প্রবাসী
ইতিহাসের ধারা

দ্বিতীয় খণ্ড

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

রত্নাবলী
১১এ, ব্রজনাথ মিত্র লেন। কলকাতা ৭০০ ০০৯

নিবেদন

বাংলা সাময়িকপত্র প্রকাশনার প্রবাহে *প্রবাসী* দিকচিহ্নপ্রতিম। বস্তুত বিশ শতকের প্রত্যুষে প্রকাশিত এই সাময়িকপত্র বাঙালির রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বাঁকবদলের কালবিন্দুকেই যেন চিহ্নিত করে রেখেছে। সাহিত্যক্ষেত্রে যে বিপুল অর্জন নিশ্চিত হয়ে গেল, রাষ্ট্রক্ষেত্রে প্রগাঢ় দেশচেতনার নানা স্রোত-প্রতিস্রোত যেভাবে উন্মথিত হল, সংস্কৃতির অন্য নানা আঙিনা যে সোনালি ফলনে সমাকীর্ণ হল, তার প্রতিভাস মিলে যাবে *প্রবাসী*-র অক্ষরসমারোহে, অলংকরণ, অঙ্গসজ্জা, আলোকচিত্র ও চিত্রবহুলতার আয়োজনে। *প্রবাসী* এবং তার জন্মদাতা ও স্বপ্নদ্রষ্টা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রায় সমার্থক শব্দ। *দাসী, প্রদীপ* বা ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত *মডার্ন রিভিয়্যু*—এগুলিও রামানন্দ-জীবন ও মননের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত থাকলেও *প্রবাসী* নামের সঙ্গে রামানন্দ নামের সমীপবর্তিতা বুঝি পূর্বতন দৃষ্টান্তগুলির তুলনায় অধিকতর নিবিড়। *প্রবাসী* প্রকাশনার পূর্বে সম্পাদনাকর্মে তাঁর দীর্ঘ প্রস্তুতিপর্ব ছিল, সম্পাদকের বৃত্তি ও যোগ্যতা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ধ্যানধারণা ছিল, সাহিত্য-সংস্কৃতি-শিল্পকলা, রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি প্রসঙ্গে তাঁর স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত ছিল। এসবের ধারাবাহিক প্রতিফলন পাওয়া যাবে *প্রবাসীর* পাতায়-পাতায় বছরের পর বছর।

প্রবাসী থেকে চয়ন করে বিবিধ প্রসঙ্গ ও সংশ্লিষ্ট রচনা সংকলিত হল গ্রন্থাগারে। এই কাজটি সম্পাদন করেছেন প্রাজ্ঞ গবেষক অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু এবং অধ্যাপক সুদীপ বসু। অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর রসবোধ ও গবেষণাকর্মে প্রাবীণ্য এবং অধ্যাপক সুদীপ বসুর বিদ্যোৎসাহী উদ্যম এই সংকলন বাস্তবায়নের পথে আমাদের প্রভূত সহায়তা করেছে।

দ্বিতীয় প্রচ্ছদে ব্যবহৃত রবীন্দ্রগান *প্রবাসী*-র উদ্দেশ্যে রচিত। পাণ্ডুলিপিচিত্র শ্রদ্ধেয় শঙ্খ ঘোষের সহৃদয় সৌজন্যে পাওয়া গেছে।

দ্বিতীয় খণ্ডে সংকলিত হল চারটি পর্ব—শিক্ষা ও সংস্কৃতি, শিল্প ও শিল্প-আন্দোলন, জীবনচিত্র ও অন্যান্য প্রসঙ্গ এবং স্বাস্থ্য ব্যায়াম খেলাধূলা। শেষোক্ত পর্বে প্রকাশিত হয় জাতিগঠনে সুস্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সদা-সচেতনতা এবং একই সঙ্গে মোহমেডান ক্লাবের ফুটবলবিজয় প্রসঙ্গে তাঁর অসাম্প্রদায়িক দেশপ্রেমিক মনের ঠিকানা। অন্য তিনটি পর্ব একে অপরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট। এদেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উজ্জীবিত পর্বে শিক্ষা,

নারীশিক্ষা, চিত্রকলা, ব্যক্তিক উৎকর্ষ ও জ্ঞানচর্চা—সকল প্রসঙ্গগুলিই গভীরভাবে বিজড়িত হয়ে গিয়েছিল আমাদের দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদী প্রশ্নের সঙ্গে। সুতরাং সেদিনের স্বদেশ ও সভ্যতাকে জানার জন্য এই পর্বগুলি সমেত এই সংকলন বাঙালি পাঠকের জন্য প্রস্তুত হয়ে রইল।

পরবর্তী খণ্ডগুলি প্রকাশেও আমাদের আগ্রহ ও উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে। আশা করি এই সংকলন বাঙালি পাঠককে বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার বিষয়ে উদ্দীপিত করবে, অনুপ্রাণিত করবে।

সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়
সচিব

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-এর

প্রবাসী

ইতিহাসের ধারা

'বিবিধ প্রসঙ্গ' ও সংশ্লিষ্ট রচনা সংকলন

দ্বিতীয় খণ্ড

সূচি

শিক্ষা ও সংস্কৃতি

জ্ঞানব্রতী শিক্ষাব্রতী

নারী-শিক্ষা : নারী-প্রসঙ্গ : নারী-জীবন

সংগীত অভিনয় নৃত্য

শিক্ষা ও সংস্কৃতির নানা কথা

শিল্প ও শিল্প-আন্দোলন

Sainte Genevieve watching over Paris [পুভি দ্য শ্যাভানে-র চিত্র সম্বন্ধে নিবেদিতার মূল ইংরেজি আলোচনা ও বাংলায় তার সারানুবাদ]

১৩১৩ অগ্রহায়ণ — Millet's Angelus [মিলেট-এর চিত্র সম্বন্ধে নিবেদিতার মূল ইংরেজি আলোচনা ও বাংলায় তার সারানুবাদ] ৩২৭

চৈত্র — Notes On Pictures [Nivedita of RK-V] ৩২৮
চিত্র সম্বন্ধে। [প্রবাসী-তে ক্রমে প্রকাশিতব্য কয়েকটি বিখ্যাত ইউরোপীয় নিবেদিতার ইংরেজি মন্তব্য ও বাংলায় তার সারানুবাদ]

১৩১৪ জ্যৈষ্ঠ — QUEEN LOUISE [by Richter] ৩৩১
চিত্র-পরিচয়। [রিখটারের চিত্র বিষয় ইংরেজিতে নিবেদিতার মন্তব্য ও বাংলায় তার সারানুবাদ]

আষাঢ় — PEASANT GIRLS [by Jules Bretion] ৩৩৩
চিত্র-পরিচয়। [জুলস্ ব্রেটনের চিত্র সম্বন্ধে নিবেদিতার ইংরেজি মন্তব্য ও বাংলায় তার সারানুবাদ]

১৩১৫ জ্যৈষ্ঠ — [নন্দলাল বসুর 'সতী'-চিত্র সম্বন্ধে নিবেদিতার ইংরেজি মন্তব্য ও বাংলায় তার সারানুবাদ। নিবেদিতার ইংরেজি মন্তব্য মডার্ন রিভিউ থেকে সংকলিত।] ৩৩৪

১৩১৬ বৈশাখ — চিত্রপরিচয় : মহাদেবের তাণ্ডবনৃত্য। [মডার্ণ রিভিউ পত্রিকার ১৯০৯ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় নন্দলাল বসুর The Dance of Shiva চিত্র সম্বন্ধে নিবেদিতার ইংরেজি মন্তব্য ও বাংলায় তার সারানুবাদ। নিবেদিতার মন্তব্য মডার্ণ রিভিউ থেকে সংকলিত] ৩৩৬

চৈত্র — চিত্র-পরিচয় . শাজাহানের তাজমহল কল্পনা। [মডার্ণ রিভিউ পত্রিকার ১৯১০ জানুআরি সংখ্যায় অবনীন্দ্রনাথের Shah Jahan Dreaming of the Taj চিত্র সম্বন্ধে নিবেদিতার ইংরেজি মন্তব্য ও বাংলায় তার সারানুবাদ। নিবেদিতার ইংরেজি মন্তব্য মডার্ণ রিভিউ থেকে সংকলিত] ৩৩৭

প্রবাসী-র চিত্র-পরিকল্পনা, চিত্র-পরিচয় ও কলাশিল্পের প্রকৃতি বিচার

১৩০৯ ভাদ্র — [রাফায়েল ও তাঁর চিত্র] ৩৪১

— [যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় ও তাঁর চিত্র-প্রসঙ্গ] ৩৪২

মাঘ-ফাল্গুন — [জি এস নিউটন, আর-এ, অঙ্কিত পোর্সিয়া-র চিত্র] ৩৪২

১৩১০ জ্যৈষ্ঠ — চিত্র। [প্রবাসীতে মুদ্রিত চিত্র-নির্বাচনের যৌক্তিকতা] ৩৪৩

১৩১৩ চৈত্র — আগামী বর্ষের প্রবাসী। [চিত্র-মুদ্রণ পরিকল্পনা] ৩৪৬

১৩১৪ জ্যৈষ্ঠ — [চিত্র-পরিচয় : চিত্তরঞ্জন গুহর উপর পুলিশি প্রহারের চিত্র;

অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুগামী শিল্পীগণ

অন্যান্য শিল্পী : রবীন্দ্রনাথ-গগনেন্দ্রনাথ-অমৃত শেরগিল প্রমুখ

ভাস্কর্য : স্থাপত্য : প্রত্নতত্ত্ব

শিল্প-বিষয়ে নানা আলোচনা

শিল্প-বিতর্ক : অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়-সুকুমার রায়-রমাপ্রসাদ চন্দ ও প্রবাসী-সম্পাদক

জীবনচিত্র ও অন্য প্রসঙ্গ

বাঙালি নিজবাসে ও পরবাসে

বাঙালির ব্যবসা

নানা কথা

স্বাস্থ্য ব্যায়াম খেলাধূলা

শিক্ষা ও সংস্কৃতি

প্রাসঙ্গিক কথা

একদা অধ্যাপক শিক্ষাবিৎ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বহু বৎসর ধরে ধারাবাহিকভাবে শিক্ষাপ্রসঙ্গে লিখে গেছেন। স্বতই দেশের প্রধান শিক্ষা-নিয়ামক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রিয় বিশ্বভারতী তাঁর বহুল মন্তব্যের লক্ষ্য হয়েছে। (বিশ্বভারতী রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে উল্লিখিত)। অন্যান্য প্রসঙ্গের মধ্যে আছে—কয়েকটি বিশেষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি, শিক্ষাজীবনে প্রাচীন ভাষা ও সংস্কৃতির গুরুত্ব এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতি-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিপ্রসঙ্গ। শিক্ষার সঙ্গে বিজ্ঞানের বড়ো অংশ যুক্ত। বিজ্ঞান ও শিক্ষার সম্পর্কের বিষয়টি বিজ্ঞান বিভাগে পাওয়া যাবে। তেমনই রামকৃষ্ণ মিশন সংগঠিত কয়েকটি বিদ্যালয়ের সংবাদ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। একইভাবে রবীন্দ্রনাথের ব্যাপক শিক্ষাপ্রয়াসের বিষয়ে নানা সংবাদ রবীন্দ্র-প্রসঙ্গে ('সাহিত্য ও সাহিত্যিক' অধ্যায়ে) সংকলিত হয়েছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘদিন ধরে রামানন্দর প্রখর মন্তব্যের লক্ষ্য। ('কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়ে আমরা বহু বৎসর ধরিয়া অনেক কথা লিখিয়াছি')। যথা, ১৩২৯ পৌষ সংখ্যায় বিভিন্ন শিরোনামাযুক্ত বৃহৎ সমালোচনামূলক একটি লেখা বিবিধ প্রসঙ্গে বেরিয়েছিল।

বঙ্গীয় সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থকৃচ্ছ্র নিবারণের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বাড়তি আর্থিক অনুদান দেবার প্রস্তাব করেন, সেইসঙ্গে কিছু শর্ত জুড়ে দেন। বিষয়টির সঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আত্মকর্তৃত্বের প্রশ্ন জড়িত। শর্ত সহ দান গ্রহণ করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকার ক্ষুণ্ণ হবে, এই ছিল স্যর আশুতোষ প্রমুখের সোচ্চার মত। রীতিমতো জোরালো ভাষায় প্রকাশিত আশুতোষের এইসব বক্তব্য রামানন্দর কাছে 'যাত্রার-দলে- ভীমোচিত বীরত্ব ও আস্ফালনপূর্ণ' বক্তৃতা বলে মনে হয়। বিচার-বিশ্লেষণের দ্বারা তিনি দেখিয়েছেন, সরকারের শর্ত কেবল টাকাকড়ির ব্যয়-সংক্রান্ত, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ সরকারের উদ্দেশ্য নয়। রামানন্দ আরো বলতে চেয়েছেন, গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ই যেখানে সরকার-নিয়ন্ত্রিত, সেখানে স্বাধীনতার জন্য 'ইংরেজের এক ভৃত্য আশু-বাবু'র লম্ফঝম্প হাস্যকর। রামানন্দর আক্রমণ এমনকি ব্যক্তিগত পর্যায়ে নেমে এসেছিল। স্যর আশুতোষ সদাপে বলেছিলেন, সরকারি সাহায্য নেবার থেকে অধ্যাপকেরা উপবাস করে কাটাবেন। উত্তরে রামানন্দর ব্যঙ্গ—যেখানে আশুবাবুর জজিয়তি বজায় আছে, পূর্বসঞ্চিত পুঁজিও আছে, নিজের 'উপবাসপ্রবৃত্তি নাই', সেখানে অপরকে উপবাসী থাকতে বলা 'ন্যায়াধীশের পক্ষে' কতখানি ন্যায়সংগত?

মূল প্রশ্নটি রামানন্দ অবশ্য উত্থাপন করেননি। এ কথা ঠিক, টাকাপয়সা যে দেয়, তার শর্ত আরোপ করার অধিকার আছে। কিন্তু সরকার যেখানে বিদেশি সেখানে প্রশ্ন উঠবে সরকার কার টাকা দিচ্ছেন? পরাধীন দেশের টাকা নিংড়ে বার করে তার কিছু অংশ পরাধীন দেশের মানুষদের জন্য দান করার সময়ে শর্ত আরোপ করার নৈতিক অধিকার কি সরকারের আছে? এই মূল প্রশ্ন যাঁদের সেইসব 'অসহযোগীরা' অসহযোগ আন্দোলনকালে জাতীয় 'শিক্ষানীতি'র বিরোধিতায় তৎপর ছিলেন। অথচ স্যর আশুতোষ অসহযোগীদের জাতীয় শিক্ষানীতির বিরোধী। তিনিই আবার শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি নিয়ন্ত্রণের সমালোচক। এক্ষেত্রে স্ববিরোধিতায় আক্রান্ত তিনি।

মনে হতে পারে, আশুতোষের বিরুদ্ধে রামানন্দর জাতক্রোধ ছিল। মোটেই না। দু-বৎসরের মধ্যে আশুতোষের দেহান্তে যে দীর্ঘ একটি সম্পাদকীয় রামানন্দ লিখেছিলেন (১৩৩১ আষাঢ়), নানা তথ্যে এবং বিচারশীল শ্রদ্ধায় পূর্ণ সে-লেখাটি সত্যই উচ্চাঙ্গের। তার মধ্যে এই চমকপ্রদ তথ্যটি আছে—রামানন্দই আশুতোষের প্রথম জীবনীকার, যা বহুপূর্বে *প্রদীপ* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজে ছাত্রাবস্থা থেকেই রামানন্দ আশুতোষের সঙ্গে পরিচিত। তাঁর যেসকল গুণাবলির উল্লেখ রামানন্দ করেছেন, তাতে আশুতোষকে বিরাট কর্মশক্তিসম্পন্ন প্রতিভাশালী মানুষ হিসাবে দেখা যায়। রামানন্দ বলেছেন, আশুতোষ এমনই ক্ষমতাযুক্ত ছিলেন যে, যে-কোনো বৃত্তিই তিনি অবলম্বন করুন-না-কেন, তাতে শীর্ষস্থান অধিকার করতেনই। বহু বিদ্যার অধিকারী আশুতোষ তাঁর আইনব্যাবসার (পরে জজিয়তি) অতিরিক্ত শিক্ষাবিস্তারকেই জীবনের লক্ষ্য করেন এবং তাঁরই প্রযত্নে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পালি, চৈনা ইত্যাদি জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হয়ে ওঠে। রামানন্দর বলতে দ্বিধা হয়নি "ভিন্ন ভিন্ন জাতির, ধর্ম্মের, রুচির, ব্যবসায়ের ও মতের নানা লোককে একত্র কাজ করাইবার অসাধারণ ক্ষমতা তাঁহার ছিল। প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার অসাধারণ ক্ষমতাও তাঁহার ছিল।" 'বর্তমান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি প্রধান স্থপতি।' বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, কর্মক্ষমতায়, সংগঠনী প্রতিভায় সমাজের শীর্ষস্থানীয় এই মানুষটি ব্যক্তিগত জীবনে সহজ সরল বাঙালিয়ানা বজায় রাখতেন। সর্বসাধারণের কাছে তিনি 'আশুবাবুই' থেকে গিয়েছিলেন—এ কথাও রামানন্দর লেখা থেকে পাই।

দরকার মনে করলে রামানন্দ সমালোচনা থেকে কাউকেই রেয়াত করতেন না। এমনকি তাঁর শ্রদ্ধেয় 'আচার্য' প্রফুল্লচন্দ্র রায়কেও নয়, যাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আবিষ্কারের প্রভূত প্রশংসাকারী তিনি। আচার্য রায়ের বিজ্ঞান-বিষয়ক লেখা তিনি সাদরে পত্রস্থ করেছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূত্রেই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রামানন্দর আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সবকারি অনুদানের সঙ্গে শর্ত জুড়ে দেবার ব্যাপারে প্রফুল্লচন্দ্র দু-দিক রেখে কথা বলতে চেয়েছিলেন। তাঁর সেই কাজ রামানন্দর পছন্দ হয়নি। প্রফুল্লচন্দ্র একদিকে অর্থদাতা কর্তৃক প্রার্থীর উপর শর্ত আরোপের অধিকার, অন্যদিকে অর্থপ্রার্থীর প্রাপ্ত অর্থব্যয়ের স্বাধীনতা—দুই অধিকারকেই যুক্তিযুক্ত বলেন। তিনি মেনে নিয়েছিলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় অনেক গলদ থাকতে পারে বা আছে; কিন্তু কোথায় গলদ তা তিনি পরিষ্কার করে বলার 'উপকারটুকু' করেননি—এসব কথা বলতে রামানন্দর সংকোচ হয়নি।

সরকারি অর্থের প্রায় সবটুকু নিম্ন পর্যায়ের শিক্ষায় ব্যয়িত না হয়ে উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষা যেন উপযুক্ত অর্থ লাভ করে, তার পক্ষে প্রফুল্লচন্দ্র সওয়াল করেছিলেন। কেন-না দেশের সাংস্কৃতিক ও বৈষয়িক উন্নতির জন্য উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন। এই সূত্রে রামানন্দ যা লিখেছেন তাতে তাঁকে কার্যত এক সমাজতান্ত্রিকের ভূমিকায় দেখা যায়। সরকারি রাজস্বের প্রায় সবটাই যে 'দৈহিক শ্রমজীবীদের' কাছ থেকে আদায় করা হয়, তা নানা তথ্যযোগে দেখিয়ে দেবার পরে তিনি পরিষ্কার বলেন, 'অতএব সরকারী টাকার উপর সাধারণ চাষী, মজুর প্রভৃতির শিক্ষারই দাবী বেশী।' এমন প্রশ্নও তিনি করেছেন, 'কতকগুলি ধনী ও শিক্ষিত লোক মজুরদিগকে খাটাইয়া নবাবী করিবেন, এবং মজুররা ময়লা ছেঁড়া কাপড় পরিয়া কুঁড়ে ঘরে মোটাভাত খাইয়া অজ্ঞতায় জন্তু-জীবন যাপন করিবে?' প্রফুল্লচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'নিরপেক্ষ সমালোচনা' না করায় রামানন্দর বিদ্রূপে ঝাঁঝ যথেষ্ট : 'তিনি কিছু সমালোচনা করিলে কর্ত্তারা বলিতে পারিতেন না, যে, লোকটা উমেদার ছিল, নিরাশ হইয়া সমালোচক সাজিয়াছে।'

আধুনিকতা ও ঐতিহ্যের সমন্বয়কামী রামানন্দর জোরালো প্রতিবাদ শোনা গিয়েছিল যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তাব করে—প্রবেশিকা পরীক্ষা পাসের জন্য সংস্কৃত বা অপর কোনো ধ্রুপদি ভাষা শিক্ষা আবশ্যিক থাকার দরকার নেই। ১৩৩৮ আষাঢ়-এর সম্পাদকীয়তে রামানন্দ আপসহীন স্বরে বলেছিলেন : 'আমরা কিছুতেই উহার অনুমোদন করিতে পারি না।' এমনকি তাঁর বক্তব্য, কেবল হিন্দু বালক-বালিকারা নয়, মুসলমান বালক-বালিকাদেরও সংস্কৃত শেখা উচিত। সে-শিক্ষা কেবল বাংলা ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণেই নয়, অধিকন্তু সংস্কৃত সুমহান ঐতিহ্যের ধারক, এই কারণেও বটে। রামানন্দর সে-মত জানা গেছে 'ত্রিকালব্যাপী স্বদেশপ্রীতি' (১৩৪২ কার্ত্তিক) রচনায়। এইসঙ্গে উল্লেখ করা যায় 'বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই'—বঙ্কিমচন্দ্রের এই কথা কেবল বাংলার ক্ষেত্রে নয়, ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও সত্য। একই ধরনের কথা স্বামী বিবেকানন্দ বারবার স্মরণ করিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের লেখাতেও সে-প্রসঙ্গ আছে।

একই কথা রামানন্দ পরে তুলেছিলেন স্বদেশপ্রীতির সঙ্গে ব্যাপারটিকে যুক্ত করে ('ত্রিকালব্যাপী স্বদেশপ্রীতি', ১৩৪২ কার্ত্তিক)। ভাষাবিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতিষ, রসায়নবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে প্রাচীন ভারতীয়দের আগ্রহ, চর্চা ও লব্ধ জ্ঞান, 'এই সকল বিদ্যা বর্ত্তমান অনুশীলকদের কাজে লাগিতে পারে।' যথার্থ স্বদেশপ্রীতি তখনই সম্ভব যখন বর্তমানের শুভ ফল-কে অতীতের জন্য সংরক্ষণ করা যাবে। রামানন্দ লিখেছেন 'ভবিষ্যতের স্বদেশের লোকেরা আমাদের নিকট হইতে ভাল পাইয়া ও মন্দ না পাইয়া উপকৃত হইবে। এ হেন ভবিষ্যৎস্বদেশের মূর্ত্তি কল্পনার চক্ষে দেখিয়া প্রীতি ও আনন্দ অনুভব করিতে পারা সৌভাগ্যের বিষয়।'

প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে চিন্তাভাবনা উনিশ শতকের মধ্যপর্ব থেকে বিশেষভাবে আরম্ভ হয়ে

গিয়েছিল। নারীদের জন্য (পুরুষদের জন্যও) বিদ্যাসাগরের প্রাথমিক শিক্ষাদানের পরিকল্পনা ছিল যা হয়তো সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়নি। খ্রিস্টান মিশনারি এবং ব্রাহ্মসমাজের এই-বিষয়ক চেষ্টা উল্লেখযোগ্য। কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁর অনুবর্তী সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বরাহনগরের শ্রমজীবী বিদ্যালয়ের কথা বিশেষভাবে স্মর্তব্য। কেবল সর্ববর্ণের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা নয়, ভারতীয় জনসংখ্যায় সংখ্যাগুরু নিম্নশ্রেণির মানুষদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা স্বামী বিবেকানন্দ প্রবলভাবে উপস্থিত করেছেন। তাঁর মতে, নিম্নবর্ণের মধ্যে শিক্ষার শক্তি বিস্তৃত না হওয়ার জন্য ভারতীয় সমাজদেহ ক্ষীণপ্রাণ হয়ে গেছে; ভারতবর্ষের উন্নতির জন্য আশু প্রয়োজন নিম্নশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার বিস্তার করে উচ্চশ্রেণির সঙ্গে শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত সমতা আনা। রবীন্দ্রনাথের এই-বিষয়ক চিন্তাও সুবিদিত। *প্রবাসী*-সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের এ বিষয়ে সারগর্ভ কিছু কথা *সঞ্জীবনী* পত্রিকা থেকে অনুবাদ করে পত্রস্থ করেছেন যা এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। (১৩২৪ কার্তিক)। বিবেকানন্দের মতোই রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাগত অসাম্য ইত্যাদি বর্তমান থাকলে সামাজিক বিপ্লব সম্ভাবিত, এ কথা ওই বক্তৃতায় বলেছিলেন।

বিদ্যালয়ে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের পক্ষে রামানন্দ স্পষ্ট সমর্থন জানিয়েছেন। তার দ্বারা আবার ইংরেজি শিক্ষার গুরুত্ব যেন হ্রাস না পায় সে-বিষয়েও সতর্ক করেছেন। 'ইংরাজী খুব ভাল করিয়া শিখাইতে হইবে, তাহা শিখাইবার উৎকৃষ্টতম প্রণালী শিক্ষকদের শিখিতে হইবে।' জ্ঞানরাজ্যে গন্ডিবদ্ধতার বিরোধী রামানন্দ অধিকন্তু বলেছেন, 'আমেরিকান্, ফ্রেঞ্চ ও জার্মেন্ পাঠ্যপুস্তক- সকলও আনাইয়া দেখা কর্তব্য।' (১৩২৯ শ্রাবণ)।

বর্তমান অধ্যায়ে সাধারণ শিক্ষাপ্রসঙ্গ থেকে আলাদা করে 'নারী-শিক্ষা : নারী-প্রসঙ্গ' পৃথকভাবে উপস্থিত করা হয়েছে। কারণ রামানন্দর জীবনকালে নারীশিক্ষার অপ্রচুর ব্যবস্থা, নারীদের শিক্ষা-বিষয়ে অভিভাবকদের অনিচ্ছা ইত্যাদি নারীশিক্ষাপ্রসারকে ব্যাহত করেছিল। নারীশিক্ষা-চেষ্টার সঙ্গে এদেশের বিরাট পুরুষদের ঘনিষ্ঠ যোগ, বিদ্যাসাগরের মহান ভূমিকা, কেশবচন্দ্র সেন ও ব্রাহ্মসমাজের প্রয়াস, কিছুটা মিশনারিদের চেষ্টা, যদিও তা প্রায়শ স্বার্থগন্ধী ইত্যাদি ছিল— সংস্কারপন্থী রামানন্দ নারীদের উন্নয়নমূলক এই ধারার উত্তরাধিকার গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পত্রিকায় তিনি সর্বদাই শিক্ষা ও জীবনের অন্য ক্ষেত্রে নারীদের সাফল্য-সংবাদকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করতেন। নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠাই সংস্কার-আন্দোলনসমূহের মূল প্রেরণা। (সে-প্রসঙ্গ অন্য খণ্ডে থাকবে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ খণ্ডে রামকৃষ্ণ মিশনকেন্দ্রিক নারীশিক্ষার সংবাদও আছে।) নারী-পরিচালিত অথবা নারীদের জন্য স্থাপিত শিক্ষা ও কর্মপ্রতিষ্ঠানের সংবাদ তাঁর পত্রিকায় যথেষ্টই পাওয়া যায়। ১৩৪১ পৌষ সংখ্যায় চিত্তরঞ্জন চক্রবর্তী লিখিত 'বাণীবন বালিকাবিদ্যালয়' নামে সচিত্র রচনা প্রকাশিত হয়েছে। বিদ্যালয়টির উন্নতির মূলে ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম নেতৃস্থানীয় ডা. প্রাণকৃষ্ণ আচার্য। তা ছাড়া একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি এই বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা ও প্রধানশিক্ষকতা করেছেন। অল্প বেতনে এই বোর্ডিং স্কুল হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া মহকুমার ক্ষুদ্র গ্রামে অবস্থিত। বেশির ভাগ অধিবাসী দরিদ্র। বিদ্যালয়ের ছাত্রীনিবাসে

বাংলার নানা জেলার, এমনকি অসম বা মাদ্রাজ (বর্তমান চেন্নাই) থেকেও বালিকারা এসে বাস করেন। নানা ধরনের কর্মশিক্ষা দেওয়া হয়। ব্যায়ামচর্চার ব্যবস্থাদি ও 'নীতি-বিদ্যালয়' আছে। নমশূদ্র সম্প্রদায়ের কয়েকটি বালিকা পরীক্ষায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে এবং শিক্ষাবিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা বিদ্যালয়টির বিশেষ প্রশংসা করেছেন।

লর্ড কার্জনের শিক্ষাসংকোচ নীতির ফলস্বরূপ নারীশিক্ষার জন্য কেবল বেথুন কলেজকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় যেখানে শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে গণিত ছিল না। অর্থাৎ উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নারীরা গণিতশিক্ষায় বঞ্চিত। এই বিচিত্র ব্যবস্থা দেখে রামানন্দ কঠোর মন্তব্য করেছেন : 'ছাত্রীরা গণিতের মত সাধারণ একটা বিষয় কেন শিখিতে পাইবে না'—(১৩১৬ শ্রাবণ), যখন ছাত্রদের শিক্ষার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে গভর্নমেণ্ট অকুণ্ঠ? আশ্চর্যের বিষয় 'দেশপ্রেমিক গোপালকৃষ্ণ গোখলে' 'বুদ্ধিভ্রংশ'-হেতু শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে সরকারের কঠোর বিধিব্যবস্থার সমর্থন করেছিলেন (১৩১৬ শ্রাবণ)। স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারে রামানন্দর এই আগ্রহ ক্রমান্বয়ে চোখে পড়বে প্রধানত প্রাচীনপন্থী হিন্দুবাড়ির মেয়েদের বিদ্যালয় 'মহাকালী পাঠশালা' (১৩১৪ জ্যৈষ্ঠ), 'সাবিত্রী শিক্ষালয়' অল্প (১৩৪১ পৌষ) কিংবা 'নারীশিক্ষাসমিতি' (১৩৩৬ পৌষ) সম্পর্কে তাঁর লেখা থেকে। একইসঙ্গে শান্তিনিকেতনের নির্মল আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক পরিবেশ বালিকাদের শারীরিক ও মানসিক শিক্ষার পক্ষে কতটা উপযোগী, সে সম্বন্ধেও রামানন্দ সওয়াল কবেছেন। (১৩৩২ জ্যৈষ্ঠ)। এমনকি এই শংসাপত্রও ছিল : 'কোন-কোন বিষয়ে শান্তিনিকেতনের গ্রন্থাগার প্রেসিডেন্সী কলেজের গ্রন্থাগার অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট।'

বিবিধ প্রসঙ্গের মধ্যে প্রচলিত ধারা অনুযায়ী শিক্ষাদানে নিয়োজিত মহাকালী পাঠশালার প্রতিষ্ঠাত্রী মাতাজি তপস্বিনীর মতো বর্ণময় চমকপ্রদ চরিত্রকে রামানন্দ তুলে এনেছেন। (১৩১৪ জ্যৈষ্ঠ)। মাতাজি তপস্বিনীর 'আদর্শ'কে তিনি কেবল 'অনুকরণযোগ্য' নয়, 'পূজনীয়' পর্যন্ত বলেছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বিএ এবং ডাক্তার উপাধিপ্রাপ্ত কাদম্বিনী গাঙ্গুলি নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে বিস্ময়কর চরিত্র। কাদম্বিনীই 'প্রথমে কংগ্রেসে ও সমাজ সংস্কার সমিতিতে বক্তৃতা করেন।' নারীদের রাষ্ট্রীয় অধিকারলাভ এবং শ্রমক্ষেত্রে নারীর স্বার্থসংরক্ষণে কাদম্বিনীর সাগ্রহ সমর্থন রামানন্দ করে গেছেন।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি অধ্যায়ের মধ্যে অশ্বিনীকুমার দত্তের মৃত্যুতে রচিত শোকনিবন্ধটি (১৩৩০ অগ্রহায়ণ) কেন অন্তর্ভুক্ত করা হল সে সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে। অশ্বিনীকুমার স্বদেশি যুগের বিখ্যাত নেতা, গঠনমূলক স্বাদেশিক কর্মে তাঁর অসামান্য সাফল্য—এইসব কারণে তাঁকে রাজনীতি খণ্ডেও আনা যেত। কিন্তু সাধারণের কাছে অশ্বিনীকুমার শিক্ষাব্রতী হিসাবেই পরিচিত। ১৮৯৭ সালে আলমোড়ায় অবস্থানকালে স্বামী বিবেকানন্দ অশ্বিনীকুমারকে শিক্ষাব্রতী জেনে আদর্শ শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছিলেন। জীবনের বাস্তব প্রয়োজনের সঙ্গে শিক্ষার সংযোগ, শিক্ষার দ্বারা ছাত্রদের মধ্যে আত্মমর্যাদা আত্মবিশ্বাস ও বীর্যবত্তার সৃষ্টি, এবং সমাজের একেবারে নিম্নশ্রেণি যথা মুচি মেথর প্রভৃতির মধ্যে

উপযুক্ত শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা—সে-বিষয়ে অনেক কথাই স্বামীজি বলেছিলেন। অশ্বিনীকুমারকে স্বামীজি বলেন :

> শুনছি, আপনি কি একটা শিক্ষার কাজ নিয়ে আছেন; ঐ হল আসল কাজ। আপনার মধ্যে একটা বিরাট শক্তি কাজ করছে, আর জ্ঞানদান হচ্ছে একটা মস্ত কাজ। কিন্তু দেখবেন, জনসাধারণের মধ্যে যেন মানুষ-গড়ার শিক্ষা বিস্তার পায়। তার পরের কাজ হল চরিত্র গড়ে তোলা। আপনার ছাত্রদের চরিত্র বজ্রদৃঢ় করে তুলুন। বাঙ্গালী যুবকদের হাড় থেকেই তৈরী হবে সে বজ্র, যা ভারতের দাসত্বকে চূর্ণ করবে।.. আর অচ্ছুত, মুচি, মেথর ও তাদের মতো সকলের কাছে গিয়ে বলুন, 'তোমরাই তো জাতের প্রাণ, তোমাদের মধ্যে এমন অসীম শক্তি আছে যে তা দুনিয়াকে উলটে দিতে পারে। ওঠ, বাঁধন ঝেড়ে ফেল—দেখবে, সারা দুনিয়া তোমাদের দেখে অবাক্ হয়ে যাবে।' তাদের মধ্যে স্কুল বসান, আর তাদের গলায় পৈতে ঝুলিয়ে দিন। (স্বামী গম্ভীরানন্দ, যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৩, ২য় সংস্করণ, কার্ত্তিক ১৩৭৬)

এইসব বিবেচনায় আমরা সর্বাত্মক মানুষ গঠনে ব্রতী জাতীয়শিক্ষক হিসাবে অশ্বিনীকুমারকে গ্রহণ করেছি, সেজন্যই তাঁকে শিক্ষা অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এদেশে নবধারার শিক্ষানীতির প্রবর্তন রবীন্দ্রনাথের অসামান্য কীর্তি। সেই হিসাবে শান্তিনিকেতনে নানা ধারার শিক্ষাপ্রয়াস স্বভাবতই *প্রবাসী*-র রচনাবিষয় হয়েছে। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রামানন্দর গভীর সৌহার্দ্য এবং রবীন্দ্রসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিকে জনসমক্ষে উপস্থিত করার ব্যাপারে তাঁর বহুল উদ্যম ছিল। শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন ও বিশ্বভারতী সংক্রান্ত প্রচুর সংবাদ ও সে-বিষয়ে সমাদরমূলক মন্তব্য *প্রবাসী*-তে বেরিয়েছে।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত স্কুল-কলেজের বাইরে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাঁচে বিশ্বভারতীতে শিক্ষা প্রবর্তনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। সেজন্য তিনি লোকশিক্ষাসংসদ স্থাপন করেন এবং বিশ্বভারতীও পাঠ্য-গ্রন্থাবলি প্রকাশ করতে থাকেন (১৩৪৬ মাঘ)। এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বিবৃতি সংবাদপত্রে বেরিয়েছে এবং তিনি বঙ্গীয় শিক্ষাসচিব মহাশয়কে ওই ব্যাপারে অনুরোধজ্ঞাপক পত্র লিখেছেন। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রকাশিত বিবৃতিতে (১৩৪৬ আশ্বিন) লোকশিক্ষাসংসদের পরীক্ষার্থীদের বিশ্বভারতীর গ্রন্থ ক্রয়ে উৎসাহিত করার জন্য শতকরা পঁচিশ টাকা কম মূল্য নেওয়ার কথাও আছে।

কেবল পুথিগত শিক্ষা নয়, 'শিক্ষাসত্র' স্থাপন করে শিক্ষাকে ফলিত আকারে উপস্থিত করতে রবীন্দ্রনাথ উদ্যোগী হন (১৩৪৫ জ্যৈষ্ঠ)। বিশ্বভারতীর বুলেটিনের অংশবিশেষ উদ্ধার ক'রে রামানন্দ দেখিয়েছেন, 'কারুশিল্পে ও গৃহশিল্পে'র 'শিল্পশালায় সে [ছাত্র] শিক্ষিত উৎপাদক ও সম্ভাব্য স্রষ্টারূপে দক্ষতা অর্জ্জন' করবে। কলকাতায় শ্রীনিকেতন পণ্যভাণ্ডারের উদ্‌বোধন (উদ্‌বোধন করেন কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু) উপলক্ষ্যে (১৩৪৫ পৌষ) রামানন্দ, রবীন্দ্রনাথের নবশিক্ষক ভূমিকাকে পুনশ্চ স্মরণ করালেন। শ্রীনিকেতন প্রবর্তনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, যেসকল সাধারণ

মানুষের পক্ষে পুথিগতশিক্ষা নেওয়া সম্ভব নয়, তাদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে কারুশিল্প-শিক্ষার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। শিক্ষার সঙ্গে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয়তা এই শিক্ষাব্যবস্থায় স্বীকৃত।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-সংস্কৃতি-বিষয়ক ভাবনার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য অংশ, ১৩২৪ কার্ত্তিক সংখ্যার 'নিম্নশ্রেণীর লোকেদের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য'। শ্রমজীবী পাঠশালায় প্রদত্ত ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলেন, শিক্ষিত-অশিক্ষিতের শিক্ষাগত ব্যবধান না কমলে ভবিষ্যৎ বিপ্লবের সূচনা হতে পারে। এ ধরনের চিন্তা রবীন্দ্রনাথের মনে দীর্ঘদিন ধরেই বর্তমান ছিল। এরপর ১৯৩০ সালে তিনি রাশিয়া ভ্রমণ করেন—রাশিয়ার 'বিপ্লবে'র পরে—এবং সেখানে সাধারণ মানুষের ব্যবস্থা দেখে অভিভূত হন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও
অন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গ

১৩১৬ শ্রাবণ

[লর্ড কার্জনের শিক্ষাসংকোচ নীতির ফল]

লর্ড কার্জ্জনের বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। আইন অধ্যাপনা পূর্ব্বে কলিকাতা বিদ্যালয়ের অনেক কলেজে হইত, এখন কেবল দুটি কলেজে হইবে। সরকারী কলেজটি স্থাপিত হইবার যখন প্রস্তাব হয়, তখন কর্ত্তাদের লম্বাচৌড়া বাক্যে মনে হইয়াছিল যে নাজানি তাহাতে কি দিগ্‌গজ অধ্যাপক সকল নিযুক্ত হইবেন। এখন অধ্যাপকদের নামের তালিকার গোড়াতেই প্রিন্সিপ্যাল মহাশয়ের নাম দেখিয়াই আমাদের আইন সম্বন্ধে অজ্ঞতা বেশ বুঝিতে পারিলাম। তাঁহার নাম আমরা কখন শুনি নাই। উকীল ব্যারিষ্টরেরা হয়ত অনেকবার শুনিয়াছেন। অধ্যাপকদের মধ্যে এক জন কি দু জন ছাড়া আর কাহারও আইনজ্ঞান সম্বন্ধে খ্যাতির কথা আমরা শুনি নাই। কিন্তু আমরা অব্যবসায়ী লোক, আমাদের ভুল হইতে পারে।

সাধারণ শিক্ষার কলেজ ২/১টি মাত্র উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু কার্য্যতঃ অনেকগুলিই আংশিক ভাবে উঠিয়া গিয়াছে। কারণ এখন প্রত্যেক কলেজেরই অধ্যাপনার বিষয় খুব কমাইয়া সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে। ছাত্রদের জন্য তবু অনেক কলেজ আছে, ছাত্রীদের একমাত্র বেথুন কলেজ। তাহাতে গণিত শিখান হইবে না। ছাত্রীরা গণিতের মত সাধারণ একটা বিষয় কেন শিখিতে পাইবে না? ছাত্রদের জন্য গবর্ণমেণ্ট লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করিবেন আর ছাত্রীদের জন্য বৎসরে কয়েক শত টাকা খরচ করিতে পারেন না, ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। ছাত্রীরা কলেজে গণিত শিখিতে না পাইলে ইংরাজী বালিকাবিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীর জন্য গণিত শিখাইবার শিক্ষয়িত্রী কোথা পাওয়া যাইবে?

এ বৎসর ছাত্রেরা দলে দলে কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিতেছে। সর্ব্বত্র শ্রেণীগুলির নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ১৫০ পূর্ণ। কোথাও স্থান নাই। প্রত্যেক শ্রেণীতে ১৫০ ছাত্র, এই যে সীমা, ইহা অযৌক্তিক নহে, কিন্তু যে দেশে যথেষ্ট কলেজ নাই, বিশ্ববিদ্যালয়ের কড়া নিয়মে হইতেও পারে না, সেদেশে এইরূপ সীমানির্দ্দেশ প্রকারান্তরে ছাত্রগণকে এই বলার সমান যে তোমরা টাকা খরচ করিলেও লেখা পড়া শিখিতে পারিবে না। অথচ অনেক সুবুদ্ধি লোক ভাবিয়া স্থির করিতে পারেন না যে ছাত্রদের হৃদয় সর্ব্বদা সন্তোষ ও বিশ্বপ্রেমে কেন পরিপূর্ণ হইয়া থাকে না।

শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে সম্প্রতি একটি বক্তৃতায় বলিয়াছেন :—

"It should be plain to the meanest understanding that towards ideas of Independence the Government could adopt only one attitude—that of stern, and relentless repression, for these ideas were bound to lead to violence."

গোখ্‌লে মহাশয়ের বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম। তাঁহার এই উক্তিকে বোম্বাইয়ের এংলো ইণ্ডিয়ান কাগজ এড্‌ভোকেট অব্ ইণ্ডিয়া পর্য্যন্ত absurd (অসঙ্গত ও হাস্যকর) বলিয়াছেন, কারণ, এড্‌ভোকেটের মতে

"The law cannot punish a man's thoughts, and no Government can punish a people's ideas."

১৩১৮ বৈশাখ

[সরকারি শিক্ষাবিভাগে শ্রেণীভেদ]

ভারতবর্ষের সরকারী শিক্ষাবিভাগে তিন শ্রেণীর চাকরী আছে, যথা, ইন্ডিয়ান (ভারতীয়) এডুকেশন্যাল সার্ব্বিস, প্রভিন্‌শ্যাল (প্রাদেশিক) এডুকেশন্যাল সার্ব্বিস (শিক্ষা-সম্বন্ধীয় কর্ম্ম), এবং সবর্ডিনেট (অধস্তন) এডুকেশন্যাল সার্ব্বিস। তন্মধ্যে যেটির নাম ভারতীয় তাহাতে কার্য্যতঃ ভারতবাসীকে নিযুক্ত করা হয় না! ইহা শ্বেতচর্ম্মীদিগের জন্য রাখা হইয়াছে। এক আধজন দেশী লোক ইহাতে নিযুক্ত হইয়াছেন। বিদ্যা, গবেষণাশক্তি, শিক্ষাদানকার্য্যে দক্ষতা, ভারতবাসীর যতই থাক না কেন, সে এই শ্রেণীর কাজ পাইবার অধিকারী নহে। পাইলে তাহা সরকার বাহাদুরের অনুগ্রহমাত্র। বিজ্ঞানচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় ভারতবর্ষের কোন ইংরাজ অধ্যাপক অপেক্ষা বিদ্যায়, গবেষণাশক্তিতে, অধ্যাপনানৈপুণ্য বা চরিত্রে নিকৃষ্ট নহেন। কিন্তু তিনি দুই যুগ ধরিয়া প্রাদেশিক শ্রেণীতেই কাজ করিতেছিলেন এবং তাঁহার স্বদেশবাসীরা এই চমৎকার বর্ণভেদের বিরুদ্ধে চীৎকার করিয়া আসিতেছিল। সম্প্রতি তাঁহাকে ইণ্ডিয়ান্ শ্রেণীতে উন্নীত করা হইয়াছে। তাঁহার মত বাছা একজন লোককে উন্নীত করিয়া সর্ব্বসাধারণের অসন্তোষ দূর করিবার চেষ্টা মন্দ নয়! কিন্তু এই বর্ণভেদ প্রথাটাই খারাপ। ইহা সমূলে উৎপাটিত না হইলে আমরা কখনও সন্তুষ্ট হইতে পারি না।

১৩২২ কার্ত্তিক

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়ান্স কলেজ।

সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের এক অধিবেশনে বলেন যে ভারতগভর্মেন্টের নিকট প্রত্যাশিত সাহায্য না পাওয়াতে সায়ান্স কলেজের কাজ আরম্ভ করিতে পারা যাইতেছে না। অমনি কালা গোরা অনেক সিনেটার আতঙ্কে অস্থির হইয়া ঘোষণা করিলেন—দোহাই ধর্ম্মাবতার, সার আশুতোষের কথার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নাই! গভর্মেন্ট সাহায্য করিতেছেন না এমন কথা মুখে আনা?—কথাটা কিন্তু সত্যই, যে, টাকার অভাবে সার তারকনাথ ও সার রাসবিহারীর দানের বৃক্ষ নিষ্ফল হইয়া আছে। গভর্মেন্টের উচিত ইহাকে ফলবান করিয়া তোলা। যাহাদের দানে সায়ান্স কলেজের উৎপত্তি তাঁহাদের মধ্যে জীবিত সার রাসবিহারী বা সেইরূপে বদান্য কোনো ধনীর দানে উহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইতে পারা আশ্চর্য্য নয়; কিন্তু তাহা যে পরিমাণে আমাদের দেশের লোকের গৌরবের কারণ হইবে সেই পরিমাণে তাহাতে গভর্মেন্টের নিন্দা ও কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইবে। সামান্য টাকা বাঁচাইতে গিয়া গবর্ণমেন্টের এরূপ নিন্দাভাজন হওয়ায় কোনই লাভ নাই।

রসায়ন-বিভাগে অল্প কয়েকটি ছাত্র লইয়া সম্প্রতি কাজ আরম্ভ হইয়াছে।

১৩২৩ চৈত্র

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রশ্ন চুরি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্ন চুরি হওয়ায় ছাত্রেরা দুই দিন পরীক্ষা দেওয়ার পর উহা স্থগিত হইয়াছে; ৩০শে মার্চ্চ আবার আরম্ভ হইবে। প্রশ্ন চুরি যাওয়ায় নানা-প্রকার অনিষ্ট হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর এবং উহার পরীক্ষার উপর লোকের আস্থা কমিয়া যায়, এবং লোকের ধারণা জন্মে যে, যে-সকল বৎসর প্রশ্ন চুরির কোন কথা শুনা যায় না, বুঝি বা সে-সব বৎসরও প্রশ্ন জানা পড়িয়া থাকে। এই-প্রকারে, পরীক্ষায় পাশ হওয়ার যে কোন মূল্য আছে, এ-বিশ্বাস কমিয়া যায়। তজ্জন্য চাকরীর বাজারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের দর পরোক্ষভাবে কমিয়া যাওয়া বিচিত্র নহে। অনেক ছাত্র সব বৎসরই জ্ঞান অর্জ্জনে ততটা মন দেয় না, যতটা কি প্রশ্ন পড়িতে পারে, তাহা অনুমান করিতে চেষ্টিত হয়, বা কি প্রশ্ন পড়িয়াছে তাহা জানিবার জন্য ব্যগ্র থাকে। ইহাতে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। বিদ্যালয়ে যাওয়া ও পরীক্ষা দেওয়া ব্যর্থ হয়। সকলের চেয়ে অনিষ্ট এই হয় যে মনের মধ্যে প্রশ্ন জানিবার এবং জ্ঞানলাভ না করিয়াও ফাঁকি দিয়া পাশ করিবার একটা অসাধু আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া থাকে। চরিত্রগঠনের ইহা এক মহা অন্তরায়। বাঞ্ছনীয় কৃতিত্ব মানুষের যাহা কিছু হইতে পারে, সিদ্ধিলাভ মানুষের দ্বারা যাহা কিছু হইতে পারে, পরিশ্রম, সংযম, কষ্ট-সহিষ্ণুতা ও সাধনার মূল্যে সেই কৃতিত্ব ও সিদ্ধি ক্রয় করিব,—মনুষ্যত্ব যাহার আছে, সে এইরূপ ইচ্ছাই করে। বিপরীত প্রকারের ইচ্ছা যাহারা করে, তাহাদের চরিত্র অন্তঃসারশূন্য হয়। ফাঁকি দিয়া খাঁটী কিছু এ জগতে পাইবার জো নাই। যে-যে কারণে মানুষের মন অসাধু উপায় অবলম্বন, চাতুরী, প্রভৃতির দিকে আকৃষ্ট হয়, ও মানুষ ফাঁকি দিয়া কিছু একটা করিতে ও হইতে উৎসুক হয়, সেই-সব কারণ মানুষের মহাঅনিষ্টের হেতু।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন চুরি যাওয়ায় বাঙালীরা কি পরিমাণ দায়ী এবং শ্বেতকায়েরাই বা কি পরিমাণে দায়ী তাহা নির্ণীত হইবে কি না, জানি না; কিন্তু ব্যাপারটা যে গবর্ণমেণ্টের কাছে ও সভ্যজগতের কাছে বাঙালীর অকর্ম্মণ্যতা ও বিশ্বাসের অযোগ্যতার প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করা হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিদ্রূপ করিয়া বলা হইবে, ইঁহারাই আবার স্বরাজ চান! আমরা কোন বাঙালী বা বাঙালীদের দোষ ঢাকিতে প্রয়াসী নহি। দোষ যত জানা পড়ে, এবং সংশোধিত হয়, ততই মঙ্গল। আমাদের কেবল ইহাই স্মরণ রাখিতে হইবে, যে, প্রশ্ন চুরি প্রভৃতি ব্যাপার কেবল মাত্র বাংলা দেশেরই একচেটিয়া দোষ নহে। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে এইরূপ-ব্যাপার হইয়া গিয়াছে। পঞ্জাবে হইয়া গিয়াছে। সেখানকার একজন ইংরেজ রেজিষ্ট্রার ঘুষ লইয়া প্রশ্নের কাগজ বিক্রী করিত। তাহা প্রমাণ হইয়া যাওয়ায় সে দণ্ডিত পদচ্যুত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক টাকা নষ্ট হইল। উত্তর লিখিবার খাতা ৬৭০০০ নষ্ট হইল। পুনর্ব্বার সমুদয় প্রশ্ন প্রস্তুত করাইবার ও ছাপাইবার জন্য বিস্তর ব্যয় হইবে। দুই দিন যাঁহারা পরীক্ষাগৃহে পাহারা দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে যে টাকা দিতে হইবে, তাহা বৃথা খরচ হইল। সমুদয় পরীক্ষা-কেন্দ্রে প্রশ্ন পাঠাইবার ব্যয় আবার হইবে। পরীক্ষার্থী ছাত্রদের ও তাহাদের অভিভাবকদের বিনা দোষে অর্থনাশ ও কষ্টভোগ হইল। অধিকাংশ ছাত্র বাড়ী

বসিয়া পরীক্ষা দিতে পায় না। বাড়ী হইতে দূরে পরীক্ষা-কেন্দ্রে গিয়া বাসাখরচ করিয়া তাহাদিগকে পরীক্ষা দিতে হয়। যাতায়াতের খরচও আছে। এই-সব খরচ দুই বার করিয়া হইবে। অনেক বিধবা মা গয়না বন্ধক দিয়া ছেলের পরীক্ষার খরচ দিয়াছিলেন। তাঁদের মত গরীব লোকদের কি কষ্ট! অনেক ছাত্র ও ছাত্রী পরীক্ষার জন্য সুস্থ দেহে উপস্থিত হইয়াছিল; কোন বিভ্রাট না ঘটিলে তাহারা পরীক্ষা দিয়া পাস্ হইতে পারিত। কিন্তু পুনর্ব্বার যখন পরীক্ষা হইবে, তখন তাহারা পীড়িত হইয়া পড়িতে পারে। বিনা দোষে তাহাদের এই যে শাস্তি হইবে, ইহা গভীর পরিতাপের বিষয়।

যাহাদের অসাবধানতা, অকর্ম্মণ্যতা বা দুর্বৃত্ততায় প্রশ্ন চুরি হইয়াছে, তাহারা অতি দুষ্ট লোক। তাহাদের সমুচিত শাস্তি হওয়া উচিত।

এই বিভ্রাটের মধ্যে সন্তোষের বিষয় কেবল একটি আছে যদি প্রশ্নচুরি ব্যাপারটা চাপা থাকিয়া যাইত, তাহা হইলে অনেক অযোগ্য ছাত্রও পাস্ হইয়া যাইত, এবং তাহারা সম্ভবতঃ অনেক যোগ্য ছাত্র অপেক্ষাও পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করিত। যাহারা প্রশ্ন জানিতে পারিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে যে অনেকে সৎ ছেলে, তাহার প্রমাণ এই যে তাহারা চুরিটা গোপন না রাখিয়া প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। যদি বাঙালীরা ও বাঙালী ছেলেরা সকলে তাহাদের নিন্দুকদের আঁকা বিকৃত ছবির অনুযায়ী অসৎ হইত, তাহা হইলে সকলে মিলিয়া ষড়যন্ত্র করিয়া ব্যাপারটা লুকাইয়া রাখিত। কিন্তু কাহারও কাহারও ধর্ম্মবুদ্ধি ইহা অসম্ভব করিয়া ফেলিয়াছে। অবশ্য কেহ কেহ অন্য কারণেও কথাটা প্রকাশ করিয়া থাকিবে।

১৩২৫ শ্রাবণ

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় দর্শনের অধ্যাপনা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত কনভোকেশ্যনে (উপাধিদান সভায়) লর্ড রোনাল্ড্‌শে বিশ্ববিদ্যালয়ে বি-এ পরীক্ষার জন্য ভারতীয় দর্শন পড়াইবার কথা তুলিয়াছিলেন। সংবাদপত্রে এই প্রস্তাবটির সম্যক্ আলোচনা হওয়া উচিত ছিল। প্রবাসীতে অল্প কিছু লেখা হইয়াছিল, মডার্ণ রিভিউতে তদপেক্ষা কিছু বেশী হইয়াছে, এবং আরও আলোচনা হইবে। বিষয়টির আলোচনা করিবার সময় মনে রাখিতে হইবে, যে, ভারতীয় দর্শন শিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে মতভেদ হইবার কথা নয়। বি-এ ক্লাসেই ছাত্রেরা সব দর্শন অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করে। এই নূতন দর্শনশিক্ষার্থীদিগকে গোড়াতেই ভারতীয় দর্শন পড়ান উচিত কি না, এবং পড়াইলে ফল ভাল হইবে কি না, তাহাই বিবেচ্য। ইহাও স্মরণ করিতে হইবে, ভারতীয় দর্শন বলিতে শুধু হিন্দুদর্শন বুঝায় না; হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, সব রকম দর্শনই বুঝায়। হিন্দুদর্শনও নানাবিধ; সবগুলি সমান মূল্যবান্ নহে, সুতরাং কোন্ কোন্ দর্শন অধীতব্য, তাহাও যে-সে বলিতে পারে না।

যদি বাংলা দেশে দার্শনিক আলোচনার উচ্চ অঙ্গের স্বতন্ত্র সাময়িক পত্র থাকিত, কিম্বা

শিক্ষাসম্বন্ধীয় উৎকৃষ্ট পত্রিকা থাকিত, তাহা হইলে হয় ত এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞদিগকে আলোচনা করিবার উপযুক্ত ক্ষেত্র দেওয়া যাইতে পারিত। দর্শনাচার্য্য শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের মত পণ্ডিত লোকদের মতই এরূপ বিষয়ে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। কারণ, তিনি পাশ্চাত্য ও ভারতীয় সর্ব্ববিধ দর্শনের পারদর্শী, এবং ছাত্রদিগকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়া থাকেন। অধিকন্তু তিনি আর্য্যামি-গ্রস্তও নহেন, সাহেবআনা-গ্রস্তও নহেন। এইপ্রকার শ্রদ্ধেয় ও নিরপেক্ষ লোকের মত যদি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জানিতে পারেন, তাহা হইলে কর্ত্তব্যনির্ণয়ের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইবে। অবশ্য এবিষয়ে মত প্রকাশ করিবার যোগ্যতা আরও কাহারও কাহারও আছে। কিন্তু সকল দিক্ দিয়া তাঁহার সমান যোগ্য আর কাহারও নাম মনে না পড়ায় কেবল তাঁহার নাম করিলাম।

১৩২৬ বৈশাখ

তিন বৎসর পরে পাসের ভুল সংশোধন!

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯১৬ সালে বলিয়াছিলেন যে বরকত আলী ও সৈয়দ আহমদ্ নামক দুটি বালক প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। ১৯১৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয় বলিতেছেন উহা ভুল, তাহারা পাস হয় নাই।

যাহারা পাস্ হয় নাই, তাহারা পাস হইয়াছে বলা হউক, সাধারণতঃ ইহা কেহ চায় না। কিন্তু তিন বৎসর পরে ভ্রম সংশোধনে ছাত্র দুটির নানারকম ক্ষতি ও অসুবিধা হইবে। যদি তাহারা সার্টিফিকেট দেখাইয়া কলেজে ইন্টারমীডিয়েট পড়িয়া পাস্ করিয়া এখন বি-এ পড়ে, তাহা হইলে কি তাহাদিগকে কলেজ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইবে? তাহা অন্যায় হইবে। কারণ এরূপে তাহাদের জীবনের তিন বৎসর সময় নষ্ট হওয়ার জন্য তাহারা দায়ী নহে। যদি তাহারা প্রবেশিকার সার্টিফিকেট দেখাইয়া কোন চাক্‌রীতে ঢুকিয়া থাকে, এবং তাহা করিবার সামর্থ্য দেখাইয়া থাকে, তাহা হইলে এখন তাহাদিগকে পদচ্যুত করা অন্যায় হইবে। যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে বা রেগুলেশ্যান্সে কাহারো ইহাদিগকে পাস্ করিয়া দিবার ক্ষমতা থাকে তবে ইহাদিগকে পাস্ করিয়া দেওয়া তাঁহার উচিত। ইহা ভিন্ন ন্যায়াচরণের অন্যপথ দেখিতেছি না।

এত দিন পরে কি প্রকারে ভুল ধরা পড়িল, তাহাও রহস্যাবৃত।

১৩২৭ অগ্রহায়ণ

শিক্ষায় গবর্ণমেণ্টের সাহায্য গ্রহণ।

স্কুল কলেজে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য গ্রহণ বা সরকাবী স্কুল কলেজে শিক্ষালাভ গান্ধি মহাশয় পাপ মনে করেন, কারণ তাঁহার মতে গবর্ণমেণ্টের টাকা দস্যুতা-লব্ধ, সে টাকা লওয়া বা সে টাকায় যে-কাজ চলে তাহার সাহায্য লওয়া পাপ। পরের দ্রব্য জোর করিয়া তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে লইলে তাহা দস্যুতা হয় বটে। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত আমরা ট্যাক্স দিতে আপত্তি না করিতেছি, ট্যাক্স দিতে বিরত না হইতেছি, ততদিন গবর্ণমেণ্ট ন্যায়তঃ মনে করিতে পারেন যে ট্যাক্স দিতে আমাদের সম্মতি আছে; ততদিন ট্যাক্সলব্ধ টাকা দস্যুবৃত্তির টাকা নহে।

বাস্তবিক মহাত্মা গান্ধি ও তাঁহার অনুচরগণ ট্যাক্স দিয়া এই "দস্যুতার" সাহায্য করিতেছেন। অতএব "সহযোগিতাবর্জ্জন" প্রচেষ্টার প্রথম অনুষ্ঠান হওয়া উচিত ছিল, ট্যাক্স্ না দেওয়া। আমরা জানি, এই অনুষ্ঠান ঐ প্রচেষ্টার অন্তর্ভূত; কিন্তু উহা কঠিন ও বিপৎসঙ্কুল বলিয়া প্রথমেই আরব্ধ হয় নাই। কিন্তু যৌক্তিকতার খাতিরে (to be logical) উহাই যে প্রথম কার্য্য হওয়া উচিত ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাও নিশ্চিত, যে, ট্যাক্স্ প্রদান হইতে বিরতির পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের টাকাকে ডাকাতির টাকা বলা যায় না।

উচ্চতর রাজনীতির জন্য শিক্ষা বলিদান

মহাত্মা গান্ধি বলিয়াছেন, তিনি উচ্চতর রাজনীতির অনুরোধে শিক্ষা বলি দিতে (to sacrifice education for higher politics) প্রস্তুত হইয়াছেন। তিনি কি করিতে চান, না জানায়, ইহার অর্থ বুঝা গেল না। গত মহাযুদ্ধে ইংলণ্ডের, ফ্রান্সের, বেল্‌জিয়ামের কলেজেব ছেলেরা দেশের স্বাধনীতা রক্ষার জন্য লেখা পড়া ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ করিতে গিয়াছিল। যদি ভারতবর্ষে স্বাধীনতা-সময় ঘটিত, তাহা হইলে আমাদের কলেজের ছেলেরাও যুদ্ধ করিতে গেলে আমরা মনে করিতাম উচ্চতর রাষ্ট্রনীতির খাতিরে তাহারা শিক্ষা বলি দিতেছে। কিন্তু সমরের কল্পনাও কেহ করিতেছে না, করা বাতুলতা। শ্রীযুক্ত গান্ধি ও তাঁহার সহযোগীরা কেবল বর্ত্তমান সরকার-অনুমোদিত শিক্ষালয়গুলি ভাঙ্গিয়া জাতীয় শিক্ষালয় স্থাপন করিবেন বলিতেছেন; ছাত্রদিগকে কোন প্রকার অস্ত্রহীন সাত্ত্বিক সংগ্রামে নিযুক্ত করিবেন বলিয়া ত এখনও শুনি নাই।

হইতে পারে যে, তাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্য, দেশে একটা ঝড় বওয়ান। জাতীয় ঝড়ে কলুষিত বাতাস নষ্ট হইতে পারে বটে, যদিও সঙ্গে সঙ্গে অনেক জীবন ও সম্প্রতি নষ্ট হয়। তাহার সহিত রাষ্ট্রীয় সামাজিক ঝড়ের সাদৃশ্য কল্পনা করা যাইতে পারে। কিন্তু সাদৃশ্য থাকিলেই ফলের সমতা অনুমান করা যায় না; ইহাও বলা যায় না, যে, ইতিহাস-বর্ণিত প্রত্যেক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ঝড়েই অনিষ্ট অপেক্ষা ইষ্ট অধিক হইয়াছে।

১৩২৭ চৈত্র

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি।

আগামী জুলাই মাসে বিলাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির একটি সম্মেলন হইবে। তাহাতে উহার সমুদয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত হইবেন। শুনিতেছি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছয় জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়াছেন, যথা—ডাক্তার স্যার্ নীলরতন সরকার, অধ্যাপক হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়, অধ্যাপক যোগেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, ডাক্তার প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক আর্কার্ট্, ও অধ্যাপক সী, ভী, রামন্। ইহাঁরা সকলেই বিদ্বান্ লোক। কিন্তু অধ্যাপক দাসগুপ্ত সম্বন্ধে আমাদের আপত্তি এই, যে, তিনি যখন অপরের লিখিত জিনিষ অংশতঃ নিজের বলিয়া চালাইয়াছেন, তখন তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি করিয়া পাঠান অকর্ত্তব্য।

আর একটা কথা এই, যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ও রসায়ন বিভাগের কোনও প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন নাই। অথচ আইনজীবীরা বিশ্ববিদ্যালয়কে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক টাকা দিয়াছেন, ও রসায়ন বিভাগ হইতে খাঁটি গবেষণা অনেক হইয়াছে, এবং তন্মধ্যে অনেক গবেষণা ইংরেজী বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। দুজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক গবেষক, ডাক্তার জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ও ডাক্তার মেঘনাদ সাহা, এখন ত বিলাতেই রহিয়াছেন! তাঁহাদিগকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিলে কোন ব্যয় হইত না, অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি প্রধান বিদ্যা, রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞান, উভয়েরই প্রতিনিধি সম্মেলনে স্থান পাইত। রসায়ন বিভাগের প্রতি বিমুখ হইবার কোন উপযুক্ত ও যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখিতেছি না। ডাক্তার জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের আবিষ্কৃত একটি রাসায়নিক নিয়ম "ঘোষের নিয়ম" (Ghose's Law) নামে ইউরোপীয় রাসায়নিক পুস্তকে উল্লিখিত হইতেছে।

প্রতিনিধিগণের মধ্যে কে কে বাস্তবিক বিলাত যাইবেন এবং তাঁহাদিগকে কত পাথেয় ও হোটেল-ব্যয় দিতে হইবে, জানিতে পারিলে বুঝা যাইত, যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অর্থকৃচ্ছ্রতার দিনে এত জনকে পাঠাইবার প্রয়োজন আছে কিনা।

১৩২৮ কার্ত্তিক

মুখুজ্যে মহাশয়ের আনন্দ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জানিত (recognised) বিদ্যালয়-সকলে বৃত্তিশিক্ষা দিবার জন্য গত ৯ই, ১১ই, ১২ই জুন যে পরামর্শ-সভা হয়, তাহাতে স্যার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রসঙ্গক্রমে বলেন, "আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য। তিনি বাংলা গবর্ণমেণ্টকে দেউলিয়া বলিয়াছেন শুনিয়া আমি প্রগাঢ়রূপে আহ্লাদিত (intensely pleased) হইয়াছি, কারণ এবিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলা গবর্ণমেণ্ট একপর্য্যায়ভুক্ত।" একটু তফাৎ

আছে। বিশ্ববিদ্যালয় যে-যে কারণে দেউলিয়া হইয়াছে, বাংলা গবর্ণমেণ্ট ঠিক্ সেই সেই কারণে দেউলিয়া হয় নাই। যাহা হউক মুখুজ্যে মহাশয় যে দেউলিয়াত্ব পাঁচ মাস আগে স্বীকার করিয়া ছিলেন, এও ভাল; কারণ আমরা তৎপূর্ব্বেও, আড়াই লক্ষ্য টাকা ঘাট্‌তি হওয়ার ও এবম্বিধ অন্যান্য কথা লেখায় তাঁহার ক্রোধভাজন হইয়াছি। আমাদের মত অন্যান্য সমালোচকদিগকে unscrupulous critics, flitting spectres of humanity প্রভৃতি আখ্যা তিনি দিয়াছেন।

১৩২৯ শ্রাবণ

প্রবেশিকা পরীক্ষার ভাষা ও শিক্ষণীয় বিষয়

স্থির হইয়াছে, যে, অতঃপর প্রবেশিকা পরীক্ষার শিক্ষণীয় ইংরেজী ছাড়া আর সব বিষয় দেশভাষার সাহায্যে শিখিতে হইবে, এবং সেই-সকল বিষয়ে পরীক্ষায় প্রশ্নের উত্তর দেশভাষায় দিতে হইবে। ইংরেজীও একটি অবশ্য-শিক্ষণীয় বিষয় থাকিবে।

এইরূপ পরিবর্ত্তন ভাল হইয়াছে। কিন্তু ইংরেজী খুব ভাল করিয়া শিখাইতে হইবে, তাহা শিখাইবার উৎকৃষ্টতম প্রণালী শিক্ষকদিগের শিখিতে হইবে। যে-সব জায়গায় ইংবেজী উচ্চারণ ও ইংরেজী কথোপকথন ভাল করিয়া শিখিবার অন্য উৎকৃষ্ট উপায় নাই, তথায় ফোনোগ্রাফ বা গ্রামোফোনের সাহায্যে তাহা শিখাইতে হইবে। উহার উপযোগী রেকর্ড চেষ্টা করিলেই পাওয়া যাইবে। যে-সকল শ্রেণীতে ইংরেজী শিখান হইবে, তাহার প্রত্যেকটিতে ইংরেজী পড়া ও ইংরেজী বলার পরীক্ষা লইতে হইবে। আমরা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে দেখিয়াছি, যে, বাঙালী ছাত্র শিক্ষক ও অধ্যাপকদের চেয়ে অন্য অনেক প্রদেশের ছাত্র শিক্ষক ও অধ্যাপকেরা অবাধে তাড়াতাড়ি শুদ্ধ ও অশুদ্ধ ইংরেজী বলিতে পারে।

মাতৃভাষায় নানাবিষয় শিক্ষা দিবার চেষ্টায় আপাততঃ অনেক অসুবিধা ও অনিষ্টও হইতে পারে। কিন্তু এই প্রণালীই যখন স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত, তখন ইহার প্রবর্ত্তন করিয়া অসুবিধা ও অনিষ্ট পরিহার করিবার চেষ্টাই করা কর্ত্তব্য। বাংলা পাঠ্যপুস্তক-সকলের বিষয়-বিন্যাস লিখন-প্রণালী, ছাপা ও কাগজ, চিত্র, ম্যাপ্ প্রভৃতি ইংরেজী উৎকৃষ্ট পাঠ্যপুস্তক সকলের মত করিতে হইবে। তা ছাড়া, যাহা লেখা হইবে, তাহা যেন সেকেলে না হইয়া, হালনাগাদ লব্ধ জ্ঞান অনুযায়ী হয়, তাহা দেখিতে হইবে। আমরা সাধারণতঃ কেবল ইংরেজী পাঠ্যপুস্তক-সমূহ দেখি। আমেরিকান্, ফ্রেঞ্চ ও জার্ম্মেন্ পাঠ্যপুস্তক-সকলও আনাইয়া দেখা কর্ত্তব্য। ফরাসী হইতে অনুবাদিত গ্যানোব পদার্থবিজ্ঞান ও ডেশানেলের পদার্থবিজ্ঞান আমরা অনেকে পড়িয়াছি। ঠিক্ ওরূপ বহি ইংরেজীতে ছিল না। নানা বিষয়ে বাংলা পাঠ্য-পুস্তক এখন চলিবে। স্বজনপোষণ, আশ্রিতপোষণ, উৎকোচের বিনিময়ে নিকৃষ্ট পুস্তক নির্ব্বাচন, প্রভৃতি কি প্রকারে নিবারণ করা যায়, এখন হইতে তাহার উপায় চিন্তা করিতে হইবে।

দৈনিক কাগজ-সকলে প্রবেশিকার অবশ্য-শিক্ষণীয় ও বৈকল্পিক বিষয়-সকলের যে

তালিকা বাহির হইয়াছে, তাহার মধ্যে ইতিহাস নাই। ইহা কি কাগজগুলির ভুল, না ইতিহাস সত্যসত্যই বাদ পড়িয়াছে? ভূগোল বাদ দিলে মানুষকে স্থান সম্বন্ধে সংকীর্ণমনা কূপমণ্ডূক করা হয়, ইতিহাস বাদ দিলে মানুষকে কাল সম্বন্ধে সংকীর্ণমনা ও কূপমণ্ডূক করা হয়। জাতীয় নৈরাশ্যের প্রধান প্রতিষেধক ও ঔষধ ইতিহাস। ব্যক্তিগত ও জাতীয় আচরণ সম্বন্ধে অমূল্য উপদেশ ইতিহাস হইতে পাওয়া যায়। অতীতের ভ্রম, কুপ্রথা, কুসংস্কারাদি পরিত্যাগ করিয়া নূতন পথে সুপথে চলিতে হইলে ইতিহাস আমাদের প্রধান সহায়। মিথ্যা ইতিহাসের অনিষ্টকারিতা জানি, কিন্তু বর্ত্তমানে প্রচলিত অনেক ইতিহাসের ভ্রম যে সংশোধন করা যাইবেই না, ইহা কেন মানিয়া লইব?

একটি প্রস্তাব উঠিয়াছিল, যে, প্রবেশিকা-পরীক্ষার্থীদিগকে এই সার্টিফিকেট দেখাইতে হইবে, যে, তাহারা নিয়মিতরূপ দৈহিক শিক্ষা লাভ করিয়াছে। ইহা গৃহীত হয় নাই। কলিকাতার জন্য ব্যবস্থা আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া মফঃস্বলের সকল স্কুলের জন্য এই নিয়ম এখন করিলে ভাল হইত। জানি, দেশের দারিদ্র্য নিবারণ দ্বারা পুষ্টিকর যথেষ্ট খাদ্যের ব্যবস্থা এবং ম্যালেরিয়া বিনাশ না করিলে ছাত্রদের স্বাস্থ্যের সম্যক্ উন্নতি হইবে না; কিন্তু নিয়মিত অঙ্গচালনের ব্যবস্থা থাকিলে কিছু উন্নতি হইত। এবং শরীর পটু হইলে মনের জোর ও সাহসও কিছু বাড়িত।

১৩২৯ অগ্রহায়ণ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা

বহুবৎসর ধরিয়া প্রধানতঃ আমরা মডারন্ রিভিউ ও প্রবাসীতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয় আলোচনা করিয়া আসিতেছি। অধিকাংশ সম্পাদক এবিষয়ে উদাসীন ছিলেন। কিছু দিন হইতে অনেক কাগজে বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা আলোচিত হইতেছে। ঔদাসীন্য কাটিয়া গিয়াছে, ইহা সুখের বিষয়। কিন্তু আলোচনা যে ভাবে হইতেছে, তাহাতে সন্তুষ্ট বা আশান্বিত হওয়া যায় না। যখন ভারতগবর্ণমেণ্টের প্রধান শিক্ষাকর্ম্মচারী শার্প্ সাহেবকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের নামে ডহার রোজস্ট্রার একটা কড়া চিঠি লিখেন ও তাহা বিশ্ববিদ্যালয়েরই পক্ষ হইতে দৈনিক কাগজে প্রকাশিত হয়, তখন কোন কোন সম্পাদক ভারতগবর্ণমেণ্ট তথা শার্পের এবং অপর কোন কোন সম্পাদক বিশ্ববিদ্যালয় তথা আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। আমরা কোন পক্ষ অবলম্বন করি নাই। উভয়েরই সপক্ষে ও বিপক্ষে কমবেশী বলিবার কথা ছিল এবং তাহা আমরা বলিয়াছিলাম। বর্ত্তমানে দেখিতেছি, সত্য ও ন্যায্য ও হিতকর কি, তাহা নির্ণয়ের চেষ্টা অপেক্ষা দলাদলির ভাব বেশী প্রবল হইয়াছে। ইহাতে কল্যাণ নাই। বেশীর ভাগ খবরের কাগজ এইভাবের কথা লিখিতেছেন, যে, গবর্ণমেণ্ট যথেষ্ট টাকা না দেওয়াতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক দুরবস্থা হইয়াছে। তাহা সত্য নহে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অদূরদর্শিতা ও অপব্যয় দুরবস্থার কারণ।

স্যার্ মাইকেল স্যাড্‌লারের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বসাইবার উদ্দেশ্যই এই ছিল, যে, তাহার রিপোর্ট বিবেচনা করিয়া ভারতগবর্ণ্মেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার ও পুনর্গঠন করিবেন। রিপোর্ট বাহির হইবার পর দেখা গেল, যে, কমিশন আমূল পরিবর্ত্তন ও পুনর্গঠনের পরামর্শ দিয়াছেন এবং তদনুরূপ অনুরোধ করিয়াছেন। এই প্রকারের পরিবর্ত্তন ও পুনর্গঠন ভাল কি মন্দ, আবশ্যক কি অনাবশ্যক, কিম্বা কোন্ কোন্ পরিবর্ত্তন প্রস্তাব আবশ্যক ও হিতকর, তাহার আলোচনা এস্থলে করিবার প্রয়োজন নাই। এখানে কেবল বক্তব্য এই, যে, কমিশনের প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন রকমে বিশ্ববিদ্যালয়কে চালাইতে হইলে অনেক লক্ষ টাকা এককালীন ও বৎসরে বৎসরে খরচ করিতে হইবে। ইহা অধিক হইলেও এক কোটি টাকার মধ্যে। এরূপ খরচ করিবার ক্ষমতা ভারতগবর্ণ্মেণ্টের নিশ্চয়ই ছিল; কেননা ঐ গবর্ণ্মেণ্ট সামরিক ব্যয় কোটি কোটি টাকা বাড়াইয়া চলিতেছেন। কিন্তু ভারত-গবর্ণ্মেণ্ট কিম্বা কোন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টই কখন সাধারণ নিম্ন, মধ্য বা উচ্চ শিক্ষার জন্য এবং কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পশিক্ষার জন্য যথেস্ট খরচ করেন নাই। সুতরাং আমাদের এরূপ আশা ছিল না, যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে কমিশনের অভিপ্রায় অনুযায়ী আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করিবার জন্য ভারত গবর্ণ্মেণ্ট্ যথেস্ট টাকা খরচ করিবেন।

ইতিমধ্যে কমিশনের কাজ শেষ হইয়া যাইবার পর, মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড রিপোর্ট্ অনুসারে ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালীর পরিবর্ত্তন হইল, এবং তদনুসারে প্রত্যেক প্রদেশের সর্ব্ববিধ শিক্ষার ভার উহার প্রাদেশিক গবর্ণ্মেণ্টের উপর ন্যস্ত হইল। এখন ভারত-গবর্ণমেণ্ট্ একটা বেশ সুযোগ পাইয়া গেলেন। নিজে কমিশন বসাইয়া ভারত-গবর্ণ্মেণ্ট মুস্কিলে পড়িয়াছিলেন; কারণ কমিশন লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ করিয়াছিলেন। শাসনপ্রণালী পরিবর্ত্তিত হওয়ায় ভারত-গবর্ণ্মেণ্ট্ কমিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী পরিবর্ত্তন করা না করার ভার বাংলা গবর্ণ্মেণ্টের ঘাড়ে চাপাইয়া অব্যাহতি পাইলেন। বাংলা-গবর্ণ্মেণ্ট্, কমিশনের প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তন করিবার নিমিত্ত যত টাকা আবশ্যক, তাহা ভারত-গবর্ণমেণ্টের নিকট দাবী করিয়াছিলেন কি না, জানি না, কিন্তু করা উচিত। করিবার পর যদি ভারত-গবর্ণ্মেণ্ট বলেন, "টাকা দিব না" বা "দিতে পারিব না", তাহা হইলে বাংলা গবর্ণ্মেণ্ট্ও ন্যায়তঃ অনায়াসে বলিতে পারেন, "স্যাড্‌লার কমিশন আমরা বসাই নাই, আপনারা বসাইয়াছিলেন। উহার প্রস্তাব-সকল কার্য্যে পরিণত করিবার দায়িত্ব আমাদের নহে, আপনাদের। আপনারা যখন ঐ দায়িত্ব লইবেন না, তখন প্রস্তাব সকল অনুসারে কাজ করা বা না-করা সম্বন্ধে আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে।" আমরা বাংলা-গবর্ণ্মেণ্ট্ হইলে যাহা করিতাম, উপরে তাহার আভাস দিলাম।

যাহা হউক, যদি ধরিয়া লওয়া যায়, যে, স্যাড্‌লার কমিশনের প্রস্তাবগুলি সবই ভাল, (আমরা স্বীকার করি না, যে, সব প্রস্তাবগুলি ভাল,) তাহা হইলেও দেখিতে হইবে, যে, তদনুসারে কাজ করিতে হইলে যত টাকার দরকার, বাংলা গবর্ণমেণ্ট্ তাহা খরচ করিতে পারেন কিনা। আমাদের ধারণা এই, যে, বাংলা দেশের সমুদয় রাজকর্ম্মচারীদের বেতন দেশের আয় অনুযায়ী করা হয়, যদি জাপানের মত যুক্তিসঙ্গত করা হয়, যদি কমিশনার, রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বার, প্রভৃতি অনাবশ্যক পদ এবং কয়েকটি অনাবশ্যক ডিপার্টমেণ্ট্ বা শাসন বিভাগ উঠাইয়া দেওয়া হয়, এবং তাহার পর শিক্ষাদান-কার্য্যকে তাহার উপযুক্ত

গৌরবের স্থান দিয়া অন্যান্য বিভাগের তুলনায় শিক্ষাবিভাগকে তাহার গুরুত্ব অনুযায়ী যথেষ্ট টাকা দেওয়া হয়, তাহা হইলে স্যাড্‌লার কমিশনের প্রস্তাবিত টাকা বাংলা-গবর্ণ্‌মেণ্ট্ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য খরচ করিতে পারেন। কিন্তু এখন প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা যেরূপ আছে, তাহাতে পুলিশ বিভাগ প্রভৃতি "হস্তে রক্ষিত" (reserved) বিষয়ের জন্য খুব বেশী টাকা লইয়া তাহার পর দেশী মন্ত্রীদের "হস্তান্তরিত" (transferred) শিক্ষা প্রভৃতির জন্য অযথেষ্ট টাকা দেওয়া হয়। এই কারণে শাসন-ব্যবস্থার দোষে নিম্ন মধ্য উচ্চ কৃষি শিল্প বাণিজ্য কোন প্রকার শিক্ষার জন্যই যথেষ্ট টাকা দিবার সামর্থ্য বাংলা-গবর্ণ্‌মেণ্টের নাই।

বঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের এক নম্বর বেকুবি এই হইয়াছে, যে, তাঁহারা এমন গবর্ণ্‌মেণ্টের চাকরী কেন লইলেন, যে-গবর্ণ্‌মেণ্ট্ ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের কার্য্য পরিচালন নিমিত্ত রাজস্ব বণ্টনের সময় তাঁহাদের হস্তে অর্পিত বিভাগগুলিকে যথেষ্ট টাকা দিবে না। দুই নম্বর বেকুবি এই হইয়াছে, যে, তাঁহারা প্রত্যেকেই সঙ্গতিপন্ন লোক হওয়া সত্ত্বেও কেন বার্ষিক ৬৪০০০ টাকার কম বেতন লইতে রাজী হইলেন না। তাহাতে ফল্ এই হইয়াছে, যে, কোন প্রতিষ্ঠানকে যথেষ্ট টাকা না দিলেই লোকে স্বভাবতঃ বলে, "ভায়া, তোমরা নিজে বৎসরে ৬৪০০০ লইতে পার, আর ভাল কাজের বেলা টাকা দিতে পার না?" মন্ত্রীদের তিন নম্বর বেকুবির কথাটা এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও বিবৃতির সম্পূর্ণতার খাতিরে বলিতেছি। তাহা, গবর্ণ্‌মেণ্টের কাজ চালাইবার জন্য নূতন ট্যাক্স্ স্থাপনে মত দেওয়া। তাহাতে ফল এই হইয়াছে, যে, লোকে নূতন শাসনপ্রণালীর কোন সুফল দেখিবার পূর্ব্বেই ট্যাক্সবৃদ্ধিরূপ কুফলটা আগে দেখিল। এই-সব কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাঁইরা ও অন্যেরা সহজেই লোককে তাঁহাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপাইতে পারে।

ভারত-গবর্ণ্‌মেণ্ট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে এপর্য্যন্ত যত টাকা দিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা বেশি টাকা দেওয়া উচিত ছিল। বাংলা-গবর্ণ্‌মেণ্টেরও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে টাকা দেওয়া উচিত। সেই টাকা কি ভাবে ব্যয়িত হইবে, তাহার সর্ত্ত পরিষ্কার করিয়া নির্দ্দেশ করিবার অধিকার গবর্ণ্‌মেণ্টের আছে, প্রত্যেক দাতারই আছে। এবং নির্দ্দেশ করাও কর্ত্তব্য, কেন না, বিশ্ববিদ্যালয়ে অপব্যয় হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য আয়ের টাকা কি প্রকারে ব্যয়িত হইবে, সে সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়সম্পর্কীয় আইনে গবর্ণ্‌মেণ্টের হাতে যাহা করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে; তাহার বেশী গবর্ণ্‌মেণ্ট্ কিছু করিতে পারেন না, করা উচিত নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ এই ক্ষমতার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আমাদের মতে তাহা ভ্রান্ত। আমরা আগষ্ট্ মাসের মডার্ন রিভিউ এবং ভাদ্র মাসের প্রবাসীতে এ বিষয়ে আমাদের মত যুক্তিসহকারে ব্যক্ত করিয়াছি। তাহার ভুল এপর্য্যন্ত কেহ দেখাইতে পারেন নাই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতার কথা উঠিয়াছে। আমরা এই স্বাধীনতার সম্পূর্ণ পক্ষপাতি। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের মোক্তারেরা স্বাধীনতার কথা তুলিয়া আপনাদিগকে হাস্যাস্পদ করিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে যে নূতন আইনের খস্‌ড়া প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাতে ব্যয় সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা লুপ্ত হইবে এবং ব্যয়ের ক্ষমতা বাংলা-গবর্ণ্‌মেণ্টের ও উহার শিক্ষামন্ত্রীর হাতে যাইবে। যদি খস্‌ড়ায় এইরূপ বিধি থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক স্বাধীনতা লুপ্ত হইবে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এখন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা আছে? না, সে স্বাধীনতাটা ব্যক্তিবিশেষের

"মুঠার ভিতর"? উহার খরচ কি সেনেট, সীণ্ডিকেট্, বা হিসাবের বোর্ড (Board of Accounts) যেরূপ আগে হইতে নির্দ্দেশ করেন, সেইরূপ হয়? আগে নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে বজেট্ প্রস্তুত হইয়া গেলে তাহার পর তদনুসারে খরচ হয় কি? ইহা কি সত্য নহে, যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বৎসর আরম্ভ হইবার পরে অনেক মাস যথেষ্ট খরচ হইবার পর অনেক বৎসর হইতে বজেট্ পাস্ ও মঞ্জুর হইয়া আসিতেছে? বাংলাদেশের একাউন্ট্যান্ট্ জেনেরাল কি হিসাব পরীক্ষা করাইয়া দেখান নাই, যে, বজেটে নির্দ্দিষ্ট টাকা অপেক্ষা বিনা মঞ্জুরীতে অনেক টাকা খরচ হইয়াছে? হিসাব বোর্ড সম্বন্ধীয় যে-সব নিয়ম অনেক বৎসর পূর্ব্বে প্রণীত হইয়াছিল, তাহা কেন সেনেটে পেশ্ করিয়া পাস্ করান হয় নাই, এবং কেন সেই-সব নিয়ম অনুসারে কাজ হয় নাই? স্যার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ইচ্ছা অনুসারে খরচ হইলে তাহার নাম যদি হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক স্বাধীনতা, তাহা হইলে তাহা আছে বটে। যাহা হউক, যদি সেনেটের সভ্যগণ প্রকৃত স্বাধীনতা চান, তাহা হইলে তাঁহারা যথাসময়ে যথানিয়মে বজেট্ হওয়ার পর তদনুসারে খরচ করাইয়া দেখান, যে, তাঁহারা স্বাধীনতার মানে বুঝেন ও তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে সমর্থ। নতুবা শুধু, স্বাধীনতা গেল, স্বাধীনতা গেল, বলিয়া চেঁচাইলে কি হইবে? মাথা নাই তার মাথা ব্যথা।

যাহা হউক, স্যার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং তাঁহার অনুচরদের দল চিরকাল শক্তিশালী থাকিবেন না; বাংলা-গবর্ণ্মেন্ট্ বা উহার শিক্ষাবিভাগ নিরঙ্কুশ ক্ষমতা নিজের হাতে পাইলে অপব্যবহার করিবেন না, তাহারও কোন প্রমাণ নাই। অতএব, আমাদের বিবেচনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন আইনে বিশ্ববিদ্যালয়কে আর্থিক স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। অর্থাৎ খরচ গবর্ণ্মেন্ট্ বা শিক্ষা মন্ত্রীর হুকুম অনুসারে হইবে, এরূপ নিয়ম হওয়া উচিত নয়; ব্যবস্থা এইরূপ হওয়া উচিত, যে, বষারম্ভের আগে বজেট্ হইবে; ঐ বাজেট্ বর্ষারম্ভের আগে সেনেট, আবশ্যক হইলে পরিবর্ত্তনের পর, মঞ্জুর করিবেন। তাহার পব তদনুসারে খরচ হইবে।

স্বাধীনতার সুব্যবহার করিবার এবং তাহা রক্ষা করিবার উপযুক্ত মানুষ থাকা চাই। এইজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্থিতি (constitution) আবশ্যকমত পুনর্গঠিত হওয়া দরকার। সেনেট্কে যথাসম্ভব স্বাধীন মনুষ্যসমষ্টি করিবার জন্য উহার খুব বেশী অংশ—অন্যূন শতকরা ৯০জন—নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত। বাকী শতকরা ১০জন গবর্ণ্মেন্টের কর্ম্মচারী ও মনোনীত লোক হইবেন। নূতন আইনের খসড়া না দেখিলে বিস্তারিত আলোচনা করা যায় না।

তবে একটা কথা সর্ব্বদাই মনে রাখা উচিত, তাহা আগে একাধিকবার বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি। বুদ্ধিমান্, জ্ঞানবান্, স্বাধীনচিত্ত লোকেরা নিঃস্বার্থভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পরিশ্রম করিতে যদি রাজী না থাকেন, তাহা হইলে আশু-বাবুর একচ্ছত্র রাজত্বের বিরুদ্ধে চীৎকার নিরর্থক। যে পরিশ্রম করিবে, ক্ষমতা তাহার হাতে না আসিয়া অলসের হাতে আসিতে পারে না। অবশ্য আশু-বাবু কেবল পরিশ্রমের দ্বারাই ক্ষমতাশালী হইয়াছেন, এমন নয়। বহু বৎসর ধরিয়া তিনি দল বাঁধিয়াছেন, এবং তাঁহার হাতে মানুষকে টাকা পাওয়াইয়া দিবার যত উপায় আছে, তাহা বাংলাদেশের আর কাহারও হাতে নাই। তা ছাড়া তাঁহার এবং বাংলাদেশের অন্য নামজাদা লোকদের মধ্যে একটা তফাৎ এই আছে, যে, তিনি অনুগত লোকদের ও স্তাবকদের সাংসারিক উপকার করিতে ইচ্ছুক ও প্রস্তুত এবং তজ্জন্য দুর্নাম সহ্য করিবার

শক্তিও তাঁহার আছে। কূটনীতি, চাতুরী ও কৌশলেও কেহ তাঁহার সমকক্ষ নহে। দেশী সম্পাদকের দ্বারা পরিচালিত আজকালকার খবরের কাগজগুলি পড়িলে ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

বেঙ্গালীতে দেখিলাম নূতন আইনের খস্‌ড়ায় সেনেটের সভ্যসংখ্যা ১৪০ হইবে, এবং তাহার অৰ্দ্ধেক আন্দাজ নির্ব্বাচিত এবং বাকী অৰ্দ্ধেক গবর্ণ্‌মেণ্টের কর্ম্মচারী ও গবর্ণ্‌মেণ্টের মনোনীত লোক হইবেন। আমরা এইরূপ ব্যবস্থার বিরোধী। শতকরা নব্বই জন সভ্য নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত। বাকী সভ্য গবর্ণ্‌মেণ্টের কর্ম্মচারী বা মনোনীত লোক হইলেই যথেষ্ট। নির্ব্বাচিত সভ্যদের মধ্যে যদি এমন কোন সম্প্রদায় বা শ্রেণীর লোক না থাকেন, যাহাদের লোক থাকা গবর্ণ্‌মেণ্ট দরকার মনে করেন, তাহা হইলে সেইরূপ লোক সরকার মনোনীত করিয়া দিতে পারেন; ইহা হইলেই যথেষ্ট।

আমরা বলিয়াছি, আমরা কেবলমাত্র অৰ্দ্ধেক সভ্যের নির্ব্বাচনে সন্তুষ্ট হইব না। কিন্তু যাঁহারা সেনেটের বর্ত্তমান সংস্থিতিতে (constitutionএ) সন্তুষ্ট, বিশেষতঃ যে-সব প্রসিদ্ধ ব্যক্তি অম্লানবদনে আশু-বাবুর তাবেদারী করিতেছেন, সেই-সব সেনেট-সভ্য ও অন্য লোকদের এই প্রস্তাবিত ব্যবস্থাকে যথেষ্ট গণতান্ত্রিক নহে বলিয়া চীৎকার করিবার অধিকার নাই। কারণ বর্ত্তমানে রেজিষ্টরীভুক্ত গ্রাজুয়েট্‌রা ১০০ সাধারণ ফেলোদের মধ্যে মাত্র দশজনকে নির্ব্বাচিত করেন, আর দশ জন ফেকাল্‌টিসমূহ দ্বারা নির্ব্বাচিত হন। বাকী আশীজন চ্যান্সেলার মনোনয়ন করেন। নূতন আইনের খস্‌ড়ায় নির্ব্বাচিতদের অনুপাত ও সংখ্যা, আমাদের মনঃপূত না হইলেও, বর্ত্তমান অবস্থায় উহা যেরূপ আছে, তদপেক্ষা অনেক বেশী।

বেঙ্গালীতে দেখিলাম, ধর্ম্মসম্প্রদায় অনুসারে সেনেটের সভ্যের সংখ্যা বা অনুপাত নির্দ্দেশের মত একটা কি ব্যবস্থা নূতন আইনের খস্‌ড়ায় আছে। আমরা ইহার সম্পূর্ণ বিরোধী। বিদ্যামন্দিরে এরূপ ভেদবুদ্ধি থাকা উচিত নয়। দেশে স্বতন্ত্র হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও মুসলমান বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার অশুভ দিক্ যথেষ্ট আছে। তাহার উপর সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়-সকলেও ধর্ম্ম অনুসারে সভ্যনির্ব্বাচন মোটেই হওয়া উচিত নয়। যদি সাধারণ নির্ব্বাচন দ্বারা কোন বা যথেষ্ট মুসলমান নির্ব্বাচিত না হন, তাহা হইলে গবর্ণ্‌মেন্ট্ যে-কয়জনকে মনোনীত করিবেন তাঁহাদের মধ্যে উপযুক্ত সংখ্যক মুসলমান রাখিতে পারেন।

খস্‌ড়া হস্তগত হইলে বিস্তারিত আলোচনা করা চলিবে।

১৩২৯ পৌষ

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কিছুদিন আগে কলিকাতার অনেক ইংরেজী দৈনিকে অধ্যাপক স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থাভাব সম্বন্ধে একটি চিঠি ছাপা হয়। তাহার দুএকটা কথা সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। তিনি বলিতেছেন—

"I hold no brief for the faults of omission or commission of which the University authorities might have been

guilty during the last few years. No one can deny that unbiassed criticism of public institutions is always desirable and has a healthy effect."

প্রথম বাক্যটির অর্থ ও অভিপ্রায় পরিষ্কার বোঝা যায় না। "might have been guilty", "দোষী হইয়া থাকিতে পারেন", বলিলে ঠিক্ জানা যায় না, যে, তাঁহার মতে দোষ হইয়াছিল বা হয় নাই। গবর্ণমেণ্ট্কে তিনি যেমন জোর-গলায় দোষ দিয়াছেন ও উপদেশ দিয়াছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের দোষ হইয়া থাকিলে, তাহাও তেমনি স্পষ্ট করিয়া জোরের সহিত বলা উচিত ছিল। গবর্ণমেণ্ট্কে ও সর্ব্বসাধারণকে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা সম্বন্ধে উদাসীন বলিয়াছেন। কিন্তু অবস্থার উন্নতি দোষ দূর করিয়া হয়, এবং টাকা দিয়া হয়। তিনি যদি কেবল টাকা দিতে বলেন, নিজে কোন দোষ নির্দ্দেশ না করেন, তাহা হইলে তাঁহাকেও ত বলা চলে, যে, তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা সম্বন্ধে উদাসীন, যেহেতু তিনি উহার দোষের উল্লেখ ও সংশোধন চেষ্টা করেন নাই? তবে যদি এমন হয়, যে, তাঁহার মতে বিশ্ববিদ্যালয়ের দোষত্রুটি কিছুই হয় নাই, তাহাও পরিষ্কার করিয়া বলা উচিত। "Might have been" এর কর্ম্ম নয়; "have been" কিম্বা "have not been" বলিতে হইবে।

সার্ব্বজনিক প্রতিষ্ঠানের নিরপেক্ষ সমালোচনা বাঞ্ছনীয় ও তাহাতে কল্যাণ হয়. তিনি বলিয়াছেন। কিন্তু এই "নিরপেক্ষ সমালোচনা" জিনিষটি স্বদেশী আন্দোলনের যুগে গবর্ণমেণ্টের সমর্থিত "অনেস্ট্ স্বদেশীর" (honest Swadeshi-র) মত কিছু নয় ত? গবর্ণমেণ্ট্ চান এমন স্বদেশী যাহাতে ইংরেজের ব্যবসা একটুও না কমে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তারাও চান এরূপ নিরপেক্ষ সমালোচনা যাহার দ্বারা তাঁহাদের কোন গুরুতর দোষত্রুটি প্রমাণিত হইয়া না যায়।

এরূপ বলিবার কারণ এই, যে, সংবাদপত্রে ও সাময়িক পত্রে যে-কেহ পূর্ণমাত্রায় সমালোচনা করিয়াছে, তাহারই উপর কোন-না-কোন দুরভিসন্ধি আরোপিত ও গালাগালি বর্ষিত হইয়াছে। এই জন্য রায় মহাশয় নিরপেক্ষ সমালোচনার একটা নমুনা, দৃষ্টান্ত বা আদর্শ প্রদর্শন করিলে ভাল হইত। তিনি তাহা করিলে দেখা যাইত, যে, তাঁহার মত বন্ধুর সমালোচনাকেও কর্ত্তা নিরপেক্ষ মনে করেন কি না।

তাঁহাকে বলিতেছি এইজন্য, যে, তিনি লিখিয়াছেন,

"One could suggest many reforms in the University. It is not very difficult to diagnose its ailments and to suggest the remedies..."

বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাধি-নিরূপণ এবং প্রতিকারের উপায়-নির্দ্দেশ যদি বেশী কঠিন নাই হয়, তাহা হইলে এই সোজা কাজটা তিনি কেন করেন নাই, জানিতে ইচ্ছা করি। তাঁহার খুব সুবিধাও ছিল। তিনি অভাবগ্রস্ত অর্থকামী লোক নন। তিনি চিরকুমার, পুত্রকন্যা নাই। তিনি কিছু সমালোচনা করিলে কর্ত্তারা বলিতে পারিতেন না, যে, লোকটা উমেদার ছিল, নিরাশ হইয়া সমালোচক সাজিয়াছে। তবে হইতে পারে, যে একবার আইন-কলেজ ভাঙিবার খেয়াল প্রকাশ করিয়া তিরস্কৃত হওয়ায় (তখন আমরা তাঁহার সমর্থন করিয়াছিলাম মনে থাকিতে পারে) পুনর্ব্বার সমালোচনার সখ্ আর হয় নাই।

যাহা হউক, তিনি প্রকাশ্যভাবে ব্যাধিনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলে বেশী কিছু ফল হইত বলিয়াও আশা হয় না। কারণ তিনি লিখিয়াছেন, "but after all the disease is one of chronic starvation due to want of support from Government", "বস্তুতঃ ব্যাধিটা হচ্চে

গবর্ণ্‌মেণ্ট্ টাকা না দেওয়ায় বহুকালব্যাপী অনশনজাত।" তাহা হইলে বুঝা গেল, যে, ডাক্তার রায়ের মতে গবর্ণ্‌মেণ্ট্ টাকা দিলেই রোগ সারিয়া যাইবে। তাহা হইলে তিনি গোড়ার দিকে "faults of omission or commission of which the University authorities might have been guilty" লিখিয়াছেন কেন বুঝিতে পারিলাম না। অনশন একটা অপরাধ বা দোষ নয়। কিন্তু ভাবিয়া দেখিতেছি, যে, অনশনক্লিষ্ট লোকদেরও দুরকমের দোষ হইতে পারে বটে; (১) তাহারা শক্তির অভাবে কর্ত্তব্য করিতে পারে না (faults of omission), (২) তাহারা পেটের জ্বালায় পরস্বাপহরণ করে (faults of commission)। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম রকমের দোষ হইয়া থাকিবে, কিন্তু উহা ত মানুষ নয়, যে, পরস্বাপহরণ করিবে। অতএব যদি উহাকে ডাক্তার রায় faults of commission এও দোষী মনে করেন, তাহা হইলে যে দোষগুলি কি, জানিতে কৌতূহল হয়। যদি তিনি উহাকে ঐ-প্রকার দোষে দোষী মনে না করেন, তাহা হইলে ত কথাই নাই। তিনি লিখিয়াছেন,

"On principle, I have no sympathy for autocracies, but the public and the keepers of the public purse must remember that there is a great deal of difference between antagonism to a person and antagonism to a cause".

ঠিক্ কথা। কিন্তু তিনি যে একেচ্ছাতন্ত্রের পক্ষপাতী নহেন, তাহার কার্য্যগত প্রমাণ সর্ব্বসাধারণ চাহিলে তাহা কি খুব বেয়াদবী হয়? ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধাচরণ এবং কোন সার্ব্বজনিক প্রতিষ্ঠান বা প্রচেষ্টার বিরুদ্ধাচরণ এক নহে, ইহা সোজা কথা। কিন্তু এপর্য্যন্ত শিক্ষামন্ত্রীর চিঠিপত্র, প্রেসের প্রতিনিধির প্রশ্নের উত্তর এবং বক্তৃতা অপেক্ষা সেনেট্-হাউসের বক্তৃতা ও কলিকাতা রিভিউয়ের প্রবন্ধ ও টিপ্পনীসমূহে ব্যক্তির প্রতি আক্রমণ কম আছে, না বেশী আছে, তাহা রায় মহাশয় সহজেই স্থির করিতে পারিবেন। কোন্ পক্ষ বেশী উত্তেজিত ও কোন্ পক্ষ বেশী শান্ত আছে, কে আস্ফালন করিতেছে কে করিতেছে না, তাহাও সহজেই লক্ষ্য করা যায়। একেচ্ছাতন্ত্রকে বিনষ্ট বা শক্তিহীন করিতে হইলে, যে মানুষে উহা মূর্ত্তিমান্, সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে তাঁহার ক্ষমতার উপর যে হাত পড়ে, তাহা বলিয়া দেওয়া কি আবশ্যক? অটোক্র্যাসীকে আক্রমণ কর কিন্তু অটোক্র্যাট্‌কে আক্রমণ করিও না, ইহা ঠিক কথা। কিন্তু অটোক্র্যাটের যে কাজে ও কথায়, তাঁহার জীবনের যে যে অংশে, যেরূপ ব্যবহারে, অটোক্র্যাসীর পরিচয় আছে, সেইসব জিনিষকে যদি আক্রমণ করা না চলে, তাহা হইলে ইংরেজীতে যাহাকে টুইডল্‌ডম্ ও টুইডল্‌ডীর প্রভেদ বলে, সেইরূপ একটা নিস্ফল পার্থক্য-নির্দ্ধারণ-চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতে হয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়ে আমরা বহু বৎসর ধরিয়া অনেক কথা লিখিয়াছি। সম্প্রতি সব কাগজেই ইহার বিষয়ে অনেক লেখালেখি হইয়াছে। ফলতঃ জিনিষটি তিক্ত হইয়া গিয়াছে। তথাপি কর্ত্তব্যের অনুরোধে মোটামুটি কয়েকটি কথা লিখিতে হইতেছে।

বাংলা গবর্ণ্মেন্ট্ যে-যে সর্ত্তে বিশ্ব-বিদ্যালয়কে আড়াইলাখ টাকা দিতে চান, তাহার সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নিরূপণের জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। ঐ কমিটির রিপোর্ট্ বিবেচনা করিবার জন্য ২রা ডিসেম্বর সেনেটের অধিবেশন হয়। রিপোর্ট্টি পরিশিষ্টাদি-সমেত ২৮৪ পৃষ্ঠাব্যাপী। এত বড় একটি জিনিষের সমালোচনা করিবার মত সময় ও স্থান আমাদের নাই; এবং বিস্তৃত সমালোচনা লিখিয়া তাহা ছাপিতে হইলে কাগজ মুদ্রণব্যয় প্রভৃতি যাহা হইবে, তাহা পরের পয়সায় হইবে না, আমাদিগকেই দিতে হইবে;—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তা সদস্যেরা যেমন পরের পয়সায় একই জিনিষ নানা আকারে বার-বার ছাপিয়া থাকেন, সেরূপ কিছু করিবার প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা আমাদের নাই। সেইজন্য, যদি এই অখ্যাতিও রটিত হয়, যে, সম্পাদকদের মস্তিষ্ক লক্ষ্য করিয়া সেনেটের কর্ত্তা যে পুঁথি ছুড়িয়াছেন, তাহার আঘাতে আমাদের মস্তিষ্ক জখম ও অকেজো হইয়া গিয়াছে. তাহাও স্বীকার, কিন্তু বিস্তারিত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারিব না—অন্ততঃ "প্রবাসী"তে নয়।

এখন সেনেটের অধিবেশনের একটি বক্তৃতার একটি অংশ সম্বন্ধে কিছু বলিব। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁহার যাত্রার-দলের-ভীমোচিত বীরত্ব-ও আস্ফালনপূর্ণ বক্তৃতার শেষের দিকে বলেন—

What will the Post-graduate teachers say? They will resign to-morrow. They will go into banishment rather than take money under these d streeing conditions. What will future g nerations say? Future generations will cry shame—the Senate of the University bartered away there freedom for $2^1/_2$ lakhs of rupees. One of the dissenters said that he should do his duties towards his electors. I have also my duty to perform. I am the first elected Vice-Chancellor. I am the represetative of the graduates. I would tell you what would happen to this University. You give me slavery in one hand and money in the other. I despise the offer. I will not take the money. We shall retrench and we shall live within our means. We shall starve. We shall go from door to door all through Bengal. We shall ask the post-graduate teachers to starve themselves, to starve their families but keep their independence. That is what I intend to do.

I tell you as members of this University to stand up for the right of the University. Forget the Government of Bengal. Forget the Government of India. Do your duty as the Senators of this University. Freedom first, freedom second, freedom always. Nothing else will satisfy me.

সেনেট্ গবর্ণ্মেন্টের সর্ত্ত মানিয়া লইয়া সরকারী সাহায্য লইলে পোষ্ট্গ্রাজুয়েট শিক্ষকেরা তাঁহাদের চাকরী ছাড়িয়া দিতেন আমাদের ধারণা এরূপ নয়। কিন্তু একটা কিছু ঘটিলে আর-একটা কি ঘটিত বা না ঘটিত সে-বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী

করিবার ক্ষমতা অন্ততঃ আমাদের নাই; সুতরাং এবিষয়ে বেশী কিছু বলিব না।

ভারতবর্ষের মধ্যে একটি মানুষ আছেন, যিনি কোন একটি আদর্শের জন্য অন্য অনেককে উপবাসী থাকিতে বলিতে অধিকারী; কারণ তিনি স্বয়ং অন্যের সঙ্গে ও অন্যের জন্য বহুদিবসব্যাপী উপবাস একাধিক বার করিয়াছেন। তিনি মহাত্মা গান্ধী। তাঁহার তথাকথিত কোন কোন অনুচর আসাম-বেঙ্গাল রেলওয়ের ধর্ম্মঘটীদিগকে, "বরং উপবাস শ্রেয় তবু ধর্ম্মঘটত্যাগ ভাল নয়," বলিয়াছিলেন, এবং তাহাদেব অনেকের অনশনক্লেশ ঘটাইয়াছিলেন, কিন্তু নিজেরা উপবাসী ছিলেন না। আশু-বাবুর জজিয়তী এখনও আছে, পূর্ব্বসঞ্চিত পুঁজিও যে নাই, এমন নয়। সুতরাং তাঁহার নিজের যখন উপবাস-সম্ভাবনা বা উপবাস-প্রবৃত্তি নাই, তখন অপরকে উপবাসী থাকিতে বলা ন্যায়াধীশের পক্ষে অন্যায় ও অশোভন কথা হইয়াছে। বেতনের বদলে "স্বাধীনতাজান" বাষ্প (Freedomogen Gas) কাহারও প্রাণরক্ষা করিতে পারিবে কি?

যে স্বাধীনতার জন্য পোষ্ট্‌গ্রাজুয়েট শিক্ষকদিগকে উপবাস স্বীকার করিতে বলা হইয়াছে, তাহাও যে কি চীজ্, তাহা আমরা বুঝিতে অসমর্থ। যদি বাংলা-গবর্ণ্‌মেণ্টের কোন কর্ম্মচারী তাঁহাদিগকে বলিতেন, "আমার কথা অনুসারে তোমাদিগকে চলিতে হইবে" (যাহা কেহই বলে নাই) এবং যদি তাঁহাদিগকে তাহাই করিতে হইত, তাহা হইলে এখন শিক্ষকেরা ইংরেজের এক ভৃত্য আশু-বাবুর অধীনস্থ হইয়া চলেন, তখন ইংরেজের ভৃত্য আর-কোন লোকের অধীনস্থ হইয়া চলিতেন; স্বাধীনতা এখনও নাই, তখনও থাকিত না। ইহার জন্য এত লম্বাচৌড়া কথা, উপবাসের কথা, সুসঙ্গত নহে। তবে ইহা স্বীকার্য্য বটে, যে, শিক্ষকদের মতে আশু-বাবুর অধীনতা অন্য কাহারও অধীনতা অপেক্ষা শ্রেয় হইতে পারে। সে-বিষয়ে আমরা কিছু বলিতে অসমর্থ, কিন্তু ইহা বলিতে পারি, যে, কাহারও অধীনতা স্বাধীনতা নহে।

কলিকাতার সেনেটের স্বাধীনতাও পোষ্ট্‌গ্রাজুয়েট্ শিক্ষকদের স্বাধীনতার মত—বাষ্পীয়—ধরিতে ছুঁইতে দেখিতে পাওয়া যায় না। আশু-বাবু যাহা বলেন, তাহাই হয়; অধিকাংশের ভোট ত তাঁহার "মুঠার ভিতরে!" স্বাধীনতাটা কোথায়! তবে যদি কেহ কেহ বলেন, আশুতোষের অধীনতা বাংলা- গবর্ণ্‌মেণ্টের অধীনতা অপেক্ষা ঘন (solid) জিনিষ, তাহার শব্দ ওজন মূল্য ইত্যাদি আছে; তাহা হইতে পারে। কিন্তু সে-স্থলেও বলি, কাহারও অধীনতার নাম স্বাধীনতা হইতে পারে না।

তা ছাড়া, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়টাই যে গবর্ণ্‌মেন্টের অধীন। একটা গরুকে বা ঘোড়াকে তাহার মনিব যদি একটা দেওয়ালঘেরা জায়গায় পায়ে লম্বা দড়ি বাঁধিয়া ছাড়িয়া দেয়, তাহা হইলে তাহার স্বাধীনতা যেরূপ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতাও সেইরূপ। উহার উৎপত্তি ভারত গবর্ণ্‌মেণ্টের আইন অনুসারে, অধিকার যাহা কিছু আছে তাহাও ভারত-গবর্ণ্‌মেণ্টের দেওয়া, পরিবর্ত্তন হইবে বাংলা গবর্ণ্‌মেণ্টের আইন অনুসারে, অনেকবার ভারত-গবর্ণমেণ্টের নিকট টাকা চাওয়া ও পাওয়া হইয়াছে এবং কখন কখন প্রার্থনা মঞ্জুর হয় নাই, বাংলা গবর্ণ্‌মেণ্টও একবার প্রায় দেড় লাখ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন, তাহার নিকটও টাকা চাওয়া হইয়াছে, এখনও অধ্যাপক-নিয়োগে বাংলা গবর্ণ্‌মেণ্টের অনুমোদন চাই। সুতরাং ভারত- গবর্ণ্‌মেণ্টকে ভুলিয়া যাও, বাংলা-গবর্ণ্‌মেণ্ট্‌কে ভুলিয়া যাও, ইত্যাকার কথা সেনেট-গৃহে বিকৃতমস্তিষ্ক লোকের মুখেই শোভা পায়।

অবশ্য ইহা ঠিক, যে, বিশ্ববিদ্যালয়কে গবর্ণমেন্ট কতকগুলি অধিকাব দিয়াছেন। আমরা এই অধিকার রক্ষার সমর্থন বরাবর করিয়া আসিতেছি, এখনও করি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে আশু-বাবুর কৃতিত্ব নিশ্চযই আছে। কিন্তু তিনি ও তাঁহার অনুচরেরা কেন ভুলিয়া যান, যে, এই কৃতিত্বের ভিত্তি ও কাবণ গবর্ণমেন্টের অনুগ্রহ ও আনুগত্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকাবী চার্টার আছে; চাকবীর বাজারে ও ওকালতী আদি ব্যবসাক্ষেত্রে গবর্ণমেন্টের স্বীকৃত (recognised) বলিয়া ইহার উপাধিগুলির মূল্য আছে; ইত্যাকার নানা কাবণে ইহার মানমর্য্যাদার উৎপাত হইয়াছে। ঐসব কারণে এবং গবর্ণমেন্টের প্রতিষ্ঠান বলিয়াই, মূলধন কেহ কেহ উড়াইয়া দিতে পারিবে না বলিয়াই, রাসবিহারী ঘোষ, তারকনাথ পালিত প্রভৃতি বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন লোক ইহাকে এত টাকা দিয়াছেন। গবর্ণমেন্টের চার্টারের ভবসা ত্যাগ, উপাধিগুলির গবর্ণমেন্টের অনুমোদন ত্যাগ, সমুদয় ঘব বাড়ী ত্যাগ, গবর্ণমেন্টের প্রদত্ত টাকা না পাওয়া, গবর্ণমেন্টের প্রতিষ্ঠান বলিয়া উহাকে রাসবিহারী ঘোষ প্রভৃতিব প্রদত্ত লক্ষ লক্ষ টাকা না পাওয়া, প্রভৃতি মানিয়া লইয়া যদি কেহ একটা স্বাধীন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে চান বা পাবেন, তাহা হইলে তাঁহার মুখে স্বাধীনতার কথা উচ্চারিত হইতে পারে; অন্যের মুখে নহে।

মহাত্মা মুন্‌শীরাম (শ্রদ্ধানন্দ স্বামী) হরিদ্বারে যে গুরুকুল নামক বিদ্যালয় স্থাপন করিযাছেন, তাহা তাঁহার স্বাধীন-কীর্ত্তি। ঐ বিদ্যালয়ের আদর্শের বিচার অবশ্য হইতে পারে। কিন্তু ঐরূপ স্বাধীন প্রতিষ্ঠান কেহ বঙ্গে স্থাপন করিয়া বহু বৎসর চালাইলে তাঁহারও মুখে স্বাধীনতার স্পর্দ্ধাপূর্ণ বাক্য ও আস্ফালন শোভা পাইত, অন্যের মুখে ত নহেই।

আশু-বাবুর বক্তৃতার পরে কোনও অসহযোগী কাগজে আশুতোষ অনেকটা অসহযোগী হইয়াছেন, বলিয়া জয়-কোলাহল উত্থাপিত হয়। মোটেই না। আশুতোষ স্বয়ং ত অসহযোগের শিরদাঁড়া ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন বলিয়াছেনই, অধিকন্তু তিনি ও তাঁহার অনুচর অন্যান্য নাইট্‌রা কেহ উপাধি ছাড়েন নাই। উপাধি, চাকরী, পেন্‌স্যান ইত্যাদি ছাড়িলে তবে অসহযোগের হাতে খড়ি মাত্র হয়। স্বাধীনতার চীৎকার যিনি যতই করুন, এদিকে সবাই জানেন, যে, কথায় চিঁড়ে ভিজে না।

সরকারী দানের সর্ত্ত

উচ্চশিক্ষার জন্য গবর্ণমেন্ট্ টাকা মঞ্জুর করিলে তাহাব সহিত কোন সর্ত্ত জুড়িয়া দিবার অধিকার সরকারের আছে কি না, সে বিষয়ে স্যার্ প্রফুল্লচন্দ্র বলেন,

"The obvious solution of the present trouble is to set the University on its feet first and that at once by wiping out the deficit without any controversial conditions attached to the grant of money...The Government have also every right to make conditions for grants of money, provided they are in harmony with the interests of higher

education."

বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান সঙ্কট-অবস্থায় রায়মহাশয় বলেন, যে, যাহাতে মতভেদ হইতে পারে, এরূপ কোন সর্ত্ত না জুড়িয়া, উহার ঋণশোধ করিয়া দেওয়া ভাল। কিন্তু অবিসংবাদী সর্ত্ত যে কি হইতে পারে, তাহা তিনি বলেন নাই। তাঁহার কি ধারণা এই, যে, কোনও-প্রকার সর্ত্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তা রাজী হইতেন? যাহা হউক, রায় মহাশয় সাধারণভাবে স্বীকার করিতেছেন, যে, গবর্ণমেন্টের এরূপ সর্ত্ত নির্দ্দেশ করিবার অধিকার আছে যাহা উচ্চশিক্ষার পক্ষে অকল্যাণকর নহে।

শিক্ষামন্ত্রীর সর্ত্তগুলি ভাল কি মন্দ, তদনুসারে কাজ করা সহজ কি কঠিন, সম্ভব না অসম্ভব, তাহার বিচার না করিয়া বলা যাইতে পারে, যে, একটি সর্ত্তও এমন নহে যাহার সহিত উচ্চশিক্ষার বিরোধ আছে। একটি সর্ত্তে আছে বটে, যে, যতদিন না বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়, ততদিন উহার কার্য্যক্ষেত্র আর যেন বিস্তৃত করা না হয়। কিন্তু উচ্চশিক্ষাকে স্থায়ী করিতে হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই এইরূপ নিয়ম অনুসারে চলা উচিত।

ভিন্ন ভিন্ন রকমের শিক্ষা ও সর্‌কারী সাহায্য

স্যার্ প্রফুল্লচন্দ্র বলেন;—

"I have observed public men to dwell upon the exclusive necessity of fostering primary and technical education. I fully realise the need of support to both these types of education· but I hope I shall not be misunderstood, when I say with all the emphasis at my command that it will be nothing short of a national disaster if higher University education and the spirit of research, be it in history, literature or science, are allowed to die an unnatural death due to our short-sightedness. Our primary and secondary schools or properly equipped technical schools are very useful in their own way, but wider outlook and culture are perhaps equal necessary. They cannot turn out scholars or statesmen who will mould the future of the country. If we really care for the development of the resources of our country in our interest, we must have our own men who can tackle the present-day scientific and engineering problems."

আমাদেরও মত এই, যে, সব রকম শিক্ষাই চাই। ইহাও আমরা অনেকবার বলিয়াছি, যে, বর্ত্তমান সঙ্কটে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঋণশোধ হওয়া চাই। কিন্তু সরকারী তহবীল হইতে বিশ্ববিদ্যালয়কে টাকা দেওয়া উচিত, ইহাই প্রমাণ করিবার জন্য স্যার্ প্রফুল্লচন্দ্র কলম ধরিয়াছেন বলিয়া, সাধারণভাবে আমাদের দেশে সরকারী রাজস্বের উপর কোন্ শ্রেণীর লোকদের কোন্ স্তরের শিক্ষার দাবী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তাহা খুব পরিষ্কার করিয়া বলা দরকার।

সর্‌কারী রাজস্বের প্রায় সমস্তটা, অন্ততঃ অধিকাংশ, সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে দৈহিকশ্রমজীবীদের নিকট হইতে আদায় হয়।

জমীদাররা যে খাজনা দেন, তাহা কৃষকদের ও ক্ষেত্রের মজুরদের মিহনৎ হইতে প্রাপ্ত! পাটের কল ও কাপড়ের কল, চিনির কল, তেলের কল, প্রভৃতি সমুদয় কারখানার মালিকরা যে ইন্‌কম্-ট্যাক্স্ দেন, তাহাও শেষ পর্য্যন্ত সেই চাষী ও শ্রমজীবীর পরিশ্রম হইতে আসে। বড় বড় কয়লার কারবার, লোহা-ইস্পাতের কারখানা হইতে সরকার যে ট্যাক্স পান, তাহাও খনির ও কারখানার মজুরদের পরিশ্রম ব্যতিরেকে পাওয়া যাইত না। উকীল-ব্যারিষ্টাররা যে-সব দেওয়ানী মোকদ্দমা করেন, তাহার কতক চাষীদের, কতক জমীদারদের, ইত্যাদি। শেষ পর্য্যন্ত তাঁদের টাকাটাও আসে দৈহিকশ্রমীদের নিকট হইতে। তাঁহারা যে ইন্‌কম্-ট্যাক্স দেন, তাহাও গরীবের ট্যাঁকের টাকা। অনেক ফৌজদারী মোকদ্দমা মারামারি-প্রভৃতি ঘটিত। তাহাও অশিক্ষিত সাধারণ লোকেরা বেশী করে। তাহার আয়ও ঐসব লোকদের নিকট হইতে আসে। বিচার বিভাগের অধিকাংশ আয় সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে সাধারণ লোকদের নিকট হইতে আসে।

অতএব সরকারী টাকার উপর সাধারণ চাষী, মজুর প্রভৃতির শিক্ষারই দাবী বেশী। বাংলা দেশে শতকরা, ৯৪ জন গ্রামবাসী। যাহারা সরকারকে সকলের চেয়ে বেশী টাকা দেয়, তাদের শিক্ষার জন্যই সরকারের সর্ব্বাগ্রে সকলের চেয়ে বেশী টাকা খরচ করা উচিত। সাধারণ লোকের, গ্রাম্য লোকের, শিক্ষার জন্য দেশময় প্রাথমিক বিদ্যালয় আগে স্থাপন করিয়া তবে সরকার উচ্চতর শিক্ষার জন্য ব্যয় করিতে পারেন। ইহা সত্য, যে, এই-সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিবার জন্য উচ্চতর শিক্ষাপ্রাপ্ত লোক চাই। কিন্তু আমাদের এন্ট্রেন্স স্কুলগুলি, কলেজগুলি ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সাক্ষাৎভাবে বা প্রধানতঃ পাঠশালার শিক্ষক প্রস্তুত করে না, এবং অর্দ্ধ শতাব্দীরও উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা দিবার আবশ্যকতা এখনও বড় বড় পণ্ডিতরা পর্য্যন্ত কার্য্যতঃ স্বীকার করিতেছেন না। উচ্চ শিক্ষার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা দান পাওয়া গিয়াছে বটে; কিন্তু যে চাষী শ্রমীদের ট্যাঁক হইতে এই-সব টাকা আসিয়াছে, তাহাদের মধ্যে সার্ব্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য কোন্ কোন্ ধনী ও পণ্ডিত ব্যক্তি কত লক্ষ টাকা দিয়াছেন, জানিতে ইচ্ছা করি। সুতরাং উচ্চ শিক্ষার বিস্তার ও গবেষণার দ্বারা দেশের উপকার হইবে ইহা আমরা স্বীকার করিলেও, দেশের অধিকাংশ লোক যে তাহার ফল ভোগ করিতে পাইতেছে না, তাহাদের টাকায় যাহারা শিক্ষা পাইয়া পণ্ডিত হইয়াছে তাহারা তাহাদের প্রতি ন্যায্য ও কৃতজ্ঞতাসঙ্গত কার্য্য করিবার জন্য সময় শক্তি ও অর্থ দান করিতেছে না, ইহা শোচনীয় ও লজ্জাকর সত্য কথা। যে অল্পসংখ্যক শিক্ষিত লোক স্বীয় কার্য্য দ্বারা ন্যায়পরায়ণতা ও কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিতেছেন, তাঁহারা ধন্য; কিন্তু তাঁহারা মুষ্টিমেয়। উচ্চশিক্ষা দিলে পরে পরোক্ষভাবে নিরক্ষরদের উপকার হইবে, এ কথা বলিলে এখন আর "ভবী" ভুলিবে না। সাধারণ লোকদের উপকার করিবার এই বাঁকা পথ অবলম্বন না করিয়া, সাধারণ লোকদের টাকায় উচ্চশিক্ষা পাইয়া তাহাদের কথা ভুলিয়া গিয়া কেবল স্বার্থসিদ্ধিতে মন না দিয়া, সোজাসুজি সমস্ত দেশে প্রাথমিক সাধারণ বিদ্যালয়, কৃষিবিদ্যালয়, শিল্পবিদ্যালয়, প্রভৃতি খোলা উচিত। ইহা আরও বেশী কর্তব্য এইজন্য, যে, বহুকাল সাধারণ লোকেরা অবহেলিত হইয়াছে। এখন তাহাদের ন্যায্য পাওনা তাহাদিগকে সুদসমেত দেওয়া হউক।

দেশের রিসোর্সের ডিভেলাপ্ করিবার কথাও যে বলা হইয়াছে, তাহাও বেশ কথা। কিন্তু তাহারও মানে ত এই, যে, কতকগুলি ধনী ও শিক্ষিত লোক মজুরদিগকে খাটাইয়া নবাবী

করিবেন, এবং মজুররা ময়লা ছেঁড়া কাপড় পরিয়া কুঁড়ে ঘরে মোটাভাত খাইয়া অজ্ঞতায় জন্তু-জীবন যাপন করিবে? এইসব সাধারণ লোক একটু শিক্ষা পাইলে মানুষের মত হইতে পারে এবং নিজের পাওনাগণ্ডাও বুঝিয়া লইতে পারে। সেটা কিন্তু আমরা বাবু-মহাশয়েরা দিতে চাই না।

রিসোর্সেজ, ডিভেলাপ্ করার কথাটা যখন উঠিয়াছে, তখন জিজ্ঞাসা করি, দেশের মাটি, গাছ-পালা, জঙ্গাল,খনির ধাতু কয়লা তেল, জলের মাছ, ইত্যাদি, এই সবই কি আমাদের প্রধান সম্পত্তি? তার চেয়েও মহত্তর শ্রেষ্ঠতর সম্পত্তি কি মানুষের বুদ্ধি, মানুষের হৃদয়, মানুষের মন নহে? অথচ এদেশের অধিকাংশ লোকের আন্তরিক শক্তির বিকাশের যথেষ্ট কোন চেষ্টাই হইতেছে না। মানস সম্পত্তির উৎকর্ষ বিধান সার্ব্বজনীন শিক্ষা দ্বারা না হইলে, দেশের জড় উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ সম্পত্তিও আমরা আমাদের কাজে লাগাইতে পারিব না। পাশ্চাত্য দেশ-সকলে কত হাজার বিদ্বান্ কত গবেষক, কত যন্ত্র-উদ্ভাবক, কত পণ্যশিল্প-নায়ক, সামান্য নিরক্ষর দরিদ্রের ঘরে জন্মিয়াছিলেন। আমাদের দেশেরও সর্ব্ব-সাধারণের মনের চাষ হইলে আমাদের দেশ জগতের কাছে ২/৪ জন লোকের নামে পরিচিত হইত না, শত শত লোকের নামে পরিচিত হইত। অতএব, আবার বলি, যদিও সকল রকম শিক্ষা চাই, তথাপি এ আশা দুরাশা যে উচ্চতর শিক্ষা দিলেই দেশের অর্থাৎ উহার অধিকাংশ লোকের কল্যাণ ও শ্রীবৃদ্ধি হইবে। সুতরাং সাক্ষাৎ ভাবে, এখনই, সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বসাধারণের শিক্ষার জন্য দেশময় প্রাথমিক বিদ্যালয় আদি স্থাপন করা অবশ্যকর্ত্তব্য। সাধারণ লোকেরা অবহেলিত হইয়াছেন বলিয়া, এখন যদি তাঁহাদের শিক্ষার জন্য যথেষ্ট টাকা সরকারী তহবীলে দিয়া উচ্চতর শিক্ষার টাকা না থাকে, তাহা হইলে বাবু-মহাশয়েরা নিজেদের শিক্ষার ব্যবস্থা কিছুকাল নিজেদের টাকাতেই করুন।

সর্ব্বসাধারণের শিক্ষা যেমন অবহেলিত হইয়াছে, নারীদের শিক্ষাও তেমনি বা তদপেক্ষাও অধিক অবহেলিত হইয়াছে। অতএব তাঁহাদের শিক্ষার জন্যও সম্যক্ ব্যবস্থা করা আগেই উচিত। অন্য সব শিক্ষার দাবী তাহার পর।

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতার অর্থভেদ

বাংলা দেশের শিক্ষামন্ত্রী গবর্ণ্মেন্ট্-সাহায্য লাভের যে-যে সর্ত্ত নির্দ্দেশ করেন, তাহা করিবার ক্ষমতা সরকারের আছে কি নাই, তাহার বিচার করিব না, (আমরা মনে করি আছে) কারণ, মন্ত্রী প্রভাস-বাবু স্বয়ং বলিয়াছেন, যে, ওগুলি প্রস্তাব, উহার পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে আলোচনা ও বিবেচনা হইতে পারে। যদি সেই আলোচনা ও বিবেচনা উভয়পক্ষের লোকে করেন, ও পরে ফল জানা যায়, তখন আমাদের কিছু বলিবার সময় আসিবে; এখন নয়।

১৯১৪ সালের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্‌ভোকেশ্যনে আশু-বাবু যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি সাধারণভাবে স্বীকার করেন, যে, গবর্ণমেন্টের সর্ত্ত করিবার ক্ষমতা আছে; তাঁহার কথাগুলি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাসের একটি চিঠিতে অনেক ইংরেজী কাগজে উদ্ধৃত হইয়াছে। স্যাড্‌লার

কমিশনের রিপোর্টে (যাহাতে আশু-বাবুরও স্বাক্ষর আছে) লেখা আছে, যে, সর্ত্ত করিবার অধিকার সরকারের আছে। প্রয়োজন হইলে তাহা উদ্ধৃত করিব। স্যার্ প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই অধিকার স্বীকার করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। সোজা বুদ্ধিও বলে. যে, যে টাকা দেয়, সে কিছু সর্ত্তও নিশ্চয়ই কবিতে পারে। সুতরাং এবিষয়ে বেশী বাগ্‌বিতণ্ডার দবকার নাই। কিন্তু গোলদীঘির কর্ত্তাদেব কথার ভঙ্গীটা এরূপ, যে, তাঁহারা বাংলা-গবর্ণ্মেণ্টের নির্দ্দিষ্ট সর্ত্ত কটাই যে মানিতে অরাজী, তা নয়. কোন সর্ত্তই যেন মানিতে অরাজী বলিয়া মনে হয়।

গবর্ণ্মেণ্ট-গ্র্যান্ট কমিটির রিপোর্টে নানা জনের ও নানা রিপোর্টের বহু বাক্য উদ্ধৃত করিয়া ইহাই দেখাইবাব চেষ্টা হইয়াছে, যে, বিশ্ববিদ্যালয় মাত্রের আদর্শই হইতেছে এই, যে, ঐ প্রতিষ্ঠানগুলি স্বাধীন হইবে। কিন্তু এই স্বাধীনতাটা কি বিষয়ে এবং কিরূপ? গ্র্যান্ট কমিটির রিপোর্টে উদ্ধৃত সব কথা উদ্ধৃত করিবার স্থান আমাদের নাই। কেবল, কিরূপ স্বাধীনতা বিশ্ববিদ্যালয় সকলের আদর্শ, তাহা বুঝাইবার জন্য কিছু উদ্ধৃত করিব। টাইমস্ এডুকেশন্যাল সপ্লেমেন্ট হইতে ৯২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে—

"The great teaching body of the Universities, University Colleges, and Institutions of University rank, notwithstanding their grievances, will not sell their *academic* freedom for a mess of pottage." ইটালিক্স্ আমাদের।

৯৬ পৃষ্ঠায় স্যার হার্‌কোর্ট্ বাট্‌লারের বক্তৃতায় অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজ কমিশনের রিপোর্ট হইতে উদ্ধৃত —

"But the ways of thought and feeling of the modern British community are hostile to any development in the direction of *State control of the academic spirit*, and the public grants already enjoyed by the old Scottish and new English Universities have not led to *State interference with opinion and tendency* in those institutions." ইটালিক্স্ আমাদের।

৯৬-৯৭ পৃষ্ঠায় কোয়ার্টারলী রিভিউ হইতে উদ্ধৃত—

"Again, if the proposals to destroy the supremacy of the Senate, and to consign the *control over Education and Research* to the 'administrators' be carried into effect, the advancement of knowledge will have received a deadly blow." ইটালিক্স্ আমাদের।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, পণ্ডিতমণ্ডলীর আপত্তি, কোনও বিদ্যাবিষয়ক মত ও আদর্শ, তাহার অনুশীলন পদ্ধতি, পরীক্ষাপ্রণালী, গবেষণার বিষয় ও প্রণালী, শিক্ষণীয় বিষয় ও পুস্তক, ইত্যাদিতে সরকার-কর্ত্তৃক হস্তক্ষেপ বা তাহাতে কর্ত্তৃত্ব-ফলানর বিরুদ্ধে। ইহার গোটা দুই দৃষ্টান্ত দিতেছি। সম্প্রতি আমেরিকার কতকগুলি লোক ডার্‌উইনের বিবর্ত্তন-বাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়া বলিতেছিলেন, যে, উহা (খৃষ্টীয়) ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ, উহা বিশ্ববিদ্যালয় সকলে শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়। এখানে গবর্ণ্মেণ্ট্ তেমন কিছু বলিতেছেন না। অর্থনীতি শিক্ষা দিতে গিয়া উহার শিক্ষকদিগকে অবাধ বাণিজ্য বা সংরক্ষণ-নীতি সমর্থন করিতে হইবে, গবর্ণ্মেণ্ট্ তাহাও নির্দ্দেশ করিতেছেন না। ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়াইতে গিয়া শিক্ষকগণ শিবাজীকে দস্যু বলিতে বাধ্য হইবেন. ক্লাইবের সমস্ত কার্য্যের সমর্থন করিতে বাধ্য হইবেন, ভারতবর্ষে কখনও কোথাও ছোট রকমেরও সাধারণতন্ত্র ছিল না বলিতে বাধ্য হইবেন, একথা গবর্ণ্মেণ্ট্

বলিতেছেন না' সর্ত্তগুলি, সমস্তই হিসাব টাকাকড়িসম্বন্ধীয়; কেবল একটিতে শিক্ষিতব্য বিষয়ের সহিত কিঞ্চিৎ সম্পর্ক আছে। তাহা এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থার উন্নতি না হওয়া পর্য্যন্ত যেন নূতন কোন বিষয় শিক্ষা দিবার চেষ্টা বা অন্যবিধ ব্যয়সাধ্য কোন কার্য্যবিস্তার আরব্ধ না হয়। ইহাও বাস্তবিক আর্থিক সর্ত্ত, এবং ইহার প্রয়োজনও আছে। কারণ, কার্য্যবিস্তার করিয়া যদি ঋণ হয়, তাহা হইলে ত আবার গবর্ণ্মেন্টের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা হইবে, এবং আবার নানাপ্রকার অশোভন কলহ হইবে। এই সর্ত্তটিও গবর্ণ্মেন্ট্ সম্ভবতঃ সাবধানতার জন্য আগে হইতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন; না করিলেও চলিত। কারণ, বেশী কিছু কার্য্যবিস্তার পরোক্ষ ভাবে বন্ধ করিবার ক্ষমতা গবর্ণ্মেন্টের আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেগুলেশ্যন্সের নবম ও দশম অধ্যায় অনুসারে গবর্ণ্মেন্টের মঞ্জুরী ব্যতীত কোন ইউনিভার্সিটি অধ্যাপক বা রীডর নিযুক্ত হইতে পারে না, পোষ্ট্ গ্রাজুয়েট শিক্ষাবিষয়ক ৩২শে নিয়ম অনুসারে কোন লেক্‌চ্যারার নিয়োগে গবর্ণ্মেন্ট্ পাণ্ডিত্য বা শিক্ষাদানযোগ্যতা বা তদ্বিধ কারণ ব্যতীত অন্য কোন কারণে বাধা দিতে পারেন। আর্থিক অসচ্ছলতা এইরূপ একটি কারণ। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের রেগুলেশ্যন্সেই যাহা উহ্য রহিয়াছে, তাহা একটি সর্ত্তে পরিস্ফুট করিয়া দিয়া গবর্ণ্মেন্ট্ নূতন কোন ক্ষমতা লাভের চেষ্টা করেন নাই, কিম্বা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান কোন অধিকারে হাত দেন নাই।

উহার কর্ত্তা ত স্বাধীনতা, স্বাধীনতা, বলিয়া খুব চীৎকার করিয়াছেন; কিন্তু যখন গবর্ণমেন্ট্ কাশীপ্রসাদ জায়সওয়াল, আবদুল রসুল, প্রভৃতিকে লেক্‌চ্যারার নিয়োগ করিতে দেন নাই, তখন স্বাধীনতা কোথায় ছিল?

আমরা দেখাইয়াছি যে, জ্ঞানানুশীলন, গবেষণা, শিক্ষাদান, পরীক্ষাগ্রহণ, ইত্যাদি কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার অভিপ্রায় কোন সর্ত্তে নাই। সর্ত্তগুলি টাকাকড়ি- বিষয়ক। এরূপ সর্ত্ত কেম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের প্রস্তাবসমূহের মধ্যেও আছে। তাহা দেখাইতেছি। প্রস্তাব এই, যে, উভয় ইউনিভারসিটিকে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট্ বার্ষিক এক লক্ষ পাউণ্ড করিয়া দিবেন এবং তা ছাড়া নারীদের শিক্ষা এবং সীমার বাহিরের কাজ (extra mural worth) করিবার জন্য দশ হাজার পাউণ্ড করিয়া দিবেন। এই-সব টাকা ইউনিভার্‌সিটিদ্বয় যথেচ্ছ খরচ করিতে পারিবেন না। কোন্ কোন্ বাবতে খরচ হইবে, তাহা বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। গত ২৫শে মার্চ্চের ম্যাঞ্চেষ্টার্ গার্জেন বলিতেছেন —

The principal purposes for which the grant is recommended are :—

Better salaries and pensions for staffs—*the first charge* [ইটালিক্‌স্ আমাদের।]

Increased staffs.

Endowment of research and advanced teaching.

More research scholarships for young graduates.

More entrance scholarships to widen the door for the poor student.

Maintenance and improvement of laboratories, libraries, and museums.

To help the women's colleges and non-collegiate bodies.

To extend extra-mural work.

গত ১লা এপ্রিলের টাইম্‌স্ এডুকেশ্যান্যাল সপ্লেমেণ্ট বলিতেছেন :—

"They [the Commissioners] therefore recommend that each University receive, instead of the existing interim grant of £30,000, an

annual grant of £100,000 (£90,000 for general purposes and £10,000 for the Bodleian Library, Oxford, and the University Library, Cambridge, in addition to £10,000 a year for special purposes), women's education, £4,000, and extra-mural work, £6,000, and a lump sum for pension arrears."

তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, বাংলা গবর্ণ্‌মেণ্ট্ তাঁহাদের মঞ্জুরী টাকা হইতে প্রথমেই শিক্ষকদের বেতন এবং পরীক্ষকদের মজুরী দিতে বলিয়া কি অপরাধ করিয়াছেন?

টাইম্‌স্ আরও বলেন—

"The Commission suggests several changes to secure efficiency. Many of these will require Parliamentary legislation, and it recommends the setting up of a statutory commission to carry out the consequent changes in University and college statutes, and where necessary, to revise trusts."

ইহা যে কত গুরুতর পরিবর্ত্তন, তাহা ইংরেজী-জানা লোক মাত্রেই বুঝিবেন। এফিশিয়েন্সীর (সুচারুরূপে কার্য্যনির্ব্বাহের) জন্য বাংলা-গবর্ণ্‌মেণ্ট্ একটা অফিস্ ম্যানুয়েল প্রস্তুত করিতে বলিয়াছেন মাত্র; অক্সফোর্ড্ কেম্ব্রিজ কমিশন এমন সব পরিবর্ত্তন করিতে বলিয়াছেন যাহার জন্য পার্লেমেন্টে নূতন আইন করিতে হইবে। জিজ্ঞাসা করি, কোন্‌টা বেশী হস্তক্ষেপ? বিলাতী কমিশন ট্রাষ্টের অর্থাৎ ন্যস্ত সম্পত্তির (যেমন পালিত ও ঘোষ ট্রাষ্ট্) নিয়মাবলী পর্য্যন্ত আবশ্যক হইলে বদ্‌লাইতে বলিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাণ্ট্ কমিটির রিপোর্টে ১০১-১পৃষ্ঠায়, বিলাতের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষামন্ত্রী ফিশার সাহেবের নিম্নলিখিত মত উদ্ধৃত হইয়াছে :—

"No one appreciates more fully than myself the vital importance of preserving the liberty and autonomy of the Universities within the general lines laid down under their constitution. The State is, in my opinion, not competent to direct the work of education and disinterested research which is carried by Universities, and the responsibility for its conduct must rest solely with their Governing Bodies and Teachers. This is principle which has always been observed in the distribution of the funds which Parliament has voted for subsidising University work; and so long as I have any hand in shaping the national system of education, I intend to observe this principle."

সেনেটের কমিটি ফিশার সাহেবের এই-সব কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন। অতএব তাঁহারা নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন, যে, শিক্ষামন্ত্রীরূপে তিনি অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজ কমিশনের প্রস্তাবসকল কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য পার্লেমেন্টে যে আইনের খস্‌ড়া বা বিল্ পেশ করেন, তাহার দ্বারা ইউনিভার্সিটি দুটির স্বাধীনতা ও আত্মকর্ত্তৃত্ব (liberty and autonomy) নষ্ট হয় নাই। ঐ বিলের দুটি ধারা উদ্ধৃত করিতেছি।

1. There shall be two bodies of Commissioners to be styled respectively "the University of Oxford Commissioners" and "the University of Cambridge Commissioners".

6. Subject to the provisions of this Act the Commissioners shall, from, and after the first day of January, nineteen hundred and twenty-four, make statutes and regulations for the University, its colleges and halls, and any emoluments, endowments, trusts, foundations, gifts, offices, or institutions

in or connected with the University in general accordance with the recommendations contained in the report of the Royal Commission, but with such modifications as may, after the consideration of any representations made to them, appear to them expedient.

এই-প্রকার বিস্তারিত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিবর্ত্তন করিলেও যদি অক্স্‌ফোর্ড্‌ ও কেম্ব্রিজের স্বাধীনতা ও আত্মকর্ত্তৃত্বে হাত না পড়ে, তাহা হইলে টাকাকড়ি ও হিসাব সম্বন্ধীয় কয়েকটি সর্ত্ত দ্বারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযের স্বাধীনতা কি প্রকারে বিপন্ন হইয়াছে, তাহা বুঝা সহজ নহে।

১৩৩০ অগ্রহায়ণ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আক্ষেপ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় ভারতবর্ষের অন্য সব বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে বেশী; কিন্তু ইহার কার্য্যক্ষেত্রও বৃহত্তম। কাজ ভাল করিয়া করিতে হইলে ভাল কর্ম্মী চাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কর্ম্মী ইহার অধ্যাপকেরা। অধ্যাপকদিগকে উপযুক্ত বেতন দিতে না পারিলে তাঁহারা অধিকতর বেতন যেখানে পাইবেন সেইখানে চলিয়া যান। ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঈর্ষ্যা, বা অভিযোগ, বা আক্ষেপ, বা ক্রোধ, আক্রোশের একটি কারণ হইয়াছে। ভাল কোন অধ্যাপক অন্যত্র চলিয়া গেলে মনের এই ভাব নানা আকারে প্রকাশ পায়। অভিপ্রায় এই, যে, ভাল অধ্যাপকেরা স্বার্থত্যাগ করিয়া কলিকাতাতেই থাকুন। তাঁহারা তাহা করিতে পারিলে নিশ্চয়ই সুখের বিষয়ই হয়। কিন্তু মানুষ আর্থিক ক্ষতিস্বীকার যে-সব কারণে করে, তাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যমান কি না, তাহা কর্ত্তৃপক্ষ বিবেচনা করিলে ভাল হয়। শিক্ষার, জ্ঞানের, চরিত্রের, ধর্ম্মনীতির, আধ্যাত্মিকতার উচ্চ আদর্শ কোথাও থাকিলে মানুষ এইরূপ কোন-না-কোন আদর্শের জন্য স্বার্থত্যাগ করেন। গবেষণা ও জ্ঞান আহরণের অধিকতর বা অধিকতম সুযোগের জন্যও লোকে স্বার্থত্যাগ করে। কিন্তু বিদ্যাপীঠগুলির মধ্যে আদর্শ কিম্বা গবেষণাদির সুযোগ যদি সমান থাকে, তাহা হইলে বেতন যেখানে বেশী, মানুষ স্বভাবতঃ সেখানেই যায়। আবার, যদি কোন এক বিদ্যাপীঠে উচ্চ আদর্শ না থাকে, তাহা হইলে উচ্চ বেতনের আকর্ষণে অন্যত্র যাওয়াও স্বাভাবিক। যদি এমন হইত, যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কাহাকেও বেশী বেতন দিতে পারেন না, কিম্বা যদি ইহার বেতনের হারের পার্থক্য যোগ্যতার পার্থক্য অনুসারী হইত, তাহা হইলেও লোকে স্বার্থত্যাগ করিত। কিন্তু মনজোগান, তোষামদ, প্রভৃতি যেখানে অন্যতম যোগ্যতা বলিয়া কার্য্যতঃ দেখা যায়, এবং যেখানে কেহ কেহ গূঢ় কারণে বেশী বেতনও পায়, সেখানে স্বার্থত্যাগের কথা উঠিতে পারে না।

আমাদের বিবেচনায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যক্ষেত্র সীমাবদ্ধ করিয়াও যদি যোগ্যতম লোকদিগকে রাখা যাইত, তাহা হইলে তাহার দ্বারা দেশের প্রকৃত কল্যাণ হইত; কার্য্যক্ষেত্র সংকীর্ণতর না করিয়াও অধ্যাপক-সংখ্যা সহজেই কমান যায়, এবং বাকি অধ্যাপকদিগকে অন্য ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সমান বেতন

দেওয়া যায়। কিন্তু অধ্যাপকসংখ্যা বাড়াইয়া আশ্রিত-পোষণ অনুগত-সমর্থকের সংখ্যা-বৃদ্ধির প্রবৃত্তি এরূপ প্রবল, যে, অনেকের প্রত্যাশিত বা প্রতিশ্রুত বেতন বৃদ্ধি হইতেছে না, কিন্তু নূতন অধ্যাপক নিয়োগ চলিতেছে—আর্থিক টানাটানি সত্ত্বেও চলিতেছে।

মজার কথা এই, যে, ছাত্র কমিলেও অধ্যাপক বাড়ে ও ব্যয় বাড়ে। ১৯১৯-২০ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের ছাত্র ছিল ৮৮+৭৫=১৬৩ (একশত তেষট্টি) জন। ১৯২০-২১ সালে উহা কমিয়া হয় ৮২+৪৬=১২৮ (একশত আটাশ) জন। ১৯১৯-২০ সালে সাঁইত্রিশ জন অধ্যাপক ছিল, পর বৎসর উহা বাড়িয়া আটত্রিশ হয়। ১৯১৯-২০ সালে অধ্যাপকদের মাসিক বেতন ছিল ৮৮২৫ টাকা; ১৯২০-২১এ উহা বাড়িয়া ৯১৭৫ টাকা হয়। অর্থাৎ ১৯২০-২১ সালে ১২৮ জন ছাত্রকে ইতিহাস পড়াইবার জন্য একশত দশ হাজার এক শত টাকা খরচ হয়!

আমরা ঐতিহাসিক না হইলেও এইটুকু বুঝি, যে, শুধু এক বাংলা দেশেরই ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণা ও জ্ঞান দান করিবার জন্য এক শত অধ্যাপক নিয়োগ করা অসঙ্গত না হইতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে এই, যে, কতগুলি যোগ্য লোককে উপযুক্ত বেতন দিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিজের কার্য্যক্ষেত্রে বরাবর রাখিতে পারেন? যখন দেখা যাইতেছে, যে, বিশ্ববিদ্যালয়, যাঁহারা অন্যত্র চলিয়া গেলে অসন্তোষ প্রকাশ করেন, তাঁহাদিগকে যথেস্ট বেতন দিতে পারেন না, তখন তাঁহাদিগকে যথেষ্ট বেতন দিবার জন্য অন্য দিকে ব্যয়সংক্ষেপ কেন করেন না? তাঁহারা যোগ্য লোক নহেন বলিবার জো নাই; কারণ, তাঁহারা অযোগ্য হইলে তাঁহাদের অন্যত্র গমনে অসন্তোষ আক্রোশ আদি প্রকাশ হইত না। যদি এরূপ বলা হয়, যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে একজনও অনাবশ্যক অধ্যাপক নাই, তাহা হইলে সর্ব্বসাধারণকে প্রত্যেকের নাম ধরিয়া জানান হউক, কে কত কাজ করেন, কি কাজ করেন, কত কাজ করিয়াছেন, কি কাজ করিয়াছেন। দুই চারি জনের সার্টিফিকেট খবরের কাগজে ছাপিলে ও ছাপাইলে তাহার দ্বারা ইহা প্রমাণ হয় না, যে, অন্য বহুসংখ্যক অধ্যাপকদের প্রত্যেকেই ভারী লায়েক এবং প্রত্যেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহের পক্ষে একান্ত আবশ্যক।

১৩৩১ আষাঢ়

শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

কোন প্রসিদ্ধ লোকের মৃত্যু হইলে খবরের কাগজে এইরূপ লিখিবার একটা প্রথা দাঁড়াইয়া গিয়াছে, যে, তাঁহার স্থান অধিকার করিবার লোক আর নাই। কিন্তু আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সম্বন্ধে এই কথা বলিলে তাহা প্রথা-রক্ষা হিসাবে বলা হয় না, অক্ষরে অক্ষরে সত্য কথাই বলা হয়। কেন না, তিনি একা যতরকম কাজ নিয়মিতরূপে ও দক্ষতার সহিত করিতেন, দেশে সত্য সত্যই আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই, যিনি তাহা করিতে সমর্থ। তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিদের মধ্যে নাই, বয়ঃকনিষ্ঠদের মধ্যেও কেহ আছেন বলিয়া অবগত নহি। তাঁহার অসাধারণ কা

ও শ্রমশক্তি ছিল, বুদ্ধিও খেলিত বহু বিষয়ে। পৃথিবীতে সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা কাহারও ছিল বা আছে, বলিলে সত্য কথা বলা হয় না। সুতরাং আশু-বাবুর সম্বন্ধেও তাহা বলা যায় না। তদ্রূপ কেহ আধুনিক জগতে বাস্তবিক সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ আছেন বা ছিলেন, বলিলেও সত্যের অপলাপ হয়। কিন্তু আশু-বাবুর পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে একটি কথা সত্যের অপলাপ না করিয়া বলা যায়। ভারতবর্ষে এক-একটি বিষয়ে বা একাধিক বিষয়ে তাঁহা অপেক্ষা পণ্ডিত লোক আছেন, নিজের নিজের বিদ্যায় অতিশয় কৃতী ও প্রসিদ্ধ লোক আছেন; কিন্তু আশু-বাবুর মত অনেকগুলি বিষয়ে পাণ্ডিত্যের সহিত নানাপ্রকার কাজ চালাইবার ক্ষমতা আর কোন ব্যক্তিতে এদেশে দৃষ্ট হয় নাই। আর একটি ক্ষমতা তাঁহার অধিক মাত্রায় ছিল। তাঁহাকে কার্য্য গতিকে নানাবিদ্যার নানা উচ্চ অঙ্গের বিষয়ে লিখিতে ও বলিতে হইত। তাহার মধ্যে তিনি কোনটায় পারদর্শী না থাকিলেও তৎতদ্বিষয়ে পণ্ডিত সহকর্ম্মীদের নিকট হইতে জ্ঞাতব্য কথা জানিয়া লইয়া অতি শীঘ্র তিনি গুছাইয়া লিখিতে ও বলিতে পারিতেন।

ভিন্ন ভিন্ন জাতির, ধর্ম্মের, রুচির, ব্যবসায়ের ও মতের নানা লোককে একত্র কাজ করাইবার অসাধারণ ক্ষমতা তাঁহার ছিল। প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার অসামান্য ক্ষমতাও তাঁহার ছিল।

বাল্যকালেই আশুতোষের ভবিষ্যৎ কৃতিত্বের পূর্ব্ব লক্ষণ লক্ষিত হইয়াছিল। স্কুল ও কলেজে তিনি ছাত্ররূপে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়াছিলেন। আমরা যখন প্রেসিডেন্সী কলেজে আসিয়া ভর্ত্তি হই, তখন তিনি উচ্চ শ্রেণীতে পড়িতেন। তাঁহার একমাত্র ভ্রাতা ও কনিষ্ঠ যৌবনেই পরলোকগত হেমন্তকুমার আমাদের সহপাঠী ছিলেন। সেই কারণে আশু-বাবুর সহিত বিশেষ পরিচয়ও হইয়াছিল। আমরা যখন নীচের ক্লাসে পড়ি, আশু-বাবু তখন একজন বিখ্যাত ছাত্র এবং কলেজের বিতর্ক-সভার অন্যতম বাগ্মী নেতা। তখনই, তাঁহার এই খ্যাতি রটিয়াছিল, যে, গণিতের কোন কোন অধ্যাপক অপেক্ষা গণিতে তাঁহার মাথা খেলে বেশী। তিনি ধনী লোকের ছেলে ছিলেন, কিন্তু কখনও বিলাসী বা ফ্যাশনেব্‌ল ছোকরাদের মধ্যে পরিগণিত হন নাই। আমাদের এখন যতটা মনে পড়ে, তাহাতে তাঁহার একখানা সাদাসিধে ধুতি-পরা ও একটা লংক্লথের পিরান বা পাঞ্জাবী গায়ে, মেধা দৃঢ়চিত্ততা আত্মবিশ্বাস ও সাহস ব্যঞ্জক চেহারাই মনে আসে। লম্বা কোঁচা তাঁহার ছিল বলিয়া মনে পড়ে না, চাদর ব্যবহার তিনি বড় একটা করিতেন বলিয়াও মনে পড়িতেছে না। এবং এইরূপই মনে হইতেছে, যে, সেই কারণে তাঁহাকে ছাত্রেরা পরিহাস করিয়া চাদরনিবারিণী সভার সভাপতি বলিত।

আমার সম্পাদিত প্রদীপ নামক মাসিক পত্রে আমি তাঁহার সচিত্র জীবনচরিত্র সংক্ষেপে লিখিয়াছিলাম। ইহাই আশুতোষের প্রথম জীবনচরিত। আমার মনে পড়ে, ইহার জন্য আমি আশুতোষের স্বহস্তলিখিত কতকগুলি তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলাম, এবং ঐ জীবনচরিতটি প্রকাশিত হইবার পর বহুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট কেহ তাঁহার জীবনসম্বন্ধে কিছু জানিতে চাহিলে তিনি প্রদীপ কাগজ দেখিতে বলিতেন।

কথিত আছে, যে, তিনি আইন-ব্যবসায় অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে শিক্ষা-বিভাগে কাজ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু বঙ্গের তৎকালীন শিক্ষাকর্ম্মাধ্যক্ষ তাঁহাকে বিলাতের ইংরেজ গ্রাজুয়েটদের মত শিক্ষাবিভাগের উচ্চ স্তরের অধ্যাপকতা দিতে রাজী না হওয়ায়, তিনি অধ্যাপক হইবার বাসনা ত্যাগ করেন। তাঁহার মত শক্তিশালী

ও বিদ্বান্ যুবকের পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক; কারণ তাঁহার প্রকৃতিই বরাবর এইরূপ ছিল, যে, যেখানে থাকিবেন সেখানে শীর্ষস্থানীয় হইয়াই থাকিবেন, নতুবা সেখানে থাকিবেনই না। তিনি যদি উচ্চশ্রেণীর অধ্যাপকতা পাইয়া শিক্ষাবিভাগে থাকিতেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ গণিতে গবেষণা দ্বারা নূতন অনেক কিছু করিতে পারিতেন; কারণ ছাত্রাবস্থাতেই তিনি কিছু গবেষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি আইন-ব্যবসায়ী হইয়া হাইকোর্টের জজের আসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া পদের প্রভাবে শিক্ষার বিস্তারকল্পে এবং অধ্যাপক ও ছাত্রদের গবেষণা কার্য্যের সুবিধা করিয়া দিবার জন্য যাহা করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা করিতে পারিতেন না। তথাপি, যদিও তিনি শিক্ষকতা অবলম্বন করেন নাই, কিন্তু তাঁহার বিদ্যানুরাগ এবং জ্ঞানার্জ্জন স্পৃহা বরাবরই ছিল। এইজন্য তাঁহার লাইব্রেরী, শোভার জন্য নহে, পরন্তু নানাবিষয়ক বহু সহস্র পুস্তকের সমষ্টি বলিয়া দেখিবার জিনিষ ছিল। অনেক মানুষেরই একটা না একটা সখ্ বা বাতিক থাকে; আশু-বাবুর সখ্ বা বাতিক ছিল পুস্তক ক্রয়।

তিনি কয়েক বৎসর ওকালতী করিবার পর হাইকোর্টের জজ্ নিযুক্ত হন। তাহাতেই তাঁহার আইনজ্ঞানের এবং ওকালতী কার্য্যে দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। হাইকোর্টের সহিত এবং মোকদ্দমা আদির সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক না থাকায়, তাঁহার জজিয়তী সম্বন্ধে আমাদের কোন সাক্ষাৎ জ্ঞান নাই। এইজন্য এই কার্য্যে তাঁহার খ্যাতি বা নিন্দা কোনটি সম্বন্ধেই আমাদের কিছু বলা উচিত নয়। তিনি কিছু কাল কলিকাতায় মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার ছিলেন, এবং কিছু কাল বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ও ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। বোম্বাইয়ে ফিরোজশাহ্ মেহতা বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটি কার্য্যে যত সময় ও শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন, আশুবাবু যদি কলিকাতায় তাহা করিতে মনস্থ করিতেন, তাহা হইলে তিনি এখানে মিউনিসিপ্যাল কার্য্যে মেহ্‌তার মত কিংবা তদপেক্ষা অধিক কৃতিত্ব দেখাইতে সমর্থ হইতেন। যদি তিনি রাজনীতির ক্ষেত্রে কাজ করিতে মনস্থ করিয়া ব্যবস্থাপক সভার কার্য্যেই তাঁহার অধিকাংশ শক্তি ব্যয় করিতেন, তাহা হইলে এ-বিষয়েও শীর্ষস্থানীয় হইতে পারিতেন। অবশ্য একথা ঠিক্, যে, তিনি গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লের মত দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু তাহা না করিলেও তাঁহার কার্য্যের বৈচিত্র্য ও পরিমাণ বিবেচনা করিলে বলা যায়, যে, তাঁহার খাটিবার শক্তি অন্য কাহারও চেয়ে কম ছিল না, এবং তিনি অর্থ উপার্জ্জনে সময় দিয়াও সার্ব্বজনিক কাজে এত সময় দিয়াছিলেন এবং এত কাজ করিয়াছিলেন, যে, অনন্যকর্ম্মা রাজনৈতিকরাও রাজনীতি- ক্ষেত্রে তদপেক্ষা বেশী শ্রম করেন নাই ও সময় দেন নাই। তা ছাড়া, আর-একটা কথাও মনে রাখিতে হইবে। যদি ধরিয়া লওয়া যায়, যে, কোন দুইজন লোকের বুদ্ধি, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ক জ্ঞান-অর্জ্জনের ক্ষমতা, তর্কশক্তি ও বাগ্মিতা আছে, তাহা হইলে বলা যাইতে পারে, যে, খুঁৎখুতে নরমস্বভাবের লোক অপেক্ষা দ্বিধাশূন্য দৃঢ়চিত্ত ও দুর্দ্দমনীয় প্রকৃতির লোকের রাজনীতি ক্ষেত্রে অধিক কৃতিত্ব হইবার সম্ভাবনা। রাজনীতিক্ষেত্রে সিদ্ধিলাভের উপযোগী আরও কোন কোন শক্তি আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ছিল। যে-সব ক্ষেত্রে কতগুলি মানুষ কোন্ পক্ষে তাহা গণনা করিয়া জয়পরাজয় নির্দ্ধারিত হয়, সেখানে শুধু যুক্তি ও প্রমাণের প্রবলতার উপর নির্ভর করিলে চলে না; দল বাঁধা আবশ্যক হয়। এরূপ

দল বাঁধিতে হয়, যে, নেতার আদেশ বা সঙ্কেত মাত্রেই দলের সমস্ত লোক কোন না কোন দিকে নিজেদের মত জ্ঞাপন করে। আশু-বাবুর এইরূপ দল বাঁধিবার ক্ষমতা যেরূপ দেখা গিয়াছে, আজকালকার কাহারো তাহা দেখা যায় না, এবং আমাদের মৃত বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতাদের দল বাঁধিবার তদ্রূপ বা তদপেক্ষা অধিক ক্ষমতা দৃষ্ট হয় নাই। স্বরাজ্যদল আজকালকার দিনে ব্যবস্থাপক সভা-সকলে প্রবলতম দল। কিন্তু এক মধ্যপ্রদেশ ভিন্ন আর কোথাও, যাহারা ঐ দলের লোক বলিয়া পরিচয় দিয়া সহজে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই দলপতির মত অনুসারে চলেন নাই। অবশ্য দল বাঁধিতে গেলেই যে-সব উপায় ও কৌশল অবলম্বিত হয়, তাহার সবগুলি প্রশংসনীয় নহে; কিন্তু আমরা, আশু-বাবু রাজনীতি ক্ষেত্রে গেলে কেন খুব কৃতী হইতে পারিতেন, তাহারই কারণ দেখাইতেছি। এখন কোনরূপ সমালোচনা অসাময়িক বলিয়া তাহা আমাদের অভিপ্রেত নহে।

রাজনীতি-ক্ষেত্রে আর-একটি শক্তি কাজে লাগে। তাহা, গুপ্ত সংবাদ জানিবার উপায় অবলম্বন এবং তাহা জানিয়া আগে হইতে সাবধান ও প্রস্তুত থাকা ও বিপক্ষকে বিফলপ্রযত্ন করা। এই ক্ষমতা আশু-বাবুর ছিল, এবং এইজন্য তিনি এ-বিষয়ে পাশ্চাত্য রাজনৈতিকদের সমশ্রেণীস্থ ছিলেন।

আমাদের দেশের রাজনীতিক্ষেত্রে সাফল্যলাভের জন্য দেশভক্তি ও স্বাজাতিকতা থাকা দরকার। এই জন্য কথা উঠিতে পারে, যে, আশু-বাবুর তাহা ছিল কি না। আমরা যাহা জানি, তাহাতে আমাদের বিশ্বাস তাঁহার দেশভক্তি ও স্বাজাতিকতা ছিল। তাহার কিছু কিছু প্রমাণের উল্লেখ পরে করিব। আপত্তি এই হইতে পারে, যে, তাঁহার প্রধান হইবার ইচ্ছা ও প্রভুত্বপ্রিয়তা ছিল। কিন্তু জীবিত ও মৃত ভারতীয় রাজনৈতিক নেতাদের এক-একজনের কথা ভাবিলে, অধিকাংশেরই প্রকৃতিতে ঐ ঝোঁক্ লক্ষিত হইবে। প্রভেদ এই, যে, আশু-বাবু যে-পরিমাণে সফলকাম হইয়াছিলেন, অন্য অনেকেই তাহা হন নাই। সম্পূর্ণ আত্মবিলোপ বা স্বার্থত্যাগ আশু-বাবু করিতে পারেন নাই, ইহা স্বীকার্য্য। কিন্তু যিনি বা যাঁহারা পারিয়াছেন বা পারিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম করা বড় সহজ হইবে না।

যাহাই হউক, আশু-বাবু যখন রাজনীতিকে নিজের কার্য্যক্ষেত্র করেন নাই, তখন সে বিষয়ে অধিক লেখা অনাবশ্যক। শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতি, সর্ব্ববিশ্ব জ্ঞান-অর্জ্জন, গবেষণা দ্বারা মানবের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করা,—সকল সভ্য দেশে যেমন এইসকল দিকে চেষ্টা হইতেছে, আমাদের দেশেও যাহাতে সেইরূপ হয়, আশু-বাবুর ইহা হৃদগত ইচ্ছা ছিল। এই ইচ্ছাকে ফলবতী করিবার জন্য তিনি যৌবন কাল হইতে প্রভূত, অবিরাম, এবং এতদর্থে ভারতবর্ষে অনতিক্রান্ত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার জীবনের কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য যে-সকল রীতি ও উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার সবগুলির উপযোগিতা, ফলোপধায়কতা এবং অনবদ্যতা সম্বন্ধে অবশ্য মতভেদ আছে। কিন্তু তিনি নিজের সম্বন্ধে একদা যে নিম্নলিখিত মর্ম্মের কথা বলিয়াছিলেন, তাহা সত্য :—

"আমি আমার বিবেকের অনুমোদন-সহকারে বলিতে পারি, যে, আমি পরিশ্রম হিসাবে যেমন অনেক সময় অন্যকে রেয়াৎ করি নাই, তেমনি আমি কখনও নিজেকেও বাঁচাইয়া চলি নাই। আমার অন্যবিধ অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য—তন্মধ্যে আমার বিচারপতি-পদের কর্ত্তব্য সর্ব্বপ্রধান—

সম্পন্ন করিয়া, যতটুকু সময় করিতে পারিতাম, তাহার প্রত্যেক ঘণ্টা প্রত্যেক মিনিট বহু বৎসর ধরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে নিয়োজিত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য নানা উপায় ও পদ্ধতির চিন্তা আমার দিবাস্বপ্নের বিষয়; রাত্রি কালে বিশ্রামের সময়েও সেইসব চিন্তা হইতে আমি নিষ্কৃতি পাই নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের জন্য আইনি অধ্যয়ন ও গবেষণার সমুদয় সম্ভাবনা বলি দিয়াছি, সম্ভবতঃ কিয়ৎপরিমাণে পরিবারবর্গ ও বন্ধুদের স্বার্থ বলি দিয়াছি, এবং দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, আমার স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তির অনেক অংশ নিশ্চয়ই বলি দিয়াছি।"

তাঁহার মত মানসিকশক্তিশালী লোক যে তাঁহার বুদ্ধির উপযুক্ত কোন মৌলিক গ্রন্থ-আদি রাখিয়া যাইতে পারেন নাই, ইহাতে তিনি নিজের প্রতি অবিচার করিয়াছেন, এবং তাঁহার জাতিও সম্ভাবিত লাভ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

আমাদের জাতিকে নানা বিষয়ে প্রবুদ্ধমনা করিবার জন্য দেশে যত প্রতিষ্ঠান আছে, তাহার অনেকগুলির সহিত তিনি যুক্ত থাকিয়া কাজ করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটীর তিনি সভ্য ছিলেন, এবং পুনঃ পুনঃ সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি ১৯০৯ সালে ভারতীয় মিউজিয়মের ট্রষ্টীদিগের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। প্রায় সেই সময়ে বঙ্গে সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষার পরিচালক-সমিতির সভাপতি হন। তিনি বৌদ্ধ মহাবোধি সভারও সভাপতি ছিলেন। যখন কলিকাতার ধর্ম্মরাজিক চৈত্যবিহারে গবর্ণমেন্ট্ বুদ্ধদেবের দেহাবশেষের কিয়দংশ দান করেন, তখন গবর্ণমেন্ট্ প্রাসাদ হইতে শোভাযাত্রা করিয়া উহা আনয়ন করিবার সময় মুখোপাধ্যায় মহাশয় নগ্নপদ ও পট্টবস্ত্র পরিহিত হইয়া উহা গ্রহণপূর্ব্বক আনয়ন করেন। ভারতের অতীত গৌরবস্বপ্নে পূর্ণ তাঁহার হৃদয়ে সেদিন ভারতের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ অবস্থা সম্বন্ধে কি চিন্তার উদয় হইয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই, কেবল কল্পনা করা যাইতে পারে। তিনি বঙ্গের গণিত-সভার সংস্থাপক ও সভাপতি ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের সহিতও তাঁহার যোগ ছিল। তিনি একবার বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া আমাদের ভাষার ও সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁহার আশা ও স্বপ্ন বঙ্গভাষী জনগণকে জ্ঞাপন করেন।

বর্ত্তমান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি প্রধান স্থপতি। তিনি ইহাকে যতটা গড়িয়াছেন, আর কেহ ততটা নহে। ইহার ভালর জন্য প্রশংসা ও মন্দের জন্য দায়িত্ব তাঁহার যত বেশী, অন্য কাহারও তত নহে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠন-কার্য্যে তাঁহার সহকর্ম্মী ও সহায়ক অনেকে ছিলেন, সকল বড় প্রতিষ্ঠানেই তাহা থাকে; কিন্তু চালক ছিলেন তিনি। তা ছাড়া, নিজেও স্বহস্তে যত কাজ করিতেন, তাহার পরিমাণও খুব বেশী। পূর্ব্বে আধুনিক ভারতবর্ষের সব বিশ্ববিদ্যালয় কেবল পরীক্ষা করিয়া উপাধি ও সার্টিফিকেট দিত। এখন সর্ব্বত্র বিশ্ববিদ্যালয়গুলি উচ্চতম শিক্ষারও নিকেতন হইতেছে। এবিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কাল হিসাবে সর্ব্বপ্রথম এবং কাজ হিসাবে সর্ব্বপ্রধান। এখানে যত ছাত্র যত ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যার শিক্ষা পায়, ভারতবর্ষের অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে তত ছাত্র তত বিষয়ে শিক্ষা পায় না। এখানে সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও নানা বিজ্ঞানে খাঁটি গবেষণা যতটুকু হইয়াছে, ভারতের অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহা হয় নাই। ইহার জন্য প্রধান গৌরব তাঁহার প্রাপ্য যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য কোন ছাত্র ও সদস্য অপেক্ষা

দীর্ঘতর কাল অধিকতর অনুরাগ, শ্রমশীলতা ও একাগ্রতা সহকারে সেনেটর, সীণ্ডিক্ ও ভাইস্‌চ্যান্সেলার-রূপে তাহার সেবা করিয়াছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ বিভাগ, সমিতি ও কমিটির সভাপতি ছিলেন; কিন্তু গরহাজিরী রোগ তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে নাই। তিনি সর্ব্বত্রই নামে ও কাজে নেতৃত্ব করিতেন। খুঁটিনাটি সব বিষয়েই এতটা করিবার প্রয়োজন ছিল না; এবং তাহার ফলে তাঁহার যে সময় ও শক্তি উচ্চতর কার্য্যে ব্যয়িত হইলে জাতি ও জগৎ লাভবান্ হইতে পারিত, তাহা সম্ভব হয় নাই; অধিকন্তু অন্যদের নেতৃত্বশক্তি বিকশিত হইবার যথেষ্ট সুযোগও ঘটে নাই। তাঁহার স্থানাভিষিক্ত হইবার লোকের অভাবের ইহা অন্যতম কারণ। কিন্তু আশু-বাবুর স্বভাবনেতৃত্বে, আত্মনির্ভর, আত্মবিশ্বাস ও কর্ম্মিষ্ঠতা অসামান্য ছিল বলিয়া, তিনি সময় ও শক্তি সম্বন্ধে মিতব্যয়ী ও সকল দিকে বিবেচক হইতে পারেন নাই।

অনুমান হয়, আশু-বাবুর এই উচ্চাভিলাষ ছিল, যে, কালক্রমে তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয় যেন, শুধু ভারতে নয়, পৃথিবীতেও প্রথমশ্রেণীস্থ বলিয়া পরিগণিত হয়, এবং শেষে সর্ব্বপ্রধান হয়; যদিও এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ অবলম্বিত নীতি ও উপায়সমূহ সকলস্থলে তদুপযোগী বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। আশু-বাবুর আশার ভিত্তি ছিল তাঁহার নিজের মানসিক শক্তিতে বিশ্বাস এবং তাঁহার স্বদেশ-বাসীর মানসিক শক্তিতে বিশ্বাস। এইজন্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষণীয় প্রধান প্রধান বিদ্যা ও বিজ্ঞানের, প্রত্যেকটিতে, সমুদয় না হউক, কতকগুলি অধ্যাপক ভারতীয়। অবশ্য শিক্ষাক্ষেত্রে বিদেশী জ্ঞান বা বিদেশী অধ্যাপক কিছুই বর্জ্জন করিবার পাগলামি তাঁহার ছিল না। কিন্তু তা বলিয়া, তাঁহার স্বদেশ-বাসীর মানসিক শক্তি ও জ্ঞান অবহেলিত, অবমানিত, ও অবসাদিত হইয়া ভারতীয় প্রতিভা ভগ্নোৎসাহ হইবে, ইহাও তাঁহার অসহ্য ছিল। তাহা যাহাতে না হয়, তাহার উপায়ও তিনি করিয়াছিলেন। ভারতীয় মানসিক শক্তির কার্য্যক্ষেত্র তিনি ক্রমেই বিস্তৃত করিতেছিলেন। দেশীয় প্রতিভার প্রতি তাঁহার এই আস্থা যে ভিত্তিহীন নহে, তাহাও তিনি দেখিয়া গিয়াছেন। তিনি গুণজ্ঞ, গুণগ্রাহী ও গুণের উৎসাহদাতা ছিলেন,—যদিও শক্তিশালী লোকদের স্তাবকবাৎসল্যের দোষ তাঁহাকেও স্পর্শ করিয়াছিল। বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপকতা ও গবেষণাবৃত্তি আদি যে সমস্তই খাঁটি ভারতীয়দিগের জন্য বলিয়া বন্দোবস্ত আছে, তাহা অবশ্য রাসবিহারী ঘোষ ও তারকনাথ পালিত মহাশয়দ্বয়ের দানের দলিলেরই অন্তর্গত। কিন্তু এরূপ অনুমান করিবার কারণ আছে, যে, ইহাতে আশু-বাবুরও পরামর্শ ও হাত ছিল। এই উভয় দাতার প্রভূত দানও অনেকটা আশু-বাবুর চেষ্টায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পাইয়াছিলেন, তাহাও সর্ব্বজনবিদিত।

খয়রা রাজাব দান, এবং অন্যান্য ক্ষুদ্রতর অনেক দান আশু-বাবুরই চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয় পাইয়াছেন।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের স্বাজাতিকতা রাজনীতিক্ষেত্রে প্রকাশ পাইবার সুযোগ ঘটে নাই, তিনি আরও কিছু কাল বাঁচিয়া থাকিলে তাহা ঘটিতে পারিত। কিন্তু তাঁহার স্বাজাতিকতা সম্বন্ধে তাঁহার বন্ধুগণ নিশ্চয়ই নিঃসন্দেহ ছিলেন। শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁহার স্বাজাতিকতার পরোক্ষ প্রমাণ বিস্তর আছে। কিছুর উল্লেখ উপরে করিয়াছি। আরও কিছু বলিতে পারা যায়।

ভারতবর্ষের লোকেরা প্রাচীন কালে কতটা সভ্য বা অসভ্য ছিল, স্বাধীনভাবে অপরের সাহায্যে

কোন্ বিদ্যা, জ্ঞান, শিল্প প্রভৃতিতে কতটা উন্নতি করিয়াছিল, ভারতীয় সভ্যতার ও উন্নতির কোন্ স্তরের প্রাচীনত্ব কিরূপ, এইসকল বিষয়ের আলোচনা অবশ্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাই প্রথমে করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের নিকট হইতেই আমরা প্রথমে এইসব বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিয়াছি। তজ্জন্য তাঁহারা আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। কিন্তু সকল বিষয়ে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত অবিচারিতভাবে অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। আমাদের অতীতের জ্ঞানের জন্য চিরকাল পরমুখাপেক্ষী থাকা নিষ্প্রয়োজন ও অবমানজনক, এবং এমন অনেক বিষয় ও তথ্য আছে, যাহা আমরা সহজে আবিষ্কার ও উপলব্ধি করিতে সমর্থ, বিদেশী পণ্ডিতেরা নহেন। আমাদের অতীত সম্বন্ধে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি যদি কখন হয়, তাহা অনেকটা আমাদেরই দ্বারা হইতে পারে ও হওয়া উচিত। ভারতীয় অন্য মনীষীদের মত আশুতোষ এইসব কথা জানিতেন বুঝিতেন। সেই জন্য তিনি ভারতের অতীত ইতিহাস এবং ইহার প্রাচীন সভ্যতা ও নানাবিষয়ক কৃতিত্বের অনুশীলনে ও তদ্বিষয়ক গবেষণায় খুব উৎসাহ দিতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিভাগে কেহ কেহ প্রকৃত গবেষণা করিয়াছেন। পালি ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চা এবং তিব্বতীয় ও চৈন ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলনের সুযোগ দিয়া বিশ্ববিদ্যালয় পরোক্ষভাবে পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায় হইয়াছেন। প্রাচীন সভ্যতাবিশিষ্ট কোন জাতির পুনরুজ্জীবন ও পুনর্যৌবনলাভ, অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণে, তাহার অতীত সভ্যতার জ্ঞানসাপেক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয় এবিষয়ে এপর্য্যন্ত যাহা করিয়াছেন, ভবিষ্যতে তদপেক্ষা অধিক করিলে তাহার কর্ত্তব্য সম্পাদন করা হইবে।

পাশ্চাত্য শিক্ষার অনিষ্টকারিতার প্রচার খুবই হইয়াছে। তাহার মধ্যে উপভোগ্য এই, যে, প্রচারকরা নিজেই পাশ্চাত্য শিক্ষার সাহায্যে মান্যগণ্য হইয়াছেন, এবং পাশ্চাত্য ভাষারই সাহায্যে উক্ত অনিষ্টকারিতা প্রচার করিয়াছেন। যাহা হউক, এবিষয়ে আলোচনা এখন প্রাসঙ্গিক নয়। পাশ্চাত্য শিক্ষার দু-একটা ভাল ফল যাহা হইয়াছে, তাহাই উপলক্ষ্য করিয়া একটা কথা বলিতে চাই। ভবিষ্যতে ভারতের সাধারণ ভাষা যাহাই হউক, বর্ত্তমানে শিক্ষিতদের ইংরেজী সাধারণ ভাষা। তদ্দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা ত হইয়াছেই, সকল বিষয়ে মানসিক আদানপ্রদান, পরস্পরকে জানিবার উপায়, রাষ্ট্রীয় ও অন্যবিধ সাধারণ প্রচেষ্টার সুসাধ্যতা, এবং ঐক্যসাধনের উপায়, প্রভৃতি হইয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্বারাই আমরা আমাদের অতীতকে জানিয়া গৌরব বোধ করিতে শিখিয়াছি। তা ছাড়া, ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে কূপমণ্ডূকতা হইতে মুক্ত হইয়া জগতের চিন্তাস্রোত, প্রভাবস্রোত, কার্য্যস্রোত ও ঘটনাস্রোতের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। এসব লাভ বড় কম লাভ নয়। দেশে শিক্ষা যত বাড়িবে, এইসব লাভ তত বেশী হইবার সম্ভাবনা বাড়িবে। লর্ড্ কার্জ্জনের বিশ্ববিদ্যালয় আইনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল উচ্চশিক্ষার বিস্তৃতি ও উন্নতিতে বাধা দেওয়া। বাংলা দেশে আশু-বাবু এই আইনটিকেই কিন্তু উচ্চশিক্ষার বিস্তৃতি ও উন্নতির উপায়ে পরিণত করিয়াছিলেন। অবশ্য ইহা সত্য, যে, বিস্তৃতির দিকে বেশী ঝোঁক দেওয়ায় উৎকর্ষের দিকে দৃষ্টি কম হইয়াছে; কিন্তু উৎকর্ষ যে কোন দিকেই সাধিত হয় নাই, তাহাও সত্য নয়। তা ছাড়া, ইহা স্বতঃসিদ্ধ, যে, সব জিনিষেরই উন্নতি তাহার অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে। উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি বজো রক্ষিত ও সংখ্যায় বর্দ্ধিত হইয়াছে। তাহাদের উন্নতি বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে করা যাইতে পারিবে।

ভারতবর্ষের প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্য, প্রাচীন মন্দির, মুদ্রা, মূর্ত্তি, অনুশাসন প্রভৃতি জানিলেই ভারতবর্ষকে জানা হইবে না। ভারতীয় জীবনের এবং ভারতের ব্যক্তিত্বের চরম ও চূড়ান্ত অভিব্যক্তি প্রাচীন কালেই হইয়া যায় নাই। অতীত যাহা কিছু, তাহা জানা অবশ্য চাইই এবং তাহার ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয় যাহা করিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহার উল্লেখও করিয়াছি। কিন্তু অভিব্যক্তি প্রাচীন কাল হইতে মধ্যযুগে এবং মধ্যযুগ হইতে এখন পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। ইহার পরিচয ও প্রমাণ বাংলা সাহিত্যে এবং ভারতীয় অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যে আছে। বাংলা সাহিত্যের এবং তৎপরে অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা ও তৎসৎসৃষ্ট গবেষণার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় আমাদিগকে ভারতীয় জীবন ও সভ্যতার যে সর্ব্বাঙ্গীণ ধারণা লাভ করিবার সুযোগ দিয়াছেন, অন্যত্র কোথাও তাহা নাই। অবশ্য কার্য্যটির প্রারম্ভ মাত্র হইয়াছে, এবং অর্থলিপ্সুদের দ্বারা ইহার অপব্যবহারও হইয়াছে। কিন্তু সংশোধন অসাধ্য নহে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবহারিক বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও কৃষি এবং নানা বৃত্তি শিখাইবার সূচনা হইয়া আছে। ইহার বিকাশ, বিস্তৃতি ও উন্নতি ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। ছাত্রদের স্বাস্থ্যের উন্নতি ও তদ্দ্বারা শারীরিক উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টার সূত্রপাতও হইয়া আছে। এই সকল বিষয়েই উপক্রম, উদ্যোগ ও সূত্রপাত আশু-বাবু করেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার সম্মতি ও সহযোগিতা ব্যতীত কিছু হইতে পারিত না ও হয় নাই।

যাহা অবস্থাবিশেষে কেজো এবং অবস্থাবিশেষে যাহা দ্বারা অর্থাগম হয়, সেইরূপ শিক্ষার বন্দোবস্তই প্রথমে ও বেশীপরিমাণে স্বভাবতই হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও সেইরূপই হইয়া আসিতেছে। ললিতকলার চর্চ্চা এদেশে এখনও বিস্তৃতভাবে খুব একটা রোজগারের উপায় হয় নাই। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবিষয়ে বক্তৃতা দিবার জন্য অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। কি অবস্থায়, কি কি কারণে ও কি কি উদ্দেশ্যে এই নিয়োগ হইয়াছে, তাহাব আলোচনা এখানে অনাবশ্যক। আমরা এখানে কেবল ইহার লাভের দিক্‌টাই মুখ্যতঃ দেখিব। কোন জাতিকে সর্ব্ববিষয়িণী শিক্ষা না দিলে ঐ জাতির লোকেরা সকল দিকে প্রবুদ্ধমনা ও উদ্বুদ্ধহৃদয় হইতে পারে না, সুতরাং প্রকৃত সভ্যপদবাচ্যও হয় না। তজ্জন্য ললিতকলার শিক্ষা ও অনুশীলন আবশ্যক। এক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য এই, যে, যখন সাধারণভাবে ললিতকলা বিষয়ে অনুশীলন বিশ্ববিদ্যালয়ে আরম্ভ হইয়াছে, তখন সঙ্গীত, চিত্র, তক্ষণ, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য আদির শিক্ষার ব্যবস্থাও হইবে আশা করা যায়।

বিদেশী কাহারো সহিত তর্কযুদ্ধে বা পত্রব্যবহারে আশু-বাবুকে কখনও পরাজয় স্বীকার করিতে হয় নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধেও তিনি যত জানিতেন, অন্য কোন বাঙালীর ততটা জানা ছিল বলিয়া আমরা অবগত নহি। বস্তুতঃ, বিদেশী শিক্ষাতত্ত্বজ্ঞদিগের সহিত তুলনা করিলে তাঁহাকে নিকৃষ্ট মনে করিবার কারণ ছিল না। এইজন্য মনে হয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দোষত্রুটিগুলি সম্ভবতঃ তাঁহার জ্ঞানাভাব হইতে উদ্ভূত নহে, অন্য কারণে ঘটিয়াছিল। তিনি যে শিক্ষণ-বিষয়ে এবং পাণ্ডিত্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি, তাহা বঙ্গের বাহিরে অন্যান্য প্রদেশেও কার্য্যতঃ স্বীকৃত হইয়াছিল।

তিনি খুব দৃঢ়চিত্ত শক্ত মানুষ ছিলেন। অনেক ঝড় তাঁহার মাথার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে;

কিন্তু তিনি তাহাতে ভগ্ন বা নত হন নাই।

আশু-বাবু বলিয়া তাঁহার পরিচয়েই বুঝা যায়, যে, তিনি বাঙালী বাবু হইয়া জন্মিয়াছিলেন, এবং শেষ পর্য্যন্ত বাঙালী বাবুই ছিলেন। সেই পরিচয়ে তিনি কখন লজ্জা বা সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। ইহা সৌভাগ্যের বিষয়, যে, তাঁহার মত মানুষ "বাবু" বলিয়া পরিচিত ছিলেন; কেন না, তাহাতে "বাবু" কথাটার অর্থের লাঘব না হইয়া গৌরবই হইয়াছে। তাঁহার অশন বসন চাল চলন সাবেকধরণের ছিল। নিজের আফিস-আদালতের কাজ ছাড়া অন্য সব কাজে ও অবস্থায় তাঁহাকে ধুতিপরিহিত দেখা যাইত। বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের বৈঠকেও তিনি ধুতি পরিয়া উপস্থিত হইতেন। তিনি অবিলাসী সাদাসিধেভাবে জীবন যাপন করিতেন। তাঁহার দেশী চালচলনে অনুরাগ তাঁহার স্বাদেশিকতার অঙ্গ ছিল বলিয়া প্রতীত হয়।

এক দিকে তিনি প্রভুত্বে ও নেতৃত্বে অভ্যস্ত শক্ত লোক ছিলেন বটে, কিন্তু অন্য দিকে সাবেককালের ভদ্র বাঙালীর একটি গুণ তাঁহার ছিল যাহা আজকালকার দিনে খুব সুলভ নহে। তিনি সকল অবস্থার সকলরকমের লোকের সহজে অধিগম্য ছিলেন। কোন কোন বড় লোকের, এমন কি খুব পরিচিত বড় লোকেরও, বাড়ীতে গিয়া দেখিয়াছি, বাড়ীর কর্ত্তার সঙ্গে দেখা করিতে গেলে বাড়ীর দারোয়ান বা অন্য চাকর এমনভাবে তাকায় ও কথা বলে, যেন একটা ভিখারী বা হ্যাংলা উমেদার আসিয়াছে। আশু-বাবুর বাড়ীতে কোন-না-কোনপ্রকারের সাহায্যপ্রার্থী ও উমেদার খুব বেশী যাইত, কিন্তু তিনি বাড়ী থাকিলে সকলে অনায়াসে অবিলম্বেই দেখা পাইত। তিনি সকলের কথাই মন দিয়া শুনিতেন, এবং উপায় ও সাধ্য থাকিলে সাহায্য বা উপকার করিতে বিমুখ হইতেন না। হাল্ ফ্যাশ্যনের "চেষ্টা করিব" বলিয়া ফাঁকি দিবার ও পরমুহূর্তেই ভুলিয়া যাইবার অভ্যাস তাঁহার ছিল না। এই কারণে, বোধ হয়, বাংলা দেশে শিক্ষিত ও শিক্ষার্থী লোকদের মধ্যে তাঁহার নিকট হইতে কোন-না-কোনপ্রকারের সহায়তা ও উপকার যত লোক পাইয়াছেন, অন্য কোন লোকের নিকট হইতে তত নহে। মৎলবী ও তোষামোদকারী লোকেরা তাঁহার সহৃদয়তার অপব্যবহার করিয়াছে, তাহা স্বীকার্য্য; কিন্তু তাঁহার গুণটির অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না।

নিজের পরিবারের মধ্যে তিনি খুব স্নেহশীল ছিলেন। লক্ষ্মীস্বরূপা তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা বিধবা হইবার পর তিনি আবার তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহাকে অতি নীচ ও অভদ্ররকমের নানা আক্রমণ সহ্য করিতে হইয়াছিল। তাহাতে তিনি অটল ছিলেন। দুঃখের বিষয় এই কন্যাটি আবার বিধবা হন এবং পিতার মৃত্যুর অল্পকাল পূর্ব্বে গতাসু হন। তাঁহার শোকে মুখোপাধ্যায় মহাশয় কাতর হইয়াছিলেন।

তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু অবগত নহি। তিনি অন্য অনেক শিক্ষিত হিন্দুর মত প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহার অকপটতায় সন্দেহ করিবার মত আমরা কিছু অবগত নহি। কিন্তু ইহা বলিলেও বোধ হয় তাঁহার প্রতি কোন অবিচার করা হইবে না, যে, তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস সম্ভবতঃ তাঁহার স্বাজাতিকতারও অঙ্গ ছিল।

সত্যের অপলাপ না করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে সময়োচিত যাহা বলা যায়, আমরা তাহাই আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি অনুসারে বলিতে চেষ্টা করিয়াছি। তাঁহার জীবন, কার্য্য ও চরিত্রের সমালোচনা ভবিষ্যতে নিরপেক্ষ জীবন-চরিতলেখক ও ঐতিহাসিক করিবেন।

১৩৩২ ভাদ্র

প্রবেশিকা পরীক্ষার শিক্ষণীয় বিষয়

অনেক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য ভূগোল ও ইতিহাস অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয় ছিল। তাহার পর অনেক বৎসর ধরিয়া এই দুটি বিষয় শিক্ষা করা না-করা ছাত্র-ছাত্রীদের ইচ্ছাধীন ছিল। তাহার ফলে এমন অনেক ছাত্র এম্-এ, ডি-এস্-সি, পি-এইচ্-ডি হইয়া থাকিবেন, যাঁহারা স্বদেশ ও বিদেশের ইতিহাস ও ভূগোল কিছুই জানেন না; ইহা বড়ই দুঃখ ও লজ্জার বিষয়।

এখন আবার ইতিহাস ও ভূগোলকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট করায় আমরা আহ্লাদিত হইলাম।

ভারতবর্ষের যে-সকল ইতিহাস সচরাচর পঠিত হয়, তাহা না-পড়ারও কিছু যে সুবিধা আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, ঐ সকল ইতিহাসে ভারতবর্ষকে ক্রমাগত বিজিত এবং প্রায় চিরপরাধীন দেশ বলিয়া ছাত্রদের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। আমরা অবশ্য ছাত্রদিগকে ইহার পরিবর্ত্তে উল্টা রকমের অন্যবিধ মিথ্যা কথা শিখাইতে বলিতেছি না। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক যে-সব দুঃখকর পরিবর্ত্তন পুরাকাল হইতে সত্য-সত্যই ঘটিয়াছে, অতীতে এবং বর্ত্তমানে ভারতের যে-দুর্ব্বলতা অবশ্য স্বীকার্য্য, সে- সকলের অপলাপ করিতে আমরা বলিতেছি না। এ-সকল বিষয়ে সত্য যাহা তাহা শিখাইতে হইবে। কিন্তু তাহার সঙ্গে-সঙ্গে ভারতের অতীত নানা যুগ-সম্বন্ধে এরূপ সত্য কথাও শিখাইতে হইবে, যাহাতে বিদ্যার্থীরা স্বদেশ ও স্বজাতি সম্বন্ধে কেবল লজ্জিত না হইয়া কিছু গৌরবও বোধ করিতে পারে, এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশাশীল হইতে পারে।

পৃথিবীতে বহু শতাব্দী ধরিয়া পরাধীন দেশ যে আরও ছিল, ভারতবর্ষই তাহার একমাত্র দৃষ্টান্ত নহে, নানাদেশের ইতিহাসের দৃষ্টান্তের দ্বারা তাহা ছাত্রদিগকে বুঝাইতে পারিলে ভাল হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইটালীর উল্লেখ করা যাইতে পারে। উহা চৌদ্দশত বৎসর পরাধীন ছিল। এই দীর্ঘকাল ধরিয়া উহার একজাতীয়তা, ছিল না।*

ইংলণ্ডের ইতিহাসও ইংরেজরা যে-ভাবে লিখিয়াছে, তৎসম্বন্ধেও আমাদের ছাত্রদিগকে সাবধান করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রত্যেক স্বাধীন জাতিই নিজের নিজের ইতিহাস এমন করিয়া লেখে, যাহাতে তাহাদের জয়গুলি খুব উজ্জ্বল এবং পরাজয়গুলি পাঠকদের চোখে তুচ্ছ হইয়া উঠে, যাহার দ্বারা পাঠকদের এই ধারণা জন্মে যে, তাহারা প্রায় সব সময়েই জয়ী হইয়াছিল এবং

---

* "The difficulty of Italian history lies in the fact that until modern times the Italians have had no political unity, no independence, no organised existence as a nation. Split up into numerous and mutually hostile communities, they never through the fourteen centuries which have elapsed since the end of the old Western empire, shook off the yoke of foreigners completely; they never until lately learned to merge their local and conflicting interests in the common good of undivided Italy. Their history is therefore not the history of a single people, centralizing and absorbing its constituent elements by a process of continued evolution, but of a group of cognate populations exemplifying diverse types of constitutional developments"—*Encyclopaedia Britannica*. 11th Edition

তাহাদের ইতিহাসের অধিকাংশ সময় তাহারা এক-একটি স্বাধীন ও সম্মিলিত জাতি ছিল। ইহা ভ্রান্ত ধারণা। ইংরেজের লিখিত ইংলণ্ডের ইতিহাস পড়িয়াও এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা জন্মে; অথচ বস্তুতঃ ইংলণ্ড্ দেশটি বহুবার বিদেশী জাতি দ্বারা পরাজিত হইয়াছিল ও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দীর্ঘকাল পরাধীন ছিল। এই ভ্রান্ত ধারণা যাহাতে আমাদের ছাত্রদের না জন্মে, তাহার উপায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের করা একান্ত কর্ত্তব্য।

১৩৩৩ ভাদ্র

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার কলিকাতার "ভাইস্-চ্যান্সেলর্"

আমরা শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলর্ নিযুক্ত হওয়ায় বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। সরকার-মহাশয় পণ্ডিত ও গুণী ব্যক্তি এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান নেতৃবর্গের দোষগুণের সহিত সুপরিচিত; সুতরাং তাঁহার দ্বারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক উন্নতি সাধিত হইবে সন্দেহ নাই। ভারতের ইতিহাসের চর্চ্চায় পারসী লেখকদিগের লেখার সাহায্য গ্রহণ করিয়া যদুনাথ সরকার মহাশয় ঐতিহাসিক আলোচনার এক নূতন পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। এইজন্য তাঁহাকে সর্ব্বদেশের পণ্ডিতবর্গ বহু সমাদর করিয়াছেন। তাঁহার কার্য্যক্ষমতা, বুদ্ধিমত্তা ও ধৈর্য্যশীলতা অসাধারণ। এইসকল গুণের সাহায্যে তিনি আমাদিগের বিশ্ববিদ্যালয়কে গৌরবমণ্ডিত করিয়া তুলিতে পারিবেন বলিয়াই আমাদিগের আশা।

কোনো অধ্যাপক ইতিপূর্ব্বে কখনও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলর্ নিযুক্ত হন নাই। এদিক দিয়াও এই নিয়োগের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা উন্নততর হইবে মনে হয়।

এই সম্বন্ধে একটি কথা বলা প্রয়োজন যাহা অতিশয় দুঃখের ও লজ্জার বিষয়। শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের নিয়োগের সংবাদ প্রথম যখন বাহির হয় সেই সময় হইতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় নেতৃস্থানীয় লোক তাঁহার বিরুদ্ধে যথাসাধ্য কুৎসা করিয়া ও তাঁহার নিয়োগ খারিজ করাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া দেশবাসীর মনে তাঁহাদিগের সম্বন্ধে নিদারুণ ঘৃণার সৃষ্টি করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য যে গত বহু বৎসর ধরিয়া উপযুক্ত, ন্যায়সঙ্গত ও আদর্শরূপে সম্পন্ন হইতেছিল না তাহা সকলেই জানেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে-সকল মহাপুরুষ কখন (সৎ) সাহস করিয়া দাঁড়াইবার মত মেরুদণ্ডের জোর দেখাইতে পারেন নাই, তাঁহারাই আজ নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য দৈনিক পত্রের আফিস হইতে আরম্ভ করিয়া লাটসাহেবের দপ্তর পর্য্যন্ত ছোটাছুটি করিয়া ও যদুনাথ সরকার মহাশয়ের বিরুদ্ধে নানা-প্রকার অভিযোগের সৃষ্টি করিয়া জগতকে হাসাইলেন। "যদুনাথ সরকারকে আমরা চাই না, যে হেতু তিনি আমাদিগের সমালোচনা করিয়াছেন।" সমালোচনাগুলি সত্য কি মিথ্যা সে-কথা কেহ বলিলেন না। সমালোচনা প্রায় সর্ব্বক্ষেত্রেই সত্য হইয়াছিল বলিয়াই আজ যদুনাথ সরকার মহাশয় ভাইস্-চ্যান্সেলর্

হইয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতাগণ আশা করি অতঃপর অপরের দোষ দেখিয়া সময়ের অপব্যবহার না করিয়া নিজেদের কার্য্যে অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের যথার্থ উন্নতির দিকে মন দিবেন। যদি কেহ বলেন, "তাহা হইলে আপনারা মাসিক পত্রিকায় পরের দোষ ধরিয়া বেড়ান কেন?" তাহার উত্তর এই যে, মাসিক পত্রিকার কার্য্য জগতের সকল ঘটনা পাঠকদিগের নিকট মন্তব্য সহযোগে উপস্থিত করা এবং দোষাবহ ও গুণাবহ সকল ঘটনাই পাঠকদিগের নিকট সমন্তব্য উপস্থিত করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করা। ইহাই মাসিক পত্র-চালকের কর্ত্তব্য।

শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য কোন্ কোন্ কার্য্য অবিলম্বে করা প্রয়োজন তাহা উত্তমরূপে জানেন। তিনি কলিকাতায় আসিয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার কার্য্য সফল হউক।

১৩৩৪ আষাঢ়

কলিকাতার ভাইস্-চ্যান্সেলারের উপর আক্রমণ

শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার ভাইস্-চ্যান্সেলার হইয়া নানাদিকে যথাসাধ্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার নিয়োগে যে দলের লোকদের চাঁইগিরি যায় যায় হইয়াছে, তাহারা নানা মিথ্যা কথা রটাইয়া তাঁহাকে অপদস্থ করিতে চেষ্টা করিতেছে। যে সব মিথ্যা কথা ফরোআর্ড লিখিয়াছিল, অন্য অনেক কাগজে তাহা খণ্ডিত হইয়াছে, কিন্তু ফরোআর্ড দোষ বা ভ্রম স্বীকার করে নাই। ভাইস্-চ্যান্সেলারের অঙ্গুলিনির্দ্দেশে পরীক্ষায় পাশ ফেল বেশী হয়, এই যে ধারণা, ইহাকেই ভিত্তি করিয়া ফরোআর্ড যদুবাবুকে আক্রমণ করিয়াছিল। চাঁইয়েরা ইহার দ্বারা যে নিজেদের দেবতাকেই অপদস্থ করিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারে নাই। আগেকার কর্ত্তার আমলে পরীক্ষায় খুব বেশী পাশ তাঁহার আদেশে হইত বলিয়াই, এখন এই মিথ্যা কথা রটান হইয়াছিল, যে, যদুবাবুর আদেশে ফেল বেশী হইতেছে। সত্য কথা কিন্তু এই, যে, যদুবাবুর এ বিষয়ে কোনই আদেশ ছিল না, থাকিতে পারে না, এবং মোটের উপর ফেলও বেশী হয় নাই। যদুবাবুর নিয়োগে অনেকের চাঁইগিরি গিয়াছে, এবং তাহাদের আশ্রিত অনেকের "উপরি পাওনা"ও গিয়াছে; আক্রোশের ইহা অন্যতম কারণ।

১৩৩৪ ফাল্গুন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্‌ভোকেশ্যন্

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্‌ভোকেশ্যান্ সভায় ভাইস্- চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত অভিভাষণটি সুচিন্তিত ও সুন্দর হইয়াছিল। তাঁহার উক্তির অনেক কদর্থ করিবার চেষ্টা হইবে জানি। কিন্তু তিনি ছাত্রদিগকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য কথা। তিনি বলিয়াছেন :—

It is a common place truth of economics that the employment of immature lads in factories is not only harmful to their health but also hinders the growth of a class of efficient adult labourers. Similarly, the youth who prematurely leaves his studies or practical training incomplete, in response to the noble instinct of patriotism, is sure to realise in his hours of calm reflection that he is really showing irreverence to our Great Mother by laying before her shrine the cheap and useless offering of an undeveloped body, an immature mind, a hazily learnt art or craft, an undisciplined will. He will realise with regret, after his life's opportunities are gone for ever, that it requires a higher type of patriotism to possess his soul in patience, to resist with unshaken firmness all distractions and temptations during the period of his education, and to thoroughly master his own special subject, so that he may supply the nation with an expert workman and supreme teacher, — which is its greatest need.

ইহাতে তিনি বলেন নাই, যে, ছাত্রদিগকে সর্ব্বদা ঘরে ঘাড় গুঁজিয়া বসিয়াই থাকিতে হইবে, সার্ব্বজনিক কোন কাজের সঙ্গে তাহাদের কোন যোগ থাকিবে না।

আমরা বরাবর বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্ব্বাচন প্রথার বহুল প্রচলনের পক্ষপাতী, আজ নূতন করিয়া নহে; ভাইস্-চ্যান্সেলার যদুনাথ সরকার মহাশয়ও তাই। তিনি হৃদয়মনের আভিজাত্যের যেমন প্রশংসা করিয়াছেন, প্রকৃত গণতান্ত্রিকতারও তেমনি প্রশংসা করিয়াছেন। যথা—

The original investigation of truth, the discovery of the secrets of Nature, the opening of new paths for the march of the human mind, — this is the work, not of the multitude but of a select few. Such leaders of thought and discoverers of science must ever be a small minority; they form what the Greeks called an aristocracy, i.e., a body of the best men in intellectual power and strength of character. While an aristocracy of birth hardens and narrows down to an exclusive caste in a few generations, an aristocracy in the ancient Greek sense of the word is the supreme need of every people that wishes to live and advance in the world.

—

১৩৩৪ চৈত্র

বঙ্গের লাটের হুমকী

ফাল্গুনের "প্রবাসীর" বিবিধ প্রসঙ্গ লিখিত হইবার পর, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত উপাধিদান সভায় তাহার চ্যান্সেলার বঙ্গের লাটের বক্তৃতা পড়িবার অবসর পাইয়াছিলাম। সেজন্য গত মাসে এবিষয়ে প্রবাসীতে কিছু লিখিতে পারি নাই। কিন্তু তাঁহার হুমকী সম্বন্ধে শীঘ্র কিছু বলা আবশ্যক মনে হওয়ায় ফাল্গুনের "শনিবারের চিঠি"তে আমার মত ব্যক্ত করিয়াছিলাম। তাহা নীচে উদ্ধৃত করিতেছি।—

"নেশা জিনিষটা খারাপ, নেশা-খোর ছাড়া আর সবাই এবিষয়ে একমত। কিন্তু ন্যায়পরায়ণ ব্রিটিশ জাতির একটা প্রবাদ-বাক্য অনুসারে শয়তানকেও তাহার ন্যায্য পাওনা দেওয়া উচিত। সেই কারণে ব্রিটিশ-প্রজা আমরা নেশারও একটা গুণ কীর্ত্তন করিতে বাধ্য। মানুষ যখন নেশার অধীন হইয়া পড়ে, তখন সত্য কথা গোপন করিতে পারে না; তাহা বাহির হইয়া পড়ে।

"প্রভুত্বের অহঙ্কার এক-রকম নেশা। তাহার উপর যদি ক্রোধও কাহাকেও পাইয়া বসে, তাহা হইলে সে মানুষ খুব কুটরাজনীতি-বিশারদ হইলেও সত্য কথা গোপন করিতে পারে না।

"আমাদের লাট সাহের সেই কারণে সর্ব্বজন-অনুমিত একটা সত্য কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন। হরতাল হওয়ায়, অনেক ছেলে তাহাতে যোগ দেওয়ায়, এবং কেহ কেহ কন্‌ভোকেশ্যনের সময় "শেম্ শেম্" বলায় তাঁহার ব্রিটিশ-সুলভ অহঙ্কারে আঘাত লাগিয়াছে। তাই তিনি রাগিয়া কন্‌ভোকেশ্যনের বক্তৃতায় বলিয়াছেন, যে, গবর্ম্মেণ্টকে হয়ত উচ্চশিক্ষার জন্য বরাদ্দি টাকাটা অন্য কাজে দিতে হইবে। 'সংস্কৃত' ভারত-শাসন-প্রণালী অনুসারে শিক্ষাটা একটা হস্তান্তরিত বিষয়। তাহার ভার থাকে শিক্ষামন্ত্রীর উপর। শিক্ষার জন্য মোট কত টাকা বরাদ্দ হয়, তাহা শিক্ষামন্ত্রী ভিন্ন ভিন্ন রকমের শিক্ষার জন্য বাঁটিয়া দেন। বজেটটা এই রকমে হয়। তার পর ব্যবস্থাপক সভা তাহার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বকম শিক্ষার জন্য কিছু চালাচালি, কমবেশী করিয়া দিতে পারেন। আইন অনুসারে কার্য্যপদ্ধতি এই রকম। ইহার মধ্যে ত লাট সাহেবের **প্রকাশ্য** কোন হাত দেখা যাইতেছে না। কিন্তু ক্রোধভরে তিনি যে ধমক দিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যাইতেছে, যে, মন্ত্রীটন্ত্রী কিছুই নয়, তিনিই সর্ব্বেসর্ব্বা, এবং ব্যবস্থাপক সভাটাও একটা লোক-দেখান ব্যাপার মাত্র।

"লাটসাহেব যে ধমক দিয়াছেন, তাহা কি উভয় মন্ত্রীর বা অন্ততঃ পক্ষে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তাঁহাদের সম্মতিক্রমে দিয়াছেন? যদি তাহাই সত্য হয়, তাহা হইলে উভয় মন্ত্রী বা শিক্ষামন্ত্রী সর্ব্বসাধারণকে তাহা জানান। আর যদি কেবল লাটসাহেবই তাঁহার উক্তির জন্য দায়ী হন, তাহা হইলে তাহাতে কি মন্ত্রীদের ও ব্যবস্থাপক সভার তদ্দারা অপমান করা হয় নাই? অন্য কোন কোন প্রদেশের কোন কোন মন্ত্রী কোন কোন কারণে প্রতিবাদ ও পদত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের বাঙালী মন্ত্রীদের দৃঢ়তা, কর্ত্তব্যানুরাগ ও অধ্যবসায় অতুলনীয়; তাঁহাদিগকে তাড়াইয়া না দিলে তাঁহারা নড়েন না!

"কয়জন ছাত্র কি করিয়াছে, তাহার জন্য লাটসাহেব একেবারে উচ্চশিক্ষাটাই তুলিয়া দিবেন! একটা গাঁয়ে বা সহরে কিছু নিয়মভঙ্গ হইলে

বেড়া-আগুনে সমস্ত গাঁ বা সহর পুড়াইয়া ফেলাই তাঁহার মতে প্রকৃত প্রতিকার! ছাত্রদের প্রকৃত দোষের চুণকাম করিবার ইচ্ছা আমাদের মোটেই নাই। কিন্তু কর্তাদের নিজের যে-সব দোষ আছে, তার জন্য পুলিশ-বিভাগটা, আই-ই-এস্ চাক্‌রীগুলা, প্রভৃতি সব কি উঠাইয়া দেওয়া হইবে?

"লাটসাহেব কেম্বিজের ছাত্র। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ও বিলাতের অন্য অনেক জায়গায় ছাত্ররা যে র‍্যাগ্ করে, সেটা কি লাটসাহেবের মনে ছিল না? বিলাতী বা দেশী ছাত্রদের দোষ দোষ নয়, বলিতেছি না; কিন্তু 'মাকড় মারিলে ধোকড় হয়',—ব্যবস্থাটা ঠিক্ নয়। কয়েক বৎসর আগে কেম্ব্রিজের ছেলেরা নিউন্‌হাম কলেজের প্রসিদ্ধ সুন্দর সিংহদ্বারটা ধ্বংস করিয়া ফেলে। তাহাতে কি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকারী সাহায্য বন্ধ হইয়া গিয়াছিল? অধ্যাপকদের অনেক দুর্দ্দশাও অনেকবার ছাত্রেরা করিয়াছে। তাহাতেও ত সেরূপ কোন দণ্ড হয় নাই। আমাদের যে ছাত্রের যে দোষ প্রকাশ্য বিচারে প্রমাণ হইবে, তাহার শাস্তি হউক। কিন্তু তাহার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ নির্বুদ্ধিতা ও দর্প ভিন্ন আর কিছু নয়।

" 'ডারুইন সাহেব কেম্ব্রিজের ছাত্র ছিলেন। সেই কারণে ডারুইনের স্বজাতি তথাকার এবং সমবিশ্বাসী অন্য বিলাতী ছাত্রেরা কন্‌ভোকেস্যন-আদি সভায় বিড়াল কুকুর ভেড়ার ডাক ডাকিবার এবং মর্কটোচিত তামাসা করিবার অধিকারী। বঙ্গদেশের ছাত্রেরা সনাতন আর্য্যসন্তান। ডারুইনের মতবাদ তাহাদের অস্থিমজ্জাগত হয় নাই। সুতরাং ব্রিটিশ ছাত্রেরা যাহা করে, বাঙালী ছাত্রদের তাহা কপ্‌চান উচিত নহে।' লাট সাহেবের ধারণা সম্ভবতঃ এইরূপ। এবং তজ্জন্য বিলাতে যাহা মার্জ্জনীয়, এদেশে তাহা তিনি মার্জ্জনীয় মনে করেন না।

"আমরা ইহা যুক্তিসঙ্গত মনে করি।"

১৩৩৮ আষাঢ়

সংস্কৃত ও সংস্কৃত কলেজ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের সংস্কৃতশিক্ষা তাহাদের স্বেচ্ছাধীন করিতে চাহিতেছেন! কি কারণে জানি না, এমনই সংস্কৃত শিখিবার ইচ্ছা ছাত্রদের কমিয়াছে বোধ হয়। তাহার উপর ঐরূপ নিয়ম করিলে সংস্কৃত শিখিবার ছাত্র আরও কমিবে। সংস্কৃতের প্রতি বিরাগের জন্য বা অন্য কি কারণে জানি না, সংস্কৃত কলেজে ছাত্র কমিয়াছে। উহার ইংরেজী বিভাগে ১৯২৮-২৯ সালে ১২৩ জন ছাত্র ছিল, ১৯২৯-৩০ সালে কমিয়া ১০০ হয়। ১৯৩০-৩১এ শুনিয়াছি ৭৮ জন হইয়াছে। সংস্কৃত বিভাগে ১৯২৯-৩০ সালে ৮৭ জন ছাত্র ছিল, এখন কত জানি না। এই কলেজের ইংরেজী বিভাগে ছাত্রবেতন মাসিক ৬ টাকা মাত্র। তাহাও সকলকে দিতে হয় না। "ব্রাহ্মণপণ্ডিত" দিগের পুত্রেরা মাত্র দুটাকা বেতন দিলেই পড়িতে পান। ষাটজনের জন্য এইরূপ কম বেতনের ব্যবস্থা আছে। তদ্ভিন্ন মাসিক ১০, ১৬, ২০, ও ৩০

টাকার কয়েকটি বৃত্তি আছে। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ও অধ্যাপকেরা যোগ্য লোক। দর্শন ও ইতিহাসের "অনার্স" ছাত্রেরা অতিরিক্ত বেতন না দিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে ঐ দুই বিষয়ে ব্যাখ্যান শুনিতে পারে। অনেক ছাত্রকে কোন-না-কোন কলেজে ভর্ত্তি হইতে ক্লেশ পাইতে হয়। তাহারা অন্যান্য "সস্তা" কলেজের সঙ্গে সঙ্গে এই কলেজটিতেও সন্ধান লইলে ভাল হয়।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় সংস্কৃত

বর্ত্তমান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করিবার জন্য সকল ছাত্র-ছাত্রীকেই সংস্কৃত, ফার্সী, আর্বী বা এইরূপ কোন ভাষা শিখিতে হয়। সম্প্রতি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পাঠ্য বিষয়ে যে পুনর্বিচার চলিতেছে, তাহাতে প্রস্তাব করা হইয়াছে, যে, ভবিষ্যতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাস করিতে হইলে সংস্কৃত বা অন্য কোন 'ক্লাসিকাল' ভাষা শিখিবার কোনও বাধ্যবাধকতা থাকিবে না। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পাস করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ যে-যে বিষয়গুলি সকল ছাত্রকেই গ্রহণ করিতে হইবে বলিয়া প্রস্তাব করিয়াছেন, সেগুলি নিম্নলিখিত রূপ :—

বিষয়			নম্বর
ভার্ণাকুলার	২	প্রশ্নপত্র	২০০
ইংরেজী	২	"	৩০০
গণিত	১	"	১০০
ইতিহাস (ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের)	১	"	১০০
ভূগোল	১	"	১০০

সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে, প্রস্তাবিত ব্যবস্থা অনুমোদিত হইলে ছাত্রদিগকে আর বাধ্য হইয়া সংস্কৃত বা ঐরূপ কোন প্রাচীন ভাষা শিখিতে হইবে না। আমরা ইহা সমীচীন মনে করি না। কেন করি না, তাহা আপাততঃ অন্য কোন ভাষার প্রসঙ্গ না তুলিয়া কেবল মাত্র সংস্কৃতের ক্ষেত্রেই আলোচনা করিব।

বিশ্ববিদ্যালয় কি ধারণার বশে সংস্কৃতকে আবশ্যিক না রাখিয়া স্বেচ্ছাধীন করিতে চাহিতেছেন তাহা আমরা জানি না। কিন্তু আমরা কিছুতেই উহার অনুমোদন করিতে পারি না। আমাদের মনে হয়, প্রত্যেক বাঙালী বালক-বালিকারই সংস্কৃত শিক্ষা করা উচিত। যদি বাংলার মুসলমানদের সংস্কৃত শিখিতে কোন আপত্তি থাকে, তাহা হইলে বাংলার সমস্ত হিন্দু বালক-বালিকার সংস্কৃত শেখা উচিত। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, মুসলমানদের পক্ষেও সংস্কৃত জানার প্রয়োজন আছে। সংস্কৃতের সহিত ভারতবর্ষের অন্য কোন আধুনিক ভাষা অপেক্ষা বাংলা ভাষার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর এবং বাংলা ভাষা সংস্কৃতের উপর বেশী নির্ভরশীল। ইহা বাংলা ভাষার দৈন্য বা দুর্ব্বলতা বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু দৈন্যই হউক বা দুর্ব্বলতাই হউক, উহা যে সত্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, এবং সত্য বলিয়াই অন্ততঃ কিছু পরিমাণ সংস্কৃত না জানিলে শুদ্ধ ভাবে বাংলা লেখা সম্ভবপর নয়। গত এক শত বৎসরের সাহিত্যচর্চ্চার ফলে বাংলা ভাষা নানা দিকে সমৃদ্ধ হইয়াছে সত্য, কিন্তু এখনও তাহার কতকগুলি বিষয়ে একটু দৈন্য আছে। এই

দৈন্য দূর করিতে নূতন শব্দের সৃষ্টি ও চয়ন আবশ্যক। বর্ত্তমানে এই সকল শব্দই সংস্কৃত হইতে গৃহীত হয়। বাংলা দেশে সংস্কৃতের চর্চ্চা ও জ্ঞান লোপ হইলে বাংলা ভাষার পুষ্টিসাধনের ও বিকাশের প্রধান উৎসটিই শুকাইয়া যাইবে।

ইহা ছাড়া বাংলা দেশের কালচার বা সংস্কৃতির দিক হইতেও সংস্কৃত জানা ও শিক্ষার প্রয়োজন আছে। একমাত্র অসভ্য বর্ব্বর জাতিদেরই সভ্যতার কোন অতীত নাই। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সভ্যতা প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক সাধনার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই প্রাচীন সভ্যতার পরিচয় আমরা আংশিকভাবে পাই পালি সাহিত্যে, কিন্তু প্রধানতঃ সংস্কৃত সাহিত্যে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত শিক্ষার বাধ্যবাধকতা না থাকিলে এই সভ্যতার সহিত বর্ত্তমান যুগের যোগমূল বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এই দিক হইতে সংস্কৃত ভাষার কি মূল্য তাহা বিচার করা কোন চৌদ্দ পনর বৎসর বয়স্ক বালকের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং একটা নূতন ভাষা শিক্ষা করা পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপার বলিয়া যদি সে বাল্যকালে সংস্কৃত না শেখে তাহা হইলে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সে যখন বুঝিতে পারিবে ইহাতে তাহার কি ক্ষতি হইল, তখন আর তাহার পক্ষে সেই ক্ষতির প্রতিকার করা সম্ভব হইবে না। সেই জন্য আমাদের মনে হয়, শিখিবার বয়সের সকল ছাত্রকে মোটামুটি সংস্কৃত ভাষা শেখানো উচিত যাহাতে সে ভবিষ্যৎ জীবনে ইচ্ছা করিলে সংস্কৃতের গভীরতর চর্চ্চা করিতে পারে এবং যাহাতে সেই সংস্কৃত চর্চ্চার পথ আগে হইতেই বন্ধ হইয়া না যায়।

কেহ কেহ হয়ত বলিবেন যে, ব্যবহারিক জীবনের দিক হইতে সংস্কৃতের কোন মূল্য নাই। কিন্তু স্কুলে যে-সকল জিনিষ শিক্ষা দেওয়া হয় তাহার কতগুলিরই বা ব্যবহারিক মূল্য আছে? বীজগণিত সকল স্কুলের ছাত্রকেই পড়িতে হয়। ব্যবহারিক জীবনে উহারই বা কি মূল্য আছে? কিন্তু শিক্ষাসমস্যার মধ্যে শুধু জীবিকা অর্জ্জনের আদর্শকেই বড় করিয়া ধরিলে চলিবে না। বুদ্ধি মার্জ্জিত করা, মনের প্রসারসাধন করা, নিষ্কাম জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মানোও শিক্ষার কাজ। এই কথাটা ভুলিয়া গেলে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয় সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, বাংলা ভাষার চর্চ্চা যাঁহারা করেন তাঁহাদের পক্ষে সংস্কৃত জানা নিতান্তই প্রয়োজন। বাংলা যাহাদের মাতৃভাষা তাহাদিগকে যদি সংস্কৃত শিখিতে না দেওয়া হয় তাহা হইলে উহার ফল অত্যন্ত বিষম হইবে।

আমরা এই মতের সম্পূর্ণ সমর্থন করি, এবং বিজ্ঞান শিক্ষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছেন তাহারও অনুমোদন করি। আমাদেরও এই মত, যে, ম্যাট্রিকুলেশনের পাঠ্যতালিকার মধ্যে সংস্কৃত ও প্রাথমিক বিজ্ঞান আবশ্যিক হওয়া উচিত। তাহা হইলে অতীত ও ভবিষ্যৎ, কাহারও সহিতই আমাদের কোন বিরোধ হইবে না।

১৩৪১ ফাল্গুন

দেশ-বিদেশের কথা

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ শতবার্ষিকী

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ শতবার্ষিকীও সম্প্রতি হইয়া গিয়াছে। ইহা লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের আমলে ১৮৩৫, ২৮এ জানুয়ারী প্রতিষ্ঠিত হয়। শতবার্ষিকীর স্মৃতিরক্ষার জন্য মেডিক্যাল কলেজের হাসপাতালেব একটি নূতন ওয়ার্ড নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে চিকিৎসার যন্ত্রপাতি, ঔষধপত্র প্রভৃতিরও একটি প্রদর্শনী হইয়াছিল।

১৩৪৬ অগ্রহায়ণ

লেডী বসুর প্রেসিডেন্সী কলেজকে দানের প্রস্তাব প্রত্যাহার

সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, লেডী অবলা বসু প্রেসিডেন্সী কলেজে উদ্ভিদবিজ্ঞানের গবেষণা বৃত্তি- স্থাপনের নিমিত্ত যে পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করিতে চাহিয়াছিলেন, সেই প্রস্তাব তিনি প্রত্যাহার করিয়াছেন। প্রত্যাহারের কারণ এইরূপ অনুমিত হইয়াছে যে, তাঁহার দানের এই সর্ত্ত ছিল যে, বৃত্তি বাঙালী হিন্দু ছাত্রেরাই পাইতে অধিকারী হইবে, এবং বাংলা সরকার এই সর্ত্তে দান গ্রহণ করিতে রাজী হন নাই। এ বিষয়ে আমাদের কিছু বক্তব্য গত সংখ্যাতেই বলিয়াছি। কোন দাতা যদি বিশেষ কোন সম্প্রদায়ে শিক্ষার বা গবেষণার উৎসাহ দিতে চান, তাহা হইলে তাহা করিবার তাঁহার ন্যায্য অধিকার আছে। ধার্ম্মিক মোহম্মদ মোহশিনের প্রদত্ত সম্পত্তি হইতে যে কেবল মুসলমানেরাই বৃত্তি পায়, তাহাতে হিন্দুরা কোন আপত্তি করে না—আপত্তি করিলে তাহা অন্যায় হইত।

লেডী বসুর প্রেসিডেন্সী কলেজকে দান যদি কৃতজ্ঞ চিত্তে বাংলা সরকার কর্ত্তৃক গৃহীত হইত, তাহা হইলে তাহা সুশোভন হইত। কারণ আচার্য্য বসু মহাশয় তাঁহার অধ্যাপকজীবনের প্রথম দিন হইতে শেষ দিন পর্য্যন্ত—পেন্সান লইবার পরেও—প্রেসিডেন্সী কলেজের সহিত যুক্ত ছিলেন।

যাহা হউক, লেডী বসু অন্য প্রকারে উদ্ভিদবিজ্ঞানের গবেষণায় উৎসাহ দিতে পারিবেন। কোন সাম্প্রদায়িকতাগ্রস্ত মন্ত্রিমণ্ডল তাহাতে বাধা দিতে পারিবে না।

১৩৪৭ চৈত্র

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবারকার সমাবর্তনে ডাঃ সর্ নীলরতন সরকার মহাশয়কে সম্মানসূচক ডক্টর অব্ সায়েন্স উপাধি দেওয়া হয়, যাহা পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে তাঁহাকে দেওয়া যাইতে পারিত, এবং বোম্বাইয়ের ডাক্তার রাঘবেন্দ্র রাও মহাশয়কেও ঐ উপাধি দেওয়া হয়। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহাশয়কে কমলা স্বর্ণপদকভূষিত করা হয়।

এবারকার প্রধান বিশেষত্ব সর্ তেজবাহাদুর সপ্রুর মত বিদ্বান ও বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞকে সমাবর্তনের অভিভাষণ দিতে আমন্ত্রণ। তিনি তাঁহার সুগ্রথিত অভিভাষণটির গোড়ার দিকে বলেন :—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়। ৫০ বৎসরেরও অধিক কাল পূর্ব্বে আমি যখন আগ্রায় অধ্যয়ন করিতেছিলাম তখন দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে এক নূতন স্পন্দন অনুভূত হইয়াছিল। জাতীয় জীবনে এই নূতন চিন্তা-প্রবাহের কেন্দ্র ও উৎস ছিল কলিকাতা। আমি এই চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলাম। আমার অধ্যাপকদের মধ্যে কয়েক জন বাঙ্গালী ছিলেন। বস্তুতঃ একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তৎকালে বাঙ্গালীরা কেবলমাত্র যুক্তপ্রদেশের চিন্তাজগতে রূপান্তরই আনয়ন করেন নাই ঐ ক্ষেত্রে তাঁহারা অপ্রতিহত আধিপত্যও বিস্তার করিয়াছিলেন। আমার নিজ প্রদেশের যুবকগণ তখন রাজা রামমোহন রায় ও কেশবচন্দ্র সেনের দৃষ্টান্ত হইতে সমাজ সংস্কারের প্রেরণা লাভ করিত। তাহা ছাড়া সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, লালমোহন ঘোষ, আনন্দমোহন বসু ও কালীচরণ ব্যানার্জির অপূর্ব্ব বাগ্মিতা তাঁহাদের মধ্যে এক বিপুল রাজনৈতিক উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়াছিল। ১৮৮৭ সনে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পর বাঙ্গলা ও যুক্তপ্রদেশের এই যোগসূত্রে বাহ্যতঃ এক বিচ্ছেদের সূচনা হইলেও কলিকাতার প্রভাব যুক্তপ্রদেশের উপর অনেক দিন পর্য্যন্ত সমভাবেই বিদ্যমান ছিল। বর্ত্তমানে যুক্তপ্রদেশে ৫টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার মধ্যে অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়েই অনেক বাঙ্গালী অধ্যাপক আছেন। কৃতী বাঙ্গালী অধ্যাপক, বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক, বিচারক, আইনজীবী, সাংবাদিক, ভাইসচ্যান্সেলার ও রাজনীতিজ্ঞদের প্রতি যুক্তপ্রদেশের সর্ব্বত্র বিশেষ শ্রদ্ধা পোষণ করা হয়। ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে বাঙ্গালীদের ন্যায় আমরাও গৌরব অনুভব করি। দুর্ভাগ্যবশতঃ রবীন্দ্রনাথের মূল কবিতাগুলির ভাষার মাধুর্য্য উপলব্ধি হইতে আমরা বঞ্চিত থাকিলেও তাঁহার কাব্যের অপূর্ব্ব ভাব-সম্পদের সহিত আমরা অপরিচিত নহি। অবশ্য আমাদের কোন ঐতিহ্য ছিল না একথা আমি বলি না। একথা সত্য যে দুইটি সংস্কৃতির ধারা সম্মিলিত হইয়া যুক্তপ্রদেশের নিজস্ব সংস্কৃতির উন্নযনে সহায়তা করিযাছিল। ইহার মধ্যে একটির কেন্দ্র ছিল কাশী এবং অপরটির কেন্দ্র ছিল দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ। কিন্তু ইহাও আমি নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করি যে বাঙ্গালার নিকট আমাদের ঋণ কম নয় এবং ইহা নিশ্চিত যে অন্য কোন প্রদেশ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে বাঙ্গালার নিকট আমাদের ঋণই সমধিক।

১৩১৮ ফাল্গুন

ঢাকায় নূতন বিশ্ববিদ্যালয়

ইংরাজ ও অন্যান্য স্বাধীন জাতি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে কতকগুলি অধিকার নিজ পৌরুষ দ্বারা অর্জ্জন করিয়াছেন। সুতরাং কোন রাজপুরুষ সেই অধিকার লোপ করিতে চেষ্টা করেন না, করিলে ঐ সকল জাতি জোরের সহিত কৈফিয়ৎ চান ও পান। আমরা তদ্রূপ কোন অধিকার অর্জ্জন করি নাই। সেরূপ অধিকার আমাদিগকে কেহ দেয়ও নাই। সুতরাং রাষ্ট্রীয় মূল নিয়ম (Constitution) ভঙ্গ হইল বলিয়া আমরা কিছু বলিতে পারি না। কিন্তু কিরূপ হইলে ভাল হইত তাহা অবশ্য আমরা বলিতে পারি;—তাহা কেহ শুনুক বা না শুনুক। আমাদের এই কথাগুলির মধ্যে বিন্দুমাত্রও বীররস নাই, কথাগুলি মোটেই গরম নয়, বড় ঠাণ্ডা। কিন্তু শূন্যগর্ভ চীৎকারে ও আস্ফালনে যে বড় লজ্জা বোধ হয়।

রাজধানী দিল্লীতে লইয়া যাওয়া হইল। অথচ আমাদের সুবিধা অসুবিধার কথা কেহ জিজ্ঞাসাও করিল না। আমাদের বিশ্বাস যে বাজধানী স্থানান্তরিত করার কোন প্রয়োজন ছিল না। উহাতে অকারণ বহুকোটি অর্থের অপব্যয় হইবে মাত্র। তবে, মানুষের ভালমন্দ সব কাজ হইতেই বিধাতা শুভফল উৎপাদন করেন। সে হিসাবে দিল্লীতে রাজধানী যাওয়ায় ভবিষ্যতে মঙ্গল হইতেও পারে। যাহা হউক, সেটা আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয় নহে। আমরা কেবল বলিতেছিলাম এই যে দেশবাসীদের মতামতকে মোটেই আমল না দিয়া, তাহা জানিবার চেষ্টা না করিয়া, রাষ্ট্রীয় কোন কাজ করা ভাল নয়। বড়লাটের এই ভাবের আর একটি কাজ দেশবাসীর চিত্তকে আন্দোলিত ও বিক্ষুব্ধ করিতেছে। তাহা পূর্ব্ববঙ্গের জন্য এক স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ও একজন স্বতন্ত্র শিক্ষাকর্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োগের প্রস্তাব। এই দুটি জিনিষ পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু বা মুসলমান কোন সম্প্রদায় প্রার্থনা করে নাই, এবং এ পর্য্যন্ত উক্ত দুই সম্প্রদায়ের মত যতটা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে কোন সম্প্রদায়ই একযোগে বা অধিকাংশের মতে এই দুটি কল্যাণকর মনে করে নাই। বড়লাট তাঁহার প্রস্তাবিত এই দুটি কাজ সম্বন্ধে দেশের কাহারও মত জানিতে চান নাই; এমন কি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতও চান নাই। এইরূপভাবে কেবল নিজের মত অনুসারে কাজ করা সুসভ্য দেশসকলের উন্নতশাসন-প্রণালীর অনুমোদিত রীতি নহে।

দিল্লীতে রাজধানী সরাইয়া লইবার যেসকল কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং উহার যেসকল সুফলের সম্ভাবনা সরকারী কাগজপত্রে দেখান হইয়াছে, তন্মধ্যে একটি এই যে বড়লাট নিজের জন্য দিল্লীর চারিপার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র প্রদেশ গড়িয়া লইবেন, প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদিগকে তাঁহাদের প্রদেশগুলির আভ্যন্তরীণ ব্যাপারসমূহে স্বাতন্ত্র্য দিবেন, কেবল কুশাসন ও অত্যাচার হইলে তিনি বাধা দিবেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে—মিলিতবঙ্গ একজন সকৌন্সিল গবর্ণরের দ্বারা শাসিত হইতে আর দুইমাসও বাকী নাই; ১লা এপ্রিল হইতে লর্ড কারমাইকেল বঙ্গদেশ শাসন করিবেন; তিনি আসিতে না আসিতে বঙ্গদেশে একটি অতিরিক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও একটি অতিরিক্ত শিক্ষাবিভাগ স্থাপনরূপ গুরুতর কাজ দুইটি করিয়া ফেলায় তাঁহার প্রতি অবিচার করা হইতেছে না কি? এ কিরূপ স্বাতন্ত্র্য (autonomy)? শিক্ষাকার্য্যের ব্যয় এই যে

দ্বিগুণিত করা হইবে, ইহাতে যদি অসুবিধা হয়, তবে সে অসুবিধাও তাঁহাকেই ভোগ করিতে হইবে? ইহাতে যদি কোন কারণে দেশে অসন্তোষ ও অশান্তি হয়, তবে তাহা নিবারণ ত তাঁহাকেই করিতে হইবে? এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে আর একটি কথাও বলা প্রয়োজন। কাগজে দেখা যাইতেছে যে তাঁহার মন্ত্রিসভার সভ্যও এখন হইতে নিযুক্ত হইয়া যাইতেছেন। তন্মধ্যে একজন পূর্ব্ববঙ্গের শক্ত শাসনের ভক্ত ও অন্যতম প্রবর্ত্তক, একজন কলিকাতার বক্‌রীদ দাঙ্গার সময় এক সম্প্রদায়ের লোকের বিরাগভাজন হইয়াছেন এবং একজন হিন্দু-মুসলমানের দলাদলিতে বিশেষভাবে কোন এক পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। যাঁহাদের সহযোগিতায় ও সাহায্যে বঙ্গদেশ শাসনের এক নূতন পালা আরম্ভ করিতে হইবে,তাঁহাদের নির্ব্বাচন সম্বন্ধে লর্ড কারমাইকেলকে কিছু বলিবার সুযোগ পর্য্যন্ত না দেওয়া কিরূপ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন (Provincial autonomy) তাহা আমরা বুঝিতে অসমর্থ।

তাহার পর ব্যয়ের দিক্‌টা দেখা যাক। বঙ্গ বিভাগের পূর্ব্বে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যা ছোটনাগপুর এই চারি প্রদেশের জন্য একজন শিক্ষাকর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন। বঙ্গ বিভাগের পর (আসাম সহিত লইয়া) দুই জন হইয়াছিলেন। এখন প্রদেশগুলির নূতন ব্যবস্থায় বঙ্গের জন্য দুই, বিহার উড়িষ্যা ছোটনাগপুরের জন্য এক, এবং আসামের জন্য এক, এই চারিজন উচ্চবেতনভোগী শিক্ষাকর্ম্মচারী নিযুক্ত হইবেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের একটা করিয়া নূতন আফিসও হইবে। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবরের পূর্ব্বে একজন শিক্ষাকর্ম্মাধ্যক্ষ বঙ্গ বিহার উড়িষ্যা ছোটনাগপুর এই চারি প্রদেশের শিক্ষাকার্য্য কলিকাতায় বসিয়া চালাইতেন। এখন সেই কর্ম্মচারীও কলিকাতায় বসিয়া বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সী মাত্র এই দুটি বিভাগের কাজ করিবেন, এবং আর একজন ঢাকায় বসিয়া ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগের কাজ চালাইবেন। অথচ এই সাতবৎসরে পাঠশালা স্কুল কলেজ ও ছাত্রের সংখ্যা ৩/৪ গুণ বাড়িয়াছে, ইহা কেহই বলিতে পারিবেন না। আমরা বরাবর দেখিয়া আসিতেছি যে প্রজার পক্ষ হইতে শিক্ষার জন্য বেশী অর্থব্যয়ের আবেদন হইলেই রাজপুরুষগণ বলেন, টাকা নাই। এহেন যে অবহেলিত শিক্ষাকার্য্য তাহার জন্যও দেখিতেছি গবর্ণমেণ্ট ব্যয় অনেক বাড়াইতেছেন। এত টাকা কোথা হইতে আসিবে? অনেকে বলিতে পারেন, সম্রাট যে বার্ষিক ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় বাড়াইতে বলিয়াছেন, তাহা হইতেই এই অতিরিক্ত ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে ঐ টাকা হইতে অধিক সংখ্যক ছাত্রের শিক্ষা পাইবার সম্ভাবনা অল্প। উহার অধিকাংশ উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারী ও তাঁহাদের কেরাণী প্রভৃতির বেতনেই খরচ হইবে। গবর্ণমেণ্ট যে শিক্ষার জন্য এত ব্যয় বাড়াইতেছেন, শিক্ষাবিস্তারই যে তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য, তাহা প্রজাবর্গকে প্রমাণসহ বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। যদি শিক্ষাবিস্তারে গবর্ণমেণ্টের এতই উৎসাহ থাকে, তাহা হইলে আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশ ও পূর্ব্ববঙ্গে ছাত্র সংখ্যা এবং কোথাও কোথাও পাঠশালার সংখ্যা কমিয়া গেল কেন? যে দেশে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা এত বেশী, তথায়, ছাত্রসংখ্যা কমিতেছে, অথচ শিক্ষাদানকার্য্যে গবর্ণমেণ্টের উৎসাহ বাড়িয়া চলিতেছে, এই দুইটি ঘটনার ব্যাখ্যার সামঞ্জস্য বিধান করা রাজপুরুষগণের কর্ত্তব্য।

বড় লাটের প্রস্তাব দুটির যথাযথ সমালোচনা করা সম্ভব নহে; কারণ, তিনি, বিশ্ববিদ্যালয়টি কিরূপ হইবে, পূর্ব্ববঙ্গের ছাত্রেরা উহার অধীনস্থ

কলেজস্কুলগুলিতেই পড়িতে বাধ্য হইবে কি না, ইত্যাদি, এবং তথাকার সর্ব্বোচ্চ শিক্ষাকর্ম্মচারী সর্ব্বেসর্ব্বা হইবেন, না, বঙ্গের শিক্ষাকর্ম্মাধ্যক্ষের অধীন হইবেন, এসব বিষয়ে জন-সাধারণকে কিছুই জানান নাই। তথাপি অনুমান করিয়া, এবং সম্ভবতঃ সরকারের তরফ হইতে যেসকল কথা বলা হইতেছে, তাহা অবলম্বন করিয়া কিছু বলা যাইতে পারে।

আমরা প্রথমেই বলিয়া রাখি যে দেশে বহুসংখ্যক শিক্ষাদায়ক বিশ্ববিদ্যালয় হয়, ইহা আমরা অবাঞ্ছনীয় মনে করি না। কিন্তু বর্ত্তমানে যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়টি আছে, তাহার ক্ষতি করিয়া, বা তাহার একান্ত প্রয়োজনীয় অভাব পূর্ণ না করিয়া, বঙ্গদেশে আর একটি বিশ্ববিদ্যালয় হয়, ইহা আমরা চাই না। কারণ দেখিতেছি, অর্থাভাবে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিজের কাজ করিতে পারিতেছেন না। এম্‌-এ পড়াইবার জন্য বেশী কলেজ নাই, অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ও তজ্জন্য যথোচিত ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। এম্, এস্, সি, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত কেবল প্রেসিডেন্সী কলেজে অতি অল্প ছাত্র লওয়া হয়। অথচ প্রবেশিকা পরীক্ষার পর শত শত ছাত্র কলেজগুলির বিজ্ঞানের ক্লাসে ভর্ত্তি হয়; তন্মধ্যে কেবল মুষ্টিমেয় ছাত্র এম্, এস্, সি, হইবার উপযুক্ত, ইহা হইতেই পারে না। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় অর্থাভাবে এম্, এস্‌সির বন্দোবস্ত করিতে পারিতেছেন না। অন্তত ৫০ জন করিয়া ছাত্র যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানমন্দিরে পদার্থবিদ্যা রসায়ন আদি শিখিতে পারে, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া, তবে গবর্ণমেন্ট আর একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিবার প্রস্তাব করিলে শোভা পায়। গবর্ণমেন্টের যদি এতই আর্থিক সচ্ছলতা, তাহা হইলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভাব পূর্ণ হয় না কেন? পূর্ব্ববঙ্গের লোকেই যদি আর একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের টাকা দিতে পারেন, তবে তাঁহারা ঢাকা কলেজে বা অন্য কোন প্রাদেশিক কলেজে হাজার হাজার টাকা দিয়া এম্‌-এ, ও এম্, এস্‌সি, পড়াইবার যথেষ্ট আয়োজন ও বন্দোবস্ত করেন না কেন? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তাহার নামের একটি মোহর খোদাইয়া উহার ছাপ পূর্ব্ববঙ্গের কলেজগুলির গায়ে মরিয়া দিলেই ঐগুলি শ্রেষ্ঠ শিক্ষার স্থান হইয়া উঠিবে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নামের গুণেই দশ বিশটা কলেজ ২/১ মাসে বা বৎসরে গজাইয়া উঠিবে না।

বড়লাট শুভ উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং নূতন শিক্ষাকর্ম্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতে পারেন; কিন্তু বড়লাট ত স্বহস্তে সমুদয় কাজ করিবেন না, সমস্ত বন্দোবস্তও করিবেন না। আইন ভাল হইলেও সুবিচারক জজের অভাবে যেমন অবিচার হয়, এস্থলেও তেমনি পূর্ব্ববঙ্গের কর্ম্মচারীদের প্রকৃতির গুণে বিপরীত ফল ফলিবার সম্ভাবনা। পূর্ব্ববঙ্গের শাসনকার্য্যে ও শিক্ষা-বিভাগে এ পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি দেখা গিয়াছে :—

(১) ইস্কুল কলেজের সংখ্যা বাড়ান অপেক্ষা তাহার সংখ্যা কমাইবার উদ্যোগ। যেমন বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ, সিরাজগঞ্জের একটি ইস্কুল, লৌহজংঘের একটি ইস্কুল, বোলপুরের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, ইত্যাদির সম্বন্ধে রাজকর্ম্ম- চারীদের ব্যবহার।

(২) স্কুল কলেজ ও ছাত্রদের সম্বন্ধে অনাবশ্যক কঠোর শাসন, এবং ছাত্রদিগকে অত্যন্ত অধিক সন্দেহের চক্ষে দেখা।

(৩) ক। বাঙ্গালা ভাষাকে কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন উপভাষায় বিভক্ত করিয়া তাহাতে গ্রন্থ লিখাইবার চেষ্টা।

(৩) খ। পূর্ব্ববঙ্গে যেসকল বহি ছাপান হয় নাই, তাহা যাহাতে পূর্ব্ববঙ্গে পঠিত না হয়, এরূপ উপায় অবলম্বন। এই দুই উপায়ে বঙ্গসাহিত্যকে বিভক্ত করায় উহার ব্যাপ্তি ও শক্তি হ্রাসেব সম্ভাবনা।

(৩) গ। রাজকর্ম্মচারীদের অনুগৃহীত সংবাদ ও মাসিক পত্রের তালিকা প্রকাশ করিয়া প্রকারান্তরে অনেক উৎকৃষ্ট কাগজের প্রচার বন্ধ করিবার চেষ্টা।

(৪) পূর্ব্ববঙ্গে মোটের উপর শিক্ষালয় ও ছাত্রের সংখ্যা হ্রাস।

বড়লাট এরূপ কোন উপায় করিতে পারিবেন কি যাহাতে এইসকল শিক্ষোন্নতি ও শিক্ষাবিস্তারের বিরোধী কার্য্য, ভাব ও লক্ষণ অন্তর্হিত হইয়া তাহার বিপরীত কার্য্য, ভাব ও লক্ষণের আবির্ভাব হয়?

ঢাকায় নূতন বিশ্ববিদ্যালয় হইবার পূর্ব্বেই দেখা যাইতেছে যে কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে ও একটি উৎকৃষ্ট মিশনারী কলেজে পূর্ব্ববঙ্গের ছাত্র ভর্ত্তি করা হয় নাই। শিক্ষালাভ সম্বন্ধে এইরূপে ছাত্রদের স্বাধীনতা লোপ বাঞ্ছনীয় নহে। কিন্তু ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় হইলে এই স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা। কেহ কেহ বলিতেছেন, ইংলণ্ডে স্কটলণ্ডে অনেক বিশ্

আছে; অতএব বঙ্গে কেন হইবে না? কিন্তু ঐ সব দেশে কোন কাউন্টি বা নগরের ছেলে কোন বিশেষ কলেজে পড়িতে পাইবে না, এরূপ নিয়ম আছে কি? আমি যে কলেজটিকে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল মনে করি, সেখানে আমি পড়িব; অন্যে তাহাতে কেন বাধা দিবে? এরূপ বাধা দিলে আমরা যদি মনে করি, যে, পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের যুবকগণের মিশামিশি বন্ধ করা ও পূর্ব্ববঙ্গের যুবকদের পশ্চিমবঙ্গের নেতাদের প্রভাবের মধ্যে আসা নিবারণ করা, রাজপুরুষদের উদ্দেশ্য, তাহা হইলে সেটা কি নিতান্তই অযৌক্তিক বা অন্যায় হয়?

ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সপক্ষে কয়েকটি প্রধান যুক্তি পরীক্ষা করা দরকার।

কলিকাতার প্রবেশিকা পরীক্ষায় এবার বোধ হয় ৯০০০ ছাত্র উপস্থিত হইবে। এত ছাত্রের পরীক্ষা করিতে গেলে প্রত্যেক বিষয়ে অনেক পরীক্ষকেব প্রয়োজন। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষকের যোগ্যতার মাপকাঠি ভিন্ন হওয়ায় সকল ছাত্রের পরীক্ষা একভাবে হয় না। সমান যোগ্যতা বিশিষ্ট দুই জন ছাত্র ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষকের হাতে পড়িয়া, কেহ পাশ কেহ ফেল হয়। ইহা হইতে পারে এবং কখন কখন হয়। কিন্তু ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় করিলেও ইহার প্রতিকার হইবে না। কারণ সেখানেও প্রায় ৩০০০ প্রবেশিকা-পরীক্ষার্থী হইবে। তজ্জন্য প্রত্যেক বিষয়ে অন্যূন চারি জন পরীক্ষক নিযুক্ত হইবেন। তাঁহাদেবও মাপকাঠি ভিন্ন ভিন্ন হইবে। বাস্তবিক একই পরীক্ষক দিনের পর দিন হয় বেশী কড়া বা কম কড়া হন, ইহা আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকের কার্য্য করিয়া অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি। তবে একজনের হাতে মাপকাঠি কতকটা ঠিক্ থাকে বটে। অতএব, আলোচ্য দোষের পরিহার হইতে পারে কেবল এক উপায়ে;—এতগুলি স্থাপন যাহাতে কোন পরীক্ষায় ৭/৮ শত অপেক্ষা বেশী ছাত্র উপস্থিত না হয়; কারণ তাহা হইলে প্রত্যেক বিষয়ে কেবল একজন পরীক্ষকই যথেষ্ট হইবে।

আমরা ১১ বৎসর ধরিয়া এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য দেখিয়াছি। তথায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কলিকাতা অপেক্ষা অনেক কম। তথাপি পরীক্ষাকার্য্যে তথায় কলিকাতার মতও সমমান রক্ষিত হয় না। পরীক্ষার্থী কম হইলেই পরীক্ষা ভাল হইবে, ইহা মনে করা ভুল।

কলিকাতাতেই যখন দেড় হাজার দুই হাজার প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী হইত, এখন তদপেক্ষা পরীক্ষা কার্য্য অধিক সন্তোষজনকরূপে নির্ব্বাহিত হয়।

কলিকাতার নৈতিক হাওয়া ভাল নয়, অতএব ছাত্রদের অন্য স্থানে যাওয়া ভাল। যাঁহারা ছাত্রদিগকে বেশ্যাকলুষিত থিয়েটারে যাইতে বাধা দেন না, কিন্তু কংগ্রেস্ দেখিলে শাস্তি দেন, তাঁহাদের মুখে এ কথা শোভা পায় না। যাহা হউক, কলিকাতা অপেক্ষা ঢাকার নীতি ভাল ইহার প্রমাণ আবশ্যক। এবং কলিকাতার ছাত্রাবাসগুলি পরিদর্শনের ও তৎসমুদয় সুনিয়মের অধীন করিবার চেষ্টা করিলে অনেক সুফল হইতে পারে। তদ্ভিন্ন, কলিকাতায় মন্দ সংসর্গ যেমন আছে, তেমন এখানে সৎসংসর্গও যত ভাল হইতে পারে, বঙ্গের আর কোথাও ততটা হইতে পারে না।

কলিকাতায় বাড়ীঘরও অন্যান্য সহর অপেক্ষা বেশী পাওয়া যায়। এখন আরও বেশী পাওয়া যাইবে। তা ছাড়া, যদি ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় করিবার এবং নূতন কলেজ করিবার টাকা যুটে, তাহা হইলে কলিকাতায় যথেষ্টসংখ্যক ছাত্রাবাস নির্ম্মাণের টাকা কেন যুটিবে না?

(৩) কলিকাতা ছাত্রদের বাড়ী হইতে অনেক দূর। কিন্তু ঢাকাই কি সব পূর্ব্ববঙ্গবাসী ছাত্রদের জন্মস্থান? পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থান ঢাকা অপেক্ষা কলিকাতার নিকট। যাঁহাদের পক্ষে ঢাকা নিকটতর, তাঁহারা ঢাকা যান না কেন? কেহ ত বাধা দেয় না। যদি বল, ঢাকার কলেজগুলি কলিকাতার কলেজগুলির মত ভাল নয়; তাহা হইলে সেখানে ত স্বভাবতই ছেলেরা কম যাইবে। তাহাদিগকে বাধ্য কর কেন? যদি বল যে সেগুলি ভাল, কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পীঠস্থান বলিয়াই সেখানে সব ছেলে ছুটিয়া আসে, ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় হইলে সেখানেও সকলে যাইবে; তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে, সেখানে ত একটি গবর্ণমেণ্ট কলেজ ও একটি বেসরকারী কলেজ আছে; উভয়ই পূর্ণ। এখন কলিকাতায় যেসব পূর্ব্ববঙ্গের ছেলে পড়ে, তাহাদের সকলের যায়গা কোথায় হইবে? ঢাকা সহরে একাধিক গবর্ণমেণ্ট কলেজ হইবে না। মিশনারী ও বেসরকারী কলেজ না হয় ধরুন কালক্রমে আরও দুইটা হইল; তাহাতেই কি সকল ছাত্রের স্থান কুলাইবে? কলিকাতার শিক্ষাকেন্দ্র বলিয়া যে খ্যাতি প্রতিপত্তি আছে, ঢাকার তাহা হইতে বিলম্ব হইবে। বাধ্য না করিলে পূর্ব্ববঙ্গের অনেক ছেলেই কলিকাতায় আসিবে। এরূপ স্থলে বাধ্য করা কি উচিত হইবে? যদি বাধ্য করা হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ববঙ্গের সমস্ত ছাত্র কলেজে পড়িতে পারে, এত কলেজও চাই। তত কলেজ এখন নাই। যথেষ্ট সংখ্যক নূতন কলেজ কে স্থাপন করিবে? গবর্ণমেণ্ট না জনসাধারণ? কেহই করিবেন বলিয়া সম্ভব বোধ হইতেছে না। যদি করেন, তাহা হইলে এখন করিতেছেন না কেন? আমাদের মনে হয় যে এইরূপে কলেজ স্থাপন করিলেই অনেক ছাত্র কলিকাতায় আসিবে না। কারণ, দেখা যাইতেছে যে কলিকাতায় কলেজগুলিতে স্থানাভাব হওয়ায় নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর স্থান ব্যতীত মফঃস্বলের আর সকল স্থানের কলেজে ছাত্রের অভাব নাই। এখানে কেবল একটি কথা উঠিতে পারে। তাহা এই যে পূর্ব্ববঙ্গে গবর্ণমেণ্ট যেমন সরকারী সমুদয় কলেজকে সম্পূর্ণরূপে নিজকরতলগত করিতে চান, সে প্রয়াস বহু পরিমাণে সিদ্ধ হইলেও, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরও প্রভুত্ব থাকায় তাহা সম্পূর্ণরূপে সফল হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকায় হইলে, পূর্ব্ববঙ্গের রাজপুরুষদের মনস্কাম পূর্ণ হইবে। কিন্তু শিক্ষার উদ্দেশ্য যে মনুষ্যত্ব বৃদ্ধি, তাহা

এতদ্দ্বারা সিদ্ধ না হইয়া বিফল হইবে। কারণ অতিরিক্ত পরাধীনতা ও কঠোর শাসনে মনুষ্যত্বের লোপ হয়।

কলিকাতার কলেজগুলির এক এক ক্লাসে ১৫০ বা ততোধিক ছাত্র থাকায় ভাল পড়ান হয় না, অধ্যাপকগণ প্রত্যেক ছাত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে পারেন না, অধ্যাপক ও ছাত্রের মনে ও হৃদয়ের সংস্পর্শ হয় না। ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় হইলে এ বিষয়ে উন্নতি হইবে। ইহা সত্য কথা যে কলিকাতায় শিক্ষার অবস্থা এইরূপই বটে। কিন্তু সংসারে সব কাজই মাঝামাঝি রকমে রফা করিয়া চালাইতে হয়। জীবনের কোন কাজই ঠিক্ আদর্শ অবস্থাতে নাই। এখন দেখিতে হইবে, যে, দেশে উচ্চ শিক্ষা একেবারে বন্ধ না করিয়া কিম্বা অতি অল্প সংখ্যক ছাত্রের মধ্যে আবদ্ধ না রাখিয়া শিক্ষার আদর্শের দিকে কতদূর অগ্রসর হওয়া যায়। ভারতবর্ষ প্রধানতঃ নিরক্ষরের, অজ্ঞের দেশ। এদেশে শিক্ষার প্রচার যাহাতে একটুও কম হয় এমন কিছু করা উচিত নয়। কলিকাতার কলেজগুলিতে অনেক ছাত্র শিক্ষা পায়। তাহা উৎকৃষ্ট রকমের না হইলেও শিক্ষা নামের যোগ্য; নিরক্ষরতা, নিরেট মূর্খতা অপেক্ষা উহা ভাল। গবর্ণমেন্ট নিজব্যয়ে এতগুলি কলেজ চালান না, চালাইবেন না, দেশের লোকও প্রভূত সম্পত্তিদান করিয়া ইহাদের অর্থাভাব দূর করিতেছেন না। বহুসংখ্যক ছাত্র অল্প অল্প বেতন দিয়া এই সকল কলেজ চালাইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয় এখন নূতন নিয়ম করিয়া কলেজ চালান এত ব্যয়সাধ্য করিয়াছেন যে খুব বেশী ছাত্র না হইলে এই সব কলেজ উঠিয়া যাইত; এবং এখনও ছাত্র কমিয়া গেলে উঠিয়া যাইতে পারে। সুতরাং কলেজগুলি রাখিতে হইলে হয় ছাত্রাধিক্যরূপ দোষ সহ্য করিতে হইবে, নয় গবর্ণমেণ্টকে বিস্তর অর্থ সাহায্য করিতে হইবে, নয় দেশের ধনী লোকদিগকে এইরূপ সাহায্য করিতে হইবে, নয় ছাত্রদিগের নিকট অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিতহারে বেতন লইতে হইবে। কিন্তু শেষোক্ত উপায় অবলম্বন করিলে দেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান যে মধ্যবিত্ত ও অল্পবিত্ত শ্রেণীর ছাত্রগণ তাহারাই শিক্ষায় বঞ্চিত হইবে। অতএব এই সকল কথা মনে রাখিয়া শিক্ষাসমস্যার সমাধান করিতে হইবে।

ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেক ছাত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইলে এক এক শ্রেণীতে ২০/২৫টির বেশী ছাত্র রাখা চলে না। ইহা অভিজ্ঞ শিক্ষক মাত্রেই স্বীকার করিবেন। ১৫০এর পরিবর্ত্তে ২৫ যদি প্রতি শ্রেণীর ঊর্দ্ধ সংখ্যা করা যায়, তাহা হইলে কলিকাতায় ৮টি কলেজের যায়গায় আরও অন্ততঃ ৪০টি কলেজ করিতে হইবে; কারণ কোন কোন কলেজে এক এক শ্রেণীর ২/৩টি বিভাগ আছে। পূর্ব্ব বা পশ্চিমবঙ্গে এতগুলি কলেজ কে স্থাপন করিবেন, জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি? যদি প্রতি ক্লাসে ৫০টি করিয়া ছাত্র রাখা যায়, তাহা হইলেও কলিকাতার বর্ত্তমান কলেজগুলি ব্যতীত আরও ১৬টি কলেজ স্থাপন করিতে হইবে। ইহাই বা কে করিবে? তা ছাড়া মফঃস্বলের অনেক কলেজেও প্রতি শ্রেণীতে ২৫এর, ৫০এর অধিক ছাত্র আছে। সুতরাং সেগুলিকেও আদর্শ কলেজ করিতে হইলে, স্থান বিশেষে একটি দুটি করিয়া কলেজ বাড়াইতে হইবে। এই সব কলেজ কে স্থাপন করিবে? আদর্শের দিকে দৃষ্টি রাখা খুব দরকার, কিন্তু দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় কার্য্যতঃ কতদূর আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করা যায়, তাহা বিস্মৃত না হওয়া আরও দরকার। উৎকৃষ্ট পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন বেশ ভাল, কিন্তু যখন দুর্ভিক্ষের সময় লোকে হা অন্ন, হা অন্ন করে, তখন জনকতক

লোককে ঐরূপ আদর্শ আহার দিয়া বাকী লোককে উপবাসী রাখা কোন বুদ্ধিমান্ বা সহৃদয় লোক শ্রেয়ঃ মনে করেন না। কারণ তাহার ফল বড় শোচনীয়। জ্ঞানাভাবে আমাদের দশা শোচনীয় হইয়াছে। এখন আদর্শ শিক্ষার নাম করিয়া শিক্ষা-দুর্ভিক্ষ ঘটান কাহারও কর্ত্তব্য হইবে না।

যত দিন পূর্ব্ববঙ্গে যথেষ্ট সংখ্যক কলেজ না হইবে, ততদিন অনেক ছাত্র কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য স্থানে যাইবেই যাইবে। দেশের প্রকৃত অভাব হইতেছে আরও শিক্ষালয়, এবং উৎকৃষ্টতর শিক্ষালয়। তাহার পরিবর্ত্তে আর একটি পরীক্ষার যন্ত্র এবং পরিদর্শন ও শাসনযন্ত্র দিলে কি হইবে? না হয় ধরিলাম পরীক্ষা, পরিদর্শন ও শাসন এখনকার চেয়ে ভালই হইল। কিন্তু আরও শিক্ষা যে চাই, তাহার কি উপায় হইল? শিক্ষাবিস্তারে আরও যে উৎসাহ চাই, তাহার কি হইল? ঈসপের কথামালার সেই ঘোটক বেচারা সহিসকে বলিয়াছিল, ভাই, অঙ্গমার্জ্জন ও অঙ্গমর্দ্দন একটু কমাইয়া তুমি যদি আরও কিছু দানা আমাকে দিতে তাহা হইলে তাহাতে আমার উপকার হইত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই আর একজন কলেজ ইন্‌স্পেকটর রাখিলে সমুদয় কলেজ আরও ভাল করিয়া পরিদর্শন ও শাসন করাইতে পারেন। তজ্জন্য আর একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন হয় না।

আর যদি ঢাকায় একটি শিক্ষাদায়ক বিশ্ববিদ্যালয় করা হয়, তাহা হইলে কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, কি দোষ করিল? কলিকাতা এখনও নামে মাত্র শিক্ষাদায়ক, তাহা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। গবর্ণমেন্ট ঢাকায় যে টাকা ফেলিতে যাইতেছেন, তাহাতে তথায় একটি চলনসই রকমের শিক্ষাদায়ক বিশ্ববিদ্যালয়ও হইবে না, কিন্তু কলিকাতায় সেই টাকা ব্যয় করিলে অন্ততঃ বিজ্ঞান শিক্ষার বন্দোবস্তটা এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় কিয়ৎপরিমাণে করিতে পারিবেন। ভারতের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়কে যষ্টিবিহীন পঙ্গু করিয়া ফেলিয়া রাখিয়া অন্যত্র যষ্টির বন্দোবস্ত করার চেষ্টা কি ভাল? তাহাতে ফল এই হইবে যে ঢাকা বা কলিকাতা কেহই চলৎশক্তিবিশিষ্ট হইবে না।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে যতদিন না ঢাকায় ও পূর্ব্ববঙ্গের অন্যান্য সহরে যথেষ্ট সংখ্যক উৎকৃষ্ট কলেজ হইবে, ততদিন ঐ অঞ্চলের ছাত্রেরা কলিকাতায় ও পশ্চিম বঙ্গে আসিবেই। তাহা হইলে, কলিকাতার ছাত্রাধিক্য কমান কেমন করিয়া ঘটিবে? সুতরাং ছাত্রাবাস ও কলেজক্লাসগুলির অবস্থাই বা কেমন করিয়া ভাল হইবে? আর যদি পূর্ব্ববঙ্গে অনেক উৎকৃষ্ট কলেজ হয়, তাহা হইলে ত আপনাআপনিই কলিকাতার কলেজে ও ছাত্রাবাসে ছেলে কমিয়া যাইবে; তখন ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় করার কি প্রয়োজন থাকিবে?

যদি গবর্ণমেন্ট এই নিয়ম করেন যে পূর্ব্ববঙ্গের ছেলেরা কলিকাতায় ও পশ্চিমবঙ্গে পড়িতে পারিবে না, তাহা হইলে অনেক ছেলে শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইবে। ইহা কি বাঞ্ছনীয়? অথবা গবর্ণমেন্ট পরোক্ষভাবে উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায় করিতে পারেন। গবর্ণমেন্ট এইরূপ নিয়ম করিতে পারেন যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র ব্যতিরেকে কেহ পূর্ব্ববঙ্গে চাকরী পাইবে না, সেখানকার বি. এল্. ভিন্ন কেহ পূর্ব্ববঙ্গে ওকালতী করিতে পারিবে না। এরূপ নিয়ম করিলে সুতরাং ঐ অঞ্চলের গবর্ণমেন্ট কর্ম্মচারীদের পুত্রগণের শিক্ষার ও পরে চাকরী প্রাপ্তির সুবিধার জন্য তাহাদিগকে পশ্চিমবঙ্গে বদলী করা চলিবে না। তদ্ভিন্ন, কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যবিষয় ও পুস্তক, এবং

পশ্চিমবঙ্গের ও পূর্ব্ববঙ্গের শিক্ষাবিভাগদ্বয়ের শিক্ষাপ্রণালী ও পাঠ্যপুস্তকাদি, পৃথক্ হওয়ায়, পশ্চিম ও পূর্ব্ববঙ্গের, অধ্যাপক, শিক্ষক, এবং পরিদর্শক কর্ম্মচারীরা বঙ্গের ঐ ঐ বিভাগেই আবদ্ধ থাকিবেন। বদলী হইলে কাজের অসুবিধা হইবে। এই প্রকাবে উকীল, ডেপুটী, মুনসেফ আদি, এবং অধ্যাপকাদি পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গের স্বস্ব গণ্ডীতে থাকিলে বঙ্গদেশে নামে অখণ্ড হইলেও কার্য্যতঃ দ্বিখণ্ডিত হইবে কি না, তাহা সকলে ভাবিয়া দেখুন।

যদি ধরা যায় যে আর একটা বিশ্ববিদ্যালয় না করিলে কলিকাতার অবস্থা ভাল হইবে না, তাহা হইলে বেহার, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যার যে ৬টা কলেজ আছে,তাহাদিগকে লইয়া বেহার বিশ্ববিদ্যালয় হউক না? কুচবেহার দেশীয় রাজ্য; উহার কলেজ কলিকাতার সঙ্গে থাকিতেই ইচ্ছা করিবে। তাহা হইলে পূর্ব্ববঙ্গের ৭টি কলেজ থাকে। ছয় আর সাতে খুব বেশী তফাৎ নহে। তদ্ভিন্ন, বেহার, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যায় বঙ্গদেশ অপেক্ষা বিস্তর স্বাস্থ্যকর, বিরলবসতি স্থান আছে; তথাকার ভূগর্ভস্থ খনিজ সম্পদও বঙ্গ অপেক্ষা বেশী। ঐ প্রদেশগুলি নূতন স্বতন্ত্র গবর্ণমেণ্টেরও অধীনে আসিল। সুতরাং তৎসমুদয়ে পূর্ব্ববঙ্গ অপেক্ষা শীঘ্র লোকসংখ্যা বাড়িবে, ধন বাড়িবে, কলেজও বাড়িবে। ঐ সব স্বাস্থ্যকর স্থানে বহু সংখ্যক কলেজস্থাপন অস্বাস্থ্যকর বঙ্গে কলেজ বাড়ান অপেক্ষা বাঞ্ছনীয়ও বটে। সুতরাং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অপেক্ষা, বেহার বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা সর্ব্বাংশেই শ্রেয়ঃ। আরও দুইটি কারণে ইহা বাঞ্ছনীয় :— (১) বেহারের লোকেরা একমত হইয়া ইহা চাহিতেছে. বঙ্গের হিন্দুমুসলমান কোন সম্প্রদায়ই একমত হইয়া ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় চাহিতেছে না। (২) বেহার, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যার ভাষাগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকার অন্তর্গত প্রধান প্রদেশ বঙ্গের ভাষা হইতে পৃথক্। একভাষাভাষী বঙ্গে ২টি বিশ্ববিদালয় করিয়া ভাষাবিভাগ ও সাহিত্য বিভাগের আতঙ্ক উপস্থিত না করিয়া ভিন্নভাষাভাষীদের পৃথক্ করিয়া দেওয়াই ত উচিত। এত সকল কারণ সত্ত্বেও যদি গবর্ণমেণ্ট ঢাকাকেই অনুগ্রহ করেন, (গবর্ণমেণ্টের সমর্থদের ভাষা ব্যবহার করিতে গেলে বলিতে হয়) যদি গবর্ণমেণ্ট বাঙালীকেই দুটা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা "সম্মানিত" করেন, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে শিক্ষার উৎকর্ষ জন্য নহে, পরন্তু (সর্ব্বজনঅনুমেয়) রাজনৈতিক কারণে সরকার বাহাদুর বাঙ্গালীর প্রেমপাশ কাটাইতে পাবিতেছেন না।

অন্য কথা ছাড়িয়া দিয়া, শিক্ষাবিষয়েই পূর্ব্ববঙ্গ কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন, তাহা সংক্ষেপে দেখাইতেছি। কলিকাতায় আসিতে না পাইলে তাঁহারা প্রেসিডেন্সী কলেজ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট কলেজে পড়িতে পাইবেন না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পাইবেন না। জাপান ইউরোপ আমেরিকায় শিক্ষালাভার্থ গুরুপ্রসন্ন ঘোষ বৃত্তি পাইবেন না। তদ্ভিন্ন বহুসংখ্যক ডফ্‌বৃত্তি, ঈশানবৃত্তি, উডোবৃত্তি, প্রভৃতি বৃত্তি, পুরস্কার, ও পদক পাইবেন না। ঢাকায় এইরূপ বৃত্তি আদি স্থাপিত হইতে বহু বিলম্ব আছে। ঢাকায় সদ্য সদ্য মেডিক্যাল কলেজ এবং এঞ্জিনীয়ারিং কলেজ স্থাপিত হইতেছে না। কলিকাতা ও শিবপুরের এই দুই কলেজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভূত। ইহাঁরা নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকিতে ঢাকার ছাত্র লইবেন না, লওয়া উচিতও হইবে না। এখনই অনেক ছাত্র মেডিক্যাল কলেজে যায়গা পায় না। সুতবাং পূর্ব্ববঙ্গবাসীর চিকিৎসা

ও এঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষার পথ কতকটা সংকীর্ণ হইয়া যাইবে। সমস্ত বঙ্গের শিক্ষিতসমাজের প্রতিনিধিরা চেষ্টা করা সত্ত্বেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রজাপক্ষের মত দুর্ব্বল। ঢাকায় উহার অস্তিত্বমাত্রও না থাকিবার কথা। সুতরাং ছাত্রদের সুবিধা অসুবিধার কথা কর্ত্তৃপক্ষের ভাল করিয়া কর্ণগোচরই বা কে করিবে তাহা বিবেচনা করিতেই বা কে বাধ্য করিবে?

ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমর্থক একজন বলেন যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সীণ্ডিকেটে পূর্ব্ববঙ্গের কোন প্রতিনিধি নাই; এই কারণেও ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় হওয়া উচিত। এই ত্রুটি ত সহজেই দূর হইতে পারে। গবর্ণমেন্ট, আবশ্যক হইলে নিয়ম পরিবর্ত্তন করিয়া, সীণ্ডিকেটে পূর্ব্ববঙ্গের কলেজগুলির প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে পারেন।

যাহা হউক যে বিষয়ে আমাদের হাত নাই, তাহা লইয়া অধিক লেখা পণ্ডশ্রম। তার চেয়ে. ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় ও স্বতন্ত্র শিক্ষাবিভাগ যদি হয়ই, তাহা হইলে আমাদের কর্ত্তব্য কি তাহাই সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করা ভাল। (১) বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য যাহাতে অবিভক্ত থাকে, তাহার দিকে সতত সজাগ দৃষ্টি রাখা। (২) পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গের হৃদয় মনের সংস্পর্শ যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহার চেষ্টা করা। (৩) তরুণবয়স্কেরা যাহাতে সমস্ত বঙ্গের সহিত পরিচিত হয়, তাহার উপায় করা। (৪) স্বাধীনবৃত্তি অবলম্বন যাহাতে সহজ হয়, তাহার উপায় করা। (ওকালতী স্বাধীনবৃত্তি নহে)। (৫) সরকারী শিক্ষাবিভাগের ও সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের সহিত যতটা সম্ভব সম্পর্কবিবর্জ্জিতভাবে শিক্ষালাভের উপায় করিয়া দেওয়া। (৬) পূর্ব্ববঙ্গের যুবকদের মনুষ্যত্ব হ্রাসের সম্ভাবনা ঘটিলে যাহাতে তাহা কমিয়া না যায়, তাহার উপায় চিন্তা করা।

উপায়গুলি নির্দ্দেশ করা খুব সহজ, কিন্তু কার্য্যে পরিণত করা কঠিন। কিন্তু তা বলিয়া, এগুলি ভুলিয়া গেলে চলিবে না।

১৩২০ বৈশাখ

কাশী বিশ্ববিদ্যালয়

বাঙ্গালা দেশে কায়স্থ আদি ভিন্ন ভিন্ন জাতের উন্নতির জন্য পৃথক্ পৃথক্ সভা স্থাপন বেশী দিনের কথা নয়। কিন্তু হিন্দুস্থানীদের মধ্যে এরূপ সভা ২৫ বৎসর আগেও ছিল। আমরা যখন এলাহাবাদে থাকিতাম, তখন একদিন এইরূপ একটি বিষয়ে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় মহাশয়ের সহিত কথা হইতেছিল। তিনি বলিলেন, "কায়স্থ কন্‌ফারেন্স, ক্ষত্রিয় কন্‌ফারেন্স, বৈশ্য মহাসভা প্রভৃতি আছে বলিয়া আমাকে অনেকে অনেক বার বলিয়াছে যে আপনি একটা ব্রাহ্মণ কন্‌ফারেন্স বা মহাসভা প্রতিষ্ঠিত করুন না কেন? আমি সে চেষ্টা করি নাই। আমার ধারণা, ব্রাহ্মণ সকলের হিতের জন্য; সে স্বার্থচিন্তা করিবে না"। মালবীয় মহাশয়ের ঠিক কথাগুলি মনে নাই; কিন্তু ভাবটি

স্পষ্ট মনে আছে। তাহাই নিজের ভাষায় বলিলাম। তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা ব্রাহ্মণের বিশেষত্ব অবশ্যই হওয়া উচিত। অধিকন্তু, আমাদের বক্তব্য এই যে, উচ্চ আদর্শ সকল শ্রেণীর লোকেরই হওয়া উচিত, কেবল ব্রাহ্মণে আবদ্ধ থাকা উচিত নয়।

পণ্ডিত মদনমোহন এখন কাশীতে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনার্থ অর্থসংগ্রহের জন্য ভারতের নানা প্রদেশ ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। ভিন্ন ভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের জন্য পৃথক পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়া উচিত কিনা, তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে। কিন্তু পণ্ডিত মদনমোহন যে নিজের আদর্শ অনুসারে কাজ করিতেছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এপর্য্যন্ত আশি লক্ষ টাকা চাঁদা স্বাক্ষরিত হইয়াছে। আদায় কুড়ি লক্ষ টাকার উপর হইয়াছে। অঙ্গীকারের তুলনায় আদায় কম হইয়াছে। অন্যূন ৫০ লক্ষ আদায় না হইলে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবে না।

১৩২২ ফাল্গুন

হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়।

বারাণসীতে হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিস্থাপন একটি স্মরণীয় ঘটনা। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্পনা যাঁহাদের মনের মধ্যে প্রথম উদিত হইয়াছিল, এবং যাঁহাদের চেষ্টায় ইহার ভিত্তিস্থাপন পর্য্যন্ত হইয়া গেল, তাঁহারা অতি গুরুতর দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে চারিকোটি টাকা তুলিতে হইবে, কিন্তু তাহা প্রধান দায়িত্ব নহে। ঘরবাড়ী নির্ম্মাণ করিতে হইবে; তাহাও প্রধান দায়িত্ব নহে। উপযুক্ত অধ্যাপক নির্ব্বাচন ও নিয়োগ করিতে হইবে। ইহা কঠিন কাজ, কিন্তু ইহাও কঠিনতম কার্য্য নহে। বারাণসীব বিশ্ববিদ্যালয় কেবল মাত্র পাশ্চাত্যবিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত ভারতবর্ষে স্থিত বিশ্ববিদ্যালয় যাহাতে না হয়, যাহাতে ইহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, স্বতন্ত্র আত্মা থাকে, এরূপ চেষ্টা, এরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। সত্য বটে বিদ্যার জাতি নাই কিন্তু তথাপি ইহাও ইতিহাসে দেখা যাইতেছে যে বিদ্যার নানা অঙ্গের বিকাশ সব দেশে হয় নাই; যে বিদ্যার বিকাশ নানা দেশে হইয়াছে, তাহাও সর্ব্বত্র একই প্রকারে হয় নাই, দেশকাল অনুসারে তাহার বিশেষত্ব জন্মিয়াছে।

আমাদের পূজনীয় পূর্ব্বজগণ বিদ্যার জাতিবিচার করেন। তাঁহারা বিদেশ হইতে যাহা শিক্ষণীয় তাহা শিক্ষা করিতেছেন। বরাহমিহির বলিয়াছেন, "ম্লেচ্ছা হি যবনাস্তেষু সম্যক্ শাস্ত্রমিদং স্থিতম্ ঋষিবত্তেঽপি পূজ্যান্তে।" গ্রীকরা ম্লেচ্ছ, কিন্তু জ্যোতির্বিদ্যায় তাহারা পারদর্শী বলিয়া তাহা তাহাদের নিকট শিক্ষণীয়, এবং তাহারা ঋষিবৎ পূজনীয়। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়েও পাশ্চাত্য বিদ্যার অধ্যয়ন অধ্যাপনা নিশ্চয়ই হইবে। কিন্তু ভারতবর্ষের নিজস্ব কিছুও শিখিতে ও শিখাইতে হইবে। ইহা বলিতে অনেকে ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্য, দর্শন, প্রভৃতিই বুঝিবেন। তাহাও শিখিতে ও শিখাইতে হইবে। কিন্তু ভারতবর্ষের শক্তি ও

ফুরাইয়া যায় নাই, এবং ভারতবর্ষে পূর্ব্বে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহাও শেষ কথা নয়। সুতরাং ভারতবর্ষকে নূতন কিছু সত্য আহরণ করিতে হইবে, নূতন কিছু জানিতে হইবে, নূতন কিছু সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিতে হইবে; এবং এই সমুদয় জগতের লোকের সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইবে। যে প্রাণবান্, সে যেমন বাহির হইতে কিছু গ্রহণ করে, তেমনি আপনার প্রাণবত্তার প্রমাণস্বরূপ কিছু নূতন করে, এবং নূতন কিছু দেয়। হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়কে এই নূতন কিছু করিতে এবং নূতন কিছু দিতে সমর্থ করিতে হইবে। ইহাই কঠিনতম কাজ। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন আচার্য্যগণের আধ্যাত্মিক শোণিতস্রোত প্রবাহিত করিতে হইবে, এবং আধুনিক আচার্য্য রাজেন্দ্রলাল ভাণ্ডারকর রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্র প্রফুল্লচন্দ্র অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতি ও তাঁহাদের অনুজসমূহের আত্মিক বংশধরগণের আবির্ভাব সম্ভবপর করিতে হইবে। নতুবা ইহার ভারতীয়ত্বের সার্থকতা কেমন করিয়া হইবে, এবং তাহার প্রমাণই বা কিরূপে হইবে?

হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপনকর্ত্তাদিগের সম্মুখে আরও একটি কঠিন কাজ রহিয়াছে। জীবিত যে তাহাকে যেমন বাহির হইতে পুষ্টিসংগ্রহ করিতে হয়, অন্তঃস্থ প্রাণশক্তির পরিচয়স্বরূপ নূতন কিছু করিতে হয় এবং দিতে হয়, তেমনি তাহাকে, অনাবশ্যক ক্ষতিকর যাহা তাহা বর্জ্জন করিতে হয়। ভারতীয় সভ্যতার সংরক্ষণ, ভারতীয় সভ্যতার প্রসারবর্দ্ধন, গভীরতা ও শক্তিমত্তা সম্পাদন এবং উহার উদ্ভাবনক্ষমতার প্রতিষ্ঠা, হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। কিন্তু এই শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্যসাধন করিতে হইলে ও ভারতীয় সভ্যতাকে পূর্ণাঙ্গ করিতে হইলে, যাহা যোগ করা বা বিকশিত করা আবশ্যক, তাহা যেমন করিতে হইবে, তদ্রূপ, যাহাতে ভারতীয় সভ্যতাকে ক্ষীণপ্রাণ ও পঙ্গু করিতেছে, তাহাও পরিহার করিতে হইবে। স্বদেশপ্রেম, স্বজাতিপ্রেম ও স্বধর্ম্মপ্রেমে অনেক সময় মানুষকে অন্ধ করে। তখন, যাহা মানুষের দুর্ব্বলতার প্রধান কারণ, তাহাকেই মানুষ প্রধান সম্পদ ও সম্বল বলিয়া মনে করে। এইজন্য এবিষয়ে হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃবর্গকে বিশেষরূপে অবহিত হইতে হইবে।

তাঁহারা বহুপরিমাণে উদারতা দেখাইয়াছেন বলিয়া আমরা এই সকল কথা লিখিতেছি। তাঁহারা "হিন্দু" কথাটির কোন সংজ্ঞা না দিয়া ভালই করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় ভারতীয় যে-কেহ আপনাকে হিন্দু বলিয়া পরিচিত করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাকেই হিন্দু মনে করা উচিত। অতীত, বর্ত্তমান, বা ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষকে যিনি পৃথিবীর অন্য কোন দেশ অপেক্ষাই নিকৃষ্ট মনে করেন না, তিনিই হিন্দুনামে পরিচিত হইতে পারেন। হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃবর্গ যে অনেকটা এইভাব দ্বারা চালিত, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে। "হিন্দু" নামটি অবশ্য সাম্প্রদায়িক। কিন্তু হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ে জাতিধর্ম্মবর্ণনির্ব্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের ছাত্রই পড়িতে পারিবে। হিন্দুধর্ম্মশিক্ষা কেবল হিন্দু ছাত্রেরা পাইবে। অধিকন্তু, যদি শিখ ও জৈন সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজ নিজ ব্যয়ে ব্যবস্থা করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ছাত্রেরাও নিজ নিজ ধর্ম্মের শিক্ষা পাইতে পারে। শিখধর্ম্ম এক ঈশ্বরের পূজা শিক্ষা দেয়; ইহা মূর্ত্তিপূজার, জাতিভেদের, এবং হিন্দুতীর্থদর্শনের বিরোধী। তথাপি যে উহার শিক্ষার ব্যবস্থা হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ে হইতে পারিবে, ইহা দ্বারা কর্ত্তৃপক্ষের উদারতা ও লোকনীতিজ্ঞতা সূচিত হইতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের শিক্ষা দেওয়া চলিবে, এরূপ ব্যবস্থা করিলে আরও ভাল হইত, এবং পঞ্জাবের

হিন্দুসভা হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় বিলের এইরূপ সংশোধন প্রস্তাব করিয়াও পাঠাইয়াছিলেন। হইতে পারে যে কর্ত্তৃপক্ষ ব্রাহ্মধর্ম্মকে ঔপনিষদিক হিন্দুধর্ম্ম মনে করেন বলিয়া বা অন্য কোন কারণে এই সংশোধন গ্রহণ করেন নাই। যাহাই হউক, হিন্দু এবং হিন্দুধর্ম্মের বিশেষ কোন সংজ্ঞা দিয়া যখন ইহাকে নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করা হয় নাই, তখন বুঝিতে হইবে যে বিশাল হিন্দুসমাজে যে-কেহ বাঁচিয়া থাকিবার এবং জগতের সর্ব্বপ্রকারে সেবা করিবার যোগ্যতম তাহাকেই হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় সুযোগ দিতে প্রস্তুত।

আমরা সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক বিদ্যালয়ই ভালবাসি। এইজন্য হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় যদি জাতীয় বা ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হইত, তাহা হইলে অধিকতর আনন্দিত হইতাম। কিন্তু আমরা সাম্প্রদায়িক নামেই নাক সিঁটকাইতে প্রস্তুত নহি। হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রদায়িকতা ঠিক কতটুকু তাহা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। ইহা খ্রীষ্টীয়ান কলেজগুলিব মত বিজাতীয়, অভারতীয়, ও সংকীর্ণভাবে সাম্প্রদায়িক নহে। খৃষ্টিয়ান কলেজগুলিতে কেবল খৃষ্টধর্ম্ম শিখান হয়, অন্যধর্ম্ম শিখাইবার জো নাই, এবং খৃষ্টিয়ান অখৃষ্টিয়ান সকলকেই বাইবেল পড়িতে হয়। হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের এতটা সংকীর্ণতা ও একদেশদর্শিতা নাই। অথচ দেখিতে পাই, যাঁহারা খৃষ্টিয়ান কলেজগুলির স্থাপনে বা সংখ্যাবৃদ্ধিতে কখনও অসন্তোষ প্রকাশ করেন নাই, তাঁহারা কেহ কেহ হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় অসাম্প্রদায়িক নহে বলিয়া প্রতিকূল সমালোচনা করেন। ইহাও একপ্রকার গোঁড়ামি।

হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের আর একটি কঠিন কাজ আছে। পাশ্চাত্য দেশসকলে প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সেই সকল বিদ্যারই চর্চ্চা হইত (এবং এখনও অনেকগুলিতে হয়) যাহার দ্বারা মানুষেব জ্ঞান বাড়ে, বুদ্ধি পুষ্ট ও মার্জ্জিত হয়, এবং হৃদয়ের উৎকর্ষ ও সরসতা সাধিত হয়। মানুষের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ শিক্ষা দেওয়া প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তাঁহাদের পক্ষে আবশ্যক মনে করেন নাই। অনেক "ভদ্রলোক" যেমন চাষীর কাজ এবং শিল্পী কারিগরের কাজ স্বহস্তে করাটা অগৌরবের বিষয় মনে করেন, হয় ত বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের মনে কৃষিবিদ্যা ও অর্থকরী নানা শিল্পবিদ্যার প্রতি তেমনি একটা অবজ্ঞার ভাব আছে। কিন্তু আমাদের বোধ হয়, লোকস্থিতির জন্য যাহা কিছু আবশ্যক, তাহারই শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক, এবং তাহা শিক্ষা দেওয়া অগৌরবের বিষয় নহে। অধ্যাপক, উকীল ও চিকিৎসকেরাও ত পয়সা রোজগার করেন, এবং বিশ্ববিদ্যালয় হইতেই তাঁহারা শিক্ষা পান। তাহা হইলে কৃষি ও শিল্প হইতে অর্থাগম হয় বলিয়া উহা শিক্ষা দেওয়া কেন অগৌরবের বিষয় হইবে? সত্য বটে, অধ্যাপনা, চিকিৎসা বা ওকালতী দ্বারা অর্থোপার্জ্জন অপেক্ষা উচ্চতর উদ্দেশ্যও সাধিত হয় এবং এই বিদ্যাগুলি শিখিলে মানসিক উন্নতিও হয়। কিন্তু কৃষি ও শিল্প দ্বারাও ত অর্থোপার্জ্জন ছাড়া উচ্চতর উদ্দেশ্য যে লোকহিত ও লোকসুখ তাহা সাধিত হয়, এবং কৃষি ও শিল্প শিক্ষা দ্বারাও মানসিক উন্নতি সাধিত হয়। অতএব, আমাদের বিবেচনায়, হিন্দুবিশ্ব- বিদ্যালয়ে প্রাচীন পারী অক্সফর্ড এবং নবীন কলম্বিয়া কর্ণেল বার্মিংহামের সংযোগ ও সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে। দেশের দারিদ্র্য দূর করিতে না পারিলে, জাতিটা বাঁচিবে না; সুতরাং সাহিত্যাদির চর্চ্চা কে করিবে? অবশ্য, যাহাই করা হউক, অর্থ অপেক্ষা পরমার্থ শ্রেষ্ঠ, ভারতীয় সভ্যতার এই মূলমন্ত্র শিরোধার্য্য

করিয়া করিতে হইবে। অর্থকে আত্মিক ঐশ্বর্য্য লাভের সহায় করিতে হইবে।

হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ে বর্ত্তমান ভারতবর্ষীয় বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির আর একটি অসম্পূর্ণতা পূরণ করিতে হইবে। ইহাতে সঙ্গীত শিক্ষা দিতে হইবে; চিত্র, স্থাপত্য, তক্ষণ, প্রভৃতি কলা শিক্ষা দিতে হইবে। তাহার শিক্ষকও ভারতবর্ষেই পাওয়া যাইবে।

বলিয়াছি, হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব, স্বতন্ত্র আত্মা চাই। তেমনি ইহার দেহটিও সাজসজ্জা পরিচ্ছদও যথাসম্ভব ভারতীয় হওয়া চাই। এই হেতু ইহার জন্য যে-সকল অট্টালিকা নির্ম্মিত হইবে, তাহা ভারতীয় স্থাপত্যরীতি অনুসারে হওয়া বাঞ্ছনীয়, এবং ইহার উদ্যানাদি ভারতীয় প্রণালীতে পরিকল্পিত ও রচিত হওয়া উচিত। ইহার আসবাবপত্রেও ভারতবর্ষের বিশেষত্ব রক্ষিত হইলে ভাল হয়।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় সমগ্র ভারতবর্ষের হিন্দুর জ্ঞানযজ্ঞ। ইহাতে সকল প্রদেশের স্থান আছে, কাজ আছে। ইহার প্রধান কর্ম্মী পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়; তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা, ভারতভক্তি, ত্যাগ, সাহস, লোকচরিত্রানুরূপ ব্যবহার, মিষ্টভাষিতা, ধৈর্য্য ও অক্লান্ত পরিশ্রম ব্যতিরেকে ইহা সম্ভবপর হইত না। তাঁহার সঙ্গে আরও অনেকে পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহাদের সকলের নাম করা এখানে সম্ভব না হইলেও কাহারওই সাহায্য ব্যতিরেকে কাজটি যতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহা হইত না, এবং পরেও কাজ চলিবে না। "প্রবাসী" সমুদয় বাঙ্গালীর এবং প্রবাসী বাঙ্গালীর কাগজ। এইজন্য আমাদের আনন্দ হইতেছে যে অন্যান্য প্রদেশের লোকের ন্যায় বাঙ্গালী এবং প্রবাসী বাঙ্গালীর চেষ্টা, সেবা, ত্যাগও হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার মূলে এবং মধ্যে রহিয়াছে। ঠিক্ কাহার মস্তিষ্কে হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের কল্পনা ও আদর্শ প্রথম উদিত হইয়াছিল, তাহা অন্তর্য্যামীই জানেন; কিন্তু আমরা অবগত হইয়াছি যাঁহারা সর্ব্বপ্রথম এই কল্পনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে প্রবাসী বাঙ্গালীর অন্যতম অগ্রণী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য এম-এ মহাশয় একজন। এখনও তিনি এই মহৎ উদ্যমের একজন অধিনায়ক। চারি পাঁচ জন ত্যাগী সুযোগ্য প্রবাসী বাঙ্গালী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সেন্ট্র্যাল হিন্দু কলেজে অবৈতনিক অধ্যাপকের কাজ করিতেছেন। ব্যবহারাচার্য্য রাসবিহারী ঘোষ, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, প্রভৃতি দানশীল বাঙ্গালী ইহার ধনভাণ্ডার পুষ্ট করিয়াছেন। সমগ্র ভারতের কোন কার্য্যেই কোন প্রদেশের লোকের বাদ পড়া উচিত নয়। বাঙ্গালী বাদ পড়ে নাই দেখিয়া সুখী হইলাম। যাঁহারা হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ আদর্শ পূর্ণাঙ্গ ও বিকশিত করিয়া তুলিতে সাহায্য করিতেছেন, ভিত্তিস্থাপন-মহোৎসব উপলক্ষে তাঁহাদের মধ্যে জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্রের মত বিজ্ঞানে বাঙ্গালীর শিরোমণি উপস্থিত থাকিয়া অভিভাষণ দ্বারা সকলকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন, ইহাতে আমরা আনন্দিত।

১৩২৪ আষাঢ়

উস্‌মানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়

হাইদরাবাদের নিজাম তাঁহার রাজ্যে উস্‌মানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় নামে একটি নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে আদেশ দিয়াছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে উর্দ্দুভাষায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রাচীন ও আধুনিক নানা বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইবে। কিন্তু ইংরেজী ভাষাও সকল ছাত্রকেই শিখিতে হইবে। দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রাচীন ও আধুনিক সদুপায়-সকল অবলম্বিত হইবে। ছাত্রদের নৈতিক উন্নতির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইবে। এখানে নানাবিদ্যার গবেষণাও হইবে।

১৩৩৫ শ্রাবণ

চিদাম্বরম্ বিশ্ববিদ্যালয়

মান্দ্রাজের চিদাম্বরম্ সহরে স্যার্ অন্নমালাই চেট্টির প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত মীনাক্ষি কলেজ ও বিদ্যালয় আছে। তিনি ঐ বিদ্যামন্দির ও তাহার সম্পত্তি এবং তাহার উপর আরও কুড়ি লক্ষ টাকা দিয়া চিদাম্বরম্ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব গবর্ন্মেণ্টের নিকট উপস্থিত করেন। মাদ্রাজ গবর্ন্মেণ্ট তাহাতে সম্মত হইয়াছেন। ঐ গবর্ন্মেণ্ট এককালীন কুড়ি লক্ষ টাকা দান করিবেন, ইমারৎ ও সাজসরঞ্জামের জন্য সাড়ে সাত লক্ষ টাকা দিবেন, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের চলিত ব্যয় ভাবতে বার্ষিক দেড় লক্ষ টাকা দিবেন।

মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং অন্ধ্রবিশ্ব-বিদ্যালয়ে যাহা শিক্ষা দেওয়া হয় না, এই নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ে সেরূপ কিছু উত্তম রূপে শিক্ষা দিলে ফল ভাল হইবে।

জ্ঞানব্রতী শিক্ষাব্রতী

১৩১৮ ভাদ্র
[য়ুনিভার্সেল্ রেসেজ্ কংগ্রেসে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল]

গত জুলাই মাসে লণ্ডন সহরে য়ুনিভার্সেল্ রেসেজ্ কংগ্রেস বা সার্ব্বজাতিক মহাসভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য—বিজ্ঞানের ও আধুনিক ধর্ম্মবুদ্ধির আলোকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জাতিদের, তথাকথিত শ্বেত ও তথাকথিত অশ্বেত জাতিদের, বর্ত্তমান পরস্পর সম্বন্ধের বিচার করা. যদ্দ্বারা তাহারা আরও ভাল করিয়া পরস্পরকে বুঝিতে পারে, তাহাদের মধ্যে মিত্রতা জন্মিতে পারে, এবং আন্তরিক সহযোগিতা উৎপন্ন হইতে পারে। এই মহাসভার আটটি বৈঠক হইয়াছিল। নানাজাতির পণ্ডিত ও গণ্যমান্য লোকে এই কংগ্রেসের জন্য প্রবন্ধ পাঠাইয়াছিলেন। প্রথম বৈঠকের বিচার্য্য বিষয় উত্থাপন করিবার ভার ছিল, বঙ্গের সুপণ্ডিত সন্তান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের উপর। ভারতবর্ষের, বঙ্গের, এই সম্মানে আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

১৩৪২ মাঘ
আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের জয়ন্তী

আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের ৭২ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে ভারতবর্ষীয় দার্শনিক কংগ্রেসের উদ্যোগে গত মাসে কলিকাতায় তাঁহার জয়ন্তী হইয়া গিয়াছে। ডাঃ সর্ নীলরতন সরকার মহাশয় এই জয়ন্তীর সভায় সভাপতি মনোনীত হন এবং আচার্য্য শীল মহাশয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন। দুঃখের বিষয় তাঁহার এই প্রশস্তি কোন কাগজ রিপোর্ট করে নাই। অন্য প্রশস্তিগুলিরও যে রিপোর্ট ঠিক ঠিক বাহির হইয়াছে তাহা নহে। মহীশূরের অধ্যাপক কে. ভি. মাধব, ঢাকার অধ্যাপক হরিদাস ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি যে কিছু বলিয়াছেন, তাহার উল্লেখ পর্য্যন্ত দেখি নাই।

আচার্য্য শীল মহাশয়ের প্রগাঢ় বিদ্যাবত্তা যেমন বহুমুখী, মননশক্তি যেমন অসাধারণ, স্বভাব তেমনি সরল এবং চরিত্র তেমনি উদার মহৎ পবিত্র। ইহা সাতিশয় ক্ষোভের বিষয় যে অবস্থাচক্রে এবং তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও মনস্বিতার অনুরূপ কোন গ্রন্থ তিনি লিখিতে পারেন নাই। কিন্তু ইহা বিদ্বন্মণ্ডলীর পরিজ্ঞাত, যে, যেমন ছোট ছোট বহু ব্যাঙ্ক বৃহৎ ব্যাঙ্কের আনুকূল্যে নিজেদের কারবার চালায়, তেমনি বিদ্যার অনেক শাখার বহু গ্রন্থকার তাঁহার নিকট হইতে সঙ্কেত, উপদেশ ও চালনা প্রাপ্ত হইয়া যশস্বী হইয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সভাপতি ব্রিটেনের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও শিক্ষাতত্ত্বজ্ঞ সর্ মাইকেল স্যাড্‌লার আপনাকে শীল মহাশয়ের শিষ্য বলিয়া যে প্রশস্তিটি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন,

তাহা জানুয়ারি মাসের 'মডার্ণ রিভিয়ু'তে আমাদের অনেক পাঠক দেখিয়া থাকিবেন।

রবীন্দ্রনাথ নিম্নমুদ্রিত কবিতাটি পাঠাইয়াছিলেন।

আচার্য্য শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, সুহৃদ্বরেষু-

জ্ঞানের দুর্গম ঊর্দ্ধে উঠেছ সমুচ্চ মহিমায়,
যাত্রী তুমি, যেথা প্রসারিত তব দৃষ্টি সীমায়
সাধনা-শিখরশ্রেণী; যেথায় গহন গুহা হ'তে
সমুদ্রবাহিনী বার্ত্তা চলেছে প্রস্তরভেদী স্রোতে
নব নব তীর্থ সৃষ্টি করি, যেথা মায়া-কুহেলিকা
ভেদি উঠে মুক্তদৃষ্টি তুঙ্গশৃঙ্গ, পড়ে তাহা লিখা
প্রভাতের তমোজয়-লিপি; যেথায় নক্ষত্রলোকে
দেখা দেয় মহাকাল আবর্ত্তিয়া আলোকে আলোকে
বহ্নিমণ্ডলের জপমালা; যেথায় উদয়াচলে
আদিত্যবরণ যিনি, মর্ত্ত্যধরণীর দিগঞ্চলে
অনাবৃত করি দেন অমর্ত্ত্যরাজ্যের জাগরণ,
তপস্বীর কণ্ঠে কণ্ঠে উচ্ছ্বসিয়া—শুন বিশ্বজন,
শুন অমৃতের পুত্র, হেরিলাম মহান্ত পুরুষ
তমিস্রের পার হ'তে তেজোময়, যেথায় মানুষ
শুনে দৈববাণী। সহসা পায় সে দৃষ্টি দীপ্তিমান,
দিক্‌সীমা প্রান্তে পায় অসীমের নূতন সন্ধান।
বরেণ্য অতিথি তুমি বিশ্বমানবের তপোবনে,
সত্যদ্রষ্টা, যেথা যুগ-যুগান্তরে ধ্যানের গগনে
গূঢ় হ'তে উদ্ঘারিত জ্যোতিষ্কের সম্মিলন ঘটে,
যেথায় অঙ্কিত হয় বর্ণে বর্ণে কল্পনার পটে
নিত্যসুন্দরের আমন্ত্রণ। সেথাকার শুভ্র আলো
বরমাল্যরূপে তব সমুদার ললাটে জড়ালো
বাণীর দক্ষিণ পাণি
মোরে তুমি জানো বন্ধু বলি;
আমি কবি আনিলাম ভরি মোর ছন্দের অঞ্জলি
স্বদেশের আশীর্ব্বাদ, বিদায়কালের অর্ঘ্য মোর
বাহুতে বাঁধিনু তব সপ্রেম শ্রদ্ধার রাখীডোর॥
১ ডিসেম্বর, ১৯৩৫

সমুদয় অভিনন্দনের উত্তরে আচার্য্য শীল যাহা বলেন, তাহাতে প্রথমেই ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক বিবাদকলহে গভীর ব্যথা প্রকাশ করেন। তৎপরে "জয়ন্তী"র বিদেশে ও দেশে ইতিহাস ও প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু বলেন। শেষে তাঁহার জীবনের বাহ্য ফলহীনতা সম্বন্ধে শান্ত ও গম্ভীরভাবে প্রাণস্পর্শী কয়েকটি কথা বলেন।

১৩৪৫ পৌষ
আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় অনেক দিন হইতে দৃষ্টিহীন ও কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইয়া ভুগিতেছিলেন। এখন তাঁহার বিদেহী আত্মা রোগের যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে।

তিনি তাঁহার সমসাময়িক লোকদের মধ্যে যে বহু বিদ্যায় পণ্ডিতাগ্রগণ্য ছিলেন, তাহা বঙ্গের বিদ্বান্ ও প্রতিভাবান লোকেরা বলিয়াছেন, আবার বঙ্গের বাহিরের সর্ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের মত বিদ্বান্ ব্যক্তিও বলিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সভাপতি, এবং পরে পরে বিলাতী দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার সুপণ্ডিত সর্ মাইকেল স্যাডলার শীল মহাশয়ের জীবনের ৭২ বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে তাঁহাকে নিজের গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া যে প্রশস্তি লিখিয়া পাঠান, তাহার গোড়ায় আছে :

"May one of his pupils (For pupil I was during the years 1917-19 and shall always revere him as one of my *Gurus*) express in a few words love and admiration for Dr. Brajendranath Seal, and gratitude, which grows with the years, for his guidance in my thought and for what he taught me during many long and intimate discussions about the needs and genius of India? He was indeed guide, philosopher and friend to me."

স্যাডলার সাহেবের সমগ্র প্রশস্তিটি ১৯৩৬ সালের জানুয়ারী মাসের মডার্ণ রিভিয়ুতে আছে। ঐ সংখ্যায় এবং ১৩৪২ সালের মাঘের প্রবাসীতে তাঁহার উদ্দেশে লিখিত রবীন্দ্রনাথের সেই অপূর্ব্ব কবিতাটি প্রকাশিত হইয়াছিল যাহার আরম্ভে আছে—

"জ্ঞানের দুর্গম ঊর্দ্ধে উঠেছ সমুচ্চ মহিমায়,
যাত্রী তুমি যেথা প্রসারিত তব দৃষ্টির সীমায়
সাধনা-শিখরশ্রেণী;..."

তিনি যে শুধু পণ্ডিত ছিলেন তাহা নহে। তাঁহার প্রতিভা ছিল, এবং তাহা বহুমুখী। তাঁহার ইংরেজী কবিতা-গ্রন্থ The Eternal Quest গত বৎসর অক্সফর্ড য়ুনিভার্সিটী প্রেস হইতে প্রকাশিত হয়, যদিও তাহা লিখিত হইয়াছিল ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে। ধর্ম্ম, দর্শন ও কাব্যেই প্রাচীন ভারতীয়েরা উন্নতি করিয়াছিলেন বলিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের ধারণা। আচার্য্য শীল রসায়ন পদার্থবিজ্ঞান প্রভৃতিতে প্রাচীন হিন্দুদের জ্ঞানের বৃত্তান্ত লিখিয়া সেই ধারণার ভ্রম দেখাইয়া দেন। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডনে যে সর্ব্ব-নৃজাতি-কংগ্রেস (Universal Races Congress) হয়, তাহার উদ্বোধন করিতে আহূত হইয়া তিনি নৃতত্ত্ব ও জাতিতত্ত্বাদি বিষয়ে গবেষণাপূর্ণ অভিভাষণ পাঠ করেন। উচ্চগণিত ছিল তাঁহার চিত্তবিনোদনের উপায় ("recreation")। মহীশূর রাজ্যের তৎপ্রণীত রাষ্ট্রবিধিতে সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণ প্রভৃতির ব্যবস্থা তাঁহার রাজনীতিবিশারদত্বের পরিচায়ক। ঐ রাজ্যের জন্য তৎপ্রণীত শিক্ষাপদ্ধতিতে প্রাথমিক হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পর্য্যন্ত সংস্কৃতিমূলক ও বৃত্তিমূলক উভয়বিধ শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। তথাকার শিল্পোন্নতির জন্য সরকারী সাহায্য দান ব্যবস্থাতেও তাঁহার হাত ছিল। বঙ্গে বিপিনচন্দ্র পালের মত বাগ্মী ও রাজনীতিবিৎ আচার্য্য শীলের নিকট হইতে স্বাজাতিকতার দার্শনিক তত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান

লাভ করেন। বস্তুতঃ স্যাড্‌লার সাহেব যেমন সরল ভাবে তাঁহার নিকট ঋণ স্বীকার করিয়াছেন, বিদ্যার অনেক শাখার বহু ভারতীয় গ্রন্থকারও তাঁহার নিকট সেইরূপ ঋণী। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার যাঁহারা ছাত্র ছিলেন তাঁহারা ত ঋণী আছেনই। অবস্থাচক্রে ও তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য, মনস্বিতা ও প্রতিভার অনুরূপ গ্রন্থাবলী তিনি লিখিয়া যাইতে পারেন নাই বটে, কিন্তু যেমন বড় ব্যাঙ্কের সাহায্যে বণিকেরা ও ছোট ছোট ব্যাঙ্ক নিজ নিজ কারবার চালায়, তেমনই অনেকে তাঁহার জ্ঞানভাণ্ডার ও প্রতিভার আনুকূল্যে নিজ নিজ সাংস্কৃতিক কারবার চালাইয়াছেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য, মনস্বিতা, ও প্রতিভা যেরূপ অসামান্য ছিল, তাঁহার স্বভাব ছিল সেইরূপ সরল নম্র ও সৌজন্যপূর্ণ, এবং চরিত্র ছিল সেইরূপ উদার, মহৎ ও পবিত্র।

১৩১৯ ভাদ্র
আলেকজান্দার ক্ষোমা ডি কোরস্‌]

রক্তের বন্ধন সহজে ছিন্ন করা যায় না। ইউরোপে হাঙ্গেরীর খৃষ্টান মেগিয়ারেরা বংশতঃ মধ্য-এশিয়ার হূন। ইউরোপীয় তুরুষ্কের মুসলমানেরাও মধ্য এশিয়ার তুর্ক। হূন ও তুর্কের মধ্যে হয় ত জ্ঞাতিত্ব ছিল, হয় ত ছিল না। কিন্তু উভয়েরই পূর্ব্বপুরুষেরা মধ্য-এশিয়ার অধিবাসী ছিল বলিয়া বর্ত্তমান তুর্ক-ইতালীয় যুদ্ধে হাঙ্গেরীর খৃষ্টান মেগিয়ারেরা ইউরোপীয় তুরুষ্কের মুসলমান অধিবাসীদের সঙ্গে সহানুভূতি দেখাইতেছে, খৃষ্টান ইতালীয়দিগের সঙ্গে নহে।

ক্ষোমা ডি কোরস্‌ হাঙ্গেরীতে ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার এই ধারণা হয় যে মেগিয়ারদের আদি জন্মভূমি তিব্বতে লাসার নিকট। তাই তিনি সেই পিতৃভূমি দর্শনার্থ ৩৬ বৎসর বয়সে এক বন্ধুর প্রতিশ্রুত বার্ষিক ১৫০ টাকা মাত্র বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া ইউরোপ হইতে তিব্বত অভিমুখে যাত্রা করেন। পথে মিশরদেশ দর্শন করিয়া তিনি দুইবৎসর পরে তিব্বতে পৌঁছেন। সমস্ত পথ পদব্রজে অতিক্রম করেন। কেবল মধ্যে মধ্যে সাগর ও নদী পার হইবার জন্য জাহাজ ও নৌকার সাহায্য লন। তিব্বতে তিনি নয় বৎসর ছিলেন। তথায় বাসকালে তিব্বতীভাষা শিখেন ও বিস্তর তিব্বতী পুঁথি সংগ্রহ করেন। সেই সমস্তই তিনি কলিকাতায় আসিয়া এশিয়াটিক সোসাইটিকে দান করেন। তিনি চারি বৎসর ধরিয়া ব্রায়েন হজ্‌সনের সংগৃহীত তিব্বতী পুঁথির তালিকা প্রস্তুত করেন। গবর্ণমেন্টের ব্যয়ে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ক্ষোমা ডি কোরসের তিব্বতী ব্যাকরণ ও অভিধান বাহির হয়। তাহার পর তিনি তিন বৎসর পূর্ব্ববঙ্গ ও সিকিমে ভ্রমণ করেন, এবং সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষার নিজ জ্ঞান বৃদ্ধি করেন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দ হইতে পাঁচ বৎসর তিনি এশিয়াটিক সোসাইটীর গৃহে থাকিয়া নিজের উপহৃত পুস্তকাবলীর তালিকা প্রস্তুত করিতে থাকেন, এবং সোসাইটীর পত্রিকায় তিব্বতের ভূগোল. ইতিহাস ও সাহিত্য সম্বন্ধে

অনেক প্রবন্ধ লেখেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ৫৮ বৎসর বয়সে লাসা যাইবার পথে দার্জ্জিলিঙে তাঁহার মৃত্যু হয়। তথায় তাঁহার কবর আছে। এখন উহার মেরামত হইয়াছে। হাঙ্গেরীয় বিজ্ঞান-পরিষদ সম্প্রতি বঙ্গের এশিয়াটিক সোসাইটীকে তাঁহার একটি সুন্দর আবক্ষ প্রতিমূর্ত্তি উপহার দিয়াছেন। আমরা উহার ছবি এখানে দিলাম।

ক্ষোমা ডি কোরস জ্ঞান অর্জ্জন ও জ্ঞান দানেই জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন, যদিও তাঁহার জাতির পিতৃভূমি তিনি খুঁজিয়া পান নাই। তাঁহার জীবন তপস্বীর মত সাদাসিধে ছিল। তিনি মদ্য, তামাক বা অন্যবিধ কোন মাদক বা উত্তেজক দ্রব্য ব্যবহার করিতেন না। চা আর ভাত, এই তাঁহার খাদ্য ছিল। তাঁহার কেবল এক প্রস্থ পোষাক ছিল। তাঁহার সমুদয় আয় প্রাচ্যবিদ্যার নানা শাখার উন্নতি ও বিস্তারকল্পে ব্যয়িত হইত। তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি তিব্বতী-সংস্কৃত-ইংরাজী অভিধান প্রকাশিত হইতেছে। তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থে তদীয় প্রবন্ধগুলিও গ্রন্থকারে মুদ্রিত হইবে। এমন জ্ঞানব্রত তপস্বীব জীবনচরিত আলোচনা করিলে উপহার হয়।

দুইজন বাঙ্গালী মনীষী, রাজনারায়ণ বসু ও তাঁহার সহাধ্যায়ী ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কনৌজে পিতৃভূমি দর্শন কবিতে গিয়াছিলেন। অবশ্য ক্ষোমা ডি কোরসের পিতৃভূমি দর্শন-যাত্রার মত উহা দুঃসাধ্য ছিল না, এবং সেইজন্য তেমন চিরস্মরণীয়ও হয় নাই।

১৩২০ জ্যৈষ্ঠ

স্বর্গীয় বিনয়েন্দ্রনাথ সেন।

অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেন জ্ঞানের বিস্তৃতি ও গভীরতা এবং চরিত্রের পবিত্রতা ও মাধুর্য্যের জন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। অধ্যাপনা কার্য্যে তাঁহার মত কৃতিত্ব ও যশ সকলে লাভ করিতে পারেন না। তিনি সুলেখক ও সুবক্তা ছিলেন। ইউরোপ ও আমেরিকায় তিনি যেখানে যেখানে বক্তৃতা করিয়াছেন, সেখানেই লোকের মনে নিজ ধর্ম্মভাব মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন। ছাত্রদের সঙ্গে তাঁহার অনেক সময় যাপিত হইত। তিনি ছাত্রদিগকে ভালবাসিতেন, এবং ছাত্রেরাও তাঁহাকে ভালবাসিত ও ভক্তি করিত। হৃদয়ের যোগের দ্বারাই মানুষ অপরের প্রকৃত উপকার করিতে পারে। এই জন্য অনেক ছাত্র তাঁহার দ্বারা উপকৃত হইয়াছিল। দরিদ্র নিরক্ষর লোকদিগের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, প্রভৃতি নানাবিধ জনহিতকর কার্য্যের সহিত তাঁহার যোগ ছিল। ভগবদ্ভক্তি তাঁহার সকল শক্তির উৎস ছিল। ভগবদ্ভক্তিই তাঁহাকে দীর্ঘকাল ধীর ভাবে রোগযন্ত্রণা সহ্য করিতে সমর্থ করিয়াছিল। এমন একটি মানুষের মত মানুষ ৪৫ বৎসর পূর্ণ না হইতেই কালগ্রাসে পতিত হইলেন, ইহা গভীর শোকের বিষয়।

১৩২০ আষাঢ়

ডেভিড হেয়ার

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

দুর্গতি-দুর্গম দেশে ভালবেসে আত্মীয়ের মত
জ্বেলেছিলে শুভ্র দীপ শুদ্ধ জ্ঞান প্রবুদ্ধ করিতে;
জনমি খ্রীষ্টান-কুলে খ্রীস্ট-নামের তরাতে তরিতে
চাই নাই; তাইত নাস্তিক তুমি নর-সেবা-ব্রত!

অর্থ দানে মুক্তপানি, বিদ্যা দানে অতন্দ্র নিয়ত,
আর্ত্তের ছাত্রের বন্ধু, ছিলে পটু মানুষ গড়িতে
স্নেহবিত্ত চিত্ত দানে; নব্য বঙ্গে—বিকল ঘড়িতে
বিনিমূলে কল-বল নিত্য তুমি জোগায়েছ কত!

কুড়ায়ে পথের রোগী সংক্রামকে দিলে তুমি প্রাণ,—
তবুও নাস্তিক তুমি!—ও অস্থি নেবে না গোবস্থান!

তাই ছাত্র-পল্লী-তলে বিরাজিছ ছাত্রের দেবতা।
সমাধা—সমাধি সেথা পবিত্র ব্রতের যেথা সুরু!
ছাত্র-পরম্পরা স্মরে পুণ্য তব জীবনের কথা—
মনুষ্যত্ব-ধর্ম্মে পূত—হে নাস্তিক! আস্তিকের গুরু!

১৩২১ শ্রাবণ

অধ্যাপকের প্রতি অবিচার।

[অধ্যাপক যদুনাথ সরকার]

অধ্যাপক যদুনাথ সরকার পনের বৎসর পাটনা কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপকতা করিতেছেন। তিনি তথায় এম্ এ পর্য্যন্ত পড়ান। অধ্যাপনা-কার্য্যে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তিনি বহু বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষের নানা প্রাচীন সহরে ঘুরিয়া মোগল রাজত্বকাল সম্বন্ধে প্রাচীন বহুসংখ্যক ফারসী হস্তলিপি সংগ্রহ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য নানা দেশে এইরূপ যত হস্তলিপি নানা পুস্তকালয়ে ও মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে, তিনি বহু চেষ্টায় ও অর্থব্যয়ে সে সকলের নকল আনাইয়াছেন। তাহার পর তৎসমুদয় বহুশ্রমে পাঠ করিয়া তাহা হইতে ঐতিহাসিক সত্যের উদ্ধার করিয়া ঐতিহাসিক প্রবন্ধ ও পুস্তক লিখিয়াছেন। স্বদেশে বিদেশে ঐতিহাসিক বলিয়া তাঁহার প্রভূত খ্যাতি হইয়াছে। মোগল শাসনকাল সম্বন্ধে জীবিত ঐতিহাসিকগণের মধ্যে তাঁহার কথা এখন স্বদেশে বিদেশে সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হয়। তিনি যে অতি সুন্দর ইংরাজী লিখিতে পারেন, ইহা ইংরাজেরাও স্বীকার করেন। এম্, এ, পরীক্ষায় ইংরাজী রচনায় ১০০ নম্বরের মধ্যে অধ্যাপক জেম্‌স্ যখন তাঁহাকে ৯৫ দিয়াছিলেন, তখনই বুঝা গিয়াছিল, কালে তিনি কিরূপ সুলেখক হইবেন। তিনি যে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পাইয়াছিলেন, তাহা শিক্ষিত বাঙ্গালীর অজ্ঞাত

নহে। তিনি এম্ এ পরীক্ষায় পর্য্যন্ত পরীক্ষকের কাজ করিয়া থাকেন। কিন্তু এরূপ পাণ্ডিত্য, ঐতিহাসিক গবেষণাশক্তি, অধ্যাপনায় দক্ষতা এবং ইংরাজী লেখায় কৃতিত্ব থাকা সত্ত্বেও তিনি প্রাদেশিক শিক্ষাবিভাগে কাজ করেন; ইংরেজদের প্রায় একচেটিয়া, উচ্চতর, "ভারতীয়" শিক্ষাবিভাগে স্থান পান নাই। এই ত এক অবিচার। তাহার উপর আর এক অবিচার এই হইতেছে যে পাটনা কলেজেই তাঁহার উপর একজন ইংরেজকে ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত করা হইতেছে। তাঁহার নাম ডবলিউ আউষ্টন্ স্মিথ। তিনি যে যোগ্য লোক তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি যদুবাবুর সমান যোগ্য নহেন. যোগ্যতর ত নহেনই। স্মিথ সাহেবের বন্ধুগণ বলেন, তিনি কেম্ব্রিজের বি এ পরীক্ষায় ইতিহাসে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। যদুবাবু কলিকাতার এম্ এতে প্রথম স্থান অধিকার করেন ও তৎপরে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি প্রাপ্ত হন। যখন আমরা পৃথিবীর কোন খবর রাখিতাম না, তখন কেহ বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই দেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎকৃষ্টতম ছাত্র অপেক্ষা তাঁহাকে পণ্ডিত বলিয়া ধরিয়া লইতাম। এখন কিঞ্চিৎ খবর রাখি, এবং দেশী বিলাতী দুরকম গ্রাজুয়েটের নমুনাও দেখিয়াছি। সুতরাং কেম্ব্রিজের বিএতে দ্বিতীয় হইলেই তাহাকে কলিকাতার এম-এতে প্রথমস্থানীয় প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিতে পারি না। স্মিথ সাহেবের বন্ধুগণ আর এক কথা এই বলেন যে কেম্ব্রিজের পরীক্ষায় তাঁহার নীচে হইয়াছিল এমন একজন সিবিল সার্বিস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সিবিলিয়ান হইয়াছেন। পরীক্ষায় যদুবাবুর অনেক নিম্নস্থানীয় একজন লোকও সিবিলিয়ান হইয়াছেন। সুতরাং এ বিষয়েও স্মিথ্ সাহেব যদুবাবু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহেন। মিঃ স্মিথ এম্ এর পরীক্ষক হইয়াছেন। এ কাজ যদুবাবু তাঁহার চেয়ে অনেক আগে হইতেই করিতেছেন। স্মিথ্ সাহেব ১৯০৯ সাল হইতে ৫ বৎসর অধ্যাপকতা করিতেছেন। কিন্তু যদুবাবু ২১ বৎসর অধ্যাপকতা করিতেছেন; তন্মধ্যে ১৬ বৎসর গবর্ণমেণ্ট কলেজে কাটাইয়াছেন। স্মিথ্ সাহেব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো; যদুবাবু নহেন। কিন্তু সকলেই জানেন, কেবল বিদ্যাবত্তার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো হওয়া যায় না। তাহা হইলে, জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ফেলোও নহেন, এমনটি ঘটিত না। স্মিথ্ সাহেব এম্-এ পড়ান নাই, যদুবাবু অনেক বৎসর ধরিয়া এম্-এ পড়াইতেছেন। যদুবাবু ঐতিহাসিক গবেষণা করিয়া ও পুস্তক লিখিয়া যোগ্য ইংরেজ লেখক ও সমালোচকদিগের দ্বারা প্রশংসিত হইয়াছেন, স্মিথ সাহেবের এরূপ কোন কৃতিত্ব নাই।

১৩২৪ ভাদ্র

অধ্যাপক যদুনাথ সরকারের পাটনা ত্যাগ

অধ্যাপক যদুনাথ সরকার বহু বৎসর পাটনা কলেজে খুব যোগ্যতার সহিত ইতিহাসের অধ্যাপকতা করিতেছিলেন। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ইতিহাসের অধ্যাপক মনোনীত করায় তিনি বারাণসী যাইতেছেন। তদুপলক্ষে পাটনাব বিহারী বাঙালী হিন্দু মুসলমান একত্র হইয়া তাঁহাকে যথাযোগ্য ভাবে বিদায় দিবার আয়োজন করিবার নিমিত্ত সম্প্রতি সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। তথায় বহু প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি তাঁহার পাণ্ডিত্য, অধ্যাপনদক্ষতা, ছাত্রদের প্রতি অনুরাগ ও তাহাদের হিতৈষণা, ঐতিহাসিক গবেষণায় অনুরাগ পরিশ্রম ও কৃতিত্ব, অনাড়ম্বর সরল ব্যবহার, নির্ম্মল চরিত্র, প্রভৃতির প্রশংসা করেন। এ-সমস্ত পড়িয়া আমরা আহ্লাদিত হইয়াছি। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও সুখী হইয়াছি আর একটি খবর পড়িয়া। এক্সপ্রেস্ কাগজে দেখিলাম বাঁকীপুরের কাহার জাতীয় লোকেরা তাঁহার বিদায়সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করিতেছে। কাহারেরা অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর লোক, লোকের বাড়ী চাকরী করে, ডুলি পাল্কী বহে, ও অন্যান্য দৈহিক শ্রমের কাজ করিয়া রোজগার করে। মদ্যপান তাহাদের মধ্যে প্রচলিত। যদুবাবু নানা- প্রকারে তাহাদের কল্যাণ-সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। পশ্চিমে হোলী বা দোলের সময় অশ্লীল গান, জঘন্য গালাগালি, পরস্পরের গায়ে রং, গোবর, নর্দ্দমার জল ও কাদা নিক্ষেপ, মাতলামি, প্রভৃতি লক্ষিত হয়। যদুবাবু কাহারদের মধ্যে "শুদ্ধ হোলী" প্রচলিত করিবার ও মদ্যপান নিবারণের চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাহাতে কতকটা সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তজ্জন্য কাহারেরা তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাইতে চায়। "নিম্ন" শ্রেণীর লোকের প্রতি এইরূপ প্রাণের টান দেশ-সেবকের চরিত্রের অলঙ্কার।

যদুবাবুর মত বিদ্বান্, বিচক্ষণ ও চরিত্রবান্ অধ্যাপককে গবর্ণমেণ্ট শিক্ষাবিভাগের উচ্চতম শ্রেণীর কাজ দিতে পারিলেন না, অথচ শাদা চামড়ার জোরে কত টম্ ডিক্ বব্ হ্যারি এরূপ কাজ পাইতেছে। এইরূপ ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থার ফল শিক্ষিত ভারতবাসীদের হাড়ে হাড়ে বসিতেছে।

১৩২১ কার্ত্তিক

সার তারকনাথ পালিত

গত আশ্বিন মাসে সার্ তারকনাথ পালিত দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্রবে বিজ্ঞানকলেজ স্থাপনার্থ জীবিত কালেই ১৫ লক্ষ টাকা দান করেন। সৎকার্য্যে অন্যান্য দানের মধ্যে ইহাই তাঁহার প্রধান দান।

বিজ্ঞানের অনুশীলন নানা কারণে আবশ্যক। ইহাতে বুদ্ধি মার্জ্জিত হয় ও জ্ঞান বৃদ্ধি হয়। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান শিল্পে প্রযুক্ত হইলে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে ও অল্প পরিশ্রমে মানুষের দরকারী বিস্তর জিনিষ প্রস্তুত হয়। স্থলপথে, জলপথে, ও আকাশপথে যাতায়াতের জন্য বৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্রযুক্ত হওয়ায় পৃথিবীতে কিরূপ যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, তাহা সকলেই জানেন। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অস্ত্র নির্ম্মাণে প্রযুক্ত হওয়ায় সেরূপ অস্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা অতি ভয়ঙ্কর তাহাতে মানুষের কল্যাণ বা অকল্যাণ হইতেছে, বলা কঠিন। আত্মরক্ষা, দুর্ব্বলের রক্ষা, স্বাধীনতারক্ষা, স্বাধীনতালাভ, বা একম্বিধ কোন উদ্দেশ্যে যুদ্ধ বৈধ। কিন্তু এরূপ উদ্দেশ্য সেকালের যুদ্ধে সাধিত হইবার অধিক সম্ভাবনা ছিল, কি একালের যুদ্ধে অধিক সম্ভাবনা হইয়াছে, বলা কঠিন। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান মানুষের নানা ব্যাধির চিকিৎসার্থ প্রযুক্ত হওয়ায় যে রোগ নির্ণয় ও রোগ চিকিৎসা পূর্ব্বাপেক্ষা সহজ হইয়াছে, মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষার ও দীর্ঘজীবন লাভের উপায় মানুষ যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বুঝিতে পারিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বিজ্ঞানচর্চ্চার আর একটি সুফল আছে, যাহা সহজে মানুষের চোখে পড়ে না। অশিক্ষিত মানুষ সহজেই যা তা বিশ্বাস করে। তাহার মন বড় কুসংস্কারপ্রবণ। শিক্ষিত মানুষ অশিক্ষিতের চেয়ে একটু বেশী সংশয়বাদী; সে বিশ্বাস করিবার আগে একটু বেশী প্রমাণ চায়। শিক্ষিতদের মধ্যে আবার যাহারা বৈজ্ঞানিক শিক্ষা পাইয়াছে, তাহারা সহজে যা তা মানে না, যথেষ্ট প্রমাণ চায়। কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক শিক্ষা এবং বিজ্ঞানের কোন শাখায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ এক কথা নহে। পর্য্যবেক্ষণ (observation) দ্বারা বা পরীক্ষা (experiment) দ্বারা, বা উভয় উপায়ে যাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না, জড়বস্তুসংপৃক্ত এরূপ কোন ব্যাপারে বিশ্বাস না করা, প্রমাণ পাইলে তবে বিশ্বাস কবা, ঐ দুই উপায়ে নূতন নূতন তথ্য ও সত্য আবিষ্কার করা, ইহাই বৈজ্ঞানিকের প্রকৃতি। বৈজ্ঞানিক শিক্ষা দ্বারা যদি জাতীয় চরিত্র এই রূপ বৈজ্ঞানিক প্রবৃত্তি ও শক্তি লাভ করে, তাহা হইলেই বৈজ্ঞানিক শিক্ষা সার্থক হয়। নতুবা বি এস্‌সি বা এম্ এসসি হইয়াও মানুষ যদি অশিক্ষিত মজুরের মত কুসংস্কারাবিষ্ট, নানা ভয়ে আড়ষ্ট থাকে, জগৎকে যদি সে নূতন চোখে দেখিতে না শিখে, তাহা হইলে বিজ্ঞান শিক্ষা বৃথা!

পালিত মহাশয়ের দানের ফলে যদি কেবল আরও কতকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী বাড়ে, তাহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। যদি বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির মানুষ দেশে বাড়িতে থাকে, তাহা হইলেই তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে, এবং তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।

——

১৩২২ কার্ত্তিক

শ্রেষ্ঠ আভিধানিকের তিরোধান।

[সার জেম্‌স মারে]

অক্‌সফর্ড হইতে প্রকাশিত এখনও অসম্পূর্ণ ও অতি বৃহৎ অতুৎকৃষ্ট New English Dictionary সঙ্কলনকর্ত্তা সার জেম্‌স মারের মৃত্যু হইয়াছে। ইতি অদ্ভুতকর্ম্মা অসাধারণ ধৈর্য্যশীল ও অধ্যবসায়পরায়ণ ছিলেন। তাঁহার অভিধান সঙ্কলনের ইতিহাস হইতে বুঝিতে পারা যায়, যে, অভিধান কেমন করিয়া সঙ্কলন করিতে হয় এবং তাঁহার সঙ্কলিত অভিধান কিরূপ উপাদেয় ও নির্ভরযোগ্য হইয়াছে।

ছত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে (১৮৭৯ সালে) প্রসিদ্ধ ভাষাতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক স্কীট ও ডাক্তার ফার্ণিভালের সহযোগে এই কর্ম্মের সূত্রপাত করেন; সহকারীদের তিরোধানেও প্রধান কর্ম্মীর উৎসাহ কমে নাই—৭৮ বৎসর বয়সেও তিনি দিবা রাত্রি পরিশ্রম করিয়া ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া গিয়াছেন। সপ্তাহে তিনি ৯০ ঘণ্টা করিয়া খাটিতেন; এক ক্রিয়া-সূচক to কথাটির ইতিহাস লিখিতে তাঁহার দুই মাস লাগিয়াছিল। ফাইললজিক্যাল সোসাইটি অর্থাৎ ভাষাতত্ত্বের সভা যে শব্দ সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা লইয়া কার্য্য আরম্ভ করেন; সেই শব্দগুলিকে বর্ণমালার অনুক্রমে সাজাইয়া লইতে তিন বৎসর লাগিয়াছিল; এক-একটি শব্দ এক-একটি কাগজের টুকরায় লেখা হইতেছিল—সেই টুকরাগুলির ওজন হইয়াছিল ৫৬ মণ! তাঁহার আহ্বানে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় ৮০০ পাঠক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বিভিন্ন বই পড়িয়া শব্দের ব্যবহারের পরিচায়ক ৫০ লক্ষ পদ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছিলেন; ১৫০০ সাল পর্য্যন্ত ইংরেজিতে যত বই প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার সমস্তই পড়া হইয়াছিল, একখানিও বাদ পড়ে নাই; তার পরের সমস্ত প্রধান বই পড়া হইয়াছিল। এত চেষ্টা সত্ত্বেও অনেক শব্দের ইতিহাস ও উৎপত্তি ধরা পড়ে নাই বলিয়া মারে স্বীকার করিয়াছেন!

১৩২৩ শ্রাবণ

পরলোকগত ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী।

পরলোকগত ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুবী মহাশয় বহুবৎসর শিক্ষাবিভাগে যোগ্যতার সহিত কাজ করিয়া অবসর গ্রহণ পূর্ব্বক ওড়িশায় বাস করিতেছিলেন। তিনি "মানবপ্রকৃতি" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে এবিষয়ে বাংলাভাষায় কোন গ্রন্থ লিখিত হয় নাই। তাঁহার ভারতবর্ষের ইতিহাস একদা বাংলা বিদ্যালয়সকলের পাঠ্যপুস্তক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মবিষয়ে এবং জাতিবিজ্ঞান (ethnology) সম্বন্ধে তিনি অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তিনি

কটক হইতে একখানি বাংলা মাসিক কাগজ বাহির করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্পাদিত ষ্টার অব্ উৎকল নামক ইংরেজী সংবাদপত্র দ্বারা ওড়িশার উপকার হইতেছিল; কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে তাহার জন্য গবর্ণমেন্ট তাঁহার নিকট হইতে জামিন চাওয়া তিনি প্রেস বন্ধ করিয়া কাগজখানি উঠাইয়া দেন। তাহার পর তিনি একটি স্কুল খুলিয়াছিলেন।

—

১৩২৩ মাঘ

পর্য্যটক পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র দাস

রাজা রামমোহন রায় ষোল বৎসর বয়সে হিমালয় অতিক্রম করিয়া তিব্বত দেশে গিয়াছিলেন, তাঁহার জীবন-চরিতে এই কথা লিখিত আছে; কিন্তু তাঁহার তিব্বত ভ্রমণের বিশেষ কোন বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। তিব্বত অজ্ঞাত দেশ বলিয়াই পরিচিত ছিল। এই অজ্ঞাত দেশে গিয়া তাহার বৃত্তান্ত সভ্য সমাজে বিস্তারিত ভাবে প্রথম প্রকাশ করেন, একজন বাঙালী। তিনি রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাস, সী, আই, ঈ,। সম্প্রতি ৬৭ বৎসর বয়সে তিনি দেহ-ত্যাগ করিয়াছেন। ভৌগোলিক আবিষ্কার বড় বিপৎসঙ্কুল কাজ। ইহাতে শক্ত দেহ, শক্ত মন, সাহস, উপস্থিত বুদ্ধি, কৌশল, সবই দরকার। হিমালয়ের তুষাররাশি অতিক্রম করিয়া, যে-দেশের লোকেরা বিদেশীদিগকে বরাবর সন্দেহ করিয়া তাহাদের তিব্বত প্রবেশে বাধা দিয়া আসিতেছে, সেই দেশে ১৮৭৯ ও ১৮৮১ সালে দুই দুইবার গিয়া তথাকার রীতিনীতি ও ধর্ম্মের বিষয় অবগত হইয়া, পুস্তকাদি সংগ্রহ করিয়া, তিনি যে ফিরিয়া আসেন, ইহা খুব বাহাদুরী। তাঁহার দুইবার তিব্বত-প্রবাসের বৃত্তান্ত ভারতগবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইয়া, রাজনৈতিক কারণে ১৮৯০ সাল পর্যন্ত গোপনে রাখা হইয়াছিল। ১৮৯৯ সালে তাহা রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটী দ্বারা সম্পাদিত হইয়া ১৯০২ সালে প্রকাশিত হয়। তাহাতে তিব্বতের ধর্ম্ম, জাতিতত্ত্ব (ethnology) এবং নানা কুসংস্কার সম্বন্ধে বহুমূল্য তত্ত্ব নিবদ্ধ আছে। শরচ্চন্দ্র তিব্বত হইতে তিব্বতী ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত অনেক পুস্তক আনিয়াছিলেন। তন্মধ্যে খুব মূল্যবান গ্রন্থগুলি তিনি সম্পাদন ও প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কোন কোনটির সম্পাদনে তিনি তাঁহার বন্ধু উগ্যেন্ গ্যাৎসো এবং অন্যান্য লামা (তিব্বতীয় পুরোহিত) দিগের সাহায্য পাইয়াছিলেন। তিনি একখানি তিব্বতী-ইংরাজী অভিধান প্রণয়ন করেন। তিনি ১৮৮৪ সালে সিকিম ও তিব্বতসীমান্ত প্রদেশে যাত্রা করেন। পর বৎসর চীনদেশ দর্শন করেন। ১৮৮৭ সালে তিনি শ্যামদেশে গিয়া রাজবংশীয় বজ্রজ্ঞান বরোরসের নিকট বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন এবং শ্যামদেশের রাজা দ্বারা তুষিত-মত পদকে ভূষিত হন। তাঁহার ভৌগোলিক আবিষ্কারের জন্য তিনি রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটী কর্ত্তৃক পুরস্কৃত হন। গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে বার্ষিক ৫০০ টাকা আয়ের জায়গীর, এবং রায় বাহাদুর ও সী,

আই, ঈ উপাধি দিয়াছিলেন। তিনি গত বৎসর জাপান ভ্রমণ করেন, এবং তৎসম্বন্ধে মডার্ণ রিভিউ কাগজে ইংরেজী প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাঁহার তিব্বত-যাত্রার বৃত্তান্ত মডার্ণ রিভিউ মাসিক পত্রে বহু সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৩২৫ আষাঢ়

স্বর্গীয়া মহারাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবী

ত্রিপুরার মহারাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবী সম্প্রতি দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি পরলোকগত বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের প্রথমা কন্যা ছিলেন। মহারাজকুমারী অনঙ্গমোহিনীর কবিত্ব-শক্তি ছিল। তদ্ভিন্ন তিনি সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যায় নিপুণ ছিলেন। কণিকা, শোকগাথা ও প্রীতি তাঁহার তিনখানি কবিতা-পুস্তক। কোন কোন মাসিক পত্রে তাঁহার কবিতা মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হইত। তদ্ভিন্ন তাঁহার রচিত অপ্রকাশিত অনেক কবিতা আছে। আগরতলা হইতে শ্রীসুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, "ইনি অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। বৈধব্যাবস্থায় কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেন। ইহাঁর পতির শ্মশানে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন ও সেখানে প্রস্তরফলকে একটি কবিতা লিখাইয়া রাখেন। কত লোক যে তাঁহার সাহায্যে বিপন্মুক্ত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা করা দুরূহ। বৈষয়িক ব্যাপারেও তাঁহার অশেষ দক্ষতা ছিল। বৈধব্যাবস্থায় তাঁহার স্বীয় জমিদারীর কার্য্যাদি নিজ হস্তে বিশেষ দক্ষতার সহিত করিতেন।"

স্বর্গীয় ব্রহ্মানন্দ সিংহ

আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের বাঙ্গালীদের মধ্যে একজন সৎকর্ম্মোৎসাহী, বিদ্বান, অমায়িক ও সচ্চরিত্র কৃতী পুরুষ সম্প্রতি অকালে পঞ্চাশ বৎসর বয়সে পরলোকে গিয়াছেন। ইঁহার নাম ব্রহ্মানন্দ সিংহ। ইনি এম্-এ উপাধিধারী ছিলেন। অনেক বৎসর রামপুর রাজ্যের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। এলাহাবাদে বহুবৎসর পূর্ব্বে ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন নামক যে খবরের কাগজ ছিল, ইনি কয়েক বৎসর তাহা সম্পাদন কবিয়াছিলেন। ২২/২৩ বৎসর পূর্ব্বে তিনি ইংরেজীতে শিক্ষাবিষয়ক একটি মাসিকপত্র বাহির করিয়াছিলেন। লক্ষ্ণৌ শহরে যে আপার ইণ্ডিয়া কূপার পেপার মিল্‌স্ নামক কাগজের কল আছে, তিনি অনেক বৎসর তাহার কর্ম্মাধ্যক্ষ

ছিলেন। ইহার প্রায় সমস্ত মূলধন দেশী লোকের। তিনি কিছুকাল হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়-সমিতির সহকারী সম্পাদক ছিলেন। অর্থকর শিল্প সম্বন্ধীয় নানা বিষয়ের তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। তিনি ১৯১৪ সালে আগ্রা-অযোধ্যার প্রাদেশিক শিল্পসম্বন্ধীয় আলোচনা সভার সভাপতি হইয়াছিলেন। সার্ব্বজনিক সমুদয় বিষয়ে তাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল এবং তৎসম্বন্ধে তিনি সংবাদপত্রে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিতে পারিতেন।

১৩২৬ আষাঢ়

অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

সভ্য জগতের সঙ্গে সমকক্ষের মত কাজ করিতে ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু নানা কারণে আমরা পাশ্চাত্য অনেক দেশের লোকদের মত শক্ত দেহ ও জীবনীশক্তি লইয়া জন্মি না। তাহার উপর, স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দেশের অবস্থা ভাল নয়, দারিদ্র্য আছে, এবং স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে আমাদের অবহেলা আছে। এইরূপ নানা কারণে আমাদের দেশের অনেক প্রতিভাশালী লোক অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। ৫৫ বৎসর বয়সে পাশ্চাত্য অনেক দেশে মানুষ পূর্ণ শক্তিতে কাজ করে। অনেক বিখ্যাত কর্ম্মিষ্ঠ সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, রাজনীতিজ্ঞ ও সেনাপতির বয়স ৭০ এরও উপর। কেহ কেহ ৮০ বৎসর বয়সেও যুবার মত কাজ করিতে পারেন। যেমন ফরাসী রাষ্ট্রপতি ক্লেমেন্সো।

আর বাংলাদেশে অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মত সৎ ও প্রতিভাশালী লোকের ৫৫ বৎসর বয়সেই মৃত্যু হইল। তিনি এরূপ জরাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে তাঁহাকে দেখিলে বয়স ৭০/৭৫ বলিয়া মনে হইত; কেবলমাত্র তাঁহার উজ্জ্বল চক্ষু বলিয়া দিত যে তাঁহার মন সতেজ আছে।

রামেন্দ্রসুন্দর অতিশয় মেধাবী ছাত্র ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটিমাত্র পরীক্ষা ভিন্ন আর সবগুলিতে তিনি পারদর্শিতা অনুসারে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃতিত্বের সর্ব্বোচ্চ নিদর্শন ও পুরস্কার প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পাইয়াছিলেন। তাহার পর তিনি রিপন কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন, এবং তৎপরে জীবনের শেষ বহু বৎসর উহার অধ্যক্ষতা করিয়া গিয়াছেন। একই কলেজে বরাবর অধ্যাপকতা করার এরূপ দৃষ্টান্ত বেশী দেখা যায় না।

পরীক্ষায় ভাল পাস করিতে এবং অধ্যাপকতা বা অন্য চাকরী করিতে আরো অনেককে দেখা গিয়াছে। ত্রিবেদী মহাশয়ের অন্য বিশেষত্ব ছিল। ছাত্রাবস্থায় বিজ্ঞান তাঁহার বিশেষ অনুশীলনের বিষয় ছিল, এবং তাহাতে তিনি পারদর্শীও হইয়াছিলেন। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পাইবার জন্য তাঁহাকে যাহা লিখিতে হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার বৈজ্ঞানিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। তিনি যদি বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিযুক্ত থাকিতেন,

তাহা হইলে তাঁহার মত প্রতিভাশালী লোকের দ্বারা বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া হইতে পারিত। কিন্তু কলেজে বিজ্ঞান তাঁহার অধ্যাপনার বিষয় থাকিলেও এবং বাংলা ভাষায় বিশদভাবে অনেক বৈজ্ঞানিক বিষয়ে প্রবন্ধ ও পুস্তকা রচনা করিলেও, বৈজ্ঞানিক গবেষণা তাঁহার প্রধান চেষ্টার বিষয় ছিল না। বাংলা সাহিত্য তাঁহাব চেষ্টা দ্বারা পুষ্টি লাভ করিয়াছে। তাঁহার স্বাধীন চিন্তা প্রধানতঃ দর্শন শাস্ত্রের পথে ধাবিত হইযাছিল। তিনি ইংরেজীও বেশ লিখিতে পারিতেন, কিন্তু লোককে যাহা কিছু বলিবার তাহা বাংলাতেই বলিতেন। দার্শনিক প্রবন্ধও বাংলাতেই লিখিতেন। তাঁহার এইরূপ কোন কোন প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মৈত্রেয় জার্মেন ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন, এবং সেগুলি জার্মেনীতে আদৃত হইয়াছিল।

তিনি পঁচিশ বৎসর ধরিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের সেবা করিয়াছিলেন, এবং মৃত্যুর সাতদিন পূর্ব্বে উহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিভা, পাণ্ডিত্য, বঙ্গসাহিত্যে স্থান, ও বঙ্গসাহিত্য ও ভাষার সেবা, এবং বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের সেবার কথা ভাবিলে নিঃসংশয়ে বলা যায়, যে, আরও অনেক পূর্ব্বে তাঁহাকে পরিষদের সভাপতি নির্ব্বাচন করা উচিত ছিল।

১৩২১ সালের ভাদ্রমাসে ত্রিবেদী মহাশয়ের বয়স পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করেন। তদুপলক্ষে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন, তাহা রামেন্দ্রবাবুর কীর্ত্তি ও প্রকৃতির সম্যক্ পরিচায়ক। উহা পুনর্মুদ্রিত করিতেছি।

সুহৃত্তম শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হে মিত্র, পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ণ করিয়া তুমি তোমার জীবনের ও বঙ্গসাহিত্যের মধ্যগগনে আরোহণ করিয়াছ, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

যখন নবীন ছিলে তখনই তোমার ললাটে জ্ঞানের শুভ্র মুকুট পরাইয়া বিধাতা তোমাকে বিদ্বৎসমাজে প্রবীণের অধিকার দান করিয়াছিলেন। আজ তুমি যশে ও বয়সে প্রৌঢ়, কিন্তু তোমার হৃদয়ের মধ্যে নবীনতার অমৃতরস চিরসঞ্চিত। অন্তরে তুমি অজর, কীর্ত্তিতে তুমি অমর, তোমাকে সাদর অভিবাদন কবিতেছি।

সর্ব্বজনপ্রিয় তুমি মাধুর্য্যধারায় তোমার বন্ধুগণের চিত্তলোক অভিষিক্ত করিয়াছ। তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর, হে রামেন্দ্রসুন্দর, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

পূর্ব্বদিগন্তে তোমার প্রতিভার রশ্মিচ্ছটা স্বদেশের নবপ্রভাতে উদ্বোধন সঞ্চার করিতেছে। জ্ঞান প্রেম ও কর্ম্মের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যে চিরদিন তুমি দেশমাতার পূজা করিয়াছ। হে মাতৃভূমির প্রিয়পুত্র, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

সাহিত্য পরিষদের সারথী তুমি, এই রথটিকে নিরন্তর বিজয়পথে চালনা করিয়াছ। এই দুঃসাধ্য কার্য্যে তুমি অক্রোধ দ্বারা ক্রোধকে জয় করিয়াছ, ক্ষমার দ্বারা বিরোধকে বশ করিয়াছ, বীর্য্যের দ্বারা অবসাদকে দূর করিয়াছ এবং প্রীতির দ্বারা কল্যাণকে আমন্ত্রণ করিয়াছ। আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

প্রিয়াণাং ত্বা প্রিয়পতিং হবামহে।
নিধীনাং ত্বা নিধিপতিং হবামহে॥

প্রিয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রিয় তুমি, তোমাকে আহ্বান করি; নিধিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিধি তুমি তোমাকে আহ্বান করি। তোমাকে দীর্ঘ জীবনে আহ্বান করি, দেশের কল্যাণে আহ্বান করি, বন্ধুজনের হৃদয়াসনে আহ্বান করি।

৫ই ভাদ্র ১৩২১ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ইহাতে যে কেবল কবির নিজের হৃদয়েরই ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা নয়; রামেন্দ্রবাবুকে যিনি জানিতেন, তিনিই কবির কথায় সায় দিয়াছিলেন।

তিনি অতি অমায়িক ও সদাশয় লোক ছিলেন। কিন্তু "ভালমানুষ" ছিলেন বলিয়া তাঁহার যে একটা স্বাধীন স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব ছিল না, তাহা নয়। স্বমতে দৃঢ়তা তাঁহার ছিল, যদিও দুর্দ্দান্ত লোকদের উৎপীড়ন তিনি বিরক্ত না হইয়া সহ্য করিতেন। তিনি স্বদেশ-প্রেমিক ছিলেন।

বঙ্গে প্রতিভাশালী লেখকদের রচনার প্রকৃত সমালোচনা অল্পই হয়; লেখাটি ভাল বা মন্দ, সমালোচকের তাহা ভাল লাগিল বা মন্দ লাগিল, অধিকাংশ স্থলে তাহাই বলা হয়। ত্রিবেদী মহাশয়ের সামাজিক, সাহিত্যিক, দার্শনিক নানা মতের সমালোচনা অল্পই হইয়াছে। তাহা কেহ করিলে তাঁহার প্রতি প্রকৃত সম্মান দেখান হইবে।

১৩২৭ জ্যৈষ্ঠ
মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ

মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ পালি ও সংস্কৃতে পণ্ডিত, অমায়িক ও সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি খুব পরিশ্রমী ছিলেন এবং অনেকগুলি পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে সংস্কৃত পালি ও প্রত্নতত্ত্ব অনুশীলনের ক্ষতি হইল।

১৩২৮ আশ্বিন
বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনীষী কে?

এইরূপ প্রশ্নের উত্তর পাইবার জন্য ইউরোপ ও আমেরিকার ধনাঢ্য পত্রিকাগুলি পুরস্কার ঘোষণা করেন, অথবা এক হাজার বিখ্যাত লোকের নিকট চিঠি লিখিয়া তাঁহাদের মত আনিয়া অধিকাংশের ভোট অনুসারে মনীষীগণের গুণানুক্রমিক তালিকা প্রকাশ করেন। আমাদের পুরস্কার দিবার মত অর্থ নাই এবং পত্র লিখিলে আমাদের দেশের অধিকাংশ ভদ্রলোকের উত্তর পাওয়া কঠিন। সুতরাং এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য আমরা নিজেই কিঞ্চিৎ "মৌলিক" গবেষণা করিতে বাধ্য হইয়াছি।

বিখ্যাত নাইন্‌টীন্থ, সেঞ্চুরী পত্রিকার মিস্‌টার লেনার্ড্ লিখিয়াছেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ের

কর্ত্তব্য, ছাত্রদিগকে জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনস্বীদের আদর করিতে শিখান।" "It is the function of University to train its students in the appreciation of the greatest minds the race has produced".

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশিকা হইতে বি-এ পর্য্যন্ত প্রতি পরীক্ষায় বাঙ্গালী ছাত্রদিগকে বাঙ্গালা পড়িতে ও লিখিতে বাধ্য করিয়াছেন। গত দশবৎসরে (১৯১৩- ১৯২২ খৃঃ) এইসব পরীক্ষার বাংলা রচনার পাঠ্যপুস্তকগুলি গণিলে দেখা যায়, কোন গ্রন্থকার কত বার পঠিত হইবার উপযুক্ত বিবেচিত হইয়াছেন। সে গণনাফল এইরূপ :—

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	১৪	বার
বঙ্কিমচন্দ্র	১০	"
চন্দ্রনাথ বসু	১০	"
যোগীন্দ্রনাথ বসু	১০	"
চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১০	"
রাজেন্দ্র বিদ্যাভূষণ	১০	"
দীনেশচন্দ্র সেন	১০	"
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	৭	"
রবীন্দ্রনাথ	২	"

এখানে দুটি কথা মনে রাখিতে হইবে। চন্দ্রনাথের গ্রন্থবিশেষ অনেকবার নীতিশিক্ষার জন্য ছাত্রদিগকে পড়িতে দেওয়া হয়, ভাষা বা ভাবের জন্য নহে। আর, চণ্ডীচরণ ও যোগীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর ও মাইকেলের জীবনী লিখিয়াছেন, সুতরাং তাঁহারা এই দুই পাঠ্যগ্রন্থের রচয়িতা হইলেও, তাঁহাদের পুস্তকে বিদ্যাসাগর ও মাইকেল এবং তৎকালীন অন্যান্য মহাপুরুষের কথা ও পত্রগুলিই কার্য্যতঃ আসল পাঠ্য। সুতরাং শেষফল এই দাঁড়াইতেছে, যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের মতে দীনেশচন্দ্র সেন ও রাজেন্দ্র বিদ্যাভূষণ বঙ্কিমের সম্পূর্ণ সমকক্ষ এবং রামেন্দ্রসুন্দর হইতে প্রায় দেড়গুণ ও রবীন্দ্রনাথ হইতে পাঁচগুণ শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথকে বাঙ্গালীজাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনস্বী, the greatest mind of the race, বলিবার যত কারণ আছে, রাজেন্দ্র বিদ্যাভূষণ ও দীনেশ সেনকে সেই পদ দিবার তদপেক্ষা পাঁচগুণ প্রবল কারণ পাওয়া গিয়াছে।

বিষয়টা আর-একদিক দিয়া দেখিলে এই সত্যটা আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুসারে বিএ পরীক্ষার্থীগণ বাঙ্গালা পাঠ্যগ্রন্থের শুধু ভাষা শিক্ষা করিয়া ক্ষান্ত হইবে না, তাহার মর্ম্ম বিষয় ও ভাবগুলিও হৃদয়স্থ করিবে এবং তাহাতে পরীক্ষিত হইবে। গত দশ বৎসর বিএ পরীক্ষায় পাঠ্য ছিল—

বঙ্কিম—	১০	বার
চণ্ডীচরণ (অর্থাৎ বিদ্যাসাগর)—	১০	বার
রাজেন্দ্র বিদ্যাভূষণ—	৯	বার
রবীন্দ্রনাথ—	১	বার

অতএব প্রমাণ হইল, যে, রাজেন্দ্র বিদ্যাভূষণ রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা নয়গুণ greatest mind of the Bengali race, এবং রবীন্দ্রকে যে সাহিত্যসম্রাট, Laureate of Asia, প্রভৃতি বলা হয়, তাহা আমাদের ছোক্‌রাদের মোহ বা অবিদ্যার ফল। বিশ্ববিদ্যালয় গুণের যথার্থ আদর করেন, তিনি রাজেন্দ্রকে রবীন্দ্রের মাথার ৯ তলা উপরে এবং দীনেশচন্দ্রকে অনেক তলা উপরে বসাইয়া দিয়াছেন।

আমরা গবেষণা-কার্য্যে "নূতন ব্রতী" এবং গণিতে পারদর্শী নহি; সুতরাং উপরের অঙ্কগুলায় একআধটা ভুল "অসাবধানতা" বশতঃ থাকিলে তাহা কেহ দেখাইয়া দিলে সংশোধন করিব। তবে, ইহা নিশ্চিত, যে, রবীন্দ্রনাথ দীনেশচন্দ্র বা রাজেন্দ্রনাথ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনস্বী, ইহা কোন সংশোধন দ্বারা প্রতিপন্ন হইবে না।

১৩২৮ অগ্রহায়ণ

পণ্ডিত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য এম্ এ মহাশয় প্রায় ৭৪ বৎসর বয়সে প্রয়াগে তাঁহার দারাগঞ্জস্থ ভবনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে প্রয়াগ একজন অতি শ্রদ্ধাভাজন ও বিদ্বান্ অধিবাসী হারাইয়াছে। তাঁহার জন্ম ও শিক্ষা পশ্চিমে হইয়াছিল, এবং পশ্চিমেই তিনি সমস্ত জীবন যাপন করিয়াছিলেন। বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ জীবনের সংবাদ তিনি বরাবরই রাখিতেন, এবং তাহার শ্রেষ্ঠ অংশের সহিত তাঁহার আন্তরিক যোগ ছিল। তাঁহার সচিত্র সংক্ষিপ্ত জীবনরচিত ১৩১২ সালের আষাঢ় মাসে প্রবাসীতে বাহির হইয়াছিল। উহার লেখক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয় পরে উহা প্রবাসীর চিত্র সহ তৎপ্রণীত "বঙ্গের বাহিরে বাঙালী" নামক গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেন। পণ্ডিত মহাশয় এলাহাবাদের গবর্ণমেণ্ট কলেজের অধ্যাপকতা হইতে অবসর পাইবার পর কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ পদে নিযুক্ত হন। প্রয়াগের মাহাত্ম্য ও প্রয়াগের ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহার সবিশেষ জ্ঞান ছিল। প্রবাসী-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত Prayag or Allahabad নামক পুস্তকের ঐতিহাসিক অংশের প্রায় সমস্তটি তাঁহার লিখিত।

তিনি একজন সেকালের কংগ্রেসের লোক ছিলেন। একদা হিউম্ সাহেব তাঁহাকে কতকগুলি অতি গোপনীয় চিঠি পড়িবার নিমিত্ত দিয়াছিলেন। তাঁহার বিখ্যাত ছাত্র পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, এবং অন্য কোন কোন সেকালের কংগ্রেস্ওয়ালা কখন কখন তাঁহার পরামর্শ লইতেন। দেশভক্তির বাহ্য আড়ম্বর তাঁহার ছিল না; প্রকৃত দেশভক্তি ও দেশহিতৈষণা তাঁহার ছিল। তাঁহার সহিত বহুবার কথোপকথনে ইহা আমরা বুঝিয়াছিলাম। গান্ধী মহাশয়কে তিনি আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন। ১৯০৮ সালে এলাহাবাদ ছাড়িবার পর যখনই আমরা এলাহাবাদ যাইতাম, কখন্ তাঁহার সহিত দেখা হইবে, ব্যগ্রতার সহিত সেই সময় প্রতীক্ষা করিতাম।

কর্ণেল অলকটের আমলের থিয়সফিক্যাল সোসাইটীর প্রাথমিক সভ্যদের মধ্যে তিনি একজন ছিলেন। প্রথম প্রথম মিসেস্ বেসান্টের সহিতও তাঁহার যোগ ছিল; পরে ছিল না। তিনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ছিল না। তাঁহার বন্ধুদের মধ্যে নানা ধর্ম্মের লোক ছিলেন।

১৩১২ সালের আষাঢ় মাসের প্রবাসীতে পণ্ডিতমহাশয়ের সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস লিখিয়াছিলেন :—

"হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি বিশ্বাস আছে। তিনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু হইলেও কোন ধর্ম্ম বা সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহার দ্বেষ নাই। তিনি রাজা রামমোহন রায়ের একজন অনুরাগী ভক্ত। তিনি রাজাকে Prince of Bengalis বলিয়া থাকেন। আমরা তাঁহার কোন কোন বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি, যে, তাঁহার মতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে হিন্দুধর্ম্মের সারাংশ সঙ্কলিত হইয়াছে। যে-সকল ভারতবর্ষীয় কুলি মজুর ও ব্যবসাদার জীবিকার অন্বেষণে দক্ষিণ আফ্রিকা, মরিশশ, ডেমারারা, ট্রিনিডাড প্রভৃতি স্থানে যায়, তাহাদের আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গালের ব্যবস্থা

করা যে ভারতবাসীদের কর্ত্তব্য, তিনি কেবল ইহা বলিয়াই ক্ষান্ত হন না। তিনি বলেন, এই কার্য্যে ব্রাহ্মসমাজ ও আর্য্যসমাজের হাত দেওয়া উচিত; কারণ প্রাচীন হিন্দু সমাজে জাতি যাইবার ভয় থাকায় এই কাজে হাত দিবার সম্ভাবনা কম।"

তাঁহার সম্বন্ধে প্রধান প্রধান কথা পূর্ব্বে প্রবাসীতে বাহির হওয়ায় পুনরুক্তি করিব না।

তাঁহার পরিবারবর্গের মধ্যে এক্ষণে তাঁহার সহধর্ম্মিণী, তাঁহার এক পুত্র, এবং তাঁহার সসন্তানা কন্যা জীবিত আছেন। তিনি জীবদ্দশাতেই একটি সুদৃঢ় গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে তাঁহার সংগৃহীত বহু সংস্কৃত পুস্তক রক্ষা করেন, এবং তাঁহার জননীর নামে উহার নাম রাখেন "ধন্য-গোপী পুস্তকালয়"। তাঁহার মাতা সংস্কৃতে বিদুষী ছিলেন, এবং পুত্রদিগকে প্রথমে নিজেই শিক্ষা দিতেন। পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার উইল দ্বারা তাঁহার সহধর্ম্মিণীর ও পুত্রের কেবল মাত্র যাবজ্জীবন ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিয়া লক্ষাধিক টাকার সমুদয় সম্পত্তি উক্ত পুস্তকালয়ের জন্য, কয়েকটি দরিদ্র ছাত্রের শিক্ষার জন্য, একটি সংস্কৃত বিদ্যালয়ের জন্য এবং সাধারণতঃ শিক্ষা ও জ্ঞানের বিস্তার ও উন্নতির জন্য দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত সত্যব্রত ভট্টাচার্য্য এম্-এ পূর্ব্বে কাশীস্থ সেণ্ট্র্যাল হিন্দু কলেজের স্বেচ্ছানিযুক্ত অন্যতম অধ্যাপক ছিলেন।

১৩২৯ কার্ত্তিক

পৃথিবীর ছয়জন মহত্তম মানুষ

এইচ জী ওয়েল্‌স্ ইংলণ্ডের একজন জীবিত শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। তিনি পৃথিবীর একটি ইতিহাস লিখিয়াছেন। "গড্ দি ইনভিজিব্‌ল্ কিং" অর্থাৎ "অদৃশ্য রাজা ঈশ্বর" নামক ধর্ম্মবিষয়ক পুস্তকেরও লেখক তিনি। তিনি নিজেকে খৃষ্টিয়ান বলেন না। আমেরিকান্ ম্যাগাজিন্ নামক মাসিক পত্রের পক্ষ হইতে ব্রুস্ বার্টন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার মতে পৃথিবীর মহত্তম ছয় জন মানুষের নাম জানিতে চান। ওয়েল্‌সের মতে এই ছয় জনের নাম, যথাক্রমে, যীশু, বুদ্ধ, গ্রীক দার্শনিক আরিষ্টট্‌ল্, অশোক, রজার বেকন, এব্রাহাম লিঙ্কন। অবশ্য সমগ্র তালিকাটি সম্বন্ধে এবং প্রত্যেক নাম সম্বন্ধে মতভেদ হইবে। কিন্তু ওয়েল্‌সের মতও বিবেচনার যোগ্য। ছয়টি নামের মধ্যে দুইটি ভারতবর্ষীয়, একটি ইহুদী, একটি গ্রীক্, একটি ইংলণ্ডীয় ও একটি আমেরিকান্। মহাদেশ হিসাবে তিনটি এশিয়ার, দুটি ইউরোপের, এবং একটি আমেরিকার।

১৩৩০ আষাঢ়
সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ

কলিকাতায় সরকারী সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল অর্থাৎ অধ্যক্ষের পদে একজন অধ্যাপককে শীঘ্র স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করিতে হইবে। চট্টগ্রাম কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, এম এ, পি এইচ ডি, সর্ব্বাংশ উপযুক্ত ব্যক্তি। তিনি সংস্কৃতে সুপণ্ডিত, ভারতবর্ষীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনে বিশেষজ্ঞ, অন্যান্য গ্রন্থ ব্যতীত ভারতবর্ষীয় দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে একটি ইংরেজী বহি লিখিয়াছেন যাহার প্রশংসা দেশবিদেশে হইয়াছে, যোগ সম্বন্ধীয় তাঁহার আরও একখানি ঐরূপ বহি শীঘ্র প্রকাশিত হইবে, এবং শিক্ষাদান কার্য্যে তাঁহার অভিজ্ঞতা আছে। অধিকন্তু গৈলায় তাঁহাদের পারিবারিক চতুষ্পাঠীতে প্রায় দেড়শত বৎসর ধরিয়া প্রাচীন ও আধুনিক রীতি-অনুসারে সংস্কৃত নানা বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইয়া আসিতেছে, এবং তাহাতে ব্রাহ্মণ ছাত্রেরাও শিক্ষা পাইয়া আসিতেছেন। কিন্তু শুনা যাইতেছে, যে, তিনি বংশে ব্রাহ্মণ নহেন, বৈদ্য, এই কারণে তাঁহাকে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হইবে না। সেকালে প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় কায়স্থ হইয়াও সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হইয়াছিলেন। কাউয়েল সাহেব বিলাতে জন্মিয়া ও শিক্ষালাভ করিয়া এবং হিন্দু না হইয়াও ঐপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এখন কি গবর্ণমেণ্ট বা দেশের লোক বা দেশী মন্ত্রীরা আগেকার লোকদের চেয়ে অনুদার ও সঙ্কীর্ণমনা হইবেন? অধ্যাপক ম্যাক্স্‌মূলার বিদেশ হইতে অনুবাদ সহ ঋগ্‌বেদ প্রকাশ করিয়া, বেদ কে পড়িতে ও পড়াইতে পারে, তৎসম্বন্ধে কুসংস্কারের মূল উচ্ছেদ করিয়াছেন। এখন নূতন করিয়া, ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কেহ সংস্কৃত পড়াইতে বা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতা করিতে পারিবে না, এইরূপ মনে করা সঙ্কীর্ণতা ও মূর্খতা ভিন্ন আর কিছু নয়।

সর্ব্বাপেক্ষা যুগপৎ হাস্যকর ও শোচনীয় গুজব এই, যে, একজন ইংরেজ অধ্যাপকের এই পদটি পাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। ইনি বোধ করি সংস্কৃতে অদ্বিতীয় পণ্ডিত— যদিও তাহার কোন প্রমাণ প্রকাশ পায় নাই। এবং সম্ভবতঃ ইনি জাতিস্মর, পূর্ব্বজন্মে বেদজ্ঞ ও কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন; যদিও, সেই কারণে তিনি ব্রাহ্মণসভা কর্ত্তৃক পাংক্তেয় বলিয়া গৃহীত হইয়াছেন কি না, তাহা এখনও জানা যায় নাই।

১৩৩০ শ্রাবণ
উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন

পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্নের মৃত্যুতে বঙ্গদেশ ও সমুদয় ভারতবর্ষ একজন অসামান্য বিদ্যাবান্ ব্যক্তির সেবা হইতে বঞ্চিত হইলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৯ বৎসর হইয়াছিল।

বৈদিক সাহিত্য ও অন্য সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার অধিকার অসাধারণ ছিল। তাঁহার স্মৃতিশক্তি এরূপ ছিল, যে, তিনি অনায়াসে নানা সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে প্রয়োজন মত ভূরি ভূরি শ্লোক অনর্গল আবৃত্তি করিয়া যাইতে পারিতেন। এরূপ ক্ষমতা অনেকেব থাকে, কিন্তু তাঁহার স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতা ও স্বাধীন ভাবে প্রাচীন সাহিত্যের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা করিবার শক্তি পণ্ডিতবর্গের মধ্যে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি নির্ভীক্ ও তেজস্বী লোক ছিলেন; যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন, সাংসারিক ক্ষতি বা দৈহিক আঘাতপ্রাপ্তির ভয়ে তাহা বলিতে বিরত হইতেন না। তাঁহার প্রণীত ও প্রকাশিত গ্রন্থ ও পত্রিকাগুলি তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। তিনি আরও যাহা লিখিয়াছিলেন, দারিদ্রবশতঃ তাহা প্রকাশ করিতে পারেন নাই। দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিতে না হইলে হয় ত তিনি আরও দীর্ঘজীবী হইতে পারিতেন। অনেক শোকও তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন তাঁহার আরও এক কষ্টের কারণ এই ছিল, যে, তাঁহার এক পুত্র ব্রিটিশ গবর্ণ্মেণ্টের ক্রোধভাজন হওয়ায় আমেরিকা হইতে দেশে ফিরিতে পারেন নাই। ইহাতে তিনি ক্লেশ পাইতেন বটে, কিন্তু ইহা ভাবিয়া গৌরব অনুভবও করিতেন, যে, পুত্রকে দেশের স্বাধীনতাব জন্যই নির্ব্বাসিতের মত জীবনযাপন করিতে হইতেছে।

ললিতচন্দ্র মিত্র

নীলদর্পণের দীনবন্ধুর অন্যতম পুত্র শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র পিতার প্রতিভার অধিকারী না হইলেও তাঁহার সহৃদয়তা ও বন্ধুপ্রীতির অধিকারী হইয়াছিলেন। ললিতচন্দ্র আমাদের সহাধ্যায়ী ও প্রীতিমান্ বন্ধু ছিলেন। বঙ্গে নীলকরদের অত্যাচার ও নীলকর হাঙ্গামা সম্বন্ধে তিনি ইংরেজীতে একটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন, বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন প্রভৃতি উপলক্ষে গান রচনা তাঁহার একটি সখের জিনিষ ছিল। তিনি কতকগুলি কবিতাও লিখিয়াছিলেন। পূর্ণিমা-মিলন তাঁহার অতি প্রিয় বস্তু ছিল। যখন এই উপলক্ষে সাহিত্যিকগণ তাঁহার পৈত্রিক ভবনে সম্মিলিত হইতেন, তিনি সকল দলের সমুদয় ব্যক্তিকে আদর ও যত্নে আপ্যায়িত করিতেন। তিনি কিছুকাল বঙ্গীয় সাহিত্য- পরিষদের সহকারী সম্পাদক ও হিসাবপরীক্ষক ছিলেন।

এই জুলাই মাসে তাঁহার কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির কাজ হইতে অবসর লইবার কথা ছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, চাকরী হইতে অবসর লইয়া শাস্ত্রচর্চ্চায় কালযাপন করিবেন। কিন্তু তাহা আর ঘটিয়া উঠিল না। পুত্রশোক তাঁহার আয়ুহ্রাসের অন্যতম কারণ।

১৩৩০ অগ্রহায়ণ

অশ্বিনীকুমার দত্ত

ঊনসত্তর বৎসর বয়সে ভবানীপুরে অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় দেহত্যাগ করিয়াছেন।

তিনি শিক্ষা সমাপনান্তে ওকালতী ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন, এবং তাহাতে তাঁহার বেশ পসারও জমিয়াছিল। কিন্তু নানা প্রকারে দেশের সেবা করিবার জন্য তিনি ওকালতী ছাড়িয়া দেন। বালক ও যুবকদের প্রকৃত শিক্ষার জন্য তিনি ব্রজমোহন স্কুল ও কলেজ স্থাপন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসমূহে এই শিক্ষালয়ের ফল খুব ভাল হইত; কিন্তু ইহাই ইহার বিশেষত্ব ছিল না। ছাত্রদের চরিত্রের গঠন ও বিকাশের নানাবিধ চেষ্টা এখানে হইত। অশ্বিনী-বাবুর আমলে যাঁহারা ইহার সহিত যুক্ত থাকিয়া তাঁহার সহকর্ম্মী ছিলেন, তাঁহারা এই শিক্ষালয়ের এই দিক্‌টির বিশেষ বৃত্তান্ত প্রকাশিত করিলে দেশের কল্যাণ হইবে। অশ্বিনীকুমার আগেকার যুগের কংগ্রেসের একজন প্রধান কর্ম্মী ছিলেন। ১৯০৬ সালে বরিশালে যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সের প্রতিনিধিদের মিছিল পুলিশ "বৈধ লাঠি" (Regulation Lathis) চালাইয়া ভাঙ্গিয়া দেয়, তিনি তাহার অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ছিলেন। কংগ্রেসে তাঁহার বক্তৃতা শ্রোতাদের প্রাণে উদ্দীপনার সঞ্চার করিত। কংগ্রেসের এক অধিবেশনে—কোথায় তাহা মনে পড়িতেছে না—তিনি অনেক "স্বদেশভক্ত"কে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নন্দলালের সহিত তুলনা করিয়া যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা এখনও আমাদের মনে আছে। তিনি স্বয়ং নন্দলাল-জাতীয় স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন না। এইজন্য তিনি নিজেকে বাঁচাইয়া দেশসেবা জনসেবা করিতেন না। সেই কারণেই তিনি নির্ব্বাসিত হন—বিধাতার কোন বিধি কিম্বা ব্রিটিশ প্রভুদের কোন আইন লঙ্ঘন করায় তাঁহার নির্ব্বাসন হয় নাই, নির্ব্বাসন হইয়াছিল এইজন্য, যে, বরিশালে তাঁহার প্রভাব উচ্চতম রাজকর্ম্মচারীর প্রভাব অপেক্ষা অনেক বেশী হইয়াছিল, এবং এই প্রভাবের বশে বিস্তর ত্যাগী সাহসী ও প্রেমিক জন-সেবকের আবির্ভাব হইতেছিল। এই প্রভাবের একমাত্র কারণ তাঁহার অকপট মানবপ্রেম এবং অক্লান্ত জনসেবা। দুর্ভিক্ষে জলপ্লাবনে ব্যাধির প্রাদুর্ভাবে তিনি সুশৃঙ্খলার সহিত আর্ত্তের সেবা এবং সেবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। এইসব কারণে তিনি যে কেবল রাজপুরুষদের ঈর্ষ্যা ভয় ও ক্রোধের পাত্র হইয়াছিলেন, তাহা নহে; ইহাতে তাঁহার শরীরও ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তাই এই মহাপ্রাণ সাধুপুরুষের সেবা হইতে দেশ অনেক বৎসর বঞ্চিত থাকিয়া, আজ তাঁহার পরামর্শ এবং তাঁহার সংসর্গের অনুপ্রাণনা হইতেও বঞ্চিত হইল। কিন্তু তাঁহার জীবনের অনুপ্রাণনা রহিয়া গেল। উহা আমাদের স্থায়ী সম্পত্তি। সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে তাঁহার আধ্যাত্মিক বংশধরেরা ইহার দ্বারা চিরকাল অনুপ্রাণিত হইতে থাকিবে। তিনি যেমন বাগ্মী ছিলেন, তেমনি ভক্ত ও ভাবুক ও চিন্তাশীল সুলেখকও ছিলেন। "ভক্তিযোগ" তাঁহার লেখনীপ্রসূত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

১৩৩০ পৌষ

অধ্যাপক যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

অগ্রহায়ণ মাসে বাংলা ও ইংরেজী পাটীগণিতের প্রণেতা বলিয়া বাংলা এবং আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে সুপরিচিত অধ্যাপক যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি এম্-এ পাস্ করিবার পর কলিকাতায় সিটিকলেজে গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সেখান হইতে তিনি আলিগড় কলেজের গণিতের অধ্যাপক হইয়া যান। আলিগড়ে তিনি আটাশ বৎসর দক্ষতার সহিত কাজ করিয়া হিন্দুমুসলমান সকলের প্রীতি অর্জ্জন করেন ও যশস্বী হন। অনেক নামজাদা ও বিদ্বান্ মুসলমান তাঁহার ছাত্র। তাঁহাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ মৌলানা শৌকৎ আলি ও মৌলানা মহম্মদ আলি অন্যতম। যাদব বাবুকে বাল্যকালে কঠোর দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। মৈমন্‌সিংহে যখন তিনি এক আত্মীয়ের বাসায় আশ্রয় পাইয়া হার্ডিং মিড্‌ল্ স্কুলে ভর্ত্তি হন, তখন তাঁহার বয়স বার বৎসর। সেই বয়সে আরো কয়েকটি ছাত্রের সঙ্গে পালা করিয়া তাঁহাকে সেই আত্মীয়ের বাসায় সমস্ত পরিবারের রন্ধন করিতে হইত। ১৫ বৎসর বয়সে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয। তখন সংগ্রাম কঠোরতর হইয়া উঠে। দুটি ভাই, দুটি ভগিনী, ও মাতা, পাঁচজনের ভার তাঁহার উপর পড়ে। যাহা হউক, তিনি বহুকষ্টে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক চারি টাকা বৃত্তি পান। তাহার পর অবৈতনিক ছাত্র হইয়া ও গৃহশিক্ষকতা করিয়া তিনি কঠোর শ্রম দ্বারা এন্ট্রেন্স্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও ১৫ টাকা বৃত্তি পান। ইহার পরও বরাবর বৃত্তি পাইয়া তিনি এম্-এ পর্য্যন্ত পাস্ করেন। শেষ জীবনে সম্পদ্‌লক্ষ্মীর আশীর্ব্বাদ পাইয়া তিনি দরিদ্রের দুঃখমোচনে চিরযত্নবান্ ছিলেন। তাঁহার প্রণীত পাঠ্যপুস্তকগুলি তিনি প্রার্থী যে-কোন গরীব ছাত্রকে বিনামূল্যে দান করিতেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৯ বৎসর হইয়াছিল।

১৩৩০ মাঘ

অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষ

প্রেসিডেন্সী কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের মৃত্যুতে বঙ্গদেশ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। তিনি রাজনারায়ণ বসু মহাশয়েব দৌহিত্র এবং অরবিন্দ ঘোষ মহাশয়ের মধ্যম ভ্রাতা ছিলেন। বাল্যকাল হইতে তাঁহার শিক্ষা ইংলণ্ডে হইয়াছিল। তাঁহার পাণ্ডিত্য গভীর এবং নানা-সাহিত্যব্যাপী ছিল। তিনি সুকবি ছিলেন। তাঁহার ইংরেজী কবিতা ঠিক্ ইংরেজ সুকবিরই মত ছিল, বিদেশীর লেখা বলিয়া ভ্রম হইবার সম্ভাবনা ছিল না। তিনি বিদ্যাচর্চ্চা লইয়াই থাকিতেন, এবং অতি অনাড়ম্বর লোক ছিলেন; নিজেকে লোকের সামনে খাড়া করিবার ইচ্ছা ও

প্রয়াস তাঁহার ছিল না। এইজন্য অনেকে তাঁহার অস্তিত্ব এবং নাম পর্য্যন্তও অবগত নহেন। কত বড় বিদ্বান্ ও কত বড় অধ্যাপক তিনি ছিলেন, তাহা অনেকে জানিতেনও না। স্বাস্থ্য ভগ্ন হওয়ায় তিনি ৫৫ বৎসর বয়স হইবার পূর্ব্বেই পেন্‌স্যান্ লইয়াছিলেন।

—

১৩৩৩ অগ্রহায়ণ

বৃহত্তর ভারত পরিষদে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের আশীর্ব্বাদ-পত্র

এই পরিষদের উদ্বোধন-সভায় শাস্ত্রী-মহাশয় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। পত্রযোগে তিনি যে-আশীর্ব্বাদ প্রেরণ করেন তন্মধ্যে ভারতের গৌরবময় ইতিহাসের কিছু পরিচয় আছে। পত্রটির কিয়দংশ এই—

"আপনারা আজ যে-কার্য্যের উদ্বোধন করিতেছেন তাহা অতি মহান্ কার্য্য। ...১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে চীন দেশের লোক আমাদের যে-সকল রীতি-নীতি অতি আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করিয়াছে এখন আমরা অসভ্যতা মনে করিয়া তাহা ত্যাগ করিয়াছি। যে শব্দবিদ্যা, হেতুবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা ও ধর্ম্ম সমস্ত এসিয়ার লোক আমাদের নিকট লইয়াছে, তাহা আমরা এখন ত্যাগ করিতেছি। ...যে শৈবকৌল যোগীগণ সারা ভারতে ও তাহার বাহিরে বাঙ্গালার মহিমা গাহিয়াছে আমরা তাহাদিগকে যুগী বলিয়া উপেক্ষা করিতেছি। যে সিদ্ধ পুরুষেরা সমস্ত এসিয়ায় সেদিনও ভারতের শৈব ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন তাঁহাবা এখন বিস্মৃতিসলিলে মগ্ন। ভারতের যে-ইতিহাস খুঁজিতে আমাদিগকে এখন চীন, জাপান, কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া, সামোএদ দেশে, এমন কি বল্কান ও নীল নদীর ধারে যাইতে হয় সে-ইতিহাস এককালে বড়ই গৌরবময় ছিল। আপনারা তাহার উদ্ধার-চেষ্টা করিতেছেন। আপনারা ধন্য। আশীর্ব্বাদ করি আপনারা সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইয়া ভারতের মুখ উজ্জ্বল করুন।

শুভার্থী
শ্রী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী"

—

১৩৩৮ পৌষ
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্বন্ধে অন্যত্র যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল, তাহা হইতে পাঠকেরা তাঁহার জীবনের প্রধান প্রধান কার্য্যের পরিচয় পাইবেন। তাঁহার একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিত লিখিত হওয়া আবশ্যক। কোন কোন বিষয়ে বাঙালীর কৃতিত্বের অনেক অংশ তাঁহারই কৃতিত্ব। বাঙালীর আয়ু আজকাল যেরূপ তাহাতে তাঁহাকে দীর্ঘজীবী বলিতে হইবে; কিন্তু অন্য অনেক সভ্য দেশের অনেক মনীষী যেরূপ দীর্ঘজীবী হন, তাহাতে তিনি অনেক বৎসর জীবিত থাকিয়া বঙ্গের, ভারতের ও পৃথিবীর জ্ঞানবৃদ্ধি করিবেন, তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুর পূর্ব্বে এরূপ আশা করা অসঙ্গত হইত না।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, এম্-এ

৭৮ বৎসর বয়সে গত ১লা অগ্রহায়ণ রাত্রি ১১ ঘটিকার জগৎবিখ্যাত পণ্ডিত ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ বঙ্গসাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ লেখক মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় পরলোকগত হইয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গদেশে তথা সমস্ত ভারতবর্ষের যে কতদিক হইতে ক্ষতি হইয়াছে তাহা বর্ণনা করা কঠিন। তিনি যে কেবল একজন প্রকাণ্ড সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন তাহা নহে—তিনি একজন আদর্শ অধ্যাপক ছিলেন—ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের সকল বিভাগে তাঁহার পারদর্শিতা ছিল—বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার রচনাভঙ্গী ছিল অতুলনীয়।

বাঙ্গালার এক সুপরিচিত ব্রাহ্মণপণ্ডিত বংশে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ৬ই ডিসেম্বর তারিখে হরপ্রসাদের জন্ম। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ বঙ্গের অনেক পণ্ডিতের গুরু বা অধ্যাপক। রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র রমাপ্রসাদ রায় একবার প্রসঙ্গক্রমে লিখিয়াছিলেন—'বঙ্গের প্রসিদ্ধ পণ্ডিতবর্গের অধিকাংশ এই বংশের শিষ্য।' উত্তরকালে হরপ্রসাদ পূর্ব্ব-পুরুষগণের এই কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বঙ্গের আধুনিক সংস্কৃত অধ্যাপক ও প্রত্নতত্ত্ববিদগণের প্রায় সকলেই হরপ্রসাদের সহিত গুরুশিষ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ—কেহ কেহ মুখ্যতঃ তাঁহারই শিষ্য, কেহ কেহ বা তাঁহার শিষ্যের শিষ্য। এ বড় কম গৌরবের কথা নহে।

অধ্যাপক হিসাবে হরপ্রসাদ একজন আদর্শ পুরুষ ছিলেন। সাহিত্যের অধ্যাপনে তিনি তাঁহার ছাত্রদিগের হৃদয়বিশেষরূপে আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইংরেজী সাহিত্যের ন্যায় সংস্কৃত সাহিত্যের রসবিচার ও সমালোচনা তিনি অতি সুন্দরভাবে করিতেন। ছাত্রদিগের সহিত আত্মীয়তাও ছিল তাঁহার অসামান্য। তিনি যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ তখন স্কুলেব ছাত্রদিগের সহিতও তাঁহার পরিচয়ের অভাব ছিল না। তিনি তাহাদের সহিত প্রাণ খুলিয়া মিশিতেন।

কি ছাত্র কি সাধারণ লোক সকলের সহিতই ব্যবহারে তিনি ছিলেন একজন আদর্শ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। যাহার সম্বন্ধে তাঁহার যে ধারণা তাহা তিনি স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিতে কোন দিনই দ্বিধা বোধ করেন নাই। ইহাতে অনেক ক্ষেত্রে তাঁহাকে অত্যন্ত রূঢ় বলিয়া মনে হইত সত্য—তবে যাহাদেব সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা ভাল ছিল, তাহাদিগের প্রতি তাঁহার কোমলতা ও সদ্‌ব্যবহারের অন্ত ছিল না। তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য তাঁহাকে অযথা দাম্ভিক বা অসামাজিক করিয়া তোলে নাই। তিনি সকলেব সহিত প্রাণ খুলিয়া মিশিতে পারিতেন। অগাধ পাণ্ডিত্যের সহিত তাঁহার অনন্যসুলভ রসিকতা সকলকে চমৎকৃত ও বিস্মিত করিত। তিনি যে স্থানে কথা বলিতেন, উৎকট গাম্ভীর্য্য সেস্থানকে ভীষণ করিয়া তুলিতে পারিত না—হাসির ফোয়ারা উহাকে স্নিগ্ধ ও মধুব করিয়া তুলিত।

হরপ্রসাদ আজীবন ছাত্রের মত ছিলেন, সাংসারিক সমস্ত দুঃখ-কষ্ট ও অভাব-অভিযোগের মধ্যে তিনি কখনও পড়াশুনার প্রতি অবহেলা করেন নাই। বাল্যকালে অভাবের নিষ্পেষণে তিনি অতিকষ্টে লেখাপড়া করেন। এই সময়ে 'দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর' মহাশয়ের সাহায্য তাঁহার বিশেষ উপকার করিয়াছিল। কলেজের শিক্ষা সমাপ্তির পরও তাঁহার অভাব দূরীভূত হইয়াছিল বলিতে পারা যায় না। হেয়ার স্কুলের সাধারণ শিক্ষক হিসাবে তাঁহাকে প্রথম কার্য্য আরম্ভ করিতে হয়। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রেও তিনি ছাত্রের মত পড়াশুনা করিতে কোন দিনও ত্রুটি করেন নাই। মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত তাঁহার নিয়মিত অধ্যয়নের কোনও ব্যাঘাত হয় নাই। ইহারই ফলে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য—বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে তাঁহার মত অধিক পড়াশুনা খুব কম লোকেরই ছিল।

তাঁহার বিপুল জ্ঞান কেবল মুদ্রিত পুস্তকের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল না। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা সাহিত্যের অপ্রকাশিত বহু সহস্র হস্তলিখিত দুর্লভ পুঁথি দেখিবাব সুযোগ তাঁহার ঘটিয়াছিল। প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সহিত তিনি প্রথম পুঁথির কার্য্য আরম্ভ করেন। মিত্র মহাশয়েব মৃত্যুর পব তিনি সরকাব কর্ত্তৃক পুঁথি অনুসন্ধানের কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই অনুসন্ধানের ফলে তিনি যে-সকল পুঁথি দেখিতে পাইয়াছিলেন তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ Notices of Sanskrit Manuscripts নামক গ্রন্থে চারি খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। সরকারের পক্ষ হইতে তিনি নেপালের দরবারের বিশাল পুঁথিশালার পরীক্ষা করেন এবং ঐ পুঁথিশালার পুঁথিগুলির বিবরণ দুই খণ্ডে প্রকাশ করেন। এই স্থানে তিনি কতকগুলি বাঙ্গালা ও অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার পুঁথি সন্ধান পান। এখানকার পুঁথিগুলি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস আলোচনাকারীদিগের পক্ষে বিশেষ মূল্যবান্।

অক্‌সফোর্ডে ম্যাক্‌স্-মূলার মহোদয়ের স্মৃতিরক্ষার্থে তিনি কতগুলি দুর্লভ বৈদিক পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। নেপালের মহারাজা সার চন্দ্র সমসের জঙ্গ বাহাদুর অক্‌সফোর্ডের বোডলিয়ন লাইব্রেরীতে প্রায় ৭০০০ সংস্কৃত পুঁথি দান করিয়াছিলেন। এইগুলির তালিকা প্রস্তুত ও দানের ব্যবস্থা করিবার জন্য শাস্ত্রী মহাশয়ের সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল—এ কথা ভারতের ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড কর্জ্জন স্বহস্তলিখিত এক পত্রে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ইহা ছাড়া, সরকারের পক্ষ হইতে হরপ্রসাদ বিশপস্ কলেজের পুঁথিগুলিব এক বিবরণ প্রস্তুত করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। মোটের উপর তাঁহার কর্ম্মজীবনের অধিকাংশ সময় প্রাচীন পুঁথির আলোচনায় অতিবাহিত হইয়াছিল। ইহার ফলে তিনি যে জ্ঞান আহরণ করিতে পারিয়াছিলেন তাহা অমূল্য। তাহার কথঞ্চিৎ পরিচয় তিনি এশিয়াটিক সোসাইটী হইতে প্রকাশিত Descriptive Catelogue of Sanskrit Manuscripts-এর ছয় খণ্ডের বিস্তৃত ভূমিকা হইতে পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয়, তিনি তাঁহার এই বিশাল গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইলে ইহার ভূমিকায় সংস্কৃত সাহিত্যের এক বিস্তৃত ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইত।

শাস্ত্রী মহাশয় যে কেবল পুঁথির বিবরণ সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন এমন নহে। তিনি কতকগুলি দুর্লভ প্রয়োজনীয় পুঁথি এশিয়াটিক্ সোসাইটি এবং বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে সম্পাদন ও প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল সম্পাদিত গ্রন্থের মধ্যে 'রামচরিত' এবং 'বৌদ্ধ গান ও দোঁহা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমখানি বাঙ্গালার ইতিহাসের অনেক অজ্ঞাত তথ্য সাধারণকে জানাইয়া দিয়াছে। আর দ্বিতীয়খানিতে পূর্ব্বভারতের প্রাচীন প্রাদেশিক ভাষার অনেক নিদর্শন রক্ষিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

শাস্ত্রী মহাশয়ের লিখিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ এত অধিক এবং এত বিভিন্ন বিষয় সংক্রান্ত যে, তাহাদের স্বল্প পরিচয়ও একটি প্রবন্ধে দেওয়া সম্ভবপর নহে। তাঁহার কৃত কার্য্যের ব্যাপকতা ও বিশালতার ধারণা তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ ও গ্রন্থের তালিকা প্রস্তুত হইলে তাহা হইতে পাওয়া যাইতে পারিবে। আশা করা যায়, 'হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধন লেখামালা'র দ্বিতীয় খণ্ডে এই তালিকা প্রদত্ত হইবে।

প্রাচীন পুঁথির আলোচনা দ্বারা হরপ্রসাদ কেবল যে ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান মাত্র সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন তাহা নহে। তিনি ইতিহাসে কতগুলি নূতন মত খাড়া করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে দুই একটি জনসাধারণকে আকৃষ্ট করিয়াছে এবং বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তাঁহার সর্ব্বপ্রসিদ্ধ মতবাদ এই যে—বঙ্গের তথাকথিত অস্পৃশ্য নীচ জাতি বর্ত্তমানে হিন্দুসমাজের অঙ্গীভূত হইলেও তাহারা প্রকৃত হিন্দু নহে—বঙ্গে বৌদ্ধপ্রাধান্যের সময় তাহারা বৌদ্ধ ছিল। বৌদ্ধ প্রাধান্যহ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা সমাজের নিম্নস্তর অধিকার করিয়াছে। ডোম প্রভৃতি জাতির মধ্যে প্রচলিত ধর্ম্মপূজা বুদ্ধপূজার নামান্তর ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাঁহার এই মত Discovery of Living Buddhism in Bengal নামক তাঁহার প্রথম বয়সে লেখা পুস্তকে প্রচারিত হইয়াছিল।

বাঙ্গালীর জাতীয় গৌরবের কথা তিনি তাঁহার অনেক লেখার মধ্যে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতের জাতীয় সভ্যতায় বাঙ্গালীর দান সম্বন্ধে তিনি Bihar & Orissa Research Society-র পত্রিকায় বিস্তৃত প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ আজ যতই অবজ্ঞাত হউন না কেন, একদিন সমাজে তাঁহাদের প্রভূত সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। তাই জীবনের সায়াহ্নে হরপ্রসাদ এক এক করিয়া এই ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের জীবনী প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের কয়েকজনের জীবনী বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে তাঁহার লিখিত আরও কয়েকটি প্রবন্ধ অপ্রকাশিত অবস্থায় সাহিত্য-পরিষদে রহিয়াছে।

হরপ্রসাদের কীর্ত্তির মধ্যে বাঙ্গালীর সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের বিষয় হইতেছে তাঁহার বাঙ্গালা রচনা-ভঙ্গী। তিনি সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার লেখায় 'পণ্ডিত' ভাব আদৌ ছিল না। তাঁহার বাঙ্গালা লেখায় একটা অনন্যসাধারণ প্রাঞ্জলতা বর্ত্তমান ছিল। ইতিহাসের খুঁটিনাটি ঘটনার তালিকা সাধারণতঃ লোকের আদৌ রুচিকর নহে। হরপ্রসাদ কিন্তু এই বিষয়টির মধ্যে একটা সজীবতা সঞ্চার করিতে পারিতেন। তাহার ফলে তাঁহার লেখা ঐতিহাসিক বিষয় উপন্যাসের মত সাধারণকে আকৃষ্ট করিত। মোটের উপর কঠিন বিষয়কে সরল ও সরসভাবে সাধারণের নিকট উপস্থিত করিবার তাঁহার যে রচনাকৌশল জানা ছিল তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে নূতন না হইলেও আদর্শ-স্থানীয় সন্দেহ নাই।

কালক্রমে নূতন আবিষ্কারের ফলে হরপ্রসাদের ঐতিহাসিক আবিষ্কারের মূল্য কমিয়া যাইতে পারে—তাঁহার মতবাদ ভ্রমসঙ্কুল বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার সুন্দর রচনারীতি বাঙ্গালীর সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবে—বাঙ্গালীকে চির আনন্দ দান করিবে। তাঁহার এই রচনাভঙ্গী তাঁহার 'বেণের মেয়ে' 'কাঞ্চনমালা' প্রভৃতি উপন্যাসে, 'বাল্মীকির জয়' প্রভৃতি গ্রন্থে কালিদাস প্রভৃতি সংস্কৃত কবিদের কাব্য সমালোচনাময় প্রবন্ধ সমূহে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার রচিত 'বাল্মীকির জয়' এক অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি দেশীয় ও বৈদেশিক সাহিত্যরসিকগণ মুক্তকণ্ঠে ইহার প্রশংসা করিয়াছেন।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদের দিকে তিনিই প্রথম সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বৌদ্ধ গান ও দোঁহার আবিষ্কার ও প্রকাশের দ্বারা তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাচীনতম যুগের উপর যে আলোকসম্পাত করিয়াছেন সেজন্য সমগ্র বাঙ্গালী জাতি তাঁহার নিকট চিরঋণে আবদ্ধ থাকিবে।

অর্দ্ধশতাব্দীর অধিককালব্যাপী সাহিত্যারাধনার আংশিক পুরস্কার-স্বরূপ হরপ্রসাদ সরকারের নিকট হইতে মহামহোপাধ্যায় ও সি-আই-ই এই দুই উপাধি পাইয়াছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহাকে ডি-লিট উপাধি দ্বারা ভূষিত করিয়াছিল। সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম ও শ্রেষ্ঠ প্রাচ্যশাস্ত্রানুশীলন সমিতি—বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি ১৯১৯ ও ১৯২০ এই দুই বৎসর সভাপতির গৌববময় পদে তাঁহাকে বসাইয়াছিলেন। এই সমিতি কর্ত্তৃক পরবর্ত্তীকালে তিনি আজীবন সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের তিনি অন্যতম স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। সুদীর্ঘ সপ্তবিংশ বর্ষকাল তিনি সভাপতি ও সহকারী সভাপতি রূপে এই পরিষদের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

শুধু বাঙ্গালা দেশ বা ভারতবর্ষের মধ্যেই হরপ্রসাদের সম্মান ও খ্যাতি আবদ্ধ ছিল না। তাঁহার প্রসিদ্ধি ছিল সমস্ত জগদ্‌ব্যাপী। বিলাতের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁহাকে সম্মানিত সদস্য তালিকায় স্থান দিয়াছিল। এস্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে মাত্র ত্রিশ জন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকেন।

বাঙ্গালীর গৌরব প্রচার, বাঙ্গালা সাহিত্যের সমৃদ্ধি সম্পাদন প্রভৃতি কার্য্যে যিনি জীবনব্যাপী সাধনা করিয়া গিয়াছেন সেই পরলোকগত পণ্ডিত হরপ্রসাদের উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করা বাঙ্গালীর পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। আমাদের মনে হয় শুধু তৈলচিত্র স্থাপনের দ্বারা একার্য্য সাধিত হইবে না। তাঁহার অমূল্য গ্রন্থ ও প্রবন্ধ সমূহকে বিস্মৃতির করাল কবল হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থাই কি তাঁহার স্মৃতিরক্ষার প্রকৃষ্ট উপায় নহে? তাহা যদি হয়, তবে তাঁহার প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র—এশিয়াটিক সোসাইটি ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক পত্রিকাদিতে বিক্ষিপ্ত তাঁহার রচনাসমূহ স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিবার চেষ্টা করা উচিত। আশা করি, বাঙ্গালী তাঁহাদের এই সাধু প্রচেষ্টায় যথোচিত সাহায্য করিতে পরাঙ্মুখ হইবে না।

১৩৪২ কার্ত্তিক

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর চিত্র উন্মোচন

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দিরে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সংবাদে সুখী হইলাম। এই তৈলচিত্রটি নিজ ব্যয়ে প্রস্তুত করাইয়া পরিষদকে দান করায় ডক্টর শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা মহাশয় বাঙ্গালীদের, ভারতীয়দের, এবং সমুদয় প্রাচ্যবিদ্যানুরাগীদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের জন্য, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্য, সংস্কৃত ও সংস্কৃতের জ্ঞাতি প্রাচীন ভারতীয় ভাষাসমূহ ও তাহাদের

সাহিত্যেব চর্চ্চার জন্য এবং ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বানুশীলনের জন্য শাস্ত্রী মহাশয় যাহা করিয়া গিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহার উল্লেখও সম্ভবপর নহে।

১৩৩৩ মাঘ

অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত

আমি কয়েক মাস ভারতবর্ষের বাহিবে থাকায় অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত মহাশয়ের মৃত্যুর পর যথাসময়ে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতে পারি নাই।

আমি প্রেসিডেন্সী কলেজে যখন তৃতীয় ও চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতাম, তখন গুপ্ত মহাশয় গণিতের সহকারী অধ্যাপকরূপে আমাদিগকে গণিত পড়াইতেন। গণিতে আমি মনোযোগী ছিলাম না কিম্বা আমার বুদ্ধি খেলিত না, অথচ তৎসত্ত্বেও আমি কেন বি-এ পরীক্ষার জন্য গণিত লইয়াছিলাম, তাহা এখানে বলিবার দর্‌কার নাই। আমি গণিতে গুপ্ত মহাশয়ের খুব অযোগ্য ছাত্র ছিলাম এবং তাঁহার ক্লাসে প্রায় যাইতাম না। তথাপি তিনি আমাকে চিনিতেন। কিন্তু কি কারণে জানি না, তিনি কখনও আমাকে তিরস্কার করেন নাই বা কোন শাস্তি দেন নাই; একদিন কেবল বলিয়াছিলেন, "চাটুজ্যে, তোমাকে যে, দেখ্‌তেই পাওয়া যায় না।"

গুপ্ত মহাশয় গণিতে যে খুব প্রতিভাশালী, তাহা মধ্যে মধ্যে তাঁহার ক্লাসে উপস্থিত থাকায় বুঝিতে পারিতাম। খুব শক্ত বিষয়ও যখন তিনি আমার মত গণিতে অমনোযোগী বা অল্পবুদ্ধি ছাত্রেরও সহজে বোধগম্য করিয়া দিতেন, তখন তাহা হইতেই বুঝিতে পারিতাম তিনি শিক্ষাদান-কার্য্যে সুনিপুণ। গণিতে প্রতিভাশালী সহপাঠী ছাত্রদের প্রশংসা হইতেও অবশ্য অধ্যাপক মহাশয়ের গণিতজ্ঞতার পরিচয় পাইতাম। আমরা বি-এ পড়িবার সময় বিলাত হইতে লিট্‌ল্ সাহেব আমাদের গণিতাধ্যাপক হইয়া আসিলেন। তিনি কেম্ব্রিজের উচ্চ র‍্যাংলার ছিলেন। পাস্ করিয়াই একেবারে পূরা অধ্যাপক হইয়া আসিলেন; বিপিন-বাবু কয়েক বৎসর চাকরী করা সত্ত্বেও কিন্তু তখনও সহকারী অধ্যাপক ছিলেন। গণিতে লিট্‌ল্ সাহেবের বিদ্যার দৌড় কতটা ছিল, তাহা নির্ণয় করিবার ক্ষমতা আমার ছিল না, কিন্তু তিনি যে বিপিন-বাবুর মত শক্ত জিনিষও সোজা করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারিতেন না তাহা আমার মনে আছে। তাঁহার চেহারা ও অধ্যাপনা এখনও মনে পড়িতেছে। তাঁহার মুখের রং তৎকালে লাল ছিল, এবং তিনি কোটের নীচে, শীত না থাকিলেও, ফ্লানেলের কামিজ পরিতেন। কামিজের আস্তিন কোটের আস্তিনের চেয়ে খাট ছিল। যখন তিনি চক্ খড়ি হাতে লইয়া হাত উঁচু কবিয়া বোর্ডে লিখিতেন, তখন কামিজের কফ্ অল্প দেখা যাইত। গণিতের বহিতে যে-সব নিয়ম বিবৃত আছে ও অঙ্কের যে-সব উদাহরণ কষা আছে, তাহা বুঝাইবার জন্যও তিনি বাম হাতে বহি খুলিয়া ধরিয়া বোর্ডে লিখিয়া আমাদিগকে শিখাইতেন।

বিপিন-বাবুকে এরূপ কিছু করিতে কখনও দেখি নাই। তিনি যাহা কিছু শিখাইতে চাহিতেন, তাহাতে নিজের স্মৃতির সাহায্য লওয়াই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট হইত। শিক্ষক হিসাবে তাঁহাতে ও লিটল্ সাহেবে এরূপ প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও পেন্সন্ লইবার সময় তিনি মাত্র ছয়শত টাকা বেতন পাইতেন, আর লিট্‌ল্ সাহেব শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর্ হইয়া উহার প্রায় পাঁচগুণ বেতন ভোগ করিয়া অবসর গ্রহণ করেন! গুপ্ত মহাশয় সরকারী শিক্ষাবিভাগে শেষ কাজ করেন কটকে রেভন্‌শ কলেজে। তিনি সেখানে প্রিন্সিপ্যাল থাকিবার সময় অধ্যাপনা ও ছাত্রদের থাকিবার বন্দোবস্ত প্রভৃতি বিষয়ে অনেক উন্নতি হয়। তিনি নিজে পুরুষোচিত ক্রীড়ায় নিপুণ ছিলেন এবং ছাত্রদের মধ্যেও তাহাতে খুব উৎসাহ দিতেন। গরীব ছাত্রদের জন্য সর্‌কারী কলেজে বিনা বেতনে পড়িবার ব্যবস্থা করাইবার নিমিত্ত তিনি চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

কেন্দ্রাপাড়ার দুর্ভিক্ষের সময় তিনি নিরন্ন লোকদের সাহায্যার্থ অনেক চেষ্টা করিয়া চাঁদা তুলিয়াছিলেন, এবং তাহাদিগকে সাহায্যদানের সুব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত প্রভূত পরিশ্রম করিযাছিলেন।

তাঁহার প্রফুল্লচিত্ততা ও সামাজিকতা ছাত্র, অধ্যাপক ও অপরসাধারণের সুপরিচিত ছিল।

১৩৪২ মাঘ

দেশ-বিদেশের কথা

স্বর্গীয় বিপিনবিহারী গুপ্তের চিত্র-প্রতিষ্ঠা

গত ৭ই ডিসেম্বর শনিবার অপরাহ্নে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি ডাঃ দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয় স্বর্গীয় বিপিনবিহারী গুপ্ত মহাশয়ের তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচন করিয়াছেন। তৈলচিত্রটি মাননীয় বিচারপতি সর্ মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, মাননীয় বিচারপতি ডাঃ দ্বারকানাথ মিত্র, অবসরপ্রাপ্ত একাউণ্টেন্ট-জেনারেল শ্রীউপেন্দ্রলাল মজুমদার, শ্রীমোহিনীকান্ত ঘটক ও শ্রীযতীশচন্দ্র মিত্র, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডাঃ শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায় ও রায় বাহাদুর গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, অবসরপ্রাপ্ত য়্যাকাউণ্টস্ অফিসার শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমণীন্দ্রকুমার মিত্র, জমিদার রমণীকান্ত রায় ও ডাঃ শ্রীঅন্নদাপ্রসন্ন ঘটক এই চিত্রখানি প্রেসিডেন্সি কলেজে উপহার দিয়াছেন।

সভাপতি মহাশয় স্বর্গীয় বিপিনবিহারী গুপ্তের ছাত্রজীবনের ও কর্ম্মজীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিলে, অধ্যক্ষ শ্রীগিরিশচন্দ্র বসু বাল্যবন্ধু হিসাবে, আচার্য্য সর্ প্রফুল্লচন্দ্র রায় সহকর্ম্মী হিসাবে, ব্যারিষ্টার মিঃ এস. এন. ব্যানার্জ্জি ও শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে ও রায়বাহাদুর গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় অধীনস্থ কর্ম্মচারী হিসাবে বিপিনবাবুর জীবনের নানা দিক সম্বন্ধে আলোচনা করেন। অবশেষে শ্রীবিমলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল মহাশয় যে-প্রবন্ধটি পাঠ করেন তাহার অংশবিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

"অসামান্য প্রতিভাবলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদয় পরীক্ষা বিশেষ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে প্রেসিডেন্সি কলেজের গণিতের অধ্যাপকের কার্য্যে তিনি ব্রতী হন। তখনকার সময়ে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ যুবকের পক্ষে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক হওয়া সহজ কথা ছিল না। কেবল মাত্র আপনার প্রতিভা বলেই তিনি এই উচ্চ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। দীর্ঘ ১৮ বৎসর প্রেসিডেন্সি কলেজে কৃতিত্বের সহিত অধ্যাপনা করিয়া তিনি ছোটনাগপুরের ইন্‌স্পেক্টার অব্ স্কুলস হন এবং তথা হইতে ১৯০১ সালে কটক কলেজের অধ্যক্ষ হইয়া ৮ বৎসর তথায় অবস্থান করেন। তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে কটক কলেজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হয়। উড়িষ্যার ইতিহাসে তাঁহার নাম উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত থাকিবে। উড়িষ্যার বিশ্ববিদ্যালয়-পরিকল্পনার বীজ তিনি বপন করেন। নবজাগরিত উড়িষ্যা তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। কটক কলেজ হইতে তিনি হুগলী কলেজে স্থানান্তরিত হন। হুগলী কলেজে যে যুবক একদিন বিদ্যার্থী হইয়া প্রবেশ করিয়াছিল, কে ভাবিয়াছিল একদিন তিনিই এই কলেজের অধ্যক্ষ হইয়া আসিবেন।

তাঁহারই চেষ্টার ফলে সরকারী কলেজে কর্ত্তৃপক্ষ নির্দ্দিষ্টসংখ্যক দরিদ্র ছাত্রদিগকে বিনা-বেতনে পড়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। আপন শক্তির উপর তাঁহার অগাধ বিশ্বাস ছিল এবং এই বিশ্বাসের বলে তিনি জীবনে বহু প্রতিকূল ঘটনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া উন্নতির আসনে সমাসীন হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় অকপট, সরল, শিষ্টাচারী, বিনীত, স্নেহপ্রবণ ব্যক্তি বাঙালীর মধ্যে কেন, যে-কোন সমাজে বিরল।"

১৩৩৫ শ্রাবণ

অন্ধের বন্ধু লালবিহারী শাহ্

অন্ধেরা আমাদের দেশে সাধারণতঃ ভিক্ষা করিয়া অন্যের গলগ্রহ হইয়া প্রাণধারণ করে। অথচ তাহারা জ্ঞানলাভ করিতে পারে, এবং কোন কোন পণ্যশিল্প শিখিয়া অন্য মানুষদের মত স্বাবলম্বী হইতে পারে। বাংলা দেশে স্বর্গীয় লালবিহারী শাহ্ প্রথমে ইহা উপলব্ধি করিয়া কলিকাতা অন্ধ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বহু বৎসর ইহা চালাইয়া তিনি অন্ধদের ও সমাজের প্রভূত উপকার করিয়া গিয়াছেন। বিস্তর ছাত্র ইহাতে শিক্ষা পাইয়া উপার্জ্জক হইয়াছে, এবং অন্য অনেক মানুষের মত জ্ঞানলাভ করিয়াছে।
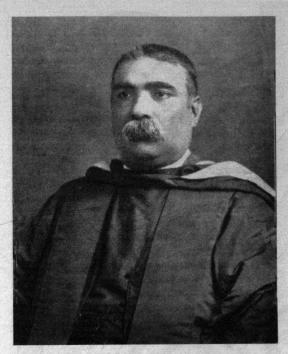
আশুতোষ মুখোপাধ্যায় • আষাঢ় ১৩৩১

আশুতোষের কার্টুন : গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত
• জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮

ডাঃ মন্তেসরি • জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮

সিলভাঁ লেভি • অগ্রহায়ণ ১৩৪২

মহিলা বিদ্যাপীঠের চারজন গ্র্যাজুয়েট ছাত্রী • আশ্বিন ১৩২৭
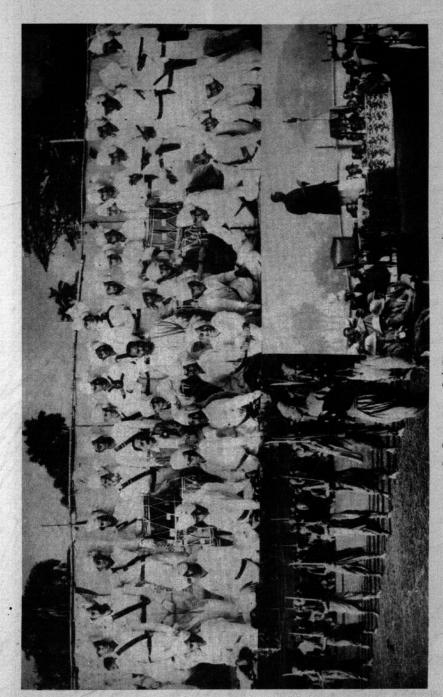
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাদিবসে ছাত্রদের ব্যান্ডবাদ্য, পাইকনৃত্য,
উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বক্তৃতা • ফাল্গুন ১৩৪৩

সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণন • মাঘ ১৩৩৭

রাহুল সাংস্কৃত্যায়ন ও তাঁর সঙ্গী
• অগ্রহায়ণ ১৩৪৩

রামকৃষ্ণ গোপাল ভান্ডারকর • আশ্বিন ১৩৩২

কাশীপ্রসাদ জয়সোয়াল • মাঘ ১৩৩৭

রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ • ফাল্গুন ১৩৪১

বিধুশেখর শাস্ত্রী • ফাল্গুন ১৩৪২

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ • পৌষ ১৩৪২

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল • পৌষ ১৩৪৫

রাঁচি বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের
সভাপতি সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
ও অন্যরা • পৌষ ১৩৪১

জগদানন্দ রায় • শ্রাবণ ১৩৪০
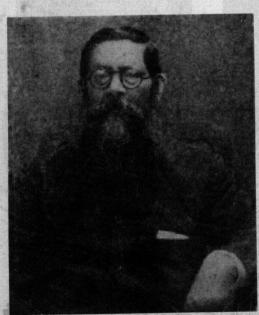
জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস • আষাঢ় ১৩৪৬

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় • চৈত্র ১৩৩৬

ঐতিহাসিক নন্দলাল চট্টোপাধ্যায় • মাঘ ১৩৪৬

নৃতত্ত্ববিদ শরৎচন্দ্র রায় • অগ্রহায়ণ ১৩৪৩

প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ • বৈশাখ ১৩০৮

রাধাকমল মুখোপাধ্যায় • পৌষ ১৩৪৩

রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় • পৌষ ১৩৪৩

মনস্বী শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়

উত্তরপাড়া কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল সুশিক্ষক ও সুপণ্ডিত শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় নব্বই বৎসর বয়স অতিক্রম করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুর তিন বৎসর আগে পর্য্যন্তও তিনি প্রবন্ধ রচনা করিয়া মাসিক পত্রে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার লিখিত শেষ প্রবন্ধ "Steps towards a World Federation" ১৯২৫ সালে মডার্‌ন্ রিভিউ পত্রে প্রকাশিত হয়। তিনি যাহা কিছু লিখিতেন, তাহাতে পৃথিবীর সমসাময়িক ঘটনা সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান ও চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যাইত। তিনি নিজের বক্তব্য বেশ বিশদভাবে লিখিতে পারিতেন। তাঁহার কর্ম্মজীবন শিক্ষাদান কার্য্যেই ব্যয়তীত হওয়ায় ঘটনাবহুল ছিল না। তথাপি তাহা শিক্ষাপ্রদ। তাঁহার সংক্ষিপ্ত স্বরচিত জীবনচরিত প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। এইজন্য এখানে তাঁহার জীবনেব কোন কথার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তাঁহার দীর্ঘজীবন হইতে এই একটি উপদেশ পাওয়া যায়, যে, অল্প বয়সে স্বাস্থ্য ভাল না থাকিলেই যে মানুষ সব স্থলে স্বল্পায়ু হয়, তাহা নহে। তিনি একবার আমাকে লিখিয়াছিলেন, যে. এক সময়ে (তখন বোধ হয় তাঁহার বয়স ত্রিশ) তাঁহার স্বাস্থ্য এত খারাপ হইয়াছিল, যে, চিকিৎসকেরা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, যে, খুব সাবধানে থাকিলে তিনি কয়েক বৎসর বাঁচিতেও পারেন। তিনি সাবধানেই থাকিতেন। ফলে কয়েক বৎসরের পরিবর্ত্তে তাহার পর ষাট বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন। শুধু জীবিত ছিলেন না, বরাবর জ্ঞানানুশীলনে জীবনযাপন করিয়া গিয়াছেন। জ্ঞানবত্তা ও উন্নত চরিত্রের গুণে তিনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যাঁহারা চর্চ্চা করেন, তাঁহারা অনেকে জানেন কিন্তু সকলে না জানিতে পারেন, যে, ১৮৭৭ সালের অক্টোবর মাসের ক্যাল্‌কাটা রিভিউ পত্রিকায়, অর্থাৎ পঞ্চাশ বৎসরেরও আগে, তিনি "কথিত ও লিখিত বাংলা" বিষয়ক প্রবন্ধে পুস্তক-রচনায় কথিত বাংলা ব্যবহারের সমর্থন করিয়াছিলেন।

তিনি প্রথম পর্য্যায়ের সাবেক ক্যাল্‌কাটা রিভিউ পত্রিকায় ১৮৭৭ হইতে ১৯০৩ পর্য্যন্ত সাতটি প্রবন্ধ, মডার্‌ন্ রিভিউ পত্রিকায় বাইশটি প্রবন্ধ এবং প্রেসিডেন্সী কলেজ ম্যাগাজিনে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

১৩৩৬ মাঘ

ম্যাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্

ধার্ম্মিক ও দার্শনিক বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়াইবার জন্য বিলাতে হিবার্ট ট্রাষ্ট্ প্রতিষ্ঠিত হয়। অনেক বিখ্যাত লোক হিবার্ট লেক্চার দিয়াছেন। ভারতীয়দের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম শ্রীযুক্ত ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর কয়েকটি হিবার্ট লেক্চ্যার দিতে নিমন্ত্রিত হন। অসুস্থতাপ্রযুক্ত তিনি এ পর্য্যন্ত তাহা দিতে পারেন নাই। তাহার পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ আহূত হন। তিনি সম্প্রতি ম্যাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে "An Idealist View of Life" (মানব জীবন সম্বন্ধে আদর্শানুসারী একটি অভিমত) বিষয়ে চারিটি বক্তৃতা করেন। লণ্ডনের একেশ্বরবাদীদের কাগজ ইন্কোয়ারারে এই বক্তৃতাগুলির খুব প্রশংসা বাহির হইয়াছে। ঐ কাগজের ২১শে ডিসেম্বরের সংখ্যায় লিখিত হইয়াছে :—

"Throughout the course the audiences were large and highly appreciated the eloquence, humour and learning of the lecturer. Professor Radhakrishnan spoke on the modern challenge to religious beliefs offered by the sciences the ways of escape provided by dogmatic denial and dogmatic affirmation, the nature of religious experience, and finally the confirmation of intuition in the spheres of intellectual endeavour, aesthetics and ethics."

"Few lectures given at the University in living memory have awakened such keen interest and evoked such warm enthusiasm."

১৩৪২ চৈত্র

অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনের অক্সফোর্ডে নিয়োগ

অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন যে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্য ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতির অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহা আমরা ফাল্গুনের প্রবাসীতে লিখিয়াছি। তিনি ইতিপূর্ব্বেও ইংলণ্ডে আপ্টন লেক্চ্যার্স ও হিবার্ট লেকচ্যার্স দিয়া সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। অক্সফোর্ডের অধ্যাপক নিযুক্ত হওয়া গৌরবের বিষয়।

ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার মজুমদার, এম-এ, পি এইচ-ডি, অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনের একটি তথ্যপূর্ণ বাংলা জীবনচরিত প্রকাশ করিয়াছেন।

আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময়ে কেহ খুব বেশী বেতন না পাইলে তাহার পদগৌরব আছে মনে করা হয় না। বড় বড় সরকারী চাকরির বেতন এদেশে যত বেশী, অন্য কোন দেশে তত নহে। অন্যান্য বিভাগের মত শিক্ষা-বিভাগেব

ডিরেক্টর, ইন্সপেক্টর ও বড় অধ্যাপকদেরও বেতন বেশ মোটা রকমের। ইংলণ্ডে তাহা নহে—যদিও ইংলণ্ড ভারতবর্ষের চেয়ে খুব বেশী ধনী এবং তথাকার লোকদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের ব্যয়ও অনেক বেশী। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন যে চাকরীতে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহার বার্ষিক বেতন নয় শত পাউন্ড অর্থাৎ ১২০০০ টাকা। ভারতবর্ষের শিক্ষাবিভাগসমূহের অনেক বিদেশী ও দেশী অধ্যাপক ইহা অপেক্ষা অধিক বেতন পান।

১৩৩৮ ভাদ্র

অধ্যাপক খুদা বখ্‌শ্‌

পরলোকগত অধ্যাপক খুদা বখ্‌শ্‌ ব্যারিষ্টার এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস অধ্যাপক ছিলেন। তিনি উত্তম ইংরেজী লিখিতে পারিতেন। কতকগুলি পুস্তকের লেখক ও অনুবাদক রূপে তাঁহার প্রভূত পাণ্ডিত্যের খ্যাতি আছে। তিনি রসিক এবং মিষ্টালাপী ছিলেন। তাঁহার স্বভাবে উৎকট সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। ভারতীয় অধিকাংশ মুসলমানের সম্বন্ধে তিনি এই মর্ম্মের কথা লিখিয়াছিলেন, “আমরা হিন্দুদেরই মত ভারতীয়, আরব মোগল পারসীক আফগান তুর্ক নহি; আমরা ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি, এই যা প্রভেদ।” তাঁহার পিতা বাঁকিপুরের বিখ্যাত খুদা বখ্‌শ্‌ লাইব্রেরীর সংস্থাপক। তাহার সাহায্যে ঐতিহাসিকদের গবেষণার সাহায্য হইয়াছে। পিতার জ্ঞানানুরাগ পুত্র পাইয়াছিলেন।

১৩৩৮ পৌষ

অধ্যাপক পার্সিভ্যাল

প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক পার্সিভ্যাল সাহেবের সম্প্রতি লণ্ডনে মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৬ অতিক্রম করিয়াছিল। চট্টগ্রাম তাঁহার জন্মস্থান। তাঁহার নাম ইউরোপীয় হইলেও তিনি ইংরেজ ছিলেন না। তাঁহার গায়ের রং শ্যামবর্ণ ছিল এবং দেখিতে তিনি বাঙালীর মত ছিলেন। জন্মভূমি ভারতবর্ষের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় প্রীতি ছিল। তিনি পাণ্ডিত্যে এবং অধ্যাপনায় দক্ষতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। ছাত্রদের তিনি প্রিয় ছিলেন এবং ছাত্রদিগকেও তিনি ভালবাসিতেন।

১৩৩৯ আশ্বিন

পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য

বিরানব্বই বৎসর বয়সে পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য দেহত্যাগ করিয়াছেন। এ বৎসর তাঁহার মানসিক শক্তি কেমন ছিল বলিতে পারি না, কিন্তু দুই-এক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাকে নারিকেলডাঙার স্যর গুরুদাস ইন্‌স্টিটিউটের এক সভায় যখন দেখিয়াছিলাম ও তাঁহার কথা শুনিয়াছিলাম, তখনও তিনি বেশ সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বেশ গুছাইয়া সুযুক্তিসম্মত অনেক কথা বলিয়াছিলেন। তাঁহার স্মৃতিশক্তিও তখন বেশ ছিল। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নানা বিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ছাত্র, বঙ্কিমচন্দ্রের সহাধ্যায়ী, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিক্ষক, এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহকর্ম্মী রূপে রিপন কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি বি-এল্ ছিলেন এবং আইনের প্রগাঢ় জ্ঞানও তাঁহার ছিল, কিন্তু বেশীদিন ওকালতী করেন নাই। "হিতবাদী" যখন স্থাপিত হয়, তখন তিনি উহার প্রথম সম্পাদক হন। উহার সংস্থাপক বা অন্যতম সংস্থাপক তিনি ছিলেন কি-না, এখন মনে পড়িতেছে না। "সাহিত্য" মাসিক পত্রে তাঁহার বাংলা লেখা কিছু বাহির হইয়াছিল। তাহা বেশ বিশদ, যৌক্তিক এবং সুশৃঙ্খল। তাহার একটিতে তিনি পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের তুলনায় সমালোচনা কিছু করিয়াছিলেন। তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোন জীবনচরিত-লেখক স্বগ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন কি-না বলিতে পারি না।

১৩৩৯ অগ্রহায়ণ

বরিশালের জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

সম্প্রতি বরিশালের আচার্য্য জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি জনসেবার কার্য্যে অশ্বিনীকুমার দত্তর সহকর্ম্মী ছিলেন। তত্ত্বজ্ঞানী, সেবাব্রতী, এবং সাধু প্রকৃতির মানুষ বলিয়া তিনি বরিশালে সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

১৩৩৯ মাঘ
অধ্যাপক হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত

অধ্যাপক হেমচন্দ্র দাসগুপ্তের মৃত্যুতে বাংলা দেশ এক জন বিদ্যোৎসাহী ভূতত্ত্ববিদ হারাইল। তিনি অধ্যাপনা এবং নিজ আলোচ্য বিদ্যা ভূতত্ত্ব ব্যতীত সাধারণভাবে সাহিত্যোৎসাহীও ছিলেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য-পরিচালনে তিনি রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের সহকর্ম্মী ছিলেন, এবং তাঁহার মৃত্যুর পরও পরিষদের কার্য্যের সহিত দাসগুপ্ত মহাশয়ের যোগ ছিল।

১৩৩৯ চৈত্র
বিহারীলাল মিত্র

বিহারীলাল মিত্র বাগবাজারের বিখ্যাত মিত্র বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলায় কয়েকখানি ভাল বহি লিখিয়াছিলেন এবং ইংরেজীতে যোগবাশিষ্ঠের অনুবাদ করিয়াছিলেন। তিনি দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। "দি রেফিউজ" নামে বৌবাজারে অসহায় চিররুগ্ন লোকদের যে আশ্রয়স্থান আছে, তাহার বাটী নির্ম্মাণের জন্য তিনি পঁচাত্তর হাজার টাকা দিয়াছিলেন। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান সভার জন্য তিনি এক লক্ষ টাকা দান করেন। তাঁহার উইলে তিনি নারীশিক্ষার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বরাবর বার্ষিক আটচল্লিশ হাজার টাকা দিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই দানটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলা দেশে ছেলেদের শিক্ষার জন্য বড় দান কেহ কেহ করিয়াছেন, কিন্তু মেয়েদের শিক্ষার জন্য এরূপ দান এ-পর্য্যন্ত কেহ করেন নাই! মেয়েদের শিক্ষার জন্য বড় দান বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে অনেকে করিয়াছেন।

১৩৪১ ফাল্গুন
স্যার আবদুল্লা সুহ্রাওয়ার্দী

স্যার আবদুল্লা সুহ্রাওয়ার্দীর মৃত্যুতে বঙ্গদেশ হইতে এক জন বহুভাষাবিৎ বিদ্বান্ ব্যক্তির অন্তর্দ্ধান হইয়াছে, এবং বিশেষ করিয়া মুসলমান সম্প্রদায় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তিনি বঙ্গদেশে, ইংলণ্ডে ও মিশর দেশে শিক্ষালাভ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েব সংস্রবে তিনি অধ্যাপকের কাজ বহু বৎসর করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার এবং ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভারও সদস্য তিনি বহু বৎসর ছিলেন।

যৌবন কালে তিনি যেমন বিলাতে বিশ্ব-ইশ্লামিক সমিতি (Pan-Islam Society) স্থাপন করিয়াছিলেন, তেমনই উৎসাহী স্বাজাতিকও (Nationalist) ছিলেন। আমরা ১৩১৫ সালের জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে লিখিয়াছিলাম :—

"সৈয়দ আবদুল্লা অল্ মামুন সুহ্রাওয়ার্দী বয়সে নবীন হইলেও জ্ঞানে প্রবীণ, নানা বিদ্যায় পারদর্শী। তিনি লণ্ডনের বিখ্যাত বিশ্ব-মুসলমান-সমিতির স্থাপনকর্ত্তা। সাহিত্যক্ষেত্রেও তিনি খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। প্রায় এক মাস হইল পূর্ণিমায় চতুর্থ মুসলমান শিক্ষাসম্বন্ধীয় আলোচনা সভার অধিবেশন হয়। তিনি তাহার সভাপতি মনোনীত হন। তাঁহার অভিভাষণ উৎসাহপূর্ণ, এবং ধর্ম্মভাব, স্বজাতিপ্রেম, স্বদেশপ্রেম, ধর্ম্মবিষয়ক ঔদার্য্য, ও বিদ্যানুরাগের একত্র সম্মিলনে উপাদেয় হইয়াছিল।"

ঐ অভিভাষণে উহা হইতে আমরা প্রবাসীর প্রায় এক পৃষ্ঠাব্যাপী দুটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। তাহার কয়েকটি বাক্য নীচে মুদ্রিত হইল।

"I for one am proud to declare that the blood of the Aryans flows in my veins with that of the Semitics. A greater and a wider heritage becomes mine when I feel that I owe allegiance not only to Moses, Christ and Muhammad, but also that Zaratustra, Srikrishna and Gautama claim my homage The Gita as well as the Gospel of Islam belongs not to this race or that, but to whole humanity"

"The Muslim is often reproached for lack of patriotism. Yet it was the prophet of Islam who declared patriotism to be a part of religion."

১৩৪১ কার্ত্তিক
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে
পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রীর লেক্‌চ্যারার নিয়োগ

খবরের কাগজে দেখিলাম, পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রীকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগে একজন লেক্‌চ্যারার নিযুক্ত করা হইয়াছে। এই নিয়োগ হইতে বুঝা যাইতেছে, যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের

কর্তৃপক্ষ শাস্ত্রী মহাশয়ের যোগ্যতা কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। তাঁহাকে 'আশুতোষ সংস্কৃত-অধ্যাপক' নিযুক্ত করিলেই তাঁহার যোগ্যতার ঠিক আদর করা হইত। কলিকাতার দেশী প্রধান প্রধান দৈনিক এবং কোন কোন সাপ্তাহিক শাস্ত্রী মহাশয়ের যোগ্যতার বর্ণনা করিয়াছিলেন, এবং কেহ কেহ স্পষ্ট ভাষায় তাঁহাকে যোগ্যতম বলিয়াছিলেন। অবশ্য, যোগ্যতম লোকেরাই যে নিযুক্ত হইয়া থাকেন, এমন নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ললিতকলার অধ্যাপক নিয়োগের সময় দেখা গিয়াছিল, যে, যোগ্যতা অপেক্ষা তদ্বির ও মুরুবির জোরে বেশী ফল পাওয়া যায়।

শাস্ত্রী মহাশয় যে আর বিশ্বভারতীর বিদ্যাভবনের প্রিন্সিপ্যাল থাকিবেন না, ইহাতে বিষাদ অনুভব করিতেছি। বিশ্বভারতীর ক্ষতি হইবে বলিয়া দুঃখিত হইতেছি। আশা করি শাস্ত্রী মহাশয় কোন-না-কোন প্রকারে বিশ্বভারতীর সেবা ভবিষ্যতেও করিতে পারিবেন।

১৩৪২ ফাল্গুন
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্যের প্রতি

প্রীতিনমস্কার সম্ভাষণ

আপনার রাজদত্ত সম্মান লাভের পর কিছুদিন বিলম্ব হয়ে গেল—যথোচিত অভিনন্দন পাঠাতে পারি নি তার কৈফিয়ৎ দেওয়া আবশ্যক। বিবাহ-উৎসবে বিধবার যোগ দেওয়া নিষিদ্ধ— আমি উপাধিত্যাগী, কী আখ্যা দেবেন? ব্যপাধিক? আপনার নব উপাধি-সম্প্রদান উপলক্ষ্যে শঙ্খধ্বনি হয় তো আমাকে শোভা পায় না। তবু আপনার রাজধানীর বন্ধুসভা থেকে দূরে এই অন্তরালে বসে রাজবুদ্ধির প্রশংসাবাদ জানাচ্চি। আমাদের এই ক্ষুদ্র মণ্ডলীর মধ্যে যতদিন ছিলেন ততদিন আপনার প্রকাশ অবরুদ্ধ ছিল, তাই রাজার প্রসাদ থেকে বঞ্চিত ছিলেন—আজ প্রশস্ত ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন এবং সম্মানও পেয়েছেন তারই উপযুক্ত। আমরা আপনাকে নিতান্ত আটপুহুরে শাস্ত্রী উপাধি দিয়েছিলেম দীনজনোচিত সঙ্কোচের সঙ্গে, সেটা মানী সমাজে ব্যবহার্য্য নয়। সেটা আজ এখানকার ধূলিতেই স্খলিত হয়ে রইল।

ইতিমধ্যে দুই বার রোগের অভিঘাতে আমার জরার জীর্ণতা আরো বাড়িয়ে দিয়ে গেছে। বিশ্রামের ইচ্ছা করে থাকি, কিন্তু সেটা আমার পক্ষে দরিদ্রের মনোরথেরই তুল্য হয়েছে। বিশ্রান্তির চরম উপাধি যিনি আমাকে দেবেন, তিনি আসন্ন হয়েছেন। ইতি ১৮ জানুয়ারি, ১৯৩৬

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত
বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য সুহৃদ্বরেষু

বিদ্যার তপস্বী তুমি। আজ তুমি যশস্বী ভারতে;

কবি তব জয়মালা সঁপি দিল তব জয়রথে।
এই আশীর্ব্বাদ করি —তব যাত্রা হোক্ অগ্রসর
অপূর্ব্ব কীর্ত্তির পথে উত্তরিয়া দেশদেশান্তর
দূর হতে দূরে। একদিন যবে অখ্যাত নিভৃতে
স্তব্ধ ছিলে, অন্তর্লীন আনন্দের অদৃশ্য রশ্মিতে
সিদ্ধি ছিল মহীয়সী; ভারতীর প্রসাদবৃষ্টিতে
ছিল তব পুরস্কৃতি, ছিল না তা' লোকের দৃষ্টিতে।
জ্ঞানের প্রদীপ তব দীপ্ত ছিল ধ্যানের আড়ালে
নিষ্কম্প আলোকে। আজ জনারণ্যে চরণ বাড়ালে,
সেথা পরিচয় লাগি নাম মাগে উপাধির সীমা,
সেথা মহিমার চেয়ে মানে লোকে চিহ্নের গরিমা।
চিহ্ন না রহিতে তবু তোমারে চিনিয়াছিল যারা
তাদের সম্মানমাল্য জনতার কাছে মূল্যহারা।
যেথা যাহা প্রয়োজন তাই দিন্ সৌভাগ্য-বিধাতা,
পদবীর পরিমাপে হয় যদি হোক্ উচ্চ মাথা।
বিশ্বে তুমি দৃশ্য হও ভালে বহি রাজদত্ত টিকা,
বন্ধুচিত্তে থাকো লয়ে নির্লাঞ্ছন আত্মালোকশিখা॥

শান্তিনিকেতন
১২ মাঘ ১৩৪২ বন্ধু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩৪১ ফাল্গুন

পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মৃত্যুতে বঙ্গের বাহিরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলনের এক জন প্রধান প্রযত্নকর্ত্তার তিরোভাব ঘটিল। তিনি প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য- সম্মেলনের এক জন প্রধান সহায়ক ছিলেন। কলিকাতায় থাকিতে তিনি সংস্কৃত কলেজের অন্যতম অধ্যাপক রূপে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষক রূপে শিক্ষাক্ষেত্রে ও সাহিত্যক্ষেত্রে কর্ম্মিষ্ঠতার পরিচয় দিয়াছিলেন। পরে পেন্স্যান লইয়া কাশীবাসী হইয়াও তিনি অলস হন নাই। কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ লইয়া তিনি বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষাদানে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং পণ্ডিতও ছিলেন। কিন্তু "ব্রাহ্মণপণ্ডিত" বলিলে যেরূপ যুক্তিবিমুখ অন্ধ গোঁড়ামির সমর্থক অনেক ক্ষেত্রে বুঝায়, তিনি সেরূপ ছিলেন না। তিনি বিধবা-বিবাহের সমর্থন করিতেন, পণপ্রথা নিবারণের চেষ্টা করিয়াছিলেন, বাল্যবিবাহনিষেধক শারদা- আইনের সমর্থনকল্পে সীতা-সাবিত্রী প্রভৃতি পূজনীয়া নারীগণের বিবাহের বয়স দক্ষতার সহিত আলোচনা করিয়াছিলেন, এবং সামাজিক দুর্নীতির বিরোধী ছিলেন। তাঁহার উপস্থিতবাগ্মিতা সুবিদিত ছিল। সদালাপে ও আপ্যায়নে তাঁহার দক্ষতার জন্য তিনি লোকপ্রিয় ছিলেন। কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি সম্বন্ধে বাংলা বহি লিখিয়া তিনি যশস্বী হইয়াছিলেন।

১৩৪২ ভাদ্র

মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের তৈলচিত্র স্থাপন

বেদান্তরত্ন মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের মৃত্যুর পর আমরা তাঁহার সম্বন্ধে কিছু লিখিয়াছিলাম। তাঁহার সম্বন্ধে অন্যেব লেখা দুটি প্রবন্ধও 'প্রবাসী'তে বাহির হইয়াছে। তাহার দ্বারা তাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সব কথা নিঃশেষ হয় নাই। তাঁহার জীবন ঘটনাবহুল না হইলেও নানাদিক্ দিয়া মূল্যবান ছিল। এই জন্য তাঁহার একটি জীবনচরিত পুস্তকাকারে বাহির হওয়া আবশ্যক।

গত ১৮ই শ্রাবণ শনিবার ২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থিত শিবনাথ স্মৃতিমন্দিরের পুস্তকাগারে তাঁহার একটি তৈলচিত্র স্থাপিত হয়। ইহা তাঁহার ভাগিনেয়ী শ্রীমতী বিনোদিনী চৌধুরাণী প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন। তজ্জন্য তিনি সর্ব্বসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন। মহেশবাবুর তৈলচিত্র শিবনাথ স্মৃতিমন্দিরের পুস্তকাগারে স্থাপন করিবার কারণ এই, যে, তাঁহার ক্রীত ও অধীত বহু ভাষার দর্শন ও ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ক ছয় হাজার গ্রন্থ তিনি এই পুস্তকাগারে দান করিয়া যান। এই গ্রন্থগুলির মূল্য কুড়ি হাজার টাকা হইবে। তদ্ভিন্ন, তাঁহার ক্রীত ও অধীত নানাবিধ কাব্য ও উপন্যাসাদির গ্রন্থও ছিল। তৎসমুদয় অন্যত্র দেওয়া হইয়াছে। তিনি ধনী লোক ছিলেন না, সরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কাজ করিতেন। পড়িবার জন্য বহি কিনিতেন, ঘর সাজাইবার জন্য নহে। বিদেশী ডাকে তাঁহার বহি আসিত না, এমন কোন সপ্তাহ যাইত কিনা সন্দেহ; কোন কোন সপ্তাহের বিলাতী ডাকের দিন ডাকের পিয়াদা একা তাঁহার বহির মোট আনিতে না পারায় মুটিয়ার মাথায় চাপাইয়া আনিত। তিনি বাংলা বৈদিক ও তৎপরবর্ত্তী কালের সংস্কৃত, পালি, ইংরেজী, গ্রীক, গুজরাটী, আবেস্তার ভাষা, এবং বোধ হয় হিব্রু জানিতেন। বহু ধর্ম্মের ধর্ম্মশাস্ত্রে তাঁহাব প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। উপনিষদ্, গীতা, বৌদ্ধ শাস্ত্র ও বাইবেল সম্বন্ধে তিনি অনেক সারবান্ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার সম্পাদিত সটীক ও সানুবাদ বৃহদাবণ্যক উপনিষদ ও ছান্দোগ্য উপনিযদ তাঁহার মৃত্যুর পর পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি চরিত্রগুণে, জ্ঞানবত্তায় এবং শিক্ষাদান-প্রণালীর উৎকর্ষে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ছিলেন। বীজগণিত সম্বন্ধে তিনি ছাত্রদের জন্য একখানি উৎকৃষ্ট ইংরেজী বহি লিখিয়াছেন। কিন্তু তিনি বিখ্যাত লোক ছিলেন না বলিয়া কোন প্রকাশক তাহা তাঁহার নিকট হইতে পাইবার চেষ্টা করেন নাই, এবং তিনিও চিরকুমার থাকায় ও অর্থাগম সম্বন্ধে তাঁহার ব্যগ্রতা না-থাকায় নিজেও তাহা প্রকাশ করেন নাই। তিনি হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা উত্তম রূপে জানিতেন এবং রোগীদিগকে বিনামূল্যে ঔষধ দিতেন—দরিদ্র রোগীদিগকে নিজ ব্যয়ে পথ্যও দিতেন। সকল জনহিতকর কর্ম্মে তাঁহার অনুরাগ ছিল, এবং যথাসাধ্য তাহার জন্য দান ও পরিশ্রম করিতেন। তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন—এরূপ বিদ্বান ছিলেন যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজপরিদর্শক প্রিন্সিপ্যাল ডক্টর প্রসন্নকুমার রায় একবার আমাকে বলিয়াছিলেন, "আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত কলেজ পরিদর্শন করিয়াছি, কিন্তু মহেশবাবুর মত পণ্ডিত কোথাও দেখি নাই।" কিন্তু পণ্ডিত বলিয়া তিনি নীরস শুষ্ক প্রকৃতির লোক ছিলেন না; তাঁহার নির্ম্মল অট্টহাস্য দেখিবার ও শুনিবার জিনিষ ছিল। এরূপ একটি

মানুষের কোন এক বয়সের চেহারা মানুষকে স্মরণ করাইয়া দিবে এমন একটি চিত্র সর্ব্বসাধারণের অধিগম্য হলে স্থাপিত হওয়া আনন্দের বিষয়। ইহা তাঁহার দেহের চিত্র। তাঁহার জীবনচরিত ও তাঁহার প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হইলে তাঁহার অন্তরের চিত্রও পাওয়া যাইবে।

১৩৪২ অগ্রহায়ণ

অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভী

গত মাসে পারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভীর মৃত্যু হইয়াছে। ভারতবর্ষীয়, তিব্বতীয় ও চৈনিক প্রাচীন সাহিত্য ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। এই সকল বিষয়ে তাঁহার সমকক্ষ তাঁহার সমসাময়িক কেহ ছিলেন না। তিনি বিশ্বভারতীর অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া কিছুকাল শান্তিনিকেতনে ছিলেন এবং তাহার প্রারম্ভিক সভায় উপস্থিত ছিলেন। যে-সব ভারতীয় ছাত্র পারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার বিভাগে শিক্ষালাভ করিতে যাইত, তিনি তাহাদিগকে যে কেবল শিক্ষা দিতেন তাহা নহে, থাকিবার জায়গা এবং ন্যায্য কম মূল্যে তাহারা যাহাতে ভাল আহার্য্য পায়, যত্নপূর্ব্বক তাহার ব্যবস্থাও তিনি করিয়া দিতেন। তাঁহার পত্নীকেও ভারতীয় ছাত্রদের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি। একবার অধ্যাপক লেভী সস্ত্রীক কলিকাতায় তাঁহার এক ছাত্রের সহিত দেখা করিতে আসেন। যখন কথাবার্ত্তা হইতেছিল, তখন ম্যাডাম লেভী একটি শিশুর পা বিছানা হইতে বাহির হইয়া আছে দেখিয়া তাহাকে আনিতে বলেন। কোলে লইয়া "আমি দিদিমা হই" বলিয়া তাহাকে আদর করেন। এই বাংলা কথাগুলি তিনি শান্তিনিকেতনে থাকিতে শিখিয়াছিলেন। শিশুটির তখনও কথা বুঝিবার বয়স হয় নাই।

১৩৪২ পৌষ

পরলোকগত অধ্যাপক সিলভাঁ লেভি

গত মাসে আমরা লিখিয়াছিলাম, নানাপ্রাচ্যভাষাবিৎ, ভারতবর্ষ চীন ও তিব্বতের পুরাকালীন সংস্কৃতি সম্বন্ধে অন্যতম প্রধান আচার্য্য প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়েব অধ্যাপক পরলোকগত সিলভাঁ লেভি কিছুকাল শান্তিনিকেতনে অধ্যাপক ছিলেন। তখন তিনি ও তাঁহার পত্নী বাঙালীর

পরিচ্ছদও পরিতেন। ইহাতে সকলের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিবার তাঁহাদের সুবিধা হইত। তাঁহাদের লোকপ্রিয় হইবার ইহাও একটি কারণ।

১৩৪২ অগ্রহায়ণ

ঈশানচন্দ্র ঘোষ

ঈশানচন্দ্র ঘোষ যশোর জেলার একটি গ্রামে দরিদ্র এক কায়স্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। নয় বৎসর বয়সে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। অন্যের সাহায্যে তাঁহাকে বাল্যকালে জীবনের পথে অগ্রসর হইতে হয়। তিনি বুদ্ধিমত্তা ও শ্রমশীলতা দ্বারা সকল পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন ও বৃত্তিলাভ করেন। এই প্রকারে তিনি উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হন। কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি কিছু কাল ছাত্র পড়াইয়া ও খবরের কাগজে লিখিয়া নিজের ব্যয় নির্ব্বাহ করেন।

১৮৮৫ সালে তিনি সরকারী শিক্ষা-বিভাগে প্রবিষ্ট হন। তিনি হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক রূপে উহার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। তিনি হুগলী নর্ম্যাল স্কুলের হেডমাষ্টার ও প্রেসিডেন্সী বিভাগের স্কুল-ইন্সপেক্‌টর হইয়াছিলেন। কিছু কাল তিনি শিক্ষা-বিভাগের সহকারী ডিরেক্‌টর ছিলেন। সরকারী কাজে যিনি এত দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন তাঁহাকে, পুলিসের সব-ইন্সপেক্টরের মত, রায় সাহেব উপাধি দেওয়াটা বিদ্রূপের মত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি এই লাঞ্ছনা গায়ে মাখেন নাই, উচ্চতর উপাধিলাভের কোন চেষ্টাও করেন নাই।

তিনি অনেক বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তাহাতে নূতনত্ব ছিল। কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি বৌদ্ধ জাতক-সমূহের বঙ্গানুবাদ। এই অনুবাদ করিবার জন্য তিনি পরিণত বয়সে পালি শিক্ষা করেন, এবং ইংরেজীতে যে অনুবাদ কয়েক জন বিদ্বান ব্যক্তি মিলিত হইয়া করিয়াছেন, বাংলায় তাহা তিনি একা ষোল বৎসর পরিশ্রম করিয়া সমাপ্ত করেন। ইহা প্রকাশ করিতে তাঁহার ন্যূনাধিক ১২০০০ টাকা খরচ হইয়াছিল। বিক্রয় হইতে তাহা যে তিনি ফিরিয়া পান নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। কারণ, জাতক গ্রন্থ গল্পের মত মনোরম অথচ উপদেশপূর্ণ হইলেও এবং ইহাতে বৌদ্ধ যুগের সামাজিক ইতিহাসের অনেক উপকরণ থাকিলেও, বাঙালী পাঠকেরা ইহার সমুচিত সমাদর করেন নাই।

সংস্কৃত তিনি ভাল জানিতেন। ইতিহাস অধ্যয়নে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৬ হইয়াছিল। তাহার ছয় মাস পূর্ব্বেও তিনি প্রাচীন গ্রীক ইতিহাস পড়িতেছিলেন। ভৌগোলিক গ্রন্থ তাঁহার প্রিয় ছিল। স্বদেশের কালিদাস ও গ্রীসের হোমর তাঁহার প্রিয় কবি ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার কৃত কালিদাসের বিক্রমোর্ব্বশীর বাংলা অনুবাদের হস্তলিপি এবং হোমরের ইলিয়ডের কিয়দংশের হস্তলিপি পাওয়া গিয়াছে।

অধ্যয়নানুরাগী, বহুভাষাবিৎ ও সুলেখক ঈশানচন্দ্রের ব্যবসা-বুদ্ধিও প্রখর ছিল। অনেক ব্যবসাদার বাণিজ্যিক নানা বিষয়ে তাঁহার পরমার্শ লইতেন, এবং তিনি কয়েকটি বড় কোম্পানীর ডিরেক্টর ছিলেন। তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন যেমন করিয়াছিলেন, তাহার সদ্ব্যয়ও সেইরূপ করিয়াছিলেন। তিনি দাতা ছিলেন, অথচ তাঁহার দানের কথা তাঁহার জীবিত কালে লোকে জানিতে পারে নাই।

জন্মগ্রামের ম্যালেরিয়া দূর করিবার নিমিত্ত তিনি মশকবিনাশের জন্য অনেক হাজার টাকা খরচ করিয়াছিলেন। সেখানে মায়ের নামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় ও পিতার নামে একটি মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তদ্ভিন্ন তথায় দুটি বড় পুকুর কাটাইয়া গিয়াছেন, একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, একটি নল কূপ খনন করাইয়াছেন ও একটি রাস্তা নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে উইলে যশোর জেলার আরও কয়েকটি অভাবমোচনার্থ টাকা দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণীর স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ কসৌলীর পাস্তয়র চিকিৎসালয়ে একটি বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দেন, কেন-না তখন ক্ষিপ্তকুক্কুরদষ্ট বাঙালীর চিকিৎসার্থ কসৌলী না-গিয়া উপায় ছিল না। যাদবপুর যক্ষ্মা-হাসপাতালে তাঁহার পরলোকগতা কন্যার নামে একটি "শয্যা" দিয়া গিয়াছেন। খবরের কাগজে দেখিলাম, তাঁহার উইলে তিনি তাঁহার সম্পত্তির বৃহৎ অংশ জনহিতকর কার্য্যের জন্য দান করিতে নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার পুত্র অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ পিতার জীবিত কালে তাঁহারই ইচ্ছা অনুসারে প্রাচ্য মূল্যবান্ গ্রন্থসমূহের বঙ্গানুবাদের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে ত্রিশ হাজার টাকা দিয়াছিলেন।

ঈশানচন্দ্র জীবনে অনেক শোক পাইয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে বিচলিত হন নাই।

১৩৪২ পৌষ

সর্ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

পঁচাত্তর বৎসর বয়সে সর্ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী পরলোক যাত্রা কবিয়াছেন। তিনি বিদ্বান ও কৃতী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, এবং নিজেও বিদ্বান ও কৃতী ছিলেন।

তাঁহার পিতা ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী কলিকাতার অন্যতম বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত অধ্যাপক প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীর বাংলা পাটীগণিত আমরা বাল্যকালে পড়িয়াছিলাম এবং যৌবনে প্রেসিডেন্সী কলেজে তাঁহাব নিকট ইংরেজী সাহিত্যের কোন কোন বহি পড়িয়াছিলাম। দেবপ্রসাদ বাবুর অন্যতম অনুজ ডাঃ সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। দেবপ্রসাদ বাবু এটর্নী ছিলেন। এটর্নীদের মধ্যে যাঁহারা লেখাপড়ার চর্চ্চা রাখিতেন ও রাখেন,

তিনি তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। বেসরকারী লোকদের মধ্যে তিনি প্রথম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার হন। তিনি ভারত-গবর্মেণ্টের প্রতিনিধিরূপে একবার জেনিভা ও আর একবার দক্ষিণ-আফ্রিকা গিয়াছিলেন; তাঁহার ইউরোপ ভ্রমণের ও দক্ষিণ-আফ্রিকা ভ্রমণের বৃত্তান্ত-পুস্তক দুখানি বাংলা সাহিত্যের ভ্রমণকাহিনী বিভাগ পুষ্ট করিয়াছে। শিক্ষাসংক্রান্ত ও জনহিকর বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার যোগ ছিল। সুরাপাননিবারিণী সভার তিনি এক জন প্রধান কর্ম্মী ছিলেন। নিঃস্ব অসহায় আতুরদের জন্য "দি রেফিউজ" নামক যে প্রতিষ্ঠানটি আছে, তাহার সহিতও তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল।

১৩৪২ ফাল্গুন
অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত

বিপিনবিহারী গুপ্ত নামের দুই জন অধ্যাপক বাংলা দেশে ছিলেন। এক জন বিখ্যাত গণিতাধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত—যাঁহার ছাত্র বঙ্গের অনেক বৃদ্ধ গণিতজ্ঞ ব্যক্তি (আমিও তাঁহার ছাত্র ছিলাম কিন্তু গণিতজ্ঞ নহি) বহু বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। আর একজন রিপন কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত। গত ২রা ফেব্রুয়ারী ৬১ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি বাংলার সুলেখক ছিলেন।

১৩৪২ চৈত্র
অন্নদাচরণ সেন

গত ১৫ই ফাল্গুন কলিকাতা সিটি কলেজের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেন ৬৭ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ৪০ বৎসর শিক্ষকতার কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ছিল। তাহার মধ্যে মদ্যপাননিবারণী সভা প্রধান। সাধু চরিত্রের গুণে তিনি শিক্ষক সম্প্রদায়ের অন্যতম অলঙ্কার ছিলেন।

১৩৪৪ জ্যৈষ্ঠ

অধ্যাপক শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়

অধ্যাপক শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে বাংলা দেশ ও ভারতবর্ষ হইতে উচ্চগণিতে বিশেষ জ্ঞানবান এক জন সুপণ্ডিত ব্যক্তির তিরোভাব হইল। তাঁহার সহিত আমার পরিচয় দীর্ঘকালব্যাপী। আমি যখন এলাহাবাদে একটি কলেজে কাজ করিতাম, তাহার গোড়ার দিকে, বোধ হয় ১৯০০ সালের কিছু আগে, তিনি তখনও বিবাহ করেন নাই, তিনি এলাহাবাদ গিয়াছিলেন এবং তাঁহার ও আমার বন্ধু গণিতাধ্যাপক উমেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাসায় ছিলেন। তখন তাঁহার ফোটোগ্রাফীর সখ খুব বেশী ছিল। বরাবরই তাঁহার একটা-না-একটা সখ ছিল ও তিনি কিঞ্চিৎ খেয়ালী ছিলেন। তখন অনেক দৃশ্যের ও অনেক মানুষের ছবি তিনি তুলিতেন। পরে তাঁহার সখ হয় গোলাপ বাগানে ও গোলাপ ফুলের চাষে। আমাকে তিনি একবার বলিয়াছিলেন, মিহিজামে তাঁহার গোলাপ বাগানে যত রকম গোলাপ আছে, ও অঞ্চলে বা অন্যত্র কোন বাগানে তাহা অপেক্ষা বেশী ও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর গোলাপ নাই। তিনি নিজের ঢাক বাজাইতে অভ্যস্ত ও নিপুণ ছিলেন না বলিয়া এবং তিনি যে বিদ্যার যে উচ্চ অঙ্গের অনুশীলন করিয়া গবেষণা করিয়াছিলেন তাহা শিক্ষিত সাধারণেরও সহজবোধ্য ছিল না বলিয়া তাঁহার খ্যাতির ব্যাপ্তি তাঁহার বিদ্যাবত্তার অনুরূপ হয় নাই। তিনি কেবল গণিতজ্ঞ ছিলেন না, ইংরেজী সাহিত্য ও দর্শনের অধ্যাপকতাও করিয়াছিলেন। তিনি সুগৃহস্থ ছিলেন। তাঁহা অপেক্ষা কম আয়ের লোকও আজকাল নিজে বাজার করে না, কিন্তু সুস্থ অবস্থায় তিনি প্রত্যহ বাজার হইতে তরকারী কিনিয়া আনিতেন। তিনি অমায়িক ও সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন।

১৩৪৪ ভাদ্র

কাশীপ্রসাদ জায়স্‌বাল

সুপণ্ডিত ডক্টর কাশীপ্রসাদ জায়সৱালের মৃত্যুতে প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধীয় গবেষণার ক্ষেত্রে একজন বিদ্বান বুদ্ধিমান সুনিপুণ কর্ম্মীর তিরোভাব হইল। তাঁহার বয়স মাত্র ৬৬ বৎসর হইয়াছিল। তিনি ব্যারিষ্টরী করিতেন। তাহাতে তাঁহার পসারও খুব ছিল। হিন্দু আইন ও ইন্‌কম-ট্যাক্সের আইনে তিনি বিশেষজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রিয় কাজ ছিল ঐতিহাসিক গবেষণা। তাঁহার গবেষণা ও সূক্ষ্মদৃষ্টির ফলে প্রাচীন ভারতেতিহাসের অনেক তমসাচ্ছন্ন যুগে আলোক পড়িয়াছে। ভারতীয় প্রাচীন রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে তাঁহার "হিন্দু পলিটি" নামক গ্রন্থ অপূর্ব্ব। তাহা

পড়িলে বুঝা যায়, প্রাচীন ভারতে সব রকম শাসনপ্রণালীর পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। ইহার অনেক কথা তিনি প্রথমে মডার্ণ রিভিয়ু কাগজে প্রকাশ করেন। বিহার এণ্ড্ উড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটিজ্ জার্ণ্যালের তিনি সম্পাদক ও প্রাণ ছিলেন। তিনিই উদ্যোগী হইয়া ভিক্ষু রাহুল সাংকৃত্যায়নকে তিব্বতে পাঠান। তিনি নবীন গবেষকদিগকে ডাকিয়া তাঁহাদের সহিত আলাপ-পরিচয় করিতেন এবং তাঁহাদের গবেষণায় মূল্যবান্ কিছু দেখিলে তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিতেন।

১৩৪৫ ভাদ্র

পণ্ডিত শ্রীনাথ চন্দ

মৈমনসিংহের প্রাচীন পণ্ডিত শ্রীনাথ চন্দ মহাশয়ের ৮৮ বৎসর বয়সে মৃত্যু হইয়াছে। তিনি যতদিন কাজ করিয়াছেন, তথাকার জেলা স্কুলের হেড-পণ্ডিতের চেয়ে উচ্চ কোন কাজ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার সাধু চরিত্র, বুদ্ধিমত্তা, কর্ম্মিষ্ঠতা, এবং সর্ব্ববিধ সার্ব্বজনিক কর্ম্মে অনুরাগ ও উৎসাহের গুণে মৈমনসিংহের বহু হিত সাধন করিয়া গিয়াছেন, এবং সর্ব্বসাধারণেব শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তিনি অল্প বয়সে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং মৃত্যুকালে ব্রাহ্ম সমাজের প্রাচীনতম নেতা ছিলেন। মৈমনসিংহের সিটি স্কুলের শাখা, সিটি কলেজের শাখা (বর্ত্তমান আনন্দমোহন কলেজ যাহার স্থলাভিষিক্ত), প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান স্থাপনে তিনি সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি আযৌবন উৎসাহী সমাজসংস্কারক ছিলেন। স্বয়ং একটি বিধবা মহিলার পাণিগ্রহণ করেন, এবং অনেক বিধবার বিবাহ দিয়াছিলেন। তিনি বাংলা বেশ জানিতেন ও লিখিতে পারিতেন। সদ্ভাবকুসুম, কাব্যকৌমুদী, সুখবোধ ব্যাকরণ, ভাষাবোধ প্রভৃতি কয়েকখানি বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তক তিনি লিখিয়াছিলেন। সেগুলি বাংলা দেশের অনেক বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত হইত বলিয়া তাহা হইতে তাঁহার বেশ আয় হইত। এই পুস্তকগুলি ভিন্ন তিনি 'ভক্তিযোগ' এবং 'ব্রাহ্মসমাজে চল্লিশ বৎসর' নামক দুটি গ্রন্থের লেখক। শেষোক্তটিতে তাঁহার জীবনকাহিনী বর্ণিত আছে।

তাঁহার শিক্ষাদান-প্রণালীর গুণে তাঁহার ছাত্রেরা তাঁহাব প্রতি অনুরক্ত হইত। তাঁহার চরিত্রের প্রভাবও তাহারা বিশেষ ভাবে অনুভব করিত।

নারীশিক্ষার প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। কন্যাদিগকে শিক্ষার সুযোগ পুত্রদের সমানই দিয়াছিলেন। তাঁহার তৃতীয়া কন্যা কুমারী ভক্তিলতা চন্দ, এম্-এ, কটকে অধ্যাপিকার কাজ করেন। অন্য এক কন্যা, কুমারী লাবণ্যলতা চন্দ, বি-এ, অসহযোগ আন্দোলনের সময় সরকারী উচ্চ চাকরি ছাড়িয়া দিয়া রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেন এবং এখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমীটির সহকারী সভানেত্রীর কাজ করিতেছেন।

জাতীয় রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। তিনি ভারতমিহিরের অন্যতম লেখক ছিলেন। কলিকাতার সঞ্জীবনী হইতে পৃথক্

সঞ্জীবনী নামে মৈমনসিংহে একটি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। শ্রীনাথ চন্দ মহাশয় ইহার সম্পাদক ছিলেন। ১৮৭৭ সালে মৈমনসিংহ-সভা নামে যে রাজনৈতিক সভাটি প্রতিষ্ঠিত হয়, তিনি তাহার সভ্য ছিলেন।

১৩৪৫ মাঘ

গিরিশচন্দ্র বসু

বঙ্গবাসী বিদ্যালয়ের ও কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রিন্সিপ্যাল গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয়ের ৮৬ বৎসর বয়সে মৃত্যু হইয়াছে। ইহা অকাল মৃত্যু না হইলেও, তাঁহার মত এক জন সুশিক্ষকের মৃত্যুতে দেশের ক্ষতি হইয়াছে। মৃত্যুকালে তিনি বঙ্গের অধ্যাপকবর্গের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু এই বয়োজ্যেষ্ঠতাই তাঁহার একমাত্র বৈশিষ্ট্য ছিল না।

তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন। পাস ভালই করিয়াছিলেন। উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ও পারদর্শিতা ছিল। তিনি সরকারী বৃত্তি পাইয়া বিলাতে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করিতে যান এবং তথাকার কলেজের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। দেশে ফিরিয়া আসিবার পর তিনি সরকারী চাকরী গ্রহণ করেন নাই। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ তিনি প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে বঙ্গবাসী বিদ্যালয়, পরে বঙ্গবাসী কলেজ স্থাপন করেন। শিক্ষাদান-কার্য্যে ও শিক্ষালয়-পরিচালনে তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। তিনি পরিচ্ছদে ও ভাষায় স্বাজাতিকতা রক্ষা করিয়া চলিতেন। চালচলনে অমায়িক ও সাদাসিধা, এবং চরিত্রবান পুরুষ ছিলেন। কলেজে বিজ্ঞানের ব্যাখ্যান বাংলাতে দিতেন। দরিদ্র ছাত্রদের তিনি সহায় ছিলেন। যে-সকল ছাত্র সরকারের রাজনৈতিক কোপে বিপন্ন হইত, তিনি তাহাদিগকে কলেজে ভর্ত্তি করিতে ইতস্ততঃ করিতেন না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত নানা ভাবে তাঁহার যোগ ছিল এবং তাহাতে বিশ্ববিদ্যালয় উপকৃত হইতেন।

১৩৪৭ জ্যৈষ্ঠ
অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

অধ্যাপক পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের বয়স মৃত্যকালে ৬১ বৎসর হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার মৃত্য অকালমৃত্যু বলা যাইতে পারে। তাঁহার তিরোভাবে তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি "বঙ্গীয় মহাকোষ" তাঁহার দ্বারা সমাপ্ত হইতে পারিল না। বাংলা সাহিত্যের, এক দিক দিয়া, পুষ্টিতে এই যে বিঘ্ন ঘটিল, ইহা দুঃখের বিষয়। দুঃখের কিঞ্চিৎ লাঘব এই ভাবিয়া হইতে পারে, যে, মহাকোষের সংকলন কার্য্যের তাঁহার অংশ তিনি শেষ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সংস্কৃত শিক্ষা কাশীতে হইয়াছিল এবং তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-এ উপাধিধারী ছিলেন। কথিত আছে, তিনি ভারতীয় ও বিদেশী ২৬টি ভাষা জানিতেন। দর্শন ও প্রত্নতত্ত্বের তাঁহার বিস্তৃত জ্ঞান ছিল। অন্য বহু বিদ্যার সহিতও তিনি পরিচিত ছিলেন। তিনি জীবনের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কোন কোন মাসিক পত্রের সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। কয়েকখানি গ্রন্থেরও তিনি রচয়িতা। হৃদয়গ্রাহী ও বহুতথ্যপূর্ণ বক্তৃতা করিবার শক্তি তাঁহার ছিল। তিনি নানাবিধ রসাল গল্প করিতে পারিতেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহিত দীর্ঘকাল তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল।

১৩৪৭ অগ্রহায়ণ
পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন

পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের তিরোভাবে বাংলা দেশ ও ভারতবর্ষ এক জন বিদ্বান আচারনিষ্ঠ প্রাচীনপন্থী শাস্ত্রবিৎ ব্যক্তির কর্মিষ্ঠতা হইতে বঞ্চিত হইল। তিনি শতাধিক সংস্কৃত গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করিয়াছিলেন; সংস্কৃতে তিনি বহু গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। পাণ্ডিত্যের সহিত এরূপ শ্রমশীলতা ও অধ্যবসায়ের একত্র সমাবেশ দুর্লভ।

১৩৪৮ ফাল্গুন

মহামহোপাধ্যায় ফণীভূষণ তর্কবাগীশ

মহামহোপাধ্যায় ফণীভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের মৃত্যুতে বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষ একজন প্রাচীনপন্থী মহাবিদ্বান্ হারিয়েছেন। সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন অনেক পণ্ডিতের আধুনিক কোন প্রচেষ্টার সহিত যোগ থাকে না। তর্কবাগীশ মহাশয় সে রকম কেবল অতীতে বাস করতেন না। তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনকারী ছিলেন না, কিন্তু সাংস্কৃতিক নানা আধুনিক প্রচেষ্টার সহিত তাঁর যোগ ছিল। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে অনেক সভায় তাঁকে উপস্থিত দেখতাম। তাঁর সৌজন্যপূর্ণ, নম্র, নিরহঙ্কার ব্যবহারের গুণে তিনি শ্রদ্ধেয় ও প্রিয়-দর্শন ছিলেন।

নারী-শিক্ষা : নারী-প্রসঙ্গ : নারী-জীবন

১৩১৪ জ্যৈষ্ঠ
[মাতাজী মহারাণী তপস্বিনী

মহাকালী পাঠশালার স্থাপয়িত্রী মাতাজী মহারাণী তপস্বিনীর মৃত্যু হইয়াছে। বর্ত্তমানে কলিকাতার সুকিয়াস্ স্ট্রীটে অবস্থিত মূল মহাকালী পাঠশালার ছাত্রীসংখ্যা ৫০০। তদ্ভিন্ন ১৬টি শাখা পাঠশালা আছে। এই সকল পাঠশালায় বহুদেববাদ ও মূর্ত্তিপূজারূপ হিন্দুধর্ম্মের নিম্নাঙ্গ শিক্ষা দেওয়া হয়। তদ্ভিন্ন গৃহকর্ম্ম এবং সামান্য লেখাপড়া শিখান হয়। আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রচার এতই কম যে যতই সামান্য হউক যে কেহ স্ত্রীশিক্ষার বন্দোবস্ত করেন, তিনিই দেশের মহৎ উপকারী বন্ধু। মাতাজী মহারাণী হিন্দুধর্ম্ম বলিতে যাহা বুঝিতেন, আমরা তাহা বুঝি না। স্ত্রীশিক্ষার তাঁহার যে আদর্শ ছিল, আমাদের আদর্শও তাহা হইতে কিছু ভিন্ন। এরূপ মতভেদ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু মতভেদ থাকতে কিছু আসিয়া যায় না। তিনি রাজবংশসম্ভূতা ও বিদুষী হইয়া স্বজাতি সেবায় ও উন্নতিকল্পে নিজের ধন, বিদ্যা ও শক্তি সমুদয় উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই জন্য তাঁহার আত্মোৎসর্গ পূজনীয় ও অনুকরণযোগ্য।

১৩১৮ আশ্বিন
[ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের উদ্যোগ]

ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

১। এই মহামণ্ডল স্থাপন দ্বারা ভারতবর্ষের সকল ধর্ম্ম, বর্ণ ও সম্প্রদায়ের নারীদিগকে একত্র আনয়ন করিয়া তাঁহাদিগের নৈতিক ও অবস্থাগত স্থায়ী উন্নতিসাধন করা এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য।

২। এই উদ্দেশ্য পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে (১) ভারতীয় সকল প্রদেশের স্ত্রীজাতিকে একত্র করিবার জন্য ইহার সভ্যদের মধ্যে সাময়িক মিটিং হইবে। (২) ভারতবর্ষীয় নারীদিগের চতুর্দ্দিকস্থ অবস্থা বুঝিয়া শিক্ষা দিবার নিমিত্ত অন্তঃপুর-শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করা হইবে। (৩) ভারতবর্ষীয় ভাষাসমুহের পুষ্টি ও বিস্তারের জন্য উৎসাহ দিয়া যাহাতে ভারতীয় স্ত্রীদিগের মধ্যে আধুনিক চিন্তা ও জ্ঞানের প্রসার হয় ও সদ্‌গ্রন্থ সকল স্বল্পব্যয়ে ও সহজে তাঁহাদের হস্তগত হয়, তাহার চেষ্টা করা হইবে।

৩। ভারতবর্ষীয় স্ত্রীদিগের দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যসকল বিক্রয়ের সুবিধার জন্য স্থানে স্থানে "পুরনারী নির্ব্বাহ ভাণ্ডার" নামে ডিপো খোলা হইবে। ঐরূপে নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্ত স্ত্রীদিগের দ্রব্যাদি বিক্রয়ের সুবিধা হইলে উহার দ্বারা অনেক দরিদ্র পরিবারের ভরণপোষণের উপায় হইবে।

মহামণ্ডলের কলিকাতা শাখা দ্বারা গত এপ্রিল হইতে আগস্ট পর্য্যন্ত পাঁচ মাসে নিম্নলিখিত

রূপ কাজ হইয়াছে।

গত ১লা এপ্রেল হইতে আমরা ৬ জন শিক্ষয়িত্রী লইয়া ১০টী বাড়ীতে ১৫টী বয়স্কা বালিকাকে শিক্ষা দিতে আবন্ত করি। এখন আমরা ১৩ জন শিক্ষযিত্রীব সাহায্যে ৫৫টী ঘরে ৯০টী বযস্কা বালিকাকে শিক্ষা দিতেছি। এই অল্প কালের মধ্যে ইহার এরূপ দ্রুত উন্নতি দেখিয়া আমাদের মনে আশা হইতেছে যে শিক্ষাপ্রিয় কোন ব্যক্তিই যে কোন প্রকারে ইহার সাহায্য করিতে বিমুখ হইবেন না। অনেকেই এখন অন্তঃপুরবাসিনীদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য এইরূপ কাজের আবশ্যকতা বুঝিতে পারিতেছেন। এই কয় মাসে সমিতির প্রায় ৩০০ জন মেম্বর হইয়াছেন। ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের সভ্যদের প্রবেশিকা ফি ১্ টাকা ও বার্ষিক চাঁদা ১্ টাকা মাত্র, এই সামান্য চাঁদাব উপর নির্ভর করিয়া সমিতি এই মহা কাজে উদ্যোগী হইয়াছেন। এই কাজে যত অধিক খরচ করা যাইবে, তত অধিক লোকের উপকার হইবে। এখন মাসে ৩ খানা গাড়ীর ভাড়া ও দারোয়ান ইত্যাদিতে প্রতি মাসে প্রায় ৩০০্ টাকা খরচ পড়িতেছে। আমাদের দেশের বাজা, মহারাজা ও স্ত্রী শিক্ষার হিতৈষী মহোদয়গণের সাহায্য ব্যতীত এ কাজ উত্তমরূপে চালান একরূপ অসম্ভব, সে কারণে প্রার্থনা করি সঙ্গতিপন্ন উদার ব্যক্তিরা যদি কিছু কিছু দান করিয়া এ কাজটাকে স্থায়ী করেন তাহলে দেশেব একটা মহা কল্যাণ সাধিত হইবে।

স্ত্রী শিক্ষার একান্ত আবশ্যকতা এখন আর নূতন করিয়া প্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই। মহামণ্ডল অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষার আয়োজন করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। খৃষ্টান জেনানা মিশনের শিক্ষয়িত্রীগণ অন্তঃপুরে গিয়া যে শিক্ষা দেন, তাহার প্রধান উদ্দেশ্য অন্তঃপুরিকাদিগকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করা। অখৃষ্টানদিগের ইহাতে সম্মতি থাকিতে পারে না। মহামণ্ডলের সভ্যদের মধ্যে নানাধর্ম্মাবলম্বিনী মহিলারা আছেন। কাহারও ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন করা ইহার উদ্দেশ্য নহে। সুতরাং সকলেরই ইহার কাজে সাহায্য করা উচিত। কলিকাতা শাখার সম্পাদিকা শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দাশ অতিশয় সাত্ত্বিক ভাবে হৃদয়মনের সমুদয় শক্তির সহিত কাজ করিতেছেন।

প্রত্যেক গ্রামে ও নগরে অন্তঃপুরে স্ত্রী-শিক্ষার বন্দোবস্ত হওয়া উচিত। যে সকল মহিলা অল্প লেখা পড়া জানেন, তাঁহারাও অপরকে পড়িতে ও লিখিতে শিখাইয়া দিতে পারেন। অল্প শিক্ষিতা বা অধিক শিক্ষিতা প্রত্যেক মহিলা বিদ্যাদানকে একটি ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিলে অল্প সময়ের মধ্যে নিরক্ষর স্ত্রীলোকের সংখ্যার অনেক হ্রাস হইতে পারে।

১৩২০ ফাল্গুন

[স্ত্রী-শিক্ষায় বেথুন কলেজ]

বেথুন কলেজ ও স্কুলের উন্নতিসাধনের জন্য সম্প্রতি শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টাব দশ জন বঙ্গমহিলার সহিত পবামর্শ করিয়াছিলেন, ও তাঁহাদের মত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। কিরূপ

পরামর্শ হইয়াছে, কে কি মত দিয়াছেন, শেষ সিদ্ধান্তই বা কি হইল, তাহা ঠিক জানা যায় নাই। কাগজে নানারূপ কথা বাহির হইয়াছে। তাহাই অবলম্বন করিয়া কিছু লেখা দরকার। কাবণ স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার হইতেছে, আরও হইবে এবং হওয়া আবশ্যক। এইজন্য শিক্ষযিত্রীর অভাবও দেশের সর্ব্বত্র অনুভূত হইতেছে। বেথুন কলেজ নারীদের উচ্চশিক্ষার জন্য একমাত্র গবর্ণমেণ্ট কলেজ। ইহার উন্নতি না হইলে, কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত না হইলে, আরও অধিকসংখ্যক ছাত্রীকে শিক্ষা দিবার ক্ষমতা না জন্মিলে, প্রয়োজনানুরূপ শিক্ষয়িত্রী পাওয়া যাইবে না। এইহেতু বেথুন কলেজেব উন্নতিতে কেবল কলিকাতাবাসীদেব নয়, কেবল ব্রাহ্মদের নয, কেবল দেশীয় খৃষ্টিয়ানদিগের নয়, পরন্তু দেশবাসী সকলেরই স্বার্থ আছে।

দেশীয় বালিকা ও মহিলাদেব মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য, দেশের উন্নতির জন্য, বেথুন কলেজের উন্নতির চেষ্টা। সুতরাং উপায় নির্দ্ধারণের জন্য যে দেশবাসীদের সঙ্গে পবামর্শ করা আবশ্যক, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব ডিরেক্টার সাহেব কয়েক জন মহিলার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া যে ভালই করিয়াছেন, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। যে-সকল মহিলা কস্টস্বীকার করিয়া দেশের মঙ্গালের জন্য ডিরেক্টার সাহেবের পরামর্শসভায় গিযাছিলেন, তাঁহারা সকলেই ধন্যবাদার্হ। কিন্তু দেশের মত জানার পক্ষে এইরূপ পরামর্শসভা যথেষ্ট নহে। কারণ, বেথুন কলেজে যাঁহাদের মেয়েরা পড়িয়াছে বা এখনও পড়ে, যাঁহারা নিজে বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা পাইয়াছেন, এরূপ সকল শ্রেণীর মহিলাদের মত জানা দরকার। অবশ্য যাঁহার বাড়ীর মেয়েরা বেথুন কলেজে শিক্ষা পান নাই, তাঁহাদের মত যে অবজ্ঞেয়, তাহা নয, কিন্তু তাঁহাদিগকে দেশের একমাত্র বা প্রধান প্রতিনিধি মনে করা ভুল। বেথুন কলেজের ছাত্রীদেব অভিভাবকদের মতই সর্ব্বাগ্রে জিজ্ঞাস্য। হিন্দুসমাজেব, ব্রাহ্ম সমাজের ও খৃষ্টীয় সমাজের মত নির্দ্ধারণ অবশ্যকর্ত্তব্য। তাহা না করিয়া ডিরেক্টাব একটা কিছু উপায় স্থির করিলে তাহাতে দেশবাসীব আস্থা হইবে না।

শুনা যায় কোন কোন মহিলা এবং ডিরেক্টার নিজে কোন ইংরেজ মহিলাকে প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত করিবাব পক্ষে। ইহাও শুনা যাইতেছে যে এই নিয়োগ অস্থায়ী ভাবে হইবে, ডিরেক্টার এইরূপ কথা দিয়াছেন, এবং এই প্রতিশ্রুতি পাইয়া কেহ কেহ নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। আমরা ডিরেক্টারের অকপটতায় কোন সন্দেহ প্রকাশ না করিযাও বলিতেছি তাঁহার এই অঙ্গীকারের বেশী কিছু মূল্য নাই। ডিরেক্টার মহারাণী ভিক্টোরিয়ার চেয়ে বড় নন। মহারাণী সিপাহী যুদ্ধের অবসানে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে যে ঘোষণা করেন, তাহা মুখের কথা নয়: তাহা নানা স্থানে নানা ভাবে মুদ্রিত আছে। তাঁহার পুত্র সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড ও পৌত্র সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ এই ঘোষণা-পত্রের সমর্থন করিয়াছেন। তথাপি, তাঁহাদের কর্ম্মচারী ও ভৃত্যেরা ইহাতে লিপিবদ্ধ অঙ্গীকারসমূহ পালন করিতেছেন, ইহা কেহই বলিতে পারেন না। এমন অবস্থায় মিঃ হর্ণেলের মত একজন অধস্তন কর্ম্মচারী গোপনীয় মন্ত্রণাগৃহে মুখে কি বলিলেন, তাহা প্রতিপালিত হইবে, মনে করিতে হইলে শৈশবসুলভ বিশ্বাসপ্রবণতার প্রয়োজন। আমাদের ধারণা, বেথুন কলেজের প্রিন্সিপ্যালের পদে একবার ইংরেজ মহিলার দখল জন্মিলে তাহা কায়েমী হইবারই অধিকতর সম্ভাবনা।

ইংরেজ প্রিন্সিপ্যাল অবশ্যপ্রয়োজনীয় হইলে

আমরা তাহার বিরোধী হইতাম না। কিন্তু তাহা অবশ্য প্রয়োজনীয় নহে। শিক্ষাবিভাগের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিন্ন ভিন্ন বৎসরের রিপোর্ট হইতে প্রকাশ যে বাঙ্গালী মহিলা প্রিন্সিপ্যালের অধীনে কলেজে পরীক্ষার ফল ভাল হইয়াছে, ছাত্রীসংখ্যা বাড়িতেছে, ছাত্রীদের মধ্যে কোন অবাধ্যতা বা উচ্ছৃঙ্খলতা লক্ষিত হয় নাই। শুনা যায়, একজন শিক্ষয়িত্রী এবং অপর এক কর্ম্মচারিণী নিয়মানুগত্য দেখান নাই; কিন্তু শিক্ষাবিভাগ তাঁহাদিগকে প্রশ্রয় না দিয়া শ্রীযুক্তা কুমুদিনী দাসের ন্যায্য কর্ত্তৃত্বকে বলবৎ রাখিলে এই দোষ লক্ষিত হইত না, আমরা এইরূপ অবগত হইয়াছি। গবর্ণমেণ্ট অনুসন্ধান করিলেই সত্য নির্ণয় করিতে পারিবেন। আরও শুনা যায়, হিসাবে সামান্য গোলমাল হইয়াছিল। কিন্তু প্রেসিডেন্সী কলেজ এবং অন্যান্য কোন কোন বড় কলেজে বহুসংখ্যক কেরাণী, ও হিসাবরক্ষক থাকা সত্ত্বেও হাজার হাজার টাকা চুরি গিয়াছে। তাহাতে ত কোন ইংরেজ প্রিন্সিপ্যাল অপসারিত হন নাই, বা তাঁহাদের জায়গায় ফরাসী প্রিন্সিপ্যাল রাখার কথা উঠে নাই। আর বেথুন কলেজে ১৯০২ হইতে প্রায় ৬ বৎসর একজনও কেরাণী বা হিসাবরক্ষক ছিল না, একজন বাজার-সরকারের সাহায্যে প্রিন্সিপ্যালকেই হিসাব রাখিতে হইত। তাহার পর ১৯০৮ আগষ্ট হইতে ১৯১২র ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত একজন মাত্র ৩০ টাকার কেরাণী ছিল, হিসাবরক্ষক ছিল না। ১৯১২ ফেব্রুয়ারী হইতে ৯ মাস এই কেরাণীটিও ছিল না, ছাত্রীনিবাসের হিসাবে-অনভিজ্ঞ একজন কেরাণীর দ্বারা হিসাব রাখা হইত। এরূপ অবস্থায় শ্রীযুক্তা কুমুদিনী দাস মহাশয়াকে হিসাব সামান্য গোলমালের জন্য কোন মতেই দোষ দেওয়া যায় না।

বাঙ্গালীর ছেলে বা বাঙ্গালীর মেয়ে ঠিক্ ইংরেজদের মত বাঁকা উচ্চারণ করিয়া ইংরেজী বলিবে, বা তাহাদের গায়ে ফিকে গোলাপী রং মাখাইয়া দিলে তাহাদিগের চালচলন ও কথাবার্ত্তায় তাহাদিগকে ইংরেজ বলিয়া ভ্রম হইবে, আমাদের দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার ইহাকেই চূড়ান্ত আদর্শ আহাম্মকেরাই মনে করিতে পারে। হাজার হাজার ছেলে ও বহুসংখ্যক মেয়ে দেশী লোকের কাছে শিক্ষা পাইয়া নানা বিষয়ে গভীর জ্ঞান লাভ করিয়াছে। তাহার মধ্যে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞানও বাদ পড়ে নাই। জ্ঞান লাভের জন্য ইংরেজ শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী একান্ত প্রয়োজনীয় নহে। বাকী থাকে, চরিত্রগঠন, সামাজিক ও পারিবারিক আদর্শ, সভ্যতা।

এবিষয়ে আমরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চরিত্র, সমাজ, পরিবার বা সভ্যতার কোন তুলনা করিতে অনিচ্ছুক। প্রত্যেক সভ্য জাতির চরিত্রে, পরিবারে, সমাজে, সভ্যতায় গুণের ভাগ আছে। কিন্তু উন্নতির জন্য কাহারও নিজ আশ্রয়-বা প্রতিষ্ঠা-ভূমি ছাড়িয়া অন্য আদর্শ ধরিতে যাওয়া ভুল, ধরিতে যাওয়া সর্ব্বনাশের হেতু। নিজের যাহা ভাল, তাহা ছাড়িও না; তাহাতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া অন্যের গুণের দ্বারা অনুপ্রাণিত হও, তাহাকে নিজ অস্থিমজ্জাগত কর; তবেই উন্নতি, তবেই মঙ্গল হইবে।

পাশ্চাত্য সমাজের নিন্দা করিবার জন্য নয়, কেবল আমাদের মতটি বুঝাইবার জন্য দুএকটি দৃষ্টান্ত দিব। বঙ্গদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রথম অবস্থায় যুবকদের মধ্যে যে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা গিয়াছিল, তাহা পাশ্চাত্য সমাজের কতকগুলি দোষের অনুকরণ করিতে গিয়া ঘটিয়াছিল। পাশ্চাত্য পুরুষদের মত নারীদের মধ্যেও কোন কোন ব্যসন ও কুঅভ্যাস আছে। যেমন—মাতাল হওয়াটা নিন্দনীয় হইলেও, কি নারী কি পুরুষ,

উভয়ের মধ্যেই ভদ্র সমাজেও মদ্যপানটার চলন আছে। মেম সাহেবরা পর্য্যন্ত ধূমপান করাটা হাল-ফ্যাসান মনে করেন। বাঙ্গালী-সমাজে খুব নিম্ন শ্রেণীর কোন কোন স্ত্রীলোক মদ খায়, হুকা টানে ও বিড়ি খায় বটে, কিন্তু ভদ্র সমাজের স্ত্রীলোকদের যে এরূপ করা অনুচিত, এ কথাটা পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে বলা অনাবশ্যক, বলিতে গেলে তাঁহারা জীব কাটিয়া কানে আঙুল দিবেন এবং রাগ করিবেন। এইখানেই দেখুন পারিবারিক ও সামাজিক আদর্শের কত প্রভেদ। অনেক মেম জুয়া খেলে, কিন্তু বাঙ্গালী ভদ্রমহিলাদের এই ব্যসন নাই।

এগুলা গেল দোষের কথা। নির্দ্দোষ ব্যাপারেও প্রভেদ দেখাইতেছি।

বাঙ্গালীর মেয়েকে অধিকাংশ স্থলে শ্বশুর শাশুড়ী ভাসুর দেবর ননদ জা ও তাঁহাদের সন্তানাদি লইয়া ঘর করিতে হয়। ইংরেজ-সমাজে তাহা হয় না। দাম্পত্য প্রেম ও পূর্ব্বরাগের কোন কোন লক্ষণ পাশ্চাত্য সমাজে বিনা নিন্দায় সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ পাইতে পারে; আমাদের দেশে তাহা হয় না। আমাদের দেশে নাবীর পক্ষে আত্মস্থ হইয়া মনের ভাব মনের মধ্যে রাখাই শিষ্টাচারের আদর্শ। ইংরেজীতে বলিতে গেলে reserve ও dignity আমাদের নারীদের চরিত্রের ভূষণ। গুরুজনের প্রতি ভক্তি বিষয়ে আমাদের দেশে যে আদর্শ আছে, তাহা অক্ষুণ্ণ থাকা বাঞ্ছনীয়।

আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন পাশ্চাত্য জীবন অপেক্ষা কম জটিল ও অধিক সাদাসিদে। টাকা উড়াইবার পন্থা আমাদের দেশে আমাদের মেয়েদেরও পক্ষে দূরবলম্বনীয় নহে; কিন্তু আমাদের প্রাচ্য ছাঁচের ভদ্র পরিবারের জীবন যাপন প্রয়োজন হইলে ভদ্রতা রক্ষা করিয়া যেরূপ অনাড়ম্বর ভাবে চলিতে পারে, পাশ্চাত্য প্রণালীতে ততটা সাদাসিদে ভাবে হয় না।

আমাদের মহিলাদের যে ভক্তি, নিষ্ঠা, তপশ্চর্য্যার শক্তি, যে শুচিতা, পরিবারের মধ্যে প্রকাশ পায়, তাহা জীবসেবায়, সমাজসেবায়, জনহিতকর কার্য্যে প্রযুক্ত হইলে, তাহাই পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত সংস্পর্শের শ্রেষ্ঠ ফুল বলিয়া আমরা মনে করিব। কিন্তু ইহার জন্যও ত ইংরেজ মেম প্রিন্সিপ্যালের প্রয়োজন নাই।

কেহ কেহ বলিতেছেন যে হয়ত কোন পার্সি মহিলা প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত হইবেন। ইহাতেও আপত্তি আছে। বাঙ্গালীদের মধ্যেই পার্সিদের সমান উচ্চশিক্ষিতা মহিলা আছেন; ছাত্রীরা বাঙ্গালী; তাহাদের প্রধান শিক্ষয়িত্রীর ও তাহাদের মাতৃভাষা ও চালচলন এক রকমের হওয়াই বাঞ্ছনীয়। পার্সিরা বড় বেশী পরিমাণে ইংরেজভাবাপন্ন হইয়াছে। ইহা আমাদের মেয়েদের অনুকরণযোগ্য ত নহেই, বরং সর্ব্বপ্রযত্নে পরিহার্য্য। শেষ কথা এই, ঘরপোড়া গরু যেমন সিন্দুরে মেঘ দেখিলেই ভয় পায়, আমরাও তেমনি ঢাকার ইডেন স্কুলের পার্সি শিক্ষয়িত্রীদের কথা কাগজে পড়িয়া, পার্সি নামেই ভয় পাইতেছি। আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, এখানে যেন ইডেন স্কুলের ব্যাপারগুলির পুনরাবৃত্তি না হয়।

পারিবারিক ও সামাজিক আদর্শ, সভ্যতার আদর্শ, পুরুষ অপেক্ষা নারীদের দ্বারাই বেশী রক্ষিত হইতে পারে ও হইতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন, পুরুষদের মধ্যে বিলাতী পোষাক পূরামাত্রায় চলিতেছে, কিন্তু মেয়েদের মধ্যে তেমন চলিল না। আমাদের বিলাতী পোষাকের উপর কোন রাগ বা বিদ্বেষ নাই। কিন্তু, বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ আছে বলিয়া, প্রাচ্য ভাবটা রাখার পক্ষে প্রাচ্য পরিচ্ছদ সাহায্য করে, এবং বিদেশী পরিচ্ছদ না পরিলে দেশের লোক

আমাদিগকে আপনার জন মনে করিয়া একটু বেশী গা-ঘেঁসা ও আত্মীয় হয়, আমাদিগকে উচ্চতর বা স্বতন্ত্র জীব, বা পর মনে করে না, জাতীয়তার পক্ষে ইহা একান্ত আবশ্যক বলিয়াই বাহিরের খোসাটার উপর ঝোঁক দিয়া থাকি। আমাদের দেশের সাধারণ ও ভদ্রলোকদের দেশী পোষাকও যদি এক ধরণের হইত, তাহা হইলে খুব ভাল হইত।

আদর্শের পালিকা ও রক্ষয়িত্রী নারী। নারীতে ফিরিঙ্গিয়ানার ঘুণ যাহাতে না ধরে সে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রথম যুগে ইংরেজ শিক্ষকদের সামাজিক দোষগুলির প্রভাবে এবং ভিন্ন ছাঁচে গড়া সভ্যতার আদর্শে আমাদের ক্ষতি হইয়াছিল। আমাদের মেয়েদের শিক্ষার জন্য মেমের একান্ত আবশ্যক থাকিলে, আমরা অনিষ্টের আশঙ্কা সত্ত্বেও তাহাতে মত দিতাম। কিন্তু যখন সেরূপ প্রয়োজন নাই, তখন আশঙ্কার মধ্যে যাই কেন? বেথুন কলেজ ও স্কুলের ছাত্রীনিবাস আছে; অর্থাৎ একটা গৃহস্থালী আছে। তাহা শৃঙ্খলা ও পারিপাট্যের সহিত চলা নিশ্চয়ই উচিত কিন্তু বাঙ্গালী ধাঁচেই তাহা হইতে পারে, এবং হওয়া চাই। ভবিষ্যতের গৃহলক্ষ্মীদের অবাঙ্গালী হওয়া উচিত নয়। বাঙ্গালীর কর্ত্তৃত্বাধীনেই বাঙ্গালীত্ব রক্ষার অধিকতর সম্ভাবনা।

বেথুন কলেজ ও স্কুল কোথায় থাকা উচিত এবং একত্র থাকা উচিত কিনা, তাহার আলোচনা সংক্ষেপে করিব। এক কথায় বলিতে গেলে সাধারণতঃ যাঁহাদের মেয়েরা বেথুনে পড়ে তাঁহাদের সুবিধার দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া স্থান নির্দ্দেশ করা উচিত। ছেলেদের স্কুল কলেজ এক যায়গায় রাখিলে, ছোট ছেলে ও বড় ছেলে এক ছাত্রাবাসে রাখিলে, কোন কোন অসুবিধা এবং কুফলের আশঙ্কা আছে। মেয়েদের বেলায় সে-সব আশঙ্কা কম। অধিকন্তু ছাত্রীনিবাসের ছোট ছোট মেয়ের ভার বড় মেয়েদের উপর থাকিলে ছোটগুলির অধিকতর যত্ন হয়, বড়গুলির স্বাভাবিক স্নেহশীলতা রক্ষিত হয়, এবং বাড়ীতে থাকিয়া ছোট ভাইবোনদের জন্য ঝঞ্ঝাট সহ্য করার অভ্যাসটা লোপ পায় না। মেয়েদিগকে ছাত্রীনিবাসে রাখিয়া পারিবারিক জীবনের অযোগ্য করিয়া ছাড়িয়া দেওয়াটা ত উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং এই বিষয়টি একটু ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

শুনা যায় যে মেম প্রিন্সিপ্যালকে পরামর্শ দিবার জন্য ৬জন বঙ্গমহিলাকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইবে। কলেজের জন্য অধ্যক্ষসমিতি (governing body), স্কুলের জন্য পরিচালক সমিতি (managing committee) এবং তাছাড়া কয়েকজন পরিদর্শক (visitors) আছেন। তাহাই কি যথেষ্ট নয়? আবার পরামর্শ-সমিতির প্রয়োজন কি? ইহা গঠিত হইলেও ইহার পরামর্শ বাস্তবিক লওয়া হইবে কিনা এবং লইলেও তাহার অনুসারে কোন কাজ হইবে কিনা, বলা যায় না। কেননা, শ্রীযুক্তা কুমুদিনী দাস মহাশয়কে প্রিন্সিপ্যাল পদ হইতে কুমিল্লার সহকারী ইন্‌স্পেক্‌ট্রেসের পদে স্থানান্তরিত করিবার মত গুরুতর কাজ ডিরেক্টার হঠাৎ করিয়াছেন। অধ্যক্ষ-সমিতিকে একবার জিজ্ঞাসামাত্রও করেন নাই। সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মত শিক্ষিত, বুদ্ধিমান্, শক্তিশালী ও জেদী লোক এই সমিতির সভ্য। তাঁহাদেরই যদি এই দশা, তখন কয়েকটি নিরীহ মহিলাকে লইয়া গঠিত পরামর্শসমিতির কথা কেহ শুনিবে বলিয়া ত বিশ্বাস হয় না। আর ডিরেক্টার যে কিরূপ মহিলাদিগকে পরামর্শ দিবার জন্য নির্ব্বাচন করিবেন, তাহাও ত বলা যায় না। দুঃখের বিষয়, নানা প্রকারে মান্যগণ্য কোন কোন বাঙ্গালী-পরিবারে ছেলে-মেয়েরা হয় ইংরেজী

বলে, নয় হিন্দী বলে, বাঙ্গালা বলে না। আমরা পাড়াগেঁয়ে মানুষ; তাঁরা ইংরেজীটা কেমন বলেন. সে বিষয়ে মত প্রকাশ করিতে ভয় পাই; কিন্তু হিন্দী উর্দ্দুটা তাঁদের চেয়ে আমরা অনেক ভালই শুনিয়াছি। সুতরাং বলিতে পারি যে তাঁদের হিন্দী শুনিলে খাস্ হিন্দুস্থানের লোকেরা তারিফ করিবে না। যাঁহারা ভাষা সম্বন্ধে নিজ নিজ পরিবারে এবম্বিধ ব্যবস্থা করেন, তাঁহাদিগকে বাঙ্গালী বালিকা-শিক্ষালয়ের পরামর্শদাত্রী মনোনীত করা সর্ব্বাংশে শ্রেয় কিনা, ভাবিবার বিষয়।

গবর্ণমেণ্টের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মত অনুসারেই তাঁহার যোগ্যতার বিচার করিয়া বলিতে পারা যায়, যে, শ্রীযুক্তা কুমুদিনী দাস মহাশয়ার উপর অবিচার করা হইয়াছে। কলেজের উন্নতি কি করিলে হয় তাহা যে তিনি বুঝেন না, তাহা ত নয়। তিনি ১৯১২ সালে ১৯০৭ হইতে ১৯১২ পর্য্যন্ত কয়েক বৎসরের যে রিপোর্ট লিখিয়াছিলেন. এবং যাহা গবর্ণমেণ্টের ছাপাখানায় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ছাপা হইয়াছিল, তাহাতে তিনি কলেজকে অর্থনীতি ও রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞানে এবং উদ্ভিদবিদ্যায় বি, এ, পরীক্ষা পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত করিতে অনুরোধ করেন; একজন গণিতের অধ্যাপক চান; ইন্টারমীডিয়েট পর্য্যন্ত ভূগোল পড়াইবার ব্যবস্থা করিতে বলেন; ছাত্রীদের জন্য লাইব্রেরীতে পড়িবার যায়গা করিয়া দিয়া অধ্যাপকদের জন্য স্বতন্ত্র বিশ্রামাগার করার প্রস্তাব করেন; একজন লাইব্রেরিয়ান নিযুক্ত করিতে বলেন; কেরাণীদের সংখ্যা বাড়াইতে বলেন; মেয়েদের ব্যায়াম ও ক্রীড়ার জন্য আরো যায়গার আবশ্যকতা প্রদর্শন করেন; কলেজে স্থানাভাবের কথা বলেন; ছাত্রীনিবাসের আয়তন বাড়াইতে বলেন; এবং অধ্যাপিকাবা ছাত্রীদের সঙ্গে বাস করিবার সুযোগ পাইলে কলেজটি যে ক্রমে সাশ্রম শিক্ষাগারে (residential institutionএ) পরিণত হইতে পারিবে. এইরূপ মত প্রকাশ করেন। কলেজটির উন্নতি করিতে হইলে যাহা যাহা করা দরকার তাহা তাঁহার সময়ে না করিয়া তাঁহাকে এবং প্রকারান্তরে সমুদয় বাঙ্গালী মহিলাকে অযোগ্য বলা, এবং মেম প্রিন্সিপ্যাল আনিয়া ও উন্নতির সমুদয় আয়োজন কবিয়া দিয়া ইংরেজ মহিলার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করা, কখনও সন্তোষজনক বলা যাইতে পারে না। তাঁহাকে তাঁহার পদে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া, সমুদয় উন্নতির ব্যবস্থা কবিবার মত অর্থ দিয়া, তাঁহার ন্যায়সঙ্গত প্রত্যেক আদেশের পশ্চাতে শিক্ষাবিভাগ আছেন, ইহা বুঝিতে দিয়া, তাঁহাকে শিক্ষালয়টির উন্নতি করিবার অধিকতর সুযোগ যদি দেওয়া হইত, তবেই সর্ব্বসাধারণ সন্তুষ্ট হইত।

আমাদের শেষ কথা এই :—যাহারা সম্পূর্ণ অসভ্য ও বর্ব্বর তাহাদিগকে গড়িয়া পিটিয়া মানুষ করিবার জন্য ভিন্নদেশীয় ও সভ্য মানুষের শিক্ষকত্ব ও নেতৃত্ব যতটা দরকার, আমাদের জন্য সেরূপ প্রয়োজন নাই। আমরা নিজেই আমাদের ছেলেমেয়েদিগকে মানুষ করিব, বাহিরের সাহায্য যতটুকু দরকাব, তাহা আমরাই প্রয়োজন-মত সংগ্রহ করিয়া লইব। আমাদের মঙ্গালের দিকে আমাদেরই ঝোঁক সর্ব্বাপেক্ষা বেশী; তাহা লাভের জন্য ছেলেমেয়েদিগকে গড়িবার যে গুরুতর দায়িত্ব তাহা অপরকে দিতে পারি না, সে উচ্চ অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে চাই না। যার দরদ বেশী সেই ত ঠিক্-মত গড়িতে পারে।

১৩২৪ আষাঢ়

শ্রীমতী গৌরী আম্মা

ত্রিবাঙ্কুড় ও মালাবারের একটি তথাকথিত "অস্পৃশ্য" জাতির নাম এজাভা। ত্রিবাঙ্কুড়ে শ্রীমতী গৌরী আম্মা নাম্মী এজাভা-জাতীয়া একটি মহিলা বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তদুপলক্ষে ঐ রাজ্যের শ্রীনারায়ণ-ধর্ম্ম-পর পালিন-যোগম্ নামক স্বধর্মনিষ্ঠ হিন্দুসমিতি সভা আহ্বান করিয়া শ্রীমতী গৌরীকে অভিনন্দন করেন, এবং ত্রিবাঙ্কুড়ের এজাভা নারীরা তাঁহাকে একটি স্বর্ণপদক উপহার দেন। শ্রীমতী গৌরী এম্-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। বাংলা দেশে কোন মুচি হাড়ি বা বাউরী জাতীয়া নারী বি-এ পাস্ করিলে ধর্ম্মমহামণ্ডলের তাঁহাকে অভিনন্দন করা আবশ্যক হইবে।

১৩২৭ আশ্বিন

মহিলা-বিদ্যাপীঠ

মহারাষ্ট্রের রাজধানী পুণা শহরে অধ্যাপক ঢোণ্ডো কেশব কার্বে যে মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় বা বিদ্যাপীঠ স্থাপন করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত বিঠলদাস দামোদব টাকর্‌সী মহাশয়ের দানশীলতায় তাহার কার্য্যকারিতা যে-রূপে বৃদ্ধি পাইবে, প্রবাসীতে পূর্ব্বে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। এই মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট হইয়া এ পর্য্যন্ত চারিটি মহিলা উপাধি পাইয়াছেন। তাঁহাদের ছবি এখানে দিতেছি। তাঁহাদের নাম শ্রীমতী কমলা বাঈ দেশপান্ডে, শ্রীমতী কব্রু বাঈ শেবড়ে, সৌভাগ্যবতী রেবতী বাঈ কর্বে, কুমারী গঙ্গু বাঈ ওক।

১৩২৮ অগ্রহায়ণ

কুমারী স্বর্ণলতা দাস

কুমারী স্বর্ণলতা দাস বি এ ব্রাহ্ম বালিকা য়ের লেডি প্রিন্সিপাল ছিলেন। গত সোমবার শারদীয় অবকাশের পর স্কুলের কার্য্য আরম্ভ হয়। তিনি সুস্থদেহে হৃষ্টমনে স্কুলে আগমন করেন। *** স্কুল হইতে বাটীতে ফিরিয়া গেলেন। মুড়ি খাইতে ভাল বাসিতেন। মুড়ি দিয়া জলযোগ

করিলেন।

সুশিক্ষিতা নারী, বি এ পাশ করিয়াছেন, বিদ্যা উপার্জ্জনের জন্য ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। হাইস্কুলের লেডি প্রিন্সিপাল স্বহস্তে রন্ধন করিতেন। সারাদিন স্কুলের কার্য্যের পর রন্ধন করিতে আরম্ভ করিলেন, নানাপ্রকার দ্রব্য রান্ধিলেন। কয়েকটি দ্রব্য স্কুলের শিক্ষয়িত্রীদিগকে পরদিন খাওয়াইবেন, বলিয়া আলাদা করিয়া রাখিয়া দিলেন।

প্রথমে পিতা ও ছোট একটি ভাইকে খাওয়াইলেন। তারপর চৌতালার উপর রন্ধনশালায় আর-একটি ভাই,ছোট একটি বোন ও নিজের জন্য ভাত ব্যঞ্জন থাল-বাটিতে পরিবেশন করিতে লাগিলেন। এমন সময় হঠাৎ তাঁহার হাত কাঁপিতে লাগিল। মা নিকটে ছিলেন। তিনি মনে করিলেন, কন্যার বুঝি মাথা ঘুরিতেছে। নিকটে আরামকেদারা ছিল। তাহাতে শয়ন করিতে বলিলেন। তখন রাত্রি ৯টা। তিনি শয়ন করিবামাত্র অচেতন হইলেন। সকলেই বুঝিলেন, সন্ন্যাসরোগ হইয়াছে। অমনই ডাক্তার ডাকা হইল। চিকিৎসার আয়োজন করিতে করিতেই রাত্রি ১১টার পূর্ব্বেই স্বর্ণলতা দেহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

স্বর্ণলতা সাধারণ নারী ছিলেন না। ১৮৮৩ সালে আসামের অন্তর্গত তেজপুর নগরে ইহাঁর জন্ম হয়। ইহাঁর পিতা রায় সাহেব রাজমোহন দাস মহাশয়ের বাড়ী ঢাকা জেলার অন্তর্গত বারদী গ্রামে। পুলিশের কর্ম্মোপলক্ষে তিনি তেজপুর থাকিতেন। রাজমোহন বাবু তেজপুর হইতে ধুবড়ি বদলী হন। স্বর্ণলতা এখানকার বালিকা- বিদ্যালয়ে প্রথমে বিদ্যারম্ভ করেন। শিক্ষক ছিলেন ধর্ম্মপ্রাণ অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায়। শিক্ষকের চরিত্র ছাত্রীর প্রাণে মহা ভাব জাগাইয়াছিল। স্বর্ণলতা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিয়া বৃত্তি পাইল। রাজমোহন বাবু ছিলেন হিন্দু, কিন্তু কন্যার আগ্রহে তাঁহাকে কলিকাতার ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। কন্যা ক্রমে ব্রহ্মোপাসিকা হইলেন। কন্যার চরিত্র দেখিয়া পিতাও কন্যার অনুগামী হইলেন। ধন্য সেই কন্যা যে পিতাকে অনন্ত জীবনের পথ দেখাইতে পারে।

স্বর্ণলতা ক্রমে বি এ পাশ করিলেন। যে ব্রাহ্মবালিকা- শিক্ষালয় তাঁহার জীবনে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দিয়াছে সেই বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিয়া তাহার ঋণ কিঞ্চিৎ শোধ দিবেন, ইহাই ছিল তাঁহার আকাঙ্ক্ষা। তাই ৫০ টাকা বেতনে কর্ম্ম আরম্ভ করিলেন। অন্যান্য স্কুল তাঁহাকে ১২৫ টাকা বেতনে নিযুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তিনি ব্রাহ্মবালিকা-শিক্ষালয় ছাড়িলেন না। ক্রমে তিনি ঐ বিদ্যালয়ের লেডি প্রিন্সিপালের পদ পাইলেন।

আরও বিদ্যোপার্জ্জনের জন্য তিনি লেডি বসুর সাহায্যে ১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইংলণ্ডে গমন করেন। ইংলণ্ড স্কটলণ্ড ও ফ্রান্সের নানা শ্রেণীর বিদ্যালয় দর্শন করিয়া তিনি অধ্যাপনার নূতন প্রণালী শিক্ষা করেন। তথায় অবস্থান কালে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন। কিন্তু বিদেশে তাঁহার মৃত্যু হইল না। গত ফেব্রুয়ারী মাসে দেশে ফিরিয়া পুনরায় ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের কার্য্যেই ব্রতী হইলেন। কত আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলেন তাহা পূর্ণ না হইতেই অকস্মাৎ চলিয়া গেলেন।

আমরা অবগত হইয়াছি, স্বর্ণলতা যখন ইংলণ্ডে ছিলেন, তখন তাঁহার পরিচিত লোকেরা তাঁহার চরিত্রের প্রভাব অনুভব করিয়া তাঁহার সদ্‌গুণের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন।

১৩২৯ আষাঢ়

গিরিডি বালিকা-বিদ্যালয়

গিরিডি বালিকা-বিদ্যালয় সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য কথা "মহিলা মজ্‌লিস্‌" বিভাগে মুদ্রিত হইয়াছে। গিরিডি স্বাস্থ্যকর স্থান। এখানে অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়ে বালিকারা প্রবেশিকা পর্য্যন্ত শিক্ষা পাইতে পারে। বাংলাদেশে নারীশিক্ষার এই একটি অন্তরায় আছে, যে, বালিকাদেব বয়স একটু বাড়িলেই তাহাবা আর স্বচ্ছন্দে খোলা জায়গায় চলাফিরা করিতে পারে না; তাহাতে তাহাদের মস্তিষ্ক-চালনার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনমত অঙ্গচালনা না হওয়ায় দৈহিক ক্ষতি হয়। গিরিডিতে এই ব্যাঘাত নাই। তথায় বালিকা ও মহিলারা স্বচ্ছন্দে সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতে পারেন ও করিয়া থাকেন, ইহা তথাকার রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

নারীশিক্ষা-সমিতি

বাংলাদেশে বালিকা ও মহিলাদের শিক্ষার নিমিত্ত ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে নারীশিক্ষাসমিতি স্থাপিত হয়। বালিকাদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন, এই-সব বিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করা, মাতাদিগকে শিশুপালন ও শিশুশিক্ষা শিখাইবার ব্যবস্থা করা, গৃহশিল্প শিখাইবার বন্দোবস্ত করা, এবং অসহায়া বিধবা ও অন্য নিঃস্ব স্ত্রীলোকদিগকে উপার্জ্জনক্ষম করিবার মত শিক্ষা দিবার জন্য আশ্রম ও শিক্ষালয় স্থাপন, এই সমিতির উদ্দেশ্য। এপর্য্যন্ত সমিতি দশটি নূতন স্কুল স্থাপন এবং একটি পুরাতন স্কুলকে দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে চারিটি কলিকাতায়, এবং বাকীগুলি চব্বিশ-পর্‌গণা ও হুগ্‌লী জেলায় স্থিত। সাড়ে ছয় শতের উপর ছাত্রী এই-সব স্কুলে শিক্ষা পাইতেছে। সমিতি কলিকাতার ব্রাহ্ম-বালিকা-শিক্ষালয়ে প্রসূতি ও শিশুর কল্যাণ-সাধন বিষয়ে যোগ্য ব্যক্তিদের দ্বারা সচিত্র বক্তৃতা দেওয়াইবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ইতিমধ্যে শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু, বামনদাস মুখোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, নিবারণচন্দ্র মিত্র, ও তেজেন্দ্রনাথ রায় ডাক্তার মহাশয়েরা বারটি বক্তৃতা দিয়াছেন। এই প্রকার শিক্ষা দিবার নিমিত্ত আহিরীটোলা ও ভবানীপুরে আরো দুটি কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। ব্রাহ্ম-বালিকা-শিক্ষালয়ে দুঃস্থ মহিলাদিগকে উপার্জ্জনক্ষম করিবার নিমিত্ত কোন কোন শিল্প শিখাইবার উপযোগী শ্রেণী খোলা হইয়াছে। সেখানে আপাততঃ চরকায় সূতা কাটা, হাতের তাঁতে কাপড় বোনা, সেলাইয়ের কাজ, এবং মোরব্বা জেলী ও চাট্‌নী তৈয়ার করিতে শিখান হয়। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী চব্বিশ-পরগ্‌ণা, হুগ্‌লী, হাব্‌ড়া ও নদিয়া জেলায় সমিতি অনেকগুলি স্কুল স্থাপন করিতে ইচ্ছা কবেন। যে-যে গ্রামে স্কুল স্থাপিত হইবে, তথাকাব স্কুল তত্রত্য বালিকা ও

মহিলাদের সর্ব্ববিধ কল্যাণ-সাধন-চেষ্টার কেন্দ্র হয়, সমিতির এইরূপ ইচ্ছা। গ্রামের লোকেরাই স্থানীয় স্কুল-কমিটির অধিকাংশ সভ্য মনোনীত হন।

সমিতির দুঃস্থা নারীদেব, বিশেষতঃ বিধবাদের, সাধারণ শিক্ষা ও অর্থকর শিল্প আদি শিক্ষার জন্য একটি আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগব মহাশয়ের নাম অনুসারে ইহার নাম বাখা হইয়াছে—

বিদ্যাসাগর বাণী-ভবন।

এই বাণী-ভবনের কিছু বিবরণ গত মাসের প্রবাসীতে দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে ইহাও লেখা হইয়াছে, যে, শ্রীমতী হরিমতি দত্ত ইহার জন্য দশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এই দানশীলা মহিলা কলিকাতা ইটালী বেনিয়াপুকুর নিবাসী ৺পবাণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের পত্নী। তিনি কাশীব রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে তাঁহার স্বামীর নামে একটি অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, এবং দুটি রোগীর শয্যার ব্যয় নির্ব্বাহ করেন। তদ্ভিন্ন এল্‌বার্ট ভিক্টর হাঁস্‌পাতালে (বেলগাছিয়ার কার্‌মাইকেল মেডিক্যাল কলেজ হাঁস্‌পাতালে) দশ হাজার টাকা দিয়াছেন।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের পত্নী শ্রীযুক্তা অবলা বসু মহাশয়া নারীশিক্ষা-সমিতির ও বিদ্যাসাগর বাণীভবনের সম্পাদিকা। সমিতির ও বাণীভবনের কার্য্যের জন্য বিস্তর টাকার প্রয়োজন। বাণীভবনের জন্য জমী বা বাড়ী ক্রয় করিতে হইবে, এবং কেবল জমী কিনিলে সমুদয় ঘর বাড়ী, ও জমীসহিত বাড়ী কিনিলে বাড়ীও কিছু নির্ম্মাণ করিতে হইবে। টাকাকড়ি সম্পাদিকার নামে ১০৫ নং আপার সার্কুলার রোড্ কলিকাতা, ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দান সাদরে কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে।

১৩৩৬ পৌষ

নারীশিক্ষা সমিতি

গত ১৯শে অগ্রহায়ণ রামমোহন রায় লাইব্রেরী হলে নারীশিক্ষা সমিতির দশম বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। ময়ূরভঞ্জের মহারাণী শ্রীমতী সুরুচি দেবী সভানেত্রীর পদ গ্রহণ করেন। শ্রীমতী হেমলতা দেবী স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং নারীদের উচ্চ অধিকার সম্বন্ধে অনেক সুন্দর কথা বলেন। সমিতি কর্ত্তৃক পরিচালিত বিদ্যাসাগর বাণীভবনের কোন কোন শিক্ষয়িত্রীও বক্তৃতা পাঠ করেন। একজন শিক্ষয়িত্রী ম্যাজিক লণ্ঠনের যে-সব ছবির সাহায্যে বাণীভবনের ও শিল্পবিদ্যালয়ের কাজ বুঝাইয়া দেন, তাহা বেশ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। শেষে সভানেত্রী মহাশয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ নম্রতাসহকারে সারবান্ মন্তব্য প্রকাশ করেন।

নারীশিক্ষা সমিতির কর্ম্মিষ্ঠা পরিচালিকা শ্রীযুক্তা অবলা বসু মহোদয়া যে বার্ষিক বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়, যে, ইহা কলিকাতায় ও মফঃস্বলে ৪০টি

বালিকা-বিদ্যালয়, একটি হিন্দু বিধবাদিগের আশ্রম এবং কুটিরশিল্প শিক্ষা-দিবার জন্য একটি শিল্পবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছে। শেষোক্ত দুইটি প্রতিষ্ঠান আমরা কিছু দিন পূর্ব্বে দেখিতে গিয়া উভয়ের সুব্যবস্থা লক্ষ্য করিয়াছিলাম। শিল্পবিদ্যালয়ে প্রস্তুত পণ্যদ্রব্যগুলির বেশ কাট্‌তি আছে। বিদ্যালয়ের কাজ ও পণ্যদ্রব্য সরবরাহের কাজ একত্র ভাল চলিতে পারে না বলিয়া সমিতির কর্ত্তৃপক্ষ পণ্যদ্রব্য সরবরাহের জন্য একটি স্বতন্ত্র কোঅপারেটিভ সমিতি স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন।

১৩২৯ অগ্রহায়ণ
মহিলা-মজ্‌লিস্‌
নারী-প্রগতি

আমেরিকার রাজনীতিক্ষেত্রে কাজ কবিতে নারীরা অধিকার পাইয়াছেন। মিস্‌ লুসিল্‌ এ্যাচার্‌সন্‌ এ বিষয়ে অগ্রণী হইয়াছেন। প্রেসিডেন্ট হার্ডিং ইঁহাকে রাজদৌত্য-কার্য্যে মনোনীত করিবার জন্য সেনেটে প্রস্তাব করিয়াছেন।

চীন দেশে বিবাহিতা মেয়েরা আপনাদের পিতৃদত্ত নাম বজায় রাখিতে পারেন। সেখানে স্ত্রীশিক্ষার খুব দ্রুত উন্নতি হইতেছে। মেয়েরা ডাক্তার, শুশ্রূষাকারিণী, শিক্ষক প্রভৃতির ও ব্যবসাক্ষেত্রে অনেক রকমের কাজ গ্রহণ করিতেছেন।

আফ্‌গানিস্তানে কাবুলে মেয়েদের জন্য একটি স্বতন্ত্র চিকিৎসা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সম্প্রতি ইহাতে পাঁচশত ছাত্রী চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন। এখানে পশ্‌তু, পার্শী, উর্দ্দু এবং বুশ ভাষাও শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

কন্‌স্‌টান্টিনোপল্‌এ নারীসমাজে যথেষ্ট পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। তাঁহারা ঘোম্‌টার সঙ্কোচ কাটাইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা মাথা অনাবৃত রাখিয়া কেবল গলাটি ঢাকা দিতেছেন। আগে নিয়ম ছিল ঘোম্‌টা কালো বঙের হইবে, এখন গলার ঢাকা পছন্দমাফিক রঙের হইতেছে। পুরুষ বন্ধুদের সহিত মেয়েরা এখন হোটেল প্রভৃতি সাধারণ ভোজনাগারে ভোজন করিতেছেন। মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র হারেমের ব্যবস্থা শিথিল হইতেছে। ইচ্ছা করিলে বিবাহের পরেও মেয়েরা পিতৃদত্ত নাম বজায় রাখিতে পারেন। কন্‌স্‌টান্টিনোপল (আমেরিকান্‌) কলেজে ছাত্রী-আবাসে এমন সব মুসলমান মেয়ে আছেন যাঁহারা ফরাসী দেশের মেয়েদের অপেক্ষা অধিক স্বাধীনভাবে আছেন।

ভারতের নারী কিন্তু অনেক পশ্চাতে। এখানে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার অত্যন্ত মন্দ গতিতে চলিয়াছে। মান্দ্রাজ প্রদেশে মেয়েদের জন্য সাতটি চিকিৎসা-বিদ্যালয় খোলা হইয়াছিল এবং ছাত্রীর অভাবে সাতটিই এখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অথচ ডাক্তারী-বিদ্যায় পারদর্শী হইতে পারিলে মেয়েদের স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জনের যে কত সুবিধা হয় তাহা বলা যায় না। তাহা ছাড়া এই কাজে দেশের এবং দশের উপকার করিবার যথেষ্ট সুযোগ পাওয়া যায়।

ভারতের ভদ্রঘরের মেয়েরা অজ্ঞতায় বিধ্বস্ত এবং নিম্নশ্রেণীর মেয়েরা অজ্ঞতার উপরন্তু পরিশ্রমে

বিধ্বস্ত। পুনার ভারত-সেবক-সমিতির শ্রীযুক্ত যোশী মহাশয় সম্প্রতি খনিসমূহের নিয়মকানুন বদ্‌লাইবার জন্য একটি আইন পেশ্‌ করিয়াছেন। এই আইনের প্রধান উদ্দেশ্য খনিতে মেয়ে মজুরদের কাজ বন্ধ করা। এইসব মেয়ে-মজুররা মাটির হাজার হাজার ফুট নীচে কয়লার খনিতে সমস্ত দিন ধরিয়া কাজ করে। প্রায় সমস্ত সভ্য দেশেই আজকাল মেয়েদের খনিতে কাজ করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। ভারতেই কেবল এ প্রথা এখনো প্রচলিত। মেয়েরা ছেলেপিলের মাতা এবং গৃহকর্ত্রী। তাহারা যদি সমস্ত দিন ধরিয়া খনিতে রুদ্ধ থাকে তাহা হইলে সন্তান পালন করে কে এবং পরিশ্রমক্লান্ত স্বামী-পুত্রকে অন্ন দেয় কে? এইসব মেয়েদের স্বামীরাও সমস্ত দিন ধরিয়া খনিতে কাজ করে। ঘরে ফিরিয়া আসিয়া তাহারা না পায় প্রস্তুত অন্ন, না পায় বিশ্রামের আয়োজন, কেননা তাহাদের স্ত্রীরাও সেই সময়েই ঘরে ফেরে। গৃহের এই বিশৃঙ্খলায় মজুররা স্বভাবতই মদের দোকানে ছুটিয়া থাকে। অতএব মেয়েদের খনিতে কাজ করায় সমাজের অহিত হইতেছে—(১) মেয়েদের স্বাস্থ্যভঙ্গ ও গৃহ-বিশৃঙ্খলা, (২) সন্তানপালনের অব্যবস্থা ও সন্তানের অপুষ্টি, (৩) পুরুষের নৈতিক অবনতি। মেয়েদের খনিতে কাজ করার বিরুদ্ধে বিশেষ আন্দোলন হওয়া উচিত।

—গুপ্ত

১৩৩০ শ্রাবণ

আমেরিকার গ্রাজুয়েট তুর্ক-মহিলা

তুরস্কের শ্রীমতী সাবিহা জেকেরিয়ার এই বৎসর গত জুন মাসে আমেরিকার কোলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সমাজতত্ত্ববিদ্যায় উপাধি পাইবার কথা ছিল। ইহার পূর্ব্বে তুরস্কের আর কোন মহিলা আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উপাধি পান নাই। ইঁহার স্বামী মহম্মদ জেকেরিয়াও কোলাম্বিয়ার ছাত্র। ইনি সংবাদপত্র-পরিচালন-বিদ্যা শিখিতেছেন। উপাধিলাভের পর ইঁহারা স্বামী স্ত্রী উভয়েই স্বদেশে ফিরিয়া যাইবেন এবং সেখানে নিজ নিজ কার্য্যে রত হইবেন। ইঁহাদের ছয় বৎসর বয়সের ছোট মেয়েটিও বড় অবহেলার পাত্র নয়। সেভিম্‌ ফরাসী, ইংরেজী ও তুর্কী ভাষায় অনর্গল কথা বলিয়া যাইতে পারে। এখন গার্ল্‌স্কাউট (Girl Scout) হওয়াই তাহার প্রধান উচ্চাকাঙ্ক্ষা। শ্রীমতী জেকেরিয়া নিউইয়র্কের তুরস্কহিতৈষিণী সভার অধিনেত্রী।

কোলাম্বিয়া আমেরিকার অনতম শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়।

১৩৩০ আশ্বিন

ঠাকুরমা ও গ্রাজুয়েটের জননী ছাত্রী

ঠাকুরমা কলেজে যাইতেছেন, এমন ঘটনাও কি জগতে ঘটে? দেখা যাইতেছে ঘটে। শ্রীমতী সারা সুমেকার্ কার্লি পেন্‌সিলভেনিয়া ষ্টেট কলেজের কৃষি-বিদ্যালয় হইতে সম্প্রতি উদ্ভিদ্‌বিদ্যায় ডিগ্রী পাইয়াছেন। ইঁহার দুই পুত্রই কলেজের গ্র্যাজুয়েট, ইঁহার নাতি নাতনীও বারটি আছে। অবশ্য ইনি একলাই যে এই সম্মানের অধিকারিণী, তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। শ্রীমতী সুসান এ পোর্টার্‌ফিলডের ছেলেরাও কলেজের গ্র্যাজুয়েট; এই গ্র্যাজুয়েট-জননীও সম্প্রতি এই কলেজ হইতে আধুনিক ভাষা ও সাহিত্যে ডিগ্রী পাইয়াছেন।

১৩৩০ অগ্রহায়ণ

ডাক্তার শ্রীমতী কাদম্বিনী গাঙ্গুলী

স্ত্রী জাতির উচ্চশিক্ষা যাঁহারা চান, তাঁহারা স্বর্গীয় ব্রজকিশোর বসু মহাশয়ের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবেন। তাঁহারই কন্যা শ্রীমতী কাদম্বিনী বসু সর্ব্বপ্রকার বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষালাভ করিয়া বি-এ উপাধি প্রাপ্ত হন। (ঐ বৎসর শ্রীমতী চন্দ্রমুখী বসুও বি-এ উপাধি লাভ করেন।) ইহাতে তাঁহার পিতার ও তাঁহার বিদ্যানুরাগ সূচিত হইয়াছিল, এবং তাঁহার মানসিক বলেরও পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। এখন বাংলাদেশের হিন্দুসমাজেরও কোন কোন বালিকা কলেজে পড়েন, এবং বি-এ উপাধি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে উচ্চশিক্ষা লাভ অপরাধে শ্রীমতী কাদম্বিনী বসুকে অনেক লোকনিন্দা সহ্য করিতে হইয়াছিল। বি-এ উপাধি লাভ করিবার পর পরলোকগত দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী মহাশয়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। অতঃপর তিনি কর্ত্তৃপক্ষের অনেকের বিরোধিতা অতিক্রম করিয়া মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হন। নারীর পক্ষে এইরূপ নূতন কাজের শিক্ষা লাভ করিয়া নূতন কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করাতেও তাঁহাকে দুর্বৃত্ত লোকদের নিন্দা সহ্য করিতে হয়। কিন্তু তিনি মানসিক বলের দ্বারা তাহা অগ্রাহ্য করিয়া চিকিৎসা শিক্ষা করেন, এবং ইংলণ্ডে গিয়া চিকিৎসা-বিষয়ে আরও যোগ্যতা লাভ করেন। নারীদের উচ্চ-শিক্ষালাভে এবং চিকিৎসা-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবার পথে অগ্রণী বলিয়া তিনি স্ত্রীজাতির ও নারী হিতৈষীদিগের কৃতজ্ঞতার পাত্র। মহিলাদের মধ্যে তিনিই প্রথমে কংগ্রেসে ও সমাজ-সংস্কার-সমিতিতে বক্তৃতা করেন। কলিকাতায় যে ট্রান্স্‌ভাল্ ভারতীয় সভা স্থাপিত হয়, শ্রীমতী কাদম্বিনী গাঙ্গুলী তাহার নেত্রী হইয়া অনেক পরিশ্রম করেন। খনিতে মজুরাণীদের কাজ বন্ধ হইবার

প্রস্তাব হওয়ায় তিনি ও শ্রীমতী কামিনী রায় বিহার ও ওড়িষা প্রদেশের কোন কোন খনি দেখিয়া নিজেদের মত প্রকাশ করেন। তিনি সকল দেশে নারীদের রাষ্ট্রীয়-অধিকার-লাভ- প্রচেষ্টার সমর্থন করিতেন।

—

১৩৩১ ফাল্গুন
শ্রীমতী সরোজনলিনী দত্ত

গত ১৯শে জানুয়ারী শ্রীমতী সরোজনলিনী দত্ত পরলোকে গমন করিয়াছেন। শ্রীমতী সরোজনলিনী—শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের পত্নী। ইনি বাঁকুড়া ও বীরভূমে অবস্থানকালে নানা-প্রকার জনহিতকর কার্য্য করিয়াছিলেন এবং তৎপরে কলিকাতায় আগমনের পরেও নারীশিক্ষা-সমিতি ক্যাল্‌কাটা লীগ অব উইমেন ওয়ার্কার্স বেবি উইক প্রভৃতি বহু অনুষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন। পর্দ্দানসীন মহিলাদেব মধ্যে শিক্ষা ও শিল্পপ্রচারের জন্য শ্রীমতী সরোজনলিনী অনেক চেষ্টা করিয়াছেন। শিশু-মঙ্গল, হাসপাতাল-স্থাপন্ ধাত্রীদিগকে আধুনিক শিক্ষাদান ইত্যাদি নানান প্রচেষ্টার মধ্যেই ইঁহাকে বিশেষ করিয়া দেখা গিয়াছে। ইঁহার মৃত্যুতে বাংলাদেশ একজন যথার্থ কর্ম্মী হারাইল। শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয়কে এই দারুণ শোকে আমরা সহানুভূতি জানাইতেছি। তাঁহার পত্নীর মৃত্যুতে বাংলার বহুস্থলে শোকের ছায়া পড়িয়াছে। কার্য্যক্ষেত্রের বাহিরে বন্ধুভাবে যাঁহারা শ্রীমতী সরোজনলিনীকে দেখিয়াছেন, তাঁহারা বিশেষ করিয়া এই গুণবতী সহৃদয়া মহিলার মৃত্যুতে শোক অনুভব করিতেছেন। অকালে ইঁহাকে হারাইয়া দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

—

১৩৩৩ বৈশাখ
বাঁকুড়ায় সরোজনলিনী দত্ত মাতৃত্বাগার

শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া সরোজনলিনী দত্ত যখন স্বামীর সহিত বাঁকুড়ায় ছিলেন, তখন তিনি সেখানে মহিলাসমিতি গঠন করিয়া তাঁহাদের সহযোগে অনেক সৎকার্য্য করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর বাঁকুড়ার মহিলারা তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ অর্থ সংগ্রহ করিয়া তথাকার মেডিক্যাল স্কুলের হাসপাতালে একটি সূতিকাগার স্থাপন করিয়াছেন। তিনি যেখানে যেখানে কাজ

করিয়াছিলেন, সর্ব্বত্র তাঁহার নামে এইরূপ কোন-না-কোন লোকহিতকর কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে তাঁহার প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শিত হইবে।

১৩৩৪ কার্ত্তিক

মুসলমান মহিলা এম্-এ

কুমারী ফজিলতুন্নেসা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতে এম.এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইহা সাতিশয়ের আহ্লাদের বিষয়। মুসলমান ছাত্রী দূরে থাক্, কোনও মুসলমান ছাত্রও বঙ্গে গণিতে, এরূপ পারদর্শিতা দেখাইতে পারে নাই। আমরা অবগত হইলাম, তিনি আবার সংস্কৃতে এম্-এ পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

মহারাণী সুনীতি দেবীর দান

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ভারতবর্ষের উৎকৃষ্ট প্রাচীন আদর্শ অনুসারে বালিকাদের শিক্ষার জন্য ভিক্টোরিয়া বিদ্যালয় স্থাপন করেন। উহার নিজের বাড়ী না থাকায় উহাকে নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছে, এবং তাহাতে নানা অসুবিধা হইয়াছে। এক্ষণে সেন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা মহারাণী সুনীতি দেবী তাঁহার কলিকাতাস্থ পৈত্রিক ভবন কমল কুটির তাহার হাতার চারি বিঘা জমিসমেত বিদ্যালয়কে দান করিয়া উহা ট্রষ্টীদের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। ইহাতে বিদ্যালয়টির স্থায়িত্ব বিধান করিয়া মহারাণী পিতার উপযুক্ত কাজ করিয়াছেন। কেশবচন্দ্রের আদর্শের ও কার্য্যতঃ নারীশিক্ষার অনুরাগী, সমুদয় ট্রষ্টী এইরূপ নির্ব্বাচন করিলে ভাল হইত। যাহা হউক, নির্ব্বাচিত কোন কোন ট্রষ্টীর প্রভাবে যদি কমল কুটীরের সম্মুখস্থ গাড়ীতে আবর্জ্জনা বোঝাই করিবার প্ল্যাটফর্মটি শীঘ্র শীঘ্র স্থানান্তরিত হয়, তাহা হইলে তাহা ছাত্রীদের স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে ভাল হইবে।

১৩৩৬ অগ্রহায়ণ

বাল্যবিবাহনিরোধ আইন ও স্ত্রীশিক্ষা

শ্রীযুক্ত হরবিলাস সারদা মহাশয়ের দ্বারা উপস্থাপিত বাল্যবিবাহনিরোধ বিল আইনে পরিণত হওয়ায় ভারতবর্ষের প্রভূত মঙ্গল হইবে। তাহার মধ্যে বালিকাদের শিক্ষার অধিকতর সুযোগপ্রাপ্তির কথাই এখন বলিতে চাই।

বালিকাদের শিক্ষার বাধা যত আছে, অল্প বয়সে বিবাহ তাহার মধ্যে একটি। বাল্যবিবাহ প্রথা থাকায়, যে-সব বালিকা পাঠশালায় যাইত তাহাদিগকেও অল্প বয়সে লেখাপড়া ছাড়াইয়া আনা হইত। ফলে, তাহারা অল্প যাহা শিখিত, তাহাও অনেকে কালক্রমে ভুলিয়া যাইত। বাল্যবিবাহনিরোধ আইন হওয়ায় এখন বালিকাদিগকে অন্যূন চৌদ্দ বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্য্যন্ত অবিবাহিত রাখিতে হইবে। অতঃপর যাঁহারা বালিকাদিগকে কিছু শিক্ষা দিতে চান, তাঁহারা তাহাদের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিবার জন্য যথেষ্ট সময় পাইবেন। ছয় বৎসরে হাতে-খড়ি দিয়া চৌদ্দ বৎসর পর্য্যন্ত লেখাপড়া শিখাইলে আট বৎসরে মোটামুটি অনেক বিষয় শিখান যাইতে পারে।

ভারতবর্ষে ও ব্রহ্মদেশে ১৯২১ সালের সেন্সস্ অনুসারে হাজার-করা কতজন পুরুষ ও স্ত্রীলোক লিখন-পঠনক্ষম ছিল, তাহা হইতে পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা শিক্ষায় পরস্পর হইতে কত দূরে বুঝা যাইবে।

প্রদেশ	হাজার-করা পুরুষ	লিখনপঠনক্ষম স্ত্রীলোক
মান্দ্রাজ	১৫২	২১
বোম্বাই	১৪১	২০
বাংলা	১৫৯	১৮
আগ্রা-অযোধ্যা	৬৫	৬
পঞ্জাব	৬৭	৮
ব্রহ্মদেশ	৪৪৮	৯৭
বিহার-উড়িষ্যা	৮৮	৬
মধ্যপ্রদেশ	৮৪	৭
আসাম	১১০	১৩
ব্রিটিশ ভারত	১৩০	১৮

১৯২১ সালে সমগ্রভারতে প্রতি পঞ্চাশ জন স্ত্রীলোকের মধ্যে এক জনের কম স্ত্রীলোক লিখিতে পড়িতে জানিত; এখন তার চেয়ে অবস্থা যে বেশী ভাল হইয়াছে, তাহা নয়। ঐ সালে প্রতি সাত জন পুরুষের মধ্যে এক জনের কম লেখা পড়া জানিত। বাংলা দেশে ঐ সালে শতকরা প্রায় ১৬ জন পুরুষ এবং শতকরা প্রায় ২ জন স্ত্রীলোক লেখাপড়া জানিত; অর্থাৎ পুরুষদের চেয়ে স্ত্রীলোকদের মধ্যে সামান্য লেখাপড়ারও বিস্তার অষ্টমাংসেরও কম হইয়াছিল।

১৯২৭ সালে ব্রিটিশ ভারতে ছেলেদের ও মেয়েদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন রকমের শিক্ষালয় কত ছিল দেখাইতেছি।

	প্রাথমিক	উচ্চতর	আর্টস কলেজ
ছেলেদের জন্য	১৬২,৬৬৬	১০,৩৭৩	২১৩
মেয়েদের জন্য	২৬,৬৮২	৯৬৫	১৯

মেয়েদের শিক্ষার প্রতিষ্ঠান ছেলেদের শিক্ষার প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা সংখ্যায় অত্যন্ত কম।

ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে মোট পুরুষ ও স্ত্রীলোক

অধিবাসীর মধ্যে শতকরা কতজন পাঠশালা হইতে কলেজ পর্য্যন্ত সবরকম প্রতিষ্ঠানে ১৯২৭ সালে শিক্ষা পাইতেছিল, নীচে তাহার সংখ্যা দেওয়া হইল।

প্রদেশ	মেয়ে	ছেলে
মান্দ্রাজ	২.৫	৯.২
বোম্বাই	২.৩	৮.৮
বাংলা	১.৮	৭.৭
আগ্রা-অযোধ্যা	০.৫	৪.৮
পঞ্জাব	০.৮	৮.৮
ব্রহ্মদেশ	২.৬	৪.১
বিহার-উড়িষ্যা	০.৭	৫.৬
মধ্যপ্রদেশ	০.৬	৫.০
আসাম	০.৯	৫.৯
ব্রিটিশ ভারত	১.৫	৬.৯

ছেলেদের শিক্ষা মেয়েদের শিক্ষা, [illegible] প্রথমশ্রেণীস্থ নহে। ছেলেদের শিক্ষায় বাংলা চতুর্থস্থানীয়, মেয়েদের শিক্ষাতেও চতুর্থস্থানীয়।

১৯২৭ সালে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে মেয়েদের শিক্ষার জন্য কত খরচ হইয়াছিল এবং ছেলেদের শিক্ষার তাহা শতকরা কত অংশ, নীচের তালিকায় দেখান গেল।

প্রদেশ	মোট ব্যয়		ছেলেদের শিক্ষাব্যয়ের শতকরা কত
মান্দ্রাজ	৪৯.৮৫ লক্ষ		১৭.২
বোম্বাই	৫৩.২৫	”	১৯.৫
বাংলা	২৮.০৯	”	১০.৯
আগ্রা অযোধ্যা	২৩.১৪	”	১২.১
	১৯.৭৬	”	১০.৪
ব্রহ্মদেশ	১৭.০২	”	১৮.১
বিহার-উড়িষ্যা	৮.৩৪	”	৭.৩
মধ্যপ্রদেশ	৬.৪৪	”	৯.৭
আসাম	২.৭৫	”	১০.১
ব্রিটিশ ভারত	২১৯.৯২	”	১৪.৪

সমগ্র ব্রিটিশভারতে ছেলেদের শিক্ষার জন্য যত ব্যয় হয়, মেয়েদের জন্য তাহার সাত ভাগের একভাগ খরচ হয়; বাংলা দেশে মেয়েদের শিক্ষার ব্যয় ছেলেদের শিক্ষা ব্যয়ের নয় ভাগের এক ভাগ। টাকাব পরিমাণ ধরিলে দেখা যায়, বাংলাদেশে মেয়েদের শিক্ষার জন্য মান্দ্রাজ ও বোম্বাই হইতে অনেক কম খরচ হয়। বস্তুতঃ প্রকৃত তুলনা করিতে হইলে কোন্ প্রদেশে নারীর সংখ্যা কত তাহা বিবেচনা করা উচিত। মোটামুটি ঐ সংখ্যা দিতেছি। মান্দ্রাজ ২১০ লক্ষ, বোম্বাই ৯০ লক্ষ, বাংলা ২২০ লক্ষ, আগ্রা-অযোধ্যা ২১০ লক্ষ, পঞ্জাব ৯০ লক্ষ, ব্রহ্মদেশ ৬০ লক্ষ, বিহার-উড়িষ্যা ১৭০ লক্ষ, মধ্যভারত ৭০ লক্ষ, আসাম ৩০ লক্ষ, ব্রিটিশভারত ১২০০ লক্ষ। বাংলা-দেশে বাস্তবিক স্ত্রীশিক্ষার জন্য বোম্বাই মান্দ্রাজ পঞ্জাব ও ব্রহ্মদেশ অপেক্ষা গবর্ন্মেণ্ট ও জনসাধারণ অত্যন্ত কম উৎসাহ দেখাইয়া থাকেন।

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা শোচনীয়। এ বিষয়ে শিক্ষিতা মহিলাদের দৃষ্টি পড়িয়াছে। তাহা হইতে অনেক সুফলের আশা করা যাইতে পারে। শিক্ষিত পুরুষদেরও অনেকের দৃষ্টি পড়িয়াছে।

স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা সকল দিক দিয়া দেখাইবার প্রয়োজন এখনও আছে। এখানে কেবল এক প্রকার প্রয়োজনের কথা বলিতেছি।

বাল্যবিবাহনিরোধ আইন পাস হওয়ায় এখন বালিকাদিগকে অন্যূন চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত রাখিতেই হইবে। যে-সব আভিভাবক

বালিকাদিগকে শিক্ষিত করিতে চান, তাঁহারা, চৌদ্দ কেন, ষোল পর্য্যন্তও তাহাদিগকে স্কুলে রাখিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করিতে চাহিবেন। তাঁহাদের প্রধান বাধা হইবে, দেশে যথেষ্ট উচ্চশ্রেণীর বালিকা-বিদ্যালয়ের অভাব। প্রত্যেক জেলার সদরে একটি ও মহকুমাগুলিতে একটি করিয়া এরূপ বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়া উচিত।

যাঁহারা এখন নিজেদেব বাড়ীর মেয়েদের শিক্ষার কোন ব্যবস্থা করেন না, তাঁহাদিগকে নূতন আইনের দ্বারা পরিবর্ত্তিত অবস্থার কথা ভাবিতে হইবে। চৌদ্দ বৎসর পর্য্যন্ত বালিকাদিগকে অশিক্ষিত অবস্থায় অবিবাহিত রাখায় তাহাদের বিপদের আশঙ্কা এবং সামাজিক অনিষ্টের আশঙ্কা আছে। ছোট মেয়েদের প্রতি দুষ্ট লোকদের যত দৃষ্টি পড়ে, অপেক্ষাকৃত অধিকবয়স্ক মেয়েদের প্রতি তাহাদের পাপদৃষ্টি তার চেয়ে অনেক বেশী পড়িবার কথা। এবং বাংলা দেশের হিন্দুসমাজে অবিবাহিতা বালিকারা সমান বয়সের বিবাহিতাদের চেয়ে চলাফিরার স্বাধীনতা অধিক পাইয়া থাকে। তাহা তাহাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালই—তাহা কমান উচিত নহে। কিন্তু স্বাধীনতাকে যথাসম্ভব নিরাপদ করিবার জন্য বালিকাদিগকে নৈতিক. দৈহিক ও সাধারণ শিক্ষা ভাল রকমের দেওয়া দরকার। তাহাদের আত্মরক্ষার সামর্থ্য যতটা জন্মে ততই মঙ্গল। অবশ্য, যে-দেশে নারীদের স্বাধীনতা যে-পরিমাণ বাড়িবে, সে-দেশে তাহাদের সম্মান রক্ষার নিমিত্ত সেই পরিমাণে পুরুষদের সাহস চারিত্রিক দৃঢ়তা—এক কথায় প্রকৃত পৌরুষ—বাড়া যে একান্ত আবশ্যক, তাহা বিস্মৃত হইতেছি না। কিন্তু বাংলাদেশের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে, অন্ততঃ পুরুষ রক্ষক কেহ না আসিয়া পৌঁছা পর্য্যন্ত, মেয়েদেব আত্মরক্ষা চেষ্টার সাহস ও সামর্থ্য, সাহায্যের প্রয়োজন জানাইবার মত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও সাহস, থাকা দরকার। দৈহিক, নৈতিক ও মানসিক সুশিক্ষা হইলে এইরূপ সামর্থ্য ও সাহস জন্মিবে ও বাড়িবে।

দেশে পুরুষদের মধ্যেও অধিকাংশ অশিক্ষিত, এবং শিক্ষিতদের মধ্যেও অনেকে অবস্থার পরিবর্ত্তন অনুযায়ী ব্যবস্থার আবশ্যকতা সম্বন্ধে চিন্তা করেন না। যাঁহারা চিন্তা করিতে অসমর্থ এবং যাঁহারা সামর্থ্য থাকিতেও চিন্তা করেন না, এইরূপ সকল লোকদের চিন্তার অভাব সমাজহিতৈষী সমাজনেতাদিগকে দূর করিতে হইবে।

বাল্যবিবাহনিরোধ আইন পাস হইবার পূর্ব্বেও বালিকাদের শিক্ষার প্রয়োজন ছিল। আমরা বঙ্গের অবস্থা বুঝিয়া মনে করি তাহার প্রয়োজন এখন বাড়িল। যে জমিতে চাষ হয় না, তাহাতে আগাছা জন্মে। শিক্ষার দ্বারা হৃদয়মনের উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা না হইলে তাহাতেও আগাছা জন্মে। একথা সকলকে মনে রাখিতে হইবে।

ছেলেদের জন্য যেরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, মেয়েদের জন্য তাহা সর্ব্বাংশে উপযোগী নহে। কিন্তু ইহাও সত্য নহে, যে, উভয়ের শিক্ষা একেবারেই আলাদা রকমের হওয়া চাই। বালিকাদের সম্পূর্ণ উপযোগী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়িয়া না-উঠা পর্য্যন্ত বর্ত্তমান যে সব বালিকা-বিদ্যালয় ও কলেজ আছে, তাহারই সাহায্য লইতে হইবে।

যাঁহারা আধুনিক রকমের বালিকা-বিদ্যালয়ের পক্ষপাতী নহেন, তাঁহারা সেই ওজুহাতে নিজেদের বাড়ীর বালিকাদিগকে মূর্খ করিয়া রাখিলে তাহাদের সাতিশয় অনিষ্ট করিবেন। অন্য রকমের বালিকা-বিদ্যালয়ও কতকগুলি আছে, এবং তাহার পক্ষপাতীরা চেষ্টা করিলে তাহাদের সংখ্যা বাড়িতে

পারে। কলিকাতায় শ্যামবাজারে যে সারদেশ্বরী আশ্রম ও বালিকা-বিদ্যালয় আছে, তাহাতে কতক প্রাচীন রীতি ও কতক আধুনিক প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। যাঁহাদের আর্থিক সামর্থ্য আছে, তাঁহারা এখানে বালিকাদিগকে পাঠাইতে পারেন। মৈমনসিংহ প্রভৃতি সহরে মহাকালী পাঠশালা আছে। তাহাতে অপেক্ষাকৃত অধিকবয়স্ক বালিকারাও পড়ে। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ কর্তৃক পরিচালিত ভদ্রকালী ব্রহ্মচর্য্য বালিকা আশ্রমের বৃত্তান্ত তাহার একজন কর্ম্মী আমাদিগকে দিয়া গিয়াছেন। তাহা পড়িয়া মনে হয়, সেখানেও প্রাচীন ধরণের শিক্ষার সহিত নানাবিধ অর্থকর কাজ শিখান হইয়া থাকে।

শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন

অনেক বাধা সত্ত্বেও বঙ্গে বালিকা-বিদ্যালয়ের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকিবে। বঙ্গের বাহিরেও বাঙালী শিক্ষয়িত্রীর আবশ্যক হয়। এই জন্য অনেক শিক্ষিতা মহিলা শিক্ষয়িত্রী হইবার জন্য প্রস্তুত হইলে সমাজের উপকার হইবে, এবং তাঁহাদেরও উপকার হইবে। আমরা কার্ত্তিকের প্রবাসীতে ১৫৯-৬০ পৃষ্ঠায় ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার সম্বন্ধে তুলনা করিবার জন্য যে তালিকা দিয়াছি তাহাতে দেখা যায়, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে শিক্ষয়িত্রী হইবার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক মহিলা অধ্যয়ন করেন ও পরীক্ষা দেন। ঐ প্রদেশে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারের ইহা অন্যতম কারণ।

শিক্ষয়িত্রীর কাজ লোকহিতকর ও সম্মানের কাজ, ইহা মহিলা ও পুরুষ উভয়েরই বুঝিতে হইবে। আর একটি বিষয়ে আমাদিগকে সাবধান থাকিতে হইবে। উত্তর-ভারতে পর্দ্দা-প্রথা থাকায় যাঁহারা বাহিরে চলাফিরা করেন এরূপ মহিলাদের চালচলন গতিবিধি নূতনত্ববশতঃ অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এবং সে বিষয়ে আলোচনাও হয়। কিন্তু আমাদিগকে সাবধান থাকিতে হইবে, যাহাতে কোন শিক্ষিতা মহিলার সম্বন্ধে কেহ মন্দ একটা কিছু বলিলেই তাহা বিনা প্রমাণে বিশ্বাস না করিয়া বসি। পুরুষদের সম্বন্ধে মন্দ কিছু সহজে বিশ্বাস করা দোষের বিষয়। মহিলাদের সম্বন্ধে সেরূপ কিছু সহজে বিশ্বাস করা অধিকতর দোষের বিষয়। কারণ মিথ্যা নিন্দায় তাঁহাদের ক্ষতি বেশী হয়, এবং সেরূপ নিন্দা হইতে আত্মরক্ষার উপায় তাঁহাদের কম। মহিলাদিগের প্রতি আমাদের মনের ভাব তাঁহাদের সমক্ষে এবং অন্যত্র সশ্রদ্ধ হওয়া উচিত।

পল্লীগ্রামস্থিত বালিকা-বিদ্যালয় সমূহের জন্য শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত কলিকাতার নারী শিক্ষাসমিতি চেষ্টা করিতেছেন। সমিতির চেষ্টা কোন কোন স্থলে সফল হইয়াছে। এই চেষ্টার বিশেষ বৃত্তান্ত সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ বসাক মহাশয়কে ৬/১ বিদ্যাসাগর স্ট্রীট ঠিকানায় চিঠি লিখিলে জানিতে পারা যাইবে।

১৩৩৭ মাঘ

ঢাকায় দীপালি প্রদর্শনী

কলিকাতায় নারীশিক্ষা সমিতি ও সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি যেরূপ কাজ করেন, ঢাকায় দীপালি সঙ্ঘ কতকটা সেইরূপ কাজ করেন। এই সঙ্ঘের নারীশিক্ষা মন্দিরে গত ডিসেম্বর মাসে মহিলাদের প্রস্তুত নানাবিধ শিল্পসামগ্রীর প্রদর্শনী হইয়াছিল। এই প্রদর্শনীর সংশ্রবে ছাত্রীদের সঙ্গীতের প্রতিযোগিতা, আবৃত্তির প্রতিযোগিতা প্রভৃতি হইয়াছিল। বিবাহিতা বালিকারাও কোন কোন প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়াছিলেন। চরখা ও টেকোর প্রতিযোগিতাও হইয়াছিল। শেষ দিনে লাঠি ও ছোরা খেলার প্রতিযোগিতা হইয়াছিল।

এই সব অনুষ্ঠান প্রশংসনীয়, এবং নাবীদের জীবনকে বৈচিত্র্য ও আনন্দে পূর্ণ করে এবং তাঁহাদের শিক্ষার সহায়তা করে।

১৩৩৮ ভাদ্র

বাঙালী মহিলার জার্ম্যান বৃত্তি প্রাপ্তি

শ্রাবণের 'প্রবাসী'তে ৫৭৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছিলাম, জার্মেনীর বিদ্বৎপরিষদের ভারতীয় বিদ্যোৎসাহক প্রতিষ্ঠান (India Institute of Die Deutsche Akademie) ভারতীয়দের জন্য যে কুড়িটি বৃত্তি অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে দশটি দশ জন বাঙালী বিদ্যার্থী এবং একটি এক জন বাঙালী বিদ্যার্থিনী পাইয়াছেন। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তারী এম-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কুমারী মৈত্রেয়ী বসু। ইনি এখন চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে কাজ করেন এবং শীঘ্র জার্মেনী যাইবেন। সেখানে ম্যুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাবিদ্যায় উচ্চতর শিক্ষা লাভ করিবেন এবং গবেষণা করিবেন।

১৩৩৯ পৌষ

মিসেস্ সখাওৎ হোসেন

মিসেস্ সখাওৎ হোসেনের মৃত্যুতে বঙ্গীয় সাহিত্যের ক্ষতি হইল, এবং বঙ্গীয় নারীশিক্ষাক্ষেত্র হইতে একজন বিশিষ্ট আত্মোৎসৃষ্টা সমাজসেবিকাব তিরোভাব ঘটিল। তাঁহাব নিজের নাম না-জানা থাকায় তিনি যে নামে পরিচিত ছিলেন তাহাই ব্যবহার করিতেছি। অকালে তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি স্বামীর নিকট হইতে প্রাপ্ত দশ হাজার টাকা মুসলমান বালিকাদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপনে ব্যয় করেন। স্বামীর স্মরণচিহ্ন-স্বরূপ বিদ্যালয়টির নাম রাখেন তাঁহারই নাম অনুসারে। তাহার পর নিজের পুঁজিপাটা এবং নিজের সমুদয় শক্তি এই কাজে নিয়োগ করিয়া তিনি বহুবৎসর বিদ্যালয়টি চালাইয়া আসিতেছিলেন। তিনি ইহাকে উচ্চশ্রেণীর বালিকা-বিদ্যালয়ে পরিণত করিয়া রাখিয়া যাইতে পারিতেছেন। তাঁহার এই কীর্ত্তিটি দাম্পত্য প্রেমের নিদর্শন, সাধ্বীর যোগ্য অবদান, এবং মুসলমান সমাজের হিতকর প্রতিষ্ঠান।

তিনি সুলেখিকা ছিলেন। পুরুষজাতির উদ্দেশে নিক্ষিপ্ত তাঁহার বাক্যবাণের তীক্ষ্ণতা অনুভূত হইলেও তাঁহার সমালোচনার ন্যায্যতা নিরপেক্ষ লোকদিগকে স্বীকার করিতে হইত।

১৩৪১ পৌষ

পুণ্যবতী সাধ্বী রোকেয়া খানম্

পুণ্যবতী সাধ্বী রোকেয়া খানম্ মুসলমান-সমাজে মিসেস্ সাখাওৎ হোসেন নামে পরিচিত। তিনি অল্প বয়সে বিধবা হন। স্বামীর স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ সাখাওৎ হোসেন বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালন করেন। তাঁহার সম্বন্ধে তাঁহার স্মৃতিসভায় মৌলবী সাদত আলি আখন্ড বলেন—

"ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে রংপুব জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে এক প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত জমিদার-বংশে রোকেয়া খানমের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম জহীর-উদ্দীন মোহম্মদ আবু আলি। বংশের প্রাচীনত্ব ও শরীফত্বই ছিল বেগম রোকেয়া খানমের জীবনের সবচেয়ে বড় অভিসম্পাত। তাঁহার পিতা মোহম্মদ আবু আলি সাহেব স্ত্রীশিক্ষার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। যে-বয়সে সাধারণ বালিকারা প্রথম স্কুলে যাইতে আরম্ভ করে, সেই বয়স হইতেই রোকেয়া খানমকে পর্দ্দার আড়ালে অন্ধকারের ভিতর লুকাইয়া ফেলা হইয়াছিল। কিশোরী রোকেয়া খানম্ বাংলার শত সহস্র মুস্‌লিম কিশোরীর মত এই অত্যাচার নীরবে সহ্য করেন নাই। তিনি পিতার সমস্ত নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া গোপনে জ্যেষ্ঠ সহোদর আবুল আসাদ ইব্রাহীম সাহেবের নিকটে সামান্য বাংলা ও ইংরেজী প্রথম ভাগ শেষ করিয়া ফেলেন। কিশোরী

রোকেয়ার এই বিদ্রোহী জীবনের ইতিহাস বাংলার মুসলিম-নারী- মুক্তি-সংগ্রামের প্রথম অধ্যায়। তিনি কৈশোরের প্রারম্ভ হতে জীবনের শেষমূহূর্ত্ত পর্য্যন্ত পর্দ্দা, অশিক্ষা ও কুশিক্ষার বিরুদ্ধে জেহাদ চালাইয়া গিয়াছেন।

প্রায় ষোল বৎসর বয়সে ভাগলপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ সাখাওৎ হোসেনের সহিত বেগম রোকেয়া খানমের বিবাহ হয়। উচ্চশিক্ষিত হৃদয়বান স্বামীর সাহচর্য্যে তিনি ইংরেজী ভাষায় সুপণ্ডিতা হইয়া উঠেন।

রোকেয়া খানমের বিবাহিত জীবন দাম্পত্যপ্রেমের এক অত্যুজ্জ্বল কাহিনী, স্বামীব অকাল মৃত্যুতেই তাহার পরিসমাপ্তি হয় নাই, অন্তরের সমস্ত গ্লানি-যন্ত্রণা নীরবে অন্তরে বহিয়া এই গরীয়সী নারী জীবনের সমস্ত দিবস ব্যাপিয়া সেবার যে উদাহরণ দেখাইয়াছেন তাহা বাংলার সেবার ইতিহাসে অতুলনীয়—শুধু প্রেমময়ী পত্নীরূপেই নহে, স্নেহময়ী সমাজ- সেবিকারূপেই তাঁহার জীবনের সাধনা কল্যাণশ্রীতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।"

১৩৪০ জ্যৈষ্ঠ

বোধনা-সমিতির প্রথম বার্ষিক রিপোর্ট

বোধনা-সমিতির প্রথম বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা ৬-৫ বিজয় মুখুজ্যের গলি, ভবানীপুর, কলিকাতা, ঠিকানায় সম্পাদক শ্রীযুক্ত গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল, মহাশয়ের নিকট পাওয়া যায়। ইহাতে পাঠক দেখিতে পাইবেন, সমিতি বোধনা- নিকেতনের গৃহনির্ম্মাণ কার্য্যে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছেন এবং ইংলণ্ডে শিক্ষিতা একটি বাঙালী মহিলাকে প্রিন্সিপ্যাল ও তত্ত্বাবধায়িকা, স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত এম্-বি ও ডি.টি-এম্ পাস একজন ডাক্তারকে রেসিডেন্ট মেডিক্যাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ও শুশ্রূষা ও গৃহস্থালীর কার্য্যে অভিজ্ঞা একটি মহিলাকে মেট্রন নিযুক্ত করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন বড় বড় চিকিৎসক ও মনস্তত্বজ্ঞ নানা প্রকারে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন; এখন টাকার একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। প্রবাসীর পাঠকেরা যদি প্রত্যেকে অল্পস্বল্প কিছুও দেন, তাহা হইলে এই প্রতিষ্ঠানটির প্রারম্ভিক আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া কাজ আরম্ভ অনায়াসে করা যায়। ভারতবর্ষে ভারতীয় জড়বুদ্ধি ছেলেমেয়েদের জন্য ইহাই একমাত্র প্রতিষ্ঠান।

১৩৪০ শ্রাবণ

বোধনা-নিকেতন

জড়বুদ্ধি ছেলেমেয়েদের জন্য ঝাড়গ্রামে গত ১৭ই আষাঢ় বোধনা-নিকেতন খোলা হইয়াছে। ঝাড়গ্রামের রাজা আগেই বোধনা-সমিতিকে প্রায় ২৫০ বিঘা জমি দিয়াছিলেন, প্রতিষ্ঠার দিন তিনি নিকেতনের প্রতিষ্ঠাতা-রূপে ১৩৪০ সালের জন্য দুই হাজার টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এই নিকেতনটি যে কিরূপ প্রয়োজনীয়, তাহা প্রতিষ্ঠার দিন পঠিত এবং ইংরেজী ও বাংলা নানা কাগজে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের বাণী হইতে শিক্ষিত সাধারণ জানিতে পারিয়াছেন। তিনি তাহাতে অন্যান্য কথার মধ্যে বলিয়াছেন, "এই পঙ্গুমনাদের যথোচিত শুশ্রূষা করার জন্য বিশেষ সাধন ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন আছে। যে সংসার প্রধানত প্রকৃতিস্থদের জন্য সেখানে এদের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা গৃহস্থের পক্ষে সহজসাধ্য নয়—এই জন্য বোধনা-নিকেতনের উদ্যোগ ও অয়োজন দেখে আনন্দিত হয়েছি।" ইহা ভিন্ন কবি 'প্রবাসী'র সম্পাদককে ব্যক্তিগত চিঠিতে লিখিয়াছেন, "এ কাজটির প্রয়োজন ও মহত্ত্ব সম্বন্ধে আমার সন্দেহ নেই।"

বোধনা-নিকেতনের অর্থাভাব খুব বেশী। থোক্ এখনও প্রায় ২৫০০ টাকা আছে। তাহার পরও পাঁচ-ছয় হাজার টাকা চাই। মাসিক নির্দ্দিষ্ট ব্যয় প্রায় চারি ও পাঁচশত টাকা। অতি ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ দান ২-১ টাউনশেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা, ঠিকানায় নিকেতনের কোষাধ্যক্ষ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নামে প্রেরিত হইলে কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে।

১৩৪০ অগ্রহায়ণ

বোধনা-নিকেতন

মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রামে প্রতিষ্ঠিত বোধনানিকেতন জড়বুদ্ধি ছেলেমেয়েদের দৈহিক ও মানসিক পরিচর্য্যা ও শিক্ষার দ্বারা তাহাদের উন্নতি বিধানের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার কাজ শৃঙ্খলার সহিত চলিতেছে। কিছু দিন হইল ঝাড়গ্রামের মহকুমা-হাকিম মহাশয় ইহার পরিদর্শন করিয়া ইহার খুব প্রশংসা করিয়াছেন। এখন ইহার ছাত্রসংখ্যা সাতটি এবং ছাত্রী একটি। ঝাড়গ্রামের রাজা নরসিংহ মল্লদেবের বদান্যতায় ইহার প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইয়াছে। তাঁহার ম্যানেজার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য নিকেতনটির বিশেষ শুভানুধ্যায়ী। রাজা বাহাদুরের বদান্যতায় প্রতিষ্ঠানটির অনেক ঋণশোধ ও অভাবমোচন হইয়াছে। কিন্তু এখনও অনেক ঋণ অপরিশোধিত আছে। এবং অভাব ত কার্য্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়াই চলিবে। সর্ব্বসাধারণের সাহায্যে সব

অভাব দূর হইতে থাকিবে, আশা আছে। 'প্রবাসী'র পাঠকেরাই সকলে কিছু দিলে অনেক হাজার টাকা হয়। যিনি যাহা দিবেন, অনুগ্রহ করিয়া বোধনা-নিকেতনের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায়কে ৬-৫ বিজয় মুখুজ্যে গলি, ভবানীপুর, কলিকাতা, ঠিকানায় তাহা পাঠাইলে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকৃত হইবে।

১৩৪১ আশ্বিন

মহিলা "বেদতীর্থ"

[শকুন্তলা দেবী]

বঙ্গীয় সংস্কৃত এসোসিয়েশনের সংস্কৃতপরীক্ষামানদানপরিষদের গত অধিবেশনে, অর্থাৎ, চলিত কথায়, সংস্কৃত উপাধি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিদিগকে উপাধিদানের সভায়, সভাপতি মাননীয় বিচারপতি মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় স্বীয় সংস্কৃত অভিভাষণে বলেন,

"এতদস্মাকং বর্ষেঽস্মিন্ মহদ্গৌরবকারণং জাতং যদেকা ব্রাহ্মণকুমারী সংস্কৃতমহাবিদ্যালয়স্থ-গবেষণাবিভাগীয়ান্তে-বাসিনী 'বেদতীর্থ' ইত্যুপাধিনা সমলঙ্কৃতা। ইতঃ প্রাক্ কদাপি কাঽপি মহিলা পরীক্ষার্থিনী অনেনোপাধিনা নৈব ভূষিতাঽভবৎ।"

"এই বৎসর আমাদের এই মহৎ গৌরবের কারণ উৎপন্ন হইয়াছে যে, সংস্কৃতমহাবিদ্যালয়ের গবেষণাবিভাগের ছাত্রী একটি ব্রাহ্মণকুমারী 'বেদতীর্থ' উপাধিতে সমলঙ্কৃতা হইয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে কখনও কোন মহিলা পরীক্ষার্থিনী এই উপাধির দ্বারা ভূষিতা হন নাই।"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার ইংরেজী অভিভাষণে অধিকন্তু বলেন, যে, ছাত্রীটি অক্সফর্ডে ডক্টর অব ফিলসফি ("দর্শনাচার্য্য") উপাধি লাভের জন্য ইংলণ্ড যাইতেছেন এবং তন্নিমিত্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "ঘোষ ভ্রমণবৃত্তি" চারি হাজার টাকা পাইয়াছেন; মহিলাদের মধ্যে তিনিই প্রথমে এই বৃত্তি পাইয়াছেন।

এই মহিলা শ্রীমতী শকুন্তলা দেবী, এম্, এ। ইনি ইংরেজী ও সংস্কৃত এই দুই বিষয়ে এম্, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, এবং "শাস্ত্রী" উপাধি লাভের জন্য পরীক্ষা দিয়াছেন। তিনি প্রত্নতত্ত্ব অনুশীলনে নিযুক্ত হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাসিক এক শত টাকা বৃত্তি পাইয়াছিলেন। তিনি যেমন বিদুষী, সর্ব্বপ্রকার গৃহকর্ম্মে সেইরূপ নিপুণা। পিতা স্বর্গগত আচার্য্য হেমচন্দ্র সরকার মহাশয়ের বহুবর্ষব্যাপী পীড়ায় অসাধারণ সেবা করিয়া ভক্তি ও সেবাপরায়ণতারও পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

১৩৪১ পৌষ
সাবিত্রী শিক্ষালয়

কলিকাতার বাগবাজার অঞ্চলের সাবিত্রী শিক্ষালয় একটি বালিকা-বিদ্যালয়। প্রাচীনপন্থী হিন্দুরাই প্রধানতঃ এই অঞ্চলের বাসিন্দা। বিদ্যালয়টিতে এখন প্রায় তিন শত ছাত্রী পড়ে। আজকাল, কতকটা মত-পরিবর্ত্তন-বশতঃ, কতকটা অন্যান্য কারণে, হিন্দু বালিকাদেব আগেকার মত অল্প বয়সে বিবাহ হয় না। তাহাদিগকে অশিক্ষিত অবস্থায় বাড়িতে বসাইয়া রাখা উচিত নয়। এই জন্য কলিকাতায় বালিকা-বিদ্যালয়ের সংখ্যা দ্রুত বাড়িতেছে, নূতন পাড়াগুলিতে ত বাড়িতেছেই, পুরাতন পল্লীগুলিতেও বাড়িতেছে। সাবিত্রী শিক্ষালয়ে এরূপ বয়সের অনেক হিন্দু ছাত্রী দেখিয়া প্রীত হইলাম, আগেকার কালে যাহাদের নিশ্চয়ই বিবাহ হইয়া যাইত ও যাহারা নিরক্ষর থাকিত। ইহা বলিবার অর্থ এ নহে, যে, আমরা বিবাহের বিরোধী! বিবাহের আমরা বিরোধী ত নই-ই, বরং সুশিক্ষার পর উপযুক্ত ও অনধিক বয়সে বিবাহ হওয়াই স্বাভাবিক ও বাঞ্ছনীয় মনে করি।

১৩২১ শ্রাবণ
লেডী হার্ডিং।

স্বর্গীয়া লেডী হার্ডিংএর জন্য ভারতবাসীর শোক অকৃত্রিম। তিনি সাধ্বী পতিব্রতা ছিলেন। পতিব্রতাকে ভারতবর্ষ চিরকাল ভক্তি করিয়া আসিয়াছে। দিল্লীতে দরবারের সময় যখন লর্ড হার্ডিং বোমা দ্বারা আহত হন, তখন লেডী হার্ডিং অসামান্য ধৈর্য্য সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন। স্বামী যতদিন শয্যাগত ছিলেন, ততদিন সতত তাঁহার শয্যাপার্শ্বে থাকিয়া সেবা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার স্বামীর মত সদাশয় ও দয়ালু ছিলেন, এবং ভারতবর্ষকে ভালবাসিতেন। সমগ্র ভারতে বালকবালিকাদের একদিন আমোদ আহ্লাদের ব্যবস্থা তিনিই করিয়াছিলেন। তাহাতে হাঁসপাতালের বালকবালিকাদের এবং অন্ধ, বোবা কালা, খঞ্জ ও আতুরদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। পীড়ার সময় অসহায়া দরিদ্রা ভারতনারীদের চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষার বন্দোবস্তের জন্য তিনি সর্ব্বদা চেষ্টিত ছিলেন। তাঁহারই উদ্যোগে ভারতনারীদের চিকিৎসার জন্য কেবল মহিলা-ডাক্তারদিগকে লইয়া একটি স্বতন্ত্র চিকিৎসাবিভাগ গঠিত হইয়াছে। ইহার নিয়মাবলী প্রথমে এরূপ হইয়াছিল যে তাহাতে ভারতীয় মহিলা-ডাক্তারদের উহাতে প্রবেশলাভ কঠিন হইত। কিন্তু লেডী হার্ডিং পরে এই বাধা দূর করিয়াছেন। দিল্লীতে নারীদের শিক্ষার জন্য মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ তিনিই করেন। লর্ড হার্ডিংএর এই গভীর শোকের সময় তাঁহার জন্য প্রাণে বেদনা বোধ সকলেই করিবেন।

১৩২৫ চৈত্র

স্বর্গীয়া কৃষ্ণভাবিনী দাস।

ভারতনারীর চরিত্রে যাহা আছে, অন্য দেশের কোন নারীর চরিত্রে তাহা নাই, আমরা এমন কথা বলিতে পারি না। ভারতনারীর চরিত্রে যে মহৎগুণ আছে, তাহাই বলিতে চাই। আত্মবিলোপ, আত্মগোপন, আত্মোৎসর্গ, স্ত্রী, অশেষ সহিষ্ণুতা, সর্ব্বপ্রকার সাংসারিক কামনাশূন্য পবিত্রতা, অসংখ্য ভারতনারীর জীবনে দেখা গিয়াছে। ভারতনারীর এইসব গুণ ও পাশ্চাত্য নারীর সাহস, কর্ম্মিষ্ঠতা ও জন- হিতৈষণার সহিত মিলিত হইলে কি অপূর্ব্ব চরিত্র সংগঠিত হইবে, তাহা অনেকেই কল্পনা করিয়াছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাধনার মণিকাঞ্চনযোগ হইয়াছিল, প্রাতঃস্মরণীয়া কৃষ্ণভাবিনী দাস মহাশয়ার মহনীয় চরিত্রে। কি উজ্জ্বল পবিত্র পাবকশিখার মত মূর্ত্তি! আবার তাহাতে কত করুণা, কত কোমলতা, কত সরলতা! তাঁহার বয়স হইয়াছিল ষাটের কাছাকাছি, অথচ ঘোমটা-দেওয়া মুখখানি ছিল ক'নে বৌয়ের মত লজ্জাবিনয়নম্র ও কোমল। অন্য দিকে আবার তাঁহার স্বাধীনতাপ্রিয়তা ও তেজস্বিতা এমন ছিল যে তিনি তাঁহার বহুব্যয়সাধ্য নানা কার্য্যের জন্য সরকারী সাহায্য লইতে সর্ব্বদা বিমুখ ছিলেন। সাহস এমন ছিল যে বাঙালী অন্তঃপুরিকা হইয়াও পদব্রজে কলিকাতার জনাকীর্ণ পথ দিয়া কোথাও যাইতে তিনি দ্বিধা বোধ করিতেন না।

তাঁহার স্বামী সুপণ্ডিত অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের সহিত তিনি আট নয় বৎসর বিলাতে ছিলেন। তখনকার বিলাতপ্রবাসী অনেক বাঙ্গালী ব্রিটিশ মিউজিয়মের লাইব্রেরীতে তাঁহাকে দিনের পর দিন অধ্যয়নরত দেখিয়াছেন। দেশে ফিরিয়া আসিবার কিছুকাল পরে তাঁহার স্বামী সেঞ্চুরী স্কুল ও পরে সেঞ্চুরী কলেজ স্থাপন করেন। এই শিক্ষাদান-কার্য্যে তিনি তাঁহার স্বামীর প্রকৃত সহধর্ম্মিণী ছিলেন। স্বামীর ও একমাত্র কন্যার পরলোকগমনের পর শোকের আগুনে পুড়িয়া তাঁহার অন্তরস্থিত তপস্বিনী মাতৃমূর্ত্তি নির্ম্মল আভায় লোকচক্ষুর গোচর হয়। বহু অনাথ বালক বালিকা, বহু বিপথগামিনী নারী, বহু অজ্ঞ অন্তঃপুরিকা এই তপস্বিনী লোকমাতার স্নেহপ্রণোদিত সেবা পাইয়া ধন্য হইয়াছে।

ভারতস্ত্রীমহামণ্ডলের প্রধান কর্ম্মী তিনি ছিলেন, কিন্তু নিজের নাম জাহির করিবার চেষ্টা করা দূরে থাক্, গোপন করিবারই চেষ্টা করিতেন।

তিনি বহুলক্ষপতি পরলোকগত উকীল শ্রীনাথদাসের পুত্রবধূ ছিলেন। কিন্তু নিজের জন্য মাসিক ১৫্ টাকার অধিক খরচ করিতেন না। বিলাতে বহু বৎসর থাকিয়া বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক ছিলেন; কিন্তু পরিচ্ছদে বা সাধারণ কথাবার্তায় বিলাত-ফেরত বা ইংরেজী-শিক্ষিকা কিম্বা বিদুষী বলিয়া বুঝিবার জো ছিল না।

সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে টাকা সংগ্রহ করিয়া সর্ব্বজনহিতকর কাজ করিতে হইলে কিপ্রকার সন্দেহাতীত ভাবে কাজ করিতে হয়, তাহা তিনি জানিতেন। তাঁহার কোন কাজের জন্য কেহ কখন টাকা পাঠাইলে অবিলম্বে তাহার রসীদ দিতে ও হিসাব রাখিতে তিনি কখন অবহেলা করিতেন না।

তাঁহার চেহারায় জরার কোন চিহ্ন না থাকায় এবং তাঁহার অক্লান্ত শ্রমশীলতা মৃত্যুর

অল্পদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও বজায় থাকায়, আমরা কখন ভাবি নাই যে বঙ্গদেশ এত শীঘ্র তাঁহার সেবা ও পবিত্র জীবন হইতে বঞ্চিত হইবে। কিন্তু তাঁহার জন্য শোক করিব না। তিনি দিব্যধামে গিয়াছেন। কেবল এই প্রার্থনা করিব, যে, তাঁহার কাজ করিবার জন্য যেন বহুসংখ্যক বঙ্গনারী অগ্রসর হয়েন, এবং তাঁহার মত সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন।

১৩৩১ চৈত্র

কৃষ্ণভাবিনী স্মৃতিসভা

বিগত ২৮শে ফেব্রুয়ারী পরলোকগতা সাধ্বী কৃষ্ণভাবিনীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থ মহিলাদের একটি সভা হইয়াছিল। তাঁহার বহু সহকর্ম্মিণী বন্ধু ও ভক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। যাঁহারা নিজে উপস্থিত হইতে পারেন নাই তাঁহারা অনেক দূর হইতে শ্রদ্ধার অঞ্জলি নিবেদন করেন। সেদিন সভাতে মাননীয়া মহারাণী সুনীতি দেবীর প্রস্তাবে স্থির হইয়াছে যে, স্বর্গীয়া কৃষ্ণভাবিনীর স্মৃতিরক্ষার্থে মেয়েরা চাঁদা সংগ্রহ করিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বালিকাবিদ্যালয়টিকে কৃষ্ণভাবিনী বিদ্যালয়-নামে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিবেন। তাঁহার নামে অসহায়া বিধবাদের শিক্ষার জন্য একটি বা ততোধিক মাসিক বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা করা হউক এইরূপ আর-একটি প্রস্তাবও গৃহীত হয়।

যাঁহারা অর্থসাহায্য করিতে চান তাঁহারা নারীশিক্ষা সমিতির সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা অবলা বসুর নিকট (৯৩ আপার সারকুলার রোড কলিকাতা) অথবা কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয়ের নিকট টাকা পাঠাইতে পারেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয়ের স্বাক্ষরিত রসিদ সকলকে দেওয়া হইবে এবং কাগজে দাতাদের দান স্বীকার করা হইবে।

সভায় বহু প্রবন্ধ পঠিত হয়। একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাঁহার আদর্শ জীবন-সম্বন্ধে কিছু জানাইয়া স্মৃতিপূজার কার্য্য শেষ করিতেছি :—

"আজ যাঁহার শ্রাদ্ধবাসরে শ্রদ্ধার অঞ্জলি নিবেদন করিতে আসিয়াছি, তাঁহার সহিত আমার পরিচয় ঘনিষ্ঠ ছিল না, কিন্তু তাঁহার তেজস্বিনী তপস্বিনী মূর্ত্তি, তাঁহার কর্ম্মনিষ্ঠা, তাঁহার চরিত্রের মাধুর্য্য ও সৌজন্য, তাঁহার সেবা ও ত্যাগ আমাকে বহুদিন হইতেই মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। আমরা আজ বাঙালীর মেয়ে বলিতে যাঁহাদের দেখি ও বুঝি, তাঁহারা অধিকাংশই অতীতের উচ্চ আদর্শকে ভুলিয়া ভারত-নারীর গৌরব রক্ষা করিতে অক্ষম হইতেছেন, তাঁহারা অনেকেই সে পূর্ণ আদর্শের সহিত পরিচিতই নহেন। আবার পাশ্চাত্য জগতের নব-জাগ্রত আদর্শকেও তাঁহারা চিনেন না, তাই অবজ্ঞা-ভরে তাহাও উপেক্ষা করিয়া চলাই জীবনের লক্ষ্য বলিয়া অনেকে ভ্রম করেন। এজন্য তাঁহাদের দোষ দেওয়া চলেনা কারণ শিক্ষার অভাবই তাঁহাদের প্রাচ্য ও প্রতীচ্য-সম্বন্ধে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। এই অন্ধতা না ঘুচিলে ভারত নারীর দুঃখ ও সমস্যার অবসান হওয়া কঠিন হইবে। স্বর্গীয়া কৃষ্ণভাবিনী অতি আধুনিক

বাংলায় জন্ম গ্রহণ করেন নাই। যে যুগে তিনি বাংলার কোলে আসিয়াছিলেন, সে যুগের বঙ্গ-নারীর ভবিষ্যৎ এখনকার চেয়েও ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। তবু নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর গৃহে জন্মিয়া এবং শিশু বয়সেই নিষ্ঠাবান্ হিন্দু গৃহে বিবাহিত হইয়াও তিনি নারীর জীবনে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সকল আদর্শকে যথাসাধ্য নিপুণতার সঙ্গে একত্রে ফুটাইয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তপস্যার নিষ্ঠায় সেবায় ত্যাগে ও পাতিব্রত্যে হিন্দু-নারীর জীবনের আদর্শকে তিনি সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিলেন। শোক দুঃখ তাঁহার নিষ্ঠাকে, তাঁহার ত্যাগের আদর্শকে টলাইতে পারে নাই, অন্তর-লোকের সকল সংগ্রামেই তিনি জয়ী হইয়াছিলেন। কিন্তু শুধু তাহাই নহে। জীবনকে কেবলমাত্র নিজ গৃহের গণ্ডীতে আবদ্ধ রাখিয়া ত্যাগকে নিষ্ঠাকে কেবল পরিবারের সেবায় উৎসর্গ করিয়াই তিনি তৃপ্ত হন নাই। পাশ্চাত্যের আদর্শও তাঁহার জীবনে জ্বলন্ত হইয়াই দেখা দিয়াছিল। তিনি আপনার স্বাধীনতাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন স্বাধীন মুক্ত নারীর জীবনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া। কর্ম্মের পথের যে-সকল বাধা বাঙালীর মেয়েকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে, তাহা তিনি অনায়াসে অগ্রাহ্য করিয়া স্বীয় কর্ম্মজীবনকে সফল ও সুন্দর করিয়াছিলেন। তাঁহার হাতেই দেশের এত বড় একটা অনুষ্ঠান এমন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। অপমান, দারিদ্র্য, ঋণ, অন্ধ সংস্কার, ভীরুতা, অবরোধ, সমাজ-গ্লানি প্রভৃতি কত বাধা কতরূপে তাঁহার কর্ম্মের পথে পর্ব্বতের মতন আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু তেজস্বিনী মহীয়সী কৃষ্ণভাবিনীকে টলাইতে পারে নাই। অগ্রসর হইয়া চলাই যাঁহার জীবনের লক্ষ্য, কে তাঁহাকে ভয় দেখাইয়া পিছু হঠাইতে পারে? জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি আগেই চলিয়াছিলেন, শেষ দিন পর্য্যন্ত সেবায় ও কর্ম্মে জগৎকে ঋণী রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহারই জীবন ধন্য, তাঁহারই নারী-জন্ম সার্থক। তাঁহাকে স্বদেশবাসিনী বলিয়া স্মরণ করিতে গৌরবে মন ভরিয়া উঠে, শ্রদ্ধায়-ভক্তিতে হৃদয় নত হয়। জ্ঞানের সাহায্যে তাঁহার কথা বলিবার ক্ষমতা নাই, কিন্তু পূজার অর্ঘ্য দিয়া দূর হইতেই তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সম্মানিত হইতে আনন্দ অনুভব করিতেছি।"

—শ

১৩২৮ কার্ত্তিক

মহিলার প্রতি সৌজন্য

একজন মান্দ্রাজী ভদ্রলোক বেঙ্গালীতে লিখিয়াছেন যে, তিনি একদিন দেখিলেন যে, একটা ট্রামগাড়ীতে একটি শিক্ষিতা মহিলা গাড়ীর পা-দানীতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, পুরুষ যাত্রীরা কেহ উঠিয়া তাঁহাকে জায়গা ছাড়িয়া দেয় নাই! তিনি এই কারণে বাঙালীদের খুব নিন্দা করিয়াছেন, এবং জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, যে,বাঙালী লেখক ও বক্তারা, "যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যসেত রমন্তে তত্র দেবতাঃ" এই শাস্ত্রবচন উদ্ধার করিয়া ভারতে নারীর সম্মানের যে বড়াই করেন, এই ঘটনাটি

তাহার একটি দৃষ্টান্ত কি না?

মান্দ্রাজী ভদ্রলোকটির জানা উচিত, যে, যেমন পবিচ্ছদ পোষাকী ও আটপৌরে দু রকম থাকে, পোষাকটি বাহিরে যাইবার ও লোককে দে- ইবাব জন্য, আটপৌরেটি আর সব সময়ে ও উপলক্ষে ব্যবহারের নিমিত্ত, তেমনি আমাদের বক্তৃতা ও তর্ক হইতেছে পোষাকী, ব্যবহাব হইতেছে আটপৌরে। "আমাদের নারীরা দেবী", "নাবীরা যেখানে পূজিত হন, দেবতারা তথায় প্রীত থাকেন", "আমবা আধ্যাত্মিক জাতি ও পাশ্চাত্যেরা জড়ৈশ্বর্য্যের উপাসক", এই-সব কথা তর্কস্থলে উচ্চার্য্য, আমাদের আচরণের সহিত ইহাদের কোন সামঞ্জস্য রাখিবার আবশ্যক নাই। এই দেখুন না, যদি কোন বিদেশী লোক বলে, বঙ্গনারীর অবস্থা অবনত, অমনি কতকগুলি খবরের কাগজ কয়েকটি নামজাদা শিক্ষিতা মহিলার নাম আওড়াইয়া ঐ বিদেশীকে নিরুত্তর কবিবার চেষ্টা কবিবে, কিন্তু আবার অন্যসময়ে নারীদের উচ্চশিক্ষার নিন্দা এবং শিক্ষিতা নারীদের নিন্দা করিতেও ইহারা পশ্চাৎপদ হইবে না।

১৩২৯ কার্ত্তিক

মহিলার সাহস

১৯২১ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর দুপুর বেলা লালগোলা ঘাটের ষ্টেশনমাষ্টার বাবু গণেন্দ্রনাথ সরকারের আট বছরের মেয়ে নন্দরাণী পদ্মার তীর হইতে কয়েক হাত দূরে তাহাদের বাড়ীর বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া নদীর স্রোতের জল বহিয়া যাইতে দেখিতেছিল। সে বারাণ্ডার একটী বাঁশের খুঁটি এক হাতে ধরিয়া খেলাব ছলে যথাক্রমে সাম্‌নে ও পিছনে ঝুঁকিতেছিল। একবার এত জোরে সাম্‌নে ঝুঁকিল, যে, তাল সাম্‌লাইতে না পারিয়া সে একেবারে নদীর স্রোতে পড়িয়া গেল এবং স্রোতে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সৌভাগ্য ক্রমে তাহার দিদি শ্রীমতী কমলকুমারী নন্দী নিকটে ছিলেন। তিনি নিজের বিপদ গ্রাহ্য না করিয়া বিশেষ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও সাহসের সহিত নদীতে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন, এবং সাঁতার দিয়া তাঁহার ভগিনীর নিকট পৌঁছিয়া তাহাকে তীরে লইয়া আসিলেন। স্থানীয় রাজকর্ম্মচারীদের সুপারিসে এই ঘটনাটি রয়্যাল হিউমেন্ সোসাইটীর গোচর করা হয়। নিজেব মৃত্যুব সম্ভাবনা অগ্রাহ্য করিয়া কেহ অপরকে সাহসপূর্ব্বক আকস্মিক আসন্নমৃত্যু হইতে রক্ষা করিলে এই সমিতি তাঁহাকে পুরস্কৃত করিয়া থাকেন। সমিতি শ্রীমতী কমলকুমারী নন্দীকে তাঁহার সাহসের জন্য একটি প্রশংসা-পত্র দিয়াছেন।

১৩২৯ ফাল্গুন

মহিলা-মজ্‌লিস্

ভারতীয় মহিলা ব্যারিষ্টার

বোম্বাই এর আরদেশর টাটার কন্যা শ্রীমতী এম্‌ এ টাটা সম্প্রতি ব্যারিষ্টারীর সনদ লাভ করিয়াছেন। ভারতবাসীদের ভিতর তিনিই প্রথম মহিলা ব্যারিষ্টার। কেবলমাত্র ব্যারিষ্টারীর দিক্‌ দিযা নহে, ভারতীয় মহিলাদের ভিতব লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-এসসি ডিগ্রীও সর্ব্বপ্রথমে ইনি লাভ করিয়াছিলেন। ভাবতের পুরুষদের কর্ম্মক্ষেত্র এত ছোট যে, তাহার জন্য জাতিকে অনেক দুঃখ সহ্য করিতে হইতেছে। ভারতীয় রমণীদের কর্ম্মক্ষেত্র অন্তঃপুব ছাড়া নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এ দেশের রক্ষণশীলতার আবহাওযাও এমনি জমাট যে বাহিরের ঘরের কোন কাজে রমণীদিগকে হাত দিতে দেখিলে আমরা একেবারে আঁৎকাইয়া উঠি। এ অবস্থায় শ্রীমতী টাটা যে সম্পূর্ণ নূতন ধরনের কর্ম্মক্ষেত্র বাছিয়া লইয়াছেন, ইহা তাঁহার পক্ষে কম প্রশংসার বিষয় নহে।

শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায়

১৩৩০ ভাদ্র

শ্রীমতী মনোরমা বন্দ্যোপাধ্যায়

এলাহাবাদ হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রায় বাহাদুরের পত্নী এবং অল্পদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তথাকার প্রধান বিচারপতির পদে অধিষ্ঠিত স্যার্‌ প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্রবধূ শ্রীমতী মনোরমা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ার অকাল মৃত্যুতে প্রবাসী বাঙালী সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তাঁহার পিতা লাহোরের বিচারপতি স্যার্‌ প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু আগেই হইয়াছিল। তাঁহার পিতাকে কন্যাশোক পাইতে হয় নাই: কিন্তু শ্বশুর ও স্বামীকে শোক পাইতে হইল।

তিনি সাহিত্যানুরাগিণী ছিলেন, এবং তাঁহার নিজেরও লিপি-নৈপুণ্য ছিল। তিনি নিজের মত বেশ গুছাইয়া বলিতে পারিতেন। তাঁহার লিখিত চারিখানি পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে; যথা—"হেমলতা", "সমাজ বা দেশাচার" (নাটক), স্কট্ প্রণীত সার্জ্জেন্স্ ডটারের বঙ্গানুবাদ, এবং "জীবন-দর্পণ" (নাটক)। ইহার মধ্যে, কয়েকবৎসর পূর্ব্বে এলাহাবাদের পরলোকগত মনীষী ডাক্তার সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় "প্রবাসীতে" একখানি পুস্তকের (যতদূর মনে পড়িতেছে "সমাজ বা দেশাচার" নাটকের) সমালোচনা করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বহিখানির বেশ প্রশংসা করিয়াছিলেন। তাঁহার অপর একখানি নাটক অমুদ্রিত অবস্থায় পড়িবার সুযোগ আমরা পাইয়াছিলাম। তাহাতে লেখিকার নিজের মত

দৃঢ়তা ও সাহসের সহিত বিশদভাবে অভিব্যক্ত করিবার ক্ষমতার পরিচয় পাইয়াছিলাম। তিনি স্কটের সার্জ্জেন্স্ ডটারের অনুবাদ করিয়াছিলেন; ইহা হইতে তাঁহার ইংরেজীজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা যদি না করিতেন, তাহা হইলেও উক্ত অমুদ্রিত বহি হইতেও তাঁহার ইংরেজীজ্ঞানের প্রমাণ পাওয়া যাইত; যদিও তাহাতে তিনি কোথাও অকারণ অশোভনভাবে ইংরেজী কথাবার্ত্তার অবতারণা করেন নাই।

চিত্রাঙ্কনে তাঁহার অনুরাগ ছিল। জল-রং ও তৈল-রং দিয়া তিনি অনেক ছবি আঁকিয়াছিলেন। তা'ার মধ্যে "বসন্ত", "গ্রীষ্ম", "বর্ষা", "শরৎ", এবং কাশ্মীরের কয়েকটি দৃশ্য গত বৎসর সিমলা শিল্প প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইয়াছিল। ১৯২১ সালের মসূরী শিল্প প্রদর্শনীতে তাঁহার আঁকা কয়েকটি ছবি প্রদর্শিত হয়। ১৯১০-১১ সালে এলাহাবাদ প্রদর্শনীতে তিনি সূচিকার্য্যখচিত পর্দ্দার জন্য রৌপ্যপদক পাইয়াছিলেন। কযেক বৎসর পূর্ব্বের লাহোর প্রদর্শনীতে মাছের আঁশের ফুলের তোড়ার জন্য রৌপ্যপদক প্রাপ্ত হন।

এলাহাবাদ অঞ্চলে নারীশিক্ষার সহিত তাঁহার যোগ ছিল। এলাহাবাদের ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল তাঁহারই উদ্যোগে স্থাপিত হয়। তিনি উহার সম্পাদিকা ছিলেন। তিনি এলাহাবাদের অবৈতনিক ভারতীয় বালিকা বিদ্যালয়ের জয়েন্ট সেক্রেটারী, মহিলাদের পর্দ্দা ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ, এবং লেডী ডফারিন নারী হাঁসপাতালের কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির মেম্বর ছিলেন। বর্ত্তমান বৎসর মে মাসে তিনি জগৎ-তারণ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, এবং ইতিমধ্যেই তাহার জন্য কিছু কিছু কাজ করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের কুলবধূ ছিলেন, কিন্তু প্রয়োজন হইলে অন্তঃপুর ও অবরোধের বাহিরের উন্মুক্ত কার্য্যক্ষেত্রেও তাঁহাকে কাজ করিতে দেখা যাইত। তদুপযুক্ত শিক্ষা ঔদার্য্য ও দৃঢ়তা তাঁহার ছিল।

১৩৩৫ শ্রাবণ

লাহোরে "বব্‌ড হেয়ার"

লাহোরে কোন কোন হিন্দু মহিলার "বব্‌ড হেয়ার" অর্থাৎ ইউরোপীয় ফ্যাশনে ঘাড়ের কাছে ছাঁটা চুল দেখিয়া আমি আষাঢ়ের প্রবাসীর সম্পাদকের চিঠিতে লিখিয়াছিলাম যে, কেবলমাত্র একজন বাঙালী মহিলার এইরূপ চুল দেখিয়াছি। ইহা পড়িয়া কোন মহিলা আরও অনেক জনের নাম আমাকে জানাইয়াছেন। এখন বলিতে হইতেছে, আমি একাধিক বাঙালী মহিলার বব্‌ড হেয়ার দেখিয়াছি।

১৩৩৬ বৈশাখ
স্বর্গীয়া কৃষ্ণভাবিনী দাসী

চন্দননগরের শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ জনহিতকর কার্য্যে উৎসাহী, দাতা এবং লেখক বলিয়া বঙ্গে সুপরিচিত। তিনি যে তাঁহার মাতা স্বর্গীয়া কৃষ্ণভাবিনী দাসীর প্রভাবে সৎকর্ম্মানুরাগী হইয়াছেন, তাহা এযাবৎ জানা ছিল না। তাঁহার জননীর পরলোকগমনের পর জানা গিয়াছে, যে, তাঁহার প্রভাবের বশবর্ত্তী হইয়াই হরিহরবাবু চন্দন নগরের নারীশিক্ষা-মন্দিব, অঘোরচন্দ্র অবৈতনিক বালিকাবিদ্যালয়, নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দির নামক বৃহৎ পুস্তকালয়ের সৌধ, প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কৃষ্ণভাবিনী ভক্তিমতী, ধর্ম্মশীলা ও মধুরস্বভাবা ছিলেন।

১৩২৭ আষাঢ়
নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দির।

শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয় চন্দননগরে জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিস্তারের উদ্দেশ্যে পুস্তকসংগ্রহসমেত একটি সুন্দর অট্টালিকা তাঁহার পিতার নামে উৎসর্গ করিয়াছেন। এই নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দিরের উদ্বোধন-উৎসব গত ২রা জ্যৈষ্ঠ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নেতৃত্বে সম্পন্ন হয়। গৃহটি দুই অংশে বিভক্ত। সম্মুখের দ্বিতল অংশ পুস্তকসংগ্রহের ও পাঠকদের ব্যবহারের জন্য। হল, তাহার দুই পাশে বক্তাদের বিশ্রামের ঘর, এবং উপরে পুবমহিলাদের বসিবার স্থান, সভাসমিতির ও উৎসবাদির জন্য। হলে সাড়ে সাত শত শ্রোতার স্থান হয়। অট্টালিকাটির বাহিরের দৃশ্য এবং ভিতরের মূর্ত্তি আদি মনোরম। এই-সকলের পরিকল্পনা দাতা মহাশয়ের। গৃহটি নির্ম্মাণের ব্যয় পঞ্চাশ হাজার টাকার উপর হইয়াছে। পুস্তকালয়টি ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। ইহাতে বাংলা, ইংরেজী ও ফরাসী পুস্তক রাখা হয়। সভাসমিতির জন্য এইরূপ আয়তনের সুন্দর হল সম্বলিত এবম্বিধ পুস্তকালয় বাংলাদেশে অল্পই আছে বোধ হয়। শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয় ইহা সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য তিনজন ট্রাষ্টীর হাতে দিয়া পিতৃভক্তি ও জনহিতৈষণার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। জ্ঞানদানের মত দান আর নাই। ইহার অন্যতম উপায় অবলম্বন করিয়া হরিহরবাবু চন্দননগরের অধিবাসীদিগের এবং দেশবাসী সকলেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

১৩৩৮ অগ্রহায়ণ

হিন্দু অবলা আশ্রম

হিন্দু অবলা আশ্রমের পরিচালন ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত যে কমিটি গঠিত হইয়াছিল, তাহার রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। এই রিপোর্টে কমিটির সভ্য শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণী এবং শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ খৈতানেব স্বাক্ষব নাই। শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুবাণী এবং শ্রীযুক্ত প্রভুদয়াল হিমৎসিংকা কমিটির কার্য্যপ্রণালী ও রিপোর্ট সম্বন্ধে খবরের কাগজে আলাদা আলাদা চিঠি লিখিয়াছেন। এই সমুদয় বিবেচনা করিয়া, আশ্রমের পরিচালনায় কিছু কিছু বিশৃঙ্খলা এবং আশ্রমবাসিনী কাহারও কাহারও প্রতি অত্যাচার দুর্ব্ব্যবাহাব হইয়া থাকিলেও রিপোর্টে লিখিত সব কথা সত্য মনে হয় না। এই ধারণাও হয়, যে, কমিটিতে আশ্রমের সম্পাদক শ্রীযুক্ত পদ্মরাজ জৈনের প্রতি আগে হইতেই বিরুদ্ধভাবাপন্ন লোক ছিলেন। ইহা ঠিক হয় নাই।

ইহা নিশ্চয়, যে, আশ্রমটি এ পর্য্যন্ত যেভাবে পরিচালিত হইয়া আসিয়াছে, তাহা অপেক্ষা ভাল করিয়া চালান যাইতে পারে। সুপরিচালিত একটি আশ্রম একান্ত আবশ্যক। কিন্তু সে-বিষয়ে আমাদের বাঙালী হিন্দু নেতাদের ও সর্ব্বসাধারণেব দৃষ্টি আগে ছিল না—এখন অনেকে এ কাজে অর্থ সময় ও শক্তি দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন কি না, জানি না। হইয়া থাকিলে ভাল।

সম্প্রতি স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে হিন্দু অবলা আশ্রম সম্বন্ধে যে জনসভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে অসহায়া হিন্দু নারীদিগের জন্য একটি আশ্রমের ব্যবস্থা প্রণয়নের ভার রায় মহাশয়, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসুর উপর দেওয়া হইয়াছে। যে আশ্রমটি এখন আছে, তাহার সম্বন্ধে তদন্ত কমিটিব নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলির আমরা সমর্থন করি।

যে সকল বালিকাকে বেশ্যালয় বা ঘৃণ্য স্থান হইতে আনয়ন করা হয়, অথবা যাহারা ঘৃণিত জীবন যাপন করে, তাহাদিগকে অন্যান্য বালিকা হইতে পৃথক করিয়া রাখা একান্ত বাঞ্ছনীয়। ইহাতে অবশ্য ব্যয় বেশী হইবে, কিন্তু সম্ভবপর হইলে হিন্দু সমাজের উহা বহন করা কর্ত্তব্য।

(১) ম্যানেজিং কমিটীতে যাহাতে অধিকসংখ্যক মহিলা যোগদান করিয়া আশ্রমের কার্য্য সুপরিচালিত করেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে অনুরোধ করা কর্ত্তব্য।

(২) কম-বয়স্কা বালিকাদিগকে প্রাপ্তবয়স্কা নারীদের হইতে পৃথক রাখিতে হইবে। ইহাতে আশ্রমের ব্যয় বৃদ্ধি হইবে, কিন্তু এই উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যত শীঘ্র সম্ভব ঐ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

(৩) অপেক্ষাকৃত উত্তম ও সুবিধাজনক স্থানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। শহরের জনবহুল স্থানে উহা রাখা উচিত নহে।

(৪) আশ্রমে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের ব্যবস্থা করা দরকার। আশ্রমবাসিনীদের অবস্থানকালের স্থিরতা না থাকায় সম্ভবতঃ এই কার্য্য কঠিন হইবে, কিন্তু ইহার আবশ্যকতা আছে বলিয়া মনে হয়।

(৫) আশ্রমে অপেক্ষাকৃত উত্তম শিক্ষার

ব্যবস্থা বাখা কর্ত্তব্য। বর্ত্তমানে মাত্র অল্পবয়স্কা বালিকাদের শিক্ষার কিছু ব্যবস্থা আছে।

(৬) আশ্রমবাসিনীদের মন হইতে কাবার ভয় দূর করিতে হইবে। শারীরিক শাস্তিবিধান নিষিদ্ধ হওয়া উচিত।

(৭) কতিপয় বাহিরের মহিলাকে আশ্রম পরিদর্শনের কার্য্যে নিযুক্ত করা উচিত।

(৮) সম্ভবপর হইলে আশ্রমে সকল সময়ের জন্য একজন সম্পাদক রাখিতে হইবে।

(৯) সর্ব্বোপরি আশ্রমে নৈতিক ও ধর্ম্ম বিষয়ক আবহাওয়া সৃষ্টির চেষ্টা কবা কর্ত্তব্য।

উল্লিখিত কার্য্যপদ্ধতি অনুসাবে কাজ করিতে হইলে অর্থের আবশ্যক হইবে, কিন্তু প্রয়োজনীয়তার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া এজন্য হিন্দু সমাজের প্রস্তুত হওয়া উচিত।

বর্ত্তমান আশ্রমটি যদি টিকিয়া থাকে তাহা হইলে তাহাব কর্ত্তৃপক্ষ এই প্রস্তাবগুলি অনুসারে কাজ করিলে ফল ভালই হইবে। উহা যদি উঠিয়া যায়, তাহা হইলে যে আশ্রম স্থাপন করিবার প্রস্তাব হইতেছে, তাহা উদ্ধৃত প্রস্তাবাবলী অনুযায়ী নিয়ম অনুসাবে চালাইতে হইবে।

১৩৩৯ জ্যৈষ্ঠ

"সাবিত্রী"র ও "দেবী"র ভাগ্য

একটি আইরিশ স্ত্রীলোক, এখন বয়স ৫০, মিসটার জাফর আলী নামক একজন মুসলমানকে বিবাহ করিয়া মিসেস জাফর আলী হন। তিনি এলাহাবাদে একটি ফৌজদারী মোকদ্দমায় বিচারাধীন আছেন। মোকদ্দমার এক দিনের শুনানীর বিববণে দেখিলাম, তিনি ফিকা বেগুনী রঙের শাড়ী এবং কপালে সিঁদুরের ফোঁটা পরিয়া আদালতে হাজির হইয়াছিলেন। ভারতীয় মুসলমানের ইউরোপীয় পত্নীকে হালফ্যাশন-দুরস্ত হইতে হইলে সিঁদুর পরিতে হয় কিনা জানি না। কিন্তু দেখিতেছি, এই স্ত্রীলোকটির হিন্দুনারীদের অন্য দুটি জিনিষেও লোভ আছে। তিনি নাম লইয়াছেন "সাবিত্রী" এবং পদবী লইয়াছেন "দেবী"। এই নাম ও এই পদবী উভয়ই বেওয়ারিস্। সাবিত্রীর পিতামাতা যখন এই নাম রাখিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা ভাবেন নাই, তাঁহাদের প্রাতঃস্মরণীয় কন্যার নামের এমন অংশীদার জুটিবে এবং যাঁহারা প্রথমে নিজেদের মহিলাদিগকে "দেবী" আখ্যা দিয়াছিলেন তাঁহারাও ভাবেন নাই সিনেমায় ও অন্যত্র উহার নানা রকমের এত দাবীদার খাড়া হইবে।

১৩৪১ শ্রাবণ

বেগম সাহেবার নথ

পাশ্চাত্য দেশে আমাদের দেশের মহিলাদের কোন কোন অলঙ্কার সম্বন্ধে দেখিতেছি বেশ মজার ধারণা আছে। পায়ের মলকে পাশ্চাত্যেরা ভারতীয় মহিলাদিগকে শৃঙ্খলিত রাখিবার জন্য বেড়ী মনে করে কিনা, জানি না, কিন্তু নথ সম্বন্ধে বিলাতী ডেলী এক্সপ্রেস কাগজে একটা কৌতুকাবহ কথা বাহির হইয়াছে। ঐ কাগজে অধুনা বিলাতপ্রবাসিনী রামপুরের নবাবের বেগম সাহেবা সম্বন্ধে এক সংবাদদাত্রীর লিখিত এই কথাগুলি বাহির হইয়াছে—

She seems to have stepped straight from the fairy-tale print of the Peris with Liquid brown eyes like moons, the skin of a rose, and hair more blue than black.

She writes poetry, but may not talk much in front of the Nawab.

"I visit the Maternity Hospital in Rampur," she told me, "and I started the child welfare there. Sometimes the Nawab's Ministers and his elderly intimate friends call on me, but I never appear with him in public. My rooms are in a wing of the palace facing a little garden."

She has stepped out of that garden for the first time without her veil. She has gone all over Europe during the last two months. Seen Berlin, Vienna, Prague, Rome, Paris, been in theatres, restaurants, shops, and aeroplanes, and enjoyed all with such demure unconcern that no one has guessed she only knew shuttered rooms before.

She meekly follows her husband's lead and laughs happily with a diamond set and twinkling in her nose. If she were in Rampur City that diamond would be replaced by a gold loop which all married women obediently wear for their husbands to pull them by the nose

In England the Nawab does not do it because there it is said the S. P. C. A. is much more efficient than in India!

তাৎপর্য্য। মনে হয় তিনি যেন উপকথার পরীদের চিত্র থেকে সদ্য সদ্য সোজা পা বাড়িয়ে বেরিয়ে এসেছেন ঢলঢলে চন্দ্রাকৃতি পিঙ্গল চোখ, গোলাপ-পাপড়ির মত কোমল গোলাপী রঙের ত্বক্ এবং কৃষ্ণাভ সুনীল কেশদাম নিয়ে।

তিনি কবিতা লেখেন, কিন্তু নবাবের সম্মুখে তাঁর বেশী কথা কইতে নেই।

তিনি আমাকে বললেন, "আমি রামপুরে প্রসূতি-আগার পরিদর্শন করি, এবং সেখানকার শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানও আমি স্থাপিত করেছি। কখন কখন নবাবের মন্ত্রীরা এবং তাঁহার প্রবীণ অন্তরঙ্গ বন্ধুরা আমার সঙ্গে দেখা করেন, কিন্তু আমি তাঁর সঙ্গে প্রকাশ্যে কখনও বেরোই না। আমার কক্ষগুলি প্রাসাদের একটি পার্শ্বে একটি ছোট বাগানের সামনে।"

তিনি বিনা অবগুণ্ঠনে এই প্রথম সেই বাগান থেকে বের হয়েছেন। গত দু-মাসে তিনি ইউরোপের সর্ব্বত্র বেড়িয়েছেন। বার্লিন, ভিয়েনা, প্রাগ, রোম, প্যারিস দেখেছেন, থিয়েটার রেস্তোরাতে দোকানে গেছেন, এরোপ্লেনে চড়েছেন; এবং সবই এমন গম্ভীর অব্যগ্রতার সঙ্গে উপভোগ করেছেন, যে, কেউ ভাবতেও পারে নাই, যে, তিনি এর আগে কেবল খড়খড়ি

ঝিলমিলি লাগান কামরার সঙ্গেই পরিচিত ছিলেন।

তিনি বিনম্র ভাবে তাঁর স্বামীর পিছনে পিছনে চলেন এবং আনন্দে হাস্য করেন— নাকে বসানো হীরকখণ্ড ঝিক্‌মিক্ করতে থাকে। [এটি বোধ হয় বেগম সাহেবের হীরার নাকছাবির উল্লেখ। প্রবাসীর সম্পাদক।] তিনি যদি রামপুর শহরে থাকতেন, তা হ'লে ঐ হীরাটির পরিবর্ত্তে একটি সোনার "লুপ" [অর্থাৎ নথ] পরতেন—যা সব বিবাহিতা মহিলারা বশ্যতার সহিত পরেন, তাঁদের স্বামীদের তাঁদের নাক ধরে টান দেবার সুবিধার জন্যে।

ইংলণ্ডে নবাব এ রকম টান দেন না, কেন না, লোকে বলে, ইংলণ্ডে পশুক্লেশনিবারিণী সভা ভারতবর্ষের চেয়ে বেশী কার্য্যক্ষম!

বিলাতী ডেলী এক্সপ্রেসের সংবাদদাত্রী বেগম সাহেবার যেরূপ বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে, শুধু রূপসী নহে, বেশ গুণশালিনী ও বুদ্ধিমতী বলিয়াই মনে হয়। এরূপ মহিলার নাকের নথ ধরিয়া টান দিবার দরকার নবাব সাহেবের হইতেও পারে, ইহা সংবাদদাত্রীর উৎকট কল্পনা বটে!

১৩৪১ ফাল্গুন

শ্রীমতী হালিদে এদীব্ হানুম

তুরস্কের প্রসিদ্ধ লেখিকা ও স্বজাতির স্বাধীনতা প্রচেষ্টার অন্যতম নেত্রী ভারতবর্ষে আসিয়া নানা স্থানে বক্তৃতা করিতেছেন। তাঁহার জীবন আত্মোৎসর্গ ও দুঃখবরণের দৃষ্টান্তে পূর্ণ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও তাঁহার বক্তৃতা হইবে। সম্ভবতঃ এখানকার ভারতীয় মহিলারা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিবেন।

১৩৪২ আশ্বিন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপিকা

ইহা আনন্দের বিষয়, যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব পরীক্ষায় যিনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই কুমারী করুণাকণা গুপ্তা তথায় ইতিহাসের লেকচারার নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি ছাত্রীরূপে যেরূপ কৃতী হইয়াছিলেন, অধ্যাপিকারূপেও সেই সিদ্ধিলাভ করুন, আমাদের অভিলাষ এইরূপ।

১৩৪৬ ভাদ্র

স্বর্গতা শ্রীযুক্তা লেডী নির্ম্মলা সরকার

ডাক্তাব সব্ নীলবতন সরকার মহাশয়ের সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা লেডী নির্মলা সরকার মহোদয়া গত ১লা আগস্ট দেহত্যাগ করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম আচার্য্য ও নেতা স্বর্গত গিরিশচন্দ্র মজুমদাব মহাশয়ের তিনি জ্যেষ্ঠা কন্যা। তাঁহার মাতা স্বর্গতা শ্রীযুক্তা মনোরমা মজুমদার নারীশিক্ষার বিশেষ উৎসাহিনী ছিলেন এবং এদেশে বালিকা-বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কাজ তিনিই প্রথম করেন। এই জন্য ভারত-সচিব তাঁহার নিমিত্ত বিশেষ পেন্স্যানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। জনহিতকর কার্য্যে উৎসাহী ধর্মশীল পিতামাতার গৃহে শিক্ষা পাইয়া লেডী সরকার নানা পারিবারিক ও অন্যবিধ সদ্‌গুণের অধিকারিণী হইয়াছিলেন। তাঁহার স্বামীর খ্যাতি ও অসাধারণ কৃতিত্ব তাঁহাকে অহঙ্কৃত করে নাই। তাঁহার ব্যবহার আজীবন অনাড়ম্বর, সৌজন্যপূর্ণ, সরল ও অমায়িক ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের ও বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সহিত তাঁহার হৃদগত ও আচরণগত যোগ ছিল। বন্যা ভূমিকম্প প্রভৃতিতে বিপন্ন লোকদের সাহায্য করিবার নিমিত্ত তিনি বিস্তর শ্রম করিয়াছিলেন।

ছয় বৎসর পূর্ব্বে সেপ্টেম্বর মাসে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে যে স্বদেশী জিনিষের প্রদর্শনী হয়, তাহার দ্বার মোচন শ্রীযুক্তা নির্মলা সরকার করেন। সেই উপলক্ষ্যে তাঁহার অভিভাষণে তিনি বলেন :—

"আর্থিক দুর্য্যোগের তীব্র পেষণে নিষ্পেষিত হইয়া আমাদের দেশের কত হতভাগ্য নরনারী অভাবে, অনাহারে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, তাহা অবর্ণনীয়। ইহার একমাত্র প্রতিকার শিক্ষার বিস্তার এবং শিল্পের প্রচার।

"বিদেশী পণ্য বর্জ্জনই স্বাদেশিকতার যথেষ্ট পরিচয় নয়। স্বদেশী জিনিষ প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করিয়া লোকের মনে উৎসাহ বর্দ্ধন করা এবং অলস ও অকর্ম্মণ্য জীবনের দুর্দ্দশা দূর করাই আসল স্বাদেশিকতা। স্বদেশী প্রচারই শিল্পপ্রদর্শনীর মুখ্য উদ্দেশ্য। আমাদের জীবনমরণের এই সন্ধিক্ষণে আমাদের সকলেরই বিলাসসামগ্রী পরিত্যাগ করিয়া মায়ের দেওয়া মোটা ভাত আহার করিয়া ও মোটা কাপড় পরিয়া শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অর্থোন্নতি করার জন্য দৃঢ়মনে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে। স্বদেশী ব্যতীত অন্য পথ নাই।"

তিনি আরও বলেন :—

"বিদেশী বণিক্‌দের লুণ্ঠননীতির ফলে আর্থিক জগতে যে দুর্য্যোগের সৃষ্টি হইয়াছে, আন্তর্জাতিক যুদ্ধবিগ্রহ এবং ধনিক ও শ্রমিকদের অবিরাম বিবাদ তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল। আমাদের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের আদর্শ ও কার্য্যপ্রণালীর মধ্যে অপর দেশের বাজার লুণ্ঠন করিবার প্রবৃত্তি পোষিত হয় না। ভারতের কুটীরশিল্পে শ্রমিকের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য আরাধনা করিবার ইচ্ছা পূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়াছে। আমাদের দেশে ব্যবসাবাণিজ্য শিল্প প্রভৃতির যে বিস্তারপ্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে, তাহার মূলীভূত উদ্দেশ্য হইতেছে, দেশের দারিদ্র্য দূর করা, দেশকে অবনতির পথ হইতে রক্ষা করা। অপরের অনিষ্ট না করিয়া নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখাই আমাদের বৈশিষ্ট্য, আমাদের উদ্দেশ্য।"

তাঁহাব এই সব কথা এখনও পুরাতন হয়

নাই। তখন তিনি যে আর একটি কথা বলিয়াছিলেন, তাহার সত্যতা বাঙালীবা এখন ভাল করিযাই উপলব্ধি কবিতেছেন। তিনি বলিয়াছিলেন .

"বাঙালীকে বাঙালী রক্ষা না করিলে কে রক্ষা করিবে?"

তিনি আরও বলেন :—

"আমাদের ভবিষ্যদ্বংশীয় তরুণতরুণীদিগকে ইহাই বলিতে চাই. যে, তাঁহারা যেন ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া স্বাধীনভাবে জীবনসংগ্রামে জীবিকা নির্বাহের উপায় নির্দ্ধাবণ করিতে শেখেন। অন্ধ অনুকরণের যুগ চলিয়া গিয়াছে। এই ভীষণ প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার দিনে আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা একান্ত আবশ্যক।"

তাঁহার কর্ম্মিষ্ঠতা অধিকাংশ সময় গৃহপরিবারেব মধ্যে আবদ্ধ থাকিত। তথাপি তিনি আর একবাব সার্বজনিত কাজে নেত্রীত্ব করিয়াছিলেন, পুরাতন কাগজপত্র হইতে দেখিতেছি। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনে তিনি সভানেত্রীর কাজ করেন। সেই উপলক্ষে পঠিত তাঁহাব অভিভাষণটি তথ্যপূর্ণ ও মননশীলতার পরিচায়ক। তাহাতে তিনি স্ত্রীশিক্ষার নানা বাধার আলোচনা করেন এবং নারীদিগের শিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত সে বিষয়ে যুক্তিসহ নিজের মত ব্যক্ত করেন।

সংগীত অভিনয় নৃত্য

১৩১৮ বৈশাখ
[শৈশবেই বিস্ময়কর সঙ্গীত-প্রতিভাধর মোজার্ট]

সঙ্গীত-বিদ্যাবিশারদ মোজার্টের নাম অনেকেই জানেন। কথিত আছে যে শিশু মোজার্ট ছয় বৎসর বয়সেই নিজ অপূর্ব্ব শক্তিতে লোককে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। পনের বৎসর বয়সে তিনি একটি বিখ্যাত সঙ্গীত-সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার এই অকালপক্কতা ভবিষ্যতে তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা বিকাশের সূচনা করিয়াছিল মাত্র। যেমন সঙ্গীতে সেইরূপ অন্যান্য অনেক বিদ্যাতেও মানুষের অল্পবয়সে বিস্ময়কর প্রতিভা ও পারদর্শিতার পরিচয় কখনও কখনও পাওয়া গিয়া থাকে। ইহার কারণ-নির্ণয় বৈজ্ঞানিকের কাজ। অনেকে পূর্ব্বজন্মের কথা বলিয়া আপনাদিগকে ও অন্য লোককে বুঝাইতে চেষ্টা করেন। কিন্তু এরূপ ব্যাখ্যা দুইটি কারণে সন্তোষ উৎপাদন করে না। প্রথমতঃ, এই ব্যাখ্যা পরীক্ষণ বা পর্য্যবেক্ষণ-প্রসূত নহে, এবং পরীক্ষণ বা পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা ইহার যাথার্থ্যের পরখও করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, গোড়াতেই এই আপত্তি উঠে যে অতীতকালে ও বর্ত্তমানে আমরা একই সময়ে নানা দেশে অনেক অসামান্যশক্তিশালী মানুষ দেখিতে পাই। ইহাদের সকলেরই পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়া অসাধারণশক্তি-সম্পন্ন শিশু হওয়া উচিত। কিন্তু তাহা হয় না, আমরা এরূপ অনেক শিশু দেখিতে পাই না, এরূপ শিশু ক্বচিৎ দুই একটি দেখি মাত্র।

আমাদের দেশে সঙ্গীতে সম্প্রতি এইরূপ দুইটি শিশু দেখা গিয়াছে। তন্মধ্যে মদন নামক বালকটির কথা সংবাদপত্রে বাহির হইয়াছে। দ্বিতীয় একটি বালিকা; নাম মনোরমা, বয়স ছয় বৎসর। এই শিশুটি ভাগলপুরের উকীলবাবু উপেন্দ্রনাথ বার্‌চি মহাশয়ের পৌত্রী। মনোরমা ৩১/২ বৎসর বয়সেই তাহার সঙ্গীতশক্তির পরিচয় দিয়াছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে সে কলিকাতার অনেক ভদ্র গৃহে মজলিসে বিশেষজ্ঞ লোকদের সমক্ষে কঠিন কঠিন গান গাহিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছে।

১৩১৮ চৈত্র
[সঙ্গীতে সুশিক্ষিতা সত্যবালা দেবী]

বঙ্গদুহিতা শ্রীমতী সত্যবালা দেবী আমেরিকায় গিয়া কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতে দক্ষতা দেখাইয়া যশলাভ করিয়াছেন। মহীশূরের ইণ্ডিয়ান্ ম্যুজিক্যাল জর্নেলে তাঁহার বংশাদির পরিচয় বাহির হইয়াছে, তিনি কামাখ্যানাথ চট্টোপাধ্যায় নামক এক জমিদারের পৌত্রী। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে বেলুড়ে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র সন্তান ছিল না। তিনি এই কন্যাকে সুশিক্ষিত করেন। কন্যার ৮ বৎসর বয়সের সময় তাহাকে সঙ্গে লইয়া তিনি সমুদয় হিন্দুতীর্থে ভ্রমণ করেন। কন্যা

১৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বেথুন স্কুলে পড়েন। সংগীত ও ধর্ম্মতত্ত্বে তিনি সুশিক্ষা লাভ করেন। তিনি মহারাষ্ট্রীয় শাস্ত্রীদের নিকট সংস্কৃতে লিখিত প্রাচীন সংগীত রত্নাকর ও সংগীত-পারিজাত পাঠ করেন, এবং কাশীর পণ্ডিত দুর্গাশঙ্কর শাস্ত্রীব নিকট সামবেদ অধ্যয়ন করেন ও বিশুদ্ধভাবে আবৃত্তি করিতে শিখেন। তিনি বীণাবাদনে সুদক্ষা। বীণাবাদন বড়ই কঠিন। বার বৎসরের কম সময়ে ইহা আয়ত্ত করা দুঃসাধ্য। তিনি সংস্কৃত, বাঙ্গালা, গুজরাটী, মারাঠী, পাঞ্জাবী, হিন্দী, ফারসী, তামিল ও ইংরাজী জানেন।

১৩২১ আষাঢ়

মহারাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

সত্তর বৎসরের অধিক বয়সে মহারাজা সার্ শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি সঙ্গীতের উৎসাহদাতা বলিয়া দেশবিদেশে বিখ্যাত ছিলেন। এখন দেশে ভারতীয় সঙ্গীতের যে আদর ও চর্চ্চা দেখা যাইতেছে, তাঁহার চেষ্টা, উৎসাহ ও অর্থব্যয় তাহার মূলে। তিনি সঙ্গীতানুরাগী না হইলে সংগীতের অনুশীলন এখন যে অবস্থায় পৌঁছিয়াছে, তাহা সম্ভব হইত না। তিনি অনেক প্রসিদ্ধ ওস্তাদের দ্বারা সঙ্গীতবিষয়ক পুস্তক রচনা করান, এবং দেশীয় সঙ্গীতের স্বরলিপি ও নূতন যন্ত্র রচনা করান। সম্মানস্বরূপ অক্সফর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সঙ্গীতাচার্য্য (Doctor of Music) উপাধি প্রদান করেন। বোধহয় এমন কোন সভ্য দেশ নাই যেখান হইতে তিনি সম্মানসূচক উপাধি না পাইয়াছেন।

১৩৩১ চৈত্র

পরলোকে শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী

বিষ্ণুপুব-নিবাসী সঙ্গীত-বিশারদ শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী মহাশয় গত ২৩শে মাঘ বৃহস্পতিবার বেলা দেড় ঘটিকার সময় ইহলোক ত্যাগ করিয়া নিত্যধামে চলিয়া গিয়াছেন। লক্ষ্ণৌ সঙ্গীত-কনফারেন্স হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি বিষ্ণুপুব গমন করেন এবং তথায় ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার বয়স ৬৫ বৎসর হইয়াছিল।

তিনি বাঙ্গালার গৌরব ছিলেন; তাঁহার মৃত্যুতে বাংলা একজন বিখ্যাত সঙ্গীতাচার্য্য হারাইল। রাধিকাপ্রসাদ মৃদঙ্গ-বিশারদ স্বর্গীয় জগচ্চন্দ্র গোস্বামী

মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র ছিলেন।

পঞ্চম বৎসর বয়সে বিদ্যারম্ভ হইলে তিনি বিষ্ণুপুরের বঙ্গ-বিদ্যালয়ে একাদশ বৎসর পর্য্যন্ত পাঠ করেন। কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে বঙ্গ-বিদ্যালয়ের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতর জীবন যাপন করিবার জন্য সৃষ্টি করেন নাই। সুরের মহিমা মানবের মনের গোচর করিবার নিমিত্ত ভাগ্য-দেবতা ধীরে-ধীরে তাঁহাকে সঙ্গীতের দিকে লইয়া চলিলেন।

অতি অল্প বয়স হইতেই গোস্বামী মহাশয় কণ্ঠসঙ্গীতের প্রতি স্বভাবতঃ অনুরক্ত ছিলেন। ইহা দেখিয়া পিতা জগচ্চন্দ্র গোস্বামী এই-বালকের সঙ্গীত-শিক্ষার ভার তৎকালীন অদ্বিতীয় গায়ক স্বর্গীয় অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর ন্যস্ত করেন। অনন্তলাল এই বালককে নিজের পুত্রের ন্যায় অতি যত্নে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। সঙ্গীতগুরু অনন্তলালের নিকট রাধিকাপ্রসাদ ১১ বৎসর হইতে ১৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সঙ্গীত শিক্ষা করেন। তিনি তাঁহার গুরুদেবের সেই সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর এবং পারদর্শিতা বহু পরিমাণে অনুকরণ করিয়াছিলেন [।] তাঁহার পরিণত-বয়সে তাহার পূর্ণ স্ফূর্ত্তি দেখিয়া লোকে মুগ্ধ হইয়াছিল।

সঙ্গীত-শাস্ত্রে রীতিমত দক্ষতা লাভ করিয়া ২৫ বৎসর বয়সে তিনি কলিকাতায় আসিয়া, আদি-ব্রাহ্মসমাজে গায়কের পদে নিযুক্ত হন। কলিকাতায় থাকিয়া তিনি এই সময়ে গুরুপ্রসাদ মিশ্র, শিবনারায়ণ মিশ্র এবং গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর (নুলোগোপাল) নিকট অনেক গান সংগ্রহ করেন। ঐ-সময়ে কলিকাতায় প্রসিদ্ধ ভারত সঙ্গীত- সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, তথায় তিনি সঙ্গীতাচার্য্যের পদ গ্রহণ করিয়া বিশেষ দক্ষতার সহিত ছয় বৎসর কাল কাজ করেন। অনন্তর মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয় তাঁহার অনুপম সঙ্গীত-পারদর্শিতার পরিচয় পাইয়া, গোস্বামী-মহাশয়কে কাশিমবাজারে আনয়ন করিয়া সেখানকার সঙ্গীত বিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত করেন। বহুদিন যাবৎ কাশিমবাজারে থাকিয়া, তিনি মাত্র ৩ বৎসর কাল কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। কাশিমবাজারে অবস্থিতি-কালে তিনি কয়েকজন ছাত্রকে উত্তমরূপে শিক্ষা দিয়াছিলেন।

শ্রীঃ—

১৩৩২ বৈশাখ

সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রী অমরেশচন্দ্র সিংহ

যেদিন বিশ্ববীণার তারে প্রথম সুর ঝঙ্কৃত হইয়াছিল, সেইদিনই মানবের অন্তররাজ্য প্রতিসুরের কলরোলে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। সেই মাহেন্দ্রক্ষণে বিশ্বের সুর মানবের কণ্ঠে ধরা দিয়াছিল। সেই আদিম সুরকে প্রস্ফুটিত করিয়া একটি অপূর্ব্ব রঙে রঞ্জিত করিয়া মোহনরূপে প্রকাশ করা শিল্পীর শ্রেষ্ঠ সাধনা। তাহা সঙ্গীতে হউক বা চিত্রে হউক বা কাব্যে হউক, সেই সাধনার চরিতার্থতা অনন্তে বিহার। সর্ব্ববিধ চারুকলা হইতে আমরা যেন কিছু-একটা জিনিষ আহরণ করিয়া উপভোগ করিয়া থাকি যেটা অনন্তের অসীমের অভিব্যঞ্জনা; প্রাণ সেখানে সমগ্র বিশ্বকে সত্য সুন্দরকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিবার জন্য খুলিয়া গিয়াছে। শ্রেষ্ঠ শিল্পী তিনি, যিনি শব্দের দ্বারা, ভাষার দ্বারা, সুরের দ্বারা,

রেখার দ্বারা ভূমার অচিন্ত্য মূর্ত্তিকে মানবের অন্তশ্চক্ষুব সম্মুখে ফুটাইয়া ধরেন। বাঙ্গালার এইপ্রকাব সার্ব্বভৌমিক শিল্পীদেব মধ্যে সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত গোপেশ্বব বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম।

বিষ্ণুপুর-নিবাসী প্রসিদ্ধ গায়ক স্বর্গীয় অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশযের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৮৬ সালের ২৫শে পৌষ জন্মগ্রহণ কবেন। শ্রীযুক্তা কৃপাময়ী দেবী ইঁহার জননী। শ্রীযুক্ত গোপেশ্বব জনকের আশ্চর্য্য সঙ্গীত-অনুবাগ এবং জননীব অপূর্ব্ব কোমল হৃদয় উত্তবাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছেন।

প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের জীবনলীলা অতি বৈচিত্র্য-পূর্ণ। যখন শিশু ছিলেন, তখনই শ্রীযুক্ত গোপেশ্ববেব আশ্চর্য্য প্রতিভা, অলৌকিক মেধা ও অদ্বিতীয় বোধশক্তি দেখিযা সকলেই বুঝিয়াছিলেন যে, ভারতী তাঁহার প্রশস্ত ললাটে গৌরবের চন্দনটীকা পরাইয়া দিয়া পৃথিবীতে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। শৈশব-কালেই তাঁহার মধুর কণ্ঠে সুরের অপূর্ব্ব খেলা দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইয়াছিলেন। যখন তাঁহার বয়স পাঁচ বৎসর মাত্র তখনই তিনি ললিতকণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে গান গাহিতেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞও এই বালকের বেসুর কিংবা বেতাল লক্ষ্য করিতে পারেন নাই।

বিষ্ণুপুরাধিপতি মহারাজ গোপাল সিংহেব পুত্র সঙ্গীতানুরাগী মহারাজ রামকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুর বিষ্ণুপুরে একটি সঙ্গীতবিদ্যালয় স্থাপন করেন। শ্রীযুক্ত অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সঙ্গীতাচার্য্যরূপে মনোনীত হইয়া বহুসংখ্যক ছাত্রের মনোরঞ্জন কবিয়া সঙ্গীতশাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব বিশেষ যত্নে শিক্ষা দিতেন। শ্রীযুক্ত গোপেশ্বরও পাঁচ বৎসর বয়সে হাতেখড়ির পর বিদ্যারম্ভ করেন; এবং সেই সঙ্গে-সঙ্গেই পিতার নিকটে তাঁহার সঙ্গীতশাস্ত্রের সহিত একান্ত পরিচয় আরম্ভ হইল। সঙ্গীতশিক্ষায় তাঁহার প্রগাঢ় ঔৎসুক্য ও অশেষ যত্ন বাল্য হইতেই প্রকাশ পাইয়াছিল। বিদ্যালয়ের অল্পক্ষণ চর্চ্চা তাঁহার মনঃপূত হইত না, তিনি গৃহে আসিয়াও পিতার নিকট একাদিক্রমে তিন-চার ঘণ্টা ৺মদনমোহন জীউব মন্দিরের নির্জ্জন স্থানে একনিষ্ঠ তপস্বীর ন্যায় সঙ্গীতসাধনায় বিভোর থাকিতেন। প্রাচীন গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, তানসেনের সঙ্গীত সেই সময় সর্ব্বাপেক্ষা শ্রুতিমধুব হইত যখন তিনি তাঁহার গুরুদেবের সম্মুখে সঙ্গীতালাপ করিতেন।

শ্রীযুক্ত গোপেশ্বব এইপ্রকারে অনন্যসাধনায় তন্ময় থাকিযা পিতাব নিকটে ১৩ বৎসব সঙ্গীত শিক্ষা কবেন। এই অল্প-সময়ে প্রায় পঞ্চ সহস্র রাগরাগিণীপূর্ণ সঙ্গীত তিনি আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

যখন ৯ বৎসর মাত্র বয়স তখন শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর একবার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। বালকের কণ্ঠে মধুর সঙ্গীত শ্রবণে শত-শত ব্যক্তি মুগ্ধ হইয়াছিল, ব্রহ্মদেশীয় জনৈক বিশিষ্ট ধনী তাঁহার সঙ্গীতে এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন, যে, তিনি অন্যান্য সকলকে বালকের অদ্ভুত শক্তি দেখাইবার জন্য অতীব ব্যগ্র হইয়া উঠেন। তিনি কয়েক দিনের জন্য মিনার্ভা থিয়েটার-হলে এই বালকের মধুর সঙ্গীতে অসংখ্য জনতার মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন এবং ক্রমে শ্রীযুক্ত গোপেশ্বরের নাম চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। সেই সময়ে বিখ্যাত মৃদঙ্গী ৺মুরাবীমোহন গুপ্ত মহাশয়ের প্রিয় শিষ্য শ্রীযুক্ত সত্য গুপ্ত মহাশয় প্রত্যেক স্থানেই শ্রীযুক্ত গোপেশ্বরের সাথী হইতেন এবং তাঁহার সহিত মৃদঙ্গ বাজাইয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন। খ্যাতনামা মৃদঙ্গী শ্রীযুক্ত গোপাল মল্লিক ইঁহার সঙ্গ করিয়া উচ্চকণ্ঠে ইঁহার প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং, ভবিষ্যতে শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর যে অসাধারণ গায়ক হইবেন তাহা প্রকাশ করেন। হিন্দী সঙ্গীতে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য গোপেশ্বর হিন্দী শিক্ষা করেন। তাঁহার রচিত অনেক ধ্রুপদ এবং খেয়ালী হিন্দী-সঙ্গীতে তাঁহার হিন্দী ভাষায় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য প্রকাশ পায়।

বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহ্‌তাব বাহাদুর শ্রীযুক্ত গোপেশ্বরের সঙ্গীতে মুগ্ধ

হইয়া রাজ-দরবারের গায়ক-পদে তাঁহাকে নিযুক্ত করিযাছিলেন। তখন শ্রীযুক্ত গোপেশ্বরের বয়স ২৮ বৎসর মাত্র।

স্বর্গীয় স্যার আশুতোষ চৌধুরী এবং তাঁহার পত্নী স্বর্গীয়া প্রতিভা দেবীর যত্নে এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে বাংলায় সঙ্গীতবিদ্যার উন্নতি ও প্রচারের জন্য 'সঙ্গীত-সঙ্ঘ' স্থাপিত হয়। প্রথমে স্বর্গীয় বিশ্বনাথ রাও মহাশয় ইহার আচার্য্যপদ ভূষিত কবিয়াছিলেন। পবে তিনি অসুস্থতাবশতঃ কর্ম্মত্যাগ করিলে শ্রীযুক্ত প্রতিভা দেবী শ্রীযুক্ত গোপেশ্বরকে এই গৌরবেব পদ অলঙ্কৃত করিবার জন্য অনুরোধ করেন। দেশের সঙ্গীত-বিজ্ঞানেব লুপ্ত-গৌরব উদ্ধার করিয়া প্রচার করা শ্রীযুক্ত গোপেশ্বরের চির-জীবনের স্বপ্ন। শ্রীযুক্তা প্রতিভা দেবীর প্রস্তাবে এই সুবর্ণসুযোগ উপস্থিত হইল, এই মনে করিয়া তাহা প্রত্যাখ্যান করা তাঁহাব পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। তিনি মহারাজাধিরাজের অনুমতি লইয়া বহু কস্ট স্বীকার করিযাও সানন্দে সপ্তাহে তিন দিন 'সঙ্গীত-সঙ্ঘে' উচ্চাঙ্গের হিন্দী সঙ্গীত শিক্ষা দিতে পারিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন।

অনেকেই ধ্রুপদ গাহিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা অকারণে এত মুখভঙ্গী করেন যে, সাধারণেব পক্ষে তাহা রুচিকর হইয়া উঠে না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় শ্রীযুক্ত গোপেশ্বরের এই প্রকার কোনও মুদ্রাদোষ পবিলক্ষিত হয় না। ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পা, এই তিনপ্রকার বীতির সঙ্গীতেই তিনি অদ্বিতীয়। রাগরাগিণীর আলাপ অতি সুমিষ্ট ও প্রাঞ্জলরূপে তিনি প্রকাশ করিতে পারেন। ভৈরব রাগ ও ছায়ানট তিনি এমন মধুর গাহিতে পারেন যে, তাহা একবার শুনিলে আর ভুলিতে পারা যায না। সঙ্গীত থামিয়া গেলেও সঙ্গীতের রেশ মন-প্রাণকে আন্দোলিত ও বিভোর করিয়া রাখে। সাধারণের হিতকল্পে এবং সঙ্গীতানুরাগী জনগণের বিশেষ সহায়তার জন্য তিনি 'সঙ্গীত চন্দ্রিকা' নামক একখানি উৎকৃষ্ট সঙ্গীত-বিষয়ক পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন।

১৩৪২ ভাদ্র

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

অকালে শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আকস্মিক মৃত্যুতে বঙ্গদেশ সঙ্গীতসম্পদে পূর্ব্ববৎ সমৃদ্ধ রহিল না। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৩ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। জীবনের ২৫ বৎসর তিনি শান্তিনিকেতনে সঙ্গীতশিক্ষাদানের নিমিত্ত ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। এই সময়ের মধ্যে বিস্তর ছাত্রছাত্রী তাঁহার নিকটে রবীন্দ্রনাথের গান শিখিয়াছেন। ছাত্রছাত্রীরা তাঁহার শিক্ষাদানক্ষমতা ও স্নেহে তাঁহার প্রতি অনুরাগী ছিল। তাহাদের মধ্যে এক জন সুগায়িকা, কল্যাণীয়া শ্রীমতী অমিতা সেন, তাঁহার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

তিনি পাশ্চাত্য ও ভারতীয় উভয়বিধ সঙ্গীতে সুশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্মৃতিশক্তি এরূপ ছিল, যে, রবীন্দ্রনাথ নিজের গানের যে সুর দিতেন তাহা স্বয়ং ভুলিয়া গেলেও দিনেন্দ্রনাথ কখনও ভুলিতেন না। এই জন্য কবি যে তাঁহাকে তাঁহার সঙ্গীতাবলীর ভাণ্ডারী ও কাণ্ডারী বলিয়াছেন, তাহা অতি সত্য কথা।

তিনি যে কেবল সংগীতজ্ঞ ও সুগায়ক ছিলেন, তাহা নহে। তাঁহার সংস্কৃতি, সৌজন্য ও

নানাবিষয়ক জ্ঞানও উল্লেখযোগ্য ছিল। তিনি সুরসিক, মজলিসী লোক ছিলেন। তাঁহার অট্টহাস্য তাঁহার পিতামহ ভক্তিভাজন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের হাস্য মনে পড়াইয়া দিত।

১৩৪৩ কার্ত্তিক

পণ্ডিত বিষ্ণু নারায়ণ ভাতখণ্ডে

গত ১৯শে সেপ্টেম্বর প্রসিদ্ধ সংগীতবেত্তা পণ্ডিত বিষ্ণু নারায়ণ ভাতখণ্ডে মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৬ বৎসর হইয়াছিল। তিনি ভারতবর্ষীয় প্রাচীন সংগীতবিদ্যা ও হিন্দুস্থানী রীতির সংগীত শিখাইবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এ-বিষয়ে তাঁহার শ্রম ও কৃতিত্ব অসাধারণ। হিন্দুস্থানী সংগীত শিখাইবার নিমিত্ত তিনি লক্ষ্ণৌতে মরিস কলেজ এবং গোয়ালিয়রে সংগীত-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন।

১৩১৬ অগ্রহায়ণ

[লোকশিক্ষায় যাত্রা]

লোকশিক্ষা প্রসঙ্গে আমাদের আর একটি কথা মনে পড়িল। আমাদের দেশে বহুকাল হইতে আনন্দের ভিতর দিয়া লোক শিক্ষার নানা বন্দোবস্ত ছিল। যেমন, কথকতা, রামায়ণ গান, যাত্রা, ইত্যাদি। এ সকলের প্রভাব এখন কমিয়া আসিয়াছে। এখন লোকের ঝোঁক পড়িয়াছে, থিয়েটারের উপর।

থিয়েটার করা অপেক্ষা যাত্রা করা যে অল্পব্যয়সাধ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষে প্রাচীন কাল হইতে নাটক ও নাট্যাভিনয় চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু যাত্রাটি বোধ হয় বাঙ্গলা দেশের নিজস্ব সম্পত্তি। এই যাত্রাগুলি ক্রমশঃ অশিক্ষিত লোকদের হাতে গিয়া পড়িতেছে। বেশির ভাগ অশিক্ষিত লোকেরাই শ্রোতা। এই কারণে যাত্রাগুলির অধোগতি হইতেছে। কিন্তু শিক্ষিত লোকেরা এদিকে দৃষ্টি দিলে এখনও যাত্রার দ্বারা লোকশিক্ষার অনেক সাহায্য হইতে পারে।

আমরা কিছুদিন পূর্ব্বে বাঁকুড়ায় স্থানীয় একটি দলের সুরথ উদ্ধারের পালা শুনিতে গিয়াছিলাম। পালাটিতে নাটকত্ব বিশেষ কিছু না থাকিলেও, উহা কাব্য হিসাবে ভাল না হইলেও, উহা লোকের মনোরঞ্জন ও শিক্ষাদানের অনুপযোগী নহে। কিন্তু দেখিলাম, দলের একটি লোক অকারণ অশ্লীল কথা বলিয়া বসিল; ঐ কথা

মূল পালাতে নাই। তা ছাড়া, নর্ত্তকীরা আসিয়া পালার বহির্ভূত ২টা নিকৃষ্ট আদিরসাশ্রিত গান করিল। যাত্রার দলের লোকদের আর একটা দোষ এই যে, যখন সকলে একসঙ্গে গান ধরে, তখন কিছু ত বোঝাই যায় না, অধিকন্তু কাহারও সঙ্গে কাহারও মিল থাকে না।

শিক্ষিত, মার্জ্জিতরুচি লোকেরা এসকল বিষয়ে মন দিলে ভাল হয়। বঙ্গের প্রতিভাশালী কোন কোন লেখক উৎকৃষ্ট নাটক লিখিয়াছেন, কিন্তু যাত্রাব পালা রচনা কেহই করেন নাই। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ২/১টি আদর্শ পালা রচনা করিলে বড় ভাল হয়। ইহা নিশ্চয়ই তাঁহাদের পক্ষে অমর্য্যাদাব কারণ হইবে না। কলিকাতায় যে পূর্ণিমাসম্মিলন হয়, তাহাতে যাত্রার হাস্যোদ্দীপক নকল করা হয় দেখিতে পাই। এই পূর্ণিমাসম্মিলনে অনেক সাহিত্যিকের সমাবেশ হয়। কিন্তু তাঁহারা সকলেই যাত্রাকে নিরবচ্ছিন্ন অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন, এরূপ অনুমান বোধ হয় ঠিক হইবে না।

১৩১৯ চৈত্র
[বিদ্যালয়ের থিয়েটর]

"কাজের লোক" নামক একখানি কাগজে শ্রীরাধারমণ বসু লিখিয়াছেন :—

বিদ্যালয়ের থিয়েটর।

পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমরা অনেক বিষয়ই শিক্ষা এবং অনুকরণ করিতেছি। বিদ্যালয়ের ছাত্রগণদ্বারা বিদ্যালয়ে ষ্টেজ বাঁধিয়া অভিনয় তাহার অন্যতম। প্রাচীনকালে আর্য্য শিক্ষার সহিতও অভিনয়শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ছিল না, তাহা নহে, তবে সে অভিনয়-শিক্ষা এবং এ অভিনয়-শিক্ষার মধ্যস্থলে পার্থক্য অনেক। সেকালের ছাত্রজীবনের আর একালের ছাত্রজীবনেরও পার্থক্য বহুল। তখনকার ছাত্র ব্রহ্মচর্য্যে রত—সংযমী এবং বিলাসবিভ্রম-পরিশূন্য, আধুনিক ছাত্র বিলাসী, অসংযমী এবং ব্রহ্মচর্য্যবিরত। এইরূপ স্থলে বিদ্যালয়ে অভিনয়ের উৎসাহ দান যেন কিছু বিবেচনাধীন। শুদ্ধ অনুকরণ করিলেই চলিবে না, দেশকালপাত্রের কথাও ভাবিতে হইবে। যখন উচ্চশিক্ষিত আধুনিক মনীষিগণ ইহার উৎসাহদাতা, তখন ইহার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে যেন অগ্রপশ্চাৎ অনেক কথাই ভাবিতে হয়। অভিনয়ও একটা কলাবিদ্যা ও শিখিবার জিনিসও বটে।

ছাত্রজীবনে যদি অভিনয়ের এই হাবভাব প্রস্ফুটিত করিবারই বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের বাসনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে উপযুক্ত এবং সুদক্ষ আচার্য্যদ্বারা সেকালের মত সংযম শিক্ষার সহিত এই কলাবিদ্যার শিক্ষা দিলে মন্দ হইত না। কিন্তু তাহা ত হইতেছে না। বালকগণ যে থিয়েটারি হাব ভাব শিক্ষার জন্য পিতৃ-অর্থ ব্যয় করিয়া সাধারণ থিয়েটরের নট-নটীর হাবভাব শিক্ষা করিয়া আসিতেছে; আর পাঠাগারে তাহার অনুকরণের জন্য—তাহাতে বাহবা লইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে, তাহার প্রতিকার কি? ইহাতে সমস্ত উদ্যম, উৎসাহ, যাহাকে Energy বলে, তাহা নষ্ট হইলে বালকগণের কর্ত্তৃপক্ষের কি যে পার্থিব স্বার্থ সংশোধিত হইবে, অনেকে তাহা চিন্তা করিয়াও বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। অবশ্য কোন কোন স্থলে সাধারণ

থিয়েটারে অভিনীত পুস্তকের আপত্তিজনক িকতা, নাচ, গান, অভিনয় করিতে দেওয়া হয় না, তাহাও জানি, কিন্তু বালক যখন পুস্তক কিনিয়া তাহার নির্ব্বাচিত পার্ট অভ্যাস্থ করিতে প্রয়াস পাইয়াছে, যখন যে সেই বালক সেইসকল আপত্তিজনক অংশগুলি পাঠ করে নাই, এইরূপ বিশ্বাস করিয়া লইতে হইবে কেন?

আমাদের বোধ হয় ছাত্রজীবনের অভিনয়ের উপযুক্ত পুস্তক নির্ব্বাচিত বা লিখিত হওয়াও উচিত এবং যদি একান্তই এই অভিনয়-কণ্ডুয়ন-প্রবৃত্তি অনিবার্য্যই হইয়া উঠে, তাহা হইলে ছাত্রজীবনের কমনীয় চরিত্রের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াই সেইরূপ অভিনয়ের পুস্তক লিখিত হওয়া আবশ্যক।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দেশকাল পাত্র, এইগুলিও ভাবিতে হইবে। বালক যদি সংযমী, চরিত্রবান্ হয়, তাহা হইলে এই সর্ব্বজনপ্রিয় অভিনয়বিদ্যা শিক্ষায় আপত্তি নাই। কিন্তু তদ্বিপরীত ক্ষেত্রে ইহার বিষময় ফলও ফলিতে পারে, বিচিত্র কি? পূর্ব্বে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রগণ অভিনয়ে ভাল ভাল সংস্কৃত গ্রন্থ অভিনয় করিতেন, প্রেসিডেন্সি কলেজের ছেলেরা সেক্সপিয়ারের পুস্তকাদিও অভিনয় করিতেন। কিন্তু বাঙ্গালা গ্রন্থাদি যে সে কলেজের ছেলেদের দ্বারা অভিনয় হইতে বড় দেখা যাইত না।

কেন যে এত কথা বলিলাম, তাহার একটী কৈফিয়ৎ আবশ্যক। সহরের ছোক্‌রা বাবুরা পাড়াগাঁয়ে যাইয়া সেখানকার অনেক গরীবের ছেলের মাথায় এই অভিনয়তরঙ্গ প্রবেশ করাইয়া দিয়া গৌড় মাতাইয়া তুলিতেছে। ফলে গ্রামে গ্রামে যুবকগণের ক্লাব, থিয়েটার, রিহার্শাল! এদেশটার যে একটা মস্তদোষ আছে, যাহা অনুকরণ করিবে, তাহাতে আগুন না উঠাইয়া ছাড়িবে না। ভালটুকু ছাড়িয়া মন্দটুকুর চরম উৎকর্ষ সাধন করিয়া নিতান্ত ন্যক্কারজনক না করিয়া যে ছাড়ে না—হিতে যে এদেশে বিপরীত ফলই হইতেছে। সেই জন্যই ভয় আর কি! কলেজের অনেক ছেলে অভিনয় করেন, এমন ছেলেদেরও সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়া দেখিয়াছি—বেশ নাকি সুরের অনুকরণ, মেয়েলী মেয়েলি কথা, হাব ভাবেও বেশ, চারু বেশ বিন্যাসেও নজর কম নয়। সেইজন্যই কথাটা পাড়িলাম আর কি? নচেৎ যে কার্য্যে দেশে মনীষিগণ উৎসাহদাতা, তাহার উপর কি কথা কহিতে আছে? ছেলের হাতে অস্ত্র—এমন ছেলেও দেখিয়াছি, গ্রামে গিয়া নাকিসুরে জননীকে বলিয়াছে—"নহি মাতা অবোধ সন্তান তব, উপদেশে প্রয়োজন কিবা।" মা ছেলেকে কিছু উপদেশ দিতে গিয়াছিলেন, তাই সন্তান উপরোক্ত আভিনয়িক ছন্দে উত্তর দান করিয়াছিলেন। জননী ত অবাক্।

আমাদের দেশে তর্কের সময় প্রাচীনের দোহাই দেওয়া খুব চলিত আছে। কিন্তু তর্কের সময় যাহারা এরূপ দোহাই সকলের চেয়ে বেশী দেয়, প্রাচীনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যাহা, তাহা জীবনে গ্রহণ করিতে তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা ব্যগ্র নহে। জ্ঞানের গভীরতা, এবং চরিত্রের দৃঢ়তা ও শৌর্য্য লাভের জন্য ছাত্রদের পক্ষে প্রাচীনকালে ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এখন যদি ছাত্রকে অবিবাহিত রাখা হয়, সেটা অনেক স্থলে বরপণ বাড়াইবার জন্য, ও অনেক স্থলে পাশ করাইবার জন্য। প্রাচীনের দোহাই যাঁহারা দেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই, ছাত্রদিগকে দুশ্চরিত্রা অভিনেত্রীদিগের দূরতম সংস্পর্শ হইতে দূরে রাখিবার চেষ্টা করা উচিত; কারণ অভিনয় শিখিবার বা দেখিবার জন্য যাহারা দুশ্চরিত্রাদের হাবভাব নৃত্যাদির মোহ অনুভব করে, তাহারা তাহার ফলে কুপথগামী হইলে ত ব্রহ্মচর্য্য থাকেই না, কুপথগামী না হইলেও ব্রহ্মচর্য্য থাকে না। ব্রহ্মচর্য্য কেবল শরীরের নয়, ভাবের, চিন্তার, কল্পনারও ব্রহ্মচর্য্য চাই। যৌবনে দেহমনের শুচিতা রক্ষা না করিলে জীবনের উচ্চ লক্ষ্য হইতে নিশ্চয়ই ভ্রষ্ট হইতে হয়।

১৩২১ ভাদ্র

স্কুল কলেজে অভিনয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল ও কলেজ সকলের প্রধান শিক্ষক ও অধ্যক্ষগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে তাঁহাদের শিক্ষালয়ে বৎসরে কতবার অভিনয় হয়, কিরূপ নাটক অভিনয় হয়, এবং কোন্ কোন্ শ্রেণীর ছাত্রেরা অভিনয় করে। এই জিজ্ঞাসার কারণ এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ অবগত হইয়াছেন যে অভিনয়ের বাড়াবাড়িতে ছাত্রদের মন অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত হয় এবং তাহাদের পড়া শুনার ক্ষতি হয়। ইহা বাস্তবিক সত্য কথা। অভিনয়ের জন্য অনেক সময় এরূপ নাটক নির্ব্বাচিত হয় যে তাহা বালক ও যুবকগণ কি প্রকারে তাহাদের শিক্ষক, গুরুজন বা অপর বয়োবৃদ্ধদিগের সম্মুখে অভিনয় করে, তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। কখন কখন প্রহসন পর্য্যন্ত নির্ব্বাচিত হয়। বহুসংখ্যক আধুনিক প্রহসনের উদ্দেশ্য স্ত্রীশিক্ষার শত্রুতা করা এবং শিক্ষিতা নারীগণকে হাস্যাস্পদ ও অবজ্ঞার পাত্র করা এবং তাঁহাদের সম্বন্ধে কল্পিত কুৎসা রটনা করা। বিশ্ববিদ্যালয় কিরূপ জবাব পাইয়াছেন জানি না; কিন্তু অভিনয়ের জন্য কিরূপ নাটক ও প্রহসন নির্ব্বাচিত হয়, তাহার প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখা একান্ত আবশ্যক।

নানাকরণে আমাদের চরিত্রে পৌরুষের অভাব দৃষ্ট হয়। ইহার উপর, বালক ও যুবকগণ অভিনয়ের সময় নারী সাজিয়া মেয়েলি ঢং এবং মেয়েলি চলন, ভঙ্গী ও সুরের নকল যত কম করে, ততই মঙ্গল। কারণ শুধু সেই অভিনয়ের রাত্রি ত নয়, প্রস্তুত হইবার জন্য অনেক দিন পূর্ব্ব হইতেই রিহার্স্যাল আরম্ভ হয়; এবং অভিনয় হইয়া যাইবার পরও তাহার ঢেউ থামে না।

অভিনয়ে সময় নষ্ট, শক্তি নষ্ট, এবং ক্রমশঃ পোষাক, দৃশ্যপট আদি সব বিষয়ে ব্যবসাদার থিয়েটারগুলির মত করিবার চেষ্টায় অর্থ নাশও বেশ হয়। কিন্তু সকলের চেয়ে অমঙ্গল এই হয় যে ছাত্রেরা খুব ভাল অভিনয় শিখিবার চেষ্টায় অনেক এমন পেশাদার অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে, যাহাদের চরিত্র অতি জঘন্য।

আমাদের ইংরাজী দৈনিকগুলি ব্যবসাদার থিয়েটারগুলির বিরুদ্ধে লেখেন না। আর লিখিবেনই বা কেমন করিয়া? তাহাদের লম্বা লম্বা বিজ্ঞাপন ছাপা ও তাহাদের অশুভ প্রভাবের বিরুদ্ধে লেখা একত্রে ত চলিতে পারে না। যদিও এমন দৃষ্টান্ত আছে যে সম্পাদকীয় স্তম্ভে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারিত হইতেছে ও গবর্ণমেন্টের আবকারী আয়ের তীব্র সমালোচনা চলিতেছে, আবার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞাপনস্তম্ভে কেল্‌নারের হুইস্কী ও ব্রাণ্ডীর মহিমাও ঘোষিত হইতেছে।

১৩৩৫ ফাল্গুন

থিয়েটার ও প্রদর্শনী

বঙ্গের মফস্বলে অনেক শহরে যে কৃষিশিল্পাদির প্রদর্শনী হয়, তাহা ভাল। তাহার সহিত আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা থাকাও অনাবশ্যক নহে। কিন্তু যাহাতে সামাজিক অপবিত্রতা পরোক্ষভাবে সমর্থিত হয় ও বাড়িতে পারে, এমন কোন বন্দোবস্ত করা উচিত নয়। কোথাও কোথাও কলিকাতা হইতে থিয়েটারের দল লইয়া যাওয়া হয়, যাহাদের অভিনেত্রীদের অসৎ চরিত্র সুবিদিত এবং সঙ্গদোষে অভিনেতাদের চরিত্রও সন্দেহের অতীত নহে। এরূপ ব্যবস্থা ভাল নয়। বরিশালের ছাত্রেরা ও অন্য ভদ্রলোকেরা এই কারণে তথাকার প্রদর্শনী বয়কট করিয়া সুবিবেচনার কাজ করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহাদের উপর অনেক অত্যাচার হইয়াছে। টাঙ্গাইলেও এইরূপ প্রদর্শনী বর্জ্জনের প্রশংসনীয় চেষ্টার সংবাদ কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে।

১৩৩৫ বৈশাখ

অভিনয় ও নৃত্য

১৯২১ সালের সেন্সস্ অনুসারে, গুজরাতী যাঁহাদের মাতৃভাষা, কলিকাতায় এরূপ লোকের সংখ্যা ৬১৮৫;এখন হয় ত সাত হাজার হইয়াছে। গুজরাতী বালক ও বালিকাদের শিক্ষার জন্য ইহাঁরা কলিকাতায় একাধিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে বিদ্যালয়গুলির পুরস্কার বিতরণ সভায় আমাকে সভাপতির কাজ করিতে হয়। গুজরাতীরা সভার জন্য ধর্ম্মতলা স্ট্রীটের কোরিন্থিয়ান থিয়েটার ভাড়া লইয়াছিলেন। যাঁহাদের পুত্রকন্যারা এইসব বিদ্যালয়ে পড়ে, তাঁহারা সপরিবারে এই সভায় উপস্থিত ছিলেন বলিয়া ঐ রঙ্গালয়ে সকলের স্থান হয় নাই, অনেককে বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইয়াছিল। উপস্থিত ভদ্রলোকদের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান ও পারসী ছিলেন; মহিলাদের মধ্যে মুসলমান কেহ ছিলেন কি না বুঝিতে পারি নাই।

সভায় রিপোর্ট পাঠ ও পুরস্কার বিতরণ ছাড়া, বালকদের দ্বারা ইংরেজী ও গুজরাতীতে অভিনয়, বালিকাদের দ্বারা গুজরাতীতে অভিনয়, এবং বালিকাদের নৃত্য হইয়াছিল। গুজরাটে যাহাকে গরবা বলে, এই নৃত্য তাহাই। হিন্দু ভদ্র গৃহস্থের বালিকা ও মহিলাদের নৃত্য গুজরাটের প্রাচীন রীতি। প্রকাশ্য স্থানে এই নৃত্য তাঁহারা এখনও করিয়া থাকেন। অনেক বৎসর পূর্ব্বে 'ভারতী'তে গুজরাটে গরবার বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। আমি দুই বার বোম্বাই ও একবার সুরাট গিয়াছিলাম। কিন্তু এই নৃত্য দেখি নাই। গুজরাতী বালিকাদিগের এই নৃত্য এই প্রথম

কলিকাতায় দেখি। তাহার আগে এইরূপ নৃত্য শান্তিনিকেতনে দেখিয়াছিলাম। তথাকার, একজন পারসী অধ্যাপকের পত্নী কতকগুলি বালিকাকে উহা শিখাইয়াছেন। অন্যবিধ নৃত্যও সেখানকার কতকগুলি বালিকা জানে। তাহাও আমি দেখিয়াছি।

দি ন্যাশন্যাল ক্রিশ্চিয়ান্ কৌন্সিল রিভিউ নামে ভারতীয় খৃষ্টীয়ানদিগের একটি ইংরেজী মাসিক পত্র আছে। তাহার এপ্রিল সংখ্যায়, গত ফেব্রুয়ারী মাসে দিল্লীতে স্ত্রীশিক্ষার সংস্কার-সাধনার্থ ভারতবর্ষের সকল সম্প্রদায়ের মহিলাদের যে কন্‌ফারেন্স হইয়াছিল, সেই বিষয়ে মিস্ এলিয়ট একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ইনি বোম্বাইয়ের একটি খৃষ্টীয় বালিকাবিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী। তিনি লিখিয়াছেন, যে, কন্‌ফারেন্সে বালিকাদের দৈহিক স্বাস্থ্যের উন্নতি সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল ও প্রস্তাব নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। তাহার পর বলিতেছেন.

"যে-দেশে মৃত্যুর হার এত বেশী এবং শরীর সাধারণতঃ এত দুর্ব্বল, তথায় কন্‌ফারেন্সে জরুরী বলিয়া সমর্থিত শিক্ষা-সংস্কারগুলি খুবই দরকারী সন্দেহ নাই। ইস্কুলের ছেলেদের ও মেয়েদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও দৈহিক শিক্ষার বন্দোবস্তের দাবী করিয়া ভারতীয় মহিলারা ঠিকই করিয়াছেন। সকল সমাজেরই রক্ষণশীল শ্রেণীর লোকেরা বালিকাদের অবাধ খেলা ও ব্যায়াম ভীতির চক্ষে দেখেন। ইংলণ্ডে যখন বালিকারা হকি খেলিতে আরম্ভ করে, তখন এইরূপ আতঙ্ক দেখা দেয়। ভারতবর্ষে নৃত্যের সঙ্গে এত অশুচি ও অমঙ্গলকর জিনিষের স্মৃতি জড়িত, যে, ভদ্রশ্রেণীর লোকেরা ইহা দীর্ঘকাল পরিহার করিয়া ভালই করিয়াছেন। কিন্তু এখন বোধ হয় একটা পরিবর্ত্তনের সময় আসিতেছে। ভারতীয় বালিকারা আনন্দোপভোগের সর্ব্বাপেক্ষা তালানুগত ও সুশোভন একটি উপায় হইতে বরাবর বঞ্চিত থাকিলে দুর্ভাগ্যের বিষয় হইবে। বালিকাবিদ্যালয়ে নৃত্যের প্রবর্ত্তনেব পক্ষ সমর্থন করিতে মহীশূরের কুমারী ল্যাজ্যারসের সাহসের প্রয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু তিনি যে মাধুর্য্য ও রসিকতার সহিত ইহা করিয়াছিলেন তাহার জন্য আমাদের সকলের তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। খৃষ্টীয় ধর্ম্মমণ্ডলী বহুশতাব্দী ধরিয়া সুখবিমুখ হইয়া কঠোর সাধনার আদর্শ সমর্থন করিয়াছিলেন, কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সেন্ট ফ্রান্সিসের সহিত আবার তাহা সঙ্গীতমুখর হইয়া উঠে। যদি ভারতবর্ষের খৃষ্টীয়ানেরা তাঁহাদের দেশের জন্য অতীত সব কলঙ্ক হইতে মুক্ত নৃত্যকলার পুনরুদ্ধার কার্য্যে অগ্রণী হইতে পারেন, তাহা হইলে তাহা সুখের বিষয় হইবে।"

কুমারী এলিয়ট যে মনে করিয়াছেন, যে, ভদ্রশ্রেণীর বালিকা ও মহিলাদের মধ্যে নৃত্য ভারতবর্ষের কোথাও প্রচলিত নাই, তাহা ভুল। গুজরাটে বরাবর প্রচলিত আছে; অন্যত্রও প্রচলিত থাকিতে পারে—তাহা আমরা অবগত নহি। উহার পুনঃপ্রবর্ত্তনও যে বাংলা দেশে আগেই হইয়া গিয়াছে, তাহাও আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

বঙ্গে উহার পুনঃপ্রবর্ত্তন উপলক্ষ্যে খবরের কাগজে উহার বিরুদ্ধে আন্দোলন হইতেছে। আমাদের মতে সব রকমের নৃত্য অনিষ্টকর ও নিন্দনীয় নহে। কোন কোন রকমের নৃত্য কেবল যে নিন্দনীয় ও অনিষ্টকর নহে, তাহা নয়, বরং তাহা সুশোভন ও হিতকর। শান্তিনিকেতনে ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জোড়াসাঁকোস্থ ভবনে যে নৃত্য ও নৃত্য-সম্বলিত গীত ও অভিনয় দেখিয়াছি, তাহা আমার চক্ষে সুন্দর ও নির্দ্দোষ লাগিয়াছে। কলিকাতার আর যে-যেখানে বালিকাদের নৃত্য হইয়াছে, তাহা আমি দেখি নাই;

সুতরাং সে-বিষয়ে কোন মত প্রকাশ করিতে পারি না।

অভিনয় ও নৃত্য মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির ফল। কাহারও শিক্ষা ব্যতিরেকেও শিশুরা নাচে, তালে তালে হাত পা ছুঁড়ে, সুন্দর অঙ্গভঙ্গী করে। এইরূপে তাহারা তাহাদের হর্ষ ও আনন্দ জ্ঞাপন করে। অভিনয়ও তাহারা স্বভাবতঃ করে। তাহারা যাহা নয়, তাহা হইবার ভাণ করে, এবং সেইরূপ কাজ করে ও কথা বলে। অভিনয় ও নৃত্য স্বাভাবিক বলিয়া উহাকে মূলতঃ দুর্নীতিবিজড়িত মনে করা যাইতে পারে না। অন্য অনেক জিনিষের মত অভিনয় ও নৃত্যের ভাল মন্দ দুইরকম আছে, এবং প্রকার-ভেদে উহার সুফল কুফল দুই-ই আছে। যাঁহারা ধর্ম্মে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা স্বীকার করিবেন, যে, ধর্ম্ম মানবসমাজের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্তু। কিন্তু অনেক ধর্ম্মানুষ্ঠানের সহিত, অনেক ধর্ম্মোপদেষ্টা ও পুরোহিতের জীবনের সহিত ঘোরতর দুর্নীতির যোগ সকল দেশেই দেখা গিয়াছে; কিন্তু তাহার জন্য চিন্তাশীল লোকেরা ধর্ম্মকে নিন্দনীয় ও বর্জ্জনীয় মনে করেন না।

এমন কথা উঠিতে পারে যে, শিশুরা যাহা করে, তাহা তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক হইলেও, তাহা অপেক্ষাকৃত অধিকবয়স্ক লোকদের পক্ষে করণীয় না হইতে পারে। আমরাও বলিতেছি না, শিশুরা যাহা কিছু করে, অন্যদেরও তাহাই করা উচিত। শিশুরা স্বভাবতঃ অভিনয় করে বলিয়া উহার সঙ্গে দুর্নীতির নিত্য-সম্পর্ক নাই, ইহাই আমাদের বক্তব্য। বেঞ্জামিন্ কিডের লেখা শক্তি-বিজ্ঞান ("Science of Power") নামক পুস্তকে তিনি লিখিয়াছেন, যে, সভ্যতর জাতিদের মধ্যে যাঁহাদের হৃদয়মন বাস্তবিক সুমার্জ্জিত, তাঁহারা বয়োবৃদ্ধি-সহকারে ক্রমেই দেখিতে শিশুদের মত হন; নৃতত্ত্ববিদেরাও এইরূপ বলেন। সুতরাং শিশুরা করে বলিয়াই কোন জিনিষ তাচ্ছিল্যের যোগ্য নয়। বরং যে-সব জাতির লোক অল্প বয়সেই অতিপ্রবীণ ও অতিবিজ্ঞ সাজিয়া সব রকম খেলাধূলা ত্যাগ করে, সেইসব জাতিকে জরাগ্রস্ত এবং দৈহিক ও মানসিক কর্ম্মিষ্ঠতায় নিকৃষ্টস্থানীয় মনে করা যাইতে পারে।

অভিনয় অন্য অনেক প্রাচীন দেশের মত ভারতবর্ষেও পুরাকাল হইতে প্রচলিত আছে। উৎকৃষ্ট নাটক ও উৎকৃষ্ট নাটকাভিনয় দ্বারা অন্য দেশের মত ভারতবর্ষের লোকদেরও খুব উপকার হইয়াছে। যাত্রা একরকম অভিনয়। অন্যবিধ অভিনয়ও আছে। কথকতাও একপ্রকার অভিনয়; তাহাতে কথক একাই নানাজনের স্থলাভিষিক্ত হইয়া অভিনয় করেন। এইরূপ নানাবিধ অভিনয়ের দ্বারা ভারতবর্ষের নিরক্ষর লোকেরাও কাব্যের, সঙ্গীতের, ধর্ম্মের, ধর্ম্মনীতির, দর্শনের, এবং পুরাণাদি নিহিত ইতিহাসের আস্বাদ পাইয়া অন্য অনেক দেশের শিক্ষিত লোকদের কতকটা সমান সুবিধা পাইয়াছে। রামায়ণ ও মহাভারত যে ভারতবর্ষের সমাজকে ও মানুষকে গড়িয়াছে, তাহা অনেকটা অভিনয়ের সাহায্যে। নাটক অনেক দেশের সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ জিনিষ। তাহার দ্বারা মানবসমাজ উন্নত ও উপকৃত হইয়াছে। সুতরাং নাটক ও অভিনয়কে বাদ দেওয়া চলে না। অবশ্য মন্দ নাটক অনেক আছে, এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে দুশ্চরিত্র লোক অনেক দেখা গিয়াছে। সেইজন্য খৃষ্টীয় জগতে ও অন্যত্র নাটক ও নাট্যাভিনয়কে বর্জ্জনীয় করিবার নানাবিধ বিপুল চেষ্টাও হইয়াছে। কিন্তু চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। নাটকের ও নাট্যাভিনয়ের আনন্দ দিবার ও হিত সাধিবার শক্তি থাকায়, এবং সেই আনন্দ ও হিত মানব-প্রকৃতি অজ্ঞাতসারে চাহিয়াছে বলিয়া নাটক ও নাট্যাভিনয় বাঁচিয়া

আছে। সমাজেব অন্য অনেক শ্রেণীর লোক নিজেরা যাহা বটে ও যাহা করে, তাহাব দ্বারা পরিচিত হয়, সুখ্যাত বা অখ্যাত হয়: অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা যাহা নয় তাহা সাজিয়া পরিচিত হয়। মহারাণাপ্রতাপ ও ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ নিজ নিজ বীরত্বের জন্য সম্মানিত, কিন্তু যাহারা প্রতাপ ও লক্ষ্মীবাঈ সাজে, তাহাদের নিজের কোন বীরত্ব না থাকিতে পারে। বোধ হয়, অপরের গুণের আলোকে প্রভামণ্ডিত বলিয়া সচ্চরিত্র অভিনেতা অভিনেত্রীরাও অন্য কৃতী লোকদের মত সম্মান পায় নাই। তা ছাড়া, তাহাদেব পদস্খলনের অধিক সম্ভাবনা ঘটে। তাহা সত্ত্বেও, তাহাদের বিরুদ্ধে যাহা কিছু বলিবার বলিয়া, "ধর্ম্ম ও নীতির বিশ্বকোষ" * নামক বৃহৎ প্রামাণিক গ্রন্থের চতুথ ভল্যুমে "নাটক" প্রবন্ধের লেখক বলিতেছেন :—

"Yet it must not be forgotten that this darker side is, in reality, nothing but an unhapy incident; only the faults are generally known, and the brighter and nobler side of the actor's life is too little recognized. Accurate statistics of the moral and intellectual standard of the acting profession would, doubtless, compare favorably with similar standards of many other professions."

ইহা পাশ্চাত্য দেশের কথা। আমাদের দেশের অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞ ও নিরপেক্ষ লোক মত প্রকাশ করিয়াছেন কি না, জানি না। আমি আমাদের দেশের পেশাদার অভিনেতা অভিনেত্রীদের কোন অভিনয় দেখি নাই ও তাহাদের সহিত পরিচিত নহি বলিয়া কোন মত প্রকাশ করিতে অসমর্থ। এবিষয়ে কেবল একটা অবান্তর কথা বলিব। চারিত্রিক কারণে আমাদের দেশের পেশাদার অভিনেত্রীদের ভদ্রসমাজে স্থান নাই, কিন্তু নিকৃষ্টচরিত্র পেশাদার অভিনেতাদের স্থান আছে। আমার বক্তব্য এ নয়, যে, ঐসব অভিনেত্রীরও ভদ্র সমাজে স্থান হউক। ঐসকল অভিনেতা ও অভিনেত্রীর চারিত্রিক অধোগতি যাহাতে না হয়, তাহারা যাহাতে সচ্চবিত্র হইতে ও থাকিতে পারে, তাহার জন্য অবিরাম চেষ্টা হওয়া উচিত। সচ্চবিত্র রঙ্গালয়াধ্যক্ষ ও অভিনেতাদেরই এই চেষ্টা সর্ব্বাগ্রে কবা কর্ত্তব্য। যে-সকল সচ্চরিত্র লোক রঙ্গালয়ে গিয়া আনন্দ ও উপকার পান, তাঁহাদেরও এবিষয়ে মন দেওয়া আবশ্যক। যেবিদ্যার দ্বারা স্মরণাতীত কাল হইতে সমাজের আনন্দ ও কল্যাণ হইয়াছে, তাহার অনুশীলকগণ চারিত্রিক কারণে ঘৃণিত হইয়া থাকেন, ইহা ন্যায়সঙ্গত ও বাঞ্ছনীয় নহে। ইহাও মনে রাখিতে হইবে, যে, দুশ্চরিত্র অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের সংসর্গে অনেক সচ্চরিত্র লোকের পতন হয়।

নাট্যাভিনয় যখন মূলতঃ দুর্নীতির জনক নহে, তখন সচ্চবিত্র পুরুষ ও নারীর তাহা কবা অনুচিত মনে হয় না। কিন্তু এরূপ নাটক অভিনয় করা উচিত নয়, যাহা কুরুচিপূর্ণ ও দুর্নীতির পরিপোষক। ইহাও সহজবোধ্য, যে, সচ্চরিত্র পুরুষ ও নারীদের দুশ্চরিত্র কোন পেশাদার অভিনেতা বা অভিনেত্রীর সাহায্যে বা সহযোগে নাট্যাভিনয় করা বাঞ্ছনীয় নহে।

ভদ্রসমাজের লোকদের, বিশেষতঃ মহিলাদের, নাট্যাভিনয় দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করা কি উচিত? অর্থোপার্জ্জন নিজের জন্য করা যাইতে পারে, কোন সদনুষ্ঠান বা হিতকর প্রতিষ্ঠানের জন্যও কবা যাইতে পারে। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ

* *Encyclopaedia of Religion and Ethics*. Edited by James Hastings, M.A., D D Volume 4, pages 870-871

ঠাকুরের মত যাঁহাদের নাটক-সমূহের ও অভিনয়ের সুরুচি কুরুচি সুনীতি দুর্নীতির সূক্ষ্ম বোধ আছে, তাঁহাদের পরিচালনায় কোন ভাল অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের জন্য টাকা তুলিবার নিমিত্ত অভিনয়ে আপত্তি দেখি না; কিন্তু যাহার তাহার অধ্যক্ষতায় ইহা হওয়া উচিত নয়। তাহাতে নাটকের নির্ব্বাচন এবং অভিনয় উভয়ই কুফলপ্রদ হইতে পারে। কিসে টাকা বেশী হইবে বা অধিকসংখ্যক লোকের বাহবা পাওয়া যাইবে, এই দিকেই যাহাদের বেশী ঝোঁক, তাহারা এরূপ কাজে হাত দিলে সমাজের অহিত হইবার সম্ভাবনা। কেবল টাকার দিকে ঝোঁকের জন্য নিকৃষ্ট রকম নাটকের নিকৃষ্ট রকম অভিনয় হইতে সমাজকে ও নাট্যবিদ্যাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত কোন কোন পাশ্চাত্য দেশে সচ্ছল অবস্থায় নাট্যোৎসাহী লোকদের দ্বারা এরূপ থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, যাহার আয় কেবলমাত্র বা প্রধানতঃ টিকিট বিক্রির উপর নির্ভর করে না।

অনেক বিষয়েই সংস্কার ও বিনাশ দুই পথ আছে। সংসারে থাকিলে অনেক পাপ হইবার সম্ভাবনা ঘটে। সন্ন্যাসের ব্যবহার ইহা একটা কারণ। ধর্ম্মনিষ্ঠ গৃহস্থ হইবার ব্যবস্থা আর এক পথ। কোন্‌টি ভাল, বা কোন্‌টি সহজ পথ, তাহার বিচার এখানে অপ্রাসঙ্গিক। নাটক ও অভিনয় সম্বন্ধেও দু রকম ব্যবস্থা হইতে পারে। বহু ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের লোকেরা উভয়েরই সম্পূর্ণ বিরোধী; তাঁহারা উভয়ের বিনাশ বা চিরপাতিত্য চাহিয়াছেন কিন্তু সফল প্রযত্ন হন নাই। অন্য অনেকে আছেন, যাঁহারা জিনিষ দুটির সুনীতিসঙ্গত ব্যবহার, সংস্কার ও রক্ষা চান। শেষোক্ত দলের মত যুক্তিসঙ্গত মনে হয়, যদিও তাঁহাদের মত অনুসারে কাজ হওয়া বড় কঠিন।

নৃত্য সম্বন্ধে আগে কিছু বলিযাছি। বলিয়াছি, উহা স্বাভাবিক; কিন্তু তাহা হইলেও প্রাপ্তবয়স্ক লোকেরা যে নানাবিধ নৃত্য করে, তাহাতে ভাল মন্দ দুই-ই আছে। নৃত্য মাত্রেই যে দুর্নীতির পরিপোষক বিবেচিত হয় না, তাহার একটি প্রমাণ এই, যে, চৈতন্যদেবের অনুসরণে বৈষ্ণব সমাজের ও ব্রাহ্ম সমাজের পুরুষেরা যে নগর-কীর্ত্তনাদির সময় নৃত্য করেন, সামাজিক পবিত্রতা রক্ষণে বিশেষ যত্নশীল ব্যক্তিরাও তাহাকে দুর্নীতির পরিপোষক মনে করেন না। তাহার একটি কারণ অবশ্য এই, যে, পুরুষেরাই ঐরূপ নৃত্য করেন। কিন্তু তাহা হইলেও উহা হইতে বুঝা যায়, যে, নৃত্যমাত্রেই খারাপ নহে। ধর্ম্মের সঙ্গে নৃত্যের যোগ পুরাকালে নানা দেশে ছিল, এখনও অনেক দেশে আছে। নটরাজ মহেশ্বরের এক নাম, এবং জন্মমৃত্যু সৃষ্টিপ্রলয়াদি বিশ্বব্যাপার তাঁহার নৃত্য বলিয়া কথিত হয়।

যাহা পুরুষেরা করিলে দোষ হয় না, স্ত্রীলোক তাহা করিলে দোষ হয়। পুরুষদের কিসে অসুবিধা বা অনিষ্ট হইতে পারে বা না পারে, তদনুসারে নানা সামাজিক বিধিব্যবস্থা হইয়াছে। স্ত্রীলোকেরা বাড়ীর বাহির হইলে বা তাহাদের মুখটি পর্য্যন্ত দেখা গেলে দুর্নীতি বাড়িতে পারে মনে করিয়া অবরোধপ্রথার ব্যবস্থা হইয়াছে। নারীরা সমাজের কর্ত্রী হইলে পুরুষদের অবরোধ ও অবগুণ্ঠনের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন; কারণ সামাজিক অপবিত্রতার জন্য পুরুষরা (কম করিয়া বলিলেও) নারীদের সমান দোষী। কিছু দেখিলে বা শুনিলে কুভাব পুরুষদের মনে আসিতে পারে, নারীদের মনেও আসিতে পারে। নারী রাস্তাঘাটে বাহির হইলে যদি পুরুষদের মানসিক এবং অন্য ক্ষতি হয়, তাহা হইলে পুরুষরা দৃষ্টিগোচর হইলে নারীদেরও সেইরূপ অনিষ্ট হইতে পারে। নারীদের নৃত্য দেখিলে যেমন পুরুষদেব অনিষ্ট হইতে

পারে, পুরুষদের নৃত্য ও নানারকম কুস্তি ও মল্লযুদ্ধ দেখিলে নারীদেরও তেমনি অমঙ্গল হইতে পারে। সুতরাং নরনারী উভয়েরই দুটা চোখ কানা করিয়া দেওয়া তর্কশাস্ত্রের অনুমোদিত সুব্যবস্থা বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু তর্কশাস্ত্রের এরূপ পরম ও চরম ভক্ত কেহ নাই।

কিছু কাল আগে পর্য্যন্ত আমাদের দেশে ভদ্র মহিলাদের ও বালিকাদের পক্ষে গীতবাদ্য নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু এখন তাহা প্রাচীনপন্থী হিন্দুসমাজেও চলিতেছে। তাহা সত্ত্বেও এখনও বিস্তর লোক আছে, যাহারা নারীকণ্ঠে ভক্তিভাবপূর্ণ ধর্ম্মসঙ্গীত বা দেশপ্রীতিপূর্ণ জাতীয় সঙ্গীত শুনিয়া সঙ্গীতের ভাবে নিমগ্ন ও আপ্লুত হইতে চায় না, হয় না, অন্য নিকৃষ্টভাব ও উদ্দেশ্য লইয়া সঙ্গীতের স্থানে যায়। তাহা তাহাদের আচরণ, মুখের ভাব ও হাস্য হইতেই বুঝা যায়। কিন্তু এইরূপ অপকৃষ্ট লোক পৃথিবীতে আছে বলিয়া ধর্ম্মমন্দিরে ও সার্ব্বজনিক সভায় নারীদের উৎকৃষ্ট গান গাওয়া অবাঞ্ছনীয় বিবেচিত হইবে না।

গানের মত নৃত্যের দ্বারাও মানুষের ধর্ম্মভাব, ভক্তিভাব, নির্ম্মল আনন্দ, শোক প্রভৃতি ব্যক্ত হইতে পারে। বালিকা ও মহিলারা তাহা করিলে দোষের বিষয় মনে করি না। শান্তিনিকেতনে যখন "নটীর পূজা"র নৃত্যসহকৃত অভিনয় দেখিয়াছিলাম, তখন হৃদয়ে ভক্তিভাবের উদ্রেক হইয়াছিল।

গানের মত গানের কথাগুলির মধ্যে যে ভাব চিন্তা আদর্শ নিহিত আছে, তা ছাড়া সুরেরও একটি স্বতন্ত্র রূপ, মাধুর্য্য আছে। নৃত্যেও যদি মানুষের গতির, অঙ্গসঞ্চালনের সেইরূপ একটি ছন্দোময় তালসঙ্গত রূপ অভিব্যক্ত হয়, তাহাও নির্ম্মল আনন্দের কারণ হইতে পারে। এরূপ নৃত্য যাহা দেখিয়াছি, তাহার উল্লেখ আগে করিয়াছি। অধোগতি হইবার ভয়ে সৌন্দর্য্য মাত্রকেই আমাদের অনেক সময় ভয় হয়। কিন্তু বিধাতা যখন সুন্দর অনেক ফুলের সৃষ্টি করিয়াছেন, এমন ফুলও রচনা করিয়াছেন যাহা হইতে ফলের উৎপত্তি হয় না, সব ফুলকে ফুলকপি করেন নাই, তখন সৌন্দর্য্যকে কেবলমাত্র পতন-সম্ভাবনার একটি কারণ রূপে দেখা ঠিক্ নয়। তাহা মানুষকে শ্রেয়ের দিকেও লইয়া যায়।

স্বভাবতঃ নারীদের চলিবার, কাজ করিবার, কথা বলিবার ভঙ্গী পুরুষ ও নারীদের লক্ষ্যীভূত হয়। অনেক বালিকার ও মহিলার এই সব বাহ্য আচরণ সুশোভন এবং গাম্ভীর্য্য ও মর্য্যাদাপূর্ণ। তাহা স্বভাবতই লোকের ভাল লাগে। কিন্তু কোন মানুষের মনে বিষ থাকায় যদি এই ভাল-লাগাটা তাহার অমঙ্গলের কারণ হয়, তাহা হইলে বিধাতার কৃপায় যে বালিকা বা মহিলার বাহ্য আচরণ সৌন্দর্য্যমণ্ডিত, তিনি কি এই অমঙ্গলের জন্য দায়ী বিবেচিত হইবেন?

অনেক নৃত্যে এরূপ ভঙ্গী আছে, যাহা কুভাবের প্ররোচক। তাহা বাঞ্ছনীয় নহে। এইজন্য যদি বালিকাদিগকে নৃত্য শিখাইতেই হয়, তাহা হইলে যার তার হাতে তাহার ভার দেওয়া কখনই উচিত নয়। অর্থলাভ যাহার উদ্দেশ্য, এরূপ নৃত্য প্রদর্শনে আরও বেশী সাবধানতা অবলম্বিত হওয়া উচিত।

নৃত্য নানা রকমের। ছোট ছোট মেয়েরা নানা রকম কাজের অনুকরণ করিয়া যে গান (action song) করে, তাহা এক-রকম নৃত্য বটে। তাহা ব্যায়ামেরও কাজ করে। সক্রেটিস্ কেবল ব্যায়ামের জন্য নৃত্য করিতেন। কৃষি-নৃত্য, জাদু-নৃত্য, রণ-তাণ্ডব, মূক অভিনয়ের নৃত্য, সামাজিক আমোদ ও কালক্ষেপের নৃত্য, পূর্ব্বরাগ-সংপৃক্ত নৃত্য--নর্ত্তন এইরূপ নানা ভাগে

বিভক্ত হইয়াছে। ইহার অনেকগুলির স্থান অসভ্য সমাজে আছে। পাশ্চাত্য সভ্য সমাজে যত রকম নাচের চলন আছে, তাহার সবগুলি আমাদের দেশে না-চালানই ভাল।

নৃত্যের কি কি অভিপ্রায় ও ফল পরিহার করিতে হইবে, তাহা বুঝাইবার জন্য আমরা "ধর্ম্ম ও নীতির বিশ্বকোষ" ("Encyclopaedia of Religion and Ethics") হইতে কতকগুলি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। লাগ্রেঞ্জের Physiology of Bodily Exercise নামক গ্রন্থে আছে .—

'Mascular movement, of which the dance is the most complex expression, is undoubtedly a method, of auto-intoxication of the very greatest potency. 'A girl who has waltzed for a quarter of an hour is in the same condition as if she has drunk champagne?'

এই 'আত্ম-মাদনা' কেবল বালিকাদেরই হয় না; কীর্ত্তনকালে নাচিতে নাচিতে যাঁহাদের ভাব ও দশা হয়, তাঁহাদেরও ইহা হয়। তাহার প্রমাণ উক্ত বিশ্বকোষের নিম্নলিখিত বাক্যে আছে।—

The powerful neuro-mascular and emotional influence, leading to auto-intoxication, is the key both to the popularity of dancing in itself and to its employment for special purposes, such as the production of cerebral excitement, vertigo and various epileptoid results, in the case of medicinemen, shamans, dervishes, prophets, oracle-givers, visionaries, and sectaries even in modern culture.

নৃত্যে আর-একটি বর্জ্জনীয় জিনিষের ইঙ্গিত নিম্নোদ্ধৃত বাক্যের শেষ কয়েকটি কথায় আছে।

Primarily were physical play, it has developed in many spheres, gymnastic and artistic, as a pastime, and as a sexual stimulus;...

প্রমাণ নীচে উদ্ধৃত করিতেছি।

Just as the male bird of several species parades and dances before the female, with the object of producing tumescence in himself and in her, so to the savage dancing is the chief means of courting a woman, and for the same reason. In both bird and man the 'intention' is unconscious; it is prompted and engineered by instinct. The 'showing off' of modern youth is equally instinctive.

বালিকা ও মহিলাদের অভিনয় ও নৃত্য সম্বন্ধে যে-আন্দোলন হইতেছে, তাহা আমাদের দেশের অন্য অনেক আন্দোলনের মত একতরফা হইতেছে;—মহিলারা সম্প্রতি এবিষয়ে কিছু লিখিয়াছেন বলিয়া অবগত নহি। "বঙ্গনারী" ছদ্মনামধারিণী হিন্দুমহিলা তাঁহার "আগমনী" নামক পুস্তকে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নীচে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"আমাদের মেয়েদের আর-একটি অভাব, তাঁহারা দেহের সকল অঙ্গ অবলীলাক্রমে ও শোভন ভাবে সঞ্চালন করার কৌশল কিছুই শিখেন না। ইহাতেও তাঁহাদের সৌন্দর্য্যের অনেক হানি হইয়া থাকে। উহা ঠিক মত আয়ত্ত করিতে হইলে উপযুক্ত ব্যায়ামের সহিত কয়েকটি নৃত্যকলাও শেখা উচিত। ইহাতে অনেকেই হয়ত বিরুদ্ধ হইয়া উঠিবেন, অথবা হাসি রাখিতে পারিবেন না, জানি। তথাপি মেয়েদের ব্যায়াম ও সহবৎ শিখার জন্য নৃত্যকলার উপযোগিতা স্বীকার করিতেই হইবে। পাশ্চাত্য দেশে ইহার প্রতি যেরূপ মনোযোগ দেওয়া হয়, আমাদের অবশ্য

তাহার প্রয়োজন নাই। কিন্তু কয়েকটি দেশী বিলাতী নৃত্যকলা ও শোভন ভাবে দেহ সঞ্চালন করিবার কৌশল মেয়েদের শেখান দরকার।...কেবল মাংসপেশী পুষ্টির উপর এখন সকল বিশেষজ্ঞরাই বিশ্বাস হারাইতেছেন; সুতরাং মেয়েদের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ডাম্বেল ইত্যাদি অপেক্ষা যাহাতে মনের স্ফূর্ত্তির সহিত সকল অঙ্গের চালনা হয়, তাহাই বাছিয়া লইতে হইবে। মুক্ত বাতাসে খেলা ও নৃত্যকলার চর্চ্চা ইহার সবিশেষ উপযোগী বলিয়াই বোধ হয়।"

বাংলাদেশে আগে ভদ্রমহিলারা নৃত্য শিখিতেন ও করিতেন কি না, সে-বিষয়ে কোন সাহিত্যিক বা ঐতিহাসিক গবেষণা করি নাই। সতী বেহুলা স্বর্গে নৃত্য দ্বারা দেবতুষ্টি-বিধান করিয়া স্বামীর জীবন বর পাইয়াছিলেন বলিয়া মনসামঙ্গলে যে বর্ণনা আছে, তাহাতে মনে হয়, নৃত্য পূর্ব্বে অন্তঃপুরিকারা শিখিতেন ও করিতেন।

সমাজে দুর্নীতি প্রবেশ করিলে তাহার উচ্ছেদ সাধনের জন্য এবং দুর্নীতির প্রবেশ নিবারণের জন্য সাহিত্য ললিতকলা প্রভৃতিকে নির্ব্বাসিত করিয়াও সেই উদ্দেশ্য সাধন করিবার ইচ্ছা কখন কখন হইতে পারে। কিন্তু সে উপায়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। বীরত্বের পূর্ণ বিকাশের নিমিত্ত স্পার্টা কঠোর সাধনা করিয়াছিল, কিন্তু বীর উৎপাদনেও এথেন্স্ অপেক্ষা অধিকতর কৃতিত্ব দেখাইতে পারে নাই। পক্ষান্তরে, এথেন্স শুধু উৎকৃষ্ট কাব্য, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের নিদর্শন রাখিয়া যায় নাই; ধর্ম্মনীতি ও দর্শন ক্ষেত্রেও তাহার সন্তানেরা যাহা করিয়া গিয়াছেন, খৃষ্টীয় ধর্ম্ম এবং সমগ্র মানব-সমাজ তাহার জন্য তাহার নিকট ঋণী। স্পার্টার এরূপ কিছু দেখাইবার নাই।

কোন দেশে, জাতিতে, সমাজে, মানব-প্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ ও পুষ্টির ব্যবস্থা ভিন্ন তাহাতে বহু শ্রেষ্ঠ মানবের উদ্ভব হয় না।

১৩৩৫ জ্যৈষ্ঠ

আলোচনা

"অভিনয় ও নৃত্য"

বৈশাখের প্রবাসীর বিবিধ-প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয় "অভিনয় ও নৃত্য" সম্বন্ধে লিখিবার সময় লিখিয়াছেন যে, কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির অধ্যক্ষতায় কোন সদনুষ্ঠান বা হিতকর প্রতিষ্ঠানের জন্য মহিলাদের নাট্যাভিনয় দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করা যাইতে পারে। "কিসে টাকা বেশী হইবে বা অধিক সংখ্যক লোকের বাহবা পাওয়া যাইবে এইদিকেই যাহাদের বেশী ঝোঁক তাহারা এরূপ কাজে হাত দিলে সমাজের অহিত হইবার সম্ভাবনা।"

কিন্তু এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা এই যে, গত দু'এক বৎসর যাবৎ যাঁহারা এই সকল প্রকাশ্য অভিনয় ও নৃত্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন তাঁহারা কি ইচ্ছা করিয়াই ঐসকলের মধ্যে মহিলাদের নৃত্যাদি সংযুক্ত করেন নাই?—উদ্দেশ্য এই যে, উহাদ্বারা টাকা বেশী উঠিবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, 'নটীর পূজার' অভিনয়ের সময় সকল দৈনিক কাগজে বড় বড়

বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল— "Special Dance of Srimati Gouri Devi," etc পেশাদার Company যখন বিজ্ঞাপন দেয়—Special attraction! Continental Dances by Miss 'X' তখন আমরা জোর গলায় তাহার নিন্দা করি ও অনেককে তথায় যাইতে বারণ করি। ঠিক্ সেইজন্যই আমাদেব এইসকল নৃত্যাদিরও নিন্দা করা উচিত।

মহিলাদের নৃত্যাদি না থাকিলে অতি অল্পসংখ্যক লোকই যাইত। এইরূপ প্রকাশ্য নৃত্যাদি হওয়াতে অনেক দুষ্ট প্রকৃতির লোকও সেখানে গিয়াছে। সুতরাং ঐ সকল সম্মিলন নির্দ্দোষ ও পবিত্র হয় নাই। আমাদের দেশ অত্যন্ত দরিদ্র— এদেশে টাকা পয়সা ব্যয় করিয়া আনন্দ লাভ করিবার মত অর্থ অতি অল্প লোকেরই আছে। ইহা সত্ত্বেও যখন ঐ সকল স্থানে ভিড় হয় তখন লোকে মনে করিতে পারে, যে, ঐসকল অভিনয়ের উদ্যোক্তাগণ আমাদের দেশের জনসাধারণের নৈতিক অবনতির জন্য অন্যায় সুবিধা লইতেছেন। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। সম্পাদক মহাশয় পুরুষদিগের কুস্তি প্রভৃতির কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু সেরূপস্থলে অতি অল্প স্ত্রীলোকই গিয়া থাকেন উপরন্তু সেখানে পিতামাতার রক্ত জল করা অর্থের অপব্যবহার ত' দেখা যায়ই না।

ভদ্রমহিলারা ব্যায়ামের জন্য; নিজেদের চিত্ত বিনোদনের জন্য অথবা একটি ললিতকলার চর্চ্চা হিসাবে নিজ নিজ গৃহে নৃত্য করুন তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু প্রকাশ্যে নৃত্য করার মতন আবহাওয়া আমাদের দেশে এখনও হয় নাই।

সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন যে, শান্তিনিকেতনে যখন "নটীর পূজা"র নৃত্যসহকৃত অভিনয় দেখিয়াছিলেন তখন তাঁহার হৃদয়ে ভক্তিভাবের উদ্রেক হইয়াছিল।

কিন্তু সাধারণতঃ দেখা যায় যে, যেসকল ব্যক্তি ঐ সকল নৃত্যাদি দেখিতে যায় তাহাদের অধিকাংশ ছাত্র এবং কেহ কেহ দুর্ষ্ট প্রকৃতির লোকও। উহাদের মধ্যে অধিকাংশই প্রকৃত শিক্ষা প্রাপ্ত হয় নাই। উহাদের মনে ক্বচিৎ কখনও ভক্তিভাবের উদ্রেক হয়। সুতরাং ঐ সকল নৃত্যাদির দ্বারা আমাদের কোনরূপ নৈতিক লাভ নাই—বরং ক্ষতিই আছে।

তাই বলিতেছি যে, যতদিন পর্য্যন্ত জনসাধারণ প্রকৃত শিক্ষার আলোকে আলোকিত না হইতেছে ততদিন পর্য্যন্ত ভদ্রমহিলাদের নৃত্যাদির দ্বারা অর্থোপার্জ্জন সদুদ্দেশ্যে হইলেও স্থগিত রাখা কর্ত্তব্য। সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের প্রকৃত শিক্ষার জন্য সকল রকম উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

যখন জনসাধারণ প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হইবে ও ভদ্রমহিলাদের নৃত্য দেখিবার জন্য অযথা ভিড় করিবে না, তখন আর ভদ্রমহিলাদের প্রকাশ্য নৃত্যে কোন বাধা থাকিবে না। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত তাহা না হয় ততদিন পর্য্যন্ত সমাজের মঙ্গলের জন্য উহা বন্ধ রাখিতে হইবে।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার গুপ্ত

সম্পাদকের মন্তব্য।

আমি যাহা লিখি নাই, সেরূপ কোন কোন কথার উল্লেখ ও আলোচনা বাদ দিয়াছি।

"কিসে টাকা বেশী উঠিবে বা অধিকসংখ্যক লোকের বাহবা পাওয়া যাইবে, এই দিকেই যাহাদের বেশী ঝোঁক, তাহারা এরূপ কাজে হাত দিলে সমাজের অহিত হইবার সম্ভাবনা।" যাহাবা কুরুচিপূর্ণ নৃত্য বা অভিনয় দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন কবিতে সঙ্কোচ বোধ না করিতে পারে, তাহাদের উদ্দেশে আমি ঐ কথা লিখিয়াছিলাম। "নটীর পূজা"র অভিনয় ও নৃত্য সে-জাতীয় নহে। উহার বিজ্ঞাপন আমি দেখি নাই। কিন্তু বিজ্ঞাপনে সুরুচিসম্মত নৃত্যে নিপুণা কোন মহিলার উল্লেখ কুরুচিপূর্ণ নৃত্যে দক্ষা পেশাদার নর্ত্তকীর উল্লেখের সমশ্রেণীস্থ মনে করি না। পেশাদার নর্ত্তকীদের সব নৃত্যও কুরুচিপূর্ণ নহে। তাহাদের সেরূপ সুনৃত্য দেখিলে সচ্চরিত্র লোকদের অনিষ্ট না

হইতে পারে।

নৃত্যের কথা ছাড়িয়া দিলে দেখা যায়, যে, মহিলাদের গান শুনিবার ও তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্যও অনেক "দুষ্টপ্রকৃতির লোকও" খুব সুস্থান সকলেও গিয়া থাকে; কিন্তু তাহার জন্য প্রকাশ্য স্থানে মহিলাদের ধর্ম্মসঙ্গীত, জাতীয় সঙ্গীত, গান প্রভৃতি বন্ধ করা যাইতে পারে না।

আমি যেসব অভিনয় ও নৃত্য দেখি নাই, সেই সকলের বিষয় কিছু লিখি নাই, লিখিতে পারি না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অধ্যক্ষতায় যে-সব অভিনয় ও নৃত্য হইয়াছে, তাহাতে "আমাদের দেশের জনসাধারণের নৈতিক অবনতির জন্য অন্যায় অসুবিধা" লওয়া হয় নাই, ইহা আমার বিশ্বাস ও মত। অধিকন্তু আমি মনে করি তিনি নৃত্যকে পঙ্কিলতা হইতে উদ্ধার করিয়া সমাজের উপকার করিতেছেন, এবং নির্ম্মল আনন্দের ব্যবস্থা করিতেছেন।

স্থলবিশেষে আমি পুরুষদের কুস্তি প্রভৃতিতে বিস্তর মহিলা দেখিয়াছি। "পিতামাতার রক্ত জল করা অর্থের অপব্যবহার" করিবার জন্য থিয়েটারে বায়োস্কোপে এবং ফুটবল ম্যাচে যত ভিড় হয়, রবীন্দ্রনাথের অধ্যক্ষতায় যে-সব অভিনয় ও নৃত্য হইয়াছিল, তাহাতে তত ভিড় হয় নাই। "অযথা ভিড়" হয় নাই।

ব্যায়াম, চিত্তবিনোদন ও ললিতকলার চর্চ্চার জন্য ভদ্রমহিলাদের নিজ নিজ গৃহে নৃত্য করায় যে লেখকমহাশয়ের আপত্তি নাই, ইহা সুখের বিষয়। কিন্তু নৃত্য যে নির্দ্দোষ হইতে পারে, প্রকাশ্যস্থানে ভদ্রমহিলাদের সুনৃত্য না দেখিলে আমাদের দেশে অনেকের সেরূপ ধারণা জন্মিবে না। অন্য রকমের একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। ব্রাহ্মসমাজের মহিলারা প্রকাশ্য স্থানে ধর্ম্মসঙ্গীত ও অন্যান্য ভাল গান গাওয়ায় অন্তঃপুরিকাদের মধ্যে ভাল গান গাহিবার রীতি প্রচলিত হইবার পক্ষে সাহায্য হইয়াছে। জলে না নামিলে যেমন সাঁতার দেওয়ার অভ্যাস জন্মে না, তেমনি "প্রকাশ্যে নৃত্য করা" ব্যতিরেকে "প্রকাশ্যে নৃত্য করার মতন আব্‌হাওয়া আমাদের দেশে" হইবে না।

ছাত্র ও অন্যান্য দর্শকদের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষাপ্রাপ্ত লোক কত ও দুষ্টপ্রকৃতির লোক কত, তাহা আমি বলিতে অসমর্থ। জনসাধারণের প্রকৃত শিক্ষা আমিও চাই। ভাল নাটক ও যাত্রার অভিনয় এবং ভাল নৃত্য লোকশিক্ষার একটি উপায় বলিয়া আমি মনে করি।

যাহা নির্দ্দোষ চিত্তবিনোদনের উপায়, সেইরূপ সুনৃত্য যদি ভদ্রপরিবারের বালিকারা ও মহিলারা নিজের আত্মীয়স্বজনের নিকট করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহা সামাজিক চিত্তবিনোদনের জন্য সামাজিক ভাবে না করিবার যথেষ্ট কারণ দেখিতেছি না। বরং এরূপ সামাজিক আনন্দ বিধানের ব্যবস্থা করিলে একত্র আনন্দ উপভোগ দ্বারা সামাজিক ঘনিষ্ঠতা ও সংহতি বৃদ্ধি হয় বলিয়া তাহা করাই উচিত।

শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
প্রবাসীর সম্পাদক

১৩৩৮ অগ্রহায়ণ

এলাহাবাদে সঙ্গীত সম্মেলন

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত সভার উদ্যোগে এলাহাবাদে সঙ্গীত কন্‌ফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ইহার অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি হইয়াছিলেন উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যার অধ্যাপক ডক্টর দক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্য্য এবং সভাপতি হইয়াছিলেন এলাহাবাদ ডিভিশনের কমিশনার শ্রীযুক্ত বিনয়েক মেহ্‌তা। মেহ্‌তা মহাশয় উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় এবং ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার জন্য সঙ্গীতকে একটি বৈকল্পিক শিক্ষণীয় বিষয় করার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন। তাঁহার মতে,

"The credit of reviving music in public for respectable women goes to Bengal and the Brahmo Samaj. In Gujarat and Rajputana the custom of caste and mohalla group singing kept up the old tradition."

"ভদ্রমহিলাদের প্রকাশ্য স্থানে গান গাওয়ার পুনঃপ্রচলনের প্রশংসা বঙ্গদেশের ও ব্রাহ্মসমাজের প্রাপ্য। গুজরাট ও রাজপুতানায় এক এক জাতের ও মহল্লার মেয়েদের দল বাঁধিয়া গান করিবার রীতি দ্বারা পুরাতন প্রথা সংরক্ষিত হইয়াছে।"

কন্‌ফারেন্সে কাশীর সৌখীন ওস্তাদ শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনাথ বসু বীণা বাজাইয়াছিলেন। বালকবালিকা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সঙ্গীতের মধ্যে প্রতিযোগিতা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনাথ বসু (সভাপতি), রায়সাহেব পণ্ডিত সত্যানন্দ জোশী, শ্রীযুক্ত আর. সি. রায় এবং শ্রীযুক্ত এ. সি. মুখুজ্যে বিচারক কমিটির সভ্য ছিলেন। যে সব ওস্তাদ কন্‌ফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে "লীডার" কাগজে ইনায়েৎ খাঁ, হাজিফ আলি খাঁ, নারায়ণ রাও ব্যাস, পর্ব্বত সিং, বীরু মিশ্র, নাজিম খাঁ, জহুর খাঁ, দলসুখ রাম, আফতাব উদ্দীন, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

১৩৪১ অগ্রহায়ণ

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত-সম্মেলন

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত-সম্মেলন প্রতি বৎসর হইয়া থাকে। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে ইহার আরম্ভ হয়। প্রধানতঃ এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর দক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্য্যের চেষ্টায় ইহা স্থাপিত হয় ও পরিচালিত হইতেছে---এই জন্য গত বৎসরের অধিবেশনের সভাপতি মেজর ডাঃ দেশরাজ রণজিৎ সিং এবং বর্ত্তমান বৎসরের সভাপতি বিহারী নেতা শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ সিংহ তাঁহাকে ধন্যবাদ দেন। এ বৎসর আগ্রা-অযোধ্যার শিক্ষামন্ত্রী স্যর জ্বালাপ্রসাদ

শ্রীবাস্তব ও স্বরাষ্ট্র সদস্য (Home Member) কুমার জগদীশপ্রসাদও তাঁহার প্রশংসা করেন। পুরস্কার-বিতরণ উপলক্ষে কুমার জগদীশপ্রসাদ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত ফ্যাকাল্টি না-থাকা আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে সঙ্গীতের সম্যক উন্নতির পক্ষে একটি বাধা।

এই সম্মেলনে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ ও দেশী রাজ্য হইতে ওস্তাদরা আসিয়া নিজ নিজ নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। তদ্ভিন্ন, ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গীত ও নৃত্যে পারদর্শিতার পরীক্ষা হয় এবং তাহাদের মধ্যে সুদক্ষেরা পুরস্কৃত হয়। এ বৎসর ৫৫টি পুরস্কারের মধ্যে ২৪টি প্রবাসী বাঙালী ছেলেমেয়েরা পাইয়াছে। তাহাদের নাম ও দক্ষতাব বিষয়—

কণ্ঠসঙ্গীতে অন্নপূর্ণা বিশ্বাস, শান্তিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাবতী মিত্র, সান্ত্বনা ভট্টাচার্য্য; নৃত্যে সান্ত্বনা ভট্টাচার্য্য, হার্মোনিয়মে মিনতি ঘোষ; এস্রাজে মিনতি ঘোষ, তবলায় সান্ত্বনা ভট্টাচার্য্য। এই বালিকাগুলির বয়স নয় বৎসরের কম। নয় বৎসরের কম বয়সের বালকদের মধ্যে পুরস্কার পাইয়াছে—কণ্ঠসঙ্গীতে নিরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, বেহালায় সমীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তবলায় নিরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, পাখোয়াজে মদনমোহন মুখোপাধ্যায়, নৃত্যে নিরঞ্জন ভট্টাচার্য্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে কণ্ঠসঙ্গীতে শৈলেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তবলায় শচীরঞ্জন ভট্টাচার্য্য ও শক্তিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং হার্মোনিয়মে প্রজেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পুরস্কার পাইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মধ্যে এলাহাবাদের বাঙালী কোন ছাত্রী নাই, কিংবা পরীক্ষা দেয় নাই, বা পুরস্কার পায় নাই। অষ্টম শ্রেণীতে নয় বৎসরের কম বয়সের বালিকাদেব মধ্যে কণ্ঠসঙ্গীতে মণিকা সাহা, এবং চৌদ্দ বৎসরের কম বয়সের বালিকাদের মধ্যে কণ্ঠসঙ্গীতে গৌরীরাণী ঘোষ, ঝরণারাণী ঘোষ, বীণাপাণি মুখোপাধ্যায় ও উমা মিত্র এবং হার্মোনিয়াম বীণাপাণি মুখোপাধ্যায় পুরস্কার পাইয়াছে। ১৪ বৎসরের কম বয়সের বালকদের মধ্যে কণ্ঠসঙ্গীতের জন্য দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য পুরস্কৃত হইয়াছে। সংগীত-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে গত বৎসরের ন্যায় এবৎসরও ভট্টাচার্য্য-পরিবার প্রথম পুরস্কার পাইয়াছে।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির নানা কথা

১৩১৮ শ্রাবণ

[নিম্নবর্গের শিক্ষা]

আমাদের দেশের কোন শ্রেণীর লোকদের মধ্যে যথেষ্ট শিক্ষাবিস্তার হয় নাই। নিম্ন শ্রেণীর লোকদের মধ্যে ত শিক্ষার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। এইজন্য তাহাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের বিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন। ইহার জন্য বোম্বাই অঞ্চলে শ্রীযুক্ত বিঠলরাম শিন্দে কর্ত্তৃক রীতিমত চেষ্টা হইতেছে। তাহার বৃত্তান্ত প্রবাসীতে দেওয়া হইবে। আমাদের বাঙ্গলা দেশেও এরূপ চেষ্টা নানা স্থানে হইতেছে। পূর্ব্ববঙ্গে যে চেষ্টা হইতেছে, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার জন্য একটি সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। ঢাকা তাহার কেন্দ্র। নমঃশূদ্র, চামার, জোলা প্রভৃতির মধ্যে কার্য্য হইতেছে। বেরাস্ নামক একটি নমঃশূদ্রপ্রধান গ্রামে সমিতির একজন পরিচারক কাজ ।। তথায় একটি উচ্চপ্রাইমারী বিদ্যালয়, দুইটি বালিকা বিদ্যালয় ও একটি নৈশ বিদ্যালয়, স্থাপিত হইয়াছে। ঢাকাতে চর্ম্মকার ও সূত্রধরদিগের জন্য একটি ও মেথরদিগের জন্য একটি পাঠশালা, এবং শ্রমজীবীদিগের জন্য তিনটি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। অর্থাভাবে এবং নিঃস্বার্থ ভাবে কাজ করিবার জন্য আরও পরিচারকের অভাবে সমিতির কার্য্য আশানুরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে না। বাবু রমেশচন্দ্র সেন চট্টগ্রামে মোক্তারী কাজ ছাড়িয়া উৎসাহের সহিত বঙ্গে নানা স্থানে অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন।

যশোহর জেলার শেখহাটী হাতিয়াড়া গ্রামে কেন্দ্র স্থাপন করিয়া শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী ব্রহ্মব্রত পূর্ব্বোক্তরূপ শিক্ষাবিস্তার কার্য্য করিতেছেন। বাঁকুড়াতেও এইরূপ একটি নৈশ বিদ্যালয় আছে। তাহার ছাত্রসংখ্যা ৯৪ জন।

১৩২১ ভাদ্র

মহীশূরের সার্ব্বজনীন শিক্ষা।

মহীশূর গবর্ণমেণ্ট এই নিয়ম করিয়াছেন যে অভিভাবকগণ ৭ হইতে ১১ বৎসর বয়সের মধ্যে তাঁহাদের বালকগণকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে আইন অনুসারে বাধ্য থাকিবেন। আপাততঃ কতকগুলি সহর ও জেলায় এই আইন জারী করা হইবে। তজ্জন্য সেখানে যথেষ্ট সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে।

১৩২৩ কার্ত্তিক

নমঃশূদ্রের উচ্চশিক্ষা।

ভাদ্রমাসের "নমঃশূদ্র-হিতৈষী"তে দেখিয়া সুখী হইলাম, ৪ জন নমঃশূদ্র ছাত্র বি-এ, ২ জন আই-এ, ১ জন আই-এস্‌সী, এবং ২ জন প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

শিক্ষিত নমঃশূদ্রদের প্রতি নিবেদন, তাঁহারা অন্য জাতির শিক্ষিত হিন্দুদিগকে "রাজদ্রোহী" ইত্যাদি যেন না বলেন। তাঁহারা এ-যাবৎ অবজ্ঞা লাঞ্ছনা পাইয়া আসিতেছেন বটে; কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে বিদ্বেষ ভাল নয়; ক্ষমা ও প্রীতিও ভাল।

১৩২৪ কার্ত্তিক

রাজনৈতিক অধিকার ও সামাজিক সমস্যা

এবং কলিকাতা শ্রমজীবী বিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাষণ

যে সকল দেশ স্বাধীন এবং যেখানকার অধিবাসীদের সর্ব্বপ্রকার রাষ্ট্রীয় অধিকার আছে, তাহাদেরও সামাজিক কর্ত্তব্য আছে। তাহাদের মধ্যে যাহারা সচ্চরিত্র, জ্ঞানী, সুস্থ, ও সমৃদ্ধ, দেশের দূষিতচরিত্র, মূর্খ, রুগ্ন ও দরিদ্র, লোকদের প্রতি তাহাদের কর্ত্তব্য আছে; এবং এই-সব দেশে অল্পাধিক পরিমাণে এই কর্ত্তব্য সাধিত হইয়া থাকে। আমরা যদি স্বাধীন হইতাম, এবং আমাদের সকল-রকমের রাষ্ট্রীয় অধিকার থাকিত, তাহা হইলেও এই-সব কর্ত্তব্য না করিলে আমরা অমানুষ বলিয়াই পরিচিত হইতাম। কিন্তু আমাদের জাতীয়-আত্মকর্ত্তৃত্ব নাই, এবং রাষ্ট্রীয় অধিকারও না-থাকারই মধ্যে। ইহাও নিশ্চিত, যে, নারীদের এবং "নিম্ন"শ্রেণীর লোকদের অবস্থা উন্নত না হইলে আমরা পূর্ণমাত্রায় জাতীয়-আত্মকর্ত্তৃত্ব লাভ করিতে পারিব না। যদিই বা আমরা কতকগুলি অধিকার পাই, তাহা আমরা রাখিতে পারিব না, এবং তাহা হইতে সুফল পাইব না, যদি আমাদের দেশে সকলে, পুরুষনারী নির্ব্বিশেষে, সামাজিক স্তরনির্ব্বিশেষে, উন্নত না হয়। সকলে উন্নত না হইলে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কতকগুলি চক্রী, ক্ষমতাপ্রিয়, স্বার্থপর, অসৎ লোকের হাতে যাওয়া অনিবার্য্য। তাহাতে অনিষ্ট বই ইষ্ট হইবে না।

আমরা যে শিক্ষা পাইয়াছি, তাহা অল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিতদের শ্রমজাত অর্থের সাহায্যে, আমরা যে সুখে স্বচ্ছন্দে কাল কাটাই তাহাও অশিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত লোকদের পরিশ্রমের ফলে।

গত ১৬ই আশ্বিন কলিকাতা শ্রমজীবী বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে যে সভা হয়, তাহার সভাপতিরূপে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় "নিম্ন"শ্রেণীর লোকদের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। এরূপ বক্তৃতা শুনিলে সদাশয় বুদ্ধিমান্ লোক মাত্রেরই মনে এই বিশ্বাস জন্মে, যে, আমাদের

এমন অনেক গুরুতর কর্ত্তব্য আছে, যাহা আমরা করিতেছি না বলিলেও হয়। দুঃখের বিষয় বক্তৃতাটি যথাযথ লিখিয়া লইবার ব্যবস্থা করা হয় নাই। "সঞ্জীবনী"তে যে ইহার কিয়দংশের তাৎপর্য্য দেওয়া হইয়াছে, তাহা মন্দের ভাল। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের ভাষা নাই, ভাব ও চিন্তা কতক কতক আছে। ইহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

আমাদের দেশে অসংখ্য লোক অশিক্ষিত। তাহাদের উন্নতির জন্য আমাদের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এই আলোচনা এখন আর নূতন নহে।

শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের ব্যবধান।

এ কথা মনে করিয়াও আমার লজ্জা হয় যে, গোখ্‌লে যখন অবৈতনিক নিম্নশিক্ষা প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন, তখন এই বঙ্গদেশ হইতেই তাহার প্রতিবাদ উঠিয়াছিল। এই দেশের কোন কোন বিশিষ্ট ভদ্র লোক বলিয়াছিলেন, ছোটলোকেরা যদি বিদ্যাশিক্ষা করে, তাহা হইলে আমরা চাকর পাইব কোথায়?

আমাদের দেশে অশিক্ষিত কৃষক ও নিম্নবর্ণের লোকই অধিক। দেশের যে রাজস্ব হইতে আমাদের উন্নত শ্রেণীর শিক্ষার ব্যবস্থা হইতেছে, তাহার বেশির ভাগ অর্থ আমাদের ঐ অশিক্ষিত কৃষকেরাই জোগাইতেছে। বড়মানুষের ঘরে তাহাদের ব্যয়ে যেমন কোন কোন দরিদ্র বালকের বিদ্যাভ্যাস হয়, ভাবিয়া দেখিলে আমরাও তেমনি আমাদের অনুন্নত ও নিম্নশ্রেণীর লোকদের টাকায় লেখাপড়া শিখিতেছি। কারণ, শিক্ষায় যে টাকা ব্যয় হয়, তাহার অধিকাংশ তাহারাই দেয়। এই যে তাহাদের ব্যয়ে আমাদের কিঞ্চিৎ বিদ্যাশিক্ষা হইয়াছে, তাহার কি কোন প্রতিদান আমরা করিব?

আমাদের দেশে উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের মধ্যে ব্যবধানের যে উচ্চ পর্ব্বত রচিত হইয়াছে, বিদ্যালোচনার মেঘরাশি, ঐ পাহাড়ে ঠেকিয়া এক পার্শ্বেই বারিবর্ষণ করে। উর্ব্বরতা, শ্যামলতা এক পার্শ্বেই দেখা যায়। অপর পার্শ্বে মরুভূমি ধূ ধূ করিতেছে।

পূর্ব্বের কথা।

পূর্ব্বে আমাদের দেশে ধনী ও দরিদ্র শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে এখনকার মত ব্যবধান ছিল না। তখন এমন-সকল আয়োজন ছিল যাহার দ্বারা সকল-প্রকার জ্ঞানধর্ম্মমূলক কথা আপনি সকলের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িত। উহার ফলে, পাশ্চাত্যদেশে ধনীদরিদ্রে যে প্রভেদ, পণ্ডিতে মূর্খে যে প্রভেদ রহিয়াছে, আমাদের দেশে তেমন প্রভেদ কখনও হইতে পারে নাই।

বর্ত্তমান অবস্থা।

এখন ক্রমশঃ সেই প্রভেদ বাড়িতেছে। পল্লীর সমৃদ্ধেরা নগরের মুখে ছুটিয়াছেন। পল্লীর শিক্ষিতেরা জীবিকার্জ্জনের নিমিত্ত বিদেশে বাস করিতেছেন। যাঁহারা পল্লীকে সঞ্জীবিত করিবেন, তাঁহারাই নগরে গিয়াছেন। এই কারণে পল্লী নির্জ্জীব।

ফল।

ইহার কুফল ফলিয়াছে ও ফলিতেছে। পল্লীবাসী কৃষকেরা আমাদিগকে বিশ্বাস করে না। তাহারা আমাদিগকে বিশ্বাস করিবে কেন? তাহারা জানে যে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটিয়া তাহারা যাহা উপার্জ্জন করে, জমিদার গোমস্তা, উকিল, মোক্তার, ব্যারিষ্টার সকলেই তাহা শোষণ করিয়া সেই টাকায় বাঁচিয়া আছে। সুতরাং আমরা এখন যখনই হঠাৎ তাহাদের দুয়ারে হাজির হইয়া বলি, আমরা তোমাদের উপকারের জন্য এখানে আসিয়াছি, তাহারা স্বভাবতঃই আমাদিগকে সন্দেহ করে। করিবে না কেন? তাহাদের শ্রমের ধন আমরা ভোগ করি, কিন্তু বিনিময়ে কি দিয়াছি?

বিপ্লবের সূচনা।

ইহা এক ভবিষ্যৎ বিপ্লবের সূচনা করে। এক জায়গায় যখন বায়ু একান্ত শুষ্ক, অন্য স্থলে অত্যন্ত সরস, তখনই প্রবল ঝটিকাবর্ত্ত উত্থিত হইয়া বায়ুমণ্ডলের মধ্যে সাম্য আনয়ন করে। এইরূপ বৈষম্য হইতেই বিপ্লবের সৃষ্টি হয়। শিক্ষার প্রভেদের জন্য আমাদের দেশে স্বামীস্ত্রীতে মনের মিল কমিতেছে, নিম্নবর্ণে উচ্চবর্ণে ব্যবধান ভীষণ বাড়িতেছে।

ব্যবধান দূর করিবার উপায়।

এই ব্যবধান দূর করিবার উপায় শ্রমজীবীদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। একটি দুইটি নহে, দেশের মধ্যে এইরূপ সহস্র সহস্র বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া উন্নত ও অবনতের ব্যবধান দূর করিয়া দিতে হইবে।

ভিত্তি ফাটা।

আমাদের দেশে রাজনৈতিক উন্নতির চেষ্টা চলিতেছে। সাম্রাজ্যের পুনর্গঠনের সময়ে আমরা কিছু কিছু অধিকার পাইতেও পারি। এই দেশে রাজনৈতিক সৌধনির্ম্মাণের চেষ্টা হইতেছে, অনেক মিস্ত্রী সেই কার্য্যে লাগিয়াছেন, রাজকীয় মিস্ত্রীও আমাদের অনুকূল। আমাদের এই সৌধ যত সুন্দর হউক, ইহার কারুকার্য্য যত নিপুণ হউক, মনে রাখিতে হইবে যে ঐ সৌধের ভিত্তিই ফাটা। আমাদের দেশের নিম্নস্তরে যে কোটি কোটি লোক আছে, তাহাদিগকে টানিয়া না তুলিলে আমাদের কোন উন্নতি স্থায়ী হইতে পারে না।

কলিকাতা শ্রমজীবী-বিদ্যালয়।

কলিকাতা আণ্টনীবাগান লেনের ২১-এ সংখ্যক গৃহে যে শ্রমজীবী-বিদ্যালয় আছে, তাহারই পুরস্কার বিতরণসভার কথা উপরে বলা হইয়াছে। এই বিদ্যালয় ১৯০৯ সালে স্থাপিত হয়। গত বৎসর (১৯১৬ এপ্রিল হইতে ১৯১৭ মার্চ্চ পর্য্যন্ত) প্রথমে ইহাতে ৩৬ জন ছাত্র ছিল; পরে তাহা বাড়িয়া ৪৯ হয়। ছাত্রদের বয়স ৭ হইতে ৩০ পর্য্যন্ত। তাহাদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান, বেহারী, ওড়িয়া ও বাঙালী আছে। তাহারা দপ্তরী, মুচি, গাড়োয়ান, ছাপাখানার জমাদার, প্রভৃতির কাজ করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করে। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষা, সাধারণ এবং শ্রামিক, এই দুই ভাগে বিভক্ত। সাধারণ বিভাগে বাংলা, পাটীগণিত, ইংরেজী, ইতিহাস, ভূগোল, স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম, এবং সুনীতি শিক্ষা দেওয়া হয়। শ্রামিক বিভাগের ছাত্রেরা দপ্তরীর কাজ শিখে। যাহারা এই কাজ শিখে তাহারা শিক্ষাকালে বরাবর মাসে মাসে কিছু বৃত্তি পাইয়া থাকে। দপ্তরীর কাজ শিখিয়া এখানকার কোন কোন ছাত্র আফিসে, কারখানায় ও ছাপাখানায় চাকরী পাইয়াছে। ইহারা যে বেশ ভাল বহি-বাঁধিতে পারে, মিঃ পি, সি, লায়ন, মিঃ এ, সী, আণ্ডারউড্ প্রভৃতি বহি বাঁধাইয়া তাহার সার্টিফিকেট দিয়াছেন। গত বৎসর বিদ্যালয়ের মোট আয় ৯৪৬ টাকা এবং মোট ব্যয় ৮৪৮৷৷০ হইয়াছিল। শ্রামিক বিভাগের মোট আয় ২৬৬৬ [টাকা, ১৫ আনা] ৬ [পয়সা] এবং মোট ব্যয় ২৬৩৮ [টাকা, ১৫ আনা] ৩ [পয়সা] হইয়াছিল। বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ একটি গৃহ নির্ম্মাণ করিবার

চেষ্টা করিতেছেন। তাহার জন্য ৬০০০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। আরও অনেক টাকা চাই। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেন বিদ্যালয়ের সম্পাদক।

১৩৪০ চৈত্র

মুসলমান ও অনগ্রসর হিন্দু বাঙালীর শিক্ষা

পঞ্চবার্ষিক শিক্ষাবিবরণীতে লিখিত হইয়াছে, "শিক্ষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে 'অনগ্রসর' হিন্দুরা এখন সম্পূর্ণ সজাগ হইয়াছে। ১৯২১ সালে যেখানে তাহাদের একজন ইস্কুলে যাইত, তাহার জায়গায় এখন ৫ জনের বেশী যায়। মুসলমানদের মধ্যে অগ্রগতিও প্রায় ঐরূপ চমকপ্রদ; তাহাদের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে এবং ১৯২১-২২ সালে তাহাদের শতকরা ৩.৫ জন শিক্ষাধীন থাকার জায়গায় তাহা বাড়িয়া ১৯৩১-৩২ সালে শতকরা ৫.২ হইয়াছে।" ইহা সুসংবাদ—যদিও বঙ্গে শিক্ষার বিস্তার অত্যন্ত কম হইয়াছে বলিয়া এই উন্নতি ও অগ্রগতি মোটেই যথেষ্ট নহে—ইহাতে সন্তুষ্ট থাকা যাইতে পারে না।

১৩৪২ আশ্বিন

প্রস্তাবিত শাখা প্রাথমিক-বিদ্যালয়ে জাদুমন্ত্র?

বর্ত্তমানে যে-সব প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে, শিক্ষাবিভাগ বলিতেছে, যে, তাহাতে তিন বৎসর পড়িয়াও বালক- বালিকারা লিখনপঠনক্ষম হয় না। ঐ সব বিদ্যালয় রোজ ৪ ঘণ্টা করিয়া বসে। কিন্তু শিক্ষাবিভাগের প্রস্তাবিত শাখা প্রাইমারী বিদ্যালয়গুলি রোজ দু-ঘণ্টা বসিবে এবং তাহাতে ছেলেমেয়েরা দু-বৎসর মাত্র পড়িবে। অথচ তাঁহারা মনে করেন, বর্ত্তমান বিদ্যালয়ে তিন বৎসর ধরিয়া প্রত্যহ চারি ঘণ্টা করিয়া শিক্ষা পাইয়া ছাত্রছাত্রীরা যতটা অগ্রসর হইতে পারে না, তাঁহাদের প্রস্তাবিত শাখাবিদ্যালয়গুলিতে প্রত্যহ দু-ঘণ্টা শিক্ষা দুই বৎসর পাইয়া তাহা অপেক্ষা বেশী অগ্রসর হইতে পারিবে। তাঁহারা কি কোন জাদুমন্ত্র জানেন যাহার বলে ইহা ঘটিবে?

১৩২৩ আষাঢ়

কলিকাতা অন্ধ বিদ্যালয়

আমরা এই বিদ্যালয়ের নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি।

"অন্ধদিগকে লেখাপড়া ও জীবিকা-নির্ব্বাহোপযোগী শিল্প ও গীতবাদ্যাদি শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রায় ২০ বৎসর হইল শ্রীযুক্ত লালবিহারী শাহ কর্ত্তৃক এই বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ছাত্রগণ প্রাথমিক ও ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিতে পারে। এতদ্ব্যতীত শর্টহ্যাণ্ড ও টাইপ্ রাইটিং শিক্ষা দেওয়া যায়। লেখাপড়া শিক্ষার পর অধিক বয়সে যাঁহাদের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ বা হীন হইয়াছে, তাঁহারাও টাইপ্‌রাইটিং বিভাগে যোগ দিয়া পুনরায় উপার্জ্জনক্ষম হইতে পারেন। সাধারণ ছাত্রের জন্য বেতন মাসিক তিন টাকা। বিদ্যালয়সংক্রান্ত একটি ছাত্রাবাস আছে। ছাত্রদের তত্ত্বাবধানের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত আছে; অধিকাংশ শিক্ষক ছাত্রাবাসেই থাকেন। ছাত্রাবাসের মাসিক ব্যয় দশ টাকা। কোন কোন ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড স্থানীয় বালকদের এই ছাত্রাবাসে অবস্থিতি ও পাঠের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। দরিদ্র বা নিরাশ্রয় ছাত্রের ভার বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষেরা গ্রহণ করিয়া থাকেন। যাঁহাদের অন্ধ পুত্র বা কন্যা আছে, তাঁহারা তাহাদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া তাহাদিগকে আত্মনির্ভরশীল, উপার্জ্জনক্ষম ও জীবনে যৎকিঞ্চিৎ সুখী হইতে সহায়তা করিবেন, আমরা এমত ভরসা করি। কেহ যদি বাড়ীতে পড়াইতে চান, তাহা হইলে কর্ত্তৃপক্ষ সেইমত ব্যবস্থা করিতে পারেন। বিশেষ বিবরণের জন্য ২২২ নং লোয়ার সার্কুলার রোড, বালিগঞ্জ, কলিকাতা ঠিকানায়, সুপারিণ্টেনডেণ্ট, অন্ধ বিদ্যালয়, এই নামে পত্র দিবেন।"

১৩২৮ জ্যৈষ্ঠ

প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য বিদ্যালয়

এখন যদি দেশের সর্ব্বত্র সকল বালকবালিকাদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, এবং তাহাদের সকলকেই কোন না কোন প্রকারে শিক্ষা দিবার জন্য তথায় আনিতে পারা যায়, তাহা হইলেও দেশের অজ্ঞতা ঘুচিতে বহু বিলম্ব ঘটিবে। কেন না, যে-সব প্রাপ্তবয়স্ক নরনারী বাল্যে শিক্ষা পায় নাই, তাহারা নিরক্ষরই থাকিয়া যাইবে। জানি, নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা এক জিনিষ নয়; লিখনপঠনক্ষমতা ও শিক্ষাও এক জিনিষ নয়; কিন্তু শিক্ষা দিবার, জ্ঞান বিস্তার করিবার, প্রধান উপায় লিখিতে পড়িতে শিখান।

দেশের সব লোককে জ্ঞানবান্ ও শিক্ষিত

করিবার চেষ্টা করিতে হইলে, যেমন বালকবালিকাদের, তেমনি প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষার ব্যবস্থাও করিতে হইবে। শেষোক্তদের শিক্ষার জন্য অবশ্য লেখাপড়া শিখাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে; কিন্তু মনোজ্ঞ ও জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতার ব্যবস্থাও করিতে হইবে, এবং ভাল যাত্রা, ম্যাজিক লণ্ঠন ও বায়স্কোপের সাহায্যে হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধন ও জ্ঞানদানের বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

ইংলণ্ড, আমেরিকা, প্রভৃতি দেশে নিরক্ষর লোক খুব কম, লিখনপঠনক্ষম লোকদের সংখ্যাই বেশী। তথাপি সেইসব দেশে প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষার জন্য প্রভূত চেষ্টা হইতেছে। আমাদের দেশে অধিকাংশ লোক, অধিকাংশ প্রাপ্তবয়স্ক লোক, নিরক্ষর ও অজ্ঞ। এইজন্য তাহাদের শিক্ষাদানের আয়োজন এদেশে ইংলণ্ড আদি দেশ অপেক্ষাও বৃহৎ হওয়া আবশ্যক।

এই প্রয়োজন বরাবরই ছিল। এখন খুব বেশী হইয়াছে। সাধারণ লোকেরা জাগিয়াছে, নিজেদের অধিকার দাবী করিতেছে ও পাইতেছে। তাহাদের শক্তি বাড়িতেছে, আয় বাড়িতেছে। নিজের হিতের, দেশের হিতের, জগতের হিতের জন্য, এই বর্দ্ধিত শক্তির ও বর্দ্ধিত আয়ের কি প্রকার ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা তাহাদিগের জানা দরকার। এই শিক্ষা না পাইলে, এপর্য্যন্ত যেমন এক শ্রেণীর লোক অন্য কয়েক শ্রেণীর কাঁধে চাপিয়া ছিল, এখন এবং ভবিষ্যতেও তেমনি অন্য কয়েক শ্রেণীর লোক বাকী জনসমষ্টির কাঁধে চাপিয়া থাকিবে। তাহাতে সংঘর্ষ, বিরোধ ও সামাজিক অনিষ্ট ঘটিবে।

আমাদের দেশের সাধারণ লোকেরা মধ্যবিত্ত লোকদের চেয়ে জ্ঞানে ও মার্জ্জিতবুদ্ধিতে হীন হইলেও,ভক্তি ও হৃদয়ের শক্তি তাহাদেরই বেশী বলিয়া মনে হয়। তাহারা ভাবের বশে আমাদের চেয়ে বেশী সাহসের, কষ্টসহিষ্ণুতার, স্বার্থত্যাগের কাজ, একা একা ও দলবদ্ধভাবে, করিতে পারে। সকলপ্রকার ভাব ও প্রবৃত্তির মূল্য সমান নয়। সৎভাব ও সৎপ্রবৃত্তির উন্মেষ ও বিকাশ যাহাতে হয়, যাহাতে তৎসমুদয় শক্তিশালী হয়, যেরূপ চেষ্টা করা শিক্ষার একটি উদ্দেশ্য। প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষাতেও বালকবালিকাদের শিক্ষার ন্যায়, এই উদ্দেশ্য মনে রাখা একান্ত আবশ্যক।

- ১৩২৯ মাঘ

বঙ্গে স্বাধীন শিক্ষানিকেতন

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন :—

"এ মাসের প্রবাসীতে ইউনিভারসিটি সম্বন্ধে আপনি যে আলোচনা করেছেন তার দু-এক স্থান ব্যতীত সমস্তই আমার বেশ মর্ম্মগ্রাহী হয়েছে। কিন্তু এর একটি জায়গা পড়ে' আমি বাস্তবিকই বড় দুঃখিত হয়েছি এবং আপনার কাছ থেকে তা আশা করি নাই বলেই, বোধ হয়, আমার মনে স্বতঃই কষ্ট হয়েছে। 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা' প্রবন্ধে একস্থানে লিখিয়াছেন :— "গবর্ণমেণ্টের চার্টারের ভরসা ত্যাগ, উপাধি গুলির গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন

ত্যাগ, সমুদয় ঘর বাড়ি ত্যাগ, গবর্ণ্‌মেন্টের প্রদত্ত টাকা না পাওয়া, গবর্ণ্‌মেন্টের প্রতিষ্ঠান বলিয়া উহাকে রাসবিহারী ঘোষ প্রভৃতির প্রদত্ত লক্ষ লক্ষ টাকা না পাওয়া, প্রভৃতি মানিয়া লইয়া যদি কেহ একটা স্বাধীন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে চান বা পারেন, তাহা হইলেই তাঁহার মুখে স্বাধীনতার কথা উচ্চারিত হইতে পারে।" এরূপ স্বাধীন বিশ্ববিদ্যালয়ের উদাহরণস্বরূপ হরিদ্বারের গুরুকুলের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। বাঙ্গালাদেশে কি এইরূপ কোন প্রতিষ্ঠান নাই যে উপরি-উক্ত সমস্ত সর্ত্ত প্রতিশব্দে পালন ক'রে' স্বাধীনতা পেতে পারে? আমার মনে হয়, বঙ্গের 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্' যাহার তত্ত্বাবধানে Bengal Technical Institute দেশের উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা করছে, তাহার নামোল্লেখই বাঙ্গালার গৌরবের কথা হ'তো। এই প্রতিষ্ঠান যে বাঙ্গালাদেশের একটা মস্ত গৌরবের জিনিষ, তা বোধ হয় আপনার মত লোকের অজ্ঞাত নেই। অবশ্য গুরুকুল খারাপ, আমি মনে করি না; তথাপি আমার মনে কষ্ট হয়েছে, তার কারণ বোধ হয়, ঐ গৌরবে সামান্য আঘাত লেগেছে বলেই।"

লেখক আমাদের যে ত্রুটির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা সত্য। কিন্তু জাতীয় শিক্ষাপরিষদের অনুল্লেখ ইচ্ছাকৃত নহে, বিস্মৃতি বা অসাবধানতা বশতঃই হইয়াছে। কেন আমাদের এইরূপ বিস্মৃতি ঘটিয়াছিল, এখন ঠিক্ করিতে পারিতেছি না।

১৩২৯ চৈত্র

জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের কার্য্য

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ সম্পর্কীয় আন্দোলনের সময় যতটা আশা ও যে যে উদ্দেশ্য লইয়া জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই আশা পূর্ণ ও সেই সেই উদ্দেশ্য সব সিদ্ধ না হইলেও, কেজো বৈজ্ঞানিক শিক্ষাদান বিষয়ে পরিষৎ অনেকটা সফলপ্রযত্ন হইয়াছেন এবং ভবিষ্যতে আরও হইবেন।

কলিকাতা হইতে দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী যাদবপুর নামক স্থানে পরিষৎ নিজের বাড়ী ঘর নির্ম্মাণ করিতেছেন। এখানে শিক্ষার সমুদয় বন্দোবস্ত থাকিবে, এবং ছাত্রদের বাসস্থানও থাকিবে। পরিষৎ একশত বিঘা জমি কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির নিকট হইতে মাসিক ২১০ টাকা খাজনায় ৯৯ বৎসরের জন্য ইজারা লইয়াছেন। আরও ৫০ বিঘা পাইবার আশা আছে। পরিষৎ কাজ আরম্ভ করিবার সময় নিম্নলিখিত দান পাইয়াছিলেন। বাবু ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ৫ লক্ষ, আয় বার্ষিক ২০,০০০; মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য আড়াই লক্ষ, আয় বার্ষিক ১০,০০০; শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মল্লিক এক লক্ষ, আয় বাৎসরিক ৩৬০০ টাকা। তাহার পর স্যার রাসবিহারী ঘোষ দেন ২ লক্ষ টাকার একটি বাড়ী এবং ৮,৯২,০০০ টাকার কোম্পানীর কাগজের অংশ আদি, যাহার আয় এখন বৎসরে কুড়ি হাজার টাকা হয়, কিন্তু যাহা হইতে কর্ত্তৃপক্ষ ভবিষ্যতে পঞ্চাশ হাজার পাইবার আশা করেন।

ভবানীপুরের শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র সিংহ কৃষিশিক্ষা দানের জন্য লক্ষ টাকা মূল্যের একটি সম্পত্তি দিয়াছেন, যাহার আয় বৎসরে ৪৫০০ টাকা হইবে।

বর্ত্তমানে পরিষদের শিক্ষালয়-আদি মুরারিপুকুরে আছে। সেখানকার কাজ শিখাইবার কার্‌খানার মূল্য সওয়া লক্ষ টাকা, সরঞ্জামের মূল্য ত্রিশ হাজার, নানাবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের মূল্য ষাট হাজার টাকা।

১৯২১ সালে ৩০০০ ছেলে ভর্ত্তি হইতে চাহিয়াছিল; ১৯২২এ ২০০০; কিন্তু স্থানাভাবে অধিকাংশ ছাত্র লওয়া হয় নাই। এক্ষণে ছাত্রসংখ্যা ৬৫০। ছাত্রেরা প্রত্যেকে মাসিক ছয় টাকা বেতন দেয়, কিন্তু ছাত্রপ্রতি গড়ে মাসিক ১৫ টাকা খরচ হয়। খরচ আরও অনেক বেশী হইত, যদি শিক্ষকগণ স্বার্থ ত্যাগ করিয়া খুব কম বেতনে কাজ না করিতেন। ইঁহারা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য এবং বঙ্গীয় সর্ব্বসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষও বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

যাদবপুরে ইতিমধ্যে একটি ঝীল খনিত হইয়াছে, তাহা ৫০০ ফুট লম্বা, ১০০ ফুট চৌড়া ও ১০ ফুট গভীর। পদার্থ বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারে ৮০,০০০ এবং রাসায়নিক পরীক্ষাগারে ৭০, ০০০ টাকা খরচ পড়িবে। প্রধান কলেজ-অট্টালিকাটির খরচ হইবে দুই লক্ষ টাকা, কাজ শিখাইবার ও যন্ত্রাদি নির্ম্মাণের কার্‌খানা ৯০,০০০, আপাততঃ একশত জন ছাত্রের জন্য দুটি ছাত্রাবাস ৫০,০০০ টাকা। আরও পাঁচটি ছাত্রাবাস এবং একটি হাঁসপাতাল প্রস্তুত করিতে হইবে। সরঞ্জাম ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির জন্যও প্রায় দুই লক্ষ টাকা লাগিবে।

ইহা হইতে বুঝা যাইবে, যে, পরিষদের অনেক টাকার দরকার। এ পর্য্যন্ত দেশের কয়েকজন মাত্র ধনী লোক ইহাতে টাকা দিয়াছেন। আরো বিস্তর ধনী লোক আছেন যাঁহারা দিতে পারেন, এবং যাঁহাদের দেওয়া উচিত।

কিন্তু ধনী লোকদের উপরই কোন ভাল কাজের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে, এবং সেরূপ ভার দিয়া থাকিলে চলেও না। সাধারণ লোকরাও টাকা দিয়া খুব বড় প্রতিষ্ঠান খাড়া করিতে ও চালাইতে পারেন। তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

হরিদ্বারের গুরুকুল

হরিদ্বারে আর্য্যসমাজের যে গুরুকুল নামক বিদ্যালয় আছে, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ তাহার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি পূর্ব্বে মহাত্মা মুন্‌শীরাম নামে পরিচিত ছিলেন। এই গুরুকুলের বার্ষিক উৎসব সম্প্রতি হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষ্যে হাজার হাজার নরনারী সমবেত হইয়াছিলেন। অনেক পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতাআদি হইয়াছিল। যখন টাকার জন্য সমবেত জনমণ্ডলীর নিকট আবেদন করা হইল, তখন গুরুকুলের জন্য একলক্ষ টাকা এবং আর্য্যসমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জন্য চল্লিশ হাজার টাকা চাঁদা উঠিল। কেবল এই বৎসরই যে এইরূপ চাঁদা উঠিয়াছে, তাহা নহে। প্রতি বৎসরই গুরুকুলের

বাৎসরিক উৎসবের সময় বেশী পরিমাণ চাঁদা উঠিয়া থাকে। ইহা দু-একজন ধনী লোক দেন না, অল্প আয়ের বহুসংখ্যক লোকে দিয়া থাকেন। বাংলাদেশে কোনও কাজের জন্যই এই রকম দান প্রতি বৎসর দেখা যায় না। অথচ বাঙালী ইচ্ছা করিলে দান করিতে পারেন, তাহা অল্প কাল আগে উত্তরবঙ্গে প্লাবনপীড়িত লোকদের সাহায্যার্থে দানে দেখা গিয়াছে।

১৩৩৫ ফাল্গুন

"বয়েজ্ নার্সারী হোম"

কলিকাতা নলিনবিহারী সরকার স্ট্রীটের ৬নং ভবনে স্থিত "বয়েজ্ নার্সারী হোম" নামক ছাত্রাবাসসমন্বিত বিদ্যালয়টি উৎকৃষ্ট প্রণালীতে পরিচালিত। ইহার ইংরেজী শিখাইবার রীতি উৎকৃষ্ট। শিশুরা যেন ভিন্ন ভিন্ন বস্তু, ক্রিয়া ও ভাববিশেষের সহিত শব্দবিশেষের সম্বন্ধ লক্ষ্য করিয়া ভাষা শিক্ষা করে, সেইরূপ সাক্ষাৎ শিক্ষাপ্রণালীতে এখানে ইংরেজী শিখান হয়। অন্যান্য বিষয়ও উৎকৃষ্ট রীতিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। ছাত্রদের শারীরিক উন্নতির জন্য ব্যায়াম-শিক্ষার ও খেলার বন্দোবস্ত আছে। নীতি শিক্ষা দেওয়া হয়। শ্রীযুক্ত অশোককুমার গুপ্ত ইহার অধ্যক্ষ। তিনি শিক্ষা-কার্য্যে দক্ষ। ভারতীয় ও বিদেশী অনেক শিক্ষাপারদর্শী বিখ্যাত লোক এই বিদ্যালয়ের প্রশংসা করিয়াছেন।

১৩৪১ কার্ত্তিক

বরিশালের ব্রজমোহন ইন্সটিটিউশ্যনের জুবিলী উৎসব

স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত ব্রজমোহন ইন্সটিটিউশ্যন বাংলা দেশে কেবল ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার কল্পে সাহায্য করিয়াছে, এমন নহে, বিস্তর ছাত্রের প্রাণে ধর্ম্মভাব ও স্বদেশপ্রেম উদ্দীপিত করিয়াছে। গত ১৫ই সেপ্টেম্বর ইহার পঞ্চাশ বৎসর বয়স অতিক্রম করা উপলক্ষ্যে উৎসব হইয়া গিয়াছে। তাহাতে সভাপতিরূপে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় অন্যান্য কথার মধ্যে বলেন :—

আমাদের দেশে শিশুমৃত্যুর হার অধিক; মানুষেব মধ্যে বটে, এবং প্রতিষ্ঠানের মধ্যেও বটে! পঞ্চাশবৎসরব্যাপী অস্তিত্বের গৌরব করিতে পারে,

সতীশচন্দ্র রায় • শ্রাবণ ১৩৩৮

ত্রিগুণা সেন • কার্তিক ১৩৩৬

গণিতাধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত • মাঘ ১৩৪২

অধ্যক্ষ সুশীলকুমার রুদ্র • শ্রাবণ ১৩৩২

প্রভৃতিতে বিশেষত্ব আছে। অন্য যে সকল চিত্রে বহুলোকের সমাবেশ আছে, তাহাতেও প্রত্যেকের কিছু না কিছু স্বতন্ত্র কার্য্য দেখান হইয়াছে; কেবল কতকগুলা কাঠের পুতুলের মত মানুষ সাজাইয়া দেওয়া হয় নাই। গ্রিফিথ্‌স্ সাহেবের মত আমরা পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি। ফর্গুসন সাহেব বলেন যে অজণ্টাচিত্রগুলি আধুনিক ইউরোপীয় চিত্রের সমতুল্য নহে, কিন্তু সে গুলি যে যুগে চিত্রিত হইয়াছিল, তাৎকালিক ইউরোপীয় চিত্র অপেক্ষা নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট। গ্রিফিথ্‌স্ বলেন :—

"The Ajanta workmanship is admirable; long subtle curves are drawn with great precision in a line of unvarying thickness with one sweep of the brush, both on the vertical surface of walls and on the more difficult plane of the ceiling, showing consummate skill and manual dexterity."

৩য় চিত্র।

ধারণা ছিল, তাহাও আমরা অজণ্টাচিত্রাবলী হইতে, জানিতে পারি। আরও যে সকল জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, আমরা ক্রমে ক্রমে তাহার কিয়দংশের উল্লেখ করিব।

যে সকল চিত্রে জনসংহতি বুদ্ধের আরাধনা ও উপাসনা

৪র্থ চিত্র।

করিতেছে, তৎসমুদয়ে প্রত্যেক ব্যক্তিই সজীব, প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব আছে, প্রত্যেকের মুখভাব, অঙ্গভঙ্গী

৫ম চিত্র।

ইউরোপীয় সমালোচকদিগের মতে অজণ্টাচিত্রগুলির কতকগুলি বিশেষত্ব (peculiarity) আছে। আমাদের দেশে পুরাকাল হইতে আকর্ণবিস্তৃত অর্থাৎ পটোলচেরা

অবনীন্দ্রনাথ
সৌজন্যে *নিবেদিতা লোকমাতা* গ্রন্থ

যৌবনে অবনীন্দ্রনাথ • ফাল্গুন ১৩৪৭

অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যবর্গ : (পিছনে, বাম দিক থেকে) সত্যেন দত্ত, অবনীন্দ্রনাথ, হাকিম খাঁ, সুরেন কর। (মধ্যে) বেঙ্কটাপ্পা, নন্দলাল। (সামনে, বামদিক থেকে) দুর্গেশ সিংহ, অসিতকুমার হালদার, শৈলেন দে, ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার) • আশ্বিন ১৩৪৮
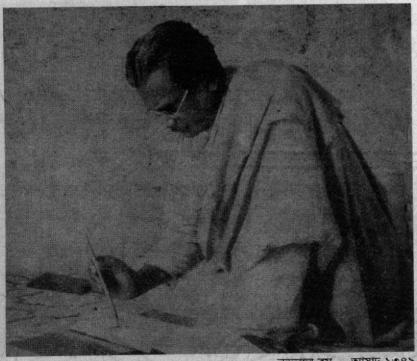
নন্দলাল বসু • আষাঢ় ১৩৪৯

নিবেদিতা পড়ার টেবিলে
সৌজন্যে *নিবেদিতা লোকমাতা* গ্রন্থ

রবীন্দ্রনাথ ও আনন্দ কুমারস্বামী
• আশ্বিন ১৩৪৮

ঈ বী হ্যাভেল • মাঘ ১৩৪১

গগনেন্দ্রনাথের আত্মপ্রতিকৃতি
সৌজন্যে *Gaganendranath Tagore* গ্রন্থ
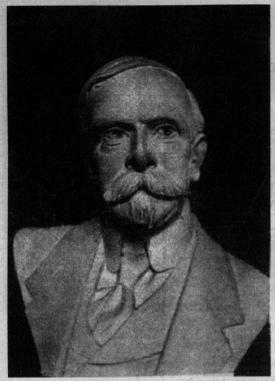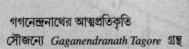
রাজা রবিবর্মা • অগ্রহায়ণ ও পৌষ ১৩০৮
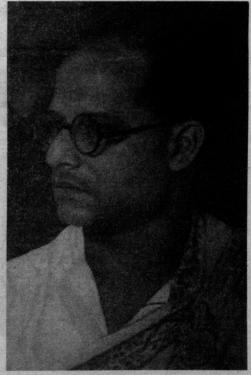
দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী • পৌষ ১৩৪১

গণপৎ কাশীনাথ ম্হাত্রে • শ্রাবণ ১৩০৮

বরদাচরণ উকিল • মাঘ ১৩৪২
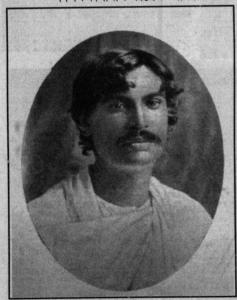
সারদাচরণ উকিল • বৈশাখ ১৩৩৯

অর্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলি • চৈত্র ১৩৪৩

এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অঙ্গুলীতে গণনা করা যায়। ব্রজমোহন ইনষ্টিটিউশ্যন এই পঞ্চাশ বৎসর কাল কেবল অস্তিত্ব বজায় রাখে নাই,—ইহা মানবপ্রাণে প্রেরণা জাগাইয়াছে, বাংলা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সংস্কৃতি ও আদর্শ প্রচার করিয়াছে। ব্রজমোহন ইনষ্টিটিউশ্যন কেবল মাট্রিকুলেট প্রস্তুত করিবার কারখানা নহে; ইহা অশ্বিনীকুমারের আদর্শবাদের মূর্ত্ত প্রতীক। যাহাতে কিশোর ও তরুণদল উত্তরকালে জীবনযুদ্ধে জয়ী হইতে পারে, মনুষ্যত্বের গৌরবে সমুন্নত শিরে দাঁড়াইতে পারে, তাহাদিগকে তদ্রূপ শিক্ষাদানই ছিল অশ্বিনীকুমারের লক্ষ্য। তিনি ছাত্রদিগকে কেবল পুঁথিগত শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ব্রজমোহন ইনষ্টিটিউশ্যন স্থাপন করেন নাই। তিনি তাহাদিগকে নৈতিকশিক্ষা ও ধৰ্ম্মশিক্ষা দিয়া আদর্শ মানুষ করিয়া তুলিতেন।

১৩২৭ বৈশাখ
তুর্ক-সাম্রাজ্যে শিক্ষার বিস্তার।

যে-সকল কারণ দেখাইয়া তুর্ক সাম্রাজ্যকে অঙ্গহীন ও ক্ষুদ্র করিবার এবং তুরস্কের সুলতানকে রাষ্ট্রীয়শক্তিহীন করিবার ও তাঁহাকে কনষ্টান্টিনোপল্ হইতে তাড়াইবার চেষ্টা হইয়া আসিতেছে, সেগুলি সত্য হইলে, ঠিক্ ঐরূপ কারণে জার্ম্মেনী, বুল্‌গেরিয়া, রুমেনিয়া প্রভৃতির প্রতিও ঐরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত ইহা আমরা আগে বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি।

তুর্কদের বিরুদ্ধে একটা কথা এই বলা হয় যে, উহাদের শাসনাধীন দেশে কোন উন্নতি হয় না, দেশ উচ্ছন্ন যায়। ইহার সত্যমিথ্যা স্থির করা কঠিন; কারণ আমাদিগকে তথ্য জানিতে হয়, ইউরোপীয় বা আমেরিকান্ খ্রীষ্টিয়ান লেখকদিগের খবরের কাগজ ও বহি হইতে। অন্য দেশের ও জাতির রাজনৈতিক লেখকদের মত তাহাদের মধ্যেও নিরপেক্ষ সত্যবাদী লোকের সংখ্যা বেশী নহে। যাহা হউক, একটা বিষয়ে খ্রীষ্টীয় লেখকদের বহি হইতেই প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, যে, তুর্কশাসনকে যত মন্দ বলা যাইতেছে, উহা তত মন্দ নহে। বিষয়টি শিক্ষা। "১৯১৭-১৮ সালে ভারতীয় শিক্ষা" (Indian Education in 1917-18) নামক সর্‌কারী রিপোর্টের ৪ পৃষ্ঠায় দেখা যায়, যে, ঐ বৎসর ব্রিটিশভারতের সমস্ত অধিবাসীর শতকরা ৩.২৬ জন কলেজ বিদ্যালয় ও পাঠশালার শিক্ষা পাইতেছিল। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত ১৯২০ সালের নিউ হেজেল এনুয়েল (*The New Hazell Annual*) নামক বার্ষিক পুস্তকের ৫৯৬ পৃষ্ঠায় আছে যে তুর্ক-সাম্রাজ্যের লোকসংখ্যা ১,৩৪, ৮১,০০০, এবং ৫৯৭ পৃষ্ঠায় আছে যে তথায় ছাত্রসংখ্যা ১৩,৫০,০০০। তাহা হইলে ঐ সাম্রাজ্যের অধিবাসীদের শতকরা ১০ জনেরও অধিক শিক্ষাধীন। অতএব, তথায় শিক্ষার বিস্তার ব্রিটিশভারতের তিন গুণেরও বেশী, এবং ইটালী, গ্রীস, স্পেন, পোর্টুগ্যাল ও রুশিয়া অপেক্ষাও উহা বেশী।

১৩৩৬ অগ্রহায়ণ

রুশিয়ায় প্রাথমিক শিক্ষার নববিধ চেষ্টা

অনেক দেশে আগে এইরূপ নিয়ম ছিল এবং এখনও আছে, যে, সমর্থ-বয়সের সুস্থ সব পুরুষকে যুদ্ধ শিখিতে এবং দরকার মত যুদ্ধ করিতে হইবে। এই নিয়মকে কন্সক্রিপ্‌শ্যন বা বলপূর্ব্বক যোদ্ধৃতালিকাভুক্তকরণ বলে। রুশিয়ার একটি সহরে অন্য রকমের কন্স্ক্রিপশ্যন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সেখানে নিয়ম হইয়াছে, যে, নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিকে যুদ্ধ করিতে হইবে। যুদ্ধের প্রকার ও প্রণালী এই, যে, ১৮ ও ৫০ বৎসর বয়সের প্রত্যেক শিক্ষিত পুরুষ ও স্ত্রীলোক, যাহারা কোন বিদ্যাশালায় ৬ বৎসরের অধিক শিক্ষা পাইয়াছে, বৎসরে ২১৮ ঘণ্টা শিক্ষা দিতে বাধ্য হইবে।

নৈশ বিদ্যালয়ে এই শিক্ষা দিতে হইবে। সুতরাং শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী ছাত্র ছাত্রী কাহারও দৈনিক নিত্য কর্ম্মে বাধা জন্মিবেনা। যাহারা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সময় কাজ করিতে পারিতেছে না দেখা যাইবে, তাহাদের উপর একটা বিশেষ ট্যাক্স বসান হইবে। "ওয়েলফেয়ার" নামক কলিকাতার ইংরেজী সাপ্তাহিকে এই সংবাদটি দেওয়া হইয়াছে।

প্রাথমিক শিক্ষার জন্য মানুষের উপর ট্যাক্স বসান অপেক্ষা রুশিয়ার এই সহরের ঐ নিয়মটি সুচিন্তিত এবং অর্থনীতিশাস্ত্রের অধিকতর অনুমোদিত। ট্যাক্স বসাইলে লোকের নিয়মিত আয় কমান হয়। কিন্তু রুশিয়ার এই নিয়মটিতে অধিবাসীদের আয়ের সমষ্টি পরোক্ষভাবে বাড়িয়া যায়। কারণ, যে শিক্ষাদানের কাজটি অনেক টাকা খরচ করিয়া করাইতে হইত, অধিবাসীদিগের অবসর সময়ের কিয়দংশের সদ্ব্যয়ে তাহা নির্ব্বাহিত হইয়া যাইবে। সুতরাং বেতনভোগী শিক্ষক রাখিতে হইলে যত ব্যয় হইত, সমগ্র সমাজের আয় তত বাড়িয়া সৎকার্য্যে তাহা ব্যয়িত হইতেছে, ধরিতে হইবে। অবসর-সময়ের এরূপ সদ্ব্যয়ে, বিনাবেতনে শিক্ষা যাঁহারা দিবেন, মানবসেবা দ্বারা তাঁহাদের ও চারিত্রিক উন্নতি হইবে।

বঙ্গে ও ভারতবর্ষের অন্য সব প্রদেশে এইরূপ নিয়ম করিলে খুব ভাল হয়। তাহাতে নিরক্ষরদের অজ্ঞতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং অলস প্রকৃতির শিক্ষিত লোকদের আলস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ—যুগপৎ উভয়ই করা হইবে।

গবর্ণমেণ্ট রুশিয়ার সহরটির মত আইন নিশ্চয়ই করিবেন না। কিন্তু আমরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিয়া একমত হইয়া এরূপ নিয়ম অন্ততঃ ক্ষুদ্র এক একটি গ্রামের জন্যও করিতে পারি না কি? এক জন মানুষও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এইরূপ নিয়মপালনের ব্রত গ্রহণ করিলে তাহারও সুফল ফলিবে।

১৩৪২ শ্রাবণ

চীনে নিরক্ষরতা দূরীকরণের চেষ্টা

চীন দেশে নিয়ম হইয়াছে, যে, ছাত্রদিগকে এই সর্ত্তে গ্র্যাজুয়েট হইতে দেওয়া হইবে, যে, তাহারা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে সাহায্য করিবে। আমরা বহু বৎসর ধরিয়া বলিয়া আসিতেছি, যে, আমাদের দেশের লেখাপড়া জানা লোকদের নিরক্ষর লোকদিগকে শিক্ষা দেওয়া একটি কর্ত্তব্য—ঋণপরিশোধ হিসাবে কর্ত্তব্য। চীনে আর একটি নিয়ম হইয়াছে, যে, দোকানের ও কারখানার মালিকদিগকে তাঁহাদের নিযুক্ত লোকদের শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। এরূপ নিয়ম আমাদের দেশেও হওয়া উচিত। সর্ব্বোপরি চীনে নিয়ম হইয়াছে, যে, ১৯৩৬ সালের ১লা মের পর যে-কেহ একখানি চৈনিক ভাষার বর্ণপরিচয় পড়িতে না পারিবে, তাহার অর্থদণ্ড হইবে।

আমাদের দেশে এই রকম সব আইন করাইবার চেষ্টা কেহ করিবার ইচ্ছা করিলে তাঁহার পক্ষে এড্‌ভোকেট জেনার‍্যালের মত লওয়া ভাল, যে, এরূপ চেষ্টা সিদীশন বিবেচিত হইবে কি না।

১৩১৬ অগ্রহায়ণ

[পাঠ্যপুস্তক রচনার নীতি]

আমরা বাল্যকালে পদ্যপাঠ তৃতীয়ভাগের যে সংস্করণ পড়িয়াছি, তাহাতে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের—

স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়।
দাসত্বশৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায়॥

ইত্যাদি কবিতা ছিল। উহা সরকারী শিক্ষাবিভাগ কর্ত্তৃক পাঠ্যপুস্তক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সেকাল হইতে আমরা এখন অনেক দূরে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এখন বিদ্যার যে যে শাখার আলোচনা করিলে মানুষের স্বদেশভক্তির উদ্রেক্ হয়, সাহস ও মনুষ্যত্ব লাভের ইচ্ছা করে, স্বাধীন হইবার ইচ্ছা জাগিয়া উঠে, অবনত দশায় লজ্জা বোধ হয়, তাহা ত প্রকারান্তরে বাদ পড়িতেছেই, অধিকন্তু এখন বিদ্যালয়ে যেসকল বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে, তজ্জন্য নির্দ্দিষ্ট পুস্তকগুলি এরূপভাবে লিখিত হওয়া চাই, যে তদ্দ্বারা যেন মানুষ কেবল বেশ শান্ত শিষ্ট হইতে ও চিরপরাধীনতায় সন্তুষ্ট থাকিতে শিক্ষা পায়। দেশভক্তি, মনুষ্যত্ব, সাহস, অবনত অবস্থায় অসন্তোষ, তেজস্বিতা, এসকল শিক্ষা এখন আর আমাদের ছেলে মেয়েরা তাহাদের পাঠ্যপুস্তক হইতে যেন না পায়, প্রকারান্তরে তাহারই ব্যবস্থা

অনেক দিন হইতে হইয়া আসিতেছে।

এ অবস্থায় কর্ত্তব্য কি? প্রথম কর্ত্তব্য এই যে গৃহপাঠ্য এরূপ পুস্তক সকল রচনা করা উচিত, যাহাতে এইরূপ শিক্ষা তরুণবয়স্ক সকলে পাইতে পারে। দ্বিতীয় কর্ত্তব্য এই যে আমাদিগকে, সরকারী শিক্ষাবিভাগ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুগ্রহনিরপেক্ষ বহুসংখ্যক বিদ্যালয় সংস্থাপন করিতে হইবে, যাহাতে আমরা মনের মত শিক্ষা দিতে পারি। দেশভক্তি ও মনুষ্যত্ব শিক্ষা দিতে হইলে, অন্য স্বাধীনদেশের লোকদের মত সর্ব্ববিষয়ে উন্নত হইতে উত্তেজিত করিতে হইলে যে বেআইনী বহি লিখিতেই হইবে, তাহা নয়। আগেকার সংস্করণের পদ্যপাঠ বেআইনী বহি ছিল না। এইরূপ বেসরকারী বিদ্যালয়সমূহে স্বাধীনভাবে লিখিত বহি সকল পঠিত হইতে পারিবে। সমুদয় সুসভ্যদেশে শৈশব হইতে বালকবালিকাদিগকে স্বদেশপ্রেম শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে। আমাদের দেশে প্রকৃত স্বদেশ- প্রেমের বিশেষ প্রয়োজন। সুতরাং আমাদিগকেও উহা সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ ভাবে শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। শিশু সাহিত্যকে এই দেশভক্তির পরিপোষক করিতে হইবে।

সাহিত্য ও স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপন সম্বন্ধে আমরা যেরূপ ব্যবস্থা করিতে স্বদেশবাসিগণকে আহ্বান করিতেছি, কার্ত্তিক মাসের প্রবাসীতে লিখিত ইতিহাস ভূগোল বিষয়ক পুস্তক লিখিবার প্রস্তাব তাহারই অঙ্গ।

১৩২০ চৈত্র

[বোর্ডিং স্কুল হওয়া উচিত কিনা]

কাগজে এইরূপ পড়িয়াছি যে কলিকাতায় বিস্তৃত-হাতা-যুক্ত একটি বড় বাড়ী লইয়া বাঙ্গালী ছেলেদের জন্য বিলাতী পব্লিক স্কুলের মত একটি সাশ্রম বিদ্যালয় (Boarding school) স্থাপিত হইবে। ইহার সম্বন্ধে ঠিক সমস্ত খবর জানিতে পারি নাই। শুনিয়াছি, ইহার জন্য বিলাত হইতে ইংরেজ শিক্ষক আনা হইবে, এবং বালকদিগের নিকট হইতে মাসিক ৫০্ কিম্বা ৭৫্ টাকা হিসাবে ব্যয় লওয়া হইবে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষকে জ্ঞানদান, মানুষের অজ্ঞাতপূর্ব্ব তথ্য আবিষ্কারের ক্ষমতা বিকশিত করিয়া তুলা, মানুষের চরিত্রগঠন, এবং মানুষের জীবিকা নির্ব্বাহের ক্ষমতা জন্মান। আমরা দেখিতেছি যে ভারতবর্ষীয় শিক্ষকেরা এই কয়েকটি অঙ্গেই আপনাদের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়াছেন। পুস্তকে লিখিত বিদ্যা ছাত্রদের আয়ত্ত করিয়া দিতে বাঙ্গালী শিক্ষকেরা ভাল রকমেই পারেন, সুতরাং সে বিষয়ে কিছু বলা অনাবশ্যক। ভারতবর্ষের শিক্ষাবিভাগে আবিষ্কার ও উদ্ভাবন-ক্ষমতা বিকশিত করিতে ইংরেজ অপেক্ষা বাঙ্গালী বেশী সমর্থ হইয়াছেন। আমাদের দেশে ব্যবসা বাণিজ্য বাদ দিলে দেখা যায় যে উকীল ও ব্যারিষ্টারেরা সকলের চেয়ে বেশী রোজগার করেন। আমরা যতদূর জানি, বাঙ্গালী উকীল ও বাঙ্গালী

ব্যারিস্টারদের মধ্যে যাঁহারা সকলের চেয়ে বেশী টাকা পান, তাঁহারা বাল্যকালে বাঙ্গালী শিক্ষকের নিকটই শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহাদের উপার্জ্জন-ক্ষমতা কম হইয়াছে কি না বলিতে পারি না।

প্যারীচরণ সরকার, রাজনারায়ণ বসু, রামতনু লাহিড়ী, প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় শিক্ষকের প্রভাব যে সব ছাত্র হৃদয়ে অনুভব করিয়া মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের কেহ কেহ এখনও সাক্ষ্য দিবার জন্য জীবিত আছেন। জীবিত শিক্ষকদের নাম করিতে চাই না। কিন্তু ইহা বলাই যথেষ্ট যে সৎশিক্ষকের অত্যন্ত অভাব এখনও আমাদের দেশে হয় নাই। মানুষ চিনিবার ক্ষমতা থাকিলে এবং কার্য্যতঃ গুণের আদর করিলে এখনও পর্য্যাপ্ত সংখ্যায় সুশিক্ষক পাওয়া যাইতে পারে।

একপক্ষে ক্ষমতা ও অপর পক্ষে ভয়, ইহাতে মানুষ গড়ে না। চরিত্রগঠন এ উপায়ে হয় না। শিক্ষক যদি ছাত্রকে ভাল বাসেন, তাহা হইলে ছাত্র স্বভাবতঃ শিক্ষকের আজ্ঞানুবর্ত্তী হয় এবং তাঁহার চরিত্রের সদ্‌গুণ সকলের প্রভাবে ছাত্রের সদ্‌গুণ-সকলের বীজ অঙ্কুরিত ও ক্রমশ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ইহা দুঃখের বিষয় বটে, কিন্তু ইহা সত্য যে ভারতবর্ষে ও পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্বেত ও অশ্বেত জাতির পরস্পর মনের ভাব ও সম্বন্ধ যেরূপ, তাহাতে বাঙ্গালী শিক্ষক ও বাঙ্গালী ছাত্রের মধ্যে যতটা হৃদয়ের যোগ হইতে পারে, ইংরেজ শিক্ষক ও বাঙ্গালী ছাত্রের মধ্যে ততটা হইবার সম্ভাবনা কম। সুতরাং আমাদের বিবেচনায় সাশ্রম বিদ্যালয়ে বাঙ্গালী শিক্ষক রাখাই কর্ত্তব্য।

আমরা ও আমাদের ছেলেরা সকলেই শিষ্ট, শান্ত, বিনীত, শ্রদ্ধাবান্, আত্মিকশুচিতাসমন্বিত, ইহা বলিতে পারি না। কিন্তু ইহা বলা বোধ হয় অপ্রকৃত হইবে না যে আমাদের জাতীয় চরিত্রে কোমল গুণাবলী অপেক্ষা দৃঢ়তা, সাহস, স্বাধীনতাপ্রিয়তা, প্রভৃতি পৌরুষব্যঞ্জক গুণের অভাব বেশী, এবং আমাদের মধ্যে আত্মীয়প্রীতি অপেক্ষা স্বদেশপ্রেমের অভাবই বেশী। ইহা যদি ঠিক্ হয়, তাহা হইলে বিবেচ্য এই যে আমাদের বালকদের চরিত্রগঠন সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার সময়, অন্যান্য সদ্‌গুণ বিকাশে অবহেলা না কবিয়া, দৃঢ়তা, সাহস, স্বাধীনতাপ্রিয়তা, স্বদেশপ্রেম প্রভৃতি বিকশিত করিয়া তুলিবার বিশেষ ব্যবস্থা ও চেষ্টা করা কর্ত্তব্য কি না। যদি তাহা কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে ভারতের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা, ভারতীয় সরকারী ও বেসরকারী ইংরেজদের মনের গতি, ভারতবাসীদের প্রতি তাঁহারা যে নীতি অবলম্বন করা কর্ত্তব্য মনে করেন, ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া কেহ কি বলিতে পারেন, যে ইংরেজ শিক্ষকের অধীনে আমাদের এই-সকল সদ্‌গুণ বাড়িবার সম্ভাবনা? অতিমানুষ ব্যতিক্রমস্থল ইংরেজ কেহই নাই, বা থাকিতে পারেন না ইহা কেমন করিয়া বলিব? কিন্তু সাধারণতঃ ইহা সত্য যে ইংরেজেরা আমাদের ছেলেদের মধ্যে বাধ্যতা, সেলামপটুতা, তাঁহাদের সমক্ষে সভয় ব্যবহার, ইত্যাদি যতটা দেখিতে চান, দৃঢ়তা, সাহস, স্বাধীনতাপ্রিয়তা, স্বদেশপ্রেম সেরূপ দেখিতে চান না, সহ্য করিতেও পারেন না। স্বদেশে তাঁহারা দৃঢ়তা, স্বাধীনতাপ্রিয়তা প্রভৃতির বিকৃতি-ও বাড়াবাড়িজনিত বাঁদরামি ও ছেলেমানুষি যে চক্ষে দেখেন, এখানে তাহা দেখেন না; বরং তাঁহারা এগুলিকে বিদ্রোহিতা বা তাহার পূর্ব্বলক্ষণ জ্ঞান করেন। সুতরাং ছেলেদের মনের উপর ইংরেজ শিক্ষকের শাসনভয়ের চাপ চাপাইয়া দিলে তাহাদের মনুষ্যত্ব ও স্বদেশপ্রেম বাড়িবে বলিয়া ত মনে হয় না। কুফলের আশঙ্কা একেবারেই

থাকিবে না এরূপ বন্দোবস্তে কেহ কখন সুফল পায় নাই। ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়া চোট লাগিতে পারে, এমন কি অঙ্গহানি বা প্রাণনাশ পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে, এটুকু মানিয়া না লইলে, পাকা ঘোড়সোয়ার প্রস্তুত হয় না। আমাদের ছেলেরা পুরুষবাচ্চার মত হয়, ইহা যদি আমরা চাই, তাহা হইলে কেহ কেহ রূঢ় হইয়াও যাইতে পারে, এ আশঙ্কার পরিহার একেবারে করা যায় না। কিন্তু শিক্ষকেরা যদি এরূপ জাতির লোক হন, যাঁহারা নিজেদের অলক্ষিতেও ভাবিতে বাধ্য হন, "We must teach them their place", "তাদের স্থান যে আমাদের নীচে তা তাদের শিখাতে হ'বে", তাহা হইলে কেমন করিয়া মানুষ তৈয়ার হইবে? আসল কথা এই যে শিক্ষক যদি এইরূপ মনে করিতে পারেন যে "আমার ছাত্র যত বড় পণ্ডিত, যতই তেজস্বী, সাহসী, দৃঢ়চিত্ত হউক না, তাহাতে আমার বা আমার দেশের লোকদের কোন স্বার্থে ঘা পড়িবে না, প্রত্যুত তাহাতে আমার ও আমার স্বদেশের গৌরব, শক্তি, ও অধিকার বাড়িবে ও উন্নতি হইবে"। তাহা হইলেই তাঁহার দ্বারা ছাত্রদের চরিত্র অভীষ্টরূপে গঠিত হইবে; অন্যরূপ শিক্ষকদের নিকট হইতে মনুষ্যত্বের অনুপ্রাণনা লাভের আশা সুদূরপরাহত।

বিলাতের পব্লিক্‌স্কুল হইতে যে-সব বালক মানুষ হইয়া বাহির হয়, তাহারা বাধা বিঘ্নের মধ্যে নিজের বুদ্ধি খাটাইয়া কাজ উদ্ধার করিতে পারে, সঙ্কটে নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারে, বিপদ্‌কে অগ্রাহ্য করিতে পারে, এইজন্য, যে, তাহারা খুব স্বাধীনতা পায়, এবং সে দেশের সামাজিক হাওয়া ও রাজনৈতিক হাওয়া এইরূপ স্বাধীনতার পক্ষে। ঐ-সকল স্কুলের শিক্ষকদিগকে যদি রুশিয়ায় বা চীনে শিক্ষা দিতে হইত, তাহা হইলে ঠিক্ বিলাতের ছাত্রদের মত মানুষ তাঁহারা গড়িতে পারিতেন না। বিলাতে ঐসব স্কুলের ছাত্রদিগকে স্বাধীনতা দেওয়ায় অনেক ছেলে যে বিগড়াইয়া যায় না, তাহা নয়; কিন্তু যাহারা উত্‌রায় তাহারা ভারী ভারী কাজের উপযুক্ত হইয়া উঠে। পব্‌লিক স্কুলগুলির শিক্ষাপদ্ধতি বা তাহাদের আদর্শ যে সব দিক্ দিয়াই ভাল, তাহা নয়। কিন্তু তাহার বিস্তৃত আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে।

এখানে আপত্তি উঠিতে পারে যে, দেশে দেশী শিক্ষকদের দ্বারা চালিত যে-সব স্কুল আছে, তৎসমুদয়ের দ্বারা বক্ষ্যমাণ আদর্শ অনুযায়ী চরিত্র গঠিত হইতেছে কি? উত্তরে বক্তব্য এই যে মোটের উপর তাহা হইতেছে না বটে; কোথাও যে একটুও হইতেছে না, তাহাও নয়। কিন্তু অনেক টাকা বিদেশীর পকেটে ঢালিয়া দিয়া, চরিত্রগঠন হিসাবে অধিকাংশ দেশী স্কুলগুলিরই মত অথবা তদপেক্ষা অধম আর একটি স্কুল বাড়াইবার কি প্রয়োজন? ইংরেজ শিক্ষক রাখার মানেই এই যে দেশী ভাল শিক্ষক পাওয়া যায় না। না পাওয়া দেশের পক্ষে অগৌরবের বিষয়। দেশী ভাল শিক্ষক পাইবার সম্যক্ চেষ্টা না করিয়া দেশের এরূপ অগৌরব হইতে দেওয়া কাহারও কর্ত্তব্য নহে।

শিক্ষার মধ্যে, বিশুদ্ধ উচ্চারণ করিয়া নির্ভুল ইংরেজী বলা, এবং ভাল ইংরেজী লেখার কথা উঠিতে পারে। আমরা সকলেই জানি যে স্কুলে ইংরেজ শিক্ষকের নিকট পড়েন নাই বা শিক্ষা লাভার্থ বিলাত যান নাই, এমন অনেক বিখ্যাত লোক ইংরেজী বেশ বলেন ও লেখেন। ইংরেজী বলা ও লেখা শিখিবার জন্য ইংরেজ শিক্ষক অবশ্যপ্রয়োজনীয় নহে। তবে, এটা ঠিক্ বটে যে যাহারা ইংরেজের কাছে না পড়িয়াও ভাল উচ্চারণ করিতে পারে, তাহারা ইংরেজের কাছে পড়িলে

হয়ত আরও ভাল উচ্চারণ করিতে পারিত; এবং ইংরেজের কাছে শৈশবে ইংরেজী কহিতে ও পড়িতে শিখিলে যতটা খাঁটি ইংরেজের মত উচ্চারণ হয়, দেশী শিক্ষকের নিকট শিখিলে ততটা হয় না। যথাসম্ভব খাঁটি ইংরেজের মত উচ্চারণ যদি শিক্ষার একটা খুব দরকারী অঙ্গ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার জন্য নীচের দু একটি ক্লাসে ইংরেজ শিক্ষয়িত্রী রাখাই কর্ত্তব্য। তাঁহাদের দ্বারাই ইংরেজ শিক্ষক অপেক্ষা ভাল কাজ অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়ে পাওয়া যাইবে। গ্রামোফোন দ্বারা বিদেশী ভাষার উচ্চারণ শিক্ষা দেওয়ার রীতি প্রচলিত হইতেছে। সে-সব স্কুলের অর্থবল নাই, তাঁহারা এই উপায় অবলম্বন করিতে পারেন।

যে ভাষা যাহাদের মাতৃভাষা, সেই ভাষা **ঠিক** তাহাদের মত উচ্চারণ করিয়া বলিতে পারা শিক্ষার একটা অবশ্যপ্রয়োজনীয় অঙ্গ বলিয়া মনে করিতে পারি না। ফাদার লাফোঁর উচ্চারণ ইংরেজের মত ছিল না, ডাক্তার থিবর উচ্চারণ ইংরেজের মত নয়। ভারতপ্রবাসী আরও অনেক ফরাশিশ ও জার্ম্মেন পণ্ডিতের উচ্চারণে দোষ আছে। কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের কার্য্যকারিতা কমে নাই, গুণবত্তারও লাঘব হয় নাই। ভারতপ্রবাসী অনেক স্কচ্ ও আইরিশ রাজকর্ম্মচারীরও উচ্চারণ ত আদর্শ ইংরেজী উচ্চারণের মত নহে। সত্য বটে ইংরেজী আমাদের রাজভাষা, ফরাসী ও জার্মেনদের রাজভাষা নহে। কিন্তু আমাদের দেশী ব্যবস্থাপক সভার সভ্য, হাইকোর্টের জজ, ব্যারিষ্টার, উকিল, ডাক্তার, অধ্যাপক, প্রভৃতি কাহার উচ্চারণ **ঠিক** ইংরেজের মত নহে বলিয়া বিন্দুমাত্রও কাজের ক্ষতি হইতেছে? আমরা যথাসম্ভব বিশুদ্ধ উচ্চারণের পক্ষপাতী; কিন্তু উচ্চারণটাকে এত উচ্চ স্থান দিতে পারি না যে তজ্জন্য অকারণ অর্থব্যয়, এবং সময় ও শক্তি নিয়োগ করিব, এবং প্রয়োজনীয় বিষয়ে অবহেলা করিব।

বিলাতী আদবকায়দা শিখাইবার জন্য ইংরেজ শিক্ষক রাখা দরকার, এরূপ মনে হইতে পারে। কিন্তু ছেলে বেলা ইংরেজশিক্ষকের কাছে না পড়িলেও যে উত্তমরূপ আদবকায়দা শিখা যায়, উদ্যোক্তাদের মধ্যেই ত তাহার প্রমাণ বর্ত্তমান। বিলাতী ফ্যাশনদুরুস্ত্ পোষাক পরিতে শিখিবার জন্যও বাল্যে ইংরেজ শিক্ষকের অনাবশ্যকতার অনেক শরীরী প্রমাণ চৌরঙ্গী অঞ্চলে ও অন্যত্র অনায়াসে দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু এই আদবকায়দা ও পোষাকের মধ্যে গুরুতর কথা প্রচ্ছন্ন আছে। আমরা পাশ্চাত্য আদবকায়দা ও পোষাকের নিন্দা করি না, অন্তরেও কোন ঘৃণা বা বিদ্বেষের ভাব পোষণ করি না। পাশ্চাত্য লোকদের সঙ্গে মিশিতে হইলে তাঁহাদের শিষ্টাচার জানা দরকার, তাহাও স্বীকার করি। আমরা কেবল ইহাই বলিতে চাই যে আমাদের নিজের দেশের আদবকায়দা ও পোষাককে আমরা হীন মনে করি না, তাহার জন্য আমরা বিন্দুমাত্র লজ্জিতও নহি। যদি গায়ের রঙ্গেও আর সব বিষয়ে আমাদের ইংরেজদের সঙ্গে বেমালুম মিশিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলেও আমরা মিশিয়া যাইতে চাহিতাম না। তাহার কারণ অনেক। প্রথম কথা ত এই যে বাহিরে মিশিয়া গেলেও অন্তরের অনুভূতিটা মরিত না যে আমরা ইংরেজ নহি, আমরা বাহিরে যা বস্তুতঃ তাহা নহি। তা ছাড়া, বিধাতা যে সবাইকে ইংরেজ করেন নাই, ভারতবাসীও গড়িয়াছেন, ইংরেজও গড়িয়াছেন, তাহার কারণ এই যে তাঁহার রাজ্যে বৈচিত্র্য থাকিবে; ভারতবাসীর সাধনা ও সিদ্ধি যাহা তাহা ছাড়িয়া সে

নকল-জিনিষ কেন সাজিবে, ইংরেজই বা তাহার সাধনা ও সিদ্ধি ছাড়িয়া নকল ভারতবাসী কেন সাজিবে? যে সৈনিক তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থান (post of duty) ছাড়িয়া অন্যত্র যায়, তাহাকে কেহ শ্রদ্ধা করে না, বরং সে দণ্ডিত হয়। আমরা ভারতবাসী হইয়া জন্মিয়াছি; তাহাতে আমাদের অনেক অসুবিধা আছে, লাঞ্ছনা আছে। ভারতবাসীই থাকিয়া নিজের পৌরুষ দ্বারা আমরা সে সব দূর করিব, কোন রকম সোজা উপায়ে সংগ্রাম পরিহারের চেষ্টা দেখিব না। একজন মানুষ কোথায় জন্মে, তাহাতে তাহার নিজের কোন কৃতিত্বও নাই, অপমানও নাই। একজন শাসকদেশে জন্মিয়াছে বলিয়াই বড় ও শ্রদ্ধেয়, আর একজন অধীন দেশে জন্মিয়াছে বলিয়াই ছোট ও অবজ্ঞেয়, ইহা কেন মনে করিব? নিজের জীবনে কে কি করিল, বিধাতা যাহাকে যে দেশে পাঠাইয়াছেন তাহার অবস্থা-বেষ্টনীর মধ্যে সে মনুষ্যত্বের কি পরিচয় দিল, ইহাই জিজ্ঞাস্য। তদনুসারেই সে ছোট বা বড়।

আমি যে ভারতবাসী হইয়াছি, তাহাতে আমার দোষও নাই, গুণও নাই। আগে হইতে আমি পরাজয় মানিয়া লজ্জায় মাথা হেঁট কেন করি? চিরকালের জন্য, এমন কি একবারও, প্রত্যেক ভারতবাসীর চেয়ে প্রত্যেক ইংরেজের বা ভারতবর্ষের চেয়ে ইংলণ্ডের প্রত্যেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত হইয়া যায় নাই। আমাদের প্রত্যেকের জীবনে আমাদের দেশ ও জাতি পরাজিত বা জয়ী, ছোট বা বড় হইতেছেন। আমাদিগকে যদি বড় হইতে হয়, ভারতীয় থাকিয়াই হইতে হইবে; নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে,— অন্য পথ নাই। নকল হইতে ও নকল করিতে গিয়া আগে হইতেই আপনাকে ছোট বলিয়া মানিয়া লই কেন?

শুধু প্রাচীন আর্য্য ঋষিদিগের নিকট হইতে নয়, ভারতবর্ষের সমগ্র ইতিহাস-কাল ধরিয়া নানা জাতি ও নানা ধর্ম্মীয় মিলিত চেষ্টা ও সংঘর্ষের ফলে ভারতীয় সভ্যতার একটি আদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছে, এবং এখনও বিকাশ পাইতেছে। উহার আভাস আমরা দিতে পারি কি না জানি না; পারিলেও এখন তাহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে। এই আদর্শ এত বড় জিনিষ, উহা এত মূল্যবান্, যে, নেতৃত্বের গৌরবের বিনিময়েও উত্তরাধিকারসূত্রে উহাতে আমাদের দাবী আমরা ছাড়িতে পারি না। ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়, যুগপৎ বিষাদ ও হর্ষে মন স্তম্ভিত হয়, যে, নানাজাতি দ্বারা ভারত আক্রমণ ও তজ্জনিত জাতি-সংঘর্ষ ও সভ্যতা-সংঘর্ষের ভিতর দিয়াও আমাদের জাতীয় সভ্যতা পুষ্টি লাভ করিতেছে।

এখন এই প্রশ্ন হইতে পারে যে, তবে কি তোমরা এই চাও যে চিরকাল ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে অনৈক্য ও বিরোধ থাকিয়া যাক? সব জাতির মধ্যে ঐক্য ও বন্ধুত্ব না হউক? না, আমরা ঐক্য চাই, বন্ধুত্ব চাই। কিন্তু "আমরা" "তাহারা" হইয়া গিয়াছি বা হইব, এইরূপ ভাণ বা চেষ্টা করিয়া অনৈক্য ও বিরোধ এবং তজ্জনিত অসুবিধা ও লাঞ্ছনা হইতে উদ্ধার পাইতে চাই না। ল্যাংড়া আম ও বোম্বাই আমের ঐক্য এইখানে যে উভয়েই আম; কেহ ত বলে না যে ল্যাংড়া আম ও বোম্বাই আমের আম্রত্ব বিষয়ে একতা ততদিন প্রতিপন্ন হইবে না যতদিন ল্যাংড়া বোম্বাই বা বোম্বাই ল্যাংড়া না হইতেছে। "বিশ্বমানব" বলিয়া যে একটি ধারণা ও আদর্শ আছে, তাহা এই জন্য বিরাট ও মহৎ যে কত রকমের কত প্রকৃতিব কত বিভিন্নশক্তিবিশিষ্ট মানুষের খণ্ড আদর্শ ও ধারণা তাহার অঙ্গীভূত। প্রত্যেক বিশেষ মানবের মধ্যেই বিশ্বমানবের

অভিব্যক্তি; বিশ্বমানব বলিয়া স্বতন্ত্র একটা কোন জিনিষ নাই। একত্ব মানে একঘেয়ে অভিন্নত্ব নয়।

এক একটি জাতি বিশ্বমানবের এক একটি বড় অঙ্গ। এই এক এক অঙ্গের মধ্যে অন্তর্বিরোধ ও অন্তর্বৈষম্য লুপ্ত না হইলে বিশ্বমানবের ঐক্য সুদূরপরাহত। যাহারা চীন তাহাদের কেহ কেহ ইংরেজ হইয়া যাইতে চাহিলে, বাহিরে ভদ্রতার খাতিরে ইংরেজেরা তাহাদিগকে কিছু না বলিলেও তাহাদিগকে অভিন্ন আত্মীয় বলিয়া কখনই মনে করিবে না। অধিকন্তু চীন জাতির অধিকাংশের সঙ্গেও ঐ চীনদের একটা অমিলের রেখা গভীর ভাবে অঙ্কিত হইয়া যাইবে। পক্ষান্তরে চীন জাতির চীন থাকিয়া উন্নতি হইলে তাহাদের পক্ষে ইংরেজের অকপট শ্রদ্ধা লাভ অসম্ভব নহে।

শক্তিশালী ও শ্রদ্ধাভাজন হইতে হইলে আমাদেরও সমস্ত দেশটা জাতিটা এক হওয়া চাই আমরা জানি, যে-সকল নিরক্ষর চাষার অন্নে অক্ষরজ্ঞ শুভ্রবসনপরিহিত আমরা প্রতিপালিত, তাহাদের মধ্যে তাহাদের হৃদয়ের গুণে ভক্তিভাজন অনেক লোক আছেন। অথচ আমরা একটু লেখা পড়া শিখিয়াছি বলিয়া, পা হইতে গলা পর্য্যন্ত আমাদের শরীরের অধিকাংশ আবৃত থাকে বলিয়া, আমাদের ঘরবাড়ী চাষাদের ঘরবাড়ীর চেয়ে ভাল বলিয়া, আমাদের কথাবার্ত্তা শহুরে্য বলিয়া, তাহাদের সঙ্গে মিশিতে ইচ্ছাসত্ত্বেও যেন কেমন বাধ বাধ ঠেকে। ইহার উপর পাশ্চাত্য পরিচ্ছদ, পাশ্চাত্য আদবকায়দা, পাশ্চাত্য দৈনন্দিন জীবনযাত্রানির্ব্বাহপ্রণালী, পাশ্চাত্য গৃহস্থালির ছাঁচ আমদানী করিয়া, আর-একটা অমিলের সৃষ্টি করা আমরা অবাঞ্ছনীয় মনে করি। ছোটখাট বিষয়ে পরিবর্ত্তন করা চলিতে পারে, এরূপ পরিবর্ত্তনের আবশ্যকও আছে, কিন্তু আসল ছাঁচ, ঠাট বা কাঠামো (যাহাই নাম দাও) দেশী থাকা চাইই চাই।

প্রস্তাবিত বিদ্যালয়টি যেরূপ ব্যয়সাধ্য হইবে, তাহাতে ইহাতে কেবল বেশ সচ্ছল অবস্থার লোকদের ছেলেরাই পড়িতে পারিবে। তাহার কুফল প্রধানতঃ দুই প্রকার হইবার কথা। প্রতিভা ধনীর গৃহে যেমন, গরীবের ঘরেও অন্ততঃ সেই পরিমাণে জন্ম গ্রহণ করে। বোধ হয়, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রের গৃহেই অধিকসংখ্যক প্রতিভাশালী লোক জন্মিয়াছে। যত বেশী নানা শ্রেণীর প্রতিভাশালী ছাত্রদের প্রতিযোগিতা ও সাহচর্য্য ঘটে, শিক্ষার ও শক্তির স্ফুরণের তত বেশী সুবিধা হয়। কেবল ধনশালী লোকদের ছেলেরা একটি স্কুলে পড়িলে যথেষ্ট পরিমাণে এই প্রতিযোগিতা ও সাহায্য ঘটিতে পারে না। জনকতক অনুগ্রহভাজন দরিদ্রতর বৃত্তিভোগী ছাত্র লইয়া এই দোষ সংশোধন করা যায় না। কেবল ধনশালী ছাত্রেরা এক সঙ্গে পড়িলে তাহাদের পার্থক্যবোধজনিত একটা সংকীর্ণ শ্রেণীগত অহঙ্কার জন্মান অবশ্যম্ভাবী। ইহা ভাল নয়।

যে যত বেশীসংখ্যক মানুষের সঙ্গে নিজের ঐক্য অনুভব করিতে পারে, সে তত মহৎ ও শক্তিশালী হয়। ঐক্যের অনুভূতিই বড় জিনিষ। অনৈক্য মানুষকে ছোট ও দুর্ব্বল করে। তিনি তত বড় কবি, যিনি যে পরিমাণে বিশ্বমানবের হৃদয়ের অনুভূতিকে নিজের করিয়া ব্যক্ত করিতে পারিয়াছেন। তিনি তত বড় ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, যিনি যে পরিমাণে বিশ্বমানবের আত্মার ক্ষুধা নিজে অনুভব করিয়া সাধনার দ্বারা তাহার নিবৃত্তির পথ আবিষ্কার করিয়াছেন।

ভারতের প্রাচীন ঋষিকবি যে বলিয়াছেন—

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং

সংবো মনাংসি জানতাম্‌।
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী
সমানং মনঃ সহচিত্তমেষাম্‌।
সমানী ব আকুতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি।

তাহার মধ্যে জাতীয় শক্তি লাভের অমোঘ উপায় নিহিত রহিয়াছে।

১৩২২ পৌষ

রাজপ্রতিনিধির মত।

[শিক্ষার বাহন সম্পর্কে]

কয়েক দিন হইল শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং দর্শনাচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় দেশভাষাকে শিক্ষার বাহন করা একান্ত আবশ্যক বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা ৮/৯ মাস পূর্ব্বে এ বিষয়ে পঞ্জাবের ইংরেজী দৈনিক পঞ্জাবীতে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। তাহাতে যে-সব মত ব্যক্ত করিয়াছিলাম, এবার প্রবাসীতে প্রধানতঃ তাহাই করিয়াছি।

গবর্ণরজেনারেল লর্ড হার্ডিং মহোদয় লাহোরের পশু চিকিৎসা কলেজের নূতন অট্টালিকার দ্বার উদ্ঘাটন উপলক্ষে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে বলেন :—

"এই কলেজের প্রধান শিক্ষণীয় বিষয়গুলি দেশভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয়, এবং উচ্চতম শিক্ষা মাত্র ইংরেজীতে দেওয়া হয়, এই সংবাদ আমার ভাল লাগিয়াছে।"

১৩২৩ আশ্বিন

বঙ্গে পয়সা দিয়া ও বিনি পয়সায় চিকিৎসা

১৮৯৩ জন এলোপ্যাথী মতের চিকিৎসক এ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের তালিকাভুক্ত হইয়াছেন। অন্যান্য মতের চিকিৎসক দেশে আরও আছে; কিন্তু মোটের উপর বলিতে গেলে এলোপ্যাথী মতে পাস্‌ করা ডাক্তাররা যেমন রীতিমত শিক্ষা পান, অন্য রকমের চিকিৎসকেরা এদেশে তেমন শিক্ষা পান না। সুতরাং আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত-শিক্ষাপ্রাপ্ত চিকিৎসক বলিতে গেলে অধিকাংশ স্থলে এলোপ্যাথি চিকিৎসকই বুঝিতে হইবে। সরকারী এইরূপ একটা হিসাব বাহির হইয়াছে যে প্রতি ৬৩ খানা গ্রামে সরকারী তালিকাভুক্ত এক একজন ডাক্তার আছেন এই

হিসাবে গ্রামগুলির চিকিৎসাবিষয়ক দুরবস্থা ঠিক বুঝা যায় না। কারণ ছোট বড় সমুদয় শহরে ও বড় বড় গ্রামে একাধিক ডাক্তার আছেন। সুতরাং ডাক্তারবিহীন গ্রামের সংখ্যা এই হিসাব হইতে যাহা বুঝা যায়, তার চেয়ে উহা বাস্তবিক অনেক বেশী।

বঙ্গে ৬০২টি চিকিৎসালয় আছে। সরকারী হিসাবে অনুমান করা হইয়াছে, বঙ্গের অধিবাসীদের মধ্যে কেহই এইরূপ কোন না কোন চিকিৎসালয় হইতে ১৫ মাইল অপেক্ষা দুরে বাস করে না। এটা ভারী একটা আনন্দ ও সুবিধার কথা নয়। পীড়িত হইলে রোগী নিজে বা আত্মীয়দের সাহায্যে ১৫ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া, কখন কখন নদীনালা খানাখন্দ পার হইয়া, চিকিৎসালয়ে যাইবে, তবে তাহার চিকিৎসা হইবে, ইহা অত্যন্ত দুরবস্থার কথা। গবর্ণমেন্টের এদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপালিটী যাহা করেন, তাহাও অনেকস্থলে প্রকারান্তরে গবর্ণমেন্টের আদেশ ও অনুমতি সাপেক্ষ। জমিদার ও অন্যান্য ধনী লোকদের কেহ কেহ দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন। সকলেই করিলে বড় ভাল হয়। যিনি দেশের জন্য কিছুই করেন না, তিনি সম্মানার্হ নহেন, সামাজিক মত কার্য্যতঃ এইরূপ দাঁড়ান বাঞ্ছনীয়।

চিকিৎসা-শিক্ষা।

ঢাকায় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার একটি প্রশ্নের উত্তরে গবর্ণমেন্ট স্বীকার করিয়াছেন যে বাংলা দেশে চিকিৎসাবিদ্যা শিখিবার আগ্রহ দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে, এবং এখন যে-সব চিকিৎসা-শিক্ষালয় আছে, তাহাতে বিদ্যার্থীদের জায়গা হইতেছে না। কোন্ শিক্ষালয়ে কোন্ বৎসর কত ছাত্র পড়িতে চাহিয়াছিল, এবং ক'জন ভর্ত্তি হইতে পারিয়াছিল, গবর্ণমেন্ট তাহার হিসাব নিম্নলিখিত মত দিয়াছেন।

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ।

	প্রবেশার্থী	প্রবিষ্ট
১৯১২	৫৪৪	১৫৩
১৯১৩	৫৮১	১৫৩
১৯১৪	৭০২	১৫৪
১৯১৫	৭২০	১৬২
১৯১৬	৭২৫	১৬২

ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে ১৯১৫ সালে প্রবেশার্থী ছিল ৪৩৪, স্থান পাইয়া ছিল ১১৫; ১৯১৬-তে প্রবেশার্থী ও প্রবিষ্টের সংখ্যা ৪০৭ ও ১২২। ঢাকায় এ বৎসর ১৭৯ জন প্রবেশার্থী ছিল, কিন্তু ভর্ত্তি করা হইয়াছে ৭৭ জনকে।

মাননীয় মিঃ ডনালড্ গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে বলিয়াছেন যে সরকার শিক্ষালয় আরও বাড়াইবার বিষয় বিবেচনা করিতেছেন, কিন্তু দেশের ধনী লোকদের সাহায্য ব্যতিরেকে বাড়াইতে সমর্থ নহেন। ধনী লোকেরা লাট বড় লাটের মূর্ত্তি নির্ম্মাণাদিতে টাকা দিলে উপাধি পায়। জ্ঞান বিস্তারের জন্য টাকা দিলে উপাধি দেওয়া

হইবে, গবর্ণরেরা এরূপ অলিখিত প্রথা চালান দেখি, তাহা হইলে টাকার অভাব হইবে না। যাহারা বিদ্যাব জন্য টাকা দেয়, তাহাদিগকে বড় বড় উপাধি দিলে লোকেও বুঝিবে যে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীবা জ্ঞানবিস্তারের জন্য, আগ্রহ প্রকাশ করিয়া মাঝে মাঝে যে-সব বক্তৃতা করেন, তাহা কপটতা নহে।

বাংলা দেশে চিকিৎসা-শিক্ষালয়ের যে কিরূপ প্রয়োজন, তাহা আমরা বিলাতের সঙ্গে তুলনা করিয়া শ্রাবণের প্রবাসীতে "বেলগাছিয়া মেডিক্যাল কলেজ" প্রসঙ্গে দেখাইয়াছি।

১৩২৮ কার্ত্তিক

বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান ও বৃত্তি শিক্ষা

গত ৭ই মে বিশ্ববিদ্যালয়ের জানিত (recognised) স্কুলগুলির হেড্ মাষ্টারদের যে পরামর্শসভা হয়, তাহাতে কতগুলি স্কুল কি কি বিজ্ঞান ও বৃত্তি শিখাইতে চাহিয়াছিলেন, তাহার একটি তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা নীচে তাহার অনুবাদ দিতেছি।

বিজ্ঞান।

বিষয়	স্কুলের সংখ্যা
রেখাঙ্কন ও কেজো জ্যামিতি	১১৬
ক্ষেত্রব্যবহার ও জরীপ	৯৭
পরীক্ষামূলক যন্ত্রবিজ্ঞান	৩৯
পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন	৭৩
স্বাস্থ্যতত্ত্ব	৯৬
	২৫
হাতের দক্ষতা শিক্ষা	২৫

বৃত্তি।

বিষয়	স্কুলের সংখ্যা
ও উদ্যান কর্ম্ম	৯১
সূত্রধরের কাজ	১১৮
কর্ম্মকারের কাজ	৩১
টাইপ-লিখন ও হিসাবরক্ষণ	৮৭
সংক্ষিপ্তলিখন	৩৪
সূতা-কাটা ও তাঁতবোনা	২৪৭
দর্জ্জির কাজ	৯৫
সংগীত	২৬
গৃহস্থালী	২৩
টেলিগ্রাফী	১০
লোহা ও টিনের কাজ	১
প্রাকৃতিক ভূগোল	১
প্রকৃতি-পর্য্যবেক্ষণ	১
সূচীকর্ম্ম	১
বাণিজ্যিক ভূগোল	১
বিবিধ বিষয়	১৮

প্রাকৃতিক ভূগোল ও প্রকৃতি-পর্য্যাবেক্ষণ মধ্যে কেন আসিল, বুঝা যাইতেছে না

১৩৩৭ মাঘ

মুস্লিম শিক্ষা কন্‌ফারেন্স

মুস্লিম শিক্ষা কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন এবার বারাণসীতে হইয়াছিল। স্যার সৈয়দ আহমদের পৌত্র হায়দরাবাদ রাজ্যের শিক্ষাকর্ম্মাধ্যক্ষ ডক্টর রস মাসুদ সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আপনি বা আমি ইহা পছন্দ করি বা না-করি, পর্দ্দা প্রথা প্রচলিত থাকার বিরুদ্ধে আর্থিক ও অন্যান্য যে সব শক্তি কার্য্য করিতেছে তাহা এত প্রবল যে, বিনা আশঙ্কায় এই ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করা যায়, যে, ভারতবর্ষে অবরোধ-প্রথার মৃত্যু নিশ্চিত।" তিনি নিম্নলিখিত মর্ম্মের কথা বলিয়া বক্তৃতা শেষ করেন :—

"ভারতবর্ষ যদি কেবল একটি ভাষা ও একটি কাল্‌চ্যার বা কৃষ্টির দেশ হইত তাহা হইলে আমাদের দেশের বহু সমস্যার সমাধান অপেক্ষাকৃত সহজ হইত; কিন্তু তাহা যখন নয় এবং যখন আমরা মুসলমানেরা বিশ্বাস করি, যে, অতীতের মত ভবিষ্যতেও আমাদের কৃষ্টি আমাদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষের মহতী সেবা করিতে পারিবে, তখন আমাদের দেখা উচিত, যে, আমরা যে বৈচিত্র্যসম্পদ দ্বারা পরিবেষ্টিত তাহা আমাদের সম্প্রদায়ের জীবনকে মহা বিশৃঙ্খল অবস্থায় পরিণত না করে।

"জীবনের মুসলমান আদর্শসমূহের সংরক্ষণের মানে এ নয়, যে, যাহাদের আদর্শ অন্য প্রকার, আমাদিগকে তাহাদের সহিত সর্ব্বদা যুদ্ধ করিতে হইবে। আমি সর্ব্বদাই বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছি এবং আজ যত দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস করি তার চেয়ে বেশী কখন করিতাম না, যে, বিদ্বেষের ভিত্তির উপর স্থায়ী কিছু গড়িয়া তোলা যায় না। অধিকন্তু যে সম্প্রদায়ের নিজের উপর বিশ্বাস আছে ও যাহা নিজেদের কৃষ্টিকে খাঁটি মনে করে, তাহা তাহার প্রতিবেশীদের সহিত সর্ব্বদা ঝগড়া করিবার অভ্যাস অবলম্বন করে না।

"আমাদের ভারতীয় মুসলমানদের ইহা প্রকাশ্য ভাবে স্বীকার করা উচিত, যে, আমরা হিন্দু সভ্যতার নিকট হইতে তত পাইয়াছি যত আমরা তাহাকে দিয়াছি। যিনি যাহাই বলুন, চিন্তা-জগতেই হউক বা ললিতকলা ও শিল্পের জগতেই হউক, আমাদের জীবনের হিন্দু উপাদানই আমাদিগকে পৃথিবীর অন্যান্য দেশবাসী মুসলমানদিগ হইতে পৃথক করিয়াছে।"

সমগ্র-এশিয়া শিক্ষা কন্‌ফারেন্স

কাশীতে সমগ্র-এশিয়া শিক্ষা কন্‌ফারেন্সের প্রথম অধিবেশন হয়। এরূপ একটি কন্‌ফারেন্সের আইডিয়া যাঁহার বা যাঁহাদের মাথায় আসিয়াছিল, তাঁহারা প্রশংসার্হ; কিন্তু ইহার উদ্যোক্তারা যথোচিত বন্দোবস্ত করিতে পারেন নাই। কেন-না, এশিয়ার অধিকাংশ দেশ হইতে কোন প্রতিনিধি আসেন

নাই, সামান্য দুই এক জন লোক চীন ও জাপান হইতে আসিয়াছিলেন, এবং ভারতবর্ষেরও সব প্রদেশ হইতে যথেষ্টসংখ্যক শিক্ষক ও অধ্যাপক ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের নেতৃস্থানীয় বহু অধ্যাপক কন্‌ফারেন্সে যান নাই—যদিও এলাহাবাদ হইতে অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার মত প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক গিয়াছিলেন।

উদ্যোক্তারা যদি এমন কোন ভারতীয়ের নামে এশিয়ার সব দেশে নিমন্ত্রণ পাঠাইতেন, যাঁহার নাম ভারতবর্ষের বাহিরেও সুপরিচিত, তাহা হইলে ফল ভাল হইতে পারিত। তাহা না করিয়া তাঁহারা এমন এক জন লোককে সম্পাদক করিয়াছিলেন যিনি দক্ষ শিক্ষক হইলেও যাঁহার নাম তাঁহার প্রদেশের বাহিরে প্রসিদ্ধ নহে।

প্রথমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সভাপতি করিবার প্রস্তাব হয়; কিন্তু যখন টেলিগ্রাম করিয়া জানা গেল যে, তিনি ডিসেম্বরে দেশে ফিরিবেন না, তখন জগদীশচন্দ্র বসুকে অনুরোধ করা হয়। তিনি রাজী না হওয়ায় ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের স্বাস্থ্য কেমন আছে সন্ধান লওয়া হয়। তাঁহাকেও না পাওয়ায় অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনকে সভাপতি নির্ব্বাচন করা হয়। তিনি বাগ্মিতার সহিত মৌখিক একটি সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছিলেন, বিলম্বে নির্ব্বাচিত হওয়ায় অভিভাষণ লিখিবার সময় তিনি পান নাই।

সমগ্র-এশিয়ার কন্‌ফারেন্স আইডিয়াটি যত বড়, জিনিষটি কাজে সেরূপ হয় নাই। এমন একটি বড় সুযোগ ও আইডিয়ার ক্ষুদ্র পরিণতি দুঃখের বিষয়। কন্‌ফারেন্সটি যে আশানুরূপ হয় নাই, যোগ্য লোকদের এরূপ মত পড়িয়াছি ও শুনিয়াছি। এ বিষয়ে একটি চিঠি হইতেও কিছু উদ্ধৃত করিব। চিঠিখানি বা তাহার কোন অংশ ছাপিবার জন্য লিখিত হয় নাই। যিনি লিখিয়াছেন, তাঁহার অনুমতি না লইয়াই কোন কোন কথা উদ্ধৃত করিতেছি। ইহাও বলা দরকার, তিনি প্রতিনিধি হইয়া কাশী যান নাই, প্রতিনিধি হইবার ইচ্ছাও তাঁহার ছিল না।

"অল্‌-এশিয়াটিক কন্‌ফারেন্স আমাদের ভাল লাগে নি। জিনিষটা আসলে যত বড় তেমন কিছুই হয় নি। অল্‌-এশিয়াটিক্ কিছু হচ্ছে ব'লে বোধই হচ্ছিল না। ইন্টেলেকচুয়েল দিক্ থেকে কিছু পাওয়া যাচ্ছিল না,... প্রদর্শনীতে দেখবার বিশেষ কিছুই ছিল না। আমরা প্রদর্শনী দেখে নিরাশ হয়েছি। শুধু চীন থেকে এক জন চৈনিক চিত্রকর এসেছিলেন—তাঁর চিত্রপ্রদর্শনী খুব ভাল লেগেছে।

"যুযুৎসু দেখাতে যারা গিয়েছিল, তাদের যুযুৎসু সকলেরই খুবই ভাল লেগেছিল।"

তাহারা লাহোরে মহিলা কন্‌ফারেন্সে যুযুৎসু দেখাইতে নিমন্ত্রিত হইয়াছে।

১৩৪৬ বৈশাখ
বঙ্গের অধ্যাপকদের কন্‌ফারেন্স

দৌলতপুরে সম্প্রতি বঙ্গের অধ্যাপকদিগের যে কন্‌ফারেন্স হইয়া গেল, তাহার সভাপতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-কলেজের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার সুচিন্তিত অভিভাষণে বঙ্গের শিক্ষার উপরে বর্ণিত বিপদ বিশদ ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। অভিভাষণটি মননশীল শিক্ষিত ব্যক্তিগণের পঠনীয়।

১৩২৯ ফাল্গুন
ইম্পীরিয়্যাল লাইব্রেরী

কলিকাতায় ইম্পীরিয়্যাল লাইব্রেরীর যতটা ব্যবহার হইতে পারে, তাহা না হইলেও, ইহা কলিকাতায় থাকায় সাধারণ পাঠক, বিদ্যার্থী ও গবেষকেরা ইহার যতটা ব্যবহার করেন, দিল্লীতে গেলে তাহার দশ ভাগের এক ভাগও হইবে না। অধিকন্তু এমন অনেক পুরাতন বহি আছে, যাহা রেলে লইয়া যাইতে যাইতেই নষ্ট হইয়া যাইবে। এই লাইব্রেরী আগে কলিকাতা পাব্লিক্ লাইব্রেরী বলিয়া পরিচিত ছিল, এবং কলিকাতার পৌরজনেরাই ইহা স্থাপন করিয়াছিল। প্রথম অবস্থায় বাংলাদেশের ও কলিকাতার লোকেরাই ইহার ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াছে, পরে অবশ্য ভারতসাম্রাজ্যের রাজস্ব হইতে ইহার শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু দিল্লী নগর বিশেষ করিয়া ইহার জন্য কিছু করে নাই, যেরূপ কলিকাতা করিয়াছে। কলিকাতাও ভারতসাম্রাজ্যের অন্তর্গত, দিল্লীও ভারতসাম্রাজ্যের অন্তর্গত। কলিকাতায় যত শিক্ষিত লোক, গবেষক, কলেজ ও বিদ্বজ্জন সভা আছে, দিল্লীতে তাহা নাই। অতএব লাইব্রেরীটিকে কলিকাতায় রাখাই উচিত। তাহা রাখিবার জন্য যদি অনেক টাকা লাগে, ব্যবস্থাপক সভা ও কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর তাহা দেওয়া উচিত। বাঙ্গালীর অল্প যাহা গৌরব আছে, তাহা বিদ্যাসম্পর্কীয়। বিদ্যালাভের একটি প্রধান আয়োজনকে হাতছাড়া হইতে দেওয়া কোনক্রমেই উচিত নয়।

১৩৩১ চৈত্র

কলিকাতার ইম্পীরিয়্যাল্ লাইব্রেরী

আগে একবার কথা উঠিয়াছিল, কলিকাতার ইম্পীরিয়্যাল্ লাইব্রেরী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হইবে। আবার সেই গুজব রটিয়াছে।

উহার নাম আগে ছিল পাব্লিক্ লাইব্রেরী এবং উহা মেট্‌কাফ হলে অবস্থিত ছিল। পরে উহা লর্ড কার্জন ইম্পীরিয়্যাল্ লাইব্রেরীতে পরিণত করেন।

উহার জন্য বাঙ্গালী কত টাকা দিয়াছে ও কত শ্রম করিয়াছে, গবর্ন্মেণ্ট কত ব্যয় করিয়াছেন, এবং সেই জন্য বাঙ্গালীর উহাতে দাবী কতখানি, সে-সব কথা তুলিতে চাই না। কারণ, এরূপ প্রশ্নের ঠিক মীমাংসা করিবার মত উপকরণ আমাদের কাছে নাই।

আমরা কেবল ইহাই বলিতে চাই, যে, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক রাজধানী দিল্লীতে উঠিয়া গেলেও জ্ঞানানুশীলনের প্রধান ভার এখনও কলিকাতাই আছে। কলিকাতায় ভাল একটা লাইব্রেরীর সদ্ব্যবহার যত হয়, দিল্লীতে তাহার সমান ব্যবহার হইতে ন্যূনকল্পে আরও পঞ্চাশ বৎসর লাগিবে, অনর্থক কতকগুলা বহি রেলভাড়া দিয়া দিল্লীর একটা বড়-বাড়িতে আলমারীর মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিলে কি লাভ হইবে?

ইংলণ্ডের অন্যতম প্রধান মন্ত্রী লর্ড রোজবেরী একবার একটি লাইব্রেরীর দ্বারোদ্‌ঘাটন-অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বলিয়াছিলেন, লাইব্রেরী বেশ কাজের জিনিষ হইতে পারে, আবার গ্রন্থের গোরস্থানও হইতে পারে। দিল্লী ত নানা সাম্রাজ্যের ও সম্রাটের গোরস্থান হইয়া আছে; তাহার উপর সেখানে গ্রন্থকার ও গ্রন্থের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিবারও প্রয়োজন আছে কি?

১৩৩২ জ্যৈষ্ঠ

দেশ-বিদেশের কথা

কলিকাতার ইম্পিরিয়াল্ লাইব্রেরী

ভারত সরকারের শিক্ষাসচিব স্যার এম্. হবিবুল্লা জনৈক সাংবাদিকের নিকট বলিয়াছেন যে, ইম্পিরিয়াল্ লাইব্রেরী কলিকাতা হইতে তুলিয়া লইয়া যাইবার প্রস্তাব এখনও সরকারের বিবেচনাধীন। তিনি বলিয়াছেন যে ঐ পাঠাগার কলিকাতায় থাকিলে তাহা প্রধানতঃ বঙ্গদেশের লোকেদেরই কাজে লাগিবে। সুতরাং ভারত সরকার এই পাঠাগারের ব্যয়ভার বহন করিতে নারাজ। যদি লাইব্রেরী কলিকাতায় থাকে, তবে বাংলা সরকারকে উহার ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে---নতুবা উহা দিল্লীতে স্থানান্তরিত হইবে। সরকারী পুরাতন দলিল দস্তাবেজ ইত্যাদি দিল্লীতে লওয়াই স্থির হইয়া গিয়াছে।

১৩৪২ জ্যৈষ্ঠ
ইম্পীরিয়্যাল লাইব্রেরীর অদ্ভুত নিয়ম

খবরের কাগজে দেখিয়াছি এবং সাক্ষাৎভাবে জানেন এরূপ লোকের মুখে শুনিয়াছি যে, কলিকাতার ইম্পীরিয়্যাল লাইব্রেরীর গ্রন্থাধ্যক্ষ এই নিয়ম করিয়াছেন, যে, ভারতীয় কোন ভাষায় লিখিত উপন্যাস ও গল্পের বহি লাইব্রেরীতে বসিয়া পড়িবার জন্য কিংবা বাড়িতে লইয়া গিয়া পড়িবার জন্য কাহাকেও দেওয়া হইবে না। শুনিলাম, যদিও ভারতীয় সব ভাষার নাম করা হইয়াছে, তথাপি নিয়মটার লক্ষ্য প্রধানতঃ বাংলা উপন্যাস ও গল্পের বহি। তাহা সত্য হউক বা না হউক, নিয়মটার উদ্দেশ্য ও কারণ বুঝিতে পারিতেছি না। বস্তুতঃ এরূপ একটা আজগুবি নিয়ম সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না। অতিশয় দুষ্প্রাপ্য পুরাতন বহিও বিশেষ অনুমতি লইয়া লাইব্রেরীতে বসিয়া পড়িতে পাইবার নিয়ম সর্ব্বত্র আছে। ভারতীয় ভাষাসমূহের উপন্যাসাদি সবই দুষ্প্রাপ্য নহে।

যদি কেহ বহিগুলি পড়িতে পাইবে না, তাহা হইলে সেগুলি কিনিবার ও রাখিবার প্রয়োজন কি?

১৩৩১ ফাল্গুন
ইণ্ডিয়া আফিস্ লাইব্রেরী ও "প্রবাসী"

লণ্ডনে ভারতবর্ষের ব্যয়ে ইণ্ডিয়া আফিসে যে লাইব্রেরী আছে, তাহাতে নানা ভারতীয় ভাষার পুস্তক ও মাসিক পত্রাদি রক্ষিত হয়। ঐসকল বহি ও মাসিক পত্রিকার তালিকা খণ্ডে-খণ্ডে প্রকাশিত হয়। তাহার দ্বিতীয় ভল্যুমের ৪র্থ খণ্ড "মডার্ন্ রিভিউ" কাগজে সমালোচনার জন্য পাওয়া গিয়াছে। এইখণ্ডে বাংলা বহি ও মাসিকাদির তালিকা আছে। মাসিক কাগজগুলির মধ্যে "প্রবাসীর" নাম নাই। তালিকা-প্রণেতার ইহাতে কোন দুরভিসন্ধি আছে,মনে করি না; বরং সদভিপ্রায় থাকাই সম্ভব। অথবা, কোনপ্রকার অভিপ্রায়ই না থাকিতে পারে। এদেশে পুস্তক, মাসিক পত্র প্রভৃতি যাহা কিছু ছাপা হয়, সর্ব্বগুলিরই তিনখণ্ড সরকার-বাহাদুরকে জরিমানা-স্বরূপ দিতে হয়। তাহার এক-এক খণ্ড লণ্ডনে ইণ্ডিয়া আফিস্ লাইব্রেরীতে থাকিবার কথা। এই জরিমানা আমরা বরাবর দিয়া থাকি। সম্ভবতঃ গবর্ণমেণ্ট "প্রবাসী" বিলাতে পাঠান না, কিম্বা পাঠাইলেও তাহা ইণ্ডিয়া আফিসে রাখা হয় না; কিম্বা রাখা হইলেও ক্যাটালগভুক্ত করা হয় নাই। ক্যাটালগে "প্রবাসী"র নাম না থাকার জন্য দায়ী যিনিই হউন, তাঁহার বুদ্ধিমত্তা, দূরদর্শিতা ও মিতব্যয়িতার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। ইহা সকলেই জানেন, যে, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের নাম

থাকিবেই, এবং তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থবলী-সম্বন্ধেও বহি লিখিত হইবেই। তাহাতে সম্ভবতঃ ইহাও লিখিত হইবে, যে, তাঁহার "জীবনস্মৃতি", "গোরা", "অচলায়তন", "মুক্তধারা", "রক্তকরবী", "পশ্চিমযাত্রীর ডায়েরী" প্রভৃতি প্রথমে "প্রবাসী"তে বাহির হইয়াছিল; সুতরাং "প্রবাসী"র নামটাও কোনপ্রকারে থাকিয়া যাইতেই পারে। অতএব ওটা ইণ্ডিয়া আফিস্ লাইব্রেরীর ক্যাটালগে ছাপিয়া অনর্থক উহার কলেবর-বৃদ্ধি ও মুদ্রণব্যয়-বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন কি? এমনই ত ক্যাটালগটির পৃষ্ঠার সংখ্যা ৫২৩। রাজনৈতিক কারণে "প্রবাসী"র নাম কোন প্রকারে বাদ পড়িয়াছে, ইহা মনে করিলেও রাজদ্রোহ হইবে।

১৩১৮ বৈশাখ
[এন্‌সাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা]

এন্‌সাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা নামক সুবিখ্যাত ইংরাজী বিশ্বকোষের নূতন (একাদশ) সংস্করণ আপাততঃ কিছুদিন সস্তা দামে পাওয়া যাইবে। তাহার পর মূল্য প্রায় দ্বিগুণ হইবে। ইংরাজীতে ইহার মত উৎকৃষ্ট বৃহৎ সর্ব্ববিদ্যাবিষয়ক কোষ আর নাই। প্রত্যেক কলেজ এবং উচ্চশ্রেণীর ইস্কুলে ইহা রাখা উচিত। অধ্যাপক, শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে যাঁহাদের অবস্থায় কুলায়, তাঁহাদের সকলেরই ইহা ক্রয় করিয়া পাঠ করা উচিত। তদ্ভিন্ন জ্ঞানান্বেষী সকলেরই যে ইহা কাজে লাগিবে, তাহা বলা বাহুল্য।

১৩১৯ বৈশাখ
[বিশ্বকোষ-সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসুর সম্বর্ধনা]

বিশ্বকোষ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যা- মহার্ণবের সম্বর্দ্ধনা করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ যথাযোগ্য কাজ করিয়াছেন। বিশ্বকোষ নগেন্দ্র বাবুর ও বাঙ্গালীর একটি সাহিত্যিক কীর্ত্তি। যে ইংরাজ জাতি জীবনের ও বিদ্যার নানাবিভাগে অসংখ্য মহত্তর কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতেছেন, তাঁহারাও এন্‌সাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকার একাদশ সংস্করণ শেষ হওয়া উপলক্ষে একটা ভোজ সভার আয়োজন করিয়া লর্ড মর্লী প্রভৃতি সাহিত্যিকদিগের দ্বারা বক্তৃতা করাইয়াছিলেন।

১৩৪২ শ্রাবণ

"বিশ্বকোষ"

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু "বিশ্বকোষের" দ্বিতীয় সংস্করণ নিয়মিত রূপে প্রকাশিত হইতেছে। আমরা ইহার ২৩শ সংখ্যা পর্য্যন্ত পাইয়াছি। এই সংস্করণের ১৯শ সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইবার পর তাঁহার একমাত্র ও কৃতী পুত্র শ্রীমান বিশ্বনাথ বসু পরলোকগত হন। এই দুর্বিষহ শোক সত্ত্বেও নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় অসাধারণ ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় এবং অক্ষুণ্ণ দক্ষতার সহিত, বৃহৎ গ্রন্থখানির উৎকর্ষ বজায় রাখিয়া, বিশ্বকোষের তিন সংখ্যা মাসে বাহির করিতেছেন। বস্তুতঃ এই দ্বিতীয় সংস্করণটি তাঁহার পুত্রের স্মৃতির সহিত চিরকাল জড়িত হইয়া থাকিবে। প্রথম সংস্করণ শেষ হইবার অব্যবহিত পরে পুত্রটি জন্মগ্রহণ করে বলিয়া পিতা তাহার নাম রাখিয়াছিলেন বিশ্বনাথ। বিশ্বনাথেরই আগ্রহে, বিদ্যাবত্তায় ও কর্ম্মকুশলতায় দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশ আবদ্ধ হয়।

বিশ্বকোষ পড়িলে এত বিষয়ে এত জ্ঞান লাভ করা যায়, যে, ইহার অধ্যয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীতে শিক্ষা লাভের সমান মনে হয়।

"বঙ্গীয় শব্দকোষ"

দুটি এন্সাইক্লোপীডিয়ার বিষয় এ-মাসে লিখিয়াছি। "বঙ্গীয় শব্দকোষ" সম্বন্ধেও কিছু লেখা কর্ত্তব্য। ইহা এন্সাইক্লোপীডিয়া নহে, সাধারণ অভিধান। ইহা সমাপ্ত হইবার পর সকলের চেয়ে বড় বাংলা অভিধান হইবে। ইহার সঙ্কলয়িতা অধ্যাপক পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহা শান্তিনিকেতন হইতে বাহির করিতেছেন। তাঁহার বিশেষ কৃতিত্ব এই যে তিনি এতবড় একটি কাজ একা করিতেছেন এবং দরিদ্র হইলেও নিজের ব্যয়ে অভিধানটি প্রকাশ করিতেছেন। এক-একটি শব্দের সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় প্রয়োগের যত দৃষ্টান্ত তিনি দিতেছেন, তাহাতে তাঁহার বহু অধ্যয়ন ও শ্রমশীলতায় চমৎকৃত হইতে হয়। এ-পর্য্যন্ত ইহার ২৩টি খণ্ড বাহির হইয়াছে। তাহাকে "কটাক্ষ" ও "কটাখ" পর্য্যন্ত শব্দগুলি পাওয়া যায়। ইহা সমুদয় বিদ্যালয় ও কলেজে রাখা কর্ত্তব্য। কলেজ বলিতেছি এই জন্য, যে, কলেজের ছাত্রছাত্রীদিগকেও বাংলা পড়াইতে ও পড়িতে হয়।

১৩৪২ ভাদ্র
"শিশুভারতী"

বালকবালিকারা বিদ্যালয়ে যাহা শিখে তা ছাড়াও যাহাতে আরও অনেক বিষয় আনন্দে সহিত শিখিতে পারে তাহার নিমিত্ত ইংরেজীতে বালকবালিকাদের অভিধান (Chiddren's Dictionary), জ্ঞানের গ্রন্থ (The Book of Knowledge), প্রভৃতি বহু খণ্ডে সমাপ্ত গ্রন্থ আছে। অন্য কোন কোন পাশ্চাত্য ভাষাতেও সম্ভবতঃ আছে। "শিশুভারতী" বাঙ্গালায় এই রকম পত্রিকা বা গ্রন্থ। পত্রিকা বলিতেছি এই জন্য, যে, মাসিকপত্রিকার মতো ইহার এক এক সংখ্যা মাসে মাসে বাহির হয়, এবং পরে সেগুলি বাঁধাইয়া রাখা যায়। ইহাতে বিস্তর একরঙা ও বহুবর্ণ চিত্র থাকে। কৃতবিদ্য লোকেরা ইহার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে প্রবন্ধ লেখেন। কোন বাংলা পত্রিকা ইহার মত পুরু উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা হয় না, খুব কম বাংলা বহির কাগজ ইহার মত। ইহার ছাপাও উৎকৃষ্ট। এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেস ইহার প্রকাশক এবং শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ইহার সম্পাদক।

১৩৪৯ জ্যৈষ্ঠ
প্রাদেশিক শব্দের অভিধান

বঙ্গীয় শব্দকোষের সঙ্কলনকর্তা পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বঙ্গীয় শব্দকোষ সমাপ্ত হবার পর একটি প্রাদেশিক শব্দের অভিধান রচনা করতে বলেছিলেন। এরূপ অভিধান অত্যন্ত আবশ্যক। এর দ্বারা নানা প্রয়োজন সিদ্ধ হবে, এবং বাংলা ভাষার সমৃদ্ধি বোঝা যাবে, বাড়বে ও স্থায়ী হবে। আমরা অনেক সময় কোন কোন ইংরেজী শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ না পেয়ে সংস্কৃত ধাতু থেকে তা রচনা করি, অথচ প্রাদেশিক শব্দসমষ্টির মধ্যেই হয়ত ঠিক্ প্রতিশব্দটি রয়েছে ভুলে যাই। প্রাদেশিক শব্দের অভিধান সংকলিত হ'লে যদি সাহিত্যে প্রাদেশিক শব্দের ব্যবহার বাড়ে, তা হলে সাহিত্য মানুষের বাস্তব জীবনের নিকটতর এবং অধিকতর প্রাণবান্ হবে। শব্দসম্ভারের নিমিত্ত বাংলা হিন্দীর চেয়ে সংস্কৃতের উপর বেশি নির্ভর করে। প্রাদেশিক শব্দ অধিক ব্যবহৃত হ'লে এই পরনির্ভরতা কমবে ও স্বাবলম্বন বাড়বে।

প্রাদেশিক অভিধান সংকলনের প্রস্তাব আগে অন্য কেউ কেউও করেছেন। আমরা অনেক বৎসর আগে এই রকম প্রস্তাব "দাসী", "প্রদীপ", বা "প্রবাসী"তে করেছিলাম—ঠিক্ কোন মাসিক মনে নাই। কোষকার স্বর্গত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসকে ঐ প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ করতে অনুরোধ

করেছিলাম। আমাদের প্রস্তাবের একটি অঙ্গস্বরূপ বলেছিলাম, গোরুর গাড়ী, লাঙ্গল, রান্নাঘরে ব্যবহৃত নানাবিধ পাত্র প্রভৃতির ছবি এঁকে বঙ্গের সর্বত্র সেগুলি সহায়কদিগকে পাঠিয়ে দিয়ে সকল জেলা ও মহকুমায় ব্যবহৃত সেগুলির নাম সঙ্কলন করতে হবে— গোরুর গাড়ীর ও তার চাকার ভিন্ন ভিন্ন অংশ সংখ্যার দ্বারা চিহ্নিত ক'রে তাদের নাম, লাঙ্গালের ভিন্ন ভিন্ন অংশ সংখ্যার দ্বারা চিহ্নিত ক'রে তাদের নাম, রান্নাঘরে হাঁড়িকুঁড়ি হাতা বেড়ি খুন্তি কুলা ধুচুনি প্রভৃতির নাম, খড়ের চালের ঘরের ভিন্ন ভিন্ন অংশ সংখ্যার দ্বারা চিহ্নিত ক'রে তাদের নাম, নানা রকম নৌকার নানা অংশের নাম, ইত্যাদি সংকলন করতে হবে, আমাদের প্রস্তাব অনুসারে জ্ঞানেন্দ্রমোহন বাবু কিছু চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু যাঁদের কাছে তিনি তাঁর প্রশ্নগুলি পাঠিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে যত দূর মনে পড়ছে, কেবল একজন উত্তর দিয়েছিলেন। এখন যদি এই রকম কাজে সব জেলা হ'তে সাড়া পাওয়া যায়, তা হ'লে কাজটি শীঘ্র সম্পন্ন হ'তে পারবে।

১৩১৮ শ্রাবণ

ছাত্রদের আয়ের ব্যবস্থা

এখন কলেজগুলির বৎসর আরম্ভ হইয়াছে। এখন যে যে সহরে কলেজ আছে তথায়, বিশেষতঃ কলিকাতায়, অনেক দরিদ্র ছাত্র সাহায্যের চেষ্টায় নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। তাহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য একটি সমিতি থাকা উচিত। সমিতি হইতে দরিদ্র ছাত্রদিগকে কেবল যে নগদ টাকাই দেওয়া হইবে তাহা নয়। তাহাদিগকে গৃহ-শিক্ষকতা, কাগজ পেন্সিল সাবান পুস্তকাদি ফেরীর কাজ, টাইপরাইটিঙের কাজ, প্রভৃতি জুটাইয়া দিয়া স্বাবলম্বী করিবার চেষ্টাও করা যাইতে পারে।

১৩২১ শ্রাবণ

স্বাবলম্বী ছাত্র।

আমেরিকার সমুদয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন অনেক ছাত্র আছে যাহারা দরিদ্র, নিজে পরিশ্রম করিয়া যাহা উপার্জ্জন করে, তাহা হইতেই পড়াশুনার ব্যয় নির্ব্বাহ করে। ভারতীয় কতকগুলি ছাত্রও এই ভাবে আমেরিকায় শিক্ষালাভ করিয়াছে; অনেকে এখনও করিতেছে। সেখানে ছাত্রেরা কোন কাজকেই তুচ্ছ মনে করে না। ঘর ঝাঁট দেওয়া ও সাফ্ করা, মাঠে চাষের কাজ করা, দোকানে জিনিষ বিক্রী করা বা খাতা লেখা, হোটেলে খাদ্য পরিবেষণ করা বা বাসন মাজা, রাস্তায় গ্যাসের আলো জ্বালা ও নিবান, প্রভৃতি নানাবিধ কাজ তাহারা করে। সে-কালে আমাদের দেশের অনেক কৃতী লোক ছাত্রাবস্থায় কোন সচ্ছল অবস্থার লোকের বাড়ীতে রাঁধিয়া বা বাসন মাজিয়া ইংরাজী লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন। পুরাকালে গুরুর জন্য ভিক্ষা করা ছাত্রদের নিত্যকর্ম্ম ছিল। অনেককে গোরু চরাইতে হইত। রন্ধনের ও যজ্ঞের জন্য বন হইতে কাঠ কাটিয়া কুড়াইয়া আনাও তাহাদের একটা কাজ ছিল। সুতরাং ছাত্রজীবনে শারীরিক শ্রমসাধ্য কাজ করা আমাদের দেশেও একটি প্রাচীন রীতি।

১৩২৫ আশ্বিন

ছাত্রদের জন্য মহৎ দান

বোম্বাইয়ের ধনী বণিক সার্ বিঠলদাস দামোদরদাস ঠাকর্সী মহাশয় একটি পাঁচ লক্ষ টাকার ফণ্ড স্থাপন করিয়াছেন, যাহা হইতে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বজাতীয় গরীব ছাত্রদিগকে পড়াশুনার খরচ দিয়া সাহায্য করা হইবে। সার্ বিঠলদাস ভবিষ্যতে ইহাতে আরও টাকা দিবার ইচ্ছা রাখেন। কোনও ছাত্রকে বার্ষিক চারি শত টাকার অধিক সাহায্য দেওয়া হইবে না। সাহায্য ঋণস্বরূপে দেওয়া হইবে। সাহায্যপ্রাপ্ত ছাত্রেরা উপাধি পাইবার পর কিস্তিবন্দী করিয়া ক্রমে ক্রমে ঋণ শোধ করিবেন। বৎসরে ১০০ ছাত্রকে এইরূপ সাহায্য দেওয়া হইবে। এই ফণ্ডের নিয়মাবলী বোম্বাইয়ের ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখের ইণ্ডিয়ান সোশ্যাল রিফর্ম্মার কাগজে মুদ্রিত হইয়াছে।

আমরা একবার শুনিয়াছিলাম, সার্ রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় এইরূপ একটি ফণ্ড স্থাপন করিবেন। ঠিক শুনিয়াছিলাম কি না, জানি না। কিন্তু সকল প্রদেশেই এইরূপ ফণ্ডের খুব প্রয়োজন রহিয়াছে।

১৩৩৪ কার্ত্তিক

সম্মানসূচক এম্-এ উপাধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্ট স্থির করিয়াছেন, যে, তাহার বাংলা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্মানসূচক এম-এ উপাধি দেওয়া হইবে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে পাণ্ডিত্যের জন্য চারুবাবু সর্ব্বথা এই উপাধির যোগ্য। তিনি এই উপাধির যোগ্য বিবেচিত হওয়ায় আমরা সুখী হইয়াছি।

১৩৩৫ কার্ত্তিক

ছাত্রছাত্রীদের মধ্যাহ্নে জলযোগ

আমাদের ছাত্রছাত্রীরা দশটার মধ্যে তাড়াতাড়ি ভাত খাইয়া শিক্ষালয়ে যান, বাড়ী ফিরিতে ৪টা বাজিয়া যায়; কাহারও কাহারও আরও দেরি হয়। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী মধ্যে সামান্য জলযোগ করিতে পারে না, বা করে না। ইহাতে তাহাদের দৈহিক পুষ্টি ও বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত জন্মে। এই জন্য শিক্ষালয়ের পক্ষ হইতে সকলেরই মধ্যাহ্নে জলযোগের ব্যবস্থা হওয়া উচিত। ইহা খুব সস্তায় হইতে পারে, এবং তাহাতে ফল ভাল হয়। তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। শ্রীযুক্ত ডাক্তার নবজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরামর্শ অনুসারে কলিকাতার কেশব একাডেমীতে মধ্যাহ্নে জলযোগের ব্যবস্থা হইয়াছে। তাহার জন্য ছাত্রদের নিকট হইতে মাসে চারি আনা অর্থাৎ দিনপ্রতি আধ পয়সা আন্দাজ লওয়া হয়। মাসে চারি আনা দিয়া ছাত্রেরা প্রত্যহ একখানি বড় রুটি এবং কিছু হালুয়া বা আলুর দম বা ডাল পায়। কিছুদিন এই ব্যবস্থা চলিবার পর ছাত্রদিগকে ওজন করিয়া দেখা গিয়াছে, যে, তাহাদের ওজন বাড়িয়াছে। এত অল্পব্যয়ে যখন কলিকাতার মত জায়গায় এরূপ সুফলপ্রদ সুব্যবস্থা হইতে পারে, তখন বাংলাদেশের অন্য সব জায়গাতেও হইতে পারে এবং হওয়া উচিত।

১৩৩৭ পৌষ

একটি বাঙালী ছাত্রের গুণের কদর

[হুমায়ুন কবীর]

বাঙালী ছাত্র হুমায়ুন কবীর অক্সফর্ড বিশ্ববিদ্যালয় (ছাত্রদের) য়ুনিয়নের সেক্রেটারী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আমবা যতদূর জানি, ইতিপূর্ব্বে কোন ভারতীয ছাত্র এই পদ ও সম্মান লাভ করেন নাই। হুমায়ুন কবীর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ কৃতী ছাত্র এবং বাঙালী যুবা কবিদের অন্যতম।

১৩৪২ কার্ত্তিক

ত্রিকালব্যাপী স্বদেশপ্রীতি

ইংরেজ কবি টেনিসনের একটি কবিতায় অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ তিন কালে ব্যাপ্ত স্বদেশপ্রীতির একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি উপদেশ দিয়াছেন :

"Love thou thy land, with love far-brought
From out the storied Past and used
Within the Present, but transfused
Thro'h future time by power of though."

তাৎপর্য্য। কীর্ত্তিকাহিনীগৌরবমণ্ডিত অতীত হইতে সুদূর বর্ত্তমানে আনীত প্রেমের সহিত তোমার দেশকে ভালবাসিয়ো এবং বর্ত্তমানে সেই প্রেমকে প্রযুক্ত করিয়ো, কিন্তু মননশক্তির দ্বারা তাহাকে ভবিষ্যতেও সঞ্চারিত করিয়ো।

আমাদের প্রত্যেকের সহিত কোনও পূর্ব্বপুরুষের কোনও পিতামহ মাতামহী প্রমাতামহ প্রপিতামহীর, ঠিক্ সাদৃশ্য না-থাকিলেও ইহা যেমন নিশ্চিত যে আমরা দেহমনে তাঁহাদের সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে উত্তরাধিকারী, তেমনি ইহাও নিশ্চিত আমাদের দেশ অধুনা যাহা তাহা অল্পাধিক পরিমাণে, অতীতে দেশ যাহা ছিল, তাহা হইতে উদ্ভূত। অতীতের মধ্যে প্রাগৈতিহাসিক যুগ আছে এবং তাহার পরবর্ত্তী নানা ঐতিহাসিক যুগ আছে। বর্ত্তমানে স্বদেশের প্রতি প্রীতি অতীতের স্বদেশের প্রতি প্রীতির অনুবৃত্তি।

সেই অতীতকে জানিতে হইলে অতীতের ইতিহাসের রাজারাজড়ার যুদ্ধবিগ্রহ কিংবা ঐতিহাসিক পাঠ্যপুস্তকে লিখিত তৎকালীন আচার-ব্যবহারের বৃত্তান্ত পাঠই যথেষ্ট নহে। ব্যাপক অর্থে প্রাচীন সাহিত্য যাহা আছে, তৎসমুদয়ের সহিত পরিচিত হওযা আবশ্যক। আমাদের দেশের এই প্রাচীনতম সাহিত্য সংস্কৃত ও তাহার জ্ঞাতি প্রাকৃত ও পালিতে লিখিত। তাহার সহিত পরিচয় চাই। মূলগ্রন্থ পাঠ করিবার মত প্রাচীনভাষাজ্ঞান সকলের থাকা সম্ভবপর নহে, কিন্তু আধুনিক বাংলা বা অন্য আধুনিক

ভারতীয় ভাষার অনুবাদের সাহায্যে প্রাচীন সাহিত্যের সহিত পরিচয় ঘটিতে পারে। তাহা হইলেও প্রাচীন ভাষার কিছু জ্ঞান থাকা নানা দিক দিয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রাচীন সাহিত্য ব্যতীত প্রাচীনস্তম্ভ, শিলালেখ, তাম্রশাসন, প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্র, প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন, প্রাচীন গুহাচিত্রাদি প্রভৃতি সহিতও পরিচয় বাঞ্ছনীয়।

সংস্কৃত প্রভৃতি প্রাচীন ভাষার জ্ঞান কেবল অতীত সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্যই যে আমাদের থাকা আবশ্যক তাহা নহে; বাংলার সহিত সংস্কৃতের সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ, সংস্কৃতের উপব বাংলা এত বেশী নির্ভর করে, যে, বাংলার ব্যাপক গভীর ও বিশুদ্ধ জ্ঞানের জন্য কিছু সংস্কৃত না জানিলে চলে না। বাংলায় যিনি আধুনিক জ্ঞানগর্ভ যে-কোন বিষয়েই কিছু লিখুন না তাহা গণিত, বসায়নবিদ্যা, বেতারবার্ত্তা, আকাশযান, বা অন্য কিছুই হউক না—তাঁহাকে নূতন শব্দ কিছু রচনা করিতে হইবে, কিংবা অন্যের রচিত নূতন শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে। নিজে নূতন শব্দ গড়িতে হইলে তাহা সংস্কৃত ধাতু হইতে গড়িতে হইবে, কারণ সেইরূপ শব্দই বাংলা ভাষার অধিকাংশ অন্য শব্দের সহিত সমঞ্জসীভূত হইবে। যদি তিনি অন্যের গড়া নূতন শব্দ ব্যবহার করেন, তাহা হইলে তাহা ঠিক্ হইয়াছে কি না পরীক্ষা করিতে হইলে কিছু সংস্কৃত জানিতে হইবে।

বিজ্ঞানসম্মত ব্যাকরণ প্রাচীনকালে সংস্কৃতে রচিত হইয়াছিল। প্রাচীন সংস্কৃত ব্যাকরণে তাহার রচয়িতাদিগের উচ্চারণবিজ্ঞান ও ধ্বনিবিজ্ঞানের জ্ঞানের পরিচয়ও পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে সময়ে যাঁহারা ভাষাবিজ্ঞানের এইরূপ নানা শাখার অনুশীলন করেন, সংস্কৃতাদি ভারতীয় ভাষা তাঁহাদের জানা থাকিলে তাহা খুব কাজে লাগে। সংস্কৃত গ্রীক লাটিন প্রভৃতি ভাষা যে ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত, তাহার তুলনামূলক চর্চ্চাব জন্য সংস্কৃতের জ্ঞান অত্যাবশ্যক। গণিতের কোন কোন শাখাব, জ্যোতিষের, রসায়নীবিদ্যার, উদ্ভিদবিদ্যার এবং আরও কোন কোন বিদ্যার কতকগুলি বিষয়ের প্রাচীন ভারতীয়েরা চর্চ্চা করিয়াছিলেন। তাহার জ্ঞান এই সকল বিদ্যার বর্ত্তমান অনুশীলকদের কাজে লাগিতে পারে। দর্শনের ত কথাই নাই। যাহা ইউরোপীয়েরা নূতন মনে কবেন বা কবিতেন এরূপ কোন কোন দার্শনিক মত প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে আছে।

আমরা যদি দেশহিতকর কোন চেষ্টায় নিযুক্ত থাকি, তাহার ফল অনেক সময হয়ত আমাদের জীবিতকালে ফলিবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। এখন ফল দেখিতে না পাইলেও ভবিষ্যতে এই চেস্টাব ফলে দেশ কেমন হইবে, জাতি কেমন হইবে, তাহা কল্পনা করিয়া আমরা তৃপ্ত হই—যেমন কেহ বনস্পতিবহুল উদ্যানরচনা আরম্ভ করিয়া ইহা ভাবিয়া সুখী হইতে পারেন, যে, তাঁহার পৌত্রপৌত্রীরা দৌহিত্রদৌহিত্রীরা এই উদ্যানের আনন্দ সম্ভোগ করিবে। ভবিষ্যতের স্বদেশের প্রতি প্রীতি বস্তুটি কি, তাহা আমরা এই প্রকারে কিয়ৎপরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারি।

যে-দেশের অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ এক সুতায় গাঁথা মণিহারের মত, ধন্য সেই দেশ। এই প্রকার আদর্শ দেশ বস্তুতঃ একটিও নাই। এমন দেশ একটিও নাই যাহার অতীত কেবলই গৌরবের বস্তু, যাহার বর্ত্তমান নিষ্কলঙ্ক এবং নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের প্রস্রবণ, এবং যাহার ভবিষ্যৎকে দুঃখের, কালিমার, অশুভের বোঝা বহিতে হইবে না। অতীতের উপর আমাদের হাত নাই। অতীত হইতে আমরা যেমন আনন্দের ও গৌরবের কিছু, কল্যাণকর কিছু পাইয়াছি, তেমনি

দুঃখের, অগৌরবের, অকল্যাণের ও লজ্জার জনয়িতা কিছুও পাইয়াছি। কিন্তু আমরা যদি ভাল যাহা কেবল সেগুলিকেই পোষণ ও রক্ষা করি, তাহা হইলে কেবল যে আমাদের দেশের বর্ত্তমান ভাল হইবে, তাহা নহে, ভবিষ্যৎও ভাল হইবে। আমরা অতীত হইতে ভাল যাহা পাইয়াছি, তাহার রক্ষণ ও বিকাশসাধন ছাড়া নূতন কিছু ভালও আমাদিগকে করিতে হইবে—তাহা করিবার শক্তি বিধাতা আমাদিগকে দিয়াছেন। আমাদের পক্ষে যাহা বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ বংশাবলীর পক্ষে তাহাই হইবে অতীত। আমরা যদি আমাদের অতীতের কেবল ভালগুলিই রক্ষা ও বিকাশ করি এবং মন্দ কিছু নূতন না করিয়া নূতন ভালই করি, তাহা হইলে ভবিষ্যতের স্বদেশের লোকেরা আমাদের নিকট হইতে ভাল পাইয়া ও মন্দ না পাইয়া উপকৃত হইবে। এহেন ভবিষ্যৎ স্বদেশের মূর্ত্তি কল্পনার চক্ষে দেখিয়া প্রীতি ও আনন্দ অনুভব করিতে পারা সৌভাগ্যের বিষয়।

নিরবচ্ছিন্ন ভাল কিছু রক্ষা করা কিংবা অবিমিশ্র ভাল নূতন কিছু করা মানুষের পক্ষে দুঃসাধ্য—হয়ত অসাধ্য। কিন্তু অধম যাহা তাহাকে বর্জ্জন ও পরিহার করিবার চেষ্টা কাহারও সাধ্যাতীত নহে।

ভারতের বাহিরে ভারতীয় সংস্কৃতি

কেহ কেহ হয়ত এরূপ ভাবিতে পারেন, যে, ভারতীয়েরা যখন প্রাচীন কালে বিদেশে ভারতীয় সংস্কৃতির বিস্তার করিয়াছিল এবং আমরা যখন তাহার গর্ব্ব করিয়া থাকি, তখন বর্ত্তমানে ইউরোপীয়েরা বিদেশজয় দ্বারা পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিদেশে বিস্তারের চেষ্টা করিলে তাহার নিন্দা করা আমাদের উচিত নয়। এই বিষয়টির একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা আবশ্যক।

প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব চীনে কোরিয়ায় জাপানে ফিলিপাইন্সে অনুভূত হইয়াছিল। তাহার স্পষ্ট চিহ্ন এখনও রহিয়াছে। এই সকল দেশ ভারতীয়েরা জয় করিয়া তাহাদের অধিবাসীদিগকে অধীনতাপাশে বদ্ধ করিয়াছিল ইতিহাস এরূপ বলে না। এই সকল দেশে ভারতীয় সংস্কৃতির বিস্তারের সহিত হিংসা ও লোভের কোন সম্পর্ক নাই। অতএব ভারতীয় সংস্কৃতি বিস্তারের ইতিহাসের এই অংশটি হইতে আমরা অবিমিশ্র আনন্দ লাভ করিতে পারি।

জাভা প্রভৃতি কয়েকটি ভূখণ্ড ভারতীয়বংশোদ্ভূত রাজারাজড়ার করায়ত্ত কিরূপে হইয়াছিল, তাহার বিস্তারিত সঠিক্ ইতিহাস কেহ উদ্ধার ও রচনা করিয়াছেন কি-না, অবগত নহি। যদি এরূপ ইতিহাস থাকে, ও তাহার মধ্যে ভারতীয়দের হিংসা ও লোভের প্রমাণ থাকে, তাহা অবশ্যই নিন্দনীয়। তাহা গৌরবের বিষয় নহে। কিন্তু তাহা হইলেও আধুনিক পাশ্চাত্য বিদেশজয় ও উপনিবেশ স্থাপন নীতির সহিত প্রাচীন ভারতীয় রীতির পাথর্ক্য মনে রাখিতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য যে-জাতি

ইউরোপের বাহিরে যে-দেশ জয় করে, তথাকার ধনসম্পদ বিজেতাদের স্বদেশেই প্রধানতঃ নীত, ব্যবহৃত ও সম্ভূত হয়। ভারতীয় কোন কোন রাজা যদি জাভা প্রভৃতি জয় করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা রহিলেন পাটলিপুত্রে অযোধ্যায় উজ্জয়িনীতে বা কাঞ্চীতে এবং জাভা প্রভৃতির ধনসম্পদ প্রধানতঃ ভারতবর্ষেই আসিতে লাগিল, এরূপ ঘটে নাই। ভারতীয় বিজেতারা বিজিত দেশেই বসবাস করিলেন, বিবাহাদি দ্বারা সেখানকারই মানুষ হইয়া গেলেন। সেখানে একটি মিশ্র নূতন সভ্যজাতি গড়িয়া উঠিল। ইহা অগৌরবের বিষয় নহে। পাশ্চাত্য এবং অত্যাধুনিক জাপানী এক্সপ্লয়টেশ্যন-বর্জ্জিত এই প্রাচীনভারতীয় জয়যাত্রা আধুনিক এক্সপ্লয়টেনশ্যন-প্রধান বিদেশজয়ের সহিত তুলনীয় নহে।

ভারতীয়দের বিদেশে উপনিবেশস্থাপনের সহিত ইউরোপীয়দের বিদেশে উপনিবেশ-স্থাপনের আর একটি প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। আমেরিকায়, অস্ট্রেলিয়ায়, আফ্রিকার নানা দেশে ইউরোপীয়েরা ইচ্ছায় অনিচ্ছায় তথাকার আদিম বহু জাতি সম্পূর্ণ উচ্ছেদ বা প্রায় উচ্ছেদ সাধন করিয়াছে, এবং নিজেরা আলাদা একটি প্রভুজাতি হইয়া, কোন আদিম লোক অবশিষ্ট থাকিলে তাহাদিগকে দাসরূপে বা নিকৃষ্ট শ্রেণীর শ্রমিকরূপে ব্যবহার করিতেছে। নিজেদের ইন্দ্রিয়পরায়ণতা হইতে উদ্ভূত মিশ্র লোকদিগকেও তাহারা নিকৃষ্ট মনে করিয়া থাকে। অশ্বেতদের সহিত শ্বেতদের বৈধ সম্মানকর বিবাহ তাহাদের নিকট হইতে উৎসাহ পাওয়া দূরে থাক্, অনেক স্থলে দ্বারা নিষিদ্ধ এবং সর্ব্বত্র শ্বেতদের চক্ষে লজ্জাকর।

ভারতীয়দের জাভা প্রভৃতিতে উপনিবেশ-স্থাপনের সহিত এই প্রকার নানাবিধ নিন্দনীয় ব্যাপার জড়িত নহে।

প্রাচীন ভারতীয় বিজেতা ও উপনিবেশ-স্থাপক একটি গৌরবের জিনিষ আছে, যাহা বিজেতা ও উপনিবেশ স্থাপক কোন আধুনিক ইউরোপীয় জাতির নহে। জাভায়, কাম্বোডিয়ায়, প্রভৃতিতে ভারতীয় ও তথ্য মানুষদের মিশ্রণে উৎপন্ন সঙ্কর লোকেরা স্থাপত্যের ও মূর্ত্তিশিল্পের যে-সকল নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন, ভারতীয় সংস্কৃতির মাতৃভূমি ভারতবর্ষেও তাহা নাই। বোরোবদুরের, আঙ্কোরবটের, প্রম্বানমের মত মন্দিরাবলী; বুদ্ধের নানা মূর্তি, প্রজ্ঞাপারমিতার মূর্ত্তি, প্রস্তরমন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ রামায়ণাদি কথার ছবি—ভারতীয় উপনিবেশগুলির এই সকল প্রাচীন কীর্ত্তির সহিত তুলনীয় কিছু ভারতবর্ষেও নাই।

ইউরোপের সম্বন্ধে কি ইহা বলা যায়, যে, আফ্রিকার নিগ্রোরা, অস্ট্রেলিয়ার আদিম জাতিরা, আমেরিকার লাল ইণ্ডিয়ানরা ইউরোপীয় সংস্কৃতি সম্পূর্ণ নিজের করিয়া লইয়া ইউরোপীয়দের সমকক্ষ হইয়া ইউরোপেও যাহা নাই এমন সব ধর্ম্মমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছে, এমন সব প্রস্তর ও ধাতু মূর্ত্তি গড়িয়াছে, প্রস্তরমন্দিরগাত্রে ইউরোপীয় মহাকাব্যের দৃশ্যাবলী উৎকীর্ণ করিয়াছে? ইউরোপে যাহা নাই তাহা করা দূরে থাক্, ইউরোপে যাহা আছে তাহার সমতুল্য কিছু করিতেও তাহাদিগকে ইউরোপীয়েরা শিখায় নাই, শিখিবার সুযোগ দেয় নাই, শিখিতে উৎসাহিত করে নাই।

জাভার লোকেরা মনে করে, রামায়ণ মহাভারত তাহাদের, ঐ দুই মহাকাব্যের ঘটনাবলী তাহাদের দেশে ঘটিয়াছিল। ঐ দুই মহাকাব্যের অন্ততঃ কোন কোন অংশের প্রাচীন পুঁথি জাভায় পাওয়া গিয়াছে; গীতা পাওয়া গিয়াছে।

ইউরোপীয়দের দ্বারা বিজিত কোন আদিম

জাতি হোমরের, বর্জিলের, দান্তের, শেক্সপীয়রের কোন মহাগ্রন্থকে এই রূপে আত্মসাৎ কবিয়াছে কি?

অতএব, প্রাচীন ভারতীয়দের বিদেশজয় ও বিদেশে উপনিবেশস্থাপন, ইউরোপীয়দের তদ্বিধ কার্য্যের সমশ্রেণীস্থ নহে।

১৩১২ চৈত্র

সমালোচনা

কাশীতে বাঙালিদের সাংস্কৃতিক সম্মিলন]

গত ২৬শে ফাল্গুন কাশীনরেশের বাগানবাড়ীতে প্রয়াগস্থ বাঙ্গালীদের একটি সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। সম্মিলনক্ষেত্রে অত্রস্থ অধিকাংশ বাঙ্গালী উপস্থিত হইয়াছিলেন। ছেলে ও যুবকদের নানাবিধ ব্যায়াম ও ক্রীড়া হইযাছিল। ঐক্যতান বাদ্য ও সঙ্গীত হইয়াছিল। ফনোগ্রাফের গান হইয়াছিল। কলিকাতার শ্রীযুক্ত বাবু হেমেন্দ্রমোহন বসু (H Bose) মহাশয নিজ ব্যয়ে তাঁহার উৎকৃষ্ট ফনোগ্রাফ্ ও রবিবাবু, দ্বিজেন্দ্রবাবু প্রভৃতির কণ্ঠে গীত গানের রেকর্ডসহ একজন বাদক পাঠাইয়া প্রবাসী বাঙ্গালীদিগকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহাব রেকর্ডগুলি বেশ ভাল, অনেক যন্ত্রে যেরূপ একটা অস্বাভাবিক শব্দ বাহির হয়, এগুলিতে তাহা নাই বলিলেও চলে। ব্যায়ামাদি খুব ভাল হইয়াছিল। শিশুদের সঙ্গীতও বেশ আমোদজনক হইয়াছিল। এক্ষেত্রে অনেকেই পরিশ্রম কবিয়াছেন। কিন্তু উকীল শ্রীযুক্ত হরিমোহন রায় মহাশয়ের অনুরাগ পরিশ্রম ও উদ্যোগ আয়োজনের প্রশংসা করিলে বোধ করি কাহারও প্রতি অবিচার করা হইবে না। ব্যায়ামক্ষেত্রে কায়স্থপাঠশালার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু ধনেশপ্রসাদ ও শিক্ষক বাবু দেবকীনন্দন লাল ক্রীড়কদের গুণাগুণ নির্দ্ধারণ করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য মহাশয় পুরস্কারবিতরণ সভার সভাপতিত্ব করেন। সভাস্থলে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলর মাননীয় পণ্ডিত সুন্দরলাল রায় বাহাদুর এবং মাননীয় পণ্ডিত মদনমোহন মালবী মহোদয়দ্বয় উপস্থিত থাকিয়া সকলের আনন্দবর্দ্ধন করেন। আরও অনেক হিন্দুস্তানী ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। কাশীনরেশ বাগানবাড়ীটী ব্যবহার করিতে দিয়া আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

১৩৪০ জ্যৈষ্ঠ

অধ্যাপক যদুনাথ সিংহ ও অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনের মোকদ্দমা

অধ্যাপক যদুনাথ সিংহ ও অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনের মোকদ্দমা উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে কলিকাতা হাইকোর্ট হইতে তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। ইহার মিটমাটের সংবাদ ইংরেজী ও বাংলা কোন কোন খবরের কাগজে অসম্পূর্ণ আকারে বাহির না হইলে এ-বিষয়ে আমার কিছু লিখিবার কারণ ঘটিত না। এখন সংক্ষেপে মোকদ্দমা দুটি সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইতেছে।

১৯২৯ সালের জানুয়ারী মাসের 'মডার্ণ রিভিউ'য়ে অধ্যাপক যদুনাথ সিংহের একটি চিঠি বাহির হয়। তাহা অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনের একখানি বহির প্রতিকূল সমালোচনা। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন এই চিঠির উত্তর দেন ও আমি তাহা প্রকাশ করি। অধ্যাপক যদুনাথ সিংহের প্রত্যুত্তর এবং অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনের প্রত্যুত্তর আমি প্রকাশিত করি। ইহার পর অধ্যাপক যদুনাথ সিংহ যাহা লেখেন, তাহার উত্তরও আমি ছাপিতে প্রস্তুত। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনকে তাহা জানান হয়। কিন্তু তিনি আর উত্তর দেন নাই। এই তর্কবিতর্ক উত্তর-প্রত্যুত্তর ১৯২৯ সালের 'মডার্ন্ রিভিউ'য়ের জানুয়ারী হইতে এপ্রিল এই চারি সংখ্যায় চলিয়াছিল। তাহার পর ঐ বৎসর জুলাই মাসে অধ্যাপক যদুনাথ সিংহ কলিকাতা হাইকোর্টে অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনের নামে কপিরাইট ভঙ্গের নালিশ করেন এবং ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। তদনন্তর অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্ কলিকাতা হাইকোর্টে আমার ও অধ্যাপক যদুনাথ সিংহের নামে একলক্ষ টাকা দাবি করিয়া এক সম্মিলিত মোকদ্দমা করেন। আমাকে জড়াইবার কারণ, আমার ইংরেজী মাসিকে উভয় অধ্যাপকের তর্কবিতর্ক ছাপা হইয়াছিল। যাহা হউক, এতদিন গড়াইয়া গড়াইয়া এখন মোকদ্দমা মিটিয়া গিয়াছে। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন ও অধ্যাপক যদুনাথ সিংহের পরস্পরের সহিত মিটমাট এবং তাঁহাদেব মীমাংসার সর্ত্ত-পত্র ("terms of settlement") উভয়ের স্বাক্ষরযুক্ত হইয়া যাইবার পর অধ্যাপক যদুনাথ সিংহ স্বয়ং এবং অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনের এজেন্ট আমাকে টেলিফোনে সংবাদটি জানান, তাহার পূর্ব্বে আমাকে কিছু জানান তাঁহারা আবশ্যক মনে করেন নাই—যদিও অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন মোকদ্দমায় আমাকেও জড়াইয়াছিলেন। তাঁহাদের এই কার্য্যপ্রণালী হইতেই প্রমাণ হয়, কোন মোকদ্দমার সহিত আমার মুখ্য সম্বন্ধ ছিল না। যাহা হউক, ইহাতে আমরা আপত্তির কারণ ছিল না। কারণ উভয় অধ্যাপকের কাহারও নামে আমি নালিশ করি নাই, এবং আমাকে 'মডার্ণ রিভিউ'য়ে আমার লিখিত কিছু প্রত্যাহার করিতে বলা হয় নাই, তাহা করিতে বলিবার কোন কারণও ছিল না। সুতরাং মিটমাটে আমি স্বচ্ছন্দে সম্মতি দিয়াছি। মিটমাটের শর্তগুলি নীচে উদ্ধৃত হইল।

1. The suits against the respective defendants is withdrawn.

2. The allegations made against the aforesaid in the respective plaints, written statements of the correspondence relating to the subject of the above-

mentioned suits in the Modern Review are withdrawn.

3. There shall be no order as to costs.

আমি কোন নালিশ করি নাই, সুতরাং প্রত্যাহার করিবার "প্লেন্ট" অর্থাৎ অভিযোগপত্র আমার ছিল না; উভয় অধ্যাপক তাঁহাদের নিজ নিজ "প্লেন্ট" বা অভিযোগপত্র প্রত্যাহার করিয়াছেন। "লিখিত বর্ণনাপত্র" আমারও একটা ছিল, কিন্তু তাহাতে কাহারও নামে কোন অভিযোগ ছিল না, কেবল অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনের "প্লেন্ট" বা অভিযোগপত্রের উত্তর ছিল। তিনি আগে হইতেই নিজের "প্লেন্ট" বা অভিযোগপত্র প্রত্যাহার করায় আমার বর্ণনাপত্রও অনাবশ্যক এবং স্বতঃপ্রত্যাহৃত হইয়াছিল। বাকী থাকে 'মডার্ণ রিভিউ'তে মুদ্রিত এতদ্বিষয়ক জিনিষগুলি। সেগুলি দুই শ্রেণীর। প্রথম, উভয় অধ্যাপকের মোকদ্দমার বিষয়ীভূত উত্তর-প্রত্যুত্তর-পত্রাবলী ("the correspondence relating to the subject matter of the above mentioned suits in the *Modern Review*")। এই করেস্পণ্ডেন্সের (পত্রাবলীর) এক বর্ণও আমার নহে। দ্বিতীয়, এই বিষয় সম্পর্কে সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলি অর্থাৎ আমি যাহা লিখিয়াছিলাম। মীমাংসার সর্ত্ত-পত্রে ("terms of settlement"এ) সম্পাদকীয় মন্তব্যসমূহ উল্লিখিত ও প্রত্যাহৃত হয় নাই, হইবার কারণও ছিল না। কেন না, তাহাতে আমি উভয় অধ্যাপকের কাহারও পত্রলিখিত বিষয়ের সপক্ষে বা বিপক্ষে কিছু লিখি নাই।

অধ্যাপক যদুনাথ সিংহের যদি মোকদ্দমা করিবারই ইচ্ছা ছিল, তাহা হইলে মডার্ণ রিভিউয়ের চারি সংখ্যার এতগুলি পাতা নষ্ট করিয়া আমাকে না জড়াইলেই ভাল হইত। তাহা হইলে মোকদ্দমাঘটিত উদ্বেগ ও অর্থনাশ হইতে আমি রক্ষা পাইতাম। তিনি মোকদ্দমা না করিলে খুব সম্ভব অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনও তাঁহার ও আমার নামে মোকদ্দমা করিতেন না—অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনের মোকদ্দমাটা পাল্টা মোকদ্দমা। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনকে আমি মোকদ্দমা করার জন্য তেমন দোষ দি না। যেমন দি অধ্যাপক যদুনাথ সিংহকে। কিন্তু অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনের সম্বন্ধেও প্রশ্ন উঠে এই, যে, তিনি যখন মোকদ্দমা পরে করিলেনই তখন অধ্যাপক যদুনাথ সিংহের প্রথম চিঠি মডার্ণ রিভিউয়ে বাহির হইবার পরই তাহার জবাব না দিয়া সোজাসুজি লেখকের ও সম্পাদকের নামে নালিশ কেন করিলেন না।

আমার সন্তোষের বিষয় এই, যে, আমাকে কোন প্রকার ত্রুটি স্বীকার করিতে কিংবা মডার্ণ রিভিউয়ে আমার লেখা কোন জিনিষ প্রত্যাহার করিতে বলা হয় নাই। আমার বরাবরই এই বিশ্বাস ছিল, যে, আমি এই মোকদ্দমার বিষয়ীভূত কোন জিনিষ সম্বন্ধে অন্যায় কিছু লিখি নাই। এখন পরোক্ষভাবে প্রমাণও হইয়া গেল, যে, আমি অন্যায় কিছু লিখি নাই।

আমার অসন্তোষের বিষয় এই, যে, আমার এতগুলি টাকা ন দেবায় ন ধর্ম্মায় গেল।

শিল্প ও শিল্প-আন্দোলন

প্রাসঙ্গিক কথা

'নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলা', যা আন্দোলনের রূপ ধরেছিল—তার সূচনা ঠিক কোন্ সময়ে হয়, সে বিষয়ে বিতর্ক আছে। এই শিল্পধারার শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় বিষয় নিয়ে ছবি আঁকতে শুরু করেন রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায়। তার আগে তিনি পাশ্চাত্য রীতিতে শিল্পশিক্ষা করেছেন। দেশীয় বিষয় নিয়ে তাঁর প্রথম পর্যায়ের চিত্রাঙ্কনে অপরিণতির লক্ষণ ছিল। ক্রমে তিনি আরো অগ্রসর হন এবং লন্ডনের *স্টুডিয়ো* পত্রিকায় (১৫ অক্টোবর ১৯০২) হ্যাভেল 'সাম নোটস্ অন ইন্ডিয়ান পিক্টোরিয়াল আর্ট' প্রবন্ধের মধ্যে ভারতীয় ভাবধারার সফল আধুনিক চিত্রকর হিসাবে অবনীন্দ্রনাথের নামোল্লেখ করেন প্রশংসার সঙ্গে—এবং কয়েকটি ছবিও মুদ্রিত করেন। এই সময়টিকে আন্দোলনের সূচনাপর্ব ধরার অসুবিধা হচ্ছে—কোনো এক ব্যক্তি, তিনি যতই বিশেষ একটি ক্ষেত্রে প্রতিভার বিকাশ করুন, যতক্ষণ-না তাঁর প্রবর্তিত ধারায় অন্য শিল্পীরা সৃষ্টিকাজে এগিয়ে আসেন এবং সমর্থক শিল্প-বিশেষজ্ঞরা ওই ধারার রীতিনীতি ও মূলগত দর্শন উপযুক্তভাবে বিশ্লেষণ করেন, ততক্ষণ শিল্প-আন্দোলন হয়েছে এ কথা বলা যাবে না। সে হিসাবে অবনীন্দ্রনাথ আর্ট স্কুলে আর্নেস্ট বিনফিল্ড হ্যাভেলের সহকারী হিসাবে যোগদান করলে (১৯০৫–১৯১৫ পর্যন্ত ওই পদে থাকেন) এবং নন্দলাল বসু প্রমুখ শিল্পীরা তাঁকে কেন্দ্র করে শিল্প-সাধনায় ব্রতী হলেই বলা যাবে শিল্প-আন্দোলন ঘটেছে! সে হিসাবে ১৯০৫–০৬ সাল থেকে আন্দোলনের সূত্রপাত—যখন একদিকে তরুণ প্রতিভাবান শিল্পীরা ভারতীয় ভাবধারার শিল্পরচনা করে যাচ্ছেন এবং শিল্প-বিশেষজ্ঞরা ভারতীয় শিল্পরীতির উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা-সহ ওইসব শিল্পীদের সৃষ্টির তারিফ করছেন।

এই সময়ের আগেই কিন্তু ভারতীয় শিল্পীরা চিত্রাঙ্কন শুরু করে দিয়েছেন পাশ্চাত্য রীতির অনুসরণ করে। সেইসঙ্গে পাশাপাশি অন্য চিত্রধারাও বহমান ছিল। কলকাতাকেন্দ্রিক ঐসব শিল্পকে কয়েকটি অংশে শিল্প-গবেষকেরা ভাগ করেছেন (আমাদের সাহায্য করেছেন দেবদত্ত গুপ্ত)। একটি ধারায় পড়ে মুর্শিদাবাদ শৈলীতে আঁকা চিত্রাবলি। ইসলামে মনুষ্যচিত্র বা জীবচিত্র আঁকা নিষিদ্ধ ছিল বলে আকবরের আগে চিত্রশিল্পের স্বাধীন বিকাশ দরবারি চিত্রে ঘটতে পারেনি। মুক্তমনা আকবর দ্বার ভাঙেন, সেই দ্বারপথে স্বাধীন শিল্পের প্রকাশ জাহাঙ্গিরের রাজত্বকালে। শাজাহানের আমলে তা কিছুটা বজায় ছিল। তবে চিত্রশিল্প অপেক্ষা স্থাপত্যের বিকাশেই শাজাহান বেশি তৎপর ছিলেন। তারপর আরংজিবের আমলে ধর্মীয় অনুশাসন শিল্পের বিকাশকে রুদ্ধ করে, শিল্পীরা অগত্যা প্রান্তীয় রাজ্যগুলিতে ছড়িয়ে

পড়েন, ফলে সৃষ্ট হয় মিশ্রধারায় রাজপুত, কাংড়া শিল্প ইত্যাদি। আকবর-জাহাঙ্গীর-শাজাহান পর্বে অলংকরণের সঙ্গো পোর্‌ট্রেট এবং আনুষঙ্গিক জীবনচ্ছবি এসে গিয়েছিল।

মুঘল শাসন ভেঙে পড়ার পরে বাংলায় মুর্শিদকুলি খানের সময় থেকে মুর্শিদাবাদ বাদশাহি শিল্পকলার অন্যতম আশ্রয় হয়ে ওঠে। ইংরেজ আমলের সূচনায় মুর্শিদাবাদ কলমের কিছুটা স্বীকৃতি ছিল। "এদেশে আগত ইংরেজরা এদেশের প্রকৃতি, জীবন, ফুললতা পাতা পশুপাখি ইত্যাদির নথি নির্মাণযোগ্য ছবি আঁকবার জন্য এই শিল্পীদের নিযুক্ত করল। এইভাবেই কোম্পানির পৃষ্ঠপোষকতায় যে-চিত্রকলার সূত্রপাত হয় ১৮ শতকের শেষে, তাকেই উইলিয়ম আর্চার বলেছেন কোম্পানি-চিত্রকলা। সমকালীন ভারতীয় জীবনধারার চাক্ষুষ নথি ছিল ছবিগুলি। ছবির বিষয় : এদেশের মানুষের পোশাক-আসাক, যানবাহন, বড় বড় উৎসব, কারিগর, মুচি, রাঁধুনি, হুঁকাবরদার, নাপিত, দরজি, ভিস্তি, লাক্ষা-কারিগর। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিক থেকে মুর্শিদাবাদ শিল্পীরা পাশ্চাত্যরীতির দিকে ঝুঁকেছেন। তখন দেখা গেল—আলোছায়া, স্বচ্ছ কালো রঙের ব্যবহার ইত্যাদি।" (দেবদত্ত গুপ্তের লেখার অংশ; তাঁর লেখা থেকেই এই অংশে আমরা তথ্য সংগ্রহ করেছি। পরবর্তী কিছু অংশে বঙ্গীয় শিল্প আন্দোলনের পূর্ববর্তী শিল্পসৃষ্টি সম্বন্ধে আলোচনায় উদ্ধৃতি না থাকলে এবং উল্লেখ না থাকলেও ধরতে হবে সেসব তাঁর লেখারই অংশ)।

ইউরোপীয় চিত্রকরদের ছবি দামে চড়া বলে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির সাহেবরা মুঘল ধারার শিল্পীদের কাজে লাগান। ফলে মুঘল শৈলী ও ইউরোপীয় শৈলীর মিশ্রণে কোম্পানি-শিল্প একটা ভিন্ন চেহারা নিয়েছিল। এইখানে শেখ জৈনুদ্দিন, ভবানী দাস, রামদাস ও শেখ মুহম্মদ আমিরের কথা স্মরণ করতে হয়।

কোম্পানি-চিত্রকলার সমান্তরাল কলকাতার দক্ষিণে ও উত্তরে আরও দুটি চিত্রধারার উপস্থিতি দেখা যায়—কালীঘাট ধারা ও বটতলা ধারা।

বটতলার কাঠখোদাইয়ের কাজ বাংলা প্রকাশনার সূত্রপাত করে দেয়। বাংলা বই ছাপা শুরু হয় কাঠখোদাই হরফের সাহায্যে। শিল্পীরা সেখানেই থামেননি। তাঁরা কাঠখোদাই বড়ো প্রিন্টের ছবি ছাপতে আরম্ভ করেন। অনেক বই সচিত্র হত। তা ছাড়া আলাদা কাঠখোদাই ব্রডশিট প্রিন্টের ছবিও বাজারে চালু হয়। পঞ্চানন কর্মকার কাঠখোদাই হরফ কেটেছিলেন। আর কাঠখোদাই-শিল্পীদের মধ্যে পড়েন রামচাঁদ রায়, রামধন স্বর্ণকার, মাধবচন্দ্র দাস, রূপচাঁদ আচার্য, বেণীমাধব ভট্টাচার্য। "চিত্রে আকারের সুষ্ঠুতা, মজবুত জ্যামিতিক বিন্যাস, রেখার বৈচিত্র্য, রূপবৈচিত্র্য কাঠখোদাইয়ের বৈশিষ্ট্য।"

পট, গ্রামকেন্দ্রিক বঙ্গাদেশের প্রধান শিল্পকলা, যা সজীব ছিল শত শত বৎসর ধরে। অজন্তার পরে যখন ভারতীয় চিত্রধারার অবনমন ঘটে, তখন ভারতশিল্পের প্রাণময় রস প্রবাহিত হয়েছে গ্রামীণ পটের মধ্য দিয়েই। এই পট শিক্ষিতজনের সৃষ্টি নয়। পটুয়া-পরিবার ছিল। তাঁরা ধর্মরসে জারিত মানুষের জন্য পৌরাণিক বিষয়ই অধিক এঁকেছেন। তাতেই থেমে না থেকে গ্রামজীবনের গতিশীল ছবিও তাঁদের ছবিতে উঠে এসেছে। অজ্ঞাতনামা শিল্পীদের আঁকা এইসব চিত্র লোকশিল্প নামে চিত্রিত।

কলকাতাকেন্দ্রিক কালীঘাট পটের সঙ্গো গ্রামকেন্দ্রিক পটের রক্তসম্বন্ধ ছিলই। কিন্তু পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংস্পর্শের ফলে তার রক্তবিশুদ্ধি রক্ষা পায়নি।

ভোলানাথ ভট্টাচার্য এবং দেবদত্ত গুপ্ত নিবিড় সমীক্ষার দ্বারা কালীঘাট পটের অনেক শিল্পীর নাম উদ্ধার করতে পেরেছেন (অশোক ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'কালীঘাট পট' সংকলন-গ্রন্থের 'পশ্চিমবঙ্গের পটচিত্র' প্রবন্ধ)। তাঁরা মন্তব্য করেছেন : "বাংলা কলমের এই নতুন শাখা কালীঘাট শৈলীর সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হল—এক ছন্দোময় দুঃসাহসিক প্রবহমান বহিঃরেখা—যা দৃঢ়, মিতবাক্ ও কমনীয়, আবেদনে স্পষ্ট ও সরাসরি।... বাংলা কলমের সহজাত গুণ যে দ্রুতাঙ্কন তার সঙ্গে সরলতার মিলনে জন্ম নিল এমন এক দক্ষ ও বলিষ্ঠ রেখাগতি যার একমাত্র তুলনা হল স্ফুরিত বিদ্যুৎরেখা।... বিদেশী চিত্রের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় হয়ত পটুয়ার মনের আকাশে রঙ ধরিয়েছে এবং গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে সেইসব বিষয় হয়ত এখন ঢুকে পড়েছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা এক লহমায় কালীঘাট শৈলীতে পরিণত হয়েছে।...তাই কালীঘাটের মিশ্রণলব্ধ শৈলী আসলে বাংলা কলমের লোকায়ত ও অভিজাত শাখার সার্থক ও মহান নাগর পরিণতি।" লেখকদ্বয় শিল্পীদের দুর্লভ সমাজসচেতনতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, এবং সাহসের সঙ্গে বলেছেন, "এমন সুডৌল বলিষ্ঠ মূর্তি গ্রীক ভাস্কর্য ছাড়া কোনো শিল্পধারায় নজরে পড়ে না।"

নগররুচির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কালীঘাটের পটের আয়ু শেষ হয়ে গিয়েছে।

অবনীন্দ্রনাথের পূর্বে ইউরোপীয় ধারায় শক্তিশালী তৈলচিত্র শিল্পীরা এসেছিলেন। "গঙ্গাধর দে সর্ব প্রথম বাঙালীর মধ্যে পাশ্চাত্যানুকরণে শিল্পশিক্ষা করে যশস্বী হন।" এঁরা মহাকাব্যিক ও পৌরাণিক বিষয়ে ছবি আঁকলেও পোর্‌ট্রেট শিল্পী হিসাবে অধিক খ্যাত ছিলেন। হেনরি হোভার লক যখন আর্ট স্কুলের কর্ণধার তখনকার নামি শিল্পীরা হলেন : অন্নদাপ্রসাদ বাগচী, শ্যামাচরণ শ্রীমানি, গোপালচন্দ্র পাল, কালিদাস পাল, হরিশচন্দ্র খাঁ। আর্ট স্কুলের প্রথম পর্বে এই ধারার আরো শিল্পী : নবকুমার বিশ্বাস, ফণীভূষণ সেন, যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণচন্দ্র পাল।

অন্নদাপ্রসাদ বাগচীর নেতৃত্বে ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিয়ো। আর্ট স্টুডিয়ো চিত্রাবলি একদা খুবই খ্যাতি লাভ করেছিল

লকের পরে আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপাল ও ভাইস-প্রিন্সিপাল উইলিয়াম জবিন্স ও ওলিন্দ গিলার্ডির আমলে উক্ত ধারার প্রধান শিল্পীরা হলেন—শশীকুমার হেস, রোহিণীকান্ত নাগ, ফণীন্দ্রনাথ বসু। তা ছাড়া প্রতিকৃতি-শিল্পী হিসাবে খ্যাত প্রমথনাথ মিত্র।

অন্নদাপ্রসাদের পাশাপাশি প্রতিকৃতি রচনায় সুবিখ্যাত শিল্পী বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

হ্যাভেলের কালে এবং পরেও ইউরোপীয় ধারায় অনেকেই প্রতিকৃতিমূলক অথবা বিষয়কেন্দ্রিক ছবি এঁকেছেন—এখনও কেউ কেউ সেই ধারাকে ধরে রেখেছেন। হ্যাভেলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে রণদাপ্রসাদ দাশগুপ্ত ১৮৯৭ সালে যে জুবিলি আর্ট একাডেমি (ভিক্টোরিয়ার ৭৫ বৎসরের শাসনকালে 'জুবিলি' স্মরণে) স্থাপন করেন, তাঁর ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন নরেন্দ্রনাথ সরকার, হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার, যোগেশচন্দ্র শীল, অভয়াচরণ দাস, অতুলচন্দ্র বসু, প্রহ্লাদচন্দ্র কর্মকার। তা ছাড়া সতীশচন্দ্র সিংহ, যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, বসন্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, কিশোর রায় প্রমুখের নামও করতে হয়।

২

প্রবাসী-র পৃষ্ঠা ওলটালে (*মডার্ন রিভিউ*-র পৃষ্ঠাও) দেখা যাবে রামানন্দ কী পরিমাণে সাদা-কালো বা বহুবর্ণ ছবি ছেপেছেন। *প্রবাসী*-র অন্যতম সম্পদ এই ছবিগুলি। শিল্প রামানন্দর প্রচণ্ড প্যাশনের বিষয়—যার প্রকাশ দেখা যায় *প্রবাসী* প্রকাশের পূর্বে তাঁর দ্বারা সম্পাদিত *প্রদীপ* পত্রিকা থেকেও। উল্লেখ্য, তিনি কেবল শিল্পীদের আঁকা ছবি ছাপেননি, শিল্প-বিষয়ক যেসব প্রবন্ধ ছেপেছেন, তাদের মধ্যেও স্থান ও সংস্কৃতি-প্রকাশক প্রচুর ছবি যুক্ত করেছেন। এমনকি কখনো-কখনো গল্প ও উপন্যাসে ইলাস্ট্রেশন হিসাবে ছবি আছে।

প্রবাসী-র একেবারে প্রথম সংখ্যায় বেরিয়েছিল রামানন্দর 'অজণ্টা-গুহা-চিত্রাবলী' নামক দীর্ঘ সচিত্র একটি প্রবন্ধ। এর মধ্যে অজন্তার স্থান-পরিচয়, বৌদ্ধ ও হিন্দুদের শিল্পকর্ম, অঙ্কিত চরিত্রগুলির দেহাবয়ব, পোশাক, ব্যবহৃত জিনিসপত্র, অলংকার ও প্রসাধনরীতি, পরিবারে জীবজন্তুর আকার ও প্রকার, নিসর্গ এবং বৌদ্ধপুরাণের বিষয়বস্তু ইত্যাদি প্রসঙ্গ আছে। এই ভূমিকায় রামানন্দ ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক—সেইসঙ্গে শিল্পবেত্তার ভূমিকা নিয়ে অল্পবিস্তর চিত্রসৌন্দর্য বিশ্লেষণও করেছেন।

বোম্বাইয়ের 'স্যর জামষেদজী জীজীভাই শিল্পবিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ গ্রিফিথ্‌স্ সাহেব'-এর দ্বারা নিয়োজিত ছাত্রগণ অজন্তার যে প্রতিলিপি করেন—তার উপর নির্ভর করে সাহেব একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। অজন্তার আবিষ্কার হয় ১৮১৯ সালে। গ্রিফিথ্‌স-এর বহু বৎসর আগে প্রথম প্রতিলিপি প্রস্তুত করান মেজর রবার্ট গিল, যা পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়। গ্রিফিথ্‌স-এর ছাত্রদের করা প্রতিলিপির অনেকগুলিও পুড়ে গিয়েছিল। অবশিষ্টগুলি নিয়ে গ্রিফিথ্‌স প্রকাশ করেন দুই খণ্ডে—'The Paintings in Buddhists Caves and Temples of Ajanta', 1896-97। এই গ্রন্থ রামানন্দর প্রবন্ধের আকর।

'অজণ্টা' প্রবন্ধে রামানন্দর শিল্পদৃষ্টি অগভীর। তাঁর এই তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধটিতে তিনি শিল্পসৌন্দর্য প্রসঙ্গে নিজে অল্প কথা বলে প্রধানত নির্ভর করেছেন গ্রিফিথ্‌স্ সাহেব এবং ফার্গুসন সাহেবের মতামতের উপর। প্রচুর প্রশংসার পরে গ্রিফিথ্‌স অজন্তা-চিত্রের কোনো কোনো অংশকে তাঁর পক্ষে যে সর্বোচ্চ গৌরবদান সম্ভব তা দিয়ে বলেছেন সেগুলি ইতালির প্রথম যুগের কিছু চিত্রের সঙ্গে একাসনে বসবার যোগ্য। আর ফার্গুসন চিত্রগুলিকে 'আধুনিক ইউরোপীয় চিত্রের সমতুল্য নহে' -এমনই বিবেচনা করেছেন। তবে উদারভাবে জানিয়েছেন 'তাৎকালিক ইউরোপীয় চিত্র অপেক্ষা নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট'। রামানন্দ তাঁর শিল্পবোধের প্রথম পর্যায়ে হিন্দু-বৌদ্ধ ভাস্কর্য যে গ্রিক মূর্তি সৌন্দর্য-আদর্শের 'নিকটেও যাইতে পারে নাই'—ফার্গুসন প্রভৃতি ইউরোপীয় সমালোচকদের সেই মত গ্রহণ করেছিলেন। সেই মত রামানন্দ একই বৎসরের শ্রাবণ ১৩০৮ সংখ্যায় 'ভারতবর্ষের শিল্প' নামক এক দীর্ঘ প্রবন্ধে প্রকাশ করেছেন। এই সূত্রে তিনি ইউরোপীয় ছাড়াও রমেশচন্দ্র দত্তের অনুরূপ মতের উল্লেখ করেন। রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর 'Ancient India B.C. 2002 to A.D. 800' গ্রন্থে লিখেছেন : "Architecture and painting are almost forgotten arts in India. The Hindus, even in the best days could never equal the Greeks in these arts. Displaying much ingenuity and industry

and even elegance and beauty, Hindu art lacks the higher aesthetic quality of the Greek Art, and an Phidias or a Praxitelles was impossible among the low caste of india who were alone allowed to engage in architecture and sculpture." (শঙ্করীপ্রসাদ বসু, *নিবেদিতা লোকমাতা*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৬৬)। এ কথা অবশ্য বলা যাবে, রামানন্দ পূর্বোক্ত 'ভারতবর্ষের শিল্প' প্রবন্ধে তৎকালে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতবর্ষের ধর্ম সংস্কৃতি ও রাজদরবারের সঙ্গে শিল্পের কীপ্রকার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল তার কাহিনি প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের শিল্পধারার পতনের কারণ জানিয়েছেন।

আধুনিক ভারতীয় চিত্রধারায় প্রথম বড়ো ঢেউ তোলেন ত্রিবাঙ্কুরের রবিবর্মা। রামানন্দ *প্রবাসী*-র প্রথম বর্ষে 'রবিবর্মা' প্রবন্ধে নিঃসংশয় কণ্ঠে বলেছেন : "ভারতবর্ষীয় চিত্রবিদ্যার ইতিহাস যদি কখন লিখিত হয়, তাহা হইলে, নিশ্চয়ই তিনি আধুনিক যুগে ইহার জন্মদাতা বলিয়া পূজিত হইবেন।"

উনিশ শতকের শেষ প্রান্তে এবং বিশ শতকের গোড়ায় রবিবর্মার পৌরাণিক চিত্রগুলি অঙ্কিত ও প্রদর্শিত হয়ে ভারতবাসীর মনকে একেবারে লুঠ করে নিয়েছিল। সেই প্রথম একজন ভারতীয় চিত্রকর মহাকাব্য এবং পুরাণের চরিত্রগুলিকে বর্ণরঙিন উজ্জ্বল চিত্ররূপে উপস্থিত করলেন। সে চিত্রগুলির লিথোগ্রাফ মুদ্রণের ব্যবস্থাও তিনি করেন। ফলে সেগুলি কেবল শিক্ষিত ভারতবাসীর কাছেই নয়, গ্রামে-গঞ্জে অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত মানুষের কাছেও পৌঁছে যায়। কথকতা, যাত্রা, সংগীত এবং লোকশ্রুতিতে প্রাপ্ত চরিত্রগুলির জ্বলজ্বলে ছবি দেখে তাঁরা মোহিত হয়ে গিয়েছিলেন। মনে করা হয়েছিল, রবিবর্মা ভারতীয় চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। তাঁর ছবি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির অতিশিক্ষিত এবং প্রতিভাধর মানুষগুলিকে পর্যন্ত এমনই মুগ্ধ করেছিল যে, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩০৬-এর *প্রদীপ* পত্রিকায় রবিবর্মার চিত্রের ভাবাপ্লুত বিশ্লেষণযুক্ত প্রবন্ধ রচনা করেন, যেটি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরামর্শ করে লিখিত। দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের মনেও রবিবর্মা নাড়া দিয়েছিলেন।

আবার উলটো-স্রোত এসেছিল ঠাকুর-পরিবারের তিন শিল্পীর সৃষ্টি থেকে—গগনেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ 'ঈ বী হ্যাভেল' নামক এক রচনায় (*প্রবাসী*, ১৩৪৫ মাঘ) রবিবর্মা সম্বন্ধে তাঁর প্রাথমিক মোহমুগ্ধতা ও পরবর্তী মোহভঙ্গের কথা জানিয়েছেন। পরবর্তীকালে রবিবর্মার চিত্র সম্বন্ধে তাঁর বিচার কঠোর এবং নির্মম : "[রবিবর্মার চিত্র দেখে প্রথমদিকে] মন বিচলিত হয়েছিল সেকথা স্বীকার করি। তারা যে কত কৃত্রিম, তারা যে যাত্রার দলের পাত্রপাত্রীর একশ্রেণীভুক্ত, সেকথা বোঝবার মন তখনো হয়নি;... [শিশুপাঠ্য বইয়ের] নৃসিংহমূর্ত্তির মধ্যেও সত্য ছিল কিন্তু রবিবর্মার ছবির মধ্যে ছিল না, একথা বোঝবার পথ তাঁর [হ্যাভেলের] কাছ থেকেই পেয়েছি।"

প্রশ্ন উঠবে, তাঁর রবিবর্মা-মুগ্ধতা ঠিক কত দিন বজায় ছিল? হ্যাভেলের সঙ্গে যোগাযোগ ও আলোচনার কাল এবং বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রবিবর্মা' লেখায় তাঁর সাহায্য ইত্যাদির সময়ের হিসাব করলে ধরতে হয় প্রথম প্রৌঢ়ত্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের রবিবর্মা-মুগ্ধতা বজায় ছিল। এ বিষয়ে অধিক আলোকসম্পাত রবীন্দ্র-গবেষকরা করতে পারবেন।

রবিবর্মা সম্বন্ধে সমকালীন আবেগ-উচ্ছ্বাসপুঞ্জের উপরে সম্ভবত প্রথম প্রচণ্ড ঝাপট লাগে স্বামী বিবেকানন্দের একটি মন্তব্যে। পরিব্রাজক-জীবনে স্বামীজি রবিবর্মার চিত্রাবলি আগ্রহের সঙ্গে দেখেছেন, কিন্তু তাঁর চোখে মোহাঞ্জন লাগেনি। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে (*উদ্বোধন* পত্রিকায় ১৩০৬–০৮ সময়ে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত) তিনি সেকালের পক্ষে দুঃসাহসিক এই মন্তব্য করেছেন :

> বড় জোর ওদের [ইউরোপীয়দের] নকল ক'রে এক-আধটা রবিবর্মা দাঁড়ায়! তাদের চেয়ে দিশি চালচিত্রি-করা পোটো ভালো—তাদের কাজে তবু ঝক্‌ঝক রঙ আছে। ওসব রবিবর্মা-ফর্মার চিত্রি দেখলে লজ্জায় মাথা কাটা যায়!! বরং জয়পুরের সোনালি চিত্রি আর দুর্গাঠাকুরের চালচিত্রি প্রভৃতি আছে ভালো।

তৎকালীন এদেশীয় শিল্প-ধারণার একেবারে বিপরীত প্রান্তে দাঁড়িয়ে স্বামীজির এই ঐতিহাসিক উক্তির অনুসৃতি দেখা যায় নিবেদিতা, আনন্দকুমারস্বামী এবং শ্রীঅরবিন্দের বিস্তৃত রচনাদিতে।

রবিবর্মার দেহান্তের পরে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর *প্রবাসী*-র ১৩১৩ পৌষ সংখ্যায় 'স্বর্গীয় রবিবর্ম্মা' রচনায় রবিবর্মার উত্থান, মহাকাব্যিক ও পৌরাণিক বিষয়ে চিত্রাঙ্কন, রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা ইত্যাদি কথা বলার পরে পাশ্চাত্য শিল্পরীতির ক্ষেত্রে রবিবর্মার দক্ষতার কথা স্বীকার করেছেন। রবিবর্মা 'জাতীয়' বিষয় নিয়ে চিত্রাঙ্কন করেছেন—এরই মধ্যে তিনি প্রশংসাকে আবদ্ধ রেখেছেন। ভারতীয় চিত্রশিল্পের ধারা অজন্তা থেকে শুরু করে, মুঘল-রাজপুত শিল্পধারা পেরিয়ে, পটশিল্পের মধ্য দিয়ে কীভাবে বর্তমানে উপস্থিত হয়েছে—সেই সত্যকার ভারতীয় ভাব ও রীতি গ্রহণে রবিবর্মার অসামর্থ্য এবং তাঁর গুণপনা যে নিতান্ত সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে—এ কথা অবনীন্দ্রনাথ শীতলভাবে জানিয়েছেন।

রামানন্দ তাঁর রবিবর্মা-প্রীতি নিজ আস্বাদনে আবদ্ধ না রেখে নিজ পত্রপত্রিকায় বহুভাবে প্রকাশ করেছেন। রবিবর্মার সঙ্গে তাঁর ধারাবর্তীদের অনেক চিত্রও রামানন্দ ছেপেছেন, ওঁদের বিষয়ে রচনাদিও। রামানন্দ-সম্পাদিত রামায়ণ ও মহাভারতের মধ্যে রবিবর্মার অনেক ছবি আছে—এবং 'চ্যাটার্জীস্ অ্যালবাম'-এও। রবিবর্মার চিত্রপ্রীতি থেকে রামানন্দর মন পরে যদিও সরে গিয়েছিল তবু রবিবর্মার দেহান্তের পরে *প্রবাসী*-র ১৩১৩ কার্ত্তিক সংখ্যায় 'স্বর্গীয় রাজা রবিবর্ম্মা' রচনায় শিল্পীর ঐতিহাসিক ভূমিকার বিষয়ে সুচিন্তিত মূল্যায়নের চেষ্টা দেখা যায়। সেইসঙ্গে ওই বছরের পৌষ সংখ্যায় রবিবর্মা সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথ উল্লিখিত লেখাটিতে জানিয়েছেন, তাঁর শিল্পীজীবনের সূচনায়, তিনি রবিবর্মার চিত্রাদি সম্বন্ধে আগ্রহী ছিলেন। উলটোদিকে রবিবর্মাও অবনীন্দ্রনাথের ছবি সম্বন্ধে কিছুটা সমাদরের মনোভাব দেখিয়েছেন। ('অবনীন্দ্রবাবুর শাজাহান', *প্রবাসী*, ১৩১০ কার্ত্তিক)।

রামানন্দ যে রবিবর্মায় আটকে না থেকে নব্যবঙ্গীয়/ভারতীয় শিল্পধারার সমর্থক হয়ে উঠেছিলেন তার পিছনে ছিল ভগিনী নিবেদিতার প্রবল প্রভাব। সে কথা রামানন্দ স্বয়ং স্পষ্টভাবে লিখে স্বীকার করেছেন। একদিকে রবিবর্মার চিত্র অন্যদিকে নব্যবঙ্গীয় চিত্র, কোন্‌গুলি শ্রেয় ও শ্রেষ্ঠ তা নিয়ে নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর উত্তপ্ত আলোচনা হয়। নিজের 'উত্তেজিত' মত তিনি চিঠি লিখে নিবেদিতাকে

পাঠিয়েছিলেন। নিবেদিতাও উত্তরে বত্রিশ পৃষ্ঠার একটি চিঠি লেখেন যা অনেক বিবেচনার পর তিনি পাঠাননি। নিবেদিতার মনে হয়েছিল ছবি দেখতে দেখতেই রামানন্দের মত পরিবর্তিত হবে। সত্যই তা হয়েছিল। তিনি নব্যবঙ্গীয় চিত্রধারার একনিষ্ঠ সমর্থক হয়ে পড়েন। (দ্র. রমাপ্রসাদ চন্দের 'ভারতের প্রাচীন চিত্রকলা' প্রবন্ধের শেষে সম্পাদকীয় মন্তব্য, *প্রবাসী*, ১৩২০ অগ্রহায়ণ)

রামানন্দ প্রচুর অর্থব্যয়ে আধুনিক ভারতীয় শিল্পীদের বহুবর্ণ চিত্রাদি *প্রবাসী* ও *মডার্ণ রিভিউ* পত্রিকায় প্রকাশ ক'রে ক্ষান্ত থাকেননি, সেসকলের উপর নিবেদিতা, কুমারস্বামী প্রমুখের উচ্চ মনস্বিতাপূর্ণ আলোচনাও পত্রস্থ করেছেন। ড. যদুনাথ সরকার মন্তব্য করেছেন যে নিবেদিতার শিল্প ও সংস্কৃতিমূলক রচনাদি *মডার্ণ রিভিউ* পত্রিকার গৌরব। "শিক্ষিত ভারতবাসীকে তিনি শিল্পের খাঁটি তত্ত্ব স্বীকারে প্রণোদিত করেছেন। এবং তিনি প্রাজ্ঞ সমালোচনার দ্বারা বাংলার 'ভারতীয় চিত্রকলা'-শিল্পীগোষ্ঠীর চিত্রাবলীকে শিক্ষিত সমাজে পরিচায়িত করেছেন। এই নব্য ভারতীয় চিত্রকলা মডার্ণ রিভিউ পত্রিকার বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল।" (লোকমাতা নিবেদিতা, ৪র্থ খণ্ড, ১৭ পৃষ্ঠা)। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পবেত্তা ও মনস্বী পুরুষেরা একই কথা স্বীকার করেছেন।

প্রাচ্য ধারায় শিল্প-আন্দোলনের ক্ষেত্রে কিন্তু গুরুর আসন আর্নেস্ট বিনফিল্ড হ্যাভেলের। অবনীন্দ্রনাথ সবসময়েই হ্যাভেলকে গুরু বলে উল্লেখ করেছেন। অবনীন্দ্র-শিষ্য নন্দলাল প্রমুখ শিল্পীগণ অবশ্য ভগিনী নিবেদিতার কাছে তাঁদের প্রভূত ঋণের কথাও বলেছেন।

১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজে সরকারি আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষতা থেকে হ্যাভেল কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ হয়ে আসেন। মাদ্রাজে থাকাকালেই তিনি নির্মিত বা নির্মীয়মাণ সরকারি ভবনগুলিতে নিছক পাশ্চাত্য স্থাপত্যের অনুকরণের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন। উল্লেখ্য, এই অল্পজ্ঞাত তথ্য—মাদ্রাজের সাহেবি দৈনিক *ম্যাড্রাস টাইম্‌স* পত্রিকায় উনিশ শতকের শেষদিকে ভারতীয় শিল্পীদের অঙ্কিত চিত্রে পাশ্চাত্য অনুকরণের বিরুদ্ধে সমালোচনা করা হয়। কলকাতায় এসেই হ্যাভেল ইংল্যান্ডের মিউজিয়মে সংগৃহীত দ্বিতীয় কী তৃতীয় শ্রেণির পাশ্চাত্য শিল্পের অনুকরণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। এবং কলকাতা আর্ট স্কুলে সংগৃহীত ওই শ্রেণির মূর্তিগুলিকে কার্যত ঝেঁটিয়ে বিদায় করেন। তাঁর এই কাজ যতখানি সমাদৃত তার থেকে অনেক বেশি পরিমাণে পত্রপত্রিকায় সমালোচিত হয়।

বিদ্রোহ আসে আর্ট স্কুলের ছাত্রদের পক্ষ থেকেও। নেতৃত্ব দেন রণদাপ্রসাদ দাশগুপ্ত। হয়তো তাঁদের শিল্পবোধে ধাক্কা লেগেছিল, কেন-না তাঁরা পূর্বাহ্নেই ভারতীয় শিল্পের তুলনায় ইউরোপীয় শিল্পের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়েছিলেন—আর তখনও ভারতীয় ধারায় শিল্পসৃষ্টি করার মতো উপযুক্ত পদ্ধতি সামনে আনা হয়নি। সর্বোপরি ছিল তাঁদের রুজিরোজগারে চোট খাওয়ার আশঙ্কা। ইউরোপীয় ধারায় ছবি আঁকলে তবু কিছু বিক্রি হয়। কিন্তু ভারতীয় শিল্পরীতির ছবির খরিদ্দার কোথায়? রণদাপ্রসাদ দুঃসাহসে ভর করে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে একটি পৃথক শিল্পবিদ্যালয় স্থাপন করেন (জুবিলি আর্ট একাডেমি)। স্মর্তব্য, এই রণদাপ্রসাদের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের ১৯০১ বেলুড় মঠে শিল্প-বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। শিল্পের আদর্শ সম্বন্ধে স্বামীজি যেসব কথা বলেন, তা রণদাপ্রসাদের পোষিত ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত।

পাশ্চাত্য শিল্পের অনুরাগী রণদাপ্রসাদকে তিনি বলেন, পৃথিবীর নানা দেশে তিনি শিল্পনিদর্শন দেখেছেন, তথাপি বৌদ্ধধর্মের প্রাদুর্ভাবকালে ভারতবর্ষে যে শিল্পবিকাশ হয়েছিল তার তুলনা কোথাও নেই। মুঘল আমলে স্থাপত্য শিল্পের বিরাট উন্নতির কথাও স্বামীজি উল্লেখ করেন। তাঁর মোটকথা ছিল : ভাবের প্রকাশ করার নামই শিল্প। যেখানে তা নেই সেখানে যতই রংবেরঙের চাকচিক্য থাক, তাকে প্রকৃত শিল্প বলা যায় না। শিল্পীদের মধ্যে চিন্তার মৌলিকতা থাকা চাই। পাশ্চাত্যে শিল্পসৃষ্টিতে ফোটোযন্ত্রের সাহায্য নেওয়ায় মৌলিকতার বিনাশ ঘটছে। একইসঙ্গে স্বামীজি শিল্পক্ষেত্রে জাতীয় সংস্কৃতির বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন। যে দেশে জড়বাদী চিন্তার প্রাধান্য, সে দেশে নেচার-কে শিল্পক্ষেত্রে আদর্শ করা হয়। আর ভাববাদী দেশে প্রকৃতির অতীত ভাবকে শিল্পক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়া হয়, যেমন ভারতবর্ষে। স্বামীজি এসব কথা ভালো করে বোঝাবার জন্য নিজের 'কালী দ্য মাদার' কবিতার ভাবকল্পনা ব্যাখ্যা করে কীভাবে সে-ছবি আঁকা হওয়া উচিত তা বলবার চেষ্টা করেন। সেইসঙ্গে তিনি পরিকল্পিত রামকৃষ্ণ মন্দির এবং মঠের সিলমোহর-প্রতীকের ব্যাখ্যাও করেছিলেন। সরাসরি রণদাপ্রসাদের আর্ট স্কুলের ছবিগুলির চরিত্র সম্বন্ধে সমালোচনা করে তিনি বলেছেন, তাদের মধ্যে যেন কোনো ভাবের বিকাশ নেই। স্বামীজির ব্যাখ্যা অথবা ব্যক্তিত্বে অভিভূত রণদাপ্রসাদ না বলে পারেননি, 'আশীর্বাদ করুন আপনার নিকট যেসব ভাব পেলাম তা যেন কাজে পরিণত করতে পারি।' (*বাণী ও রচনা*, ৯ম খণ্ড, ১৩৬৯ সং, পৃ. ১৮৬–৯২)।

ঘরে-বাইরে প্রচণ্ড সমালোচনার সম্মুখীন হয়েও হ্যাভেল অদম্য ছিলেন। ছাত্রদের মধ্যে ভারতীয় ধারার শিল্পরীতি গ্রহণকে তিনি কার্যত আবশ্যিক করে দেন। যেখানে তাঁর পূর্ববর্তী আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ স্কামবার্গ এবং ও-গিলর্ডি ভারতীয় ধারার আংশিক প্রবর্তনে ব্যর্থ হয়েছিলেন, সেখানে এই অনমনীয় যোদ্ধা সফল হলেন। আর্ট স্কুলের ছাত্ররা মোটামুটি ভারতীয় রীতি গ্রহণ করলেন। তারপর যখন ১৯০৫ সালে অবনীন্দ্রনাথ, যিনি পূর্বেই ভারতীয় ভাবধারায় কিছু ছবি এঁকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, যাঁর কয়েকটি ছবি ওকাকুরা লন্ডনের 'স্টুডিয়ো' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে মুদ্রিত করেন—সেই তিনি হ্যাভেলের তাগিদে কলকাতার আর্ট স্কুলে ভাইস-প্রিন্সিপাল হিসাবে যোগ দিলেন, তখন উদ্দীপ্ত ছাত্রেরা তাঁকে ঘিরে ছবি আঁকতে শুরু করলেন। ১৯০৮ নভেম্বরে প্রকাশিত হ্যাভেল তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ইন্ডিয়ান স্কালপ্চার এন্ড পেন্টিং'-এ ভারতীয় শিল্পের বহু-যুগ-প্রবাহিত ধারার কাহিনি উপস্থিত করলেন; নিবেদিতা ও কুমারস্বামীকে ভারতীয় শিল্পতত্ত্বের ব্যাখ্যাতা হিসাবে *মডার্ণ রিভিউ* পত্রিকার বহুবিধ প্রবন্ধে দেখা গেল; এবং রামানন্দ তাঁর ইংরেজি ও বাংলা পত্রিকায় নব্যবঙ্গীয় শিল্পীদের ছবি নিয়মিত প্রাসঙ্গিক মন্তব্য-সহ প্রকাশ করতে লাগলেন। তিনি এইসব শিল্পীদের শিল্পসৃষ্টির প্রধান প্রচারকর্তা হয়ে দাঁড়ালেন, তখন উনিশ শতকের প্রথম দশকে নব্যবঙ্গীয় শিল্প-আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে।

সব দিক বিচার করে হ্যাভেলকে এই আন্দোলনের স্রষ্টা বলে স্বীকার করতেই হয়, যার আচার্য-শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ, এবং সহযোগী-শিল্পী নন্দলাল বসু প্রমুখ।

নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলা সম্বন্ধে নানা পত্রপত্রিকায় বিতর্ক জমে উঠেছিল। তর্কের প্রধান বিষয়, শিল্পে বাস্তবধর্মী পাশ্চাত্য পদ্ধতি, না ভাবধর্মী ভারতীয় পদ্ধতি—কোন্‌টির অনুসরণ বাঞ্ছনীয়? পাশ্চাত্য শিল্পরীতির পক্ষে প্রধান যোদ্ধা সুকুমার রায়। তাঁর পিতা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী পুত্রের মতের প্রতি পক্ষপাত দেখালেও মধ্যপথ গ্রহণের পক্ষে রায় দিয়েছেন।* উলটোদিকে দাঁড়িয়েছিলেন অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। একদিকে *প্রবাসী* যেখানে নব্যবঙ্গীয় শিল্পধারার প্রবল প্রচারক (রামানন্দ অবশ্য বিতর্ককালে দুইপক্ষের মতামতই প্রকাশ করেছেন) অন্যদিকে প্রধান প্রতিপক্ষ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি-সম্পাদিত *সাহিত্য* পত্রিকা। তার মধ্যে ভারতীয় শিল্পের বাস্তবতা সম্বন্ধে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র রচনা বেরিয়েছে, যথা 'ভারতীয় শিল্পাদর্শ', ১৩১৮ চৈত্র। তা ছাড়া রীতিমতো কলহের ভঙ্গিতে সমাজপতি নব্যবঙ্গীয় চিত্রাদি সম্বন্ধে ব্যঙ্গাত্মক কটু মন্তব্য করেছেন (কিছু মন্তব্য 'নিবেদিতা লোকমাতা' গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডে সংকলিত হয়েছে)। এক্ষেত্রে বিশেষ মূল্যবান নব্যশিল্পীদের গুরু অবনীন্দ্রনাথের একটি রচনা যার মধ্যে কিছু ভাবালুতা দেখা গিয়েছিল, যাকে *প্রবাসী* পত্রিকায় সমালোচনার লক্ষ্য করেন উপেন্দ্রকিশোর ও সুকুমার রায়। দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর একটি রচনায় দুই দিক রেখে মন্তব্য করায় কটাক্ষের লক্ষ্য হয়েছেন। উল্লিখিত অনেকগুলি রচনা-সংকলনে গৃহীত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে রমাপ্রসাদ চন্দের প্রতিবাদমূলক প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য ('ভারতের প্রাচীন চিত্রকলা', ১৩২০ অগ্রহায়ণ), বিশেষভাবে সেই অংশ যেখানে তিনি নানা উদ্ধৃতি-সহ শিল্পে বাস্তব অনুকরণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে 'শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা'র কথা বলেছেন। এই অংশ প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলা সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসুদের কাজে লাগবে। মুঘল চিত্রকলা ও রাজপুত চিত্রকলায় কীভাবে বাস্তবানুকরণ হয়েছে তা-ও রমাপ্রসাদ দেখিয়েছেন। দু-একটি মূর্তির বর্ণনাতে কিংবা অজন্তার চিত্রাদির বিচারে একই পদ্ধতি তিনি গ্রহণ করেছেন। শেষোক্ত অংশে রমাপ্রসাদ চন্দের যুক্তি দুর্বল। কেন-না মূর্তি দুটির রূপ ব্যাখ্যাকালে তিনি মূর্তিগুলি কীভাবে ভাবপ্রকাশক হয়েছে তা-ও জানিয়েছেন। শেষের দিকে 'বাঙ্গালার নব্য চিত্রকলা'র প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য যথেষ্ট দ্বিধান্বিত। রামানন্দ তাঁর সংশ্লিষ্ট মন্তব্যে রমাপ্রসাদের যুক্তির ফাঁক দেখিয়ে প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্য এবং অজন্তার চিত্রকলায় যে যথেষ্ট 'স্বাভাবিকতা' নেই, তার উদাহরণও দিয়েছেন।

বিভিন্ন লেখকের যুক্তির ঔচিত্য বিচার আমাদের লক্ষ্য নয়। কেবল বলা প্রয়োজন—নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলার কয়েক দশকের সজীব সৃষ্টি বঙ্গসংস্কৃতির ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। এইসকল সৃষ্টির আকার দেখে বহু মানুষ উদ্দীপ্ত, দ্বিধাগ্রস্ত অথবা রুষ্ট হয়ে তাঁদের মনোভাব নানা পত্রপত্রিকায় প্রকাশ করেছেন। এইসকলই এই শিল্পধারার শক্তির স্বীকৃতি। দেখা যাচ্ছে তৎকালীন বাঙালি মানসিকতা সংস্কৃতি-বিষয়ে অতীব সজীব। সমস্ত সময়টিতে দেশের স্বদেশি আন্দোলন এবং তার অনুসৃতি স্বাধীনতা আন্দোলন চলছে। আরো দেখা যাবে, পাশ্চাত্য সংস্কৃতি শিক্ষিত বাঙালির মনে এমনই শিকড়প্রসারী হয়েছিল যে শিল্পক্ষেত্রে ভারতীয় ভাবধারার অনুসরণ প্রচণ্ড চাঞ্চল্যের কারণ হয়।

* 'The study of Pictorial Art in India', *Modern Review*, June 1907.

ইদানীন্তন কালে শিল্প-আলোচকরা পাশ্চাত্য পদ্ধতির অনুসরণের পক্ষে সরব হয়েছেন। ফলে রবিবর্মার গলা থেকে কেড়ে নেওয়া মালার সংখ্যা বাড়িয়ে আবার তাঁর গলায় পরানো হচ্ছে। কিন্তু ওধারে দেখা যায় এখনকার পাশ্চাত্য শিল্প বাস্তবানুকরণকে ঠেলে সরিয়ে ভাববাদকে কেবল মূর্ত নয়, বিমূর্ত আকারে প্রকাশ করতে ব্যাকুল।

ভারতীয় শিল্পীদের কাছে এখন একটি সুবিধাজনক তত্ত্ব এসে গেছে—দেশকাল-নিরপেক্ষতা। এহেন নিরপেক্ষতার তাগিদে ভারতীয় শিল্পীদের অনেকে অবিরাম শিল্প-উৎপাদন করে যাচ্ছেন। কিন্তু একটি ভূমিতে স্থিত থাকতে না পারায় তাঁদের অবস্থানে আলোছায়ার খেলা। বিদ্রোহ আসছে। আধুনিক কালের বন্দিত বাঙালি শিল্পীরা, যথা গণেশ পাইন, ভারতীয় ভাবচেতনা তাঁদের শিল্পে প্রকাশ করতে সচেস্ট। তন্ত্রচক্রের নানা রূপরেখা দেখা যাবে নীরদ মজুমদারের চিত্রশিল্পে।

আধুনিক ভারতীয় শিল্প-সমালোচকদের মনোভাব সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন ওঠে--তাঁরা যেখানে রেনেসাঁস যুগের ইউরোপীয় চিত্রাদি সম্বন্ধে প্রশংসায় উদ্‌বেল, তাঁরাই আবার নন্দলালের পৌরাণিক চিত্রাবলি সম্বন্ধে নিন্দামুখর। প্রশ্নটা যদি শিল্পকৃতির গুণগত মানের উপর করা হত তাহলে বলার কিছু থাকত না। মতামতের স্বাধীনতা লেখকদের আছে। কিন্তু তাঁরা যখন বিষয়বস্তুর সমালোচনা করেন, তখন ব্যাপারটা দুর্বোধ্য হয়ে দাঁড়ায়। খ্রিস্ট-পুরাণ বিষয়বস্তু হলে উত্তম, আর হিন্দু-পুরাণ বিষয় হলে অধম—যে হিন্দু পৌরাণিক ভাবধারা কোটি কোটি ভারতবাসীর মধ্যে এখনও সজীব ও স্পন্দ্যমান।

কয়েকটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়।

ভারতীয় ভাবধারার সমর্থনে ইংল্যান্ডে একটি সমিতি গঠিত হয়েছিল যার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন বিখ্যাত শিল্পী ও সাহিত্যিকেরা।

সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনা নিয়ে একটি অঙ্কিত চিত্র *প্রবাসী*-র ১৩১৪ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় মন্তব্য-সহ প্রকশিত হয়েছে—'নির্যাতিতে আশীর্বাদ'। বরিশাল কংগ্রেস-কালে তরুণবয়স্ক চিত্তরঞ্জন গুহঠাকুরতা পুলিশের লাঠি খেয়ে রক্তাক্ত--ছবির বিষয়বস্তু। ছবিটি ছাপা যথেস্ট সাহসের।

রামানন্দ কেবল ভারতীয় শিল্পীদের ছবি ছাপেননি, নিবেদিতার রসগ্রাহী আলোচনা-সহ বিদেশীয় চিত্র ছেপেছেন। ক্ষেত্রবিশেষে নিবেদিতার মূল ইংরেজির সঙ্গে বাংলা অনুবাদ অথবা *মডার্ণ রিভিউ*-তে প্রকাশিত ইংরেজি মন্তব্যের বাংলা অনুবাদ বেরিয়েছে।

পাশ্চাত্য ধারার অনুসরণকারী শিল্পী বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হলে কেবল শোকমন্তব্য রামানন্দ প্রকাশ করেননি, সেইসঙ্গে বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়ে জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস লিখিত একটি প্রবন্ধও প্রকাশ করেছেন (১৩১৪ আষাঢ়)। লেখাটি সংকলনে গৃহীত।

ভিন্ন ধারার চিত্রকর গগনেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, অমৃত শেরগিল প্রমুখের বিষয়ে মন্তব্য আছে। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুতে প্রকাশিত শোকমন্তব্যে (১৩৪৪ চৈত্র) বলা হয়েছে, তিনি পাশ্চাত্যের কিউবিস্ট চিত্রাঙ্কনরীতির 'এক ও অদ্বিতীয়' শিল্পী। ১৩৩৮ মাঘ রবীন্দ্রনাথের চারটি ছবির প্রতিলিপি *প্রবাসী*-তে প্রকাশিত হয়। চিত্রগুলি 'সম্পূর্ণরূপে কবির মানসসৃষ্টি'। কীভাবে রবীন্দ্রনাথ চিত্রাঙ্কনে

প্রণোদিত হন, তা বলার পরে রামানন্দ রবীন্দ্রনাথের একটি ব্যাখ্যাত্মক চিঠির অংশ উদ্ধৃত করেছেন। তারপরে যে মন্তব্য করেছেন তাতে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা পরবর্তীকালে যে আবেগপূর্ণ সমাদর পেয়েছে, রামানন্দর লেখায় তা নেই। পঞ্জাবের বিখ্যাত শিল্পী অমৃত শেরগিলের ছবিও মন্তব্য-সহ *প্রবাসী*-তে ছাপা হয়েছে। (১৩৪৩ অগ্রহায়ণ)।

বলা প্রয়োজন, শিল্প সম্বন্ধে কেবল বিবিধ প্রসঙ্গ-র মন্তব্যই সংকলিত হয়নি, বড়ো আকারে অনেক লেখাই গৃহীত হয়েছে। এসকলের দ্বারা শিল্প-আন্দোলনের বিভিন্ন কালপর্বের একটা চেহারা দেখা যায় বলে আমরা মনে করি।

অজন্তা ও অন্য গুহাচিত্র

১৩০৮ বৈশাখ
অজণ্টা-গুহা-চিত্রাবলী

বুদ্ধদেব ও তাঁহার শিষ্যগণের মতে জীবন দুঃখময়: দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে সংসারত্যাগ এবং চিরনিষ্ক্রিয়তার প্রয়োজন। নির্জ্জনে জনকোলাহল হইতে দূরে বাস বৌদ্ধধর্ম্মানুমোদিত পবিত্র জীবনের পক্ষে অবশ্য-প্রয়োজনীয়। শুধু বৌদ্ধধর্ম্ম কেন, যে কোন ধর্ম্মে সংসার-বিরাগ সন্ন্যাস, বা কৃচ্ছ্রসাধনের বিধি আছে, তদনুমোদিত সাধুজীবন যাপন করিতে হইলেই লোকালয় হইতে দূরে যাওয়া আবশ্যক। এইরূপে যাঁহারা জীবনযাপন করিতেন, তাঁহারা প্রথমতঃ অরণ্যে তরুতলে বাস করিতেন। তৎপরে স্বভাবজাত গিরিগুহা তাঁহাদের আশ্রয়স্থল হইয়া উঠে। ভারতবর্ষের অন্তর্বর্ত্তী ও সীমাস্থিত পর্বতমালার গুহাবলী সাধু তপস্বিগণ কর্ত্তৃক অধ্যুষিত ছিল। কালক্রমে কোথাও বা স্বভাবজাত গুহাগুলি কৃত্রিম উপায়ে অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তন ও অধিকতর বাসোপযোগী করা হইয়াছিল, কোথাও বা সমগ্র গুহাগুলিই মানুষ কর্ত্তৃক খনিত হইয়াছিল। এই সকল আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে কৃত্রিম গুহা অধিকাংশ স্থলে স্থপতি, ভাস্কর ও চিত্রকরগণ দ্বারা নানা প্রকারে অলঙ্কৃত হইয়াছিল। এইরূপ গুহা ভারতবর্ষের নানা স্থানে দৃষ্ট হয়। কিন্তু সকল দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে অজণ্টা-গুহাবলীকেই জগতে অতুলনীয় বলিয়া প্রশংসা করিতে হয়। এখানেই গুহাখননবিদ্যা উৎকর্ষের চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিল।

গুহানির্ম্মাণের স্থান নির্ব্বাচনে বৌদ্ধগণ অনেকগুলি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিতেন। সহজে কাটিয়া খনন করা যায় এরূপ প্রস্তর নির্ব্বাচন ত তাঁহারা করিতেনই, অধিকন্তু অধিগম্যতা যাহা হইতে সকল ঋতুতে জল পাওয়া যায়, এরূপ কোনও জলাশয়ের সান্নিধ্য, বাণিজ্যবর্ত্মের সামীপ্য, প্রভৃতির দিকেও লক্ষ্য রাখিতেন। কিন্তু তাঁহারা কেবল জীবনধারণের সুবিধাই দেখিতেন না। তাঁহাদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যানুভবশক্তিও প্রবল ছিল।

ভারতবর্ষের অধিকাংশ বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দু গুহার সমীপবর্ত্তী প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় সুন্দর। কিন্তু স্বভাবের শোভা ও নিভৃতত্বে অজণ্টার সহিত আর কোনও গুহার তুলনা হয় না। স্বাভাবিক শোভার সহিত বৌদ্ধগণের ধর্ম্মজীবনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। যাঁহারা ধ্যানপরায়ণ হইয়া উন্নতজীবন- লাভপ্রয়াসী হইতেন, তাঁহাদের নিকট, জলপ্রবাহের উচ্চ বা মৃদুধ্বনি ক্রীড়াশীল সমীরণের করস্পর্শে বৃক্ষপত্রের সর সর শব্দ, আকাশপথে মেঘের যথেচ্ছ সঞ্চরণ, তরুলতাগুল্মের রহস্যময় জন্ম ও বৃদ্ধি, এবং অরণ্যচারী জীববৃন্দের বিচিত্র জীবন, শাক্যসিংহকর্ত্তৃক বিবৃত মহা"ধর্ম্মে"র স্তবগীতিস্বরূপ প্রতীত হইত। প্রস্তর কাটিয়া যে মন্দির বা গৃহ প্রস্তুত হয় তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা স্থায়ী আবাস। কিন্তু বোধ হয় বৌদ্ধগণ যে কেবল স্থায়িত্বের জন্যই গুহানির্ম্মাণ করিতেন, তাহা নয়; বুদ্ধ এবং তাঁহার শিষ্যগণ দেশভ্রমণকালে স্বাভাবিক গুহাতে বাস করিতেন বলিয়াও, বোধ হয়, বৌদ্ধগণ গুহানির্ম্মাণে এরূপ আগ্রহ ও উৎসাহ দেখাইয়াছিলেন। এই প্রকার চৈত্য, বিহার ও সঙ্ঘারামের সুবিধা বর্ণন নিষ্প্রয়োজন। ভিক্ষুগণের পক্ষে বর্ষাকালে দেশভ্রমণ নিষিদ্ধ ছিল। তাঁহারা প্রথমে, বর্ষাযাপন জন্য, কিম্বা গ্রীষ্মকালে শীতলস্থানে আশ্রয়লাভার্থ,

এইসকল গুহা ব্যবহার করিতেন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। অজণ্টাগুহাবলী পূর্ব্বে মানুষের বাসের সম্যক্ উপযোগী ছিল। তাঁহাদের ছাদ দিয়া জল পড়িত না। বর্ষার সময় বন্যা হইলে বন্যার জলও গুহার অনেক নীচে থাকে। এখনও দারুণ গ্রীষ্মের সময়, যখন নিকটবর্ত্তী ফর্দ্দাপুর গ্রামে ছায়ায় ১০৬ ডিগ্রি উত্তাপ হয়, তখনও গুহাগুলির অভ্যন্তর অতিশয় আরামদায়ক ও শীতল থাকে।

অজণ্টাগ্রাম গুহাগুলি হইতে ৪ মাইল দূরে। ফর্দ্দাপুর গুহাগুলি হইতে ৩৷৷০ মাইল দূরে অবস্থিত। গ্রেট্ ইণ্ডিয়ান্ পেনিন্‌সুলার রেলওয়ে লাইনের পাচোরা ষ্টেশন হইতে ৩০ মাইল দূরে শেষোক্ত গ্রাম অবস্থিত। এই ত্রিশ মাইল কাঁচা রাস্তার উপর গরুর গাড়ী করিয়া যাইতে হয়।

গুহাগুলি একটি গভীর সঙ্কীর্ণ গিরিদ্রোণীতে প্রাচীরবৎ দণ্ডায়মান শৈলগাত্রে খোদিত। উহার আকার কতকটা ঘোড়ার নালের মত। শৈলের পাদদেশ ধৌত করিয়া একটি নদী আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে। আমরা সামান্য একটি চিত্র দিলাম, কিন্তু কোনও চিত্র আমাদের মনে এই গিরিদ্রোণীর আরণ্য শোভার সম্যক্ ধারণা জন্মাইয়া দিতে পারে না, বিশেষতঃ যখন বর্ষাকালে সর্ব্বত্র বৃক্ষলতাগুল্ম সতেজ ও পত্রপুষ্পে সুশোভিত হইয়া উঠে। গুহাবলীর অদূরে একটি জলপ্রপাত আছে। উহা একটি হইতে আর একটিতে লাফ দিয়া দিয়া সাতটি নৈসর্গিক প্রস্তর সোপান ও প্রত্যেকের নিম্নস্থ জলাশয় অতিক্রম করিয়া প্রবাহিত; এইজন উহার নাম সাতকুণ্ড। সর্ব্বনিম্ন কুণ্ডটিতে সম্বৎসর জল থাকে। সম্ভবতঃ গুহাবাসী যতিগণ এখান হইতেই জল লইয়া যাইতেন।

বর্ত্তমানকালে সাধারণ লোকে গুহাগুলির প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। কেবল মকরসংক্রান্তির সময় এখানে যখন মেলা হয়, তখন লোকে সাতকুণ্ডে স্নান করিয়া আমোদ আহ্লাদ করে, নানা প্রকার খেলনা ও অন্যান্য সামান্য বস্তু ক্রয় করে। মেলা উপলক্ষে বন্দুক বা ফটকা আওয়াজ করিলে পার্ব্বত্য মধুমক্ষিকাগণ ক্রুদ্ধ হইয়া সমাগত মনুষ্যগণকে আক্রমণ করে। তখন সকলে ভয়ে প্রাণ লইয়া পলাইবার পথ পায় না। কখনও কখনও কোন জটাধারী ভস্মমাখা, গেরুয়াপরা সন্ন্যাসী ঘুঙ্গুর লাগান লাঠি হাতে করিয়া আসিয়া এই সকল গুহাতে কিছুদিন বাস করেন, এবং গুহাগাত্রে অঙ্কিত সিন্দূরবর্ণ ত্রিশূল চিহ্ন ও রন্ধনের ধূম দ্বারা গুহার চিত্রগুলি নষ্ট করেন।

গুহা কথাটি শুনিয়া অনেকে হয়ত ভাবিবেন যে উহার কক্ষগুলি সঙ্কীর্ণ। বাস্তবিক কিন্তু তাহা নয়। এক একটি গুহা এক একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকার সমান বৃহদায়তন। অজণ্টায় সর্ব্বশুদ্ধ ২৯টী গুহা আছে। তাহাদেব সকলগুলির আয়তন বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে চতুর্থ গুহাটীর গভীরতা (অর্থাৎ দ্বারদেশ হইতে পর্ব্বতাভ্যন্তরে শেষ দেওয়াল পর্য্যন্ত বিস্তৃতি) প্রায় ১০০ হাত। ইহার মধ্যে দুই একটী দ্বিতল গুহাও আছে। গুহাগুলির দেওয়াল, স্তম্ভ, দ্বারদেশ, ও ছাদ নানাবিধ খোদিত ও চিত্রিত মূর্ত্তি, দৃশ্য, লতাপাতা ও ফুলে সুশোভিত। অনেক গুহার গাত্রে খোদিত লিপিও দেখা যায়। খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় ৭ম বা ৮ম শতাব্দীর মধ্যে এই গুহাগুলি নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। কোন কোন গুহাতে কৃত্রিম আলোক ব্যতীত চিত্রগুলি দেখা যায় না। সুতরাং সেগুলি নিশ্চয়ই কৃত্রিম আলোকের সাহায্যেই চিত্রিত হইয়া থাকিবে। ভারতবর্ষীয় গ্রীষ্মে, যথেষ্ট বায়ুচলাচলবিহীন স্থানে এইরূপ অবস্থায় কার্য্য করা যে কিরূপ ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার পরিচায়ক তাহা সহজেই কল্পনা করা যায়। বোধ হয় এখানে পূজাদি প্রদীপালোকের

সাহায্যে নির্ব্বাহিত হইত। ঊনত্রিংশ গুহায় দীপাধার ঝুলাইবার জন্য কয়েকটি শক্ত লোহার কড়া আছে। পূর্ব্বে গুহাগুলির দ্বার ও জানালায় কপাট ছিল। আমরা এই প্রবন্ধে কেবল চিত্রগুলিরই সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত দিব। খোদিত ছবির কথা বলিব না। বর্ত্তমানে এই ছবিগুলির অত্যন্ত দুর্দ্দশা হইয়াছে। কোনটীই সম্পূর্ণ নাই। কোথাও চূণ খসিয়া পড়িয়াছে, কোথাও রং ফিকা হইয়া গিয়াছে, কোথাও বা মানুষের হাত যতদূর পৌঁছে, ততদূর পর্য্যন্ত কত নরাধম চাঁচিয়া দাগ কাটিয়া দিয়াছে। বহু শতাব্দী ধরিয়া ইহাতে পার্ব্বত্য কপোত, মধুমক্ষিকা ও চর্ম্মচটিকাদি বাস করায় এবং প্রস্তরের ফাটল দিয়া জল পড়ায়, ছবিগুলি প্রায় নষ্ট ও লুপ্তশ্রী হইয়া গিয়াছে। তথাপি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অজন্টা-গুহাচিত্রাবলী অপেক্ষা অনেক আধুনিক ছবি শতবিধ যত্নসত্ত্বেও নষ্ট হইয়া গিয়াছে, অথচ এগুলি এখনও সম্পূর্ণরূপে লয় পায় নাই। কতকগুলি ছবি গবর্ণমেন্টের ব্যয়ে নানা বর্ণে বৃহদাকারে কেম্বিসের উপর নকল করা হয়। তাহারই কতকগুলির নকল নানা বর্ণে এবং কয়েক শত কেবল কৃষ্ণবর্ণে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের ছবিগুলি এই লুপ্তপূর্ব্বশ্রী গুহাচিত্রগুলির তৃতীয় নকলের কাল কালীতে মুদ্রিত নকল। তাহাতে আবার আমাদের দেশে মুদ্রাঙ্কনবিদ্যা এখনও উৎকর্ষ লাভ করে নাই। সুতরাং আমাদের ছবিগুলি হইতে দর্শকগণ মূলের সামান্য আভাসমাত্র পাইবেন। অনেক য়ুরোপীয় শিল্পী এই চিত্রগুলির প্রশংসা করিয়াছেন। বোম্বাইয়ের সর্ জামষেদজী জীজীভাই-শিল্পবিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ গ্রিফিথ্স্ সাহেবের মতের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"After years of careful study on the spot, I may be forgiven if I seem inclined to esteem the Ajanta pictures too highly as Art. In spite of its obvious limitations I find the work so accomplished in execution, so consistent in convention, so vivacious and varied in design and full of such evident delight in beautiful form and colour that I cannot help ranking it with some of that early Art which the world has agreed to praise in Italy." "..these old Buddhist artists, who thoroughly understood the principles of decorative art in its highest and noblest sense."

অজন্টার গিরিদ্রোণীতে অগণ্যযুগ ব্যাপিয়া যে স্বভাবজ সুদৃঢ় শৈলপ্রাকার দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলে, তবে এই বৌদ্ধ গুহানির্ম্মাতাদিগের অসামান্য পরিশ্রম, শিল্পনৈপুণ্য, অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতার পরিচয় পাওয়া যায়। বৌদ্ধধর্ম্মের বিষয় ভাবিলেই আমাদের মনে বৌদ্ধদিগের মৃদু ও শান্ত কর্ম্মবিমুখতার কথা মনে হয়। কিন্তু অন্ততঃ অজন্টা গুহাবলীতে আমরা বৌদ্ধগণের ভিন্ন প্রকার গুণের পরিচয় পাই। এখানে তাঁহারা যেন বাধাবিঘ্নকে অবজ্ঞাবিমিশ্র আস্পর্দ্ধার সহিত যুদ্ধে আহ্বান করিয়া পরাজিত করিয়াছিলেন। বৃহৎ ও মহৎ সংকল্পের সম্যক্ ধারণা করিতে হইলে যে মানসিক সাহসের প্রয়োজন, তাঁহারা এখানে তাহারও পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু চিত্রগুলির সৌন্দর্য ছাড়িয়া দিলেও আমরা তৎসমুদয় হইতে অনেক শিক্ষালাভ করিতে পারি। এই চিত্রগুলির সাহায্যে আমরা বৌদ্ধধর্ম্মের ক্রমবিকাশের আলোচনা করিতে পারি। অনেকগুলিতেই বুদ্ধ মানবারাধ্য দেবতার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, কিন্তু এমন অনেক ছবিও আছে যাহাতে তাঁহাকে আর দশ জন মানুষের

মধ্যে এক জন হইয়া সংসারে বিচরণ করিতে দেখা যায়। তাঁহার জন্ম, শৈশবলীলা, বিদ্যাশিক্ষা, গৃহত্যাগ, মারকর্ত্তৃক পরীক্ষা, নানাস্থানে নানাভাবে ধর্ম্মপ্রচার, নির্ব্বাণলাভ, প্রভৃতি তাঁহার জীবনের নানা ঘটনা ও কার্য্য চিত্রগুলিতে পরিদৃষ্ট হয়। এই চিত্রগুলি কোথাও বা বুদ্ধের প্রচলিত জীবনচরিতে বর্ণিত বৃত্তান্তের সমর্থন করে, কোথাও বা বৃত্তান্তের দুর্ব্বোধ অংশ সকল সুবোধ করিয়া তুলে, আবার কোথাও বা প্রচলিত জীবনচরিতে অপ্রাপ্য ঘটনা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করে। বৌদ্ধমতে জীবাত্মা নানা জন্মে নানা জীবদেহ ধারণ করে। বুদ্ধদেব নিজেও তাহাই করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যে যে রূপ ধারণ করিয়াছিলেন এবং সেই সেই জন্মে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তৎসমুদয় জাতক নামধেয় গল্পগুলিতে বিবৃত আছে। অজণ্টাগুহার অনেক চিত্র এই সকল জাতকসম্বন্ধীয়। কিন্তু চিত্রগুলি হইতে শিক্ষণীয় বিষয়ের এইখানেই পরিসমাপ্তি নহে।

রাজগণের জন্ম সিংহাসনারোহণ ও মৃত্যুর তারিখ, যুদ্ধবিগ্রহের বৃত্তান্ত, ভিন্ন ভিন্ন রাজবংশের উত্থান ও পতন এই সকল ইতিহাসের অস্থিপঞ্জর বা কঙ্কালমাত্র! ইতিহাসকে রক্তমাংসসমন্বিত ও সজীব করিয়া তুলিতে হইলে অন্য অনেক উপাদানের প্রয়োজন। এই সকল উপাদান এরূপ হওয়া চাই, যে তাহার সাহায্যে আমরা অতীতকে কল্পনার সাহায্যে মানসনেত্রের সমক্ষে উপস্থিত করিতে পারি। পুরাকালে নরনারী কি খাইত, কি পরিত, কেমন করিয়া বেশভূষা করিত, প্রেমালাপ করিত, ঝগড়া করিত, রন্ধন করিত, ক্রয় বিক্রয় করিত, শিকার করিত, আমোদ আহ্লাদ করিত, গান ও নৃত্য করিত, কি কি জিনিষ প্রস্তুত করিতে জানিত, নানাবিধ শিল্পে কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহাদের সামাজিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিশ্বাস, সংস্কার ও আচার ব্যবহার কিরূপ ছিল, যুদ্ধবিগ্রহ ও বাণিজ্যকার্য্য কিরূপে সংসাধিত হইত, অস্ত্রশস্ত্র, গৃহসজ্জা কিরূপ ছিল, বিদেশের সহিত কতদূর এবং কি প্রকার সম্বন্ধ ও আদান প্রদান ছিল, প্রভৃতি বিষয় জানিতে পারিলে তবে আমাদের পুরাকালের জ্ঞান সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। অজণ্টাগুহা-চিত্রাবলীর সাহায্যে আমরা এইরূপ অনেক বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিতে পারি। যক্ষ-রক্ষ-গন্ধর্ব্ব-কিন্নরাদি পৌরাণিক জীবসম্বন্ধে সেকালে লোকের কিরূপ ধারণা ছিল তাহাও আমরা অজণ্টাচিত্রাবলী হইতে জানিতে পারি। আরও যে সকল জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, আমরা ক্রমে ক্রমে তাহার কিয়দংশের উল্লেখ করিব।

যে সকল চিত্রে জনসংহতি বুদ্ধের আরাধনা ও উপাসনা করিতেছে, তৎসমুদয়ে প্রত্যেক ব্যক্তিই সজীব প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব আছে, প্রত্যেকের মুখভাব, অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতিতে বিশেষত্ব আছে অন্য যে সকল চিত্রে বহুলোকের সমাবেশ আছে, তাহাতেও প্রত্যেকের কিছু না কিছু স্বতন্ত্র কার্য্য দেখান হইয়াছে; কেবল কতকগুলা কাঠের পুতুলের মত মানুষ সাজাইয়া দেওয়া হয় নাই। গ্রিফিথ্‌স্ সাহেবের মত আমরা পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি। ফর্গুসন সাহেব বলেন যে অজণ্টাচিত্রগুলি আধুনিক ইউরোপীয় চিত্রের সমতুল্য নহে কিন্তু সেগুলি যে যুগে চিত্রিত হইয়াছিল, তাৎকালিক ইউরোপীয় চিত্র অপেক্ষা নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট। গ্রিফিথ্‌স্ বলেন—

"The Ajanta workmanship is admirable; long subtle curves are drawn with great precision in a line of unvarying thickness with one sweep of the brush, both on the vertical surface of walls and on the more difficult plane of the ceiling, showing consummate skill and manual dexterity."

ইউরোপীয় সমালোচকদিগের মতে অজণ্টাচিত্রগুলির কতকগুলি বিশেষত্ব (peculiarity) আছে। আমাদের দেশে পুরাকাল হইতে আকর্ণবিস্তৃত অর্থাৎ পটোলচেরা বা টানা চোখের বড় আদর। বাস্তবিকই যে আয়তলোচনা-দিগের চক্ষু কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় তাহা নয়। কিন্তু অজণ্টাগুহাচিত্রাবলীতে চিত্রকরগণ অনেক স্থলে ললনাদিগের চক্ষু বড়ই দীর্ঘ করিয়াছেন। টানা চোখের মত আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে পীনপয়োধর ও গুরু নিতম্বেরও প্রশংসা আছে। কিন্তু তাই বলিয়া কিছুতেই স্বভাবকে অতিক্রম করা উচিত নয়। অজণ্টাগুহার ছবিগুলিতে নারীগণের স্তন ও নিতম্ব স্বাভাবিক অপেক্ষা পীনতর ও পৃথুতর করিয়া আঁকা হইয়াছে। কিন্তু নরনারীদেহচিত্রণে অপরাপর বিষয়ে এই প্রাচীন চিত্রকরগণ অসামান্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। অঙ্গুলিভঙ্গি যে কত প্রকারের আছে, বলা যায় না। মিনতি, রোষপ্রদর্শন, আদর, প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ভঙ্গী। কিন্তু এই প্রাচীন শিল্পিগণ ভাল করিয়া পা আঁকিতে পারেন নাই। নারীগণকে প্রায়ই বিবসনা বা অর্দ্ধনগ্না আঁকা হইয়াছে, কিম্বা এরূপ বস্ত্র পরান হইয়াছে, যাহাতে দেহের গঠন বুঝিতে পারা যায়। দাসীদের পরিহিত বস্ত্র চিত্রিত হইয়াছে, কিন্তু রাণী ও সম্ভ্রান্তা মহিলাগণ অতিশয় সূক্ষ্মবস্ত্র পরিতেন বলিয়া তাহা অনেক চিত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না। নগ্না রমণীমূর্ত্তি চিত্রিত হইয়াছে বলিয়া কেহ মনে করিবেন না যে অজণ্টাচিত্রগুলি অশ্লীল। বস্তুতঃ চিত্রগুলিতে অশ্লীলতার কোন গন্ধ নাই। হিন্দু ও বৌদ্ধ পুরুষমাত্রেরই মালকোঁচা মারিয়া ধুতি পরা। নারীগণের পরিচ্ছদও অধিকাংশ স্থলে তাহাই। কেহ কেহ সাড়ী-পরিহিতা। ধুতি ও সাড়ী প্রায়ই ডুরিয়া। স্ত্রী পুরুষ যাহারা কাছা দিয়া কাপড় পরিয়াছে, তাহাদের ধুতি ঊরুর নীচে নামে নাই। রাজা প্রজা সকলেরই এই বেশ। মহারাষ্ট্রদেশে এখনও স্ত্রীলোকেরা কাছা দিয়া কাপড় পরে। কেশ বিন্যাসের রীতি যে কত প্রকার ও কি বিচিত্র, বর্ণনা করা যায় না। আমাদের দেশে ফিরিঙ্গী খোঁপা চলিয়াছে। যাঁহারা প্রাচীন জিনিষ ভাল বাসেন, তাঁহারা একবার অজণ্টা খোঁপা চালাইবার চেষ্টা করুন না। জঙ্গালী মেয়েদের চিত্রে চুলে নানাপ্রকার ফিতা ও ময়ূরপালক দেখা যায়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এই চিত্রগুলিতে বুদ্ধদেবের জীবনের অধিকাংশ ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। বুদ্ধের সমুদয় ছবিতে কাণের নিম্নভাগ লম্বা দেখা যায়। কেহ বলেন বুদ্ধের কাণ স্বভাবতঃ কতকটা এই প্রকার ছিল। কেহ কেহ বলেন তৎকালে কানের ঐ অংশে ভারী অলঙ্কার পরিবার রীতি থাকায় কাণ ঐরূপ হইয়া যাইত। এই রীতি এখনও আছে। অজণ্টার একটি চিত্রে একজন পুরুষ দুই কাণে দুইটী ইন্দুরাকৃতি গহনা পরিয়াছে দেখা যায়।

জঙ্গালী লোকদের মুখাবয়ব, অস্ত্রশস্ত্র ও পরিচ্ছদ অজণ্টায় সুচিত্রিত হইয়াছে। এই সকলের সহিত বর্ত্তমান গোণ্ড ও ভীলদিগের চেহারা ও পরিচ্ছদাদির অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। সাসানীয় বা প্রাচীন পারসীকদিগের যে সকল চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে শিল্পিদিগের মানবচরিত্রজ্ঞান বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। গৃহী ও শ্রমণদিগের চেহারা ও পরিচ্ছদের পার্থক্য চিত্রগুলি দেখিয়া বেশ বুঝা যায়। সৈন্য ও ব্যাধগণের মুখ খর্ব্বাকৃতি ও কর্কশ, উচ্চশ্রেণীর লোকদিগের মুখ দীর্ঘতর, ডিম্বাকৃতি ও অধিকতর কোমল। গৌর, শ্যাম, নানাবর্ণের নরনারী অঙ্কিত হইয়াছে।

নাগদিগের আকৃতি মানুষেরই মত। প্রভেদ এই যে তাহাদের ঘাড় হইতে সাধারণতঃ ৫টী কি

৭টী সাপ উঠিয়া মাথার উপর ফণা ধরিয়া আছে। কোন কোন নাগের মাথার উপর কেবল একটি ফণা আছে। নাগিনীদের মাথায় কেবল একটী ফণা! স্থলে নাগনাগিনীদের চিত্র এইরূপ আঁকা হইয়াছে। জলে কিন্তু তাহাদের সাপের মত লেজ দেখা যায়। এক এক জনের মুখের ভাব বড়ই সুন্দর। কেহ বা করজোড়ে উপাসনা করিতেছে, কেহবা প্রেমাস্পদের পদতলে বসিয়া যেন কি গভীর বিষাদমিশ্রিত হৃদয়নিহিত কথা সুন্দর অঙ্গুলিভঙ্গি-সহকারে ঈষৎ উর্দ্ধনেত্রে নিবেদন করিতেছে ইত্যাদি। রাক্ষস রাক্ষসীর ছবিও অনেক আছে। তাহারা শূন্যমার্গে বিচরণ করিতে সমর্থ। মুখে বরাহের মত দুদিকে দুটা বড় বড় দাঁত। গন্ধর্ব্ব কিন্নরের ছবিও অনেক আছে। গন্ধর্ব্বগণের মুখ মানুষের মত, হাত মানুষের মত, কিন্তু শরীরের নিম্নদেশ পাখীর মত। কিন্নরগণ মনুষ্যাকৃতি, কিন্তু মুখ ঘোড়ার মত।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে বৌদ্ধদিগের মতে জীবাত্মা ভিন্ন ভিন্ন জন্মে নানা জীবের দেহ অবলম্বন করে। এইজন্য বৌদ্ধ শিল্পিগণ ইতর প্রাণীদের ছবি সহানুভূতির সহিত আঁকিয়াছেন। তাহাদের অঙ্গভঙ্গি ও মুখের ভাবে এমন একটি সজীবতা, একটি বিশেষত্ব আছে যে মনে হয় যেন শিল্পী তাহাদের অন্তরের কথা জানিয়া ফেলিয়াছেন। অজন্টার হাতীর ছবিগুলি বড়ই চমৎকার। বৌদ্ধধর্ম্মে হাতীর আদর হইবার বিশেষ কারণ আছে। কথিত আছে, মায়াদেবী যখন অন্তঃসত্ত্বা হন তখন তিনি স্বপ্ন দেখেন যে এক শ্বেতকায় হস্তী তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্ব বিদীর্ণ করিয়া দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে। অজন্টার হাতীর ছবিগুলিতে পিঠে হাওদা দেখা যায় না; কেবল এক একটা চারপাই ও গদি আছে। তবে নানা প্রকার অলঙ্কারের প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হয়। হাতীর পরই মহিষের ছবির সংখ্যা অধিক। ঘোড়ার ছবিও বিস্তর। ঘোড়ার ঘাড়ের লোম খাট করিয়া ছাঁটা। কোন কোন ছবিতে লেজের লোমও পরিপাটীরূপে কাটা। ঘোড়ার সাজ নানারূপ দৃষ্ট হয়। কিন্তু রেকাব দেখিতে পাওয়া যায় না। ঘোড়ার পায়ে মল, ঘুঙ্গুর ও অন্যান্য অলঙ্কার দৃষ্ট হয়। সেকালে ঘোড়ার গাড়ি ছিল, কিন্তু তাহাতে স্প্রিং ছিল না। নানাপ্রকার হরিণের ছবিও দেখা যায়। তন্মধ্যে কতকগুলি বড়ই সুন্দর বন্য হরিণের ছবি ত আছেই। অধিকন্তু কোন কোন ছবিতে দেখা যায় যে গাড়ীর উপর হরিণ বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছে। এগুলিকে মাঠে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইত। তাহার পর পশ্চাৎ পশ্চাৎ শিকারী কুকুর ছাড়িয়া দেওয়া হইত। সেকালে রাজা প্রজা সকলেই মৃগয়াপ্রিয় ছিল। শিকারী কুকুর লইয়া যাইতেছে, এরূপ ছবি অনেক দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন, তখনকার লোকে হাতীর লড়াই, ভেড়ার লড়াই ও মুরগীর লড়াই ভালবাসিত। অজন্টাগুহায় বানরের ছবিগুলি বড় চমৎকার। বানরের আচরণে যে স্বাভাবিক কৌতুকপ্রিয়তা, যে পরিহাস মাখান আছে, অজন্টার শিল্পিগণ তাহা রেখা ও বর্ণ সম্পাতে বেশ পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন। মহিষজাতকের ছবিটি বড় সুন্দর। বন্যজন্তুদের মধ্যে সিংহই এই চিত্রকরদের প্রিয় ছিল। বাঘের ছবি প্রায় দেখা যায় না। বোধহয় পূর্ব্বে পশ্চিম ভারতে বাঘ অপেক্ষা সিংহই বেশী দেখা যাইত। এখন সিংহ কেবল গুজরাটে দেখা যায়। তাহাও বড় কম। একটি চিত্রে দেখা যায় যে কয়েকজন পাহাড়িয়া দুটা ভালুককে আক্রমণ করিয়াছে। একটা ভালুক থাবা দিয়া চোক ঢাকাইয়া ঘুমাইতেছে। অপরটা একজন শিকারীকে নিষ্ঠুর আলিঙ্গান-পাশে বদ্ধ করিয়াছে। অনেক জীবতত্ত্ববিদ্ বলেন ভালুক কখনও এরূপ করিয়া মানুষকে আক্রমণ করে না। ইহা কিন্তু সন্দেহস্থল।

উটের ছবি মোটে একবার দেখা যায়। অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে হাঁস, ময়ূর, চীল, শকুনি, কাক, হাড়গিলা, পায়রা, শুক ও পেঁচা দেখা যায়। সাপুড়িয়ার সাপ ধরা ও সাপ খেলানর ছবিও আছে। এই ছবিগুলিতে বৃষ ও গাভীর কান দৈর্ঘ্যের দিকে আমূল চেরা দেখা যায়। বোধ হয় তৎকালে এইরূপ কান চিরিয়া দিবার রীতি ছিল।

নানা প্রকার অস্ত্র শস্ত্রের ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন ঢাল, তরবারি, বর্শা, বর্চ্ছি, পরশু, বজ্র, তূণীর, চক্র, গদা, ধনু, ভল্ল ইত্যাদি। নেপালী খুক্‌রির মত অনেক তলোয়ারের ন্যুব্জদিকটা ধারাল। ঋজু তরবারও দেখা যায়। হাতী চালাইবার অঙ্কুশ বর্ত্তমান কালেরই মত। পতাকা যুদ্ধের জাঁকজমকের একটা প্রধান অঙ্গ ছিল। ছাতাগুলি সম্ভবতঃ বাঁশের ছিল। পাখা তিন রকমের; এই তিন রকমই এখনও প্রচলিত। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে তূবী ও বেহালা দেখা যায় না, ও শঙ্খ, বংশী, বীণা, একতারা, খোল, করতাল, মন্দিরা ও খঞ্জনী দৃষ্ট হয়।

পরিচ্ছদের বিষয়ে পূর্ব্বে কিছু লেখা হইয়াছে। বুদ্ধদেবের গায়ে সকল ছবিতেই উত্তরীয় দেখা যায়। উহা বামস্কন্ধের উপর দিয়া পরিহিত। দক্ষিণ স্কন্ধ অনাবৃত। ভারতবর্ষীয় রাজা, রাণী, সভাসদ, ভিক্ষু, সৈনিক, দাসী, উপাসক, সকলকেই ধুতিপরিহিত দেখা যায়। ধুতির পাড় বড়ই বিচিত্র। একটি চিত্রে রাজা দ্বিতীয় পুলকেশীর দরবারে পারস্যরাজ দ্বিতীয় খসরুর দূতগণের আগমন চিত্রিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পুলকেশী খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রদেশে রাজত্ব করেন। পুলকেশী দরবারে বসিয়া আছেন; কিন্তু কেবল মালকোঁচা মারিয়া ধুতি পরিয়া আছেন। তাহাও হাঁটু পর্য্যন্ত নামে নাই। গায়ে কিছু আছে বলিয়া বোধ হয় না। অথচ তাঁহার সিংহাসনের পৃষ্ঠদেশের ঊর্দ্ধভাগ মণিমালাখচিত। গার্হস্থ্য দৃশ্যেও রাজারা কেবল ধুতিপরিহিত দৃষ্ট হন। কিন্তু ভৃত্যেরা জ্যাকেট পরিয়া আছে। মেয়েদের গায়ে বডিস্ অর্থাৎ চোলী দেখা যায়। চোলীর উপর নানাপ্রকার ছবি। সুতরাং বলিতে হইবে, তখন নানাপ্রকারের বিচিত্র ছিটের কাপড় প্রস্তুত হইত। কোন কোন স্ত্রীলোক বডিসের পরিবর্ত্তে কেবল একটী ফিতা দ্বারা স্তনদ্বয় আটকাইয়া রাখিয়াছে। তাহাতে স্তনদ্বয় ঢাকা পড়ে নাই। যাহারা পাখা করিতে বা চামর ঢুলাইতে নিযুক্ত, তাহাদের অনেকেরই এই বেশ। বডিস্ বলিতে কেহ ইংরাজী বডিস্ না বুঝেন। চোলী কথাটিও হয়ত অনেকে বুঝিবেন না। ইহার পিঠে অতি সামান্য কাপড় থাকে, কখন কখন থাকেই না। কাঁধও অল্পই ঢাকা পড়ে। কোন কোন চিত্রে কটিদেশ পর্য্যন্ত বিলম্বিত আস্তীনযুক্ত জ্যাকেট পরিহিতা নারীমূর্ত্তি দেখা যায়। কেহ কেহ অনুমান করেন যে ইহারা বিদেশিনী দাসী। মাহুতদের ও চাকরদের জ্যাকেট আজকালকার চাকরদের পরিহিত হাতকাটা জ্যাকেটের মত। চাদরেরও ব্যবহার দেখা যায়। নবম ও দশম সংখ্যক গুহাই প্রাচীনতম। এই দুইটী গুহা ব্যতীত অন্য কোনটীতে পাগড়ী দেখিতে পাওয়া যায় না। রাজা ও অভিজাতবর্গের মস্তকে রত্নাদিখচিত মুকুটবৎ নানাপ্রকার শিরোভূষণ দেখা যায়। নারীগণের মস্তকেও বিস্তর ফুল ও গহনা দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রমণ অর্থাৎ বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ এবং সৈন্যেরা প্রায় নগ্নশির। বিদেশী-পুরুষ, সৈনিক ও ভিখারীদের মাথায় নানারকম টুপী দেখা যায়। তাহার মধ্যে কোন কোনটা এখনও চলিত আছে। পারসীকদের দরজির সেলাই করা পোষাক ও টুপী দেখা যায়। তাহার কোন কোনটি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। সেকালে বোধহয় অলঙ্কারের বড়ই ছড়াছড়ি ছিল। নরনারীর দেহের ভূষণের ত

কথাই নাই; গৃহদ্বারে, সামিয়ানার থামে, গৃহে, সিংহাসনে, মুক্তার মালা, মাণিক্যের হারের অন্ত নাই। মুকুটগুলি সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে পূর্ণ। তাহার মধ্যে অনেক সূক্ষ্ম তারের কাজ আছে। গহনার মধ্যে নথ কোন ছবিতেই নাই। পায়ের আঙ্গুলেও কোন গহনা নাই। কিন্তু দুল ও ইয়ারিং, নানাবিধ হার, চীক, কণ্ঠমালা, সাতনর, বাজু, তাবিজ, বালা, কঙ্কণ, চুড়ি, মল ও অঙ্গুরী স্ত্রীপুরুষ উভয়ের গায়েই দেখা যায়। তাহাও যে কত রকমের তাহার বর্ণনা করা যায় না। আজকাল যেমন ফিতা দিয়া চীক গাঁথিয়া উহা গলায় বাঁধে, এবং ফিতার দুটা দিক ঘাড়ের দিকে কতকটা ঝুলিয়া থাকে, পুরাকালেও ঠিক সেইরূপ ছিল বোধ হয়। গহনাগুলি সবই খুব ভারি ভারি ও সেকেলে গোছের।

গৃহসজ্জার মধ্যে চারপাই (খট্টা, তক্তপোষ বা পালঙ্কের মত), তাকিয়া ও বালিশ, পা রাখিবার চৌকী, বেত ও বাঁশের গোল গোল মড়া, ও পরদা দৃষ্ট হয়। গৃহকার্য্যে ও নানাবিধ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ক্রিয়াকলাপে ব্যবহার্য্য মৃৎপাত্র সকল পূর্ব্বে যেমন ছিল এখনও তেমনি আছে। ফুল ভুলিবার সাজি সেকালেও ছিল। এখন যেমন অনেক গৃহস্থ বাড়ীতে ও গোয়ালিনীর মাথায় হাঁড়ীর উপর হাঁড়ী, ভাঁড়ের উপর ভাঁড় দেখা যায়, সেকালেও তদ্রূপ ছিল। ইন্দুর বিড়ালের এবং শিশুদের উপদ্রবে আমরা আজিও অনেক জিনিস শিকায় তুলিয়া রাখি। প্রাচীনকালেও শিকার ব্যবহার ছিল। পিক্‌দান তখনও ছিল। আমরা এখন ধুনা দিবার জন্য বৃহৎ কলিকার মত ধুনাচী ব্যবহার করি। পূর্ব্বে একপ্রকার দোদুল্যমান ধুনাচী ব্যবহৃত হইত। পুলকেশীর দরবার-গৃহের মেজেয় ফুল ছড়ান। তৎকালে ধনীর গৃহে বোধ হয় এইরূপ ফুল বিছাইবার রীতি ছিল।

পুরাকালে ভারতবাসীরা যে সমুদ্রপথে বাণিজ্য করিতে যাইতেন, অজণ্টাগুহাচিত্রাবলীর বহুসংখ্যক জাহাজের ছবিতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এই প্রাচীন শিল্পিগণ বৃক্ষ-লতা-ফল-পুষ্প অঙ্কনেও পারদর্শী ছিলেন। কলা, সুপারি, খেজুর, অশোক, পলাশ, বট, অশ্বত্থ, আম, আতা, দাড়িম, লাউ, নীল, শ্বেত, ও রক্ত পদ্ম প্রভৃতির ছবি গুহার মধ্যে পাওয়া যায়। উদ্ভিদ্‌গুলির চিত্র যথাযথ। কলার অনুদ্ভিন্ন কচি পাতা, ঝড়ে ছিন্ন পাতা, নানাবৃক্ষের নূতনপাতা, ও পতনোন্মুখ পুরাতন পাতা, এ সকলের আকৃতি ও বর্ণ স্বভাবানুযায়ী। এই সকল উদ্ভিদ-চিত্রের সৌন্দর্য্যরসানুভবই আমাদের একমাত্র লাভ নহে। ইহার মধ্যে ঐতিহাসিক সন্দেহভঞ্জনের উপায়ও নিহিত আছে। কেহ কেহ বলেন যে আতা ভারতবর্ষের ফল নহে। খৃষ্টীয় ষোড়শশতাব্দীতে পোর্তুগীজ্‌গণ কর্ত্তৃক ওয়েষ্ট ইণ্ডীজ্ হইতে ভারতবর্ষে আনীত হইয়াছিল। পোর্তুগীজ্‌গণ যে আনিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা যে তৎপূর্ব্বে ভারতবর্ষে ছিল, অজণ্টাগুহার ছবি তাহার অন্যতম প্রমাণ। কনিংহাম সাহেব ভারহুৎ এবং মথুরায় ধ্বংসাবশেষ মধ্যে প্রস্তরে খোদিত আতার ছবি পাইয়াছেন।

প্রাচীন ভারতে যে চিত্রবিদ্যা বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। এস্থলে তৎসমুদয়ের উল্লেখ করিবার স্থান নাই। ৭১৩ খৃষ্টাব্দে যখন মহম্মদ কাসিম সিন্ধুদেশ জয় করিতেছিলেন, তখনও কয়েকজন হিন্দু চিত্রকর তাঁহার ও তাঁহার কয়েকজন কর্ম্মচারীর ছবি আঁকিবার অনুমতি চাহিতে আসিয়াছিল।

একটী চিত্রে নর্ত্তকীর নাচের ছবি আছে। নর্ত্তকীর অঙ্গভঙ্গী বর্ত্তমানকালের নর্ত্তকীদিগেরই

মত। তাহার সহচরী বাদিকাদিগের ভাবভঙ্গীও খুব আধুনিক বলিয়া মনে হয়। একটি চিত্রে এক জন রাজার অভিষেক চিত্রিত হইয়াছে। চিত্রের এক অংশে রাজা অভিষেকশালায় উপবিষ্ট হইয়া এক রমণীর করদ্বয়ধৃত মাঙ্গল্যদ্রব্যনিচয় স্পর্শ করিতেছেন। দুই পার্শ্বে অভিষেক্তৃদ্বয় দাঁড়াইয়া সুন্দর চিত্রিত ঘট হইতে রাজার মস্তকে জল ঢালিতেছেন। রাজার দক্ষিণ দিকে পুরোহিত দাঁড়াইয়া মন্ত্র পাঠ করিতেছেন। পুরোহিতের নিকট এক জন ভৃত্য চামর লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। অনেক ছবিতে চামরধারী ও চামর ধারিণীর প্রাচুর্য্য দেখা যায়। পাখা করিবার লোকও আছে। সেকালে একাল অপেক্ষা মাছির উপদ্রব বেশী ছিল কি? অভিষেকচিত্রের আর একটি অংশে একটি বামন স্ত্রীলোক থালা মাথায় করিয়া সিঁড়ি দিয়া উঠিতেছে। একটি স্ত্রীলোক ফুল আনিতেছে। অপর এক সম্পূর্ণরূপে বিবস্ত্রা নারী থালা হইতে কি লইতেছেন বা স্পর্শ করিতেছেন। ইনি হয়ত রাণী। কারণ অতিশয় সূক্ষ্মবস্ত্র পরিতেন বলিয়া সম্ভ্রান্তা পুরমহিলারা অনেক স্থলে এইভাবে চিত্রিত হইয়াছেন। একজন পুরুষ আজ কাল রাখালেরা যেমন লাঠির উপর ভর দিয়া দাঁড়ায়, তেমনি করিয়া দাঁড়াইয়া কৌতূহলের সহিত এই সব দেখিতেছে। অনেক চিত্রেই স্ত্রী ও পুরুষ বামন দেখিতে পাওয়া যায়। সেকালে রাজভবনে ও ধনীর গৃহে বোধ হয় বামন দাস দাসী রাখিবার রীতি ছিল। অভিষেক-দৃশ্যের তৃতীয় অংশে চারিজন ভিক্ষু হাত বাড়াইয়া ভিক্ষা চাহিতেছে। এই অংশে প্রাসাদের বাহিরের দৃশ্যও কিছু দেখা যায়। তাহাতে কলা ও খেজুরগাছ আঁকা আছে। চিত্রের চতুর্থ অংশের ব্যাখ্যা করা কঠিন। এই অংশে একজন স্ত্রীলোক অপর একটি স্ত্রীলোকের সহিত বারকোষে করিয়া চারিটি শিশমুণ্ড একজন সন্ন্যাসীকে দেখাইতেছে। সন্ন্যাসী মালা হাতে করিয়া কর্ত্তিত শিশুমস্তকগুলির প্রতি তাকাইয়া যেন অভিষেক ব্যাপারের আনুষঙ্গিক কোন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতেছেন। আরও দুজন লোক হাত জোড় কারিয়া সাধুকে মিনতি করিতেছে। এই চারিটি শিশুর কাটামুণ্ডের অর্থ কি? কেহ কেহ অনুমান করেন যে অভিষেকের সময় পুরাকালে রাজসূয় যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিতে হইত, এবং এই যজ্ঞে কখনও কখনও পশুবলির পরিবর্ত্তে নরবলি দেওয়া হইত। যাঁহারা প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য ও ধর্ম্মশাস্ত্রে কৃতবিদ্য, তাঁহারা হয়ত চিত্রের এই অংশটির রহস্যোদ্ভেদ করিতে সমর্থ হইবেন। এই চিত্রটিতে নরনারীর ঠোঁট অত্যন্ত শাদা উঠিয়াছে। তাহার কারণ, মূল চিত্রের ঠোঁটের লাল রং ফিকা হইয়া গিয়াছে।

শাক্যসিংহ বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে মারকর্ত্তৃক (বৌদ্ধ পুরাণের শয়তান) নানা প্রকারে প্রলুব্ধ ও পরীক্ষিত হইয়াছিলেন। কিন্তু কোন প্রলোভন বা ভয়ে তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। ছবিটির চারিদিকে কেহ বা বুদ্ধকে ভয় দেখাইতেছে, কেহ বা লোভ দেখাইতেছে, কেহ বা তাঁহার ভোগলালসার উদ্রেক করিবার চেষ্টা করিতেছে। দানব ও রাক্ষসদের মূর্ত্তি ভীষণ ও নানাবিধ। কাহারও মুখ বরাহের মত, কাহারও মুখ হইতে সর্প বাহির হইতেছে, কাহারও মুখ বা সকর্ণ হাঙ্গারের মত। কিন্তু বৃথা প্রলোভন, বৃথা ভয় প্রদর্শন! বুদ্ধদেব প্রশান্তভাবে বসিয়া আছেন। বুঝি তাই দেখিয়াই ছবির বামপার্শ্বে মার স্বয়ং পরাজিত হইয়া চলিয়া যাইতেছে।

কত দৃশ্যেরই বর্ণনা করিব। ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক অনেক ঘটনার ছবি অজন্টাগুহাতে পাওয়া যায়। যেমন বিজয়সিংহের লঙ্কাজয়, —ইঁহারই নামে লঙ্কা সিংহল নামে অভিহিত

হয়—এবং রাজা শিবি ও শোন-কপোতের উপাখ্যান। একটি দৃশ্যে একজন নকীব বা বন্দী উচ্চৈঃস্বরে রাজার আগে আগে তাঁহার উপাধি ও পদবী আদি ঘোষণা করিয়া যাইতেছে। আজ কাল যেমন রাজমিস্ত্রীরা মই দিয়া চুণ সুরকীর হাঁড়ি তোলে, তৎকালেও যে মিস্ত্রীরা তদ্রূপ করিত, একটী ছবিতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। পুরাকালের সামাজিক ও নৈতিক অবস্থার অনেক প্রমাণও ছবিগুলিতে পাওয়া যায়। একটি দৃশ্যে দেখা যায় রাজা ও রাণী একত্রে বসিয়া কয়েক জন পুরুষের নিকট নজর বা উপহার লইতেছেন। আর একটিতে দেখা যায় বুদ্ধদেব উপদেশ দিতেছেন, অনেক রাজামাত্য ও অভিজাতবর্গ সস্ত্রীক প্রকাশ্য স্থানে বসিয়া তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিতেছেন। তৎকালে অবরোধ প্রথা ছিল কি না, তাহার প্রমাণ ইহা হইতে পাওয়া যায়। বুদ্ধদেব সম্বন্ধীয় একটী চিত্রে দেখা যায় যে একজন পারসী বা সাসানীয় পরিচ্ছদধারী মনুষ্য বুদ্ধদেবের আরাধনা করিতেছে। ইহা হইতে পুরাকালে ভারতবর্ষের বাহিরে বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তারের কতক পরিচয় পাওয়া যায়। অপর একটী দৃশ্যে দেখা যায়, রাজা ও রাণী একত্র বসিয়া আছেন। রাজা মদ্য পান করিতেছেন। সেকালের ফুলবাবুর ছবি বড় মজার। তাঁহার ধুতি খানি মালকোঁছা মারিয়া পরা। তাহাও হাঁটুর উপর পর্য্যন্ত আসিয়াছে। কোমরে রত্নখচিত কটিবন্ধ, হাতে দুই গাছি করিয়া সাদা সাপ্টা বালা, মস্তকে মণিমাণিক্যখচিত শিরোভূষণ, কাণে ক্ষুদ্র গোলাকার একপ্রকার ভারী গহনা, তাহা হইতে তিনটি দুলের মত গহনা ঝুলিতেছে, গলায় মণিমালা, বাহুতে দুগাছি অনন্তের মত এক প্রকার অলঙ্কার, কিন্তু তাহা হইতে একটা থোপা ঝুলিতেছে, উপবীতের মত করিয়া পরিহিত একটী ভূষণ স্কন্ধদেশ হইতে বিলম্বিত কিন্তু তাহা কেবল সূত্রময় নয়, তাহা রত্নখচিত। কাছা শেষ পর্য্যন্ত গুঁজিয়া দেওয়া হয় নাই। তাহার বিচিত্র প্রান্তভাগ মৃত্তিকা পর্য্যন্ত বিলম্বিত। ধুতিখানি ডুরিয়া; কিন্তু ডোরা গুলি কাপড়ের প্রস্থের দিকে, দৈর্ঘ্যের দিকে নহে। এই বেশে বাবু মহাশয় একটি হাত উরুর উপর দিয়া অপর হাতে একটি ফুল লইয়া ঈষৎ বঙ্কিমভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। বুদ্ধদেবের পরীক্ষার চিত্রের অধোদেশের দক্ষিণ দিকে যে সুসজ্জিত এক পুরুষ দণ্ডায়মান আছে, ফুলবাবুর বেশের সহিত তাহার বেশের অনেক সাদৃশ্য আছে। কোন কোন ছবিতে পারস্যদেশীয় নরনারীর ছবি আছে। তাহাদের পুরুষদের পায়ে ডোরাদার (striped) ফুল্ মোজা, পরিধানে দরজির সেলাই করা পোষাক। মোটের উপর বোধ হয় পুরাকালে ভারতবর্ষে, অন্ততঃ মহারাষ্ট্র অঞ্চলে, আর্য্যদিগের মধ্যে পরিচ্ছদের পারিপাট্য ও বাহুল্য অপেক্ষা ভূষণেরই বাহুল্য ছিল। অথচ ছবিগুলি দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে তৎকালে ধন, বিলাসিতা, বেশভূষা, সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা, ও সূক্ষ্ম শিল্পজাত দ্রব্যের অভাব ছিল না। নানাবিধ ছিঁটের অস্তিত্বের উল্লেখ পূর্ব্বেই করিয়াছি। খুব মিহি মসলিনও ছিল।

জীবজন্তু নরনারীর ছবি ব্যতীত কেবল সাজাইবার জন্য স্বাভাবিক ও কল্পনাপ্রসূত লতা-পাতা-ফুলে গুহার নানাস্থান সুচিত্রিত হইয়াছে। এই প্রকার চিত্র মোগল রাজত্বকালে আগরা, ফতেপুর সিক্রি, প্রভৃতি স্থানের বিখ্যাত হর্ম্ম্যসকল ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্যত্র দুর্লভ। অথচ এ সকল ১৭০০ হইতে ১১০০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় চিত্রকরগণ কর্ত্তৃক অঙ্কিত হইয়াছিল।

সংসারের পরিবর্ত্তনশীলতার কথা বলিতে

হইলেই লোকে বলে সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই। যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী, রঘুপতেঃ ক্বোত্তরকোশলা। কিন্তু কেবল রাজা ও রাজপুরীর নশ্বরতাই কি আমাদের হৃদয়ে বিষাদের সঞ্চার করে? অতীতের লিখিত ইতিহাসে প্রজা অপেক্ষা রাজার কথাই বেশী। কিন্তু এই গুহাচিত্রগুলি রাজার কথা যেমন বলে, প্রজার কথাও তেমনি বলে। ধনীর কথা, নাগবিকের কথা, সুসভ্যের কথা, প্রাসাদবাসীর কথা যেমন বলে, দরিদ্রের কথা, জানপদবর্গের কথা, অসভ্য জঙ্গালী লোকের কথা, পর্ণকুটিরবাসীর কথাও তেমনি বলে। সেকালের লোকেও আমাদেরই মত রূপের পশ্চাতে, ভোগসুখের পশ্চাতে, বাহ্যাড়ম্বরের পশ্চাতে, ধাবিত হইত; সেকালেও গার্হস্থ্য সুখ ছিল, শোক ছিল, শিশুর শৈশবলীলা ছিল, পুরমহিলার প্রসাধন ছিল, গৃহকর্ম্ম ছিল; কোথায় গিয়াছে সে সব! রাজার ও রাজপুরীর নশ্বরতা আমাদের হৃদয়ে বিষাদ আনিয়া দেয় বটে, কিন্তু যাহারা আমাদেরই দশজনের মত ছিল, তাহাদের নশ্বরতা আমাদিগকে আত্মীয়ের মৃত্যুর মত ব্যথিত করে। কিন্তু ইহাতে আমাদের উপকারও আছে। সংসারের নশ্বরতা আমাদের চিরজন্মভূমির কথা মনে পড়াইয়া দেয়। কোথায় সে জন্মভূমি, কোথায় সে মাতৃপিতৃভবন?

একবার সেকালের শুদ্ধান্তঃপুরে প্রবেশ করি। দেখিতেছি কোনও রূপযৌবনসম্পন্না গৃহলক্ষ্মী অপূর্ব্ববেশে দোলনায় বসিয়া দুলিতেছেন। দোল খাইবার সময় ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ যেরূপ ভাবে অবস্থিত থাকে, চিত্রেও অবিকল তাহাই আছে। গৃহের ভিতর গিয়া দেখি, কোনও সম্ভ্রান্তা পুরমহিলা প্রসাধনে নিযুক্ত। এক হাতে ডিম্বাকৃতি (oval) দর্পণ, অন্য হাতে প্রসাধন দ্রব্য। প্রসাধন দ্রব্য লইয়া একজন দাসী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, অপর একজন চামর ঢুলাইতেছে। গৃহস্বামিনীর সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কার; নিতম্বে মেখলা, তাহাব তিনটি স্তর; উরু বেষ্টন করিয়া একপ্রকার অলঙ্কার। বসন এরূপ সূক্ষ্ম যে তাহা লক্ষ্যই হয় না, কেবল তাহাব পাড় ও অঞ্চল হইতে তাহার অস্তিত্ব বুঝা যায়। সর্ব্বাঙ্গের গঠন ও রং ফুটিয়া বাহির হইতেছে। একটি দাসীর বাঁকা সিতা দেখিতেছি। ফ্যাষন ত্রিকালব্যাপী! একালে ভদ্র গৃহস্থ হিন্দুবাড়ীতে কেবল পায়ে আল্‌তা দেয়, মুসলমানেরা ও তাহাদের অনুকরণকারীরা হাতের পাতায় ও নখাগ্রে মেহদির বং দেয়, সেকালে হাতে পায়ে ও মুখে, সর্ব্বত্র রং দিবার প্রথা ছিল। কথিত আছে এক ভ্রষ্টা ভিক্ষুণী গায়ের রং দেখাইবার জন্য সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করায় বুদ্ধদেব ভিক্ষুণীদিগেব সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান বন্ধ করিয়া দেন। ঔরঙ্গজীবের এক কন্যার গায়ের রং পরিচ্ছদের ভিতর দিয়া দেখা যাওয়ায় বাদশাহ তাঁহাকে তিরস্কার করেন। তাহাতে বাদশাহজাদী উত্তর করেন, "আমি ৭টি পোষাক পরিয়া রহিয়াছি।" তবে, সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান রোগটা একালের নবীনাদের একচেটিয়া নয়! কিন্তু যাই [হোক]; শুধু ধনবতীর প্রসাধন দেখিলেই চলিবে না। এক নারী ছেলে কোলে করিয়া রহিয়াছেন। ঠিক্ আজকালিকার মত! তাঁহার গায়ে জামা আছে। অন্য এক গৃহে গিয়া দেখি ছেলেরা লাটিম ঘুরাইতেছে। আর এক বাড়ীতে গিয়া দেখি নারীগণ কুলোয় করিয়া চাল বাছিতেছেন। আর এক স্থানে দেখি, মা পশ্চাৎ হইতে ছেলের দুই পার্শ্ব দিয়া হাত চালাইয়া তাহার দুটি হাত যোড় করিয়া ধরিয়া আছেন। মায়ের মুখের ভাবে কি অপূর্ব্ব মিনতি, মাতৃস্নেহ ও সন্তানের জন্য আশীর্ব্বাদ ভিক্ষার অনির্ব্বচনীয় সম্মিলন! মা বুঝি ছেলের হাত দিয়া বুদ্ধদেবকে ভিক্ষা দিতেছেন! এদিকে আবার এ কি লীলা!

কয়েকটী বালক লাঠির উপর ঘোড়ায় চড়িয়াছে। এরা আমাদেরই বাড়ীর খোকাদের ভাই ছিল। শৈশবসুলভ কবিকল্পনা-বলে শুষ্ক নির্জীব কাষ্ঠখণ্ডকে সজীব অশ্বে পরিণত করিত। তবে, সেই সেকালের লোকেরা সত্য সত্যই আমাদের আত্মীয় ছিল। তাহাদের শিশুগুলিও আমাদের নয়নের মণি খোকা-খুকীদের মত বাবা ও দাদার লাঠির সাহায্যে বিনাব্যয়ে অশ্বারোহণের সখ মিটাইত। অতীতে ও বর্ত্তমানে মানবপ্রকৃতির একত্বের কি সুমিষ্ট প্রমাণ।

[প্রবন্ধমধ্যে প্রদত্ত অনেকগুলি চিত্র বাদ দেওয়া হয়েছে—সংকলন সম্পাদক]

১৩০৮ শ্রাবণ

ভারতবর্ষের শিল্প

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল হইতে নানাবিধ ললিতকলা (fine arts) এবং জীবনসাধন শিল্পের (industrial arts) উন্নতি হইয়া আসিতেছে। ঋগ্বেদে দেখা যায়, যে, যে যুগে উহার স্তোত্রগুলি রচিত হইয়াছিল, তৎকালে আর্য্যেরা কাপড় বুনিতে এবং বর্ম্ম, শিরস্ত্রাণ, তনুত্রাণ এবং নানাবিধ যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ করিতে জানিতেন। তাঁহারা স্তম্ভবিশিষ্ট অট্টালিকা, প্রস্তরনির্ম্মিত নগর, খদির ও শিশুকাষ্ঠের রথ এবং নানাবিধ স্বর্ণালংকার নির্ম্মাণ করিতে পারিতেন। ঋগ্বেদে বণিক্‌দিগের সমুদ্রগমনের উল্লেখ থাকায় ইহাও প্রতীত হয়, যে প্রাচীন আর্য্যেরা নৌকা ও জাহাজ নির্ম্মাণ করিতে জানিতেন। ইহাতে সুবর্ণমুদ্রার প্রচলন, ধাতু গলান, কর্ম্মকারের ভস্ত্রাযন্ত্র, সুবর্ণসজ্জাবিশিষ্ট অশ্ব, প্রভৃতির উল্লেখ আছে। বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ হইতে ইহাও প্রমাণ হয় যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা অতি প্রাচীনকাল হইতেই সঙ্গীতের চর্চ্চা করিয়া আসিতেছেন।

কৌষেয়বস্ত্র বলিতে রেশমী কাপড় বুঝায়। পাণিনির ব্যাকরণে চতুর্থ অধ্যায়ে এই কৌষের কথাটির ব্যুৎপত্তি দেওয়া আছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে পাণিনি খৃষ্টপূর্ব্ব ৪০০ অব্দে জীবিত ছিলেন। সুতরাং তৎকালে যে ভারতবর্ষে পট্টবস্ত্রের ব্যবহার ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে শতপথ ব্রাহ্মণ পাণিনীয় ব্যাকরণ অপেক্ষাও প্রাচীন। এই শতপথ ব্রাহ্মণে "কৌশবাসে"র উল্লেখ আছে। সূক্ষ্ম কার্পাসবস্ত্র যে অতি প্রাচীনকালেও ভারতবর্ষ হইতে রোমকসাম্রাজ্যে ও অন্যত্র রপ্তানী হইত, ইহা সুপরিজ্ঞাত কথা। বার্ড্‌বুড্‌ সাহেব বলেন, আনুমানিক ৪৫০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে লিখিত এস্থারের পুস্তক (Book of Esther) নামক বাইবেলের অংশবিশেষে প্রথম অধ্যায়ে মূল হিব্রুতে "কার্পাস" কথাটি আছে। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের কার্পাসবস্ত্র সুদূর জুডিয়া দেশে সুপরিজ্ঞাত ও প্রচলিত ছিল। বোগদাদের খলিফাগণের অন্তঃপুরে ঢাকাই মস্‌লিনের প্রভূত আদর ছিল। আমরা অজন্টাগুহাচিত্রাবলী শীর্ষক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে বুদ্ধদেবের জীবিতকালে ভারতবর্ষে অতিশয় সূক্ষ্ম

বস্ত্রের ব্যবহার ছিল। মোগলবাদশাহদিগের সময় যে সূক্ষ্ম রেশমী ও কার্পাসবস্ত্রের যারপরনাই আদর ছিল, তাহা অনেকেই জানেন। আকবরের পরিচ্ছদাগারসংলগ্ন কারখানায় বহুসংখ্যক সুদক্ষ তন্তুবায় কাজ করিত। -সম্রাট তাহাদিগকে নানাপ্রকারে উৎসাহ দিতেন। জাহাঙ্গীরের আমলে প্রস্তুত ১৫ গজ লম্বা এবং এক গজ চৌড়া ঢাকাই মস্‌লিনের ওজন হইত মোটে পাঁচতোলা। এখন অত বড় মস্‌লিন্ প্রায় দশ তোলার কম ওজনে প্রস্তুত হইতে পারে না। সেকালে ওরূপ একথান মস্‌লিনের দাম ছয় শত টাকা হইত। এখন যাহা প্রস্তুত হয়, তাহার দাম দেড় শত টাকার বেশী নয়। বর্ত্তমান সম্রাট এড্‌ওয়ার্ড যখন যুবরাজ ছিলেন ও আমাদের দেশে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার জন্য বরাত দিয়া তিনটি থান প্রস্তুত করান হয়। প্রত্যেকটি ২০ গজ লম্বা, এক গজ চৌড়া এবং ওজনে প্রায় সাড়ে নয় তোলা। খুব ভালো কুড়ি গজ লম্বা ও এক গজ চৌড়া মস্‌লিনের থান অঙ্গুরীর ভিতর দিয়া টানিয়া লওয়া যাইতে পারে। এরূপ একটি থান বুনিতে ছয় মাস লাগে; মূল্য ৩০০ টাকা। বিখ্যাত পর্যটক টাভের্নিয়ে বলেন যে পারস্য সম্রাট শাহ সাফির (১৬২৮-১৬৪১ খৃঃঅঃ) দূত ভারতবর্ষ হইতে স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া নিজ প্রভুকে একটি রত্ন-খচিত নারিকেল উপহার দেন। উহার ভিতর ৩০ গজ লম্বা একটি মস্‌লিনের পাগড়ি ছিল। উহা এরূপ কোমল ও সূক্ষ্ম ছিল যে ছুঁইলে মনে হইত না যে কিছু ছুঁইলাম। বোধ করি এইরূপ সূক্ষ্ম অবগুণ্ঠনাবৃতা নিজ প্রেমপাত্রীর উদ্দেশে এক হিন্দুস্থানী কবি লিখিয়াছেন—

"আতে হঁয়্ অপ্নে মুঁহ্ পে দুপাট্টেকো তাজ্ কর;
দেতে হঁয়্ হম্‌কো যরবৎ-ই-দীদার ছান্ কর্।"

[ইহার তাৎপর্য এই—"তিনি তাঁহার দুপাট্টা (একপ্রকার চাদর) তাঁহার মুখের উপর টানিয়া আসিতেছেন; তাঁহার সৌন্দর্য্যরূপ যরবৎ যেন ছাঁকিয়া পান করিতে দিতেছেন।"]

এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম মস্‌লিন পূর্ব্বে ঢাকায় প্রস্তুত হইত, তাহা ঘাসের উপর বিছাইয়া দিলে দেখিতে পাওয়া যাইত না। সান্ধ্যশিশির হইতে পৃথক করা যাইত না বলিয়া ইহার নাম ছিল, "শব্‌নম" (সান্ধ্যশিশির)। আর এক প্রকার মস্‌লিনের নাম ছিল, "আব্-রওআন্" (প্রবহমান জল), কারণ ইহা জলে ফেলিলে অলক্ষ্য হইয়া যাইত। রেশমী কাপড়ের চাঁদতারা, বুল্‌বুল্ চশ্ম (বুল্‌বুলের চোখ), মজ্‌চর (রজত-লহরী) প্রভৃতি আরও অনেক কবিত্বপূর্ণ নাম ছিল।

ভারতবর্ষেই তন্তুবয়নবিদ্যা পৃথিবীর মধ্যে প্রথমে পূর্ণ উন্নতিলাভ করে। এখানকার সূক্ষ্ম মস্‌লিনই যে সর্ব্বত্র আদৃত হইত, তাহা নয়; মনুস্মৃতির পূর্ব্বযুগ হইতে আমাদের দেশের কিংখাব্ প্রভৃতি বহুমূল্য বস্ত্র বিদেশে আদৃত হইয়া আসিতেছে। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞের সময় তাঁহাকে রাজন্যবর্গ যে সকল উপহার দেন, তন্মধ্যে হিন্দুকুশের পশু-রোম, গুজরাতের আভীরদিগের তৈয়ারি পশমী শাল, প্রভৃতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। প্রাচীন ভারতবর্ষের অন্যান্য সমুদয় তান্তব দ্রব্যের (textile fabrics) সংক্ষিপ্ত উল্লেখও এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, ঋগ্বেদে স্বর্ণালঙ্কারের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। অজন্টাগুহাচিত্রাবলী প্রবন্ধে আমরা দেখাইয়াছি যে প্রাচীন ভারতে অলঙ্কারের কিরূপ প্রাচুর্য্য ছিল। বাস্তবিক সোনার কাজ পুরাকালে ভালই হইত। রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ নির্ব্বাহার্থ হিরণ্ময়ী সীতামূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। রামায়ণকে বিন্দুমাত্রও ঐতিহাসিক মনে না করিয়া, উহাকে কেবল কাব্য মনে করিলেও,

উহার রচনাকালে যে স্বর্ণকারগণের এইরূপ বৃহৎ জীবিতমনুষ্যবৎ মূর্ত্তি নির্ম্মাণের ক্ষমতা ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সোনারূপার কাজ কেন্‌সিংটন কৌতুকাগারে রক্ষিত আছে। ঐতিহাসিকের চক্ষে মূল্যবান্ এই দ্রব্য দুটির মধ্যে প্রথমটি একটি সোনার কৌটা এবং অপরটি একটি রৌপ্যের থালা। সোনার কৌটাটি জেলালাবাদের নিকটবর্ত্তী বিমারনের দ্বিতীয়সংখ্যক বৌদ্ধস্তূপে পাওয়া যায়। কৌটাটির সহিত কতকগুলি তাম্রমুদ্রা ছিল। তাহা হইতে স্থির হইয়াছে যে স্তূপটি, এবং সুতরাং, কৌটাটি আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব্ব ৫০ অব্দের। ইহার উপর সুন্দর খোদাই কাজ আছে। ইহার একটি চিত্র দেওয়া গেল। এই প্রবন্ধে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান এবং বৃটিশ যুগে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সোনা-রূপার নানাবিধ অলঙ্কার ও অন্যান্য দ্রব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিবারও স্থান নাই। কৌতূহলী পাঠক শিল্পের এই এবং অন্যান্য শাখার বৃত্তান্ত বার্ডবুড় সাহেবের The Industrial Arts of India এবং শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের A Hand-Book of Indian Products-এ দেখিতে পাইবেন।

নানা প্রকার গৃহ, মন্দির ও গুহানির্ম্মাণে যে প্রাচীন আর্য্যদিগের বিশেষ দক্ষতা ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। বৌদ্ধযুগেই ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের বিশেষ উন্নতি হয়। হিন্দু ও বৌদ্ধ ভাস্করগণ নিজ নিজ নৈপুণ্যের অনেক চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা এ বিষয়ে কখনও গ্রীকদিগের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। গ্রীক ভাস্করেরা মানুষ ও দেবদেবীর মূর্ত্তিতে সৌন্দর্য্যের যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, ভারতীয় শিল্পীগণ তাহার নিকটেও যাইতে পারেন নাই। ভারতের যে সকল প্রাচীন মন্দিরাদি এখনও বিদ্যমান আছে, তাহাতে প্রস্তরে খোদিত যে সকল নরনারী ও দেবদেবীর মূর্ত্তি খোদিত দেখা যায় তৎসমূহে ভাস্করগণের অসাধারণ ধৈর্য্য, শ্রমশীলতা, অধ্যবসায় এবং সিদ্ধহস্ততার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু গ্রীক ভাস্করগণের ন্যায় উন্নত প্রতিভার পরিচয় তাহাতে নাই। মন্দিরাদির গঠনপ্রণালী এবং তাহাদের গাত্রে অঙ্কিত চিত্রগুলি সম্বন্ধেও এই সকল কথা খাটে। ইহা ফর্গুসন প্রভৃতি ইউরোপীয় শিল্পসমালোচকগণের মত। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তও এই মতে সায় দিয়াছেন। তিনি বলেন, কপিল ও কালিদাসের দেশে প্রতিভার অভাব ছিল না। কিন্তু উচ্চবর্ণের লোকেরা ক্রমে ব্যবসায়ে বিমুখ হইয়া পড়ায়, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি ললিতকলাগুলি নিম্ন শ্রেণীর লোকদের একচেটিয়া হইয়া পড়ে। এমত অবস্থায় প্রতিভার পরিচয় কেমন করিয়া পাওয়া যাইবে? বার্ডবুড় সাহেব আরও একটি কারণের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, হিন্দুদের পৌরাণিক অনেক দেবদেবী এবং তাঁহাদের অবতারগণের মূর্ত্তি অস্বাভাবিক। হিন্দু শিল্পিগণ ধর্ম্মভাবের প্রেরণায় তাঁহাদের ভাস্কর্য্য ও চিত্রে অন্ধভাবে পুরাণোক্ত বর্ণনার অনুসরণ করিয়াছেন, সৌন্দর্য্য সৃষ্টির চিন্তা তাঁহাদের মনে আসে নাই; কিন্তু যেখানেই তাঁহারা পৌরাণিক বর্ণনা ছাড়িয়া দিয়া স্বাধীনভাবে কার্য্য করিয়াছেন, সেখানেই সৌন্দর্য্যরচনায় বহু পরিমাণে সফলপ্রযত্ন হইয়াছেন। প্রাচীন ভারতে চিত্রবিদ্যার অবস্থা কিরূপ ছিল, অজণ্টাগুহাসম্বন্ধীয় প্রবন্ধে তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া গিয়াছে। সংস্কৃত কাব্যেও এ সম্বন্ধে কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ কালিদাসের শকুন্তলার ষষ্ঠ অঙ্ক এবং ভবভূতির উত্তররামচরিতের প্রস্তাবনার নাম করিতে পারা যায়।

প্রাচীন ভারতে আরও নানাপ্রকার শিল্প ছিল। সমুদয়ের বৃত্তান্ত লিখিতে গেলে একটি পুস্তক লিখিতে হয়। সে ক্ষমতাও আমার নাই, অংশত পুস্তকমুদ্রণ করিবার জন্য প্রবাসী প্রতিষ্ঠিতও হয় নাই। এখানে কেবল একটি শিল্পের উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের এই অংশের উপসংহার করিব। মহাভারত রচনাকালে হিন্দুগণ কাচের ব্যবহার জানিতেন। যুধিষ্ঠির যখন রাজসূয় যজ্ঞ করেন, তখন একটি রাজকীয় মণ্ডপের কুট্টিম স্ফটিকনির্ম্মিত ছিল। দুর্য্যোধন এই মণ্ডপে প্রবেশ করিয়া কুট্টিমকে জল মনে করিয়া পরিচ্ছদ গুটাইয়াছিলেন। এই স্ফটিক কাচ বই আর কিছুই নয়।

স্বর্গীয় রাণাডে মহাশয় ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ সামাজিক সমিতির অধিবেশনে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে, ভারতবর্ষ মুসলমান শাসনাধীন হওয়ায় কি কি উপকার হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ করেন। তিনি ভারতীয় শিল্পের উন্নতির উল্লেখ করিয়াছিলেন কি না, এখন মনে পড়িতেছে না। কিন্তু হিন্দু ও মুসলমান প্রতিভার সম্মিলনে শিল্পের সকল বিভাগেই যে উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। নানাবিধ ধাতব দ্রব্য নির্ম্মাণ, অলঙ্কার নির্ম্মাণ, কফ্‌ত্‌গিরি ও বিদ্রি (damascening), মীনার কাজ (enamelling), লাক্ষকলেপন (lacquer work), যুদ্ধাস্ত্র-নির্ম্মাণ, হাতী ও ঘোড়ার সাজ প্রস্তুতকরণ, আবলুস্, চন্দন ও অন্যান্য নানাবিধ কাঠের উপর খোদাই, ঝিনুক এবং স্বর্ণাদি প্রতিবপন (inlaying), হাতীর দাঁত খোদাই, হাতীর দাঁতের উপর ক্ষুদ্র চিত্রাঙ্কন (miniature-painting), প্রস্তর ও মৃত্তিকার মূর্ত্তি রচনা, গালার কাজ, প্রভৃতি শিল্পের নানা অঙ্গেই হিন্দু মুসলমান প্রতিভার সম্মিলনে শুভ ফল ফলিয়াছিল। তাহার চিহ্ন এখনও ভারতের সমুদয় শিল্পকেন্দ্রে পরিলক্ষিত হয়। মোটা ও মিহি কার্পাস এবং রেশমী বস্ত্র, সতরঞ্চি, গালিচা প্রভৃতি বয়ন, কাপড়ের উপর নানাপ্রকার ফুলতোলা ও অন্যান্য ছুঁচের কাজ, কিংখাব, প্রভৃতি, মোগল বাদশাহদিগের উৎসাহ পাইত। আকবর বাদশা একজন প্রধান শিল্পোৎসাহী সম্রাট ছিলেন। তাঁহার রাজকীয় কারখানায় বহুসংখ্যক শিল্পী কাজ করিত। সম্রাট প্রতি সপ্তাহে একবার প্রত্যেক শিল্পীর কাজ দেখিতেন। যাহার কাজ ভাল হইত, সে পুরস্কার পাইত ও তাহার বেতন বাড়াইয়া দেওয়া হইত। বিখ্যাত ফরাশি পর্য্যটক বের্নিয়ে যখন ভারত ভ্রমণ করেন, তৎকালে বঙ্গদেশে বস্ত্র শিল্পের অবস্থা খুব উন্নত ছিল। তিনি লিখিয়াছেন, তৎকালে বাঙ্গালা দেশ হইতে মিহি ও মোটা কার্পাস এবং রেশমী কাপড় যে কি পরিমাণে এশিয়া ও ইউরোপের নানাদেশে রপ্তানী হইত, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

ভারতবর্ষে শিল্পের অবনতি হইল কেমন করিয়া? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়। সামান্য অধ্যয়ন ও চিন্তার ফলে এ বিষয়ে আমাদের যে ধারণা জন্মিয়াছে, এস্থলে আমরা তাহাই সংক্ষেপে লিখিতেছি।

রাজার পরিবর্ত্তন শিল্পের অবনতির একটি প্রধান কারণ। মুসলমান রাজা ও তাঁহাদের অনুচরগণ ভারতবর্ষে বাস করিতে আসিয়াছিলেন। সুতরাং অনেকে প্রকৃত শিল্পানুরাগবশতঃ এবং অনেকে অন্ততঃ আপনাদের বিলাসবাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য এতদ্দেশীয় প্রাচীন ও মুসলমানপ্রভাবজাত শিল্পের উৎসাহদাতা ছিলেন। ইংরেজ শাসনকালে তাহা ঘটে নাই। সত্য বটে, ইংরেজরা ভারতের প্রাচীন মন্দিরাদি মেরামত করাইতেছেন, অজন্টা গুহাচিত্রাবলীর মত প্রাচীন শিল্পের শেষ চিহ্নগুলি তাঁহাদের দ্বারাই সংরক্ষিত

হইতেছে, তাঁহারাই মোগলস্থাপত্য ও তৎসম্পৃক্ত শিল্পবিষয়ে সুন্দর সচিত্র পুস্তক প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহারাই বিলাতে ভারতীয় শিল্পসংরক্ষিণী সমিতি গঠন করিয়াছেন, তাঁহারাই ভারতবর্ষে কয়েকটি শিল্পবিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছেন, তাঁহারাই নানাস্থানে কৌতুকাগার স্থাপন করিয়া তাহাতে নানাবিধ অতি প্রাচীন ও আধুনিক শিল্পদ্রব্য রাখিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা প্রায় দুই শতাব্দী ভারত-শাসনের পর যে বিদেশী সেই বিদেশীই আছেন। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য রুচির পার্থক্যবশতঃ তাঁহারা অনেক সময় আমাদের শিল্প পছন্দও করেন না। সকল দেশেই রাজাবা যে সকল হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করেন, সংখ্যা, আয়তন ও সৌন্দর্য্যের হিসাবে, তাহাদের সহিত অপরের নির্ম্মিত হর্ম্ম্যাদির তুলনাই হয় না। রাজনির্ম্মিত হর্ম্ম্যাদি অপরের অনুকরণীয় হয়। আমাদের দেশেও তাহাই ঘটিতেছে। ইংরাজের পূর্ত্তবিভাগ-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত সরকারী বাড়ীগুলি একই ছাঁচের; কিন্তু ছাঁচটি সাধারণতঃ বিদেশী। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল তবু তাদের প্রভাবে কোন কোন সরকারী অট্টালিকায় হিন্দুসারাসানীয় স্থাপত্যরীতি কিয়ৎপরিমাণে অনুসৃত হইয়াছে। অন্যত্র সরকারী হর্ম্ম্যগুলি বিদেশী রীতি অনুসারে নির্ম্মিত। তাহার দেখাদেখি আমাদের রাজারাজড়া ও ধনী লোকেরাও বিদেশী ধরণের গৃহ নির্ম্মাণ করিতেছেন। কারণ, পরাধীনতায় মনটাও দাসত্ব করে, রুচিও দাসত্ব করে। আমরা আরাম পাই আর নাই পাই, ভারতের আব হাওয়ার উপযোগী হউক বা না হউক, আমাদের ঘরটা বিলাতী ছাঁচের, আস্‌বাব বিলাতী ছাঁচের, পোষাক বিলাতী ছাঁচের হওয়া চাই। আমাদের রুচি এরূপ বিকৃত হইয়াছে, যে, অনেক সময় বিচার না করিয়াই দেশীয় জিনিষকে আমরা অবজ্ঞার চক্ষে দেখি এবং "বিলাতী" অর্থে উৎকৃষ্ট বুঝি। বলা বাহুল্য, আমরা উৎকৃষ্ট বিদেশী দ্রব্য ব্যবহারের বিরোধী নহি। কিন্তু ইহাও বলি, যদি দেশী ও বিদেশী জিনিষ উৎকর্ষে উনিশ-কুড়ি হয়, তাহা হইলে বিদেশী কুড়ি অপেক্ষা দেশী উনিশকেই আমাদের পছন্দ করা উচিত। বাগান ও বাড়ী সাজাইবার জন্য ভাল মন্দ প্রস্তর ও প্যারিস্-প্লাস্টারের মূর্ত্তি আমাদের দেশের অনেক লোকে রাখেন; কিন্তু মাত্রেকে কয়জন এরূপ মূর্ত্তি গড়িয়া দিবার বরাত দিয়াছেন, তাহা জানিতে কৌতূহল হয়। আমাদের বস্ত্র ও অলঙ্কার সম্বন্ধীয় রুচি-বিকারের জন্য এখন ইংরাজও আমাদের নিন্দা করিতেছেন। বার্ড্‌বুড সাহেব বলেন—

"Indian native gentlemen and ladies should make it a point of culture never to wear any clothing or ornament but of native manufacture and strictly native designs, constantly purified by comparison with the best examples, and the models furnished by the sculptures of Amravati, Sanchi and Bharut." Indian Arts, p. 244.

অজণ্টাগুহাচিত্রাবলী হইতে এবং আমাদের বর্ত্তমান সংখ্যায় মুদ্রিত স্বর্ণকৌটার চিত্র হইতে এ বিষয়ে অনেক সঙ্কেত পাওয়া যায়।

গৃহ নির্ম্মাণ বিষয়ে ভারতীয় রীতির অবহেলায় শিল্পের অন্যান্য শাখারও অনিষ্ট হইয়াছে। শিল্পরসজ্ঞেরা বলেন, চিত্রবিদ্যা, ভাস্কর্য্য, তক্ষকের কাজ, প্রতিবপন (inlaying), কাচের উপর চিত্রাঙ্কন, এসকল স্থাপত্যের আত্মীয় জ্ঞাতি-কুটুম্ব। স্থাপত্যের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এ সকলের পরিবর্ত্তনও অবশ্যম্ভাবী। এই জন্য ভারতীয় স্থাপত্য অবহেলিত হওয়ায় এই সকল শিল্পেরও অবনতি হইতেছে।

আমরা অনেক শতাব্দী ধরিয়া দৈহিক শ্রমসাপেক্ষ ব্যবসায় মাত্রকেই অবজ্ঞার চক্ষে

দেখায় যে শিল্পের উন্নতির পথ বুদ্ধ এবং অবনতির পথ উন্মুক্ত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমান রাজাদের রাজধানী ও দরবার শিল্পোৎসাহের কেন্দ্রস্থল ছিল। তাঁহাদের অমাত্যগণ ও প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণও এইরূপ উৎসাহ দিতেন। আবার সাধারণ ধনী ব্যক্তিরাও শিল্পানুরাগী ছিলেন। এখন সে রাজাও নাই, অমাত্যেরাও নাই, ধনও নাই। যে ধন আছে, আমরা তাহা দিয়া বিলাতী চক্‌চকে অপকৃষ্ট জিনিষ কিনিয়া আপনাদিগকে খুব সমজ্‌দার মনে করিতেছি। এখনও বিলাতের নানা কৌতুকাগার নানাকারুকার্য্য খচিত সোনার রূপার পাত্র, কফ্‌ত্‌গিরি ও বিদ্রি এবং মীনাকরা কত ভারতীয় থালা, বাটী, কুঁজা, কৌটা, বাক্‌স, ঘটী এবং আর নানাবিধ পাত্র রহিয়াছে। আমরা এখন সোনার দরে বিলাতী কাচের ও মাটির বাসন কিনিতেছি ও ভাঙ্গিতেছি। সুন্দর সুন্দর দেশী গালিচা, ছিট, লেপ, তোষক ও পর্দার কাপড় পরিত্যাগ করিয়া আমরা অজস্র বিলাতী জিনিষ কিনিতেছি।

রুচি ও অবস্থার পরিবর্ত্তনে যে শিল্পের অবনতি হয়, তাহার দু-একটা ছোট ছোট দৃষ্টান্ত দিলে বোধহয় মন্দ হইবে না। লক্ষ্ণৌয়ের চিকনের কাজ পূর্ব্বে রেশমের উপরও হইত, এখন কেবল সূতি হয়। ফতেপুর জেলার কিষণপুর গ্রামে রেশমী ছিট ছাপা হইত, এখন আর হয় না। আমরা নগ্নশির বাঙ্গালী ত সচরাচর কোন প্রকার টুপি বা পাগড়ী ব্যবহার করি না। হিন্দুস্থানী, পঞ্জাবী প্রভৃতিদের মধ্যে মাথা খোলা রাখা অসভ্যতা। কিন্তু তাঁহারা পূর্ব্বে যে পরিমাণে পাগড়ী ব্যবহার করিতেন, এখন পাশ্চাত্য সভ্যতার কল্যাণে তাহা আর করেন না। সুতরাং পাগড়ী বাঁধিবার অনেক প্রকার কাপড় আর প্রস্তুত হইতেছে না। রেশমী শালের ব্যবহার প্রায় উঠিয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে জুতার ও চটি-জুতার রেশমী উপর-সাজ খুব প্রচলিত ছিল। এখন ফরমাইস না দিলে পাওয়া যায় না। পূর্ব্বে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ মস্‌নদে বসিতেন, তাহার জন্য বিশেষ এক প্রকারের রেশমী কাপড় প্রস্তুত হইত। এখন ড্রইং-রুমে গদি-আঁটা চেয়ার এবং বেন্টউড্ চেয়ারের উপদ্রবে সে মস্‌নদও প্রায় দেখা যায় না, তাহার উপযোগী কাপড়ও পাওয়া ভার। পূর্ব্বে হাতীর হাওদায় বিছাইবার ও হাতীকে সাজাইবার জন্য কত প্রকার কাপড় ও অলঙ্কার প্রস্তুত হইত। ঘোড়ার জিনেরই বা কত বাহার ছিল। সেকালের হস্তশ্বপরিশোভিত বিচিত্রবর্ণালঙ্কৃত রাজধানীর রাজপথগুলির কথা ভাবিলেও সুখ হয়।

আমাদের শিল্পের অবনতির আর এক কারণ ইউরোপীয় কলকারখানার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ইংরাজের আইন। প্রথমে ইংরাজের আইনের কথা বলি। বার্ড্‌বুড্ সাহেব বলেন—

"In 1641, "Manchester cottons", made up in imitation of Indian Cottons, were still made of wool. But in vain did Manchester attempt to compete on fair free-trade principles with the printed calicoes of India, and gradually Indian Chintzes became so generally worn in England, to the detriment of the woolen and flaxen manufactures of the country, as to excite popular feeling against them, and the Government, yielding to the clamour; passed the law, in 1721, which disgraced the statute book for a generation, prohibiting the wear of all period calicoes whatever." — Indian Arts, p. 242.

এইরূপ আরও আইন করিয়া এবং ভারতীয় বস্ত্রের উপর শতকরা ৬০/৭০ টাকা কর বসাইয়া

ইংলণ্ড ভারতীয় বস্ত্রের সর্বনাশ করেন। এই সেদিন বোম্বাইয়ের কলওয়ালাদিগকে জব্দ করিবার জন্য সূত্র ও বস্ত্রের উপর ট্যাক্স বসান হইয়াছে। তাহার উপর বিলাতী, মার্কিন ও ইউরোপীয় সস্তা কলের কাপড়ের প্রতিযোগিতা আছে। কাপড় সম্বন্ধে যেরূপ, অন্যান্য দ্রব্য সম্বন্ধেও তদ্রূপ কলের জিনিষের প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন।

তাহার পর আর এক কথা। এক্ষণে আমাদের দেশের অবস্থার পরিবর্ত্তনে শিল্পী ও তাহাদের নিয়োগকর্ত্তাদের পরস্পর ব্যবহারে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাহাতেও কুফল ফলিয়াছে। লক্‌বুড্‌ কিপলিং সাহেব ১৮৮১-৮২ খৃস্টাব্দের পঞ্জাব প্রদর্শনীর রিপোর্টে লিখিয়াছেন, "গৃহনির্ম্মাণের সময় কারিগরদিগকে বেতন দেওয়া হয়; কিন্তু যখন তাহারা কোন সূক্ষ্ম কঠিন কাজ করে, তখন তাহাদিগকে মুক্তহস্তে মিষ্টান্ন, তামাক, সরবৎ প্রভৃতি দেওয়া হয়। কোন কোন জেলায় ছুতার একটি খোদিত জানালা বা দ্বারের চৌকাঠ প্রস্তুত করিলে তাহা সকলকে দেখাইবার জন্য এক দিনেব ছুটি লয়। তাহার একটি চাদর বিছাইয়া ঐ চৌকাঠ যে গৃহকে শোভিত করিবে, তাহার সম্মুখে উহা স্থাপন করে; এবং তথায় উপবেশনপূর্ব্বক নগরবাসীদিগের প্রশংসা, অভিনন্দন ও পুরস্কার লাভ করে। বেশ ভাল খোদাইয়েব জন্য কখন কখন এক এক জন কারিগর এইরূপে একশ টাকা পর্য্যন্ত পুরস্কার পাইয়াছে।" এই রূপ রীতি বাঙ্গালা দেশে কোন কালে ছিল কি না, জানি না। এখন ত নাই। পঞ্জাবেও বোধ হয় ক্রমে অপ্রচলিত হইয়া আসিতেছে। এইরূপ রীতি থাকিলে যে শিল্পী উৎসাহিত হন, এবং ইহা লোপ পাইলে যে শিল্পের অবনতি হইবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি? কলিকাতা শিল্পবিদ্যালয়ের প্রিন্সিপ্যাল হ্যাভেল সাহেব গত জানুয়ারী মাসের কলিকাতা রিভিউ পত্রে ভারতবর্ষে শিল্পশিক্ষা শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহার এক স্থানে আছে, "আগেকার ভারতীয় শিল্পীদের কাজ ইউরোপে চালান হইয়া গিয়া অপর ভারতীয় শিল্পীদের দৃষ্টিবহির্ভূত হইয়া পড়িত না। যদি কেহ একটি বেশ সূক্ষ্ম খোদাইয়ের কাজ করিত, তাহা হইলে কেবল যে তাহার শিল্পি-ভ্রাতারাই উহার আলোচনা করিত, তাহা নয়, উহা বাজারের একটা কথাবার্ত্তার বিষয় হইত, সহরের একটা দ্রষ্টব্য জিনিষ হইত, এবং ভবিষ্যদ্‌বংশাবলীর প্রশংসা ও অনুকরণের বিষয় হইয়া থাকিত।" বাস্তবিক এই কথাগুলি বড়ই সত্য। ভাল কাজগুলি যদি সমস্তই বিদেশে চলিয়া যায়, তাহা হইলে কি আদর্শ দেখিয়া আমাদের শিল্পীরা কারিগরী শিখিবে? আমরা এই প্রবন্ধে যে নয়খানি শিল্পজাত দ্রব্যের চিত্র দিলাম, তাহার মধ্যে তিন খানি জর্ম্মানির বার্লিননগর হইতে প্রকাশিত ভারতবর্ষীয় শিল্পবিষয়ক গ্রন্থে প্রথম মুদ্রিত হয়। জিনিষগুলিও বার্লিনেই আছে। বাকী ছয় খানি ছবির মূল জিনিষগুলি বিলাতে সৌথ কেন্‌সিংটন কৌতুকাগারে আছে। অজন্টাগুহাচিত্রাবলীর নকলগুলিও বিলাতের কৃষ্ট্যাল প্যালেস প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়। তাহার পর সেগুলি প্রায় সমস্তই ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে আগুনে পুড়িয়া গিয়াছে। তাহাদের কোন নকল বা ফোটোগ্রাফ নাই। এই চিত্রসমূহ যাহার নকল, গুহার সেই মূল ছবিগুলিও লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাহার পর আবার যে ছবিগুলির নকল প্রস্তুত হইয়াছে, সেগুলিও বিলাতে চালান হইয়াছে। আমরা শিখিবই বা কি দেখিয়া, এ বিষয়ে আমাদের জাতীয় আত্মশ্রদ্ধাই বা কি দেখিয়া সজীব থাকিবে? বিদেশী লোকেরা নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমাদের অনেক ভাল ভাল

জিনিষই স্বদেশে লইয়া গিয়াছে ও যাইতেছে।

নানা প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও এখন আবার আমাদের শিল্পশিক্ষার দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে। বহু শতাব্দী ধরিয়া উচ্চশ্রেণীর লোকেরা শিল্প হইতে দূরে থাকায় ভারতীয় শিল্পের উন্নতি না হইয়া বরং অবনতি হইয়াছে। এখন উচ্চশ্রেণীর লোকেরাও স্বদেশে এবং ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মানী, জাপান প্রভৃতি দেশে শিল্প শিক্ষা করিতেছেন। ইতিমধ্যেই কেহ কেহ যশস্বী হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বসাধারণে বিখ্যাত চিত্রকর রবিবর্ম্মাকেই বেশী জানেন। রবিবর্ম্মা ক্ষত্রিয়। মারাঠা ভাস্কর ম্মাত্রেও ক্ষত্রিয়। ইনি প্রায় চারি বৎসর পূর্ব্বে দেবমন্দির-পথ-বর্ত্তিনী মারাঠা যুবতীর মূর্ত্তি গড়িয়া যশস্বী হন। আমার সম্পাদনাকালে "প্রদীপে" সেই মূর্ত্তির ছবি প্রকাশিত হইয়াছিল। এখন ম্মাত্রের বয়স প্রায় ২৫ বৎসর। তিনি গত বৎসর পারিস প্রদর্শনীতে একটি সরস্বতীমূর্ত্তি পাঠাইয়াছিলেন। তথায় উহা সসম্মান উল্লেখের প্রশংসাপত্র এবং ব্রঞ্জ্ পদক দ্বারা পুরস্কৃত হইয়াছে। প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষেরা উহা তথায় বিক্রয় না করিয়া ম্মাত্রে মহাশয়কে ফেরত দেন। কিন্তু ভাল করিয়া প্যাক না করায় মূর্ত্তিখানি সম্পূর্ণ ভগ্নাবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছে। ম্মাত্রে আমাকে লিখিয়াছেন, যে, ইহাতে তাঁহার সহস্রাধিক মুদ্রা লোকসান হইযাছে। এই মূর্ত্তির একখানি ছবি দেওয়া গেল। ম্মাত্রে লিখিয়াছেন, ইহা ইতিপূর্ব্বে কোন ইংরাজী বা বাঙ্গালা কাগজে মুদ্রিত হয় নাই। ম্মাত্রে মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উহার ফোটোগ্রাফ আমাকে পাঠাইয়া না দিলে আমি উহার অস্তিত্বের বিষয়ও অবগত হইতে পারিতাম না। আমি এই জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। বোম্বাইয়ে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মূর্ত্তিতে কোন দুর্বৃত্ত কাল রং মাখাইয়া দেয়। দেশী বিদেশী অনেক রাসায়নিক দাগ উঠাইবার চেষ্টা করিয়া বিফলগ্রস্ত হন। সর্ব্বশেষে অধ্যাপক গজ্জর দাগ তুলিয়া দেন। বোম্বাইয়ে নিজ রাসায়নিক গবেষণাগারে এই স্বনামখ্যাত অধ্যাপক গজ্জর ম্মাত্রেকে একটি বিস্তৃত কক্ষ দিয়াছেন, এবং তাঁহার জন্য ফরমাইস্ সংগ্রহ করিতেছেন। ম্মাত্রের শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহাকে ইউরোপে পাঠাইবারও চেষ্টা হইতেছে। ম্মাত্রে-নির্ম্মিত এই সুঠাম মনোজ্ঞ মূর্ত্তিটির সমালোচনা করি বা তাহার সৌন্দর্য্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝাইয়া দি, এরূপ ক্ষমতা আমার নাই। সৌন্দর্য্যসৃষ্টি যে কত কঠিন রচনা, তাহা সহজেই বুঝা যায়। খুঁত ধরা সহজ, কিন্তু রচনা করা কঠিন। আমরা চিরপরিচিত সুন্দর মুখও কল্পনার তুলি দিয়া মানসপটে পরিষ্কার করিয়া আঁকিতে পারি না। যে বন্ধু, আত্মীয় বা আত্মীয়া নিকটে নাই, তাঁহার মুখচ্ছবিও স্পষ্ট মনে পড়ে না। সুতরাং একটি সুন্দরী মানসী মূর্ত্তি আপাদমস্তক মনোমধ্যে গঠিত করিয়া তাহাকে নিখুঁত বাহ্য জড়রূপ দেওয়া যে কত কঠিন, তাহা অনুমান করা দুষ্কর নহে।

ম্মাত্রের সরস্বতীমূর্ত্তিতে ময়ূরের সমাবেশ দৃষ্ট হইবে। রবিবর্ম্মার সরস্বতীচিত্রেও ময়ূর আছে। দক্ষিণ-ভারতে লোকে ময়ূরকেই সরস্বতীর বাহন মনে করে।

আমাদের মূল বক্তব্য বিষয় হইতে দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। আমরা বলিতেছিলাম যে উচ্চশ্রেণীর লোকদের শিল্পশিক্ষায় মনোনিবেশ একটা সুলক্ষণ। কারণ, তাহা হইলে শিল্পে আবার ভারতীয় প্রতিভা স্ফূর্তি পাইবে। ইহার মধ্যে আরও একটি আশার বীজ নিহিত আছে। সকলেই জানেন, আমরা কংগ্রেসে এক জাতি বলিয়া বক্তৃতা করিলেও, আমাদের প্রাদেশিক ঈর্ষা বিদ্বেষ অবজ্ঞা

যথেষ্ট আছে। প্রাদেশিকই বা বলি কেন? বাঙ্গালী বেহারীকে ছাতুখোর বলেনই, কলিকাতাবাসীর চক্ষে আর সকল বাঙ্গালীই বাঙ্গাল;—এবং কে না জানে যে, "বাঙ্গাল মনুষ্য নয়?" যত দিন আমরা পরস্পরকে না জানিব, না চিনিব, এবং জানিয়া চিনিয়া শ্রদ্ধা করিতে না শিখিব, তত দিন জাতীয়তা কেবল কথার কথা মাত্র। জানিবার চিনিবার শ্রেষ্ঠ উপায় ঘনিষ্ঠ ভাবে মিলা মিশা। কিন্তু ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশবাসীর কয়জনের এরূপ মিশিবার সুযোগ আছে? সুতরাং সাহিত্যের আশ্রয় লইতে হয়। যে বাঙ্গালী তুলসীকৃত রামায়ণ পড়িবে, বুঝিবে, সে আর হিন্দুস্থানীকে অবজ্ঞা করিতে পারিবে না। যে হিন্দুস্থানী বা মারাঠা আমাদের মধুসূদন, বঙ্কিম প্রভৃতি রচনার রসাস্বাদন করিবে, সে আর আমাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে পারিবে না। যে চিন্তামণি বা কুরাল পড়িবে, সে আর মান্দ্রাজীকে জাম্বুবান মনে করিতে পারিবে না। কিন্তু এতগুলি ভাষা শিখিয়া সাহিত্যচর্চ্চা করিবার অবকাশ, ক্ষমতা বা প্রবৃত্তি কয়জনের আছে? কেহ বলিতে পারেন, কেন, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই শিক্ষিত লোকে ইংরাজী লিখিতেছেন, তাঁহাদের ইংরাজী লেখা পড়িয়া তাঁহাদিগকে চিনিয়া ফেল। সত্য, কিন্তু এই সকল ইংরাজী লেখায় ভারতের কোন প্রদেশের জনসাধারণের প্রাকৃত জীবনের ও স্বভাবের ছবি পাওয়া যাইবে? এই জন্য শিল্পসৌন্দর্য্যকে জাতীয় একতা পরিবর্দ্ধনের আমরা একটি শ্রেষ্ঠ বাহন মনে করি। সৌন্দর্য্যতত্ত্ব বুঝাইতে অল্প লোকেই পারেন, কিন্তু নিরক্ষর লোকেও সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পারে। এই জন্য, যে দিন বঙ্কিমচন্দ্রকে একজন মারাঠা "আমাদের বঙ্কিম" বলিবে, সে দিন কখনও না আসিতে পারে, আসিলেও হয় ত তাহা সুদূর ভবিষ্যদ্‌গর্ভে নিহিত; কিন্তু ইতিমধ্যেই সৌন্দর্য্যরসিক বাঙ্গালী রবিবর্ম্মাকে আপনার লোক বলিয়া মনে করিতেছেন। সেই সঙ্গে দাক্ষিণাত্যবাসী আমাদের চক্ষে গৌরবান্বিত হইয়া আসিতেছেন। এই আত্মীয়তার অনুভূতি আমাদের বিবেচনায় কংগ্রেস্-মণ্ডপে পঞ্জাবী-হিন্দুস্থানী-বাঙ্গালী-মান্দ্রাজী-মারাঠা কণ্ঠ হইতে যুগৎ উচ্চারিত হুর্‌রে-নিনাদ অপেক্ষা কম মূল্যবান্ নহে।

[প্রবন্ধমধ্যে *প্রদত্ত চিত্রগুলি* বাদ দেওয়া হয়েছে—সংকলন-সম্পাদক]

১৩৩৫ ফাল্গুন
অজণ্টার গুহাচিত্রাবলী

আটাশ বৎসর পূর্ব্বে বাংলা কাগজের মধ্যে প্রথমে অজণ্টা সম্বন্ধে একটি সচিত্র প্রবন্ধ প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়। অজণ্টার গুহাবলী সম্বন্ধে গ্রিফিথ্ সাহেবের লেখা যে দুই খণ্ড বৃহৎ সচিত্র পুস্তক আছে, তাহা হইতে আমাদের প্রবন্ধের উপাদান সংগৃহীত হইয়াছিল। তাহাতে প্রকাশিত রঙীন ছবিগুলি গ্রিফিথের ছাত্র কয়েকজন চিত্রকরের নকলের প্রতিলিপি। তাহার পর লেডী হেরিংহাম নন্দলাল বসু প্রমুখ চিত্রকরদিগের সাহায্যে কৃত কতকগুলি নকলের প্রতিলিপি ছাপেন। উভয় গ্রন্থই মূল্যবান্। কিন্তু হাতের নকলে নকলকর্ত্তার নিজের বিশেষত্ব অল্পস্বল্প আসিয়া পড়ে। এইজন্য যান্ত্রিক উপায়ে নকল প্রস্তুত করাইবার কথা উঠে।

কালক্রমে ও মানুষের ইচ্ছাকৃত অন্যায় আচরণে অজণ্টাগুহার চিত্রাবলীর অনেকগুলি একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অপর কতকগুলি ক্ষতিগ্রস্ত ও বিকৃত হইয়াছে। বাকী কতকগুলি মোটের উপর ভাল অবস্থায় আছে। সেইগুলি যথাসম্ভব আদিম অবস্থায় পরিণত করিয়া ও মেরামত করিয়া রক্ষা করিবার নিমিত্ত হায়দরাবাদের মহিমান্বিত নিজাম মহোদয় বহু ব্যয়ে ইতালী হইতে চিত্রসংরক্ষণ-কার্য্যে দক্ষ লোক আনাইয়া আবশ্যকমত মেরামত আদি করাইয়াছেন। অজণ্টার গুহাবলী তাঁহারই রাজ্যে স্থিত। তিনি আর একটি অতীব প্রয়োজনীয় কাজ করাইতেছেন। যত চেষ্টাই করা যাক্, কালের ধ্বংসশক্তিকে সম্পূর্ণ প্রতিহত করা মানুষের অসাধ্য। এইজন্য অজণ্টার চিত্রাবলী এখনও যেরূপ আছে, তাহার প্রতিলিপি মুদ্রিত করিয়া রাখিলে অনেক শতাব্দী পরের মানুষও তাহার সম্বন্ধে কিছু ধারণা করিতে পারিবে, নতুবা পারিবে না। পূর্ব্বে যে যান্ত্রিক উপায়ের কথা বলিয়াছি, সেই উপায়ে নিজাম বাহাদুরের ব্যয়ে এইরূপ প্রতিলিপি প্রস্তুত হইয়াছে। যান্ত্রিক উপায়টি হইতেছে রঙীন ফোটোগ্রাফী। ইহার দ্বারা রেখাঙ্কন ত মূল চিত্রের অনুরূপ হইয়াছেই, রংও যথাসম্ভব মূলের অনুরূপ হইয়াছে। ইউরোপ হইতে একজন সুদক্ষ লোক আনাইয়া এই কাজ করান হইয়াছে। তাহার পর এইসকল ছবি হইতে ব্লক প্রস্তুত করাইয়া বৃহৎ পুস্তকের আকারে প্রকাশিত করা হইতেছে। হায়দরাবাদের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের ডিরেক্টর য়াজদানী সাহেবের তত্ত্বাবধানে এই কাজ হইতেছে। মুদ্রাঙ্কণাদি বিলাতেও হইতেছে। ভূমিকা লিখিয়াছেন চিত্রালোচনায় দক্ষ মিঃ লরেন্স বিনিয়ন। চিত্রগুলির বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন য়াজদানী সাহেব। এই বৃহৎ গ্রন্থ চারিখণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে। প্রত্যেক খণ্ডে ১৬টি রঙীন এবং ২৪টি একরঙা চিত্র থাকিবে। কাগজ খুব মজবুত ও সরেস। প্রত্যেক খণ্ডের দাম এখন ৮ গিনি অর্থাৎ প্রায় ১২০ টাকা করিয়া, প্রকাশের পর দশ গিনি করিয়া হইবে। আমাদের নিকট একখানি রঙীন ও একখানি একরঙা ছবির নমুনা এবং লেখার নমুনা আসিয়াছে। তাহা হইতে উপরিলিখিত বৃত্তান্ত সঙ্কলিত হইল।

১৩২৯ আষাঢ়

সিত্তন্নবসল গুহা-মন্দিরের চিত্রাবলী

অজন্টাগুহার চিত্রাবলী বহু বৎসর হইতে জনসমাজে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। ছবিগুলির নকল ও তাহার সম্বন্ধে বহিও প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার পর মধ্য ভারতে রামগড় গুহার ছবি জানা পড়ে। তাহারও কিছু কিছু নকল করা হইয়াছে। অতঃপর গ্বালিয়র রাজ্যের বাঘগুহার চিত্রাবলীর নকল শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু, শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর করেন। কিছু দিন হইল, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর পুডুক্কোট্টাইর নিকটবর্ত্তী সিত্তন্নবসল নামক স্থানের মন্দিরে কতকগুলি চিত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই মন্দির পাহাড়ের পাথর কাটিয়া নির্ম্মিত। ইহাকে গুহা-মন্দির বলা যাইতে পারে। পণ্ডিচেরির ফরাসী অধ্যাপক দুব্রেই বলেন, তথাকার চিত্রগুলি অজন্টাগুহাচিত্রাবলীর মত প্রক্রিয়া অনুসারে অঙ্কিত হইয়াছিল। মন্দিরের ছাদের ভিতরের পিঠ, স্তম্ভ, প্রাচীরের ভিতরের দিক্, প্রভৃতির উপর ছবিগুলি অঙ্কিত। অনেক ছবি নষ্ট হইয়াছে। যেগুলি এখনও অবশিষ্ট আছে, তাহার মধ্যে একটি কমল-সরোবরের দৃশ্য প্রধান। তাহাতে পদ্মফুল ছাড়া মৎস্য, হংস, মহিষ, হস্তী ও তিনটি মানুষের ছবি আছে। কমল-সরোবরের চিত্র নানা বর্ণে রঞ্জিত। ফরাসী অধ্যাপক চিত্রকর নহেন বলিয়া তাহার প্রতিলিপি লইতে পারেন নাই। একটি স্তম্ভের গায়ের এক নৃত্যরতা নারীমূর্ত্তির কিয়দংশের রেখাচিত্র মাত্র তিনি প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন। তাহার নকল আমরা ছাপিলাম।

[ছবি বাদ দেওয়া হয়েছে—সংকলন-সম্পাদক]

রবিবর্মা-প্রসঙ্গ

১৩০৮ অগ্রহায়ণ-পৌষ

রাজা রবিবর্ম্মা।

সুবিখ্যাত চিত্রকর রাজা রবিবর্ম্মা ত্রিবাঙ্কোড়ের একটী প্রাচীন সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভূত। পুরুষানুক্রমে তাঁহাদের পরিবারের সহিত ত্রিবাঙ্কোড়ের রাজপরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ চলিয়া আসিতেছে। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ত্রিবান্দ্রাম্ সহরের নিকটবর্ত্তী কিলিমানুর নামক গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা বিপদের সময় যুদ্ধে ত্রিবাঙ্কোড়ের মহারাজের সাহায্য করিয়া এই বিস্তৃত গ্রাম নিষ্কর জায়গীর স্বরূপ প্রাপ্ত হন। তদবধি রবিবর্ম্মার পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ এই সম্পত্তি ভোগ করিয়া আসিতেছেন। "পূর্ব্বপুরুষ," "পরিবার," প্রভৃতি কথা এই প্রবন্ধে ত্রিবাঙ্কোড়ে প্রচলিত অর্থে বুঝিতে হইবে। তথায় ভাগিনেয় মাতুলের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া থাকে, পুত্র পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নহে। সুতরাং পূর্ব্বপুরুষ বলিতে মাতুলের মাতুল, তস্য মাতুল ইত্যাদি, এইরূপ বুঝিতে হইবে। পরিবার বলিতে মাতুল, তাঁহার ভগিনী, ভগিনীর সন্তান, ইত্যাদি বুঝিতে হইবে। পরিবার বা বাড়ীর কর্ত্তা বলিলে মাতুলের উল্লেখ করা হইতেছে, এইরূপ বুঝিতে হইবে।

রবিবর্ম্মারা তিন ভাই ও এক ভগিনী। রবিবর্ম্মা সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। ইঁহারা ভাই বোন সকলেই স্বভাবশিল্পী। ইঁহাদের মাতা উমা অম্বা বাঈ একজন সুশিক্ষিতা ও মার্জ্জিত-স্বভাবা মহিলা ছিলেন। তিনি কবিতা লিখিয়া ত্রিবাঙ্কোড় অঞ্চলে কবিযশ লাভ করিয়াছিলেন। রবিবর্ম্মার বাল্যকালে ত্রিবাঙ্কোড়ে ইংরাজী শিক্ষার চলন ছিল না। তাৎকালিক রীতি অনুসারে তিনি স্বপরিবারের সংস্কৃত-শিক্ষকের নিকট ব্যাকরণ শিখিয়া রামায়ণ-মহাভারতাদি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বাল্যে ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি লাভ করা অপেক্ষা নিজ প্রাসাদের দেওয়ালে ও মেঝেয় খড়ি বা কয়লা দিয়া দেবদেবীর মূর্ত্তি আঁকিতেই বেশী ভালবাসিতেন। শিল্পীবিষয়িনী প্রতিভার এবম্বিধ বাল্য অভিব্যক্তি তাঁহার পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক সকলেই একটা অসহ্য বিরক্তিজনক ব্যাপার মনে করিতেন। কেবল বাড়ীর কর্ত্তা তাঁহার মাতুল রাজা রাজবর্ম্মা সেরূপ মনে করিতেন না। রাজবর্ম্মা অসামান্যপ্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার বিবিধ গুণের মধ্যে চিত্রাঙ্কনৈপুণ্য অন্যতম ছিল। তিনি নিজ চিত্তবিনোদনার্থ চিত্র আঁকিতেন, এবং তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণশক্তির সাহায্যে, যাহা কিছু আঁকিতেন, সমস্তই জীবন্ত ও সত্যানুরূপ করিয়া তুলিতেন। রাজবর্ম্মা ভাগিনেয়ের ক্রমবর্দ্ধনশীল চিত্রাঙ্কনানুরাগ দেখিয়া অতিশয় প্রীতিলাভ করিতেন, এবং সেই অনুরাগ বদ্ধমূল করিবার জন্য তাঁহাকে যথাসাধ্য উৎসাহ দিতেন। রবিবর্ম্মা রেখাঙ্কনে (drawing) অনেকদূর অগ্রসর হইলে পর তাঁহার মাতুল তাঁহাকে জলমিশ্রিত বর্ণে (water colours) চিত্র আঁকিতে শিক্ষা দেন। তৎকালে ভারতবর্ষের সেই সুদূর প্রদেশে ইউরোপীয় রং ও তুলি পাওয়া যাইত না। রাজা রাজবর্ম্মা নিজেই সমুদয় প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিতেন। এখানে ইহাও উল্লেখ করা উচিত যে তিনি জীবনের শেষভাগ নানাবিধ রং আবিষ্কার ও প্রস্তুতকরণ কার্য্যে যাপন করেন, এবং এই কার্য্যে সফলপ্রযত্নও হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার

পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তাঁহার পরীক্ষার বিষয়গুলিতে ব্যাপৃত থাকিবার লোক না থাকায় তাঁহার মৃত্যুর সহিত তাঁহার কার্য্যেরও অবসান হইয়াছে। কারণ রবিবর্ম্মা প্রাপ্তবয়স্ক ও শিল্পনিপুণ হইতে না হইতেই ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সহরে বিলাতী চিত্রাঙ্কনের উপাদান ও সাধনসামগ্রী প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইতে লাগিল।

ত্রয়োদশবর্ষ বয়সে রবিবর্ম্মা মাতুলের সহিত ত্রিবাঙ্কোড়েব রাজধানী ত্রিবান্দ্রাম্ গমন করেন। মাতুলমহাশয় রবিবর্ম্মার অঙ্কিত কয়েকখানি ছবি তদানীন্তন মহারাজকে উপহার দেন। মহারাজ এই উপঢৌকন পাইয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হন। সে সময়ে চিত্রবিদ্যা ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত লোকের পক্ষে অপমানকর বৃত্তি বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত মহারাজ সাধারণমতাবলম্বী ছিলেন না। তিনি বালকের কার্য্যে তাহার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পূর্ব্বাভাস দেখিতে পাইলেন এবং রাজোচিত বদান্যতার সহিত তাহার পৃষ্ঠপোষক ও উৎসাহদাতা হইলেন।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ষোল বৎসর বয়সে রবিবর্ম্মা ত্রিবাঙ্কোড়ের পরলোকগতা জ্যেষ্ঠা রাণীর কনিষ্ঠা ভগিনীকে বিবাহ করেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ত্রিবাঙ্কোড়ে উত্তরাধিকারসূত্র মাতৃকুলাবলম্বী। সুতরাং ত্রিবাঙ্কোড়ের জ্যেষ্ঠা রাণী অর্থে মহারাজার ভগিনীদের মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠা তাঁহাকেই বুঝিতে হইবে। তাঁহার ভগিনীরাই জ্যেষ্ঠা রাণী, কনিষ্ঠা রাণী এইরূপ নামে অভিহিতা, এবং তাঁহারাই রাণীর সমুদয় সম্মান পাইয়া থাকেন, তাঁহাদের পুত্রেরাই সিংহাসনের অধিকারী। মহারাজের স্ত্রী পুত্রেরা পদমর্য্যাদা বা উত্তরাধিকার বিষয়ে গণনার মধ্যে আসেন না। বর্ত্তমান মহারাজের সহোদরা ভগিনী ছিল না। এইজন্য রাজ্যের উত্তরাধিকারী লাভার্থ তিনি দুইজন দত্তক ভগিনী লইয়াছিলেন। ইঁহারাই বড়রাণী ও ছোটরাণী। বড়রাণী নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান, ছোটরাণীর প্রায় আট বৎসর পূর্ব্বে মৃত্যু হয়। তাঁহার দুই পুত্র ছিল। ত্রিবাঙ্কোড়ের চলিত রীতি অনুসারে প্রথম পুত্রকে এলিয়া-রাজা বা যুবরাজ এবং দ্বিতীয়কে প্রথম রাজকুমার বলা হইত। বাঁচিয়া থাকিলে এলিয়া-রাজাই বর্ত্তমান মহারাজের পর মহারাজ হইতেন, কিন্তু সম্প্রতি উভয়েরই মৃত্যু হইয়াছে। এই কুমারদ্বয় রবিবর্ম্মার এক মাসতুতো ভাইএর ঔরস সন্তান ছিলেন। বংশপবম্পরাক্রমে রবিবর্ম্মার মাতুল তস্য মাতুল বা তাঁহাদের পরিবারের লোক, ত্রিবাঙ্কোড়ের মহারাজাদের জন্মদাতা পিতা। যাহা হউক, বর্ত্তমান মহারাজের উভয় ভাগিনেয়েরই মৃত্যু হওয়ায় ত্রিবাঙ্কোড়ের সিংহাসন উত্তরাধিকারিশূন্য হয়। লর্ড কার্জ্জনের অনুমত্যনুসারে কিছুদিন হইল রবিবর্ম্মার দুইটি দৌহিত্রী মহারাজকর্ত্তৃক বড়রাণী ও ছোটরাণীর পদে অভিষিক্তা হইয়াছেন। ইঁহারা উভয়েই বালিকা মাত্র। ইঁহারা প্রাপ্তবয়স্কা হইয়া পুত্রবতী হইলে ইঁহাদের কোন না কোন পুত্র বর্ত্তমান মহারাজের পর মহারাজ হইবেন।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে থিওডোর জানসেন (Theodore Jansen) নামক একজন ইংরাজ চিত্রকর ত্রিবাঙ্কোড় দরবারে উপস্থিত হন। তদানীন্তন মহারাজা নিজ এবং নিজ পরিবারের অন্যান্য সকল ব্যক্তির চিত্র আঁকাইবার জন্য এই শিল্পীকে আনাইয়াছিলেন। ইঁহার আগমনকাল হইতে রবিবর্ম্মার প্রতিভা নূতন পথে ধাবিত হইতে আরম্ভ হয়। জানসেন সাহেবের মেজাজটা গরম ছিল, এবং তিনি যখন চিত্র আঁকিতেন, তখন কাহাকেও নিকটে থাকিতে দিতেন না। কিন্তু মহারাজের সদয় মধ্যস্থতায় রবিবর্ম্মা তাঁহার কাজ লক্ষ্য করিবাব সুযোগ পাইয়াছিলেন।

তৈলবর্ণের সাহায্যে যে কিরূপ চমৎকার ফল পাওয়া যায়, রবিবর্ম্মা তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, এবং অতঃপর তৈল-চিত্রকর হইতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। তিনি তৈল-চিত্র আঁকিবার সমুদয় সরঞ্জাম আনাইলেন এবং জানসেনের চিত্রগুলিকে আদর্শ করিয়া প্রাণ দিয়া খাটিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি মহারাজা ও মহারাণীর ছবি আঁকিলেন, এবং কয়েকটী কল্পনাপ্রসূত চিত্রও আঁকিলেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজের তদানীন্তন গবর্ণর লর্ড হোবার্টের উৎসাহে মান্দ্রাজে একটি ললিতকলা-প্রদর্শনী হয়। ত্রিবাঙ্কোড়ের মহারাজা তত্রত্য বৃটিশ রেসিডেন্টের ইচ্ছানুসারে রবিবর্ম্মার দুটি চিত্র এই প্রদর্শনীতে প্রদর্শনার্থ প্রেরণ করেন। শিল্পী নিজেও প্রদর্শনী দেখিতে যান। রবিবর্ম্মা একটি চিত্রের জন্য গবর্ণরপ্রদত্ত স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। চিত্রটির বিষয়, "একটি নেয়ার মহিলা মল্লিকাফুলের মালা দিয়া কবরী বিভূষিত করিতেছেন।" এই চিত্রটি দর্শকগণের এত ভাল লাগিয়াছিল, যে কিছুদিন ধরিয়া সহরের যেখানে সেখানে ইহার সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা চলিয়াছিল। লর্ড হোবার্ট রবিবর্ম্মাকে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। তিনি শিল্পীর চিত্রগুলির বিশেষ প্রশংসা করেন, এবং তাঁহাকে অধ্যবসায়বলে যশোলাভ করিতে উৎসাহিত করেন। রবিবর্ম্মা ত্রিবান্দ্রামে ফিরিয়া আসিলে পর মহারাজা মান্দ্রাজে তাঁহার কৃতকার্য্যতায় আনন্দ প্রকাশ করেন এবং তাঁহাকে উচ্চ সম্মান এবং বহু মূল্যবান্ উপহার প্রদান করেন। গবর্ণরের স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত এই চিত্রটি পরে ভীয়েনার আন্তর্জাতিক মহাপ্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়। তথা হইতে শিল্পী একখানি প্রশংসাপত্র ও পদক প্রাপ্ত হন। পরবৎসর, অর্থাৎ ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে, রবিবর্ম্মা মান্দ্রাজ শিল্প-প্রদর্শনীতে "এক তামিল মহিলা সরবৎ (একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র) বাজাইতেছেন," এতদ্বিষয়ক চিত্রের জন্য স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। যখন বর্ত্তমান ভারতসম্রাট যুবরাজরূপে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ভারত দর্শন করিতে আসেন, তখন ত্রিবাঙ্কোড়ের মহারাজা তাঁহাকে রবিবর্ম্মার কৃত উক্ত চিত্র ও আরও দুই খানি চিত্র উপহার দেন। যুবরাজ উক্ত চিত্রত্রয়ের প্রশংসা করেন এবং বলেন যে ইউরোপে শিক্ষালাভ করেন নাই এরূপ একজন শিল্পীর পক্ষে সে গুলি অতিশয় প্রশংসার্হ। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের মান্দ্রাজ প্রদর্শনীতে রবিবর্ম্মা "শকুন্তলা-পত্রলেখন" প্রেরণ করেন। পুনর্ব্বার রবিবর্ম্মা প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত হন এবং মান্দ্রাজের তদানীন্তন গবর্ণর ডিউক অব্ বকিংহাম উহা অবিলম্বে ক্রয় করেন। তৎকাল পর্য্যন্ত কোন ভারতবর্ষীয় শিল্পী প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে বর্ণিত নায়ক নায়িকা বা ঘটনাবলীর তৈলচিত্র প্রস্তুত করেন নাই। রবিবর্ম্মার সংস্কৃত শিক্ষা এখন তাঁহার কাজে লাগিল। তিনি সংস্কৃত সাহিত্য হইতে নিজ অভিরুচি অনুসারে চিত্রের বিষয় নির্ব্বাচন করিতে লাগিলেন। তিনি অতঃপর বাস্তব ব্যক্তিবিশেষের আলেখ্য (Portraits) এবং অন্যবিধ চিত্র, উভয় প্রকার চিত্রই আঁকিতে লাগিলেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে তিনি, মান্দ্রাজ গবর্ণমেন্ট হাউসে রক্ষিত হইবার জন্য ডিউক অব বকিংহামকে দেখিয়া তাঁহার একটি চিত্র আঁকিবার বরাত পাইলেন। এই ছবিখানি রবিবর্ম্মার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছবির মধ্যে একখানি। ইহার পার্শ্বে মান্দ্রাজ গবর্ণমেন্ট হাউসে নামজাদা ইউরোপীয় চিত্রকরগণের অঙ্কিত যে সকল ছবি টাঙ্গান আছে, তাহাদের সহিত তুলনায় ইহা ভাল বই মন্দ মনে হয় না। ডিউক অব্ বকিংহাম রবিবর্ম্মার ক্ষিপ্রকারিতায় বিশেষ চমৎকৃত হন, এবং একবার এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন যে যদিও তিনি (ডিউক্) একজন বিখ্যাত ইউরোপীয় চিত্রকরের

সম্মুখে আঠার আঠার বার বসিয়াছিলেন, তথাপি তিনি রবিবর্ম্মার চিত্রিত ছবির অর্দ্ধেক পবিমাণেও সত্যানুরূপ ছবি আঁকিতে সমর্থ হন নাই।

মান্দ্রাজ হইতে রবিবর্ম্মার প্রত্যাবর্ত্তনেব এক কি দুইমাস পরে ত্রিবাঙ্কোড়ের মহারাজার মৃত্যু হয়। তাঁহার পর তাঁহার ভ্রাতা মহারাজা হন। তিনি বর্ত্তমান মহারাজার অব্যবহিত পূর্ব্বে রাজত্ব করেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ বিদ্বান্ ও শিল্পানুরাগী ছিলেন। নূতন মহারাজের অভিলাষানুসারে রবিবর্ম্মা "সীতার পরীক্ষা" নামক বৃহৎ চিত্র অঙ্কিত করেন। এই চিত্রে, সীতার চরিত্রে দোষারোপ হওয়ায় তাঁহার জননী ধরিত্রী তাঁহাকে লইয়া অন্তর্হিত হইতেছেন, এই বিষয়টি অঙ্কিত হইয়াছে। বড়োদা রাজ্যের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী সর তাঞ্জোব মাধব রাও তখন ত্রিবাঙ্কোড় দেখিতে আসিয়াছিলেন। তিনি এই চিত্রটি দেখিয়া এতই প্রীত হন যে উহা মহারাজা গায়কোবাড়ের জন্য ক্রয় করেন এবং নিজের জন্য, একটি নেয়ার বালিকা বেহালায় সুর বাঁধিতেছে, রবিবর্ম্মাকৃত এতদ্বিষয়ক সুন্দর চিত্রখানি খরিদ করেন। মাধবরাও শেষোক্ত চিত্রটি ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের পুনা শিল্পপ্রদর্শনীতে প্রদর্শন করেন। গায়কোবাড়ের স্বর্ণপদক এই চিত্রটির জন্য প্রদত্ত হয় এবং ইহার প্রতি অনেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। বোম্বাইএর গবর্ণর সর্ জেম্স্ ফর্গুসন এই ছবিটি দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হন, কিন্তু উহা সর্ টি মাধব রাওএর সম্পত্তি বলিয়া শিল্পীকে উহার একটি প্রতিলিপি আঁকিতে আদেশ করেন। রবিবর্ম্মা উহা আঁকিয়া স্বয়ং গবর্ণরকে উপহার দেন। সর্ জেম্স্ রবিবর্ম্মার শিল্পনৈপুণ্যের গুণগ্রাহিতার চিহ্নস্বরূপ তাঁহাকে ইংলণ্ডের রাজপরিবারের ফোটোগ্রাফ সমন্বিত একখানি বহুমূল্য এলবাম্ উপহার দেন।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে রবিবর্ম্মা নিজ কনিষ্ঠ ভ্রাতা সী রাজা রাজবর্ম্মাকে সঙ্গে লইয়া মহারাজা গায়কোবাড়ের অভিষেক উপলক্ষে তৎকর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া বড়োদা গমন করেন। বড়োদার দরবারে চারিমাস অবস্থিতিকালে তিনি গা॰ ্কোবাড় রাজপরিবারের সকলের চিত্র অঙ্কিত করেন। তিনি এই সময় রাজা সর্ টি মাধবরাও এবং বৃটিশ রেসিডেন্ট মেলভিল সাহেবেরও ছবি আঁকেন।* অতঃপর তিনি ভবনগরের মহারাজার আমন্ত্রণে তাঁহার রাজধানীতে গিয়া তাঁহার জন্য কতকগুলি ছবি আঁকিয়া দেন। ভবনগর হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি গুরুতর শোক পান। চিত্রবিদ্যায় তাঁহার বাল্যশিক্ষক তাঁহার ভক্তিভাজন মাতুল মহাশয়ের এই সময়ে মৃত্যু হয়। এই মহাত্মা জীবনের শেষভাগ পরম ভাগবতের ন্যায় যাপন করিয়াছিলেন। ইঁহার শিক্ষা ও উৎসাহ ব্যতিরেকে রবিবর্ম্মা রবিবর্ম্মা হইতে পারিতেন না।

ইহার পর রবিবর্ম্মা মহীশূরের ভূতপূর্ব্ব নৃপতি সর্ চমরাজেন্দ্র ওদায়ারের নিমন্ত্রণে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে মহীশূর যাত্রা করেন। ইনি সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যার একান্ত অনুরাগী ছিলেন। রবিবর্ম্মা তিনমাস মহীশূরে থাকিয়া মহারাজা ও তাঁহার সন্তানগণের আলেখ্য অঙ্কিত করেন। মহারাজা অন্যান্য উপহারের মধ্যে, শিল্পীকে, ত্রিবাঙ্কোড়ের অভিজাতবর্গের মধ্যে তাঁহার উচ্চ মর্য্যাদার উপযুক্ত সম্মান রক্ষার্থে, দুইটি সুন্দর হস্তী প্রদান করেন।

রবিবর্ম্মা কলিকাতার আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী এবং লণ্ডনের ভারতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রদর্শনীতে রৌপ্যপদক ও প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হন। এই সময় তাঁহার জননীদেবী দেহত্যাগ

---

* মেলভিল সাহেব মহ্লার রাও গায়কোবাড়ের নির্ব্বাসনের পর বড়োদার শাসনপ্রণালীর সংস্কার ও পুনর্গঠন কার্য্যে নেতৃত্ব করেন।

করেন। তিনি শোকাচ্ছন্নহৃদয়ে ব্রতাবলম্বী হইয়া কিলিমানুরস্থ নিজ প্রাসাদে একবৎসর কাল যাপন করেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে মহারাজা গায়কোবাড় নীলগিরি শৈলে গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত করিতে আগমন করেন। এই সময় তিনি রবিবর্ম্মাকে বড়োদাস্থিত নিজ নূতন প্রাসাদ ভূষিত করিবার জন্য একটি বৃহৎ ফরমাইশ দেন। তাহা রামায়ণ ও মহাভারতের চৌদ্দটি সুনির্ব্বাচিত দৃশ্যের চিত্রাঙ্কন। এই গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে রবিবর্ম্মা উত্তর ভারতবর্ষে ভ্রমণ করা আবশ্যক মনে করেন। উদ্দেশ্য, প্রাচীন প্রস্তরমূর্ত্তি বা চিত্রাদি হইতে হিন্দু রাজা ও রাণীগণের পরিচ্ছদের সম্যগনুশীলন। কিন্তু তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হয় নাই। বহুশতাব্দীব্যাপী মুসলমান প্রাধান্যকালে তাঁহার উদ্দেশ্যসম্পৃক্ত খাঁটী হিন্দু যাহা কিছু ছিল, সমুদয়ই উত্তর ভারতবর্ষ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। ভারতবর্ষের প্রত্যেক জাতি, উপ-জাতি এবং, কোন কোন প্রদেশে, প্রত্যেক বর্ণের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার আছে। এইজন্য রবিবর্ম্মা বুঝিতে পারেন যে সকল শ্রেণীর লোককে সমভাবে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে এরূপ একটি সাধারণ পরিচ্ছদ আবিষ্কার করা বড় কঠিন। উত্তর ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিতে আসিয়া রবিবর্ম্মা মালব, রাজপুতানা, দিল্লী, আগ্রা, লাহোর, বারাণসী, এলাহাবাদ, কলিকাতা, ও অন্যান্য স্থান দর্শন করেন। কলিকাতায় তিনি বিজয়নগরমের ভূতপূর্ব্ব মহারাজার অতিথি ছিলেন। মহারাজা রবিবর্ম্মার একজন 'ভক্ত' বন্ধু ছিলেন।

উত্তর ভারত ভ্রমণ পরিসমাপ্তির পর রবিবর্ম্মা গৃহে প্রত্যাগত হইয়া গায়কোবাড়ের ফরমাইশী কাজে হাত দেন, এবং দুই বৎসরের মধ্যে ছবি চৌদ্দখানি সমাপ্ত করিয়া ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের শেষে তৎসমুদয় সঙ্গে লইয়া বড়োদা গমন করেন। চিত্রগুলি কয়েকদিনের জন্য প্রকাশ্যস্থানে প্রদর্শিত হয়। তাহা দেখিবার জন্য বোম্বাই প্রেসিডেন্সির সকল দিক হইতে দলে দলে লোকের সমাগম হয়। কিছুদিন বড়োদায় একটা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। কারণ, ভারতের শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যদ্বয় হইতে বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া এই সর্ব্বপ্রথম কেম্বিসের উপর এরূপ জীবিতবৎ ও হৃদয়স্পর্শী তৈলচিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের নানাপ্রদেশে এইসকল চিত্রের হাজার হাজার ফোটোগ্রাফ বিক্রীত হইয়াছিল। এই ছবিগুলি সর্ব্বসাধারণের এইরূপ প্রীতিলাভ করায় রবিবর্ম্মা নিজব্যয়ে বোম্বাইএ একটি লিথোগ্রাফিক মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। উদ্দেশ্য, স্বকীয় চিত্রগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকারে নানা বর্ণে মুদ্রিত করিয়া, তৎসমুদয়কে সাধারণ জনগণের সুপ্রাপ্য করা। এই প্রকারে তিনি তাঁহার স্বজাতীয় লোকদিগের মনে শিল্পানুরাগ জন্মাইতে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে তাহাদের সুপরিচিত পৌরাণিক ও ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় বিষয়ের চিত্র যেমন তাহাদের হৃদয় স্পর্শ করিবে, এমন আর কিছুতে পারিবে না। তাঁহার এই উদ্যম আশাতীত সফলতা লাভ করিয়াছে। আজ হিমালয় হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র গৃহে গৃহে তাঁহার চিত্র সকল সাদরে রক্ষিত হইতেছে এবং ছোট বড় সকল শ্রেণীর লোকের নিকট সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছে। এই প্রেস হইতে রবিবর্ম্মার প্রায় একশত ছবি নানাবর্ণে মুদ্রিত হইয়াছে। তাঁহার অনেক উৎকৃষ্ট চিত্রের ফোটোগ্রাফ লওয়া বা লিথোগ্রাফ করা সুসাধ্য না হওয়ায় এখনও তৎসমুদয়ের প্রতিলিপি সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তাঁহার যে সকল ছবি বাজারে কিনিতে পাওয়া যায় সেগুলি সর্ব্বোৎকৃষ্ট নহে। তাঁহার অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ ছবি

গত হইয়া ত্রিবাঙ্কোড়ের বাহিরে চলিয়া যাওয়ায় আর তাহাদেব ফোটোগ্রাফ পাইবারও উপায় নাই। তাঁহার আধুনিক অনেক শ্রেষ্ঠ ছবিব এ পর্য্যন্ত কোন প্রতিলিপি মুদ্রিত হয় নাই। নানা বর্ণে বঞ্জিত চিত্রের ফোটোগ্রাফ হইতে মূল চিত্রের সৌন্দর্য্যেব আভাস মাত্র পাওয়া যায়। তাহা হইতে শিল্পীর প্রতিভার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায় না। আমরা বর্ত্তমান সংখ্যায় রবিবর্ম্মার কয়েকখানি আলেখ্য হইতে হাফ্‌টোন ছবি প্রস্তুত করাইয়া প্রকাশ করিলাম। "বিরাট রাজার সভায় দ্রৌপদী" নামক চিত্রখানি এখন ত্রিবাঙ্কোড়ের মহারাজার সম্পত্তি। শিল্পী মহাশয় উহা 'প্রবাসীর' জন্য ফোটোগ্রাফ করাইয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন। এই চিত্রে দ্রৌপদী, কীচক, ভীম, প্রভৃতিকে চিনিয়া লওয়া সহজ। "রাজা রুক্মাঙ্গাদ ও মোহিনী" নামক চিত্রখানির একটু সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত দেওয়া আবশ্যক। রুক্মাঙ্গাদের দুই রাণী। ছোটরাণী ভ্রষ্টা ও ক্রূর-প্রকৃতি। রাজা তাহার যে কোন প্রার্থনা পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন; সে একবার সুযোগ বুঝিয়া এই বর মাগিয়া বসিল যে তিনি হয় বড়রাণীর গর্ভজাত স্বীয় একমাত্র পুত্রকে বধ কবুন, নতুবা তাঁহার সম্মুখে স্থাপিত খাদ্য আহার করিয়া একাদশীর উপবাস ভঙ্গ করুন। রাজা সত্যসংকল্প ছিলেন। একাদশীর দিনে আহার কবাকেও তিনি মহাপাপ মনে করিতেন। তাঁহার পুত্র তাঁহাকে এই মহাপাপের ভাগী না হইয়া বরং নিজ মস্তকচ্ছেদ করিতে অনুরোধ করিতেছে। বড়রাণী এক বৃদ্ধা পরিচারিকার ক্রোড়ে মূর্চ্ছা গিয়াছেন। রাজা উভয় সঙ্কটে পড়িয়া তরবারিহস্তে উর্দ্ধনেত্রে ভগবানকে ডাকিতেছেন। মোহিনী পাষাণীর ন্যায় তাঁহাকে নিষ্ঠুরভাবে অঙ্গীকার পালনের জন্য জিদ করিতেছে। রাজপ্রাসাদস্থ দেবমন্দিরে এই মর্ম্মভেদী দৃশ্যের অভিনয় হইতেছে। 'দময়ন্তী ও হংস' চিত্রে দময়ন্তী হংসমুখে নলরাজার প্রেরিত প্রেমবার্ত্তা তদ্গতচিত্তে শুনিতেছেন। অবশিষ্ট চিত্রখানিতে কণ্বমুনির আশ্রমে শকুন্তলা দুষ্যন্তকে পত্র লিখিতেছেন। উভয় পার্শ্বে সখী প্রিয়ংবদা ও অনসূয়া আসীনা। অদূরে এক মৃগশিশু।

ভারতবর্ষীয় লোকদিগের জীবনব্যাপার সম্বন্ধীয় দশখানি চিত্র আঁকিয়া রবিবর্ম্মা ষিকাগো আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তিনি দুইটি পদক ও প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হন। আমেরিকার কয়েকখানি প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে এই চিত্রগুলি প্রশংসিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন শিল্পপ্রদর্শনীতে ছবি পাঠাইয়া রবিবর্ম্মা যে সকল পদক, মুদ্রা-পুরস্কার এবং সসম্মান উল্লেখ লাভ করিয়াছেন, তৎসমুদয়ের দীর্ঘ তালিকা দেওয়া সুসাধ্য নহে; ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে তিনি যেখানে যেখানে ছবি পাঠাইয়াছেন, সর্ব্বত্রই পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।

বোম্বাইএ ছাপাখানা স্থাপন করিবার পর হইতে তিনি বৎসরের কিয়দংশ ত্রিবাঙ্কোড়ে এবং কিয়দংশ বোম্বাইএ যাপন করেন। তিনি বোম্বাই ও মান্দ্রাজের অধিকাংশ বিখ্যাত ও রাজদত্তউপাধিধারী ব্যক্তিদের ছবি আঁকিয়াছেন। বর্ত্তমান বৎসরের প্রারম্ভে তিনি উদয়পুরের মহাবাণা কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হন। মহারাণা নিজের, এবং নিজ দরবারে রক্ষিত পুরাতন চিত্র হইতে সর্ব্বাপেক্ষা যশস্বী নিজ চারিজন পূর্ব্বপুরুষের চিত্র আঁকাইবার জন্য শিল্পীকে ডাকিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রাতঃস্মরণীয় স্বদেশপ্রেমিক রাজপুতানার গৌরবরবি বীরকুলারাধ্য মহারাণা প্রতাপসিংহ একজন। রবিবর্ম্মা উদয়পুরের মনোহর দৃশ্যে মোহিত হন। তাঁহার ভ্রাতা রাজা রাজবর্ম্মা অনেকগুলি দৃশ্যের সুন্দর আলেখ্য প্রস্তুত

করিয়াছেন। রবিবর্ম্মার এই কনিষ্ঠ সহোদর সম্বন্ধে কিছু না বলিলে শিল্পী মহোদয়ের এই সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত অঙ্গহীন থাকিয়া যাইবে। ইনি নিজ অগ্রজের নিত্যসহচর ও সহকারী। ইনিও অগ্রজের মত বাল্যকালেই সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যায় নিজ স্বাভাবিক ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিলেন, এবং ইংরাজী সাহিত্যাদির অনুশীলন হইতে যেটুকু অবকাশ করিয়া লইতে পারিতেন, তাহা সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যার অনুশীলনে নিয়োগ করিতেন। তিনি বেশ প্রতিভাশালী ছাত্র ছিলেন। তাঁহার সহপাঠীদের মধ্যে তিনি বরাবর প্রথমস্থান অধিকার করেন। পূর্ব্বোক্ত এলিয়া-রাজা ও প্রথম রাজকুমার তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। পঠদ্দশান্তে তিনি নিজ অগ্রজের বৃত্তি অবলম্বন করেন। রবিবর্ম্মা দেখিলেন যে একজন ইউরোপীয় শিল্পীর নিকট রং-ফলান প্রভৃতি সম্বন্ধে শিক্ষা পাইলে তিনি এবং তাঁহার ভ্রাতা উপকৃত হইবেন। এইজন্য তাঁহারা ফ্র্যাঙ্ক ব্রুক্স্ নামক একজন নব্যতন্ত্রের নিপুণ চিত্রকরকে শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া তাঁহার নিকট হইতে অনেক শিক্ষালাভ করেন। রবিবর্ম্মা প্রধানতঃ মানসী মূর্ত্তি চিত্রণে সিদ্ধহস্ত। তদীয় ইউরোপীয় শিক্ষকের পরিচালনায় তাঁহার ভ্রাতা রাজা রাজবর্ম্মার প্রাকৃতিক দৃশ্য ও বাস্তব মনুষ্যালেখ্য অঙ্কনে অসাধারণ ক্ষমতা বিকশিত হইয়াছে। তিনি মান্দ্রাজ ও বোম্বাই-এর শিল্প-প্রদর্শনীতে অনেকগুলি পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। উভয় ভ্রাতাই এই বলিয়া বড় দুঃখ করেন যে ত্রিবাঙ্কোড়ের কঠিন সামাজিক নিয়ম নিবন্ধন তাঁহারা ইউরোপীয় প্রধান প্রধান শিল্পকেন্দ্র পরিদর্শন ও তথায় গিয়া শিক্ষা লাভরূপ সুবিধা হইতে বঞ্চিত। কিয়ৎপরিমাণে এই অসুবিধার প্রতীকার করিবার জন্য তাঁহারা সুবিখ্যাত ইউরোপীয় গের প্রস্তুত বহুমূল্য অনেকচিত্র ক্রয় করিয়া কিলিমানুরে স্বীয় শিল্পাগার সুসজ্জিত করিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশে শিল্পের উন্নতি ও পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে ওয়াকীব্হাল থাকিবার জন্য তাঁহারা ইংরাজী ও ইউরোপীয় নানা ভাষায় প্রকাশিত অধিকাংশ শিল্পবিষয়ক সাময়িক পত্র লইয়া থাকেন।

ভারতবাসিগণের সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষা ও মানসিক উন্নতির পথে যাঁহারা পথপ্রদর্শক, তাঁহাদের মধ্যে রবিবর্ম্মাকে কোন্ স্থান দেওয়া উচিত; তাহা নির্ণয় করিবার ভার ভবিষ্যদ্বংশাবলীর উপর। আমরা তৎসম্বন্ধে কিছু বলিব না। ভারতে মহা মহা কবি, দার্শনিক, রাজনীতিজ্ঞ, স্থপতি ও সঙ্গীতবিশারদ অনেক জন্মিয়াছেন, কিন্তু এই বত্নপ্রসূ পুণ্যভূমির উপযুক্ত একজনও চিত্রকর জন্মগ্রহণ করেন নাই। রবিবর্ম্মা এই অভাব পূরণ করিয়াছেন কি না, আমরা বলিতে অসমর্থ। বস্তুতঃ অধুনাতন যুগে চিত্রবিদ্যারূপ মহতী কলার এরূপ অবনতি ও দুর্গতি হইয়াছিল যে ইহার পুনরুজ্জীবন অতিশয় মন্থরভাবে সম্পাদিত হইত, যদি রবিবর্ম্মা স্বকীয় প্রতিভাবলে ইহাকে সাধারণের সম্মুখে গৌরবান্বিত করিয়া না তুলিতেন। ভারতবর্ষীয় চিত্রবিদ্যার ইতিহাস যদি কখন লিখিত হয়, তাহা হইলে, নিশ্চয়ই তিনি আধুনিক যুগে ইহার জন্মদাতা বলিয়া পূজিত হইবেন।

রবিবর্ম্মা নম্র মৃদু এবং ধীর প্রকৃতির লোক। তিনি দয়ালু ও দানশীল। দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত লোকদের সাহায্য করিতে তিনি সর্ব্বদাই মুক্তহস্ত। তিনি যখন চিত্রাঙ্কন করেন না, বা চিত্রের বিষয় চিন্তনে ব্যাপৃত থাকেন না, তখন সর্ব্বদাই হয় ইংরাজী জ্ঞানবৃদ্ধির চেষ্টা করেন (কারণ তিনি অনেক অধিক বয়সে ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন), নতুবা কোন প্রিয় সংস্কৃত কাব্য

অধ্যয়ন করেন। তিনি যশোগর্ব্বিত নহেন। বরং তিনি মুক্তকণ্ঠে বলেন যে যতই তাঁহার জ্ঞান বাড়িতেছে ততই তিনি উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন, যে মানবচক্ষু হইতে লুক্কায়িত প্রকৃতির মহারহস্য সমূহের অতি অল্পই তাঁহার জ্ঞানগোচর হইয়াছে।

১৩০৮ মাঘ

[চিত্রালোচনা]

"সীতার পরীক্ষা" নামক চিত্রে সীতা, তাঁহার জননী ধরিত্রী, রাম, লক্ষ্মণ, কুশ, লব, মহর্ষি বাল্মীকি, ও অপর একজন ঋষির চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।

* * *

"দ্রৌপদী ও সিংহিকা" নামক চিত্রের বিষয় মালয়ালিম ভাষায় লিখিত একটী প্রাচীন নাটক হইতে গৃহীত। ক্রিমির নামক একজন রাক্ষস দ্রৌপদীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে হরণ করিয়া নিজ আলয়ে লইয়া যাইতে সংকল্প করে। এই উদ্দেশ্যে সে নিজ ভগ্নী সিংহিকাকে দ্রৌপদীর নিকট প্রেরণ করে। সিংহিকা সুন্দরী নারীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দ্রৌপদীকে বলে যে অরণ্য মধ্যে স্থিত দেবীমন্দিরে গিয়া যদি তিনি দেবীর পূজা করেন, তাহা হইলে তাঁহার সমুদয় দুঃখ দূর হইবে। সরলা দ্রৌপদী তাহার কথায় প্রতারিত হইয়া ক্রমেই গভীর হইতে গভীরতর অরণ্যে প্রবেশ করিতে থাকেন। অবশেষে যখন সন্ধ্যা হইয়া আসিল, তখনও কোন মন্দির দেখিতে না পাইয়া তাঁহার মনে ভয়মিশ্রিত সন্দেহের উদয় হয়। চিত্রে তাঁহাকে ভীত ও অগ্রসর হইতে অনিচ্ছুক এই ভাবে অঙ্কিত করা হইয়াছে। সিংহিকা তাঁহার অনিচ্ছা দেখিয়া এই সময়ে নিজমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া যায়। কিন্তু নকুল দ্রৌপদীর উদ্ধার সাধন করেন।

* * *

রবিবর্ম্মার অঙ্কিত এবারকার তৃতীয় ছবিখানির নাম "তদ্গতচিত্তা"। ইহাতে প্রেমাস্পদের সুখচিন্তানিমগ্না কোনও তরুণীর মূর্ত্তি চিত্রিত হইয়াছে।

১৩১০ কার্ত্তিক

অবনীন্দ্র বাবুর শাহ্‌জাহান।

[রবিবর্মা-লিখিত]

আশ্বিনের প্রবাসীতে অবনীন্দ্রবাবুর শাহ্‌জাহানের ছবি দেখিয়া রবিবর্ম্মা আমাদিগকে লিখিয়াছেন, "I regret I have not yet had the pleasure of seeing any of the original works of Mr. Tagore. I am sure they will be as beautiful in colour as they are in composition. The subject of the "Last days of Shahjahan" is full of poetry and pathos."

১৩১৩ কার্ত্তিক

স্বর্গীয় রাজা রবিবর্ম্মা।

আমরা সাতিশয় দুঃখের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি গত আশ্বিন মাসে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ চিত্রকর রাজা রবিবর্ম্মা ৫৮ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুদক্ষ চিত্রকর রাজা রাজবর্ম্মার মৃত্যু হয়। সেই শোক তিনি ভুলিতে পারেন নাই। তদবধি প্রায়ই তাঁহার অসুস্থতার সংবাদ পাইতাম। গত ২২শে আগষ্ট তিনি আমাদিগকে যে পত্র লেখেন, তাহা তাঁহার শেষ পত্র বলিয়া মুদ্রিত করিতেছি।

KILIMANUR,
22nd August, 1906

My Dear Sir,

Yours of the 4th instant duly to hand. I am sorry to note that I have not as yet acknowledged receipt of the Bengali primers you kindly sent me a few days back. But my health being for the last two months gradually worse, I was prevented from attending to anything else. Nor am I yet better. I am almost confined to bed owing to the frequent attacks of fever and the weakness therefrom. I hope you will therefore kindly excuse me for the delay in replying to your letters.

I send herein enclosed two photos taken out of some of my original paintings, which I hope you will find sufficient for the present.

Awaiting your reply on receipt of the photos,

I remain
Yours Sincerely
RAVI VARMA

এই পত্রে যে বাঙ্গালা বর্ণপরিচয়ের পুস্তকের উল্লেখ আছে, তাহা আমি তাঁহার অনুরোধ অনুসারে পাঠাইয়াছিলাম;—তিনি বাঙ্গালা অক্ষর চিনিবার ইচ্ছাপ্রকাশ করিয়াছিলেন। রবিবর্ম্মা অতি

সম্ভ্রান্তবংশীয় লোক। ত্রিবাঙ্কুরের জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা মহারাণী তাঁহার দৌহিত্রী। তাঁহার মত ভদ্রলোক অতি অল্পই দেখা যায়। আমাদের সহিত তাঁহার কখনও চাক্ষুষ পরিচয় হয় নাই। কিন্তু তিনি অনেক অপ্রকাশিত তৈলচিত্রের ফোটোগ্রাফ দিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন বাজারে তাঁহার যে সকল ছবি কিনিতে পাওয়া যায়, তৎসমুদয়ই "প্রবাসী"তে ছাপিতে তিনি অনুমতি দিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে আর কেহ এ অনুমতি পান নাই, তাহাও লিখিয়াছিলেন।

১৩০৮ সালের অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসের "প্রবাসী"তে তাঁহাব সচিত্র জীবনচরিত আছে। এই জন্য আমরা আর তাঁহার চিত্র বা জীবনচরিত দিলাম না। তাঁহার সচিত্র ইংরাজী জীবনচরিত এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেস প্রকাশিত করিয়াছেন।

তাঁহার চিত্রাঙ্কনরীতি পাশ্চাত্য, কিন্তু বিষয় সমস্তই দেশীয়। দক্ষিণ ভারতের নরনাবীর সৌন্দর্য্যের আদর্শ তাঁহার চিত্রাবলীতে সুপরিস্ফুট হইয়াছে। দরিদ্রের গৃহেও আজ তাঁহার পৌরাণিক চিত্রাবলী বিরাজিত তাঁহার চিত্রগুলি তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে।

তাঁহার পত্রে যে দুইখানি চিত্রের ফোটোগ্রাফের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে একখানি আশ্বিনের "প্রবাসী"তে ছাপা হইয়াছিল; অপরখানি এবার ছাপা হইল।

১৩১৩ পৌষ

স্বর্গীয় রবিবর্ম্মা।

[অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত

পরলোকগত প্রসিদ্ধ চিত্রকর রাজা রবিবর্ম্মার জীবনীসম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে তাঁহার সহিত যে পরিচয়টা থাকা উচিত, অদৃষ্টক্রমে আমার সেটা ঘটিয়া উঠে নাই। বহু বৎসর হইল, চিত্রবিদ্যায় আমি তখন একজন শিক্ষার্থী মাত্র, সেই সময়, একদিন এই জগদ্‌বিখ্যাত চিত্রকর আমাদের বাটীতে আসিয়াছিলেন, ঘরে না থাকায় আমার সহিত তাঁহার চাক্ষুষ পবিচয় ঘটে নাই। তিনি আমার তখনকার একখানা sketch দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "It is rather ambitions for the young man" অর্থাৎ ছোকরার সাহস ত কম নয়! এই তাঁহাব সহিত আমার প্রথম পরিচয় এবং সম্প্রতি বোম্বাই শিল্পপ্রদর্শনীতে দেশীয় ধরণের আমার কতকগুলি ছবি দেখিয়া আমার সবিশেষ পরিচয় লইতে আমারই কোন বন্ধুকে পত্র লেখেন। সেই তাঁহার সহিত আমার শেষ আলাপ। এতটুকু পরিচয়ে রবিবর্ম্মা মানুষটী কেমন ছিলেন বলা আমাব পক্ষে অসম্ভব। অতএব তাঁহার সহিত সবিশেষ পরিচিতের উপরে সে ভার দিয়া রবিবর্ম্মার শিল্প সম্বন্ধে দু'এক কথা বলিয়া ক্ষান্ত হওয়াই ঠিক।

১৮৪৮ খৃঃ অব্দে ২৯শে এপ্রিল ত্রিবাঙ্কুরের প্রাচীন রাজবংশে রবিবর্ম্মার জন্ম হয়। তের বৎসর বয়সে তিনি স্বলিখিত কতকগুলি চিত্র ত্রিবাঙ্কুররাজকে উপহার দেন। এবং সেই হইতে তাঁহার শিল্পশিক্ষার সুবন্দোবস্ত হয়। আজীবন তিনি শিল্পচর্চায় নিযুক্ত থাকিয়া দেশে বিদেশে যশস্বী হইয়াছেন,

বিজয়লক্ষ্মী কখন তাঁর প্রতি বিমুখী হন নাই! এইটুকু তাঁহার জীবনের ইতিহাস; কিন্তু এইটুকু জানিয়াই সন্তুষ্ট থাকিলে তাঁর প্রতি অবিচার করা হইবে। উদ্যোগী পুরুষমাত্রকেই লক্ষ্মী আপনা হইতে বরণ করেন; ইহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই। ত্রিবাঙ্কুর রাজের উদার মন, অগাধ ধন ছিল। তিনি বালক রবিবর্ম্মার সুশিক্ষার বন্দোবস্ত করিবেনই তো। রাজপুত্র কিম্বা লাটসাহেবের চোখে কোন ছবি সুন্দর ঠেকিলে চিত্রকরের ধনলাভের সম্ভাবনা, কিন্তু চিত্রখানির গৌরব যে কিছুমাত্র বাড়ে এরূপ তো মনে হয় না; অমর রহিবার ইচ্ছা সু, কু, সুরূপ কুরূপ সকল মানুষেরই সমান এবং রবিবর্ম্মার মত নিপুণ চিত্রকর পাইয়া ধনবান যে তাঁহার দ্বারা নিজেদের উপযুক্ত মূল্যে অমর করিয়া লইবে তাহা আর বিচিত্র কি? শিল্প-প্রদর্শনীর সুবর্ণ-পদক এবং খবরের-কাগজের গুণগান একের অভাবে অন্যকে আশ্রয় করে। ব্যক্তিগত এই সকল সৌভাগ্য সম্পদ যদি আমরা রবিবর্ম্মার সারাজীবনের ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করি, তবে আমরা তাঁর জীবনের কিছুই জানিলাম না, অথবা অতি নিঃসার অংশটুকুই গ্রহণ করিলাম বলিতে হইবে। আমাদের পুরাণ ইতিহাস হইতে রবিবর্ম্মা যত চিত্র লিখিয়াছেন এত আর কোন এদেশীয় চিত্রকর লিখিয়াছেন কিনা সন্দেহ; দেশীয় সাহিত্যে বিলক্ষণ দখল এবং একটু বিশেষ অনুরাগ না থাকিলে এটুকু হয় না। রবিবর্ম্মা যে একজন পাকা রসজ্ঞের মত আমাদের কাব্য ভাণ্ডারের যা কিছু উত্তম বাছিয়া লইয়াছিলেন এ কথা কেহই অস্বীকার করিবে না এবং এ কথাও ঠিক যে আজ রবিবর্ম্মার সুনাম যে জন্য, দু'দশটা সুবর্ণ পদক তাহার কারোর নয়, কিন্তু একমাত্র স্বদেশপ্রীতি ও স্বধর্ম্মে আস্থাই তাহার মূল কারণ হইতে পারে। চিত্রকরের স্বদেশীতা স্বধর্ম্মের আস্থার অর্থ দেশীয় কাব্য সাহিত্য চর্চ্চা করা, দেশীয় ভাবরসে মগ্ন থাকা ও দেশীয় প্রণালী মতে পূর্ব্বতন শিল্পাচার্যগণের প্রদর্শিত মার্গ অবলম্বন করিয়া দেশের শিল্পটাকে উন্নত করিতে চেষ্টা পাওয়া। রবিবর্ম্মার চিত্রগুলিতে আমরা এই জাতীয়তার আভাস পাই এবং সেই জন্যই সেগুলি আমাদের কাছে এত যত্নের সামগ্রী। নচেৎ বিলাতী প্রণালী মত Shade Light Perspective grouping of figures, Human anatomny প্রভৃতি আড়ম্বরসার কতক তৈলচিত্র লিখিয়া গেলে রবিবর্ম্মা কোনো হুবহু সাহেবের মত ইংরাজীবাগীশ কিম্বা বিলাতি গোরার মতো ক্রিকেটবাজের অপেক্ষা আমাদের কাছে যে অধিক সমাদর লাভ করিতেন এরূপ তো বোধ হয় না।

ভারতবর্ষে ইংরাজরাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে একটা নব্যতার স্রোত আমাদের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। নবতর সভ্যতা এবং ভব্যতার সঙ্গে আমাদের চিত্রশিল্পেও Style, Perspective, Shade and Light এবং Anatomy রূপ কতকগুলা নব্যতা আসিয়া আমাদের প্রাচীন শিল্পটাকে বে-দখল করিয়া বসিয়াছে এবং নব্যতার অনুকূল দলের কাছে আমাদের যা কিছু পুরাতন যেমন হেয়, নূতন প্রণালী মতে শিক্ষিত শিল্পীর নিকটেও তেমনি আমাদের চিত্রশিল্পটা একেবারে অগ্রাহ্য হইয়া পড়িয়াছে; ইটালিয়ান Style-এর ন্যায় ভারতবর্ষের চিত্রকলার যে একটা বিশেষত্ব আছে এবং Perspective ও Light Shade বাদ দিয়া ঠিক anatomical না হইয়াও কোন চিত্র যে চিত্র নামের যোগ্য হইতে পারে এ কথা নব্যদলের ধারণাতেই আসে না। এই নব্যতার এমনি মোহ যে জগৎশুদ্ধ ভারতশিল্পের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ, কেবল আমরা বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না যে ভারতের চিত্রকলা—সে perspective-এর কোন ধার ধারে না Shade Lightএর দিক দিয়াও যায় না—সে কেমন করিয়া চিত্র নামের যোগ্য হয়! রবিবর্ম্মা যে এই নব্যতার হাত এড়াইয়াছিলেন এ কথা বলা চলে না; বরং ইউরোপীয় চিত্রশিল্পের দিকে তাঁর একটু বিশেষ ঝোঁকই দেখা যায়। কিন্তু তথাপি তিনি যে নব্যতার স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছিলেন এ কথাও বলা চলে না। তিনি নূতন প্রণালীতে চিত্রাঙ্কন করিয়াছেন বটে, কিন্তু চিত্রে সাজসরঞ্জাম ও আখ্যায়িকাটুকুর জন্য পুরাতনের শরণাপন্ন হইয়াছেন। একদিকে আমরা দেখি রবিবর্ম্মা ইউরোপের শিল্প-জগতের

সহিত যোগ রাখিবার জন্য তথাকার চিত্র পুস্তকাদি সংগ্রহ করিতেছেন, আর একদিকে তিনিই আবার বড়োদারাজেব নিকট পৌরাণিক চিত্র লিখিবার হুকুম পাইয়া আমাদের প্রাচীন সাজসজ্জা অলঙ্কারাদি দেখিবার জন্য ভারতের দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। রবিবর্ম্মা নিজে এবং তাঁর অনেক বন্ধুই আক্ষেপ করিয়াছেন যে সমাজের কঠোর শাসন বশতঃ তিনি ইউরোপে শিল্পশিক্ষার জন্য যাইতে পাইলেন না। আমি তো বলি সেটুকু আমাদের সৌভাগ্যক্রমেই ঘটিয়াছিল। রবিবর্ম্মার চিত্রে যে জাতীয়তাটুকু পাই সেটুকুর খাতিরে তাঁর সকল দোষ মার্জ্জনা কবা চলে; কিন্তু বিলাতি শিল্পচর্চ্চা করিতে গিয়া তিনি যদি জাতীয়তাটুকু হারাইয়া বসিতেন তবে আমাদের ক্ষোভের সীমা থাকিত না। ভারতমাতা যে তাঁর এই প্রতিভাশালী সন্তানকে দৃঢ় শৃঙ্খলে গৃহকোণে বন্ধ রাখিয়াছিলেন সে আমাদেরই মঙ্গালের জন্য সন্দেহ নাই।

রবিবর্ম্মার চরিত্র অনুশীলন করিয়া দেখিলে আমরা বেশ বুঝি যে তিনি কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন এবং সাধনার কঠোরতা অনুযায়ী সিদ্ধিলাভও করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সিদ্ধিলাভ করিয়া কেবল মেডেলরূপ স্বর্ণমৃগের পশ্চাতে যদি তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতেন যদি তাঁর প্রাণ দেশীয় শিল্পের জন্য না কাঁদিত এবং সাধনার ফল স্বদেশে বিতবণ না করিয়া বিলাতীর সেবায় যদি তিনি অর্পণ করিতেন তবে আজ তিনি আমাদের কাছে বাঙ্গালী সাহেব ও ধনীর ঘরের সাক্ষিগোপালগুলির মত একান্তই হেয় হইয়া থাকিতেন এবং আমরা বলিতে বাধ্য হইতাম যে, তিনি ক্ষমতা সত্ত্বেও নিজের দেশকে বঞ্চিত রাখিয়া গেলেন।

এত অসংখ্য এবং বিভিন্ন ধরণের চিত্র রবিবর্ম্মা লিখিয়া গিয়াছেন যে সেগুলিব গুণাগুণ সম্বন্ধে আলোচনা ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অসম্ভব এবং একই ব্যক্তি যে সেগুলির যথার্থ বিচার করিতে পারিবে এ আশাও বৃথা। রবিবর্ম্মাব সকলচিত্রের যথার্থ মর্ম্ম বুঝাইতে বহুদিন ধরিয়া বহু লোকের মতামত সংগ্রহের প্রয়োজন, কিন্তু এটুকু অসংকোচে বলা চলে যে রবিবর্ম্মার প্রদর্শিত নূতন পথটা অনুসরণ এবং তাঁহার শিল্পটাকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে আমরা একবার ভাবিয়া দেখিব আমাদের কি ছিল এবং যাহা ছিল সেইটাকে নবজীবন দান করা কিম্বা সেটাকে উপেক্ষা করিয়া একটা কিছু নূতন গড়িয়া তোলা প্রয়োজন!

আমাদের প্রাচীন চিত্রশিল্পের নমুনা আমরা অজন্টা প্রভৃতি পর্ব্বতগুহায় দেখিতে পাই। এককালে যে এই শিল্প সমস্ত ভারতের আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়; কাশী, জয়পুর, উড়িষ্যা, মান্দ্রাজ, নেপাল এবং বাঙ্গালায় এখনও এই প্রাচীন চিত্রশিল্পের নিদর্শন বর্ত্তমান। জয়পুর ও কাশীতে গৃহভিত্তি এবং মসৃণ কাগজে যে সকল চিত্রপট অঙ্কিত হইয়া থাকে, উড়িষ্যার জগন্নাথের পট, মান্দ্রাজের ত্রিপতি মেলায় যে সকল চিত্রপট বিক্রয়ার্থ আসে, বোম্বাইয়ের দশ অবতার খেলিবার তাস, নেপালের চর্ম্মফলকে লিখিত বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি, বাঙ্গালাদেশের কাপড়ের উপর লিখিত এবং পুরাতন পুঁথির পাটায় রক্ষিত সে সকল চিত্রাদি এখনও পাওয়া যায় সেগুলিতে অজন্টা শিল্পের প্রভাব বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। এই অতিপ্রাচীন শিল্প যে এককালে সমস্ত প্রাচ্য দেশে প্রসার লাভ করিয়াছিল এবং পারস্য কাবুল তিব্বত চীন জাপান প্রভৃতি দেশের প্রাচীন চিত্রশিল্প যে এই অজন্টা শিল্পেরই অনুরূপ সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। দেশ কাল পাত্র ভেদে এই প্রাচীন শিল্পের কোথাও উন্নতি বা অবনতি ঘটিয়াছে বটে কিন্তু মূলত একটার সহিত আর একটার পার্থক্য নাই বলিলেই হয়। দিল্লীর গজদন্তের পট আর জয়পুরের কাগজের ছবিতে আধার মাত্রের ভেদ, অঙ্কন এবং রঞ্জনপ্রণালী সেই সাবেক নিয়মে চলিয়া আসিতেছে। নেপালের চর্ম্মফলক এবং বাঙ্গালার কাঠের পাটা এ দুয়ের শিল্পগত পার্থক্য না থাকারই মধ্যে; যে প্রণালীতে উড়িয়া চিত্রকর জগন্নাথের পট লেখে সেই প্রণালীতেই মান্দ্রাজ বোম্বাইযের চিত্রশিল্পী খেলার তাস তৈয়ারি

করে। চীন জাপানের জতুচিত্র, পারস্য কাবুলের চিত্রিত টালি এই শিল্পেরই সুন্দরতর বিকাশ মাত্র এবং এই শিল্প সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া চলিত আজও সেই মতই চলিয়া আসিতেছে। তবে কাহারও হাতে পড়িয়া কোথাও এটা দিল্লীর পটরূপে জগদ্‌বিখ্যাত আর কাহারও বা হাতে পড়িয়া কোথাও বা সেটা কালীঘাটের ও জগন্নাথের পটরূপে বিরাজমান। রবিবর্ম্মার শিল্প এই প্রাচীন ভারতশিল্প হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। অতএব সেটাকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে আদর্শ শিল্প এবং আদর্শ শিল্পী কাহাকে বলে, জানা থাকা আবশ্যক।

শিল্পীর পক্ষে হস্তের নিপুণতা যেমন, মনের ভাবগ্রাহিতা এবং মস্তিষ্কের উদ্ভাবনীশক্তিও তেমনি অত্যাবশ্যক; ইহার একটাকে বাদ দিয়া আর একটাকে রাখিলে চলে না। এই তিনটি গুণের ন্যূনাধিক্য লইয়া শিল্পী ও শিল্পের গুণাগুণ নিরূপিত হয় এবং এই তিন গুণের সম্পূর্ণ অধিকারী আদর্শ শিল্পী বলিয়া কথিত হয়েন। এখানে জানা কর্ত্তব্য যে এই তিন গুণেরই একত্র সমন্বয় যুগান্তে একবার ঘটে কিনা সন্দেহ। হস্তের নিপুণতা মানুষের আয়ত্তাধীন কিন্তু ভাবের স্ফূর্তি এবং জ্ঞানের উন্মেষ সুকৃতী বলে কদাচিৎ কোন মনুষ্য লাভ করে।

আমরা কোন একটা বিশেষ পদার্থ পাইলেই সেটা নাড়িয়াচাড়িয়া ভাল করিয়া দেখিবার চেষ্টা পাই। তখন হয় চোখে চশমা লাগাই নয় তো দূরবীক্ষণ কিম্বা অণুবীক্ষণের সাহায্য লই। অভাবে হাতের জিনিষটাকে আলোর দিকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়াও পরীক্ষা করি। একমুষ্টি ধূলা কিম্বা একরাশ খড় দেখিবার জন্য আমরা চশমা আঁটিতে যাই না; তেমনি কোন শিল্পে যদি কোন বিশেষত্ব থাকে তবেই সেটাকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিবার জন্য নৈপুণ্য, উদ্ভাবনা এবং ভাব এই ত্রিগুণাত্মক তিনখানি চশমা চোখে লাগান আবশ্যক। রবিবর্ম্মার শিল্প জগতের চক্ষু আকর্ষণ করিয়াছে। অতএব আদর্শ শিল্পীর কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিয়া এই শিল্পের গুণাগুণ বিচার করিলে তবে আমরা রবিবর্ম্মার মহত্ত্ব এবং তাঁর শিল্পেরও যথার্থ সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব; তাহা না করিয়া স্বজাতিপ্রেমের দোহাই দিয়া তাঁহাকে রাজমুকুটে ভূষিত করিয়া বসিলে আমরা আমাদের কর্তব্য হইতে বিচলিত হইব এবং সেই পরলোকগত রবিবর্ম্মাকেও যে বিশেষভাবে উপেক্ষা করিব এ কথা বলাই বাহুল্য।

এই যে রাজবংশীয় যুবক, সে অনায়াসে মোটর গাড়ী হাঁকাইয়া সাহেবদের ভোজ দিয়া, 'বলে' নাচিয়া অথবা ঘোড়দৌড়ে জুয়া খেলিয়া জীবনটা সুখে স্বচ্ছন্দে কাটাইতে পারিত। সে যখন চিত্রকরের ব্যবসায় বাছিয়া লইল, তখন তার মনে নিশ্চয়ই কতকগুলা সুবর্ণপদক মাত্র বল সঞ্চার করে নাই. দেশের জন্য কিছু করিব এই উৎসাহই তাহাকে নবজীবন দান করিয়াছিল নিশ্চয়। নচেৎ যে ইচ্ছা করিলে Star of India পদক সহজে করগত করিতে পারে সে প্রদর্শনীর সোণার পদক পাইতে এত কঠোর করিয়া শ্রম করিতে যায় কেন? চিত্রকর হইতে যে উৎকট শ্রম দরকার এ কথা অনেকে বোঝে না; রবিবর্ম্মার যে শিল্প এত সুলভে আজ আমাদের ঘরের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে সেগুলি উৎপন্ন করিতে রবিবর্ম্মাকে কত নিরাশা কত না উপহাস উপেক্ষা সহ্য করিতে হইয়াছিল। তিনি আজ যে আনন্দের সৌন্দর্য্যের দান আমাদের জন্য রাখিয়া স্বর্গে গিয়াছেন সেটুকু সংগ্রহ করিতে যে তিনি প্রাণপাত করিয়াছেন এবং সে জন্য রবিবর্ম্মা আমাদের কাছে যে চিরস্মরণীয় এ কথা দুই বার করিয়া বলিতে হইবে না।

ঈ বী হ্যাভেল-প্রসঙ্গ

১৩৪১ মাঘ

ঈ বী হ্যাভেল

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সে তখনকার কথা যখন এক দিকে বড় বড় নামজাদা প্রত্নতাত্ত্বিকরা (archæologist) আমাদের প্রাচীন মন্দির মঠাদির বর্ণন ও ব্যাখ্যা দিয়ে চলেছেন, আর এক দিকে আর্ট-স্কুলে প্রাচীন গ্রীক্ রোম্যান মূর্ত্তির মাটির ছাঁচ এবং প্রাচীন ইউরোপীয় চিত্রকলার মাঝারিগোছের সস্তা নমুনা থেকে নকল নিয়ে নিয়ে আমাদের দেশে শিল্পশিক্ষার্থিদের ক'রে তোলা হচ্ছে ইউরোপীয় পদ্ধতিতে oil-painter, water-colour painter—নকল র‍্যাফেল, টিশিয়ান হয়ে ওঠবার অভিনয় চলেছে, যেন বাঙালী ছেলে ব্রুটাস সেজে মুখস্থ-করা স্পীচ আউড়ে যাচ্ছে আর ভাবছে নিজেকে সত্যই সে রোম্যান সেনেটের এক জন। আমরা যে কেবলই আর্টিস্ট হবার অভিনয় ক'রে চলেছি সেটা ভ্রমেও মনে হ'ত না কারু। শুধু প্রত্নতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা যে আর্টের সৌন্দর্য্য বোঝার পক্ষে একেবারেই কাজে আসে না এটা বুঝলেম আমরা প্রথম হ্যাভেল (Havell) সাহেবের লেখা থেকে—এ যেন এতকাল আমাদের ভাস্কর্য্য শিল্পের বহিরঙ্গীন অংশের দৈর্ঘ্য প্রস্থ বয়েস ইত্যাদির হিসেব ধরা হচ্ছিল আমাদের আগে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের দ্বারা—ঠিক যেভাবে ঘোড়ার দালাল ঘোড়ার দাঁত ল্যাজের দৈর্ঘ্য কাঠামোর লম্বাই চওড়াই দিয়ে ঘোড়ার সৌন্দর্য্য বর্ণন করে সেই ভাবে কাজ হচ্ছিল। কিন্তু হ্যাভেল সাহেব তাঁর লেখায় একাধারে প্রত্নতত্ত্ব, সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, ভারতীয় শিল্পের নিগূঢ় রস পরিবেশন করলেন আমাদের।

সঙ্গে সঙ্গে শিল্পশিক্ষা-পদ্ধতিও তিনি দেশী প্রথায় এ-দেশের ছাত্রগণেব উপযোগী ক'রে তোলবার চেষ্টায় রইলেন। খাঁচা থেকে পাখীকে টেনে বার ক'রে বনস্পতির ডালে তাকে বসিয়ে দিতে গেলে সে যেমন মানুষটাকেই কামড় দিতে থাকে তেমনি ঘটনা ঘটল এ-দেশীয় শিল্পী ও হ্যাভেল সাহেবের মধ্যে—আর্ট-স্কুলের প্রথম শিক্ষাসংস্কার কালে। তখন আমাদের কোন শিক্ষাসদনে কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্ট-শিক্ষার স্থান ছিল না,—আজকাল নৃত্যকলা শিক্ষা নিয়ে যে হৈ চৈ বেঁধেছে তার চেয়ে অধিক আপত্তি উঠেছিল তখনকার কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তাদের মধ্যে শিক্ষাগারগুলোর মধ্যে ড্রয়িংশিক্ষার প্রথম প্রচলন ব্যাপার নিয়ে। অক্লান্ত চেষ্টার ফলে সে-বিষয়ে সফলকাম হলেন হ্যাভেল। যে চোখে হ্যাভেল সাহেব আমাদের দেশের শিক্ষা, দীক্ষা, শিল্প, ইতিহাস প্রভৃতি দেখে গেছেন তা এক জন ঋষির পক্ষেই সম্ভব, সেই কারণেই আমরা না বুঝলেও তিনি জগতে শ্রদ্ধার পাত্র এবং এ-দেশের শিল্পশিক্ষার মূল প্রতিষ্ঠাতা বলেই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করতে হবে আমাদের।

শিল্প-শিক্ষার্থী ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ড্রয়িং শিক্ষার জন্য ড্রয়িংবুক এবং শিল্পসৌন্দর্য্য বুঝিয়ে আমাদের এবং বিদেশের রসপিপাসুগণের মধ্যে সুচিন্তিত পুস্তকাদি লেখা হ্যাভেল সাহেবের সারা জীবনের ব্রত ছিল—এমন ক'রে আমাদের শিল্পের আর শিল্পিগণের জন্যে নিঃস্বার্থ প্রাণপণ পরিশ্রম অন্য কে করেছেন?

* 'পরলোকগত ঈ বী হ্যাভেল' এই শিরোনামে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মুকুলচন্দ্র দে এবং অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা প্রকাশিত হয়েছে—সংকলন-সম্পাদক।

হ্যাভেল সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ

শ্রীমুকুলচন্দ্র দে

তখন আমি ছেলেমানুষ—বোলপুরে পড়ি; ইণ্ডিয়ান আর্টের বই হ্যাভেল সাহেবের সেই প্রথম বের'ল। তখন ভাব্‌তেও পারি নি যে তাঁর সঙ্গে কোনদিন আমার দেখাসাক্ষাৎ বা আলাপ-পরিচয় হবে।

১৯২০ সালে ইংলণ্ডে যখন গেলুম, তখন খুব ইচ্ছা হ'ল যে হ্যাভেল সাহেবকে একবার দেখ্‌ব। লণ্ডনে থাক্‌তে হ্যাভেল সাহেব যদিও দু-চার বার এসেছিলেন, কিন্তু নানা কারণে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে ওঠে নি। ১৯২৩ সালের অক্টোবর মাসে তিনি আমায় একখানি চিঠি লেখেন, তাতে বলেন, আমি অক্সফোর্ডে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলে তিনি বড় খুশী হবেন। কিন্তু তাও নানা কারণে তখন হয়ে ওঠেনি।

১৯২৬ সালের নভেম্বর মাসে কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ স্যর জন্ উড্‌রফ আমাকে তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেন। উড্‌রফ সাহেব সেই সময়ে জজের কাজ থেকে অবসর নিয়ে অক্সফোর্ডে বসবাস করছিলেন। সেখানে তখন তিনি ভারতবর্ষীয় আইনের অধ্যাপক। তাঁর বাড়িতে আমাদের দেশের আর্টের নূতন পুরাতন অনেক রকম খুব ভাল ভাল সংগ্রহ আছে দেখলুম। সেই সময়ে একদিন স্যর জন্ উড্‌রফ হ্যাভেল সাহেবের সঙ্গে আমার দেখা করার জন্য সময় ঠিক ক'রে এলেন। পরের দিন সকালবেলায় আমরা প্রাতর্ভোজন সেরে হেঁটেই হিডিংটন-হিলের দিকে রওনা হলুম। মাইল-দুই পথ হেঁটে শহরের বাইরে---উঁচু-নীচু খোলা মাঠে—বন-জঙ্গালের ঝোপ-ঝাড়ের ধারে ছোট্ট একটি ফেরোকংক্রীট ও কাঠের তৈরি আমাদের দেশী ধরণের একতালা বাংলায় পৌঁছলুম। বাড়িটির নাম "Hvide Hus".

আশপাশে আর কারও বাড়ি নেই বললেই হয়, দূরে দূরে দু-একটি বাড়ি দেখলুম। এক খোলা মাঠে বন-ঝোপের ধারে নিরালা ছোট্ট একটি নূতন ঘর, শীতকাল, বাইরে প্রচণ্ড শীত। বাড়ির দরজার সাম্‌নে গিয়ে বন্ধ দরজায় স্যর জন্ ঠক্ ঠক্ করতেই—বৃদ্ধা মিসেস্ হ্যাভেল এসে দোর খুলে দিয়ে আমাদের ভিতরে ডাকলেন। ঘরে ঢুকে দেখি ম্যাণ্টেলপিসের সামনে মাথায় হাত দিয়ে ঝুঁকে পড়ে বৃদ্ধ হ্যাভেল ব'সে আছেন। বললেন, "এস ব'সো", কিন্তু ব'লে কিছুক্ষণ ঐরকম ভাবে বসেই রইলেন। তাঁর মুখ আমরা দেখ্‌তে পেলুম না, হাতের মধ্যে গোঁজা কেশহীন শাদা মাথাটি শুধু দেখ্‌তে পাচ্ছিলুম। একটি বেতের চেয়ারে বসেছিলেন—পায়ের গোড়ায় ছোট একটি কার্পেট পাতা, ঘরে আসবাবপত্র কিছুই প্রায় ছিল না। ঘরে আগুন নেই—কন্‌কনে ঠাণ্ডা ঘর, ফায়ারপ্লেসের উপর একখানি ওঁর নিজের হাতে আঁকা ছবি—দার্জ্জিলিং থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্য। ছবিখানি শুক্‌নো অয়েলপেণ্টিং ছবির মত দেখ্‌তে মনে হ'ল। বরফের মধ্যে কাঞ্চনজঙ্ঘাই বিশেষ ক'রে দেখা গেল। পাশে একটি টেবিলের উপরে একখানি প্রকাণ্ড মোটা নিউজ্‌কাটিং-এর বই (খবরের কাগজ থেকে কাটা প্রবন্ধাদির বই) দেখ্‌তে পেলুম। তাতে ভারতবর্ষের চিত্রকলার সম্বন্ধে যত খবর বাদ-প্রতিবাদ বেরিয়েছে সব, এবং তাঁর নিজের লেখা খবরের কাগজে প্রকাশিত আলোচনাদিও রয়েছে। মনে হ'ল বৃদ্ধ ঋষি হিমালয়ের পাদমূলে ব'সে ভারতের বিষয় নিয়ে তপস্যা করছেন!

আমাকে দেখে খুশী হ'য়ে বললেন, "আমি ভারতের কথাই ভাব্‌ছিলুম। তোমার ছেলেবেলার কাজ আমি কিছু কিছু জানি।" গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর অন্যান্য বন্ধুদের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। দিল্লীর নূতন রাজধানী গঠন ব্যাপার নিয়ে

তিনি মনে বড়ই কষ্ট পাচ্ছিলেন। ভারতের কত টাকা খরচ ক'রে দিল্লীতে নূতন রাজধানী তৈরি হচ্ছিল, আর সেও লণ্ডনের অফিসে ব'সে! ভারতের বহুশিল্পী যে কিছু কাজ করতে পাচ্ছিল না, তাই নিয়ে তিনি দুঃখ করলেন, স্যর এড্উইন লাটিন্‌স্ যে প্রকাণ্ড ভুল করছিলেন, সে-কথাও তিনি বললেন। তিনি আমায় বার বার বললেন, "তুমি তোমার দেশে গিয়ে দিল্লীতে এবং কলকাতায় শিক্ষাদানের ভার নিয়ে কাজ শিখাও, তাতে খুব বড় কাজ ও উপকার হবে।" লণ্ডনে যে ইণ্ডিয়া অফিস হবে, তাও তিনি জানতেন, এবং তাতেও দেশী শিল্পীদের কাজ করা এবং দেশী ভাবের স্থাপত্য হওয়া উচিত সে কথাও তিনি আমাকে বলেছিলেন। তিনি এই সব ব্যাপার নিয়ে সেই সময়ে কাগজপত্রে খুব লেখালেখি করছিলেন; সেই সব কাগজপত্রও আমায় দেখালেন। চলে আস্‌বার সময় হ্যাভেল সাহেব তাঁর লেখা "The Himalayas in Indian Art" ("ভারতীয় ললিতকলায় হিমাদ্রি") বইখানি আমায় উপহার দিলেন; বইখানি মাথায় ছুঁইয়ে আমি বিদায় নিলাম। আমার সঙ্গে তাঁর দেখাসাক্ষাৎ এই একবারই হয়েছিল, কিন্তু ভারতের দুঃখে দুঃখী এবং ভারতের চিন্তায় নিমগ্ন সেই ঋষিমূর্ত্তি চোখের সামনে আমি এখনও দেখতে পাচ্ছি।

ভারতবর্ষকে নানা দেশের নানা লোকে নানা ভাবে ভালবেসে এসেছেন, কিন্তু ভারতীয় শিল্পকে হ্যাভেল সাহেবের মত এমন গভীর ও একনিষ্ঠ ভাবে জীবনের সব সময়ে কেউ ভালবেসেছেন কি না আমার জানা নেই। বিদেশীর মধ্যে তিনিই প্রথম ভারতবর্ষের শিল্পকে বিদেশীর হাত থেকে উদ্ধার ক'রে তার নিজস্ব মূর্ত্তিতে প্রকাশ হবার সাহায্য করেন। সেই জন্য তিনি বর্ত্তমান কালের সমস্ত শিল্পীরই আন্তরিক শ্রদ্ধার পাত্র।

আর্নেষ্ট্ বিন্‌ফীল্ড্ হ্যাভেল

শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

এক জাতির পক্ষে অন্য জাতির বিভিন্ন প্রকৃতির সভ্যতার, কৃষ্টির ও শিল্পসাধনার বিশিষ্ট রস আস্বাদন করা একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার। জগতের নানা স্থানে নানা দেশে, বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন পরিবেষ্টনীর মধ্যে আপন আপন বিভিন্ন শক্তি ও চিন্তাধারার আদর্শে, বিভিন্ন প্রকৃতির কৃষ্টি ও শিল্পসাধনার সৌধ নির্ম্মাণ করিয়া চলিয়াছে। এই বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন প্রকৃতির সাধনার সংস্পর্শে, বিনিময়ে ও প্রভাবে বিশ্বমানবের বিরাট সাধনার কলেবর, বিধাতার বিধানে যুগে যুগে, দেশে দেশে, পরিণতির পথে অগ্রসর হইতেছে। বাণিজ্যের স্বার্থ, রাজনৈতিক স্বার্থ, ব্যক্তিগত স্বার্থ ইত্যাদি নানা স্বার্থবাদের বিপাকে পড়িয়া মানুষের সম্মিলিত সাধনার জয়যাত্রা পদে পদে বাধা পায়, পদে পদে পথ হারায়। এই জন্য মধ্যে মধ্যে এক জন্য নেতার আবশ্যক হয়, যিনি এই পথ-হারান সভ্যতার পথ-প্রদর্শক হইয়া, বিভিন্ন পথের বিভিন্ন যাত্রীদের মধ্যে পরিচয়ের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া—যূথভ্রষ্ট যাত্রীদের একত্র করিয়া, সম্মিলিত করিয়া, বিশ্বমানবের কৃষ্টির পথে আবার পরিচালনা করেন। য়ুরোপ ও ভারতের সাধনার সম্মিলনক্ষেত্রে হ্যাভেল সাহেব ছিলেন বিধাতার প্রেরিত এক জন বিশিষ্ট অগ্রদূত।

ভারতের শাসনতন্ত্রের উপযোগী যে কয়টি যন্ত্র ব্রিটিশ-শাসকের কারখানায় উদ্ভাবিত হইয়াছে,

'ভারতীয় শিক্ষাতন্ত্র' তার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক ব্যাপার। হ্যাভেল সাহেব এই শিক্ষাতন্ত্রের একজন যন্ত্রচালক হইয়াও, এই শিক্ষাযন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া বড় কর্ত্তাদের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। অনেকের বিশ্বাস, হ্যাভেল সাহেবের প্রদর্শিত শিক্ষানীতি অবলম্বন করিয়া যুবক ভারতের জাগ্রত জাতীয়তাকে কৃষ্টি ও সাধনার নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে পরিচালিত করিলে ভারতের রাজনৈতিক আকাশে সন্ত্রাসবাদের ঘনঘটার কাল-ছায়ার আবির্ভাব হইত না। হ্যাভেল সাহেব যে দৃষ্টিশক্তি লইয়া ভারতের সাধনা ও সভ্যতার গভীরতম অন্তর্দেশ অনুসন্ধান করিয়া তাহার রহস্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন, সাধারণ শিক্ষিত ইংরেজের মধ্যে এই শ্রেণীর পর্য্যালোচকের একান্ত অভাব। জাপানে লফকদিয় হীয়রন্ ও ফেনেলোসা, পারস্যে বার্টন ও নিকলসন্ কৃষ্টির ক্ষেত্রে যে উদার দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন, ভারতের প্রাচীন সাহিত্য আলোচনাদির ক্ষেত্রে মোক্ষমুলার ও স্যর উলিয়ম্ জোন্স যে অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন তাহার তুলনায়, ভারতের শিল্প সাধনার ক্ষেত্রে হ্যাভেলের গভীরতর অধ্যাত্ম দৃষ্টি সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান। ভারতের শিল্পের অন্তর্নিহিত রসের অনুসন্ধান দিয়া, ভারতীয় সাধনার শ্রেষ্ঠ ফল জগতে সুপরিচিত করিয়া, হ্যাভেল সাহেব ভারতের সভ্যতাকে নূতন গৌরবের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই হিসাবে হ্যাভেল সাহেবের প্রচেষ্টা জাতীয় সাধক কোনও ভারতীয়ের চেষ্টা হইতে কম মূল্যবান্ নহে। পক্ষান্তরে, ইংরেজী শিক্ষার অতি-প্রভাবে বিজাতীয় ভাবগ্রস্ত 'শিক্ষিত' ভারতীয়কে আপনার দেশের শিল্পসাধনার মর্ম্মস্থান উদ্ঘাটন করিবার পথ দেখাইয়া দিয়া, হ্যাভেল সাহেব ভারতের নূতন দেশাত্মবোধের ইন্ধন যোগাইয়া, জাতীয়তার শ্রেষ্ঠ পুরোহিতের স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ভারতের প্রাচীন শিল্পের বিশিষ্ট রূপ ও প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া, জগতের শিল্পের দরবারে ভারতীয় শিল্পের জন্য শ্রেষ্ঠ আসন দাবি করিয়া, ভারত এবং য়ুরোপের শিক্ষিত সমাজে নানা অপমান ও লাঞ্ছনা হ্যাভেল সাহেবকে বরণ করিতে হইয়াছিল। সর্ব্বাপেক্ষা কৌতুকের বিষয় এই, যে, শিক্ষিত ভারতবাসী তাঁহার ভারতীয় শিল্পের স্তুতিবাদ প্রথমে বিরোধের দৃষ্টিতে এবং চিরকালই কিছু সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে। আজও শিক্ষিত ভারতবাসীদের মধ্যে খুব কম লোকই আছেন, যাঁহারা হ্যাভেল সাহেবের ভারত-শিল্পের মূল্যের দাবি অকপটে ও সম্পূর্ণভাবে মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছেন। ভারতের অকৃত্রিম সুহৃদ হ্যাভেল সাহেবের জীবন ও কর্ম্মপদ্ধতি ভারতের সাধনার বিশিষ্ট গুণাবলীর ব্যাখ্যা ও প্রচারে একান্তভাবে নিয়োজিত ছিল। তাঁহার লিখিত নানা গ্রন্থ ও পুস্তকাদিতে ভারতীয় সাধনার উপর তাঁহার গভীর প্রেম ও ভক্তির পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। কলিকাতার সরকারী শিল্প-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পদ নানা কর্ত্তব্য ও নানা দায়িত্বের পদ। এই পদের নানা কর্ত্তব্যের মধ্যে অবসর খুঁজিয়া লইয়া তিনি যেরূপে ভারতের শিল্প-সাধনার ঐকান্তিক অনুশীলন ও সেবা করিযাছেন তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়ের ব্যাপার। অধ্যক্ষতার অনবসরের অবকাশের মধ্যে তাঁহার ভারতীয় কৃষ্টির নানা বিভাগের গভীর অনুশীলন ও অনুসন্ধানের চেষ্টার পবিচয় তাঁহার রচিত এক একটি পুস্তকে ভারতের প্রাচীন শিল্প-মন্দিরে ভক্তের অর্ঘ্যের মত বিদ্যমান রহিয়াছে। তাঁহার প্রথম পুস্তক 'প্রাচীন বাংলার প্রস্তর-শিল্প' (*Stone-Carving in Bengal*)। এই পুস্তক প্রণয়ন করিবার সময় তিনি প্রথম পরিচয় পান, যে, প্রাচীন পদ্ধতির প্রস্তর-শিল্প ও বাস্তুবিদ্যা কুড়ি-শতকেও জীবিত আছে। এই সময়ে পুরীর 'এমার-মঠে', অপূর্ব্ব কারুকার্য্যখচিত একটি নতুন পান্থশালা সবেমাত্র নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইতিমধ্যে অনেক শিক্ষিত বাঙালী পুরীতে তীর্থযাত্রাদি ও স্বাস্থ্যের উদ্দেশে যাতায়াত সুরু করিয়াছিলেন। কিন্তু এই নূতন পান্থশালার অপূর্ব্ব স্থাপত্যের পরিচয় হ্যাভেল সাহেবের পূর্ব্বে কোনও বাঙালীই দিতে পারেন নাই। ভারতের সাধনার অকৃত্রিম ভক্তের দ্বিতীয় উপহার—"বারাণসীর পবিত্রপুরী: হিন্দু জীবন ও ধর্ম্মের চিত্র" (*Benares, the Sacred City*

· *Sketches of Hindu Life and Religion*, 1905)। এই গ্রন্থে তিনি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, যে, হিন্দুর জীবন ও কর্ম্মপদ্ধতি অন্ধ-বিশ্বাস ও কুসংস্কারের সমষ্টি-মাত্র নহে, পরন্তু হিন্দুর কর্ম্মজীবনে ও আচারের মধ্যে উচ্চ-অঙ্গের ভাবুকতা ও আধ্যাত্মিক দার্শনিকতা সুন্দরের রূপ লইয়া প্রস্ফুটিত হইয়া আছে। ৺কাশীধামের সাধারণ জীবনযাত্রার নানা খুঁটিনাটির সাহায্যে, তিনি হিন্দুর ধর্ম্মজীবনের গভীর আধ্যাত্মিকতার চিত্র অপূর্ব্ব কৌশলে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সামান্য উপকরণে, তৈজসাধারে, স্নান-ঘাটের আকস্মিক দৃশ্যে, পথের ধারে একটি উপেক্ষিত পাথরের নক্সায়, মন্দিরের প্রবেশ-পথের স্তিমিত-আলোকের ফাঁকে ফাঁকে যাত্রীদের নানা ভঙ্গীতে, ভজনারত সাধু-সন্ন্যাসীদের নিবিষ্ট চিত্রাদিতে, হ্যাভেল সাহেব হিন্দুর আধ্যাত্মিক জীবনের রহস্যের যে সমগ্র মূর্ত্তিটি আমাদের চক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা আর কোনও শিক্ষিত বিজাতীয়ের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তাঁহার তৃতীয় পুস্তক "আগ্রা ও তাজ" (*Hand Book to Agra and the Taj, 1st ed., 1907, Revised Edition*, 1912)। এটি একখানি 'যাত্রী'দের উপযোগী পরিচয় পুস্তিকা মাত্র। কিন্তু এই পুস্তিকায় হ্যাভেল সাহেব নিপুণ বিশ্লেষকের কৌশলে সহজে প্রতিপন্ন করিযাছেন, যে, মোগল-যুগের স্থাপত্য-কলা পারস্যশিল্পের জারজ সন্তান নহে, কিংবা ইতালীর ওস্তাদশিল্পীর বিজাতীয় পরিকল্পনা নহে, পরন্তু, ভারতের মানস-সরোবরের সহজাত শ্রেষ্ঠ সরসিজ। মোগল-স্থাপত্যের রসানুসন্ধানের প্রথম সূচনা এই পুস্তিকায় প্রথম পাওয়া যায়। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি প্রাচীন-পন্থী পুরাতাত্ত্বিকদের অন্ধবিশ্বাসের দুর্গে প্রচণ্ড আঘাত করিয়া নূতন দৃষ্টিতে ভারত-শিল্পের বিশ্লেষণ-রীতির প্রথম সূত্রপাত করিয়াছিল। ইহার ঠিক পরেই ভারত-শিল্পের রসবোধক যুগপ্রবর্ত্তক গ্রন্থ "ভারতের চিত্র ও ভাস্কর্য্য" (*Indian Sculpture and Painting*, January 1908) প্রকাশিত হইল। এই গ্রন্থে হ্যাভেল সাহেব ভারতশিল্পের সৌন্দর্য্যতত্ত্বের অলৌকিক স্বাতন্ত্র্য ও গৌরবের ইতিহাসে নানা শ্রেষ্ঠ নিদর্শনের প্রতিলিপির সাহায্যে সাহস ও সত্যানুভূতির শক্তি দিয়া হাতে-কলমে প্রমাণ করিয়া দিলেন, যে, ভারতের শিল্পের চাবিকাটি তাহার অভিনব আধ্যাত্মিক ইতিহাসের মধ্যেই অনুসন্ধান করিতে হইবে। ভারত-শিল্পের সৌন্দর্য্যের আদর্শ ও প্রকাশ-রীতি তাহার বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য-তত্ত্বের মধ্যেই নিহিত আছে। প্রাচীন গ্রীক্ বা ইতালীর নব যুগের আদর্শের পরকলা চোখে আঁটিয়া ভারত-শিল্পের সৌন্দর্য্য বিচারের চেষ্টা, অন্ধের চেষ্টা। অর্দ্ধ শতাব্দীর অনুসন্ধানে ভারতের পুরাতাত্ত্বিক কনিংহাম, ফর্গুসন, বর্জেস ও মার্শ্যাল প্রমুখ দিগ্‌গজ পণ্ডিতগণের চক্ষে যে সত্য অবগুণ্ঠিত ছিল, যথার্থ সৌন্দর্য্যরসিক ও ভক্তের চক্ষে ভারতের রূপলক্ষ্মী আত্ম-প্রকাশ করিলেন। ভারতে শিল্পের পক্ষ হইতে এই স্বাতন্ত্র্য, সম্মান ও গৌরবের দাবি য়ুরোপের শিক্ষিত সমাজে যে কোলাহল ও প্রতিবাদের কলরব তুলিয়াছিল আজও তাহার প্রতিধ্বনি স্তব্ধ হয় নাই। হ্যাভেল সাহেবের দাবি স্বীকার করিয়া লইয়া তাঁহার প্রদর্শিত পথে একাধিক জর্ম্মন শিল্পবিৎ ভারতের শিল্পের অনুশীলনে যে অক্লান্ত সাধনা ও গবেষণায় আজ পঁচিশ বৎসর নিযুক্ত আছেন তাহার অনুরূপ সাধনা ভারতের কোনও শিক্ষাকেন্দ্রে অদ্যাপি প্রবর্ত্তিত হয় নাই। কারণ, এই নূতন দৃষ্টিশক্তির কেবল যে য়ুরোপীয় মনীষীদের অত্যন্ত অভাব ছিল তাহা নহে, ইংরেজী শিক্ষার মাদকতায় সংজ্ঞাহীন ও দৃষ্টিহীন বিজাতীয় ভাবাপন্ন শিক্ষিত ভারতবাসীর পক্ষে এই সত্যদৃষ্টির চক্ষুলাভের একান্ত প্রয়োজন ছিল। হ্যাভেল সাহেবের অঙ্গুলীসঙ্কেতে ভারতবাসী তাহার নিজের দেশের শিল্পকে নূতন করিয়া দেখিতে, বুঝিতে ও চিনিতে শিখিল। ভারতের জাতীয়তার ইতিহাসে এই নূতন শিক্ষার দিন, একটি নবজাগরণের শুভদিন। এই শুভদিন হ্যাভেল সাহেবের পরিচালনায় ভারতের নবযুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় শিল্পের নূতন পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করিলেন। ভারতের প্রাচীন ও সত্য আদর্শ নূতন রূপে যুগের উপযোগী

আকারে ফুটাইয়া তুলিলেন। এই প্রাচীন ভারতকে বর্ত্তমানের মধ্যে মূর্ত্তিমান ও জীবন্ত করিবার গৌরব অবনীন্দ্রনাথ বাঙালী শিল্পীদের কপালে উজ্জ্বল করিয়া লিখিয়া দিয়াছেন। বাংলার নূতন চিত্রকলার বিচিত্র ও গৌরবজনক ইতিহাস "প্রবাসী"র পাঠকদের অবিদিত নাই এবং এই নূতন আন্দোলন ও সাধনার গৌরবের একাংশ যে "প্রবাসী"র সম্পাদকের প্রাপ্য এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। হ্যাভেলের প্ররোচনায় কয়েকটি রূপরসিক ইংরেজের উৎসাহে কলিকাতায় "প্রাচ্য-শিল্পের ভারতীয় সংঘে"র (Indian Society of Oriental Art) প্রতিষ্ঠা হয়। এই পরিষদের নানা চেষ্টায় ভারতের নূতন পদ্ধতির চিত্রকলা দেশে বিদেশে পরিচিত হইয়া হ্যাভেলের প্রদর্শিত সঙ্কেত সার্থক ও সফল করিয়া তুলিয়াছে।

১৯০৮ সালে প্রকাশিত হ্যাভেল সাহেবের "ভারতের ভাস্কর্য্য ও চিত্র" পুস্তকে যে একটু তর্কবাদের সুর ছিল, যে একটু প্রতিবাদের গর্জ্জন ছিল, ভারত-শিল্পের প্রতি ন্যায্য বিচারের দাবি ছিল, পক্ষপাতী ও প্রতিবাদীর সেই সুর সংযত ও উচ্চ স্বর মধুর করিয়া লইয়া তাঁহার দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশিত হইল—"ভারত-শিল্পের আদর্শ" (Ideals of Indian Art, 1911)। তাঁহার প্রথম পুস্তকে ভারতশিল্পের আদর্শের অনুসন্ধান ভারতেব প্রাচীন শিল্পের নিদর্শনের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। তাঁহার দ্বিতীয় পুস্তকে ভারতের দর্শনশাস্ত্র ও প্রাচীন ধর্ম্মসাহিত্য আলোচনা করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন, যে, ভারতের প্রাচীন বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া, নানা প্রভাব ও প্রগতির মধ্য দিয়া আর্য সভ্যতার মূল ধারাটি কি সাহিত্যে, কি শিল্পে সমান ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ভারতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য ও শ্রেষ্ঠ শিল্পের আদর্শ অভিন্ন। মধ্য যুগের ব্রাহ্মণ্য ভাস্কর্য্য ও "পৌরাণিক" শিল্প বৈদিক সাধনার ভাব ও ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। তারপর স্থাপত্য শিল্পের পালা। ১৯১৩ সালে মোগল যুগের স্থাপত্য সম্বন্ধে এক বৃহৎ পুস্তক প্রকাশিত হইল। ইহার নাম "ভাবতের স্থাপত্য তাহার মনস্তত্ব, গঠনরীতি ও ইতিহাস" (*Indian Architecture, Its Psychology, Structure and History*, 1913)। এই গ্রন্থে শতাধিক চিত্র সহযোগে হ্যাভেল সাহেব দেখাইয়াছেন যে মোগল-যুগের স্থাপত্যরীতি পারস্য দেশের আমদানী নহে, মোগল-যুগের নূতন সামাজিক রাজনৈতিক ও ধর্ম্ম-উপাসনার উপযোগী আকার ও রীতিতে প্রাচীন ভারতের স্থাপত্য শিল্পের নূতন বিবর্ত্তন। যুগে যুগে, স্থানে স্থানে, সামাজিক ও ধর্ম্ম উপাসনার নূতন রীতি-পদ্ধতির আবশ্যক অনুসারে কখনও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম, কখনও জৈনধর্ম্ম, কখনও বৌদ্ধধর্ম্ম, কখনও ইসলামধর্ম্মের বিভিন্ন উপাসকগণের ধর্ম্মসাধনার উপযোগী, বিভিন্ন মন্দির, বিহার ও মসজিদ প্রস্তুত করিয়া দিয়া ভারতের স্থপতিরা তাহাদের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যবুদ্ধির ও সৃষ্টি-শক্তির প্রতিভার পরিচয় দিয়াছে। তিনি আরও প্রমাণ করিলেন যে, মোগল বাদশাহরা ভারতের স্থাপত্য শিল্পীদের নূতন ক্ষেত্রে নিযুক্ত করিয়া ভারতের প্রাচীন শিল্পবিদ্যাকে উন্নতি ও পরিণতির পথে চালিত করিয়াছিলেন এবং ব্রিটিশ শাসনকালেও সেই প্রাচীন শিল্পের ধারা সম্পূর্ণ শক্তি ও প্রতিভা লইয়া জীবিত রহিয়াছে এবং এই প্রাচীন শিল্পধারাকে নূতন যুগের প্রশস্ততর ক্ষেত্রে নিযুক্ত করিয়া তাহার নূতন পরিণতির অবসর দেওয়া ব্রিটিশ সরকারের অবশ্য কর্তব্য। এই সূত্রে হ্যাভেল সাহেব বিলাতে এমন এক বৃহৎ আন্দোলন উপস্থিত করিলেন, যাহার ফলে সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেট একটি বিশেষ কমিশন বসাইয়া বর্ত্তমান কালে ভারতের স্থাপত্য শিল্পের অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও পরিচয় লইতে বাধ্য হইলেন। গর্ডন সাণ্ডার্সন তাঁহার লিখিত রিপোর্টে (*Modern India Building*, 1913) হ্যাভেল সাহেবের দাবি স্বীকার করিয়া অভিমত প্রকাশ করিলেন যে, ভারতের স্থপতিরা তাহাদের প্রাচীন শিল্পের ধারা ও গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এখনও জীবিত রহিয়াছে এবং অনুরূপ সুযোগ পাইলে মোগল-যুগের স্থাপত্য-কলা অতিক্রম করিয়া নবযুগের উপযোগী নূতন ধারার স্থাপত্য শিল্পের প্রবর্ত্তন করিবার সামর্থ্য ভারতশিল্পীরা দেখাইতে

পারে। এই দাবির সমর্থন করিয়া হ্যাভেল সাহেব তাঁহার দ্বিতীয় পুস্তক লিখিলেন ১৯১৫ সালে। পুস্তকখানির নাম "প্রাচীন ও মধ্য যুগের ভারতীয় স্থাপত্য শিল্প" (*The Ancient and Mediaeval Architecture of India*, 1915)। এই পুস্তকে তিনি বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য ও জৈন মন্দিরাদির রূপ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইলেন, যে, ভারতের অলৌকিক শিল্পবুদ্ধি প্রাচীন 'ভাষা' ও ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নিত্যনূতন রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং তাহার সৃষ্টির প্রতিভা এখনও জীবন্ত ও জাগ্রত আছে এবং নূতন ক্ষেত্রে নূতন সুযোগের অপেক্ষা করিতেছে। ব্রিটিশ সবকার ভারতের সভ্যতার বিকাশ ও পরিণতির সুযোগ না দিলে, ভারতবাসীকে তাহার নূতন জীবনের নানা ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশের পথ না দিলে, ভারত ও ভারতীয়দের উপর বিশেষ অন্যায় বিচার করা হইবে। হ্যাভেল সাহেব বিশ্বাস করিতেন যে, কেবল চারু কলার পুনরুত্থানে নহে, পরন্তু নিত্য-ব্যবহার্য্য নানা কারু শিল্পাদির (handicrafts) পুনঃ সংস্থাপনের ব্যবস্থা না হইলে ভারতের অন্ন-সমস্যার সমাধান হওয়া অসম্ভব এবং এই হস্ত-জাত শিল্পের পুনরুদ্ধারের প্রথম চেষ্টা ও উপায় হাতের তাঁত ও বস্ত্রশিল্পের (hand-loom) উন্নতি সাধন। কিন্তু এই বস্ত্রশিল্পের উন্নতির উপদেশ দিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। আপন উদ্যোগে "Havell-Hattersley Loom" নামক উন্নত-পদ্ধতির তাঁতের আমদানী করিয়া তিনি হাতেকলমে প্রমাণ করিয়াছিলেন, কিরূপে ভারতের প্রাচীন বয়ন-শিল্প মিলের যন্ত্র-চালিত তাঁতের কাপড়ের প্রতিযোগিতায় আত্মরক্ষা করিতে পারে। এই সম্বন্ধে তাঁহার প্রচেষ্টার ফল তাঁহার "Hand-loom Weaving" প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ আছে। 'বয়ন শিল্পের উন্নতিই ভারতের অন্ন-সমস্যার একমাত্র পথ'—এই বাণী হ্যাভেল সাহেব মহাত্মা গান্ধীর অন্ততঃ পনর বৎসর পূর্ব্বে প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

কেবল শিল্পের ক্ষেত্রে নহে, শিক্ষার ক্ষেত্রে হ্যাভেল সাহেবের আন্দোলন ভারতের ন্যায্য দাবীর সমথন করিয়াছে। তিনি পুনঃ পুনঃ এই কথাই গবর্ণমেন্টকে উপদেশ দিয়াছিলেন যে, ভারতে প্রচলিত ব্রিটিশ শিক্ষাতন্ত্র ভারতীয় সভ্যতা ও সাধনার বিকাশের উপযোগী নহে, পরন্তু ভারতীয় সাধনার হানিকারক। ভারতের সভ্যতা কেবল ভারতবাসীর সম্পত্তি নহে, পরন্তু, য়ুরোপের সভ্যতার নানারূপ ব্যাধির আরোগ্যের অব্যর্থ ঔষধ এবং এই হিসাবে ভারতের সভ্যতার বিকাশ ও বিস্তৃতি-সাধন ভারতের ন্যাসরক্ষক হিসাবে ব্রিটিশ সরকারের অবশ্যকর্ত্তব্য। ব্রিটিশ সরকারের ভারতীয় শাসনরীতির এরূপ নির্ভীক সমালোচক সে সময়ে কংগ্রেস দলের মধ্যেও বোধ হয় খুব অল্পসংখ্যক লোকই ছিলেন।

শিক্ষা ও শিল্পের ক্ষেত্রে ভারতের পক্ষ হইতে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের দাবি হ্যাভেল সাহেবই বোধ হয় প্রথম উপস্থিত করেন। শেষ বয়সে ভারতের শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি দুইটি দান দিয়া গিয়াছেন। এই দুইটি নূতন পদ্ধতিতে লিখিত ভারতের ইতিহাস। প্রথমটির নাম :—"আর্য্য শাসনের ইতিহাস" (History of Aryan Rule in India), দ্বিতীয়টি স্কুল-পাঠ্য পুস্তক—"ভারতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস" (A Short History of India, 1924)। এ-কথা শিক্ষিত ভারতবাসী সকলেই জানেন, যে, ইংরেজের লিখিত ভারতের ইতিহাস নানা ভুলভ্রান্তি প্রমাণাদির পরকলার মধ্য দিয়া অন্ধ বিশ্বাস ও আপনাদের জাতীয় অহঙ্কারের লেখনীতে লিখিত এক উদ্ভট রচনা। ভারতের সভ্যতার মর্ম্মস্থান যাঁহারা খুঁজিয়া পান নাই, ভারতের সভ্যতাকে যাঁরা শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে শিখেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে ভারতের ইতিহাস রচনা যে বিড়ম্বনা মাত্র হ্যাভেল সাহেব তাঁহার এই দুইটি পুস্তকে উত্তমরূপে প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি ভারতের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর মর্ম্মস্থান অনুসন্ধান করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, ভারতের সামাজিক নীতি, সাম্রাজ্যনীতি, শাসননীতি ও ধর্ম্মনীতি কিরূপে যুগে যুগে, প্রদেশে প্রদেশে, নানা কল্যাণের মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে; ভারতের সভ্যতাকে সার্থক করিয়াছে, সফল করিয়াছে।

তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে, পাঠান ও

মোগল-যুগের বিদেশী বাদশাহরা তাঁহাদের তথাকথিত যথেচ্ছাচারী শাসন-তন্ত্র দ্বারা আর্য্য সভ্যতার বিকাশ-লাভের বাধা প্রদান করা দূরে থাকুক, তাঁহাদের সমস্ত শক্তির দ্বারা আন্তরিক ভাবে তাহার পরিণতির সাহায্য করিয়াছেন এবং নূতন নূতন পথে তাহার সফলতার অবকাশ দিয়াছেন। তিনি নানা প্রমাণ অবলম্বন করিয়া অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ করিয়াছেন, যে, টুগ্‌লকের শাসন, সেরসাহের শাসন, আকবরের শাসন বিজেতার শাসন নহে, ভারতীয় নীতিতে, ভারতীয়ের সম্পূর্ণ সহযোগিতায়, ভারতের কল্যাণের উদ্দেশে ভারতীয় রাজার ধর্ম্ম-শাসন।

ভারতের সভ্যতার মূলসূত্র ও আদর্শে তাঁহার যে গভীর ও অবিচলিত বিশ্বাস ছিল তাহা কোনও ভারতবাসী অপেক্ষা কিছু মাত্র হীন নহে। এই বিশ্বাস ও গর্ব্ব তাঁহার একটি মাত্র বাণীতেই ফুটিয়া রহিয়াছে,—

"ভারতবর্ষ, আজ তাহার শ্রেষ্ঠ জাতীয় আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়াই বিশ্বমানবের সভায় জাতীয়তার আসন হারাইয়াছে এবং ভারতবর্ষ আবার উচ্চ আসনে তখনই প্রতিষ্ঠিত হইবে, যখনই ভারত বর্ত্তমান য়ুরোপ যে আদর্শে তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছে তাহা অপেক্ষা উচ্চতর আদর্শের পতাকা তাহার নিজের জন্য সমগ্র মানবের কল্যাণের জন্য উচ্চ করিয়া তুলিয়া ধরিবে" ("India has sunk in the scale of nations, because, she has been false to her highest ideals, and India will rise again, when she holds up for herself, and for humanity, higher ones than modern Europe now brings her.")

ভারতের সভ্যতার এইরূপ দরদী প্রেমিক, ভারতীয় সাধনার আদর্শের এরূপ বিশ্বাসী ভক্ত, ভারতীয় শিল্প ও কৃষ্টির এরূপ সহৃদয় ও সুনিপুণ ব্যাখ্যাকার, ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণের এরূপ অকৃত্রিম সুহৃদ, নবজাগরণের ও দেশ-পূজার এরূপ সুযোগ্য পুরোহিত ভারতের সমসাময়িক ইতিহাসে অতি অল্পই দেখা দিয়াছে। কটন, ওয়েডারবরণ, বেশান্ট, নিবেদিতা প্রমুখ ভারতের অন্যান্য বিদেশী বন্ধুগণের স্মৃতি যে-সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত, তাহারই পার্শ্বে ভারতের এই বরেণ্য বন্ধুর স্মৃতি-চিত্র সুবর্ণের প্রভায় চিরকাল উজ্জ্বল থাকিবে।

১৩৪৫ মাঘ

ঈ. বী. হ্যাভেল

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজকে যাঁর স্মৃতি উপলক্ষ্যে আমরা সমবেত হয়েছি, তাঁর পরিচয় অনেকের কাছেই আজ উজ্জ্বল নয়। তাঁর সম্বন্ধে কিছু ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। এই প্রসঙ্গে আমাদের প্রথম বয়সের কথা বলি। তখন ভারতের শিল্পকলার নিদর্শনগুলি দেশের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছিল কিন্তু আমাদের লক্ষ্যের মধ্যে ছিল না। কেন না তাদের ইতিহাস ছিল পূর্ব্বাপরের সূত্রচ্ছিন্ন, অস্পষ্ট, এবং সে-ইতিহাস আমাদের শিক্ষা-বিষয়ের বহির্ভূত। ভারতবর্ষে মোগল রাজত্বকালে, নবাবী আমলে বেগবান ছিল চিত্রকলার ধারা। সে খুব বেশি দিনের কথা নয়। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের কালে তার প্রভাব হ'ল লুপ্ত। তার একটা কারণ এই যে, ভারতের চিত্রকলা তখনকার কালের ইংরেজের অবজ্ঞাভাজন ছিল। আমরা ছিলুম সেই

ইস্কুলমাস্টারের ছাত্র, তাঁদের দৃষ্টি ছিল আমাদের দৃষ্টির নেতা, তার যা ফল তাই ফলেছিল। সেদিন ভারতীয় শিল্পবিদ্যা ছিল ভারতেরই উপেক্ষার দ্বারা তিরস্কৃত। তখন বনেদী রাজাদের ভাণ্ডারে পূর্বকাল থেকে যে-সব ছবি সঞ্চিত হয়ে এসেছে তার ক্ষতি ঘটলেও সেটা কারো নজরে পড়ত না। তখন বিদেশের যত সব নিকৃষ্ট ছবি বিনা বাধায় ধনীদের ধনগৌরবের সাক্ষী হয়ে তাঁদের প্রাসাদে অভ্যর্থনা পেত।

শিক্ষিতদের কাছে নিজের দেশের শিল্পকলার পরিচয় যখন একেবারেই অন্ধকারে, তখন বিদেশী গুণীদের কীর্তি আমাদের কাছে জনশ্রুতির বিষয় ছিল মাত্র। আমরা সেখানকার নামজাদাদের নাম কীর্তন করতে শিখেছি, তার বেশি এগোই নি। সেই নামাবলী জমা ছিল আমাদের মুখস্থ বিদ্যার ভাণ্ডারে। আমরা বিদেশী ছাপার বইয়ে দেখেছি ছাপার কালিতে সেখানকার শিল্পের প্রতিকৃতি, আর ছাপার অক্ষরে তাদের যাচাই দর। সে-সমস্ত পড়া বুলি ঠিকমতো আওড়ানোই ছিল আমাদের শিক্ষিতত্বের প্রমাণ। বিদেশী বইয়ে বিদেশী ছবির আবছায়া সঙ্গে নিয়ে ভেসে এসেছিল সমুদ্রপারের হাওয়ায় যে গুণগান, বিনা বিচারে বিনা তুলনায় তা আমরা মেনে নিয়েছি; কেন না তুলনা করবার কোনো উপাদান আমাদের কাছে ছিল না। অর্থাৎ রেলোয়ে টাইমটেবিলে চোখ বুলিয়ে যাওয়াতেই ছিল আমাদের ভ্রমণ।

তখন ধীরে ধীরে সুরু হয়েছে সাহিত্যের অভ্যুদয়। সে-কথাও নিজের জীবনের ইতিহাস থেকে বলতে পারি। কাব্যে বাংলা দেশের সাহিত্য থেকে যে প্রেরণা পাব তার পথ ভালো জানা ছিল না। এমন সময় অক্ষয় সরকার মহাশয় যখন বৈষ্ণব পদাবলী প্রথম প্রকাশ করলেন, লুকিয়ে পড়লাম। পড়ে জানলাম যে কাব্যকলা ব'লে একটি জিনিষ বাংলা প্রাচীন কাব্যে আছে। সেদিন সাহিত্যরসের উদ্দীপনা সহজে প্রাণে পৌঁছল। তারি প্রথম প্রবর্তনায় অন্তত আমার সাহিত্য-অধ্যবসায়কে অনেক দূর এগিয়ে দিয়েছে।

চিত্রকলায় মাতৃকক্ষ থেকে পূজোপকরণ নিয়ে রূপসাধনার পরিচয় আমাদের বাড়ীতেই পাই। অবন যখন প্রথম তুলি ধরলেন তিনিও বিদেশী পথেই শিক্ষাযাত্রা আরম্ভ করেছিলেন, ইস্কুলমাস্টারের স্বাক্ষরের মক্‌সো ক'রে ক'রে।

তখনকার দিনের মডেল-নকল-করা শিল্পবিদ্যাভ্যাস মনে করলে আজ হাসি পায় কিন্তু তখন গাম্ভীর্য ছিল অক্ষুণ্ণ। সেই চির-ছাত্রগিরির দুর্দিন আজও হয়তো চলত যদি হ্যাভেল এসে দৃষ্টি না ফিরিয়ে দিতেন। তিনি ফিরিয়ে দিলেন সেই দিকে ভারতীয় রূপকলার যেখানে প্রাণপুরুষের আসন।

সেদিন অবন ও তাঁর ছাত্রেরা শিল্পকলায় আত্মপ্রকাশের আনন্দ-বেদনার প্রথম উদ্বোধন যখন পেয়েছিলেন, দেশে তখনো প্রভাতের বিলম্ব ছিল, তখনো আকাশ ছিল আলো-অন্ধকারে আবিল। তার পূর্বে সীসের ফলকে খোদাই করা ছবি দেখেছি পঞ্জিকায়, আর শিশুপাঠ্য বইয়ে নৃসিংহ-মূর্তি, আর ষণ্ডামার্কের চিত্র, এমন সময় দেখা দিল রবিবর্মার চিত্রাবলী। মন বিচলিত হয়েছিল সে-কথা স্বীকার করি। তারা যে কত কৃত্রিম, তারা যে যাত্রার দলের পাত্রপাত্রীর একশ্রেণীভুক্ত, সে-কথা বোঝবার মন তখনো হয়নি। সেই লজ্জাকর অবস্থা থেকে এক দিন যে জাগতে পেরেছি সেজন্যে হ্যাভেলের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। সেই নৃসিংহ-মূর্তির মধ্যেও সত্য ছিল কিন্তু রবিবর্মার ছবির মধ্যে ছিল না একথা বোঝবার পথ তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছি।

য়ুরোপে শিল্পকলা গৌরবময় আমি জানি, কিন্তু সে-গৌরব আসল জিনিষে, তার প্রেতচ্ছায়ায় নেই। যে আনন্দলোকে তাদের উদ্ভব তারি আবহাওয়ায় যাদের প্রত্যক্ষ বাস, আনন্দের তারাই পূর্ণ অধিকারী। আমরা জহুরির দোকানে মোটা কাচের আড়ালে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছাপানো মূল্যতালিকা হাতে নিয়ে ঢাকাঢুকির ভিতর থেকে যা আন্দাজ করে নিই তাকে কিছু পেলুম ব'লে কল্পনা করা শোচনীয়। অশ্বত্থামা পিটুলিগোলা জল খেয়ে দুধ

খেয়েছি মনে ক'রে নৃত্য করেছিলেন এ বিবরণ পড়লে চোখে জল আসে।

অবন ফিরলেন নকল স্বর্গসাধনা থেকে স্বদেশের বাস্তব ক্ষেত্রে শিল্পের স্বরাজ্য স্থাপন করতে। এ একটা শুভ দিন। তাঁর প্রতিভা দেশ থেকে আহবান পেল আর তাঁর আহ্বানে দেশ দিল সাড়া। তিনি জাগলেন ব'লেই জাগালেন। কিন্তু জাগাতে কত দেরি হয়েছিল সে-কথা সকলেরই জানা আছে। শিল্পের সেই নব প্রভাতে চার দিক থেকে ভারতীয় কলাভারতীকে কত অবজ্ঞা কত বিদ্রূপ। অযোগ্য জনতার পরিহাসের খরশর বর্ষণের মধ্যে যাঁরা আপন সার্থকতা আবিষ্কার করলেন তাঁদের ধন্য বলি আর সেই সঙ্গে সমস্ত দেশের হয়ে তাঁকে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি যিনি তীর্থযাত্রীর সামনে বহুকালের বিলুপ্ত পথকে কাঁটার জঙ্গল থেকে উদ্ধার ক'রে দিলেন।

সেদিন তাঁরও ছিল না শান্তি। কেন না তাঁর স্বজাতীয়দের মধ্যে অল্প দুই এক জন মাত্র ছিলেন যাঁরা তাঁর নির্দেশ-পথকে শ্রদ্ধা করতে পারতেন। আর আমাদের দেশের যে-সব ছাত্র শিল্পবিদ্যালয়ে মাথা নিচু ক'রে অনুকৃতির কৃতিত্ব অর্জন করত তারা হায় হায় করে উঠেছিল। ভেবেছিল শিল্পের উচ্চ আদর্শে সম্মানভাজন হবার জন্যে তারা যে অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত, ইংরেজ গুরুর তা সহ্য হ'ল না, তিনি বুঝি দিশি পোটোর দলেই চিরদিনের জন্যে তাদের লাঞ্ছিত ক'রে রেখে দিতে চান। তাদের দোষ ছিল না, কেন না সেদিন ভারতীয় চিত্রভারতীর আসন ছিল আবর্জনাস্তূপে। ঘরে পরে তীব্র বিরুদ্ধতার দিনে হ্যাভেল যে সেদিন অবনের মতো ছাত্র পেয়েছিলেন এ রকম শুভযোগ দৈবাৎ ঘটে। যোগ্য ছাত্র আবিষ্কার করতে ও তাঁকে যথাপথে প্রবর্তন করতে ক্ষমতার আবশ্যক সেও কম দুর্লভ নয়।

অন্ধকারের ভিতর থেকে যুগ-পরিবর্তন যে হ'ল আজ তার প্রমাণ পাই যখন দেখি শিল্পকলায় নব জীবনের বীজ স্বদেশের ভূমিতেই অঙ্কুরিত হ'তে সুরু করেছে। এক দিন আমাদের ঘরে আসত পাঠানের দেশ থেকে কাঠের বাক্সে তুলোয় ঢাকা আঙুর,—খেতে হ'ত সাবধানে নিজের পকেটের দিকে দৃষ্টি রেখে। দ্রাক্ষালতা যে স্বদেশের জমিতেও সফল হ'তে পারে সে কথা সেদিন জানাই ছিল না। সেদিনকার আঙুর-ব্যবসায়ীদের অনেক দাম দিয়েছি, আজ যারা এই মাটিতে আঙুর ফলিয়ে তুললেন তাঁরা চিরদিনের জন্য মূল্য দিলেন স্বদেশকে এ কথা যেন মনে রাখি। সব ফলই যে সমান উৎকর্ষ লাভ করবে এ সম্ভব নয় কিন্তু এখন থেকে আপন মাটির উপরে বিশ্বাস রাখতে পারব এইটেই সবচেয়ে বড়ো কথা। সে কথাটিকে প্রথম সম্ভাবনা দিয়েছেন যিনি তাঁকে আজ নমস্কার করি। ভূমিকার প্রতি পরিশিষ্টের অশিষ্টতার প্রমাণ পদে পদে পেয়ে থাকি সেই অকৃতজ্ঞতার দুর্যোগকে যথাসাধ্য দূরে ঠেকিয়ে রাখবার অভিপ্রায়ে আজ আমাদের আশ্রমে হ্যাভেলের স্মৃতিমন্দির প্রতিষ্ঠা করলুম। যাঁরা আজ এই অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধার সঙ্গে যোগদান করলেন সেই সহৃদয় বন্ধুদের আমার অভিবাদন জানাই।

শান্তিনিকেতন

১১/১২/৩৮

[শান্তিনিকেতনে হ্যাভেল-স্মৃতিমন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে ভাষণ। শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কৃত অনুলিপি অবলম্বনে বক্তা কর্ত্তৃক পুনর্লিখিত]

নিবেদিতার চিত্র-আলোচনা

১৩৩৩ বৈশাখ
ভগিনী নিবেদিতা

ইনি ১৩১৩ হইতে দেশী বিদেশী বহু প্রসিদ্ধ চিত্রের চিত্রপরিচয় প্রভৃতি প্রবাসীতে ইংরাজিতে লিখিয়া দিতেন। তাহার বাংলা অনুবাদ করিয়া দেওয়া হইত। কিছুকাল পূর্ব্বে ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

১৩১৩ ভাদ্র
BHARAT-MATA
ABANINDRA NATH TAGORE

We have here a picture which bids fair to probe the beginning of a new age in Indian art. Using all the added means of expression which the modern period has bestowed upon him, the artist has here given expression nevertheless to a purely Indian idea in Indian form. The curving line of lotuses and the white radiance of the halo are beautiful addition to the Asiatically-conceived figure with its four arms as the symbol of the divine multiplication of power. This is the first masterpiece, in which an Indian artist has actually succeeded in disengaging, as it were, the spirit of the motherland,—giver of Faith and Learning, of Clothing and Food,—and portraying Her, as she appears to the eyes of Her children. What she sees in Her is here made clear to all of us. Spirit of the motherland, giver of all good, yet eternally virgin, eternally rapt from human sense in prayer and gift. The misty lotuses and the white light set Her apart from the common world, as much as the four arms, and Her infinite love. And yet in every detail, of *shankha* bracelet, and close-veiling garment, of bare feet, and open, sincere expression, is she not after all, our very own, heart of our heart, at once mother and daughter of the Indian land, even as to the rishis of old was Ushabala, in her Indian girlhood, daughter of the dawn?

Nivedita—of R.K.V.

ভারত-মাতা।

এই ছবিখানি ভারতীয় চিত্রশিল্পে এক নবযুগের প্রারম্ভ সূচনা করিবে বোধ হয়। সত্য বটে ভাব ও চিন্তা ব্যাপ্ত করিবার আধুনিক যুগের নববিধ উপায়ের সাহায্য লইয়া অবনীন্দ্র বাবু এই ছবি আঁকিয়াছেন; কিন্তু তাহা হইলেও চিত্রপটে তৎকর্ত্তৃক পরিব্যক্ত মানসিক আদর্শটি খাঁটি ভারতের

জিনিস, আকার প্রকারও ভারতীয়। পদ্মগুলির বক্ররেখা ও শিরোবেষ্টক প্রভামণ্ডলের শুভ্র দীপ্তি সংযোগে এশিয়োদ্ভূত কল্পনাজাত মূর্ত্তিটির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। চারিবাহু দৈবশক্তির বহুত্বের চিহ্ন স্বরূপ। ইহাই প্রথম উৎকৃষ্ট ভারতীয় চিত্র, যাহাতে একজন ভারতীয় শিল্পী যেন মাতৃভূমির অধিষ্ঠাত্রীকে—ভক্তিদায়িনী, বিদ্যাদাত্রী, বসন দায়িনী, অন্নদা মায়ের আত্মাকে—দেশরূপী শরীর হইতে স্বতন্ত্র করিয়া তাঁহার সন্তানগণের মানসনেত্রে তিনি যেরূপে প্রতিভাত হন, সেইভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। মায়ে শিল্পী কি দেখিয়াছেন, তাহা এই চিত্রে আমাদের সকলের কাছে বিশদ হইয়া গিয়াছে।—কুহেলিকার মত অস্পষ্ট পদ্মরাজি ও শ্বেত আভা, তাঁহার চারিবাহু ও অনন্ত প্রেমেরই মত তাঁহাকে অতিমানব করিয়া রাখিয়াছে। অথচ তাঁহার শাঁখা, তাঁহার সর্ব্বদেহাচ্ছাদক পরিচ্ছদ, তাঁহার খালি পা তাঁহার খোলা, অকপট মুখের ভাব, এই সকলে তিনি কি আমাদের পরম আত্মীয়, আমাদের হৃদয়ের হৃদয়, একাধারে ভারতের মাতা ও দুহিতা বলিয়া প্রতিভাত হইতেছেন না?—প্রাচীনকালের ঋষিদিগের নিকট বৈদিক ঊষা যেমন ছিলেন?

রামকৃষ্ণবিবেকানন্দমণ্ডলীভুক্তা নিবেদিতা।

১৩১৩ আশ্বিন

The Coronation of Sita & Rama

This picture has been bought recently by the Committee of the Calcutta Art Gallery.

No idea of its beauty can be given to those who cannot see its colour for themselves. Though small, it is a master-piece, chiefly in different shades of yellow. Its date is supposed to be about 1700. The Artist is unknown. In style, it belongs to what it is convenient to call the School of Lucknow, representing a later development of the kind of missal-painting which was practised under the Moguls, and the whole history of which is to be studied in the magnificent library presented by a noble Mohammedan Family to the City of Bankipur.

In conception, 'The Coronation of Sita and Rama' is mediaeval. It compares, in European Art, with pictures of the Court of Heaven. But I cannot remember ever to have seen that idea expressed there with such masterly simplicity and thoroughness. We have here, it will be noticed, a King's Garden and throne, with a palace behind. It is the royal and divine household of Heaven. The Divine Pair sit to receive worship. Around them stand the other persons of the sacred drama, together with their retinue. In the background are seen the white walls of the Ayodhya. And a magnifying glass makes only more

evident the marvellous perfection of detail here. We may note also, in this old Indian picture, the perfect correctness of the perspective. There is no doubt in the artist's mind that the vertical and always vertical, and that parallel lines converge as they recede.

But Ayodhya here is a palace, not a city. The home of the soul, the white-walled vision, is a royal and divine abode, not the country of a great multitude. In this, the idea of the artist is exactly the same as that which the church was always imposing on the mind of Europe. Yet in an Italian picture, of a corresponding thought and period, we should probably have had, as background to the sacred group, some fragment of a great city.

The Indian picture expresses unity. The Italian would have been full of broken suggestions. This is because the one speaks out of a full and coherent social order, present to the consciousness of all its children. The other would have been the utterance of something immeasurabley more complex, but also less aesthetically perfect.

The pearls in this picture are real, being set into the painting. The frame is of mirror. The artist is unknown.

Nivedita—of Rk.V.

সীতা ও রামের রাজ্যাভিষেক।

(ভগিনী নিবেদিতার কয়েকটী মন্তব্যের মর্ম্ম)

কলিকাতা চিত্রশালার কমিটি সম্প্রতি এই ছবিখানি কিনিয়াছেন। যাঁহারা স্বচক্ষে এই ছবিখানির রং না দেখিয়াছেন, তাঁহাদের মনে ইহার সৌন্দর্য্যের কোন ধারণা জন্মাইয়া দেওয়া যায় না। ছোট হইলেও ইহা একটি শ্রেষ্ঠ চিত্র, বিশেষতঃ ভিন্ন ভিন্ন রকমের হল্‌দে রং ফলাইবার নৈপুণ্যে। ইহা বোধ হয় ১৭০০ খৃষ্টাব্দের। চিত্রকরের নাম অজ্ঞাত। চিত্রাঙ্কন রীতিতে ইহাকে লক্ষ্ণৌ শিল্পিসম্প্রদায়ের রীতির অনুযায়ী বলা যায়।

ইউরোপে মধ্যযুগে স্বর্গের দরবারের যে সকল ছবি আঁকা হইত, ইহা সেই ধরণের। ছবিতে একটি রাজোদ্যান ও সিংহাসন এবং পশ্চাতে একটি রাজপ্রাসাদ লক্ষিত হইবে। এখানে যাঁহারা উপবিষ্ট তাঁহারা পূজা গ্রহণার্থ বসিয়াছেন। পশ্চাতে অযোধ্যার শ্বেত প্রাচীর সকল দৃষ্ট হইতেছে। বিবর্দ্ধক কাচ দিয়া দেখিলে এখানে সূক্ষ্ম কারিগরির বিস্ময়কর উৎকর্ষ বেশ বুঝা যায়। এই পুরাতন ভারতীয় চিত্রের পরিপ্রেক্ষিতবিষয়ক নির্ভুলতাও উল্লেখযোগ্য।

ছবিখানির মুক্তাগুলি প্রকৃত মুক্তা, অঙ্কিত নয়। (লেখিকার অনেকগুলি প্রগাঢ় ভাব ও চিন্তাপূর্ণ মন্তব্যের যথাযথ অনুবাদ করা কঠিন বলিয়া চেষ্টা করা গেল না।)

১৩১৩ কার্ত্তিক

সেণ্ট জেনভীভ্।

সেণ্ট জেনভীভ্ পারিসের রক্ষয়িত্রী দেবীরূপিণী।। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে তাঁহার জন্ম হয়। ঐ শতাব্দীতে যখন পারিসনগরী ফ্রাঙ্কদিগের দ্বারা আক্রান্ত ও অবরুদ্ধ হয়, তখন উহার অধিবাসীরা অনশনে মৃত্যুমুখে পতিত হইবার উপক্রম হইযাছিল। এই বিপদে এই পূতশীলা নারী শত্রুদিগকে ভয় না করিয়া একটি নৌকায় নগর হইতে পলায়ন করেন এবং ফ্রান্সের নগরে নগরে ভিক্ষা করিয়া ১২টি জাহাজ বোঝাই খাদ্য পারিসে আনিযা নগরবাসীদের প্রাণরক্ষা করেন। আর একবার তিনি পারিসবিজেতা হিল্লারিকের শিবিরে গিয়া তাহাকে তাহার নিষ্ঠুরতার জন্য তিরস্কার করেন। তাহাতে বন্দীকৃত পারিসবাসীদের প্রাণরক্ষা হয় এবং নগরবাসী অপর সাধারণের প্রতি হিল্লারিক দয়া প্রদর্শন করে। এইরূপ নানা অবদানপরম্পরা দ্বারা সেণ্ট জেনভীভ্ পারিসবাসীদের রক্ষয়িত্রী দেবী পদে অধিষ্ঠিতা হইয়াছেন।। এই চিত্রে তিনি নিদ্রিত নগরীর জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। পারিসের প্যান্থিয়নের দেওয়ালে Puvis de Chavannes কর্ত্তৃক অঙ্কিত সেণ্ট জেনভীভের জীবনচরিতবিষয়ক উৎকৃষ্ট চিত্রাবলীর ইহা অন্যতম। ফরাসীরা তাঁহাদের পূজ্যতম ব্যক্তিগণের চিরবিশ্রামস্থল এই মহান্ উপাসনামন্দির নানা পৌর ও ঐতিহাসিক প্রাকারচিত্রে বিভূষিত করিয়াছেন,—আমরা যেমন ভবিষ্যতে কোন দিন আমাদের মিলন-মন্দিরকে (Federation Hall) অলঙ্কৃত করিতে পারি।

এই ছবিখানি একখানি প্রাচ্য ছবি হইতে পাবিত। এই প্রাচীনা পুণ্যবতী নারী অবগুণ্ঠনাবৃতা। সত্য বটে, এই অবগুণ্ঠন খৃষ্টীয় সন্ন্যাসিনীর অবগুণ্ঠন, প্রাচ্য গৃহস্থাশ্রমের অবগুণ্ঠন নহে। তথাপি ইহাতেই তাঁহার সহিত আমাদের সম্পর্ক সূচিত হইতেছে। আমরা নিদ্রিত নগরীর অলিন্দের ছাদ, অনেক গৃহের সমতল ছাদ, এবং টাইল আচ্ছাদিত অট্টসমূহ দেখিতে পাইতেছি। আমাদের তুলসী গাছের মত, গৃহের বাহিরে গোলাপ গাছ ও ভিতরে ক্ষুদ্র দীপ রহিয়াছে। সেণ্ট জেনভীভের মুখ ও মূর্ত্তি অনায়াসে কোনও হিন্দু বিধবার মুখ ও মূর্ত্তি হইতে পারিত। ঠিক্ এই ছাঁচের চেহারার শত শত হিন্দু বিধবাকে আমরা জানি না কি?

এই চিত্রখানি বোধ হয় আধুনিক শিল্পে পুরপ্রেমের সুন্দরতম অভিব্যক্তি। নিদ্রিত জগতের হিতার্থ রাত্রি জাগরণ ও পরার্থ প্রার্থনা নারীর শাশ্বত বিধিনির্দ্দিষ্ট জীবনোদ্দেশ্য। এই জীবনোদ্দেশ্য এই চিত্রে আমাদের নিকট প্রকটিত হইয়াছে। অতীতে গৃহস্থাশ্রমে ও ধর্ম্মমণ্ডলীতে নারী যেমন ছিলেন, ভবিষ্যতেও তেমনি, বিশালতর চিন্তা ও আয়ততর অনুভূতির আলোকে, তিনি পৌরজন ও জাতির উপর প্রসারিতা প্রেমস্পন্দনশালিনী কল্যাণ-ধ্যান-নিমগ্না প্রার্থনাশক্তিরূপিণী হইবেন।

রামকৃষ্ণবিবেকানন্দমণ্ডলীভুক্তা নিবেদিতা।

Sainte Genevieve watching over Paris.

Sainte Genevieve is the Patron Saint of Paris. And here she is represented as praying over the city while it sleeps This is one of the series

of great frescoes of the Life of Sainte Genevieve painted by Puvis de Chavannes on the walls of the pantheon in Paris. For the French have decorated this great Church,—the resting-place of their most honoured dead,—with civic and historic mural paintings, just as we may do in the future with our Federation Hall.

This particular picture might almost be oriental. The elderly saint wears a veil. True, it is that of the nun, not that of the eastern household. Yet, it suffices to strike the note of kinship. We note also the terrace-roof, the many flat house-tops and tiled towers of the sleeping city, the rose-tree, so like our *tulsi*, in the sun outside, and the tiny lamp within, the doorway. The face and figure of Sainte Genevieve herself might well be those of some Hindu widow. Do we not all know a hundred of just this type?

And so, in what is perhaps the finest expression of the civic spirit in modern art, we have again the eternal mission of womanhood revealed to us as intercessor and vigil-keeper for the sleeping world. As in the past to household and to church, so also in the future, in the light of a larger thought and wider consciousness, a brooding power of prayer throbbing above the city and the nation.

Nivedita of Rk.V.

১৩১৩ অগ্রহায়ণ

Millet's Angelus.

Every one has heard of the controversy between realism and idealism in art. And yet no picture could offer us stronger proof than of one which is given herewith, that such distinctions are only verities in the hands of little men. For no one could be a greater realist than Jean Francois Millet, the leader of the little group of painters who have made of the french village of Barbizon a sacred name in European Art. No one could be a greater realist. And yet, was there ever such idealism, as casts its glow over his great masterpiece, the Angelus?

The word Angelus, it should be explained, is the name of a prayer, or, rather, of an act of worship. It consists of the words of salutation which the Angel said to Mary, the Blessed Virgin, when he told her that she was to be the mother of the Christ. "Hail Mary! full of grace! The Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus!" In a very special sense, this salutation represents to the Christian what may be called the memorial of the Incarnation; it brings

him closer than anything else to that mysterious union between the human and the Divine, which according to his belief sums up the mystery of Jesus. Pious Catholics, therefore, make a habit of saying these words over to themselves at certain definite hours of morning, noon, and evening, and in Catholic countries, or in Catholic religious houses, a public signal is given for the prayer, by the ringing of the church-bell, when all work stops for a moment, while it is quietly repeated.

This is the moment, then, which we witness in this picture. A couple of peasants, hoeing potatoes in a field, are suddenly caught up by their own simple reverence and the sound of the Angelus-bell, into the great drama of heaven and earth. And we who look at the picture, become aware, not of peasants at all, not of field nor hoe, nor even distant church, but of the far larger and greater truth a Nation's Labour Sanctified by Prayer.

This picture has always seemed to me to have a special message for the Modern Indian Artist. For there is nothing here that did not come to Millet straight from Nature. Everything in the scene is a reproduction from fact. Yet it is fact reproduced, not as by the photograph, but as by the poet, the prophet, the seer. It is Nature and fact *interpreted* by the mind and the heart of a great man.

It is realism. True. But it is also idealism. Ah, is there no scene, no figure in India to-day, that deserves the love that would struggle till it, too, had been expressed as worthily as this?

Nivedita of Rk.V.

শ্রদ্ধেয়া ভগিনী নিবেদিতা যে চিত্রটির সম্বন্ধে লিখিয়াছেন তাহার বিষয় এই। একটি কৃষক ও একজন চাষী স্ত্রীলোক দূরাগত উপাসনার ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া, মাঠে গোল আলু তুলিতে তুলিতে, ভক্তিভরে অবনতমস্তকে ভগবান্‌কে স্মরণ করিতেছে। একটি জাতির শ্রম ধর্ম্মের প্রভাবে পবিত্রীকৃত হইয়াছে, ছবিটি দেখিলে ইহাই আমাদের মনে হয়। ভগিনী নিবেদিতা আমাদের আধুনিক শিল্পীদিগকে এই ভাবের ছবি আঁকিতে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন।

প্রবাসী-সম্পাদক।

১৩১৩ চৈত্র

NOTES ON PICTURES

It seems wise, in our reproduction of notable European pictures, to go on for a series of months giving only modern works. In this way, we hope to create a broad impression in the mind of the reader, as to the subjects and methods of the European art of the present age, and then go back to an earlier period, and try to illustrate the way in which this power was gained, by

reproducing a few typical examples of older masterpieces.

One reason for choosing this order of procedure, lies perhaps in the fact that if our readers saw first a Virgin and Child by Botticelli, the Avenue of Trees at Middelharnis by Hobbema, a few Madonnas by Raphael, and the Last Supper by Leonardo da Vinci, they might not care for the much slighter work of the moderns. Men were much more serious over their painting in the old days. and consequently they gave birth to conceptions which carry with them an air of eternity. They painted in the grand style. Modern work is slighter, more personal; it seeks intimate and elusive moments. And by the same rule, while it is often exquisite, it is almost always fugitive, in the impression it makes on the beholder.

When it fails, on the other hand, it fails by pettiness and melodrama, whereas the old painters were always sincere, never self-conscious, and may have been stiff or crude or exaggerated in many ways, but could never by any means have been guilty of vulgarity.

One great reason for these differences lies in the fact that the artists of Italy, Germany and Holland, from the thirteenth to the sixteenth centuries, had a much smaller choice of subjects than the moderns. At first, at least in Italy, they painted very little except religious subjects. Then they began to draw upon the Greek and Latin classics, and we have Venuses and Auroras and Sun Gods, and the rest. It was in Holland that the idea of realism, or painting the common things of common life, was born. And now a days it often seems as if an artists, only idea were to paint something that had never been painted before. Yet even now, the dreamers and poets of Europe and a painter is only a poet singing in colour—cannot help turning back time and again to the old religious themes. Perhaps a man feels that until he has painted a Madonna, or a Last Supper, like the old masters, he has not fully measured his power. Perhaps the impulse is finer than this, a desire to translate high ideals into the common tongue. In any case some of the finest pictures, even in modern times are, religious and Christian. This was so, though not in its full sense, with the two modern European pictures which we have already given, St. Genevieve watching over Paris, by Puvis de Chavannes, and the Angelus by J. F. Millet. But of the picture which we give in the present month, it is true in a much larger way. This is actually a modern Madonna, by a living painter, Dagnan Bouveret.

Different as they are in many ways, there is something in the spirit of this work that brings it and the Angelus of Millet very close together. It is the blending of the ideal with the real. In this picture, we scarcely know whether the mother is portrayed as an Italian peasant-woman or as a nun. The child is an Italian peasant-baby. In no detail has the artist shrunk from faithful copying of his original. The arbor in which we see the two, is a vine-clad

verandah cooling the door of a peasant-home, a common form, it may be, for the Italian farmhouse or cottage. But it is meant to suggest a cloister. The simple woollen gown of the mother with the heavy peasant *Sabots*, is meant for the habit of the nun. Every detail of the painting is charged with symbolism. We are made to realise that this is not the mother of Jesus, nor yet the peasant-wife it seems. It is the very soul of man, of each or any of *us* clasping to itself that thought it holds most dear.

To be fully felt, this picture should be seen for the first time suddenly. It is only in this way, that one can be adequately touched and held by the wonderful intimacy of the eyes. I know of no other picture, of any period, in which the heart is so powerfully made to tell the secret of its own tenderness.

Nivedita of Rk.V.

চিত্র সম্বন্ধে।

আমরা য়ুরোপীয় বিখ্যাত চিত্রকরদিগের চিত্র-প্রতিলিপি কতকগুলি ক্রমানুযায়ী প্রকাশ করিব। প্রথমতঃ আধুনিক চিত্র হইতে আরম্ভ করিয়া পুরাতনের দিকে অগ্রসর হওয়া যুক্তিসঙ্গত মনে করি। আধুনিক চিত্রের দ্বারা বর্ত্তমান কালের য়ুরোপীয় চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি ও অঙ্কিতব্য বিষয় সম্বন্ধে একটা মোটামুটি রকম ধারণা করিয়া লইয়া প্রাচীন শিল্পগুরুদিগের কয়েকটি বিশেষ চিত্র-দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিব, এইরূপে কোথা হইতে বর্ত্তমানের ক্ষমতা অর্জ্জিত হইয়াছে।

এইরূপ বিপরীত প্রণালী অনুসরণের একটি প্রধান কারণ এই যে হয়ত পাঠক প্রথমত বটিসেল্লি-অঙ্কিত 'মাতা ও শিশু', হবেমা রচিত 'মিডেলহেনিসের তরুবীথি', র‍্যাফেলের কয়েকটি 'মাতৃমূর্ত্তি' এবং লিওনার্ডো ডা ভিন্সি-অঙ্কিত 'শেষ ভোজ' দেখিলে পরে আধুনিক শিল্পীর হীনতর চিত্র দেখিয়া তাঁহার চিত্ত প্রসন্ন ও মনোযোগী নাও হইতে পারে। প্রাচীন শিল্পিগণ তাঁহাদের রচনা বিষয়ে অধিকতর গভীরভাবানুপ্রাণিত ছিলেন, এজন্য তাঁহাদের চিত্রের অভিব্যক্তির সহিত অনাদ্যনন্তের একটি গূঢ়ভাব জড়িত দেখা যায়। তাঁহাদের চিত্র ঐশ্বর্য্যময় অপূর্ব্ব সুন্দর পদ্ধতিতে অঙ্কিত হইত। বর্ত্তমান কালের চিত্র অধিকতর স্বসম্বন্ধীয়, পরিচিত অথচ কষ্টায়ত্ত ঘটনাই তাহাদের অনুসম্বন্ধেয়, এজন্য প্রাচীন কালের অপেক্ষা হীনতর, এবং সেই কারণেই যদিও এ সকল অনেক সময় সৌন্দর্যের হিসাবে অতি চমৎকার, তথাপি দর্শকের মনের উপর স্থায়ী প্রভাব মুদ্রিত করিতে পারে না। অপর পক্ষে যখন চিত্র সফলাঙ্কন হয় না, তখন তাহার কারণ—বিষয়ের তুচ্ছতা এবং কষ্টকল্পনা। পুরাতন শিল্পিগণ সতত সবল সহজভাবে ও আত্মবিস্মৃত হইয়া চিত্রেই নিবিষ্ট হইতেন; হয়ত কাহারো কাহারো বা চিত্র আড়ষ্ট বা অস্ফুট সামান্য ভাবের বা অপ্রাকৃত অতিরঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু কেহই কখন হীনতা বা তুচ্ছতার দোষে দুষ্ট নহেন।

উভয় যুগের চিত্রের বৈষম্যের একটি কারণ, ত্রয়োদশ হইতে যোড়শ শতাব্দীর ইটালি, জর্ম্মণী ও হলাণ্ডের শিল্পিগণের আধুনিক শিল্পী অপেক্ষা অঙ্কিতব্য বিষয়াল্পতা। বিশেষত ইটালিতে প্রথমত কেবল ধর্ম্মবিষয়েই চিত্রচর্চ্চা হইত। তৎপরে প্রাচীন গ্রীক ও লাটিন পুরাণের বিষয় আরম্ভ হয়, তাহার ফলে রতিদেবী, ঊষাদেবী, সূর্যদেব ও অন্যান্য দেবদেবীর চিত্র অঙ্কিত দেখিতে পাই। হলাণ্ডেই প্রথম বাস্তবের প্রচলন, অর্থাৎ সাধারণ জীবনের সাধারণ ঘটনা অঙ্কন আরম্ভ হয়। এবং অনঙ্কিতপূর্ব্ব বিষয়ের অঙ্কনই অধুনাতনকালের চিত্রকরের একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এখনো সকল য়ুরোপীয় কল্পনাকুশল ও কবিশিল্পি—চিত্রকরও কবি, যদিও তাঁহার মধুর সঙ্গীত শব্দে নহে, বর্ণে

পরিস্ফুট—এখন তখন ফিরিয়া ফিরিয়া সেই প্রাচীন ধর্ম্মবিষয়ের দিকে যাইতে বাধ্য হইয়া থাকেন। বোধহয় তাহাদের মনে হয় যে প্রাচীন চিত্রগুরুদিগের মত যদি মাতৃমূর্ত্তি বা শেষ ভোজ না আঁকিতে পারিলাম তবে আমাদের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভার পূর্ণ যাচাই হইল কৈ? বোধহয় সেরূপ প্রবর্ত্তনার কারণ এতদপেক্ষাও সূক্ষ্মতর,—সে হয় ত উচ্চআদর্শকে সাধারণ ভাষায় ব্যক্ত করিবার অদম্য বাসনা। প্রবর্ত্তনার কারণ যাহাই হউক আধুনিক যুগেরও উৎকৃষ্টতম চিত্রের অধিকাংশই ধর্ম্মচিত্র এবং খৃষ্টীয়। আমরা যে দুটি চিত্র ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি, স্যাভ্যান্নিস্ অঙ্কিত প্যারি প্রহরায় নিযুক্তা ধর্ম্মিষ্ঠা জেনিভিভ ও জে, এফ, মিলেট অঙ্কিত উপাসনার ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণে, তাহাদের জন্ম সম্পূর্ণ না হইলেও কতকটা এইরূপ ধর্ম্মভাবপ্রসূত। বর্ত্তমান মাসে প্রকাশিত চিত্র সম্বন্ধে এ কথা অধিক রূপে বলা যাইতে পারে। ইহা জীবিত চিত্রকর দাগনান-বুভারেট অঙ্কিত বাস্তবিক একটি আধুনিক মাতৃমূর্ত্তি।

যদিও বর্ত্তমান চিত্রে ও মিলেটের 'ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণে' চিত্রে বহু বিষয়ে পার্থক্য রহিয়াছে, তথাপি এই চিত্রের অন্তরে এমন একটি ভাব আছে যাহা উভয়ের ঘনিষ্ঠতা সূচিত করিতেছে। তাহা আদর্শের সহিত বাস্তবের সম্মিলন, এই চিত্রাঙ্কিত মাতা যেন কোন ইটালীর কৃষকপত্নী অথবা সন্ন্যাসিনী এবং শিশুটি যেন ইটালীয় কৃষক শিশু। চিত্রকর বাস্তবের কোনো অংশ বাদ দিয়া অঙ্কিত করেন নাই। যে লতাবিতানে আমরা শিশু ও মাতা উভয়কে দেখিতেছি, তাহা হয়ত কোন কৃষককুটিরের দ্রাক্ষালতাবেষ্টিত বারান্দা, এবং হয় ত বা এইরূপ বারান্দা ইটালীয় কৃষিগৃহ বা কুটিরের নিতান্ত নিজস্ব সাধারণ সম্পত্তি। কিন্তু ইহা দ্বারা সন্ন্যাসাশ্রম সূচিত হইয়াছে। মাতার অনাড়ম্বর পরিচ্ছদ ও স্থূল কাষ্ঠপাদুকা সন্ন্যাসিনীর পরিচ্ছদ সূচনার জন্য অঙ্কিত বুঝিতে হইবে। এইরূপে চিত্রের প্রতিটি বিষয় বিশেষ কিছুর ইঙ্গিত জানাইতেছে। চিত্র দেখিয়া আমাদের মনে হয়, ইনি ঠিক যিশুমাতা নহেন, কিংবা কোন কৃষকপত্নীও নহেন। ইহা যেন মানুষের—আমাদের প্রত্যেকের বা আমাদের মধ্যে কাহারো—আত্মা, তাহার সর্ব্বপ্রিয় ভাবটিকে সস্নেহে আঁকড়িয়া ধরিয়া আছে।

এই ভাবটি পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, সর্ব্ব প্রথমবার সহসা এই চিত্র চক্ষুসম্মুখে ধরা দরকার। কেবল এইরূপে দর্শকের চিত্তের গূঢ়স্থান স্পষ্ট হইবে, এবং তিনি তাহার সহিত তাঁহার অন্তরের অত্যাশ্চর্য্য ঘনিষ্ঠ পরিচয় দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন। আমি আর কোন যুগের আর এমন কোন চিত্রের কথা জানি না, যাহাতে হৃদয় তাহার কোমল মধুর ভাব এমন সুস্পষ্ট করিয়া পরিব্যক্ত করিতে পারিয়াছে।

১৩১৪ জ্যৈষ্ঠ

QUEEN LOUISE

By Richter

Sister Nivadita

Doubtless this picture is known to many of our readers. It is the portrait of that beautiful Queen of Prussia, to whose reiterated entreaties for her country. Napoleon Bonaparte is said to have been first deaf, then half-humorous, and last of all abrupt, in his refusal. The so called "insult" offered by him

to Queen Louise in the beginning of the century, was diligently kept in mind by those who desired to stir up war with France, and had no little part in bringing about the terrible revenge of 1870. For Queen Louise was the mother of the old "Grey Kaiser" William, who was the first Emperor of United Germany, and she has become a kind of patron saint in the new German tradition.

We see her here, attired for the state banquet of Napoleon's reception, in what is known as an "Empire" gown, from the fact that it represents the fashion that characterised the Napoleonic Court. As a type of a noble and beautiful woman, a queen full of love of people and country, strong amidst reverse, sweet and patient under poverty, it deserves long study. The absence of all jewels save crown and wedding ring marks the moment as one of national desolations. The lofty brow shows intellect, even as the ermine cloak bespeaks the ceremonial occasion. But the clear forth-shining eyes, and the face, with its gravity and innocence, tell that this woman, seated amongst kings, and and guardian of a nation's vows, was none the less of peerless womanhood, full of purity and modesty and incorruptible simplicity, possessed of the mind of a statesman, and the heart of a child.

চিত্র-পরিচয়।

রিক্‌টার অঙ্কিত রাণী লুই। ইনি প্রুশিয়ার রূপলাবণ্যময়ী রাণী; যুক্তজর্ম্মণীর প্রথম সম্রাট প্রজাপূজ্য কৈসর উইলিয়মের জননী। সাম্রাজ্যলোলুপ নেপোলিয়ন বোনাপার্টি যখন দিগ্বিজয় আরম্ভ করেন, তখন রাণী লুই আপনার দেশ রক্ষার জন্য নেপোলিয়নের নিকটে বহু অনুনয়প্রার্থনা করেন। নেপোলিয়ন প্রথমতঃ বধির, পরে শ্লেষবর্ষী এবং অবশেষে অকস্মাৎ অনুরোধ রক্ষা করিতে অস্বীকৃত হয়েন।

নেপোলিয়ন প্রুশিয়া জয় করিয়াছেন। বিজয়ীর দৃপ্ত অভিমান সান্ত্বনা করিবার জন্য অভিনন্দন-অভ্যর্থনার উৎসব আয়োজন হইয়াছে। অত্যাচারের উপর অপমান সংযোগ; রাণী তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবেন। এই চিত্রে রাণীর সেই অবস্থা চিত্রিত হইয়াছে।*

রাণী নেপোলিয়নের দরবারের দস্তুর মত পরিচ্ছদ- পরিহিতা। মহীয়সী সুন্দরী মহিলা, প্রজা ও দেশপ্রীতি-পূর্ণপ্রাণা, রাণী, বিপদে অচলা, দারিদ্র্যে ধৈর্য্যশীলা মধুময়ী, আমাদের সযত্ন প্রণিধানযোগ্য। মুকুট ও বিবাহের অঙ্গুরী ব্যতীত সকল রত্নাভরণের অভাব জাতীয় দুর্দ্দিন জ্ঞাপন করিতেছে। প্রতিভাদীপ্ত উন্নত ললাট, স্বচ্ছ উজ্জ্বল দৃষ্টি, সরল গম্ভীর মুখ, আমাদিগকে যেন মুক্তকণ্ঠে বলিয়া দিতেছে যে এই যে মহিলা নৃপতিবৃন্দ পরিবৃত হইয়া বসিয়া আছেন, ইনি অসাধারণ স্ত্রীলোক, ইনি একটি জাতির রক্ষয়িত্রী দেবী, পবিত্রতা শালীনতা ও সরলতাময়ী, এবং ইঁহার মন রাজনীতিবিশারদের মত ও হৃদয় শিশুর ন্যায়।

* জর্ম্মণেরা এই অপমানের প্রতিশোধ দিতে বিস্মৃত হয় নাই। ১৮৭০ সালের ফরাসী বিজয়ে তাহাদের বহুপোষিত প্রতিহিংসা তৃপ্তিলাভ করিয়াছিল।

১৩১৪ আষাঢ়

PEASANT GIRLS

By Jules Bretion
Sister Nivedita

How beautiful and powerful, and yet how simple and true to common life, are these two peasant girls by Jules Breton! One has stopped, enchanted on her way out to work in the sunrise, to listen to the song of the soaring lark; and the other, having finished her day's gleaning, is returning, with swinging step, to her home. In each, the beauty of the picture lies in something below the surface. In one it is the look of ecstasy as if the child's heart joined in the bird's song; in the other more beautiful than the dark strong beauty of the face, is the balance and poise of the freely moving figure. It is a beauty seen constantly in Indian streets and road ways. How many hundreds of times in a day might one note just this queenly bearing in coolie woman or in peasant, but none, alas, have eyes of reverent and sympathetic vision wherewith to see.

It is interesting to remember that out of the seven modern pictures which we have now reproduced, six have been French, and one German. The French have made no secret of the fact that their one great object was the renewing of the home-land—"pour refaire la patne"—and that for that, they were working so hard before the eyes of the world in science, in art, in literature, in industry, in agriculture; and even the German, Richter, in his portrayal of Queen Louise, seeks obviously the glory of Germany rather than his own.

There can be no doubt that some of the greatest art of the world, in many different ages, has been born of the impulse of Nationality, and still is the great idea fertile and potent, ready as ever to lead new generations to new and untried heights.—N.

চিত্র-পরিচয়।

জুলস ব্রেটন অঙ্কিত কৃষক-কন্যা। এই দুইটি কৃষক-কন্যা কি সুস্থ সুন্দর। একজন সূর্যোদয়ে কাজে যাইতে : উচ্চ-গগন বিহারী ভারয় পক্ষীর গান শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া থামিয়াছে; অপরা সমস্ত দিনের উঞ্ছবৃত্তি শেষ করিয়া লীলায়িত গতিতে গৃহে ফিরিতেছে। প্রত্যেক চিত্রের সৌন্দর্য্যই গূঢ় যত্নানুমেয়। একটিতে আনন্দোচ্ছল দৃষ্টি যেন বালিকা হৃদয় বিহগসঙ্গীতে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়াছে; অপরটিতে স্বাস্থ্য বন্ধুত্ব মুখের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা তাহার সহজ সঞ্চলিত দেহখানির সামঞ্জস্য ও শ্রী অধিকতর চিত্তহারী। এরূপ সৌন্দর্য্য ভারতের পথে ঘাটে দেখা যায়। দিনের মধ্যে কত শত বার এই রাণীজনোচিত শ্রী কুলিরমণী বা কৃষকপত্নীতে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু হায়, সহানুভূতি ও সম্ভ্রমপূত দৃষ্টি কয়জনের আছে?*

* বাংলার কৃষক কন্যার স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্য অনশন ম্যালেরিয়া প্রায় নিঃশেষে শোষণ করিয়া লইয়াছে। স্বাস্থ্যের অনিন্দ্য নিটোল মুক্ত স্বাধীন সৌন্দর্য্য যদি

পাঠক স্মরণ রাখিবেন যে আমরা আজ পর্য্যন্ত যে ৭ খানি চিত্র প্রকাশ করিলাম, তাহার ৬ খানি ফরাশী ও ১ খানি জর্ম্মন। ফরাশীর একমাত্র উদ্দেশ্য আপনার মাতৃভূমির স্মরণ; এজন্য বিজ্ঞান, শিল্প, কলা, সাহিত্য, কৃষি প্রভৃতি সকল বিভাগে তাহার বিপুল শ্রমনিদর্শন বিদ্যমান দেখা যায়; এবং এমন কি জর্ম্মন রিক্‌টারও রাণী লুইর চিত্র অঙ্কিত করিয়া তাঁহার আপনার নিজের অপেক্ষা স্বদেশ জর্ম্মনীর যশোগৌরব অধিক কামনা করিয়াছেন দেখা যাইতেছে। যুগে যুগে প্রসূত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পের মধ্যে বহুতর যে এই জাতীয়তা প্রণোদিত তাহা নিঃসন্দেহ বুঝা যায়; এবং এখনো সেই মহান, সক্ষম প্রবর্ত্তনা নবতর বংশপরম্পরাকে নূতন ও অননুসৃত উচ্চ আদর্শের পথ দেখাইবার জন্য সতত প্রস্তুত আছে।—নিঃ

দেখিতে হয়, তবে দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্র রাজ্যে যাইতে হয়। বম্বের পথে ঘাটে পুষ্টকেশীযুক্তা ভারবাহিনী মহারাষ্ট্ররমণীর সৌন্দর্য্য শ্রদ্ধা সম্ভ্রম উদ্রেক করে। প্রবাসী সম্পাদক।

১৩১৫ জ্যৈষ্ঠ
[নন্দলাল বসুর সতী-চিত্র]

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু কর্ত্তৃক অঙ্কিত "সতী" চিত্র অতি সুন্দর ও সাত্ত্বিকভাবপূর্ণ হইয়াছে। বিবাহসজ্জায় সজ্জিতা সতী মহত্তম আত্মোৎসর্গের সময়ও সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতা; তিনি যে অসাধারণ কিছু করিতেছেন, তাহা তিনি মোটেই অনুভব করিতেছেন না। অগ্নিশিখা সকল ভীষণ রাক্ষসের জিহ্বার মত লক্‌ লক্‌ করিয়া ঊর্দ্ধে বিস্তারিত হইতেছে। তিনি সেই অগ্নিশিখা-সিংহাসনে নির্ভয়ে জানু পাতিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার ইষ্ট দেবতার আরাধনার সহিত অশ্রুপাত বা অস্ফুট ক্রন্দনধ্বনির সংমিশ্রণ নাই। তাঁহার চক্ষু আর কিছু দেখিতেছে না— নিম্নস্থ অগ্নিশিখা, বা যে সকল প্রিয়জনকে তিনি ছাড়িয়া যাইতেছেন, কিছুই তাঁহার চোখে পড়িতেছে না—তিনি কেবল তাঁহারই পবিত্র মূর্ত্তি দেখিতেছেন, যাঁহার সহিত তিনি অচিরে মিলিত হইতে যাইতেছেন। তাঁহার চিত্ত স্থির, শান্তিতে প্লাবিত। ইহা মিলনের মুহূর্ত্ত। তিনি বিচ্ছেদের কথা জানেন না।

এই সম্পূর্ণ নির্ভীকতায়, আত্মগৌরবানুভূতির সম্পূর্ণ অভাবে, আমরা নারীচরিত্রের মহিমা সম্বন্ধে ভারতীয় ধারণার কি আশ্চর্য্য সাক্ষ্য পাই! অন্যান্য দেশে, লোকে, ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্য, স্বাধীনতার জন্য, জ্ঞানার্জ্জন ও জ্ঞানবিস্তারের অধিকার লাভ ও রক্ষার জন্য, বা এবম্বিধ অন্য কোন মহৎ ব্যাপারের জন্য, যাহা করিয়াছে, ভারতে তাহাই কুসুমকোমলা নারী দাম্পত্য প্রেমের জন্য সহস্র গুণ অধিকবার করিয়াছে। যাঁহারা এরূপ মাহাত্ম্য দেখাইয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বথা পূজনীয়া। যে জাতির মধ্যে তাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদের সাহস ও নিষ্ঠা কখনও বিলুপ্ত হইবার নহে। সহমরণ প্রথায় তাহা আর দেখা দিবে না, দেওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। কিন্তু আমাদের জাতিগত

এই সাহস ও নিষ্ঠা ভবিষ্যতে অনেক রাষ্ট্রীয় ও বিশ্বব্যাপী ঘটনায় আবার দেখা দিবে।

Sati

Nandalal Bose

Sister Nivedita

Had the painter of this picture been a European, we should unquestionably have had the subject presented to us as a fine-looking woman, drawn to her full height, and facing the spectators in a mingling of beauty and triumph. Nothing could be more significant of the distinctive character of Indian feeling, however, than the way in which Mr. Nanda Lal Bose has here set himself to approach the idea. We see before us a woman, beautiful indeed, and adorned like a bride, with her whole mind set on the moment of triumph, yet without the slightest consciousness of her own glory. The form is pure Sattva, without one particle of Rajas, as the Indian thinker might express it. The spire-like flames leap up. She kneels throned on a summit of fire. Yet there is no fear. No farewell sob is mingled with her praying. Here eyes see nothing—neither the flames beneath, nor the loved ones she is leaving--nothing at all, save the sacred form of him whom she is about to rejoin. Her mind is quiet, flooded with peace. The moment is one of union. She knows nothing of separation.

In this perfect fearlessness, this absence of any self-consciousness, what a witness we find to the Indian Conception of the Glory of Woman! What other lands have done in the name of the great causes,— for faith, for freedom, for the right of knowledge,— was here done, a thousand times more commonly, out of the sweet tenderness of the home. Well may the women who have done this thing be worshipped by their descendants for all time. And certain is it that in the race that has borne them, their courage and high fealty can never die, but remain hidden, not again to be used in this form truly, but to find new utterance and fresh expression in the world-shaking crises of future ages. From the cloistered wifehood of the old Indian home to the martyr death of the Great saint—was it not in truth a path of glory, on which each footprint should receive our salutation?

[মূল ইংরেজি লেখাটি মডার্ণ রিভিউ পত্রিকার এপ্রিল ১৯০৮ সংখ্যায় প্রকাশিত]

১৩১৬ বৈশাখ

চিত্রপরিচয়।

মহাদেবের তাণ্ডবনৃত্য।

এই চিত্র শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর অঙ্কিত। বিশ্বজগতের মঙ্গালে যে আনন্দ, সেই আনন্দরসপানে বিভোর নৃত্যপরায়ণ শিবের মূর্ত্তি চিত্রকরের কবিসুলভ কল্পনাশক্তি ও শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক। সত্য বটে শিব প্রলয়জনিত ধ্বংসের মধ্যে নৃত্য করিতেছেন, তাঁহার পার্শ্বে ও পদতলে প্রলয়াগ্নির শিখা ও রক্তিম আভা দৃষ্ট হইতেছে; কিন্তু প্রলয়ের মধ্যেই সৃষ্টির বীজ নিহিত, মৃত্যুই উচ্চতর জীবনের দ্বার, নাশ স্থিতিরই রূপান্তর। (পৃ-৬৭)।

[মডার্ণ রিভিউ পত্রিকার ১৯০৯ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় নিবেদিতা-কৃত The Dance of Shiva রচনার অতি সংক্ষিপ্ত মর্মানুবাদ উপরে প্রকাশিত। নিম্নে মূল রচনাটি উদ্ধৃত :]

The Dance of Shiva

Sister Nivedita

In the world, there is but one India, and even in India, only one Shiva! (The God of the bliss that lies in nothingness, God of utter-most renunciation, God of the rapture of annihilation,—the conception of Mahadeva represents as extraordinary an achievement of the human mind, in one line,) as Newton's *Principia* in another. For sheer emotional profundity, for philosophical daring and for the directness of its approach to the Infinite, the whole world's poetry can offer nothing like this piece of Hindu mythology. From the lowest savage upwards—may be, from our four-footed brethren upwards!— all have known how to worship a Creator and Preserver, a Personal Guide and Providence, a friend and father of men. But who, save the sons of our Motherland, have dared to loves Him who breaks the Illusion. Him who neither asks nor bestows anything save the freedom of the soul, Him who loves only the rejected-of-the-world, Him whose intoxication of joy lies in the annihilation of all things?

It is not the Shiva of myth and legend, but this Shiva of absolute insight, of unassailable certainty, who is bodied forth as the Dancer of Destruction. Shiva as Nata-Raja, the Dancing King, is the creation of the South, where His form is the commonest of all emblems. The South seizes on the heart of philosophy, on the life-spring of theology. She gives us no static God, no remote Sannayasin, lost in meditation, but—Shankaracharya's Adwaita, and the common craftsman's Nata-Raja.

The present age has democratised and universalised every local trait and attribute. With burning thirst, we drink of the Adwaita, and appropriate, as a great genius has here done, the symbols of that faith.

'The Dance of Shiva' is Samadhi become dynamic. It is Samadhi represented as physical activity. Just so must it be, and no otherwise. The pillars and arches of heaven are falling. The Trisul (trident) is flaming. The universe is on fire. And He the Immortal

অমৃত শেরগিল • অগ্রহায়ণ ১৩৪৩

অসিতকুমার হালদার • মাঘ ১৩৪১

রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি • কার্তিক ১৩৩৭

"ঘট ভরা" কবিতার বিচিত্রিত পাণ্ডুলিপি
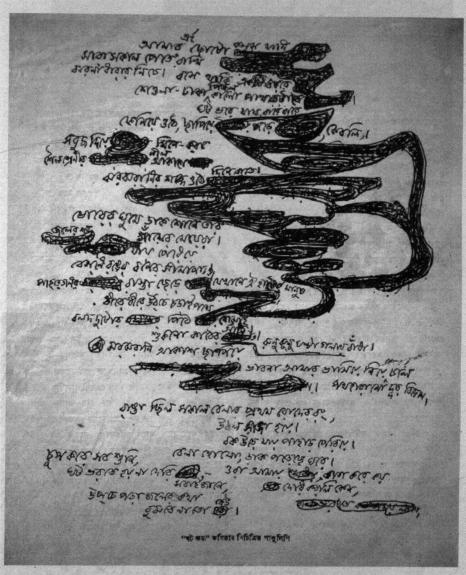
রবীন্দ্রনাথের 'ঘটভরা' কবিতার বিচিত্রিত পাণ্ডুলিপি
• অগ্রহায়ণ ১৩৪৩
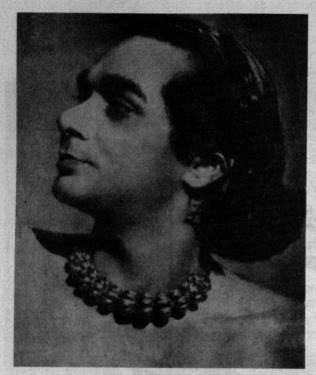
উদয়শংকর • কার্তিক ১৩৪৭

নৃত্যরত উদয়শংকর • পৌষ ১৩৪১

কথাকলিতে বিভিন্ন ভাবের অভিব্যক্তি : অভিনেতা শঙ্করণ নাম্বুদ্রি

• চৈত্র ১৩৪১

গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় • মাঘ ১৩৪১

শান্তিদেব ঘোষ • শ্রাবণ ১৩৪৩

নৃত্য ও সংগীতের ব্যবস্থাপক হরেন ঘোষ • জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫

বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে • কার্তিক ১৩৪৩

চন্দননগরে বঙ্গীয় সাহিত্যিসম্মিলন

উদ্বোধক : রবীন্দ্রনাথ

ইতিহাসশাখার সভাপতি : যদুনাথ সরকার

মূল সভাপতি : হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

সাহিত্যশাখার সভাপতি : প্রমথ চৌধুরী

চৈত্র ১৩৪৩

যদুনাথ মজুমদার • অগ্রহায়ণ ১৩৩৯

ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় • ফাল্গুন ১৩৪১

মনোরমা বসু • ভাদ্র ১৩৩০

শিশিরকুমার ঘোষ • ফাল্গুন ১৩১৭

dreamer, dances,—drunken with God-consciousness, awake only to the harmony within,—dances the dance that draws the worlds into its rhythm, and makes night and day but the pulsing of its beat.

Again, as is so often the case with these Indian pictures, we are in the presence of a work so psychological, so meditative, so intense, that the faculty of criticism ceases before it, and we are swept away by the idea that seized the artist, and made to contemplate that alone.

১৩১৬ চৈত্র

চিত্রপরিচয়।

শাজাহানের তাজমহল কল্পনা।

"সূর্য্যাস্তের শেষরশ্মিরেখা এখনও অন্তর্হিত হয় নাই; শিশু শশী শুভ্রমেঘের অন্তরালে। সম্রাট শাজাহান অশ্বারোহণে নদীতীরে উপাসনার জন্য চলিয়াছেন। যে দুর্দ্দিনে অভিন্নবৎ দুইটি হৃদয় মৃত্যুর স্পর্শে দ্বিধাভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে সে হয়ত সপ্তাহ কয়েকের...বড় জোর... মাস কয়েকের কথা। নূতন আঘাতের মুক্তমুখ ক্ষত এখনও হৃদয়কে স্পন্দিত করিয়া তুলিতেছে। এ দিকে উষাবৎ স্নিগ্ধ প্রশান্তিরও উন্মেষ হইয়াছে। তাঁহার অন্তরের মধ্যে বেদনা ও সান্ত্বনা একত্র মিলিয়াছে।

দূরে, নদীর পরপারে একটি সমাধি,... তাজবিবির সমাধি। সমাধি-স্ফটিকের শুভ্রচ্ছটায় কর্ম্মাবসানের পরিস্নাত পবিত্রতা ও নির্ম্মল শান্তি সূচিত হইতেছে।

রাজ্যের রাণী, সন্তানের জননী, স্বামীর সহধর্ম্মিণী চলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু, স্বর্গে, জগদীশ্বরের আসন-তলে একজন পুণ্যবতী করজোড়ে নতমস্তকে মর্ত্ত্যবাসী প্রিয়তম পতি-পুত্রের মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছেন। ঘরের প্রদীপ নির্ব্বাপিত, সেই প্রদীপ এখন পুণ্যবেদিকার দীপাবলীর জ্যোতিতে আপনার জ্যোতি মিলাইয়াছে।

ইতিহাসের যে অংশ অবলম্বনে অবনীন্দ্রবাবু এই চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহার মর্ম্ম নিম্নে দেওয়া গেল।

"দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধে যাইবার সময়ে শাজাহান তাজবিবিকে সঙ্গে লইয়া যান। পথে পুত্রপ্রসবের কষ্টে তাজবিবির মৃত্যু হয়। প্রথমে ঐ দেশেই নদীতীরস্থ একটি সুন্দর উদ্যানে তাঁহার দেহ কবর দেওয়া হয়। নদীর একপারে যুদ্ধক্ষেত্র, অপর পারে, সম্রাজ্ঞীর সমাধি। প্রতি শুক্রবারে, শাজাহান একাকী ঐ সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া উপাসনা করিতেন।"

"চন্দ্রগর্ভ শুভ্রমেঘের পরিপাণ্ডু আলোক সমাধির উপর পাতিত করিয়া নিপুণ শিল্পী ঐ বস্তুটিকে সম্রাটের অন্তরের অতি পবিত্র লোকে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জ্ঞাপন করিতেছেন।"

—ভগিনী নিবেদিতার ইংরাজীর মর্ম্মানুবাদ।

[মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় জানুয়ারি ১৯১০ সংখ্যায়

নিবেদিতা-কৃত মূল ইংরাজি রচনাটি প্রকাশিত হয়। নিম্নে সেই রচনাটি উদ্ধৃত :]

Shah Jahan Dreaming of the Taj

The last reflection of the sunset has not yet died out of the eastern sky. The young moon is high behind the clouds. And the Emperor rides alone by the river-side to pray. Weeks, perhaps months, have gone by, since that terrible moment of severance, when the two who were as one, were divided for a time. The heart still quivers, under the freshness of the wound; and yet serenity is at its dawn; within the soul we behold the meeting-place of pain and peace. Yonder, on the far side of the river, lies a grave, *her* grave. O flowing stream! O little tomb! How icy-cold tonight, is this tent of the heart! Awhile hence, when the moon is gone, and all the world is wrapped in secrecy, Shah Jahan will rise across the ford, and there dismount, to kneel beneath the marble canopy, and kiss, with passionate kisses, those cold stones, that silent earth, that are as the hem of her garment to him who loves. Awhile hence, despair and longing will have overwhelmed him. But now, he prays. With all the gravity and stateliness of a Mohammedan sovereign, he paces up and down on horseback, head bowed, hands quiet on the reins, and lost in thought. The healing hand of his own strong religious faith has begun to make itself felt, in the man's life. The gleam of white marble speaks to him of rest. A throne could not lift her who is gone, as she is lifted in this shrine of death. How far has she been removed, above all the weariness and pain, the turbulence and mischance, of this mortal world! The soul that came to him out of the infinite, like a great white bird, bearing love and compassion on its wings is withdrawn once more into the bosom of God. The presence of this dust is in truth a consecration. The lamp of the home is extinguished, but burns there not a light the more, before the altar? The wife, the mother, the queen, is gone, but in heaven there kneels a saint before God, praying to Him for her beloved on earth.

Was it in hours like these, that the dream of the Taj was born?

This picture, by Abanindra Nath Tagore, is based on the following story :

"When Shah Jahan went to the war in the Deccan, he took his Queen Taj Bibi with him. At Zainabad she died, in child birth. There, in a beautiful garden, on the far side of the river, she was first buried. On this side, the battle-field : on that, in its garden, the little tomb of Taj Bibi. On Fridays, Shah Jahan would cross the river alone, to pray."

It's beauty will appeal to all. The intense quiet of the subject demands night-treatment, and the little tomb of Taj Bibi, focussing the light of the veiled moon upon itself, is wonderfully eloquent of its spiritual place in the Emperor's life. The drawing is full of strength. But we do wish that we might again enjoy colour at the hands of Mr. Tagore! We long for some of those bright and tender interpretations which were once so characteristic of the art of this land of bright skies and limpid atmospheres, those interpretations in which Mr. Tagore himself is so well fitted to excel!

প্রবাসী-র চিত্র-পরিকল্পনা, চিত্র-পরিচয় ও কলাশিল্পের প্রকৃতি বিচার

১৩০৯ ভাদ্র

[রাফায়েল ও তাঁর চিত্র]

আমরা বর্ত্তমান সংখ্যায় র‍্যাফেএলের অঙ্কিত তিনখানি চিত্রের প্রতিলিপি দিলাম। অধিকাংশ সমালোচকের মতে র‍্যাফেএল পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর। স্থপতি ও ভাস্করগণের মধ্যেও তাঁহার স্থান অতি উচ্চ। তিনি ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে ইতালীর অন্তঃপাতী উর্বিনোনগরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৫২০ খৃষ্টাব্দে ৩৭ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার এত অল্প বয়সে মৃত্যু হইয়াছিল বটে, তথাপি তিনি ২৮৭ খানি তৈল চিত্র, ৫৭৬ খানি রেখাচিত্র ও নক্‌সা এবং নানা প্রাসাদের প্রাচীরগাত্রে বহুসংখ্যক অপর চিত্র আঁকিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার এক এক খানি চিত্রের মূল্যের কথা শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। বিলাতের ন্যাশন্যাল গ্যালারী অর্থাৎ জাতীয় চিত্রশালায় তাঁহার এক খানি মাতৃদেবী-চিত্র (*the Ansidei Madonna*) আছে। উহা দশ লক্ষ আশী হাজার টাকা মূল্যে ক্রীত হইয়াছিল। আর কোনও চিত্র কখনও এত অধিক মূল্যে ক্রীত হয় নাই। আমরা যে তিনখানি চিত্র মুদ্রিত করিলাম, তন্মধ্যে সিষ্টিন্ ম্যাডোনা (Sistine Madonna) শ্রেষ্ঠ। ড্যানভার্স (D' Anvers) বলেন, ইহা বোধ হয় পৃথিবীর প্রসিদ্ধতম চিত্র (perhaps the most famous painting in the world)। ইহা এক্ষণে জর্ম্মনীর অন্তর্গত ড্রেস্‌ডেন সহরের চিত্রশালা সুশোভিত করিতেছে। যুবা বৃদ্ধ ধনী নির্ধন সকলেই এই চিত্র দেখিতে গিয়া কেহ বা মন্ত্রমুগ্ধের মত ইহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকে কেহ বা ভক্তিভরে নতজানু হয়। অনেক সময় প্রবীণা মহিলাগণকে ইহার সম্মুখে অশ্রুপাত করিতে দেখা গিয়াছে। চিত্রটি দেখিয়া তাঁহাদের হৃদয়ে নূতন আশার সঞ্চার হইয়াছে. তাঁহাদের মুখ নবালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। চিত্রটিতে ঈশাজননী ঈশাকে ক্রোড়ে লইয়া মেঘরাশির উপরে প্রশান্ত দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া আছেন। অসংখ্য স্বর্গদূতগণের মুখমণ্ডল প্রভামণ্ডলের ন্যায় তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। সেণ্ট সিক্স্‌টস্ তাঁহার অনুচরদিগের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহাদের জন্য আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছেন, এবং সেণ্ট বার্ব্বারা প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে নিম্নস্থ বিশ্বাসী শিষ্যমণ্ডলীর দিকে চাহিয়া আছেন। অনুচর ও শিষ্যগণ চিত্রে অঙ্কিত হয় নাই। সর্ব্বনিম্নে দুটি সুকুমার দেবশিশু ঊর্দ্ধনেত্রে মাতৃদেবীর দিকে চাহিয়া আছেন। এই চিত্রটির সৌন্দর্য্য এপর্য্যন্ত কেহই অনুকরণ করিতে পারেন নাই। ধর্ম্মবিষয়কচিত্রাঙ্কনে সুদক্ষ ফ্রান্সিয়া, আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য অঙ্কনে কেবল র‍্যাফেএলের নিকটই পরাজিত। এহেন ফ্রান্সিয়া এই স্বর্গীয় চিত্রটি দেখিয়া নৈরাশ্যে নিজ তুলি নামাইয়া রাখিয়াছিলেন। কথিত আছে, র‍্যাফেএল এই ঈশাজননী-চিত্রের মুখটি নিজ প্রণয়িণী মার্গারিটার মুখের মত করিয়া আঁকিয়াছিলেন। আমাদের দ্বিতীয় চিত্রটিকে ইংরাজীতে The Vision of a Knight বলে। এক জন যুবা নাইট যোদ্ধবেশে নিদ্রা যাইতেছেন। নিদ্রিতাবস্থায় তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন যেন তাঁহার দুই পার্শ্বে দুই নারী দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। এক জন তাঁহাকে পুষ্প উপহার দিতেছেন, দ্বিতীয়া তাঁহাকে তরবারি ও একখানি পুস্তক গ্রহণ করিতে বলিতেছেন। এই চিত্রখানি এখন বিলাতের ন্যাশনাল গ্যালারীর শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। "স্বপ্ন" শীর্ষক কবিতাটি পাঠ করিলেই ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারা যাইবে। আমরা র‍্যাফেএলের যে

মূর্ত্তি মুদ্রিত করিলাম, তাহা তাঁহার স্বহস্তাঙ্কিত। ইহা এখন ফ্লোরেন্সের চিত্রশালায় আছে। প্রবাসীর আগামী সংখ্যায় র‍্যাফেএলের আরও কয়েকখানি চিত্র মুদ্রিত হইবে। আমরা বহু অর্থব্যয়ে ইউরোপ হইতে এই সকল ছবির ফোটোগ্রাফ আনাইয়াছি। আমাদের এবারকার ম্যাডোনার চিত্র দুই রঙ্গে মুদ্রিত।

[মুদ্রিত চিত্র-প্রতিলিপি বাদ দেওয়া হয়েছে— সংকলন-সম্পাদক]।

[যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় ও তাঁর চিত্র-প্রসঙ্গ]

এ বৎসর সিমলা চিত্রপ্রদর্শনীতে যে সকল দেশীয় চিত্রকর চিত্র প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ব্যতিরেকে সকলেই মানবমূর্ত্তির চিত্র পাঠাইযাছিলেন। যামিনী বাবু প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি পাঠাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে "পদ্মানদীতে কুহেলিকাচ্ছন্ন প্রভাতের" দৃশ্যের জন্য তিনি মাননীয় ফিন্‌লে সাহেবের পুরস্কার পাইয়াছেন। তাঁহার "আর্দ্র গঙ্গাসৈকতে" বিশেষরূপে প্রশংসিত হইয়াছে। "গঙ্গাবক্ষে চন্দ্রোদয়"ও খুব সুন্দর। যামিনী বাবুর দৃশ্যগুলি সম্বন্ধে পাইয়োনীয়ার বলেন—"Mr. J. P. Ganguli exhibits some very charming paintings of Bengal river scenery, either moonlight, misty morning or evening "effects." They are very poetic in feeling and tender in colour and treatment". ঠাকুর পরিবারের শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ও চিত্রবিদ্যায় প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছেন। তাঁহার কয়েক খানি চিত্র শীঘ্রই বিলাতের Studio পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

১৩০৯ মাঘ-ফাল্গুন

[জি. এস. নিউটন, আর-এ, অঙ্কিত পোর্সিয়া-র চিত্র]

শেক্‌সপীয়রের "বীনিস্‌নগরের বণিক" নাটক সুপরিজ্ঞাত। এই নাটকের দুইটি দৃশ্যের দুখানি চিত্র আমরা মুদ্রিত করিলাম। ঐশ্বর্য্যশালিনী পোর্ষিয়ার পাণি-গ্রহণার্থ নানাদেশ হইতে সম্পন্ন, অভিজাত ও রাজকুলোদ্ভব অনেক লোক আসিয়াছিলেন। তন্মধ্যে বাসানিয়ো একজন। পোর্ষিয়ার পিতা মৃত্যুর পূর্ব্বে এইরূপ আদেশ দিয়া যান যে তাঁহার পরিত্যক্ত তিনটি কৌটার মধ্যে যেটিতে পোর্ষিয়ার ছবি আছে, তাহা যিনি নির্ব্বাচন করিবেন, তিনিই পোর্ষিয়াকে বিবাহ করিতে পারিবেন। বাসানিয়ো এই কৌটাটি মনোনীত করেন। পোর্ষিয়া ও বাসানিযো পবস্পরকে

ভালবাসিতেন। সুতরাং বাসানিয়ো সিদ্ধকাম হওয়ায় উভয়েই আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। এখন কেবল গির্জ্জায় গিয়া বিবাহিত হইতে বাকী রহিল। কিন্তু এমন সময়ে এক বিষাদজনক ব্যাপার ঘটিল। বাসানিয়ো পোর্ষিয়ার প্রাসাদে আসিবার সময় সাজসজ্জার মূল্য, ভৃত্যাদির খরচ প্রভৃতি আণ্টোনিয়ো নামক বন্ধুর দ্বারা শাইলক নামক সুদখোর য়িহুদীর নিকট ধার করাইয়া আনেন। সর্ত্ত এইরূপ ছিল যে আণ্টোনিয়ো যথাসময়ে ঋণশোধ করিতে না পারিলে, শাইলক তাঁহার শরীরের যে কোন অংশ হইতে আধসের মাংস কাটিয়া লইবে। এখন খবর আসিল যে আণ্টোনিয়ো যথাসময়ে টাকা দিতে না পারায় শাইলক ঐ মাংস চাহিতেছে। চিত্রে, বাসানিয়ো চিঠিতে লিখিত এই সংবাদ পড়িতেছেন এবং তাঁহার মুখভাবের হঠাৎ পরিবর্ত্তন দর্শনে পোর্ষিয়া উৎকণ্ঠিত হইতেছেন, এইরূপ অঙ্কিত আছে। ছবিখানি বিখ্যাত চিত্রকর জি, এস্, নিউটন আর, এ, কর্ত্তৃক অঙ্কিত।

শাইলকের জেসিকা নামে এক কন্যা ছিল। তাহার মা ছিল না, শাইলক জেসিকাকে বাড়ীর চাবি বুঝাইয়া দিয়া নিমন্ত্রণ খাইতে যাইতেছে। ঘরদ্বার বন্ধ করিয়া রাখিতে বলিতেছে। বলিতেছে, "টাকার থলিয়ার স্বপ্ন দেখিয়াছি, বোধ হয় কোন বিপদ ঘটিবে।" ইহাই দ্বিতীয় ছবিটিব বিষয়। উহাও প্রসিদ্ধ চিত্রকর জি, এস্, নিউটন আর, এ, কর্ত্তৃক অঙ্কিত।

১৩১০ জ্যৈষ্ঠ

চিত্র

প্রবাসীতে মুদ্রিত চিত্র-নির্বাচনের যৌক্তিকতা

"প্রবাসী"র গত (১৩০৯ সালের) চৈত্র সংখ্যার প্রথমেই যে সুন্দর দ্বিবর্ণ-মুদ্রিত পক্ষীর ছবি মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহার বৃত্তান্ত গত বৈশাখ সংখ্যার ২১শ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর রবিবর্ম্মা আমাদিগকে এই চিত্রখানির প্রশংসা করিয়া পত্র লিখিয়াছেন।

চৈত্র সংখ্যার আর একখানি সুন্দর চিত্র রাফেএলের সেন্ট্ ক্যাথ্যারিন্। এই তৈল চিত্রখানি ১৫০৬ খৃষ্টাব্দে অঙ্কিত হয়। ইহা এখানে লণ্ডনের ন্যাশন্যাল গ্যালারীর একখানি শ্রেষ্ঠ চিত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। সেন্ট ক্যাথ্যারিন্ মিসরদেশের আলেকজান্দ্রিয়া নগরে রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করায় উক্ত ধর্ম্মের বিরোধীরা তাঁহার প্রাণবধ করে। চিত্রে তিনি উর্দ্ধমুখে ভক্তিভরে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন, এইরূপ অঙ্কিত হইয়াছে।

এই প্রকার খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধীয় বা বিদেশী চিত্র সম্বন্ধে একটি কথা বলা আবশ্যক। কেহ কেহ বলেন, "প্রবাসীতে" এ সকল ছবি না দিয়া কেবল আমাদের দেশের পৌরাণিক বা প্রাচীন সাহিত্যিক বিষয়ের ছবি দেওয়া উচিত। স্বদেশের শিল্পের উন্নতিসাধন ও উৎকর্ষ প্রদর্শন যে আবশ্যক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। "প্রবাসী" ভারতীয় চিত্র প্রকাশিত করিবার জন্য যেরূপ যত্ন ও অর্থব্যয়

করিয়াছে, অন্য কোন পত্র তাহার তুলনায় কিছুই করেন নাই। কিন্তু আমরা কি সঙ্কীর্ণমনা হইয়া ভালমন্দ যেরূপ হউক, কেবল ভারতীয় ছবিরই প্রশংসা করিব? ললিতকলা দেশ বা জাতি বা ধর্ম্মসম্প্রদায় বিশেষে আবদ্ধ নহে। মনে ভাববিশেষ উদ্রেকের ক্ষমতা ও সৌন্দর্য্য চিত্রের প্রাণ। যেখানে এই ক্ষমতা ও সৌন্দর্য্য পাইব, সেখানেই তাহার গুণ গ্রহণ করিব, রসাস্বাদন করিব, আমাদের মনের ভাব এইরূপ হওয়া উচিত। ইংরাজেরা খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী, কিন্তু ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট নিরপেক্ষ ভাবে হিন্দুর দেবমন্দির, মুসলমানের কবর ও মস্‌জিদ, বৌদ্ধের চৈত্য ও স্তুপ, প্রভৃতি সমুদয়ের মেরামত ও সংরক্ষণ জন্য বৎসর বৎসর হাজার হাজার টাকা ব্যয় করিতেছেন। তাহার কারণ কি? কারণ এই যে, হয়, এই সকল ইমারতের স্থাপত্য প্রশংসনীয়, সুন্দর, নয় ইহাদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। সেইরূপ চিত্র যে ধর্ম্ম বা জাতি সম্প্রদায়েরই হউকনা কেন, আমরা যাহাতে তাহার উৎকর্ষ বুঝিতে পারি, তদ্রূপ শিক্ষা লাভ করিবার চেষ্টা করা আমাদের কর্ত্তব্য। একজন হিন্দু ধর্ম্মের দিক্ দিয়া কালীঘাটের একপয়সার পটের বা বটতলার পাঁজির ছবির রাফেএলের ছবি অপেক্ষা অধিক আদর করিতে পারেন; কিন্তু চিত্রশিল্পের হিসাবে যদি কেহ তাহা করেন, তাহা হইলে তাহাতে কেবল তাঁহার শিল্পবিষয়ে অজ্ঞতা ও সৌন্দর্য্যরসানুভবে অক্ষমতাই প্রকাশ পাইবে। ধর্ম্মের দিকদিয়া একজন হিন্দু সত্যনারায়ণের পুঁথি পড়িয়া যে সুখ পাইবেন, মিল্টনের প্যারাডাইজ লষ্ট্‌ হইতে তাহা না পাইতে পারেন, কিন্তু তা বলিয়া কাব্যহিসাবে কেহ প্যারাডাইজ লষ্টের সহিত সত্যনারায়ণের পুঁথির তুলনা কল্পনাতেও আনেন না। চিত্রের উৎকর্ষ বুঝিতে হইলে আমাদিগকে জাতি, ধর্ম্ম, পরিচ্ছদাদি যথাসম্ভব ভুলিয়া গিয়া দেখিতে হইবে যে রংফলান কিরূপ হইতেছে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির গঠন ও বিন্যাস কিরূপ হইয়াছে, মুখমণ্ডল স্বাভাবিক ভাবব্যঞ্জক হইয়াছে কিনা, ইত্যাদি। তবে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে যে ছবির বিষয় ভারতীয় ও আমাদের পরিচিত, আমাদের পক্ষে তাহাকে অপেক্ষাকৃত অধিক চিত্তাকর্ষক মনে করা স্বাভাবিক। কিন্তু মানসিক উৎকর্ষ সাধন ও হৃদয়ের সম্প্রসারণের জন্য কেবল ভারতীয় ললিত কলাই যথেষ্ট নহে; বিশেষতঃ ভারতীয় চিত্রশিল্প। কারণ কি প্রাচীন কালে, কি বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে কখনও পাশ্চাত্য দেশের মত চিত্রের উন্নতি সাধিত হয় নাই।

কেহ কেহ চিত্র মোটেই চান না। তাঁহারা বলেন সাধারণ পাতলা কাগজ দুপয়সা ডাকমাশুলে যত পৃষ্ঠা যাওয়া সম্ভব, তত পৃষ্ঠা লেখা ছাপিয়া মাসে মাসে গ্রাহক দিগকে দেওয়াই উচিত। এবিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে মাসিক পত্র নানারূপ হইয়া থাকে। যাহারা চিত্র বা ভাল কাগজ, ভাল ছাপা চান না, তাঁহারা "প্রবাসী" না লইয়া অচিত্র কোন উৎকৃষ্ট কাগজ লইলেই ভাল হয়। এই সঙ্গে একটি অবান্তর কথাও বলিয়া রাখি। "প্রবাসী"র মূল্য তিন টাকা। গ্রাহকগণ তিন টাকার জিনিষ পাইতেছেন কিনা, তাহার হিসাব করিবার সময় যেন কেবল পাতা গণনা না করেন। ভাল কাগজ, ভাল ছাপা ও ভাল ছবির ব্যয় কিরূপ হয়, নিজেরা যদি না জানেন, ত অনুগ্রহপূর্ব্বক যেন কোন অভিজ্ঞ বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেন। আমরা বিশ্বাস করি, "প্রবাসী"র ব্যয় প্রত্যেক বাঙ্গালা মাসিক পত্র অপেক্ষা বেশী।

যাহা হউক, আমরা এন্‌সাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকার নব প্রকাশিত প্রপূর্ত্তি (Supplement) হইতে ললিত কলা বিষয়ে নিম্নলিখিত বাক্যগুলি

উদ্ধৃত করিয়া এই প্রসঙ্গের সমাপ্তি করিব।

"An art gallery epitomises so many phases of human thought and imagination that it connotes much more than a mere collection of paintings. In its technical and aesthetic aspect the gallery shows the treatment of colour, form and composition. In its historical aspect we find the true portraits of great men of the past; we can observe their habits of life, their manners, their dress, the architecture of their times, and the religious worship of the period in which they lived. Regarded collectively, the art of a country epitomises the whole development of the people that produced it. Most important of all is the emotional aspect of painting, which must enter less or more into every picture worthy of notice".

"প্রবাসীতে" গত সংখ্যায় বীজাপুরের রাজাদের যে ইতিপূর্ব্বে অপ্রকাশিত ছবিগুলি মুদ্রিত হইয়াছে, আমাদের দেশে তৎসমুদয়ের কিরূপ আদর হইবে জানি না; কিন্তু তৎসমুদয়ের প্রকৃত মূল্য কিরূপ, তাহা উদ্ধৃত ইংরাজী বাক্যগুলি হইতে বুঝা যাইবে। বিলাতে কোন কাগজে এরূপ ছবি বাহির হইলে তাহার ক্রেতার সংখ্যা অনেক বাড়িয়া যায়।

গত সংখ্যায় শকুন্তলার যে দ্বিবর্ণে মুদ্রিত সুন্দর ছবি খানি দেওয়া হইয়াছে, তাহা শকুন্তলার কোন্ অবস্থার, তাহা ঐ সংখ্যায় বলা হয় নাই। কণ্বমুণির আশ্রমে যেখানে একটি মধুমক্ষিকা শকুন্তলার মুখে বসিবার চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিতেছে ও তিনি উহাকে তাড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন, ছবিখানি সেই অবস্থার। এই চিত্র খানি ১৯০২ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজ শিল্পপ্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইয়াছিল। চিত্রকর শ্রীযুক্ত ধুরন্ধর ইহার জন্য একটি পদক পুরস্কার পাইয়াছিলেন।

বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত "দুষ্যন্তের সভায় শকুন্তলা" গত ফেব্রুয়ারী মাসে মান্দ্রাজ প্রদর্শনীতে রৌপ্যপদক প্রাপ্ত হইয়াছিল। মান্দ্রাজ ললিতকলা সভা (Madras Fine art Society) তাঁহাদের চিত্রশালার জন্য ইহা ক্রয় করিয়াছেন। মান্দ্রাজের প্রধান দৈনিক পত্র মাদ্রাস মেল (Madras Mail) ইহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:—

"M. V. Dhurandhar is another Bombay artist who shows great aptitude in dealing with water colours. His picture No. 191 "Shakuntala at the court of King Dushyanta", has gained a silver medal for the subject taken from Indian Mythology or History, and fully deserves it : for the artist has successfully triumphed over the difficulties inherent in the attempt to paint such a picture in water colours. He has a great sense of grouping figures and an unerring eye for their correct Values when seen in masses."

এই চিত্রের বিষয়টি সহজেই বুঝা যাইবে। শকুন্তলা শিশু পুত্রের সহিত পালক পিতা কণ্ব মুনির দুইজন শিষ্যের সঙ্গে স্বামী দুষ্যন্তের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু দুর্ব্বাসার শাপে দুষ্যন্ত কণ্বের আশ্রমে শকুন্তলাকে বিবাহ করিবার কথা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যাওয়ায় শকুন্তলা যে তাঁহার পত্নী তৎসম্বন্ধে সবিস্ময় সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন। মুনির শিষ্যদ্বয়ের একজন ক্রুদ্ধ ও আর একজন বিস্মিত হইয়াছেন। শকুন্তলা প্রথমে ঘোমটা দিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। পরে দুষ্যন্ত সহজে চিনিতে পারিবেন বলিয়া তাঁহার ঘোমটা খুলিয়া দেওয়া হয়। তাঁহার সহিত কথোপকথনের সময়

দুষ্যন্ত বলেন, "প্রবঞ্চনা স্ত্রীজাতির স্বভাবসিদ্ধ বিদ্যা, শিখিতে হয় না।" তাহাতে শকুন্তলা রুষ্ট হইয়া বলেন, "অনার্য্য, তুমি আপনি যেমন, সকলকেই সেইরূপ মনে কর।" কালিদাসের গ্রন্থে শকুন্তলা স্বামী কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইবার পর কশ্যপের আশ্রমে পুত্র প্রসব করেন। চিত্রকর এ বিষয়ে মূল উপাখ্যানের অনুসরণ করেন নাই।

ধুরন্ধরের অপর ছবিখানি বোম্বাই অঞ্চলে প্রচলিত একটি হিন্দু পর্ব্বের ছবি। ইহাকে গৌরী উৎসব বলে। ভাদ্রমাসে তেরডা নামক পুষ্প লক্ষ্মীর অবতার রূপে পূজিত হয়। এই পুষ্পবৃক্ষটি পীতবর্ণ পট্টবস্ত্রে সজ্জিত হইয়া একটি বালিকা কর্ত্তৃক গৃহের প্রত্যেক কক্ষে নীত হয়। সঙ্গে বাড়ীর সব ছেলেমেয়েরা থাকে। বালিকার মাতা বা অন্য কোন প্রাপ্তবয়স্কা মহিলা পঞ্চারতি করিতে করিতে পুষ্পবাহিকা বালিকাকে প্রত্যেক কামরায় তিনবার জিজ্ঞাসা করেন, "লক্ষ্মী, তুমি আসিতেছ কি?" বালিকা প্রতিবারে বলে "হাঁ" এবং কদলী ও শর্করা পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। এই চিত্রখানি ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইশিল্প প্রদর্শনীতে দেখান হয়। চিত্রকর তজ্জন্য একটি স্বর্ণপদক ও ১০০্ টাকা পুরস্কার পান।

১৩১৩ চৈত্র

আগামী বর্ষের প্রবাসী

[চিত্র-মুদ্রণ পরিকল্পনা]

আমরা আগামী বৎসরের প্রবাসীতে পরলোকগত রাজা রবিবর্ম্মার অনেকগুলি মূল তৈলচিত্রের প্রতিলিপি মুদ্রিত করিব। এগুলি বাজারে প্রাপ্তব্য কিম্বা অন্য কাগজে প্রকাশিত ছবির বিনা অনুমতিতে প্রকাশিত নকল নহে, বা ধার করা ছবিও নহে। রবিবর্ম্মার দ্বিতীয় পুত্র শিল্পী শ্রীযুক্ত রামবর্ম্মা এগুলি আমাদিগকে প্রকাশ করিতে অনুমতি দিয়াছেন। রামবর্ম্মারও ছবি আমরা মুদ্রিত করিব। তদ্ভিন্ন, শ্রীযুক্ত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, মহাদেব বিশ্বনাথ ধুরন্ধর প্রভৃতির ছবিও মুদ্রিত হইবে। ভগিনী নিবেদিতা নিজ অন্তর্দৃষ্টি প্রসূত মন্তব্য সহ যে সকল ইউরোপীয় ছবি আমাদিগকে প্রকাশার্থ বাছিয়া দিতেছেন, তৎসমুদয়ও ছাপা হইবে।

১৩১৪ জ্যৈষ্ঠ

[চিত্র-পরিচয়]

বর্ত্তমান মাসের প্রবাসীতে স্বতন্ত্র মুদ্রিত চারিখানি ছবির মধ্যে রাণী লুইর ছবি সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয়া ভগিনী নিবেদিতা অন্যত্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

গত বৎসর বরিশালের প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সের সময় পুলিশ যেরূপ পৈশাচিক ব্যবহার করিয়াছিল, তাহারই একটি ঘটনা অবলম্বন করিয়া "নির্যাতিতে আশীর্ব্বাদ" নামক চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। শ্রীমান্ চিত্তরঞ্জন গুহ নামক একটি যুবক মার খাইতে খাইতে জলে পড়িয়া গিয়াও "বন্দেমাতরম্" বলিতে ছাড়েন নাই। ঊর্দ্ধে সিংহবাহিনী দেশমাতা তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। ইহাই ছবির বিষয়। শিল্পনৈপুণ্যে ইহার তাদৃশ উৎকর্ষ না থাকিলেও জাতীয় ভাবব্যঞ্জক বলিয়া ইহা মুদ্রিত হইল।

কংসবধের পর "শিশু কৃষ্ণ কর্ত্তৃক পিতামাতার কারামোচন" রবিবর্ম্মার অঙ্কিত মূল তৈলচিত্রের প্রতিলিপি। ইহাতে মাতৃস্নেহ সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। মাতা দেবকী সস্নেহে কৃষ্ণের মুখচুম্বন করিতেছেন। কৃষ্ণ বিষাদপূর্ণ দৃষ্টির সহিত অঙ্গুলিনির্দ্দেশে পিতামাতার পায়ের শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া ফেলিতে আদেশ দিতেছেন। বলরাম পিতা বাসুদেবকে জড়াইয়া ধরিয়াছেন।

"কবিতা-সুন্দরী" বহরমপুরের চিত্রকর শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ পাল কর্ত্তৃক অঙ্কিত। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার একখানি পুস্তকের জন্য এই ছবিটি আঁকাইয়া প্রবাসীতে ছাপিতে দিয়াছেন। তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। ছবিখানির পশ্চাৎদৃশ্য সুন্দর হইয়াছে। কবিতা দেবীর ছবিরও বাহ্যসৌন্দর্য্য আছে। কবিতার গভীর ও উচ্চ ভাব প্রকাশ করা বোধ হয় এই চিত্রের উদ্দেশ্য নহে। প্রিয়নাথ বাবু নিজেই এই চিত্র সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কবিতাটি লিখিয়াছেন :—

আসিলে কি মনোরমে হৃদয় মাঝারে?
বাজাও বাজাও বীণা, মানস-কাননে
গাহিয়া উঠুক পাখী; মধুর ঝঙ্কারে
ফুটিয়া উঠুক ফুল আনন্দ-পবনে।
সজনি লো, তোরে আমি করিয়াছি চির-
জীবনসঙ্গিনী মোর; তুমি যেন মোরে
ফেলিয়া যেওনা একা, চঞ্চল অধীর,
এ মধু যৌবন-জ্যোৎস্না-যামিনীর-ভোরে।
নীলবাসে ঢাকা তনু, কণ্ঠে ফুলহার,
ভালে স্বর্ণটিপ, উড়ে মোহন চিকুর,
খচিত কোমল করে কঙ্কণ সোণার,
অলক্ত রঞ্জিত পদে শোভিছে নূপুর।
ঢল ঢল আঁখি দুটি, অধরেতে হাসি,
ওইরূপ চিত্তে মোর থাকুক বিকাশি'।

ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে কাব্যের বাহ্যসৌন্দর্য্যই চিত্রের বিষয়ীভূত।

১৩১৫ জ্যৈষ্ঠ

[মহাদেব বিশ্বনাথ ধুরন্ধরের অঙ্কিত চিত্র-পরিচয়

কল্যাণ দুর্গ অধিকারের পর, আবাজী, কল্যাণের শাসনকর্তা মৌলানা আহ্‌মদের পুত্রবধূ একটি সুন্দরী বালিকাকে বন্দী করিয়া, তাহাকে উপহারস্বরূপ শিবাজীর নিকট প্রেরণ করেন। শিবাজী বালিকাকে দেখিয়া বলিলেন, "আমার মা যদি তোমার মত সুন্দরী হইতেন. তাহা হইলে কি সুখের বিষয় হইত! তাহা হইলে আমিও সুন্দর হইতাম।" তিনি বালিকার সহিত পিতার মত আচরণ করিয়াছিলেন, এবং তাহাকে নূতন পরিচ্ছদ ও অন্যান্য উপহার দিয়া, বিজাপুরে তাহার বাটীতে নিরাপদে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

এই ঐতিহাসিক ঘটনাটি অবলম্বন করিয়া শ্রীযুক্ত মহাদেব বিশ্বনাথ ধুরন্ধর "শিবাজী ও মুসলমান বন্দিনী" নামক সুন্দর ছবিখানি আঁকিয়াছেন।

শিবাজীর চরিত্রের নানা অসাধারণ গুণের মধ্যে নারীর সহিত পবিত্র ও সংযত ব্যবহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৩১৬ শ্রাবণ

ভারতীয় প্রাচীন চিত্র ও মূর্ত্তি সম্বন্ধে মন্তব্য

ভারতীয় প্রাচীন রীতিতে অঙ্কিত চিত্রাদি সম্বন্ধে একটি মন্তব্য প্রায়ই শুনা যায় যে তৎসমুদয়ে মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ঠিক্ স্বাভাবিক আকৃতি ও আয়তন অনুকৃত হয় না। যাঁহারা এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাঁহারা বোধ হয় মনে করেন, চিত্র ও ভাস্কর্য্যবিদ্যার উদ্দেশ্যই নকল করা। বাস্তবিক তাহা নয়, অন্ততঃ প্রাচীন (চীন-ভারতবর্ষ-জাপানদেশীয়) শিল্পীরা তাহা মনে করিতেন না। তাঁহার কবিদের ন্যায় উপমার রীতি অবলম্বন করিয়া বাহ্যসৌন্দর্য্যের ভিতরের প্রাণটিকে, নিয়ামক সূত্রটিকে. প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেন। যেমন কবি যখন অঙ্গুলিকে চম্পক-কলির মত বলেন, তখন তিনি অঙ্গুলির গঠনের সৌন্দর্য্যের কারণ যে ক্রমসূক্ষ্মতা ইত্যাদি, তাহাই ব্যক্ত করিতে চান. কিন্তু আঙুল যে ঠিক চাঁপার কলির মত হইতে পারে না, তাহা যে তিনি জানেন না তাহা নয়। কবি জানেন মানুষের চক্ষু ঠিক পদ্মপলাশবৎ হইতে পারে না। তিনি কেবল চক্ষুর সৌন্দর্য্যের দীর্ঘায়তত্ত্ব প্রকাশ করিতে চান। আমাদের শিল্পীদের রীতিও তাই। তাঁহারা স্বাভাবিক গঠনের অবিকল নকল করেন না; কবি যে উপমাটিকে কথায় প্রকাশ করেন, তাঁহারা তাহাকেই চক্ষুর গোচর করিয়া দেন। Painting in the Far East নামক গ্রন্থের লেখক লরেন্স বিনিয়ন (Lawrence Binyon) সাহেব বলেন :—

"Throughout the course of Asian

painting the idea that art is the imitation of nature is unknown, or known only as a despised or fugitive heresy".

"Absolute anatomical correctness, which pedants demand,... is no more present in the great paintings of Europe than in the great paintings of Asia."

মুখে না বলুন কিন্তু কেহ কেহ বোধ হয় মনে করেন যে ভারতবর্ষীয় শিল্পীরা ঠিক্ স্বাভাবিক মূর্ত্তির অনুকরণ করিতে পারিতেন না বা পারেন না, বলিয়াই তাঁহাদের চিত্রাদি প্রকৃতির অনুরূপ নয়। ইহা সত্য নয়। আমরা ঠিক্ স্বভাবের অনুকারী অনেক প্রাচীন ভারতীয় মূর্ত্তির ছবি দেখিয়াছি। তা ছাড়া পাশ্চাত্য রীতিতে অশিক্ষিত অনেক কামার কুমার এখনও ঠিক্ প্রাকৃতিক মূর্ত্তি গঠন করিতে পারে। কেয়ার হার্ডি সাহেব তাঁহার নব প্রকাশিত India নাম পুস্তকে লিখিয়াছেন :—

"We found a potter at work making these images... and the grace and beauty of the figures of the image, together with their anatomical accuracy, would have done credit to any sculptors in Europe. Many of those who do this work are unable to read, and have very little concern outside the affairs of their village; but the skill which enables them to do this marvellous work is the result of the accumulated experience of generations, transmitted from father to son, until it has become as instinct. A naturalist, wishing to have some lizards modelled in clay, employed these men. and subsequently bore testimony to the fact that no flaw could be found in the work, every portion of the body being as perfectly reproduced as it appears in the living reptile. I subsequently saw in Calcutta figures of men, women, and animals made by a similar class of workers and can testify to their lifelike appearance. Is the knowledge of anatomy, too, inherited, or whence comes it in men who know nothing of the teachings of school or college?"

চিত্রপরিচয়।

"নববধূ"।

ইহা একটি পুরাতন চিত্র, বর্তমানে শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সম্পত্তি। তাঁহারই সৌজন্যে আমরা ইহার প্রতিলিপি প্রকাশিত করিতে পারিলাম।

কে এই ছবি আঁকিয়াছেন, তাঁহার নাম জানা নাই। চিত্রকর চিত্রেরও কোন নাম দেন নাই। আমরা চিত্রিত বিষয়টি কি তাহা অনুমান করিয়া "নববধূ" নাম দিয়াছি। চিত্রের বিষয় আমরা যাহা বুঝিয়াছি তাহা এই—

একটি নববিবাহিতা বালিকাকে তাহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী বালিকার প্রেমাস্পদের কক্ষে লইয়া যাইতেছেন। উভয়ের মুখাবয়বে সাদৃশ্য আছে। উভয়ের মুখের সলজ্জ ও সংযত আনন্দের ভাব সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে। কক্ষের দ্বারে যে

স্ত্রীলোকটি পর্দ্দা সরাইয়া তরুণীদ্বয়কে অভ্যর্থনা করিতেছেন, তিনি বোধ হয় পরিচারিকা কিংবা বাড়ীর কোন বয়োজ্যেষ্ঠা মহিলা। তাঁহার হাতে পথ দেখাইবার জন্য বাতি, এবং অভ্যর্থনার জন্য গন্ধদ্রব্যের পাত্র রহিয়াছে। তাঁহার চক্ষু নিদ্রালস বলিয়া বোধ হইতেছে!

তরুণীদ্বয়ের পরিচ্ছদ এবং গৃহের আকৃতিতে বুঝা যায় যে চিত্রখানি হিন্দুস্থানের।

অনেক ছবিতে এরূপ একটা আড়ষ্ট ভাব থাকে যে তাহা দেখিয়া বোধ হয় যেন চিত্রকর কয়েকজন মানুষকে বিশেষ ভঙ্গী অবলম্বন করাইয়া, সেই অবস্থায় তাহাদিগকে দেখিয়া ছবি আঁকিয়াছেন; কিম্বা তাহাদের ফোটোগ্রাফ লইয়া তাহার নকল করিয়াছেন। এই পুরাতন চিত্রে সেরূপ কোন আড়ষ্টতা নাই। ছবিটি দেখিয়াই মনে হয় যেন তরুণীদ্বয় সত্যসত্যই অগ্রসর হইতেছেন।

১৩১৮ শ্রাবণ

চিত্রপরিচয়।

বলরামের দেহত্যাগ।

যদুবংশের ধ্বংসের পর বলরাম যোগ দ্বারা প্রাণত্যাগ করেন। বলরাম অনন্ত সর্পের অবতার; সহস্রফণা অনন্ত নাগ বলরামের দেহ ত্যাগ করিয়া দূরে প্রভাস ক্ষেত্রের শান্ত সমুদ্রে প্রস্থান করিতেছেন। এই ভাবটিই লইযা শিল্পী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী এই চিত্রটি অঙ্কিত করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ।

এই প্রাচীন চিত্রখানিতে লোকালয় হইতে দূরে প্রান্তরে বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণ বাঁশি বাজাইতেছেন এবং গোপনারীগণ ও গোপাল মুগ্ধনেত্রে পরিপূর্ণ আনন্দে সেই অপরূপ প্রেমাস্পদ পুরুষকে দেখিতেছে ও বাঁশি শুনিতেছে, এই ভাবটি চিত্রিত হইয়াছে। গোপনারীদের মধ্যে কয়েকটির চিত্রে নীলাম্বরীর বেষ্টনে কমনীয় কান্তি বৈপরীত্যে সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই চিত্রখানি পরিপ্রেক্ষিত ও ছায়াসুষমায় সুচিত্রিত। বিশ্বকেন্দ্রের মধ্যে হৃদয়পদ্মে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি নিত্য নিরন্তর বাজিতেছে; যে সে বাঁশি শুনিতে পায় সে গৃহসংসার ভুলিয়া সেই রসে তন্ময় হইয়া উঠে; সে বাঁশির স্বরে পশুপক্ষী বৃক্ষলতা পর্য্যন্ত মুগ্ধ। সমস্ত বিশ্বযন্ত্রকে শৃঙ্খলায় মণ্ডল-কেন্দ্রে বিধৃত

করিয়া যিনি চালিত করেন সেই শ্রীকৃষ্ণ নিজে একদিকে সকলের সহিত যোগযুক্ত, অপর দিকে তিনি নির্লিপ্ত। এই সঙ্কেতটিও চিত্র মধ্যে পরিস্ফুট দেখা যায়।

১৩১৯ ফাল্গুন

চিত্রপরিচয়

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

মুখপাত শকুন্তলার ছবির বিষয় সকলেরই জানা কথা।

দ্বিতীয় মৌলিক চিত্র সম্রাট আকবর শাহের শিকার, প্রাচীন ভারতের পুস্তক চিত্রিত করিবার একটি নমুনা।

তৃতীয় মৌলিক চিত্র ইতালির বিখ্যাত চিত্রকর লিয়োনার্ডো ডা ভিন্সির বিখ্যাত চিত্র মোনালিসা। লিয়োনার্ডো ইতালির ফ্লোরেন্স নগরের সন্নিহিত ভিন্সি গ্রামে সম্ভবতঃ ১৪৫২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৫১৯ সালে ফ্রান্সে দেহত্যাগ করেন। তিনি মাইকেল এঞ্জেলো ও রাফেলের পূর্ব্বজ। তিনিই সর্ব্বপ্রথম চিত্রে বর্ণবিন্যাসের সঙ্গে ছায়াসুষমার (light and shade) সমাবেশ করেন; কিন্তু বিশেষজ্ঞেরা বলেন যে "his gift of chiaroscuro [light and shade apart from colour] cost the colourlife of many a noble picture." আমাদের ভারতীয় চিত্রে ছায়াসুষমার অভাব দেখিয়া যাঁহারা নিন্দা করেন এ কথা তাঁহাদের অনুধাবনযোগ্য। লিয়োনার্ডো অসীম প্রতিভাবান শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন; জ্ঞানের এমন ক্ষেত্র নাই যেখানে তিনি বিচরণ করেন নাই : উত্তর কালের অনেক আশ্চর্য্য আবিষ্কারের আভাস তিনি দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কল্পনা অসাধারণ রকমের বিরাট ছিল। তিনি বাম হাতে চিত্র করিতেন ও ডানদিক হইতে বাঁদিকে লিখিতেন। এই-সব কারণে একজন জীবনী-লেখক বলিয়াছেন—

Leonardo was a supreman.

লিয়োনার্ডোর সম্পূর্ণ-করা ছবি খুব অল্পই আছে। অসম্পূর্ণ ছবির মধ্যে মোনা লিসা ছবিখানিই সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহা একজন সম্ভ্রান্ত মহিলার প্রতিকৃতি; তাঁহার নাম ছিল লিসা; এবং তাঁহার স্বামী ছিলেন Giocondo দেশের জমিদার; এজন্য চিত্রের নাম মোনা লিসা বা লা গিয়োকোণ্ডা। এই চিত্র সম্বন্ধে একটি খুব রোমাণ্টিক গল্প আছে।

লিয়োনার্ডো নানা অবস্থা-বিপর্য্যয়ে নানা স্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শেষে ফ্লোরেন্সে আসিয়া উপনীত হন। সেখানে একটা উৎসব-মজলিসে তিনি মোলা লিসার সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া তাঁহার চিত্র অঙ্কন করিবার অনুমতি প্রার্থনা করেন এবং তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর হয়। লিয়োনার্ডো তাঁহার স্টুডিয়োতে বসিয়া দিনের পর দিন ধরিয়া তিল তিল করিয়া এই তিলোত্তমার রূপমাধুর্য্য চয়ন করিতেছিলেন, কিন্তু প্রথম সাক্ষাতের দিনে সুন্দরীর মুখে যে হাসি দেখিয়াছিলেন সে হাসি তিনি চিত্রে কিছুতেই ফুটাইতে পারিতেছিলেন না। তিনি তাঁহার মানসীকে প্রফুল্ল করিবার জন্য স্টুডিয়োর চারিদিক বর্ণে গন্ধে গানে সুষমায় রসিকতায় ভরিয়া তুলিতেছিলেন, মানসসুন্দরীর সেই ভুবনভুলানো হাসি কিছুতেই কিন্তু ফুটিতেছিল না। বিরহ-বেদনা সুন্দরীর হাসি হরণ করিয়া রাখিয়াছিল, চিত্রকর তাহা বুঝিতে পারিতেছিলেন না। এমনি করিয়া ব্যর্থ

চেষ্টায় চার বৎসর কাটিয়া গেল।

সুন্দরী লিসাকে (পদ্মিনী) দেখিয়া আর একজন হৃদয় হারাইয়াছিল, সে ফ্রান্সের রাজা ফ্রান্সিস প্রথম। তিনি সেই ক্ষণদৃষ্টার সন্ধান করিতে করিতে চার বৎসর পরে শিল্পীর শিল্পনিকেতনে তাহাকে আবিষ্কার করিলেন। অকস্মাৎ ফ্রান্সিসকে আসিতে দেখিয়া লিসার মুখে হাসির অরুণরাগ ফুটিয়া উঠিল, চিত্রকর ধন্য হইলেন আপনার দয়িতার পূর্ণ রূপ আঁকিয়া, কিন্তু তাঁহার আনন্দের পশ্চাতেই নিরানন্দ, প্রেমে প্রতিদ্বন্দ্বীর আবির্ভাব। রাজা ফ্রান্সিস হৃদয় দিয়া আদর্শকে এবং মূল্য দিয়া প্রতিরূপকে কিনিতে চাহিলেন। লিয়োনার্ডোর হৃদয় আর্ত্তনাদ করিয়া রাজাকে বলিতে চাহিল, 'আসল আপনি ত পাইয়াছেন না চাহিয়াই, নকলও আমার কাছ হইতে কাড়িয়া লইবেন না।' কিন্তু রাজার প্রার্থনা বিমুখ করিবার সাধ্য তাঁহার হইল না। লিয়োনার্ডোর সর্ব্বস্ব লইয়া ফ্রান্সিস চলিয়া গেলেন, প্রসাদ স্বরূপ শিল্পীকে দিয়া গেলেন রাজার নামাঙ্কিত অঙ্গুরী যাহার প্রভাবে সর্ব্বদা রাজপ্রাসাদের সর্ব্বত্র তাঁহার অবাধগতি থাকিবে, এবং ফ্রান্সের রাজসভায় তাঁহার আমন্ত্রণ ও বৃত্তিব্যবস্থা।

লিসা ফ্রান্সে গিয়া রাণীর রোষনয়নে পড়িয়া রাজার সাক্ষাৎ হইতে বঞ্চিতা হইলেন; তিনি রাজপ্রাসাদের দ্বারে দ্বারে প্রবেশ ভিক্ষা করিয়া ফিরেন, রাণীর আদেশে তাঁহার প্রবেশের পথ রুদ্ধ।

একদিন গভীর রাত্রে লিসা যখন রাজপ্রাসাদের দ্বারে দ্বারে দ্বাররক্ষীর প্রসাদ ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছিলেন, বাতায়নে বাতায়নে রাজার দৈবাৎ সাক্ষাৎ আশা করিয়া কাতর দৃষ্টি ছানিতেছিলেন, তখন তিনি দেখিলেন লিয়োনার্ডো চোরের মতো সন্তর্পণে বুকে একখানি চিত্র চাপিয়া ধরিয়া বাহিরে আসিতেছেন। লিসা দেখিলেন সে চিত্র তাঁহারই। লিসা শিল্পীকে এই তস্করবৃত্তির জন্য তিরস্কার করিয়া রক্ষীদের নিকট ধরাইয়া দিবার ভয় দেখাইয়া রাজি করাইলেন যে তিনি লিসাকে রাজার কক্ষে পৌঁছাইয়া দিবেন।

লিসা লিয়োনার্ডোর অঙ্গুরীর সাহায্যে রাজার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন তাঁহার চিত্রের শূন্য ফ্রেম পড়িয়া আছে; লিসা চিত্রের স্থান স্বয়ং পূর্ণ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রাজার নিদ্রাভঙ্গ হইলে রাজা দেখিলেন তাঁহার পরিত্যক্তা লিসার প্রতিকৃতি তাঁহাকে ইঙ্গিত করিতেছে। রাজা ভয় পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলে রক্ষীদের সঙ্গে সঙ্গে রাণী সেই ঘরে উপস্থিত হইলেন এবং রক্ষীর হাত হইতে তরবারি লইয়া লিসাব বুকে বিদ্ধ করিলেন, লিসা হৃদয়ের রক্তে প্রেমের পূজা শেষ করিয়া প্রেমাস্পদের চরণতলে আপনাকে বলি দিলেন।

রাজা লিয়োনার্ডোর নিকট হইতে সেই হৃত চিত্র উদ্ধার করিয়া রাজপ্রাসাদে পুনর্ব্বার রক্ষা করিলেন। লিয়োনার্ডো সকল চিহ্ন হারাইয়া চিরকামনার রূপ ধ্যান করিয়াই চিরকুমার জীবন কাটাইয়া দিলেন। সেই চিত্র এতদিন লুভ্‌র্ প্রাসাদে ছিল; গত বৎসর তাহা পুনরায় অপহৃত হইয়াছে।

এই চিত্র সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞেরা বলেন—

"It is difficult for the unpractised eye today to form any idea of its original beauty. Leonardo has here painted this worldly-minded woman... with a marvellous charm and sauvity, a finesse of expression never reached before and hardly ever equalled since."

..."Whoever shall desire to see how far art can imitate nature may do so to perfection in this head, wherein every peculiarity that could be depicted by the utmost subtlety of the pencil has been faithfully reproduced. The eyes have the lustrous brightness and moisture which is seen in life, and around them are those pale, red, and slightly livid circles, also proper to nature, &c &c"

১৩১৯ চৈত্র

[জাতীয় জীবনে কলাশিল্পের গুরুত্ব]

কোন জাতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে কিনা, তাহা তাহাদের দেশের কল কারখানা দ্বারা নিশ্চিত বলা যায় না। কারণ কল কারখানা ক্রয় করা যায়, ধার করিয়া আনা চলে; এবং তাহার ব্যবহার শিখিয়া লওয়া যায়, কিম্বা বিদেশী কর্ম্মচারী রাখিয়া তাহা চালান যায়। কিন্তু কাব্য বা সুকুমার শিল্প এরূপ করিয়া ক্রয় করা, ধার করা বা শিক্ষা করা যায় না। জাতির প্রাণে নিজস্ব কিছু সত্যের বোধ, কিছু ভাব, কিছু সৃষ্টির ও ব্যঞ্জনার ক্ষমতা না থাকিলে, সে জাতির স্বতন্ত্র কাব্য বা ললিতকলা থাকিতে পারে না। ভারতের অতীত কোনও যুগের কথা ছাড়িয়া দিয়া, বর্ত্তমান যুগে নিজস্ব কি আছে, তাহা দেখাইতে হইলে (দৃষ্টান্ত স্বরূপ) বোম্বাইয়ের কাপড়ের কল দেখাইলে চলিবে না। কারণ, ও সব কেনা জিনিষ। কলগুলা ভারতের লোকে উদ্ভাবন করে নাই বা গড়ে নাই। কারখানা চালাইবার প্রণালীও বিদেশ হইতে ধার করা, বিদেশ হইতে শেখা। শিল্পক্ষেত্রে বর্ত্তমান সময়েও ভারতের নিজস্ব কি আছে, তাহা জানিতে হইলে ভারতীয় দরিদ্র শ্রমজীবী ও কারিকরের কুটীরে প্রবেশ করিতে হইবে। জাতীয় আর্থিক দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য কল কারখানা ভাল, না কুটীরবাসীর শিল্প ভাল, তাহা আমাদের বিবেচ্য নহে; জাতির প্রাণের অস্তিত্ব কোথায় অনুভব করা যায়, তাহাই এখন বক্ষ্যমাণ বিষয়।

জাতির প্রাণের গভীরতম পরিচয় পাওয়া যায় তাহার সাহিত্যে ও শিল্পে; সেখানেই জাতির প্রাণের সহিত ঘনিষ্ঠতম সংস্পর্শ লাভ করা যায়। বর্ত্তমান যুগেও ভারতের নানা প্রদেশে ভারতবাসীর স্বতন্ত্র সাহিত্য আছে। কিন্তু ভারতবাসীর প্রাণের পরিচায়ক স্বতন্ত্র শিল্প যে আছে, বা থাকা চাই, সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা উন্নতির চেষ্টা যেমন প্রয়োজনীয়, শিল্পের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা ও উন্নতির চেষ্টাও তেমনি আবশ্যক, কিছুদিন পূর্ব্বে ইহা আমরা অনুভব করিতাম না। ঘর বাড়ী মন্দির নির্ম্মাণ করার রীতি, কাপড় চাদর শাল বুনিবার ও রঙাইবার রীতি, ঘটী বাটী থালা প্রদীপ গড়িবার পদ্ধতি, ছবি আঁকিবার ধরণ, এসকলের মধ্যেই আমাদের স্বাতন্ত্র্য ছিল, এবং এখনও আছে। ইহা যাঁহারা নিজ চেষ্টা ও প্রতিভার দ্বারা দেখাইতেছেন, তাঁহারা দেশের মহৎ উপকার করিতেছেন। "প্রাচ্য শিল্পের উন্নতিবিধায়ক ভারতীয় সমিতি" (Indian Society of Oriental Arts) এইরূপ চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য তাঁহারা প্রতিবৎসর ভারতীয় চিত্র ও অন্যান্য শিল্পদ্রব্যের প্রদর্শনী খুলিয়া থাকেন। এবার ষষ্ঠ বার্ষিক প্রদর্শনী হইয়া গেল।

এবার প্রাচীন মূল ছবি ও মূল ছবির নকল, প্রাচীন ধাতুমূর্ত্তি ও ধাতুদ্রব্য এবং এরূপ দ্রব্যের ছাঁচ লইয়া প্রস্তুত নকল অনেক প্রদর্শিত হইয়াছিল; প্রাচীন যুগের অজন্টাগুহা-চিত্রাবলীর নকল, মধ্যযুগের অনেক মূল মোগল রীতির ছবি ও এরূপ অনেক ছবির নকল, রাজপুত বা কাংড়া চিত্রণ-রীতির কয়েকটি নমুনা, প্রভৃতি প্রদর্শিত হইয়াছিল। প্রদর্শিত ধাতুমূর্ত্তি ও ধাতুদ্রব্যাদি অধিকাংশই পুরাতন, চিত্র অধিকাংশই নূতন। এরূপ প্রদর্শনী দেখিয়া আনন্দ হয়, শিক্ষা হয়, জাতীয় প্রতিভার অস্তিত্বে বিশ্বাস জন্মে এবং উহার ভবিষ্যৎ অন্ধকার মনে হয় না।

প্রায় দুইশত চিত্র ও ধাতুমূর্ত্তি আদি প্রদর্শিত

হইয়াছিল। উল্লেখযোগ্য সমুদয় ছবি ও মূর্ত্তির নাম করিলে পাঠকেরা বিশেষ কিছু বুঝিবেন না; প্রত্যেকটির রঙীন (অন্ততঃ পক্ষে সাদাকাল) ছবি দিলে বুঝিবার সুবিধা হইত। কিন্তু তাহা সম্ভবপর নহে। তাহার উপর ভাল ছবি অনেকগুলিই বিক্রী হইয়া গিয়াছে ও বিদেশে চলিয়া যাইবে। আমরা কয়েকটির ফোটোগ্রাফ হইতে ছবি প্রস্তুত করাইয়াছি, কিন্তু স্থানাভাবে সবগুলি ছাপিতে পাবিলাম না। পরবর্ত্তী দুই এক সংখ্যায় ছাপিব।

যাহা হউক, প্রদর্শনীর তালিকার প্রথম পৃষ্ঠা হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েকটি জিনিষের উল্লেখ করিতেছি। শৈলেন্দ্রনাথ দের অঙ্কিত শকুন্তলা; ফাল্গুনের প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছে। সুরেন্দ্রনাথ করের অঙ্কিত সাজিহাতে বালিকার পুষ্পচয়ন। অবনীন্দ্র বাবুর অঙ্কিত থিয়েটারের পাত্র-পাত্রীদের নক্সা; বিশেষতঃ কন্দর্প, রতি, ভাবুক রাজপুত্র, এবং বন্দী বীর। তাঁহার অঙ্কিত "পুষ্প রাধিকা" চমৎকার হইয়াছে। নন্দলাল বসুর গোকল-ব্রত; এবং রামায়ণের ১৮ খানি ছবি। তন্মধ্যে অনেকগুলি প্রবাসীতে ছাপা হইয়াছে। অতুলকৃষ্ণ মিত্রের কালী। মুকুলচন্দ্র দে বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের ছাত্র। তাঁহার আঁকা ছয়খানি ছবিই বর্ণের সৌন্দর্য্যে ও ভাবের ব্যঞ্জনায় উল্লেখযোগ্য, ও, যতদূর মনে পড়িতেছে, সবগুলিই বিক্রী হইয়া গিয়াছে। প্রথমটি বড় সুন্দর; উহাতে রবিবাবুর গীতাঞ্জলি—

"কোথায় আলো কোথায় ওরে আলো!
বিরহানলে জ্বালোরে তারে জ্বালো!"

এই গানটিকে মূর্ত্তি দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ছবিখানি দেখিতে সুন্দর! কিন্তু পরমাত্মা জীবাত্মাকে নায়ক নায়িকা মনে করিয়া জীবাত্মাকে বিরহিণী নায়িকা রূপে ঐ গানে বর্ণনা করা হইয়াছে; এই আধ্যাত্মিক বিরহের ছবি উহা হয় নাই। অন্য ছবিগুলির নাম—"ভূতের ভয়", বেশ হইয়াছে; "গৃহহারা", "কদম্বমূলে"; "কঞ্চুকী"; "জন্মাষ্টমী"। দুর্গেশচন্দ্র সিংহের সন্ধ্যার মেঘ। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সন্ধ্যার দীপ, মনের মানুষের অন্বেষণ, দহ্যমান জতুগৃহ হইতে পাণ্ডবদের পলায়ন, জগন্নাথ-মন্দির- সোপানে, এবং নিদ্রালু, চমৎকার হইয়াছে। তাঁহার অঙ্কনরীতি ও প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য সুস্পষ্ট। তাঁহার ছবি পাশ্চাত্যেরও নকল নয়, ভারতীয় অতীত কোন যুগেরও নকল নয়। অসিতকুমার হালদারের "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ" সুন্দর হইয়াছে। "চন্দ্রাবলী"ও বেশ। "যমুনার জলে" ভাল করিয়া দেখিতে পাওয়া যায় নাই। ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদারের "বিজলী চমকে" ও "শকুন্তলা"। নারায়ণপ্রসাদের "সখী"। হাকিম মহম্মদ খাঁর "বন্দী দারা"য় দুর্গের রক্তবর্ণ প্রস্তরদ্বার ও শকুনি দ্বারা ভাবী নিষ্ঠুর হত্যা সূচিত হইয়াছে। ছবিটির মধ্যে দ্রুতগতি ও ত্বরার স্পষ্ট আভাস আছে। ছবিখানি দেখিলে চমক লাগে। কিন্তু মনে হইল, উহা আরও বড় করিয়া উহাতে মুক্ত আকাশ আরও অনেকখানি রাখিয়া দিলে ভাল হইত। পুরাতন মোগল, রাজপুত ও পারসীক ছবির মধ্যে যোদ্ধা রাজকুমার, আওরংজীব, ফারসী পাঠ, সন্ন্যাসীর দল, কৃষ্ণের জন্ম, দারা শুকো, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ভবানীচরণ লাহার শ্রীকৃষ্ণ ক্রোড়ে বসুদেবের যমুনা উত্তীর্ণ হওয়া। ধাতুদ্রব্যের মধ্যে বরুণ, সুন্দরমূর্ত্তি স্বামী, বিষ্ণু, তিব্বতীয় লামা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কাষ্ঠখোদিত দ্রব্যের মধ্যে ডব্লিনে ক্রীত দক্ষিণ ভারতের রথের ভূষণরূপে ব্যবহৃত শিবের মূর্ত্তি, প্রভৃতি শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক। অবনীন্দ্র বাবুর আগেকার আঁকা "বঙ্গমাতা"ও প্রদর্শিত হইয়াছিল। ইহার এক রঙের ও নানারঙের প্রতিলিপি অনেকবার ছাপা হইয়াছে; কিন্তু কোনটিতেই ইহার পবিত্রতা, শান্ত

তেজ ও তপস্যার আত্মিক আগুন ভাল করিয়া ব্যক্ত হয় নাই।

কাব্যের মত চিত্রশিল্পও বিষয়ের জন্য নানা যুগে, নানা স্থানে, জীবনের নানা বিভাগে, ঘুরিয়া বেড়ায়। পুরাণ, ইতিহাস, বর্ত্তমান যুগের ঘটনা ও জীবন, প্রেম, বিরহ, মিলন, শোক, যুদ্ধ, স্বদেশপ্রেম, ধর্ম্মের জন্য উৎপীড়ন সহন ও প্রাণদান, ও প্রাকৃতিক দৃশ্য, প্রভৃতি সমস্ত হইতেই কবি ও শিল্পী বিষয় নির্ব্বাচন করেন। কিন্তু তাঁহারা কেবল পুরাণে, কাব্যে ও অতীত ইতিহাসে আপনাদের প্রতিভাকে আবদ্ধ রাখিলে বুঝিতে হইবে যে তাঁহারা নিজে সাক্ষাৎভাবে বিশ্বের রস অনুভব করিতে বা করাইতে পারিতেছেন না। এই জন্য নবীন শিল্পীদের সব ছবিই যে পৌরাণিক, ঐতিহাসিক বা পুরাতন গান বা কাব্য সম্বন্ধীয় নহে, ইহা আশার বিষয়। কিন্তু তাঁহারা আরও অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান জগতের ও কালের রসের সাক্ষাৎ অনুভূতিকে শিল্পের বিষয়ীভূত করিলে ভাল হয়।

প্রাচীন ভারতের পৌরাণিক যুগের দেবদেবী বা অপর বিষয়ই বেশী পরিমাণে নির্ব্বাচিত হয়। ঔপনিষদিক বিষয়ের দিকে অধিকতর দৃষ্টি পড়া বাঞ্ছনীয়, যেমন সত্যকাম-জাবালের উপাখ্যান। প্রাকৃতিক দৃশ্যও অবহেলার যোগ্য নহে।

এই প্রদর্শনীতে আরও একটি বিষয়ে দৃষ্টি পড়ে। হিন্দু চিত্রকর একজনও একটিও ঐতিহাসিক ছবি আঁকেন নাই। যে অল্পসংখ্যক ঐতিহাসিক ছবি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা সমস্তই মুসলমান চিত্রকরের আঁকা। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলেন, হিন্দুর ইতিহাসের দিকে ঝোঁক, ইতিহাস রচনায় নিপুণতা, কোন কালেই ছিলনা; মুসলমানের ছিল। হিন্দুর এই নিন্দা কতটা ঠিক্, তাহা এখন বিচার্য্য নয়; মুসলমানের প্রশংসাটা কিন্তু ঠিক্। যাহাই হউক, হিন্দুর ইতিহাসে, যদ্দ্বারা প্রাণ পবিত্র, শান্ত, শোকনির্ম্মল, উদ্বেলিত, উন্নত, দৃঢ়ীকৃত, বা তেজঃপূর্ণ হয়, এরূপ বিষয়ের অভাব নাই। হিন্দুর ঐতিহাসিক চিত্র আরও বেশী আঁকা উচিত। আরও বেশী এইজন্য বলিতেছি, যে, এবারকার প্রদর্শনীতে হিন্দুর আঁকা ঐতিহাসিক চিত্র না থাকিলেও নবীন হিন্দু চিত্রকরেরা কেহ কেহ এরূপ ছবি আঁকিয়াছেন।

আমরা কোমলতাজনক বা কোমলতাব্যঞ্জক ছবিই বেশী আঁকি। শক্ত তেজস্বী মানুষ গড়িবার পক্ষে সব দেশেই গান ও কবিতা সাহায্য করিয়াছে, ছবিও সাহায্য করিয়াছে। ধর্ম্মে, দেশভক্তিতে, জনহিতৈষণায়, গার্হস্থ্য জীবনে নানা বিঘ্নের ও বিপদের সহিত সংগ্রামে যত রকমে মানুষের শক্তির তেজের পৌরুষের অভিব্যক্তি হইয়াছে, তাহার ছবি আরও চাই।

যেমন ছবিই আঁকা হউক, নাদুস্ নুদুস, গোলগাল, বা সুন্দর মুখ ও চেহারা আঁকিতেই হইবে, এমন হাস্যকর ফরমাইস্ আমরা করিতে পারি না। কিন্তু কেবল মুখের ও দেহের এরূপ সৌন্দর্য্যের জন্যই সৌন্দর্য্য সৃষ্টির প্রয়োজন আছে, যাহার ভিতর দিয়া সুন্দর প্রাণ ফুটিয়া বাহির হয়; ইহা শ্রেষ্ঠ বস্তু না হইলে ভগবান্ জগতে এত সৌন্দর্য্য ঢালিয়া দিতেন না। নবীন চিত্রকরেরা যে মুখের ও দেহের সৌন্দর্য্য রেখাবর্ণপাতে ফুটাইয়া তুলেন নাই বা তুলিতে পারেন না, তাহা নয়। কিন্তু কখন কখন এমন দেখা যায় যে পুরাণ ইতিহাসাদিতে যাঁহাদের রূপের প্রশংসা আছে, তাঁহারা চিত্রকরদের তুলি হইতে তেমন রূপ পান না। সত্য বটে যে রস অনুভব করা এবং ব্যঞ্জনার দ্বারা অনুভব করান, ইহাতেই শিল্পীর কৃতিত্বের প্রধান পরিচয়। কিন্তু পূর্ব্বোক্তরূপ সৌন্দর্য্যের হ্রাস দ্বারা রসভঙ্গ না হয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখা, অন্ততঃ

আমাদের মত অশিল্পী লোকদের জন্য, নিষ্প্রয়োজন না হইতে পারে।

নবীন চিত্রকরেরা যেসকল মূর্ত্তি আঁকেন, তাহার সবগুলিই পাশ্চাত্য যে নয়, তাহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু কোন কোনটি ভারতীয় ছাঁচের নয়। সুখের বিষয় আজকাল এই দোষটি আর প্রায় দেখা যায় না।

আমরা শিল্প বুঝি নিতান্ত কম, কাজে কাজেই তাহার সমালোচনা করিবার অধিকারও আমাদের নিতান্ত সামান্য। তথাপি আমরা ভারতীয় শিল্পের অনুরাগী বলিয়া উহার কল্যাণ-কামনায় কিছু লিখিলাম। আশা করি, নবীন চিত্রকর-সম্প্রদায় আমাদের বক্তব্যের মধ্যে কিছু সত্য থাকিলে তাহা বন্ধুভাবেই গ্রহণ করিবেন, এবং অসত্য উপেক্ষিত হইবে।

১৩২০ অগ্রহায়ণ

শিল্পকলা বাস্তবের অনুকরণ নয়]

চিত্র ও মূর্ত্তি স্বাভাবিক কি অস্বাভাবিক হইবে, এ তর্ক আজকালকার নয়। বাস্তবিক ছবি ঠিক্ স্বাভাবিক হইতেই পারে না। শিল্পীকে কিছু সংযোগ বিয়োগ করিতেই হয়। এমন কি ফোটগ্রাফ পর্য্যন্ত ঠিক্ স্বাভাবিক জিনিষটির অবিকল নকল হয় না। পক্ষান্তরে ছবি অস্বাভাবিকও হইতে পারে না। মানুষ আঁকিতে গিয়া কোন শিল্পী তিনটা হাত বা কপালে একটা শিং আঁকিতে পারে না। কিন্তু কেহ যদি বলেন যে প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাপ ও গায়ের রং ঠিক স্বাভাবিক হওয়া চাই, তাহা হইলে ফরমাইস্‌টা কিছু কঠিন রকমের হয় এবং ললিতকলার দিক্ দিয়া অনেকটা নিষ্প্রয়োজনও হয়। বাস্তবিক মানুষের কোন্ অঙ্গের স্বাভাবিক মাপ কি, তাহা বলা বড় কঠিন। কোন দুজনের মাপ ঠিক্ এক নয়। মাইলোর বীনস্ (Venus of Milo) প্রাচীন গ্রীক ভাস্কর্য্যের সুন্দরতম নমুনা বলিয়া গৃহীত হয়। কিছুদিন হইল একখানি সচিত্র ইংরাজী কাগজে অনেক প্রসিদ্ধ সুন্দরীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাপের সঙ্গে এই মূর্ত্তির মাপের তুলনা প্রকাশিত হয়। তাহাতে দেখা যায় যে মূর্ত্তির সঙ্গে কাহারও সমুদয় মাপ ঠিক মিলে নাই। বাস্তবিক বিদ্রূপাত্মক ছবিতে যেমন হাস্যরসের উদ্রেকের জন্য কোন না কোন অঙ্গ খুব বড় বা খুব ছোট করা হয়, তেমনি শান্ত বীর, প্রভৃতি রসের উদ্রেকের জন্য কিম্বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশেষের সৌন্দর্য্য সূচনা (suggest) করিবার জন্য, মাপ ও গঠনের কিছু ব্যতিক্রম করিলে কেন যে শিল্পের ব্যাকরণে ভুল হইবে, তাহা বুঝা যায় না। কবিদের উপর ত এরূপ কড়া আইন কেহ জারি করে না। সবাই জানে যে কোন মানুষের চোখ কাণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় না; বা আঙ্গুল ঠিক্ চাঁপার কলির মত হয় না, বা গায়ের রং প্রস্ফুটিত মল্লিকার মত হয় না। অথচ আকর্ণবিশ্রান্ত চক্ষু, চম্পক কলির মত আঙ্গুল, এবং মল্লিকার মত বর্ণের উল্লেখ ত কাব্যে দেখা যায়। তাহাতে ত কাব্য গুলিকে কেহ অস্বাভাবিক অতএব অপকৃষ্ট

বলে না। ঠিক্ মানুষের গায়ের মত রংটিও কে কয়টি চিত্রে দেখিয়াছেন বলিতে পারি না। অতএব শিল্পীদের উপর কড়া আইন জারি করিয়া জুলুম করা উচিত নয়। আসল কথা শিল্পের প্রাণের খবরটা লওয়াই আগে দরকার। আর সবও দরকারী, কিন্তু প্রাণের মত দরকাবী নহে।

নবীন বঙ্গীয় চিত্রকরদের কতকগুলি সুন্দর ছবি যাঁহারা দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ভগিনী নিবেদিতা ও ডাক্তাব আনন্দ কুমারস্বামী প্রণীত সদ্যঃপ্রকাশিত হিন্দু ও বৌদ্ধ পুরাণ সম্বন্ধীয় ইংরাজী বহিখানি (Myths of the Hindus and Buddhists. By Sister Nivedita and Dr. Ananda Coomaraswamy. 15s. net. George G. Harrap and company, ও Portsmouth Street kingsway, London, W. C.) কিনিতে পারেন।

চিত্রপরিচয়।

প্রচ্ছদপট।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদপটে শিল্পাচার্য্য শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর "প্রবাসী"র পরিকল্পনা রহস্যচিত্রে ব্যক্ত করিয়াছেন। হংসপুচ্ছচ্যুত লেখনী মানুষের হাতে পড়িয়া ক্রমাগত মুখে কালি মাখিতেছিল এবং কালি ছড়াইতেছিল। অকস্মাৎ একদিন আকাশপথে হংসকে উড়িয়া যাইতে দেখিয়া তাহার মনে পড়িল যে তাহার প্রকৃত স্বরূপ হইতেছে অমল শুভ্রতা, কালিমা-প্রলেপ তাহার কলঙ্ক। তাই সে কালি-ছড়ানো ও কালি-মাখা ছাড়িয়া শুভ্র সুবিমল হংসশরীর স্বীয় বাসস্থানের উদ্দেশ্যে উধাও হইয়া ছুটিয়াছে।

বেয়াত্রিচে চেঞ্চী।

উচ্চইংরাজীশিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তিমাত্রেই শেলীর চেঞ্চী নামক কাব্যের কথা অবগত আছেন। বেয়াত্রিচে চেঞ্চীর পিতা ফ্রাঁসেস্কো তাঁহার উপর নানাবিধ পাশব অত্যাচার করায় তাঁহার ভ্রাতা ও বিমাতার চক্রান্তে ফ্রাঁসেস্কো নিহত হন; এই ষড়যন্ত্রে বেয়াত্রিচেও জড়িত আছেন এই সন্দেহে তাঁহার বিচার ও প্রাণদণ্ড হয়। মশানে নীত হইবার সময় বেয়াত্রিচে যে প্রকার নৈরাশ্য ও বিষাদপূর্ণ দৃষ্টিতে দর্শকদিগের দিকে তাকাইয়াছিলেন, চিত্রকর গীদো রেনি তাহাই অঙ্কিত করিয়াছেন বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত আছে। কিন্তু চিত্রটি যথার্থ কাহার এবং কে আঁকিয়াছিল তৎসম্বন্ধে নিঃসংশয়ে কিছু বলা যায় না। মূল ছবিখানি রোমনগরীস্থ বার্বেরিনি-প্রাসাদের সযত্ন

রক্ষিত অন্যতম রত্ন। অনেক শিল্পসমালোচক ইহাকে জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিষাদব্যঞ্জক চিত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

১৩২৮ ভাদ্র

চিত্রণ-বিদ্যা

আমাদের দেশের অনেক খুব পণ্ডিতলোকেও চিত্রের প্রশংসা এই বলিয়া করেন, "বাঃ, ঠিক্ যেন ফোটোগ্রাফটির মত!" এরূপ প্রশংসা চিত্রবিদ্যার প্রকৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞতার পরিচয় দেয়। ৪৭ বৎসর পূর্ব্বে ১৯৩০ সংবতে এই বাংলা দেশেই শ্রীযুক্ত শ্যামচরণ শ্রীমানী "সূক্ষ্মশিল্পের উৎপত্তি ও আর্য্যজাতির শিল্পচাতুরী" নামক বহিতে চিত্র সম্বন্ধে এই ভ্রম দূর করিবার চেষ্টা করেন। তিনি গবর্ণমেণ্ট আর্টস্কুলের জ্যামিতিক-অঙ্কন-শিক্ষক ছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার বহি হইতে নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলি পড়িয়া শুনাইতেছিলেন। ইহা বহিখানির ৭১ হইতে ৭৪ পৃষ্ঠায় আছে।—

অধুনা কেহ কেহ ইংরেজদিগের চিত্রবিদ্যার শিক্ষাতে যত্ন নিয়োগ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের চিত্ররচনার গুণের মধ্যে প্রায় অবিকল অনুকরণই দেখিতে পাওয়া যায় এবং অনেকে বাস্তবিকও তাহাকে গুণ মনে করিয়া তাঁহাদিগের চিত্রের প্রশংসা করেন যে, "আহা! ঠিক অবিকল অঙ্কিত হইয়াছে।" এইরূপ প্রশংসা শুনিলেই চিত্রকর আপনার সকল পরিশ্রম সফল মনে করেন। কিন্তু আমার মতে উক্ত রূপ অনুকরণ যত দোষের তত গুণের নহে। যদিও স্থানবিশেষে অনুকরণ কতক পরিমাণে শোভা পায় বটে, কিন্তু অনুকরণ মাত্রকে প্রাধান্য দিলে (সাক্ষাৎ প্রতিকৃতি-চিত্র ভিন্ন) আর সকল চিত্রেরই প্রকৃত গৌরব বিলুপ্ত হইয়া যায়। কাল্পনিক চিত্রেতেই চিত্রকরের বিশেষ গুণপনা প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহাতে কল্পনাশক্তির যত স্ফূর্ত্তি দেওয়া যায়, ততই তাহা হইতে অভীষ্ট ফল প্রসূত হয়। কোন কবি কোন পর্ব্বত বর্ণনা করিবার সময় যদি পার্ব্বতীয় যাবতীয় পদার্থ একে একে উল্লেখ করিয়া তাহার বিশেষ বিশেষ গুণ বর্ণনাতে প্রবৃত্ত হন এবং যথা দৃষ্ট তথা লিখিত এই বচনটির পাছে লেশমাত্র অন্যথা হয়, এই ভয়ে প্রতি বস্তুরই সকল গুণের বর্ণনাতে গ্রন্থের আয়তন বৃদ্ধি করেন, তবে তাহাতে তাঁহার যেরূপ হাস্যজনক কবিত্বশক্তি প্রকাশ পায়, সেইরূপ কেবলমাত্র অনুকরণের দিকে যত্নবান্ হইলে চিত্রকরের তাহাতে রচনাশক্তির লাঘব ভিন্ন কিছুই গৌরব প্রকাশ পায় না। অতএব যাঁহারা চিত্রবিষযে নিপুণতা উপার্জ্জন করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের কর্ত্তব্য এই যে, কোন স্বভাবসুন্দর ভাববিশেষের প্রতি অনুরাগী হইয়া কিসে চিত্রে সেই ভাব প্রকাশ করিতে পারেন, কেবল তাহারই চিন্তায় লাগিয়া থাকেন এবং তাহারই জন্য উপকরণ সংগ্রহের প্রয়োজন হইলে স্বভাবের অবারিত দ্বারে প্রবেশপূর্ব্বক তাহার আয়োজন করেন—অনুকরণের পথ একেবারেই পরিত্যাগ করেন।

বাহির হইতে প্রতিরূপ সংগ্রহ করাকেই যে অনুকরণ বলে তাহা নহে। কোন বিশেষ ভাব অনুসারে কার্য্য করিতে হইলে যাহা বাহির হইতে লইতে হয় তাহা লইলে অনুকরণ করা হয় না। কারণ তাহাতে সেই ভাব বিশেষেরই প্রাধান্য থাকে এবং বাহির হইতে প্রতিরূপ সংগ্রহ সেই ভাবেরই পোষকতাকার্য্যে নিযুক্ত হয়। পরন্তু, যদি অগ্রে কোন স্বাধীন ভাব হৃদয়ে উদিত না হয়, তাহা হইলেই ঐরূপ প্রতিরূপ সংগ্রহ অনুকরণ দোষে দূষিত হয়, কেন না সে স্থলে প্রতিরূপ গ্রহণ করাই একমাত্র মুখ্য কার্য্য হইয়া উঠে। যদি কেহ মনে করেন যে, তিনি একটি স্নেহভাব প্রকাশক চিত্র অঙ্কিত করিবেন, তাহা হইলে তিনি যদি স্নেহভাবের প্রতি অকৃত্রিমরূপে হৃদয়ের সহিত অনুরক্ত হইয়া ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন তবেই ভাল, নচেৎ তিনি যদি কেবল স্নেহের একটি সামান্য দৃষ্টান্ত সম্মুখে দেখিবামাত্র তাহারই প্রতিরূপ গ্রহণে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলেই অনুকরণের প্রাধান্য স্বীকার করা হয়। কিন্তু যদি চিত্রকর অগ্রে স্নেহের ভাবটি কোথায় কিরূপ অঙ্গভঙ্গিতে, কিরূপ পাত্র, কিরূপ স্থানে এবং কিরূপ আনুসঙ্গিক ঘটনার সংস্রবে বিশেষ শোভা ধারণ করে, এসমুদয় বিষয় স্বাধীনরূপে হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া তদনুসারে নানাস্থান হইতে তাহার উপকরণ সংগ্রহ করিতে থাকেন, তবেই তাহাতে ভাবের প্রাধান্য সপ্রমাণ হয়। ভাবুক ব্যক্তির চক্ষে যে স্থানে যেরূপ সৌন্দর্য্য যেরূপে শোভা পায়, তাহা স্বতঃই ধরা পড়ে, সুতরাং তাহার মন কখনই অনুকরণে তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। যে দেশে যাহা শোভা পায় সেই দেশে তিনি তাহারই অনুসরণে প্রবৃত্ত হন। যে ব্যক্তির অঙ্গে ধুতি চাদর শোভা পায়, তাহাকে তিনি কখনই কোট পরিধান করাইতে চাহেন না। যেখানে অশ্বত্থ বট শোভা পায়, সেখানে তিনি ওক্‌গাছ আনিয়া চাপাইতে চাহেন না। দেশ কাল পাত্র বিবেচনা যদিও ভাবুক চিত্রকরের স্বভাবসিদ্ধ, কিন্তু তাহাই তাঁহার মুখ্যকার্য্য নহে। যে প্রকৃত সৌন্দর্য্যের ভাব তাঁহার হৃদয়ে অহর্নিশি জাগরূক রহিয়াছে তাহাই চিত্রে প্রকাশ করা তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু তাহা করিতে গেলে তাঁহাকে দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া চলিলে হয়, না চলিতে তিনি কখনই অভীষ্টসাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না; যেহেতু চিত্রটি দেশ-কাল পাত্র অনুযায়ী না হইলে তাহার সৌন্দর্য্য সর্ব্বাঙ্গীন হইতে পারে না।...

অতএব যদি চিত্রকরগণ দেশ-কাল-পাত্রের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যের ভাব চিত্রে পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা পান, যদি অনুকরণের কুটিল পথ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বভাবের সহজ ও সরল পথ অবলম্বন করেন, এবং যদি স্বদেশসুলভ সৌন্দর্য্য অন্বেষণে যত্ন নিয়োগ করেন, তাহা হইলেই তাঁহাদের কার্য্য অভীষ্টানুযায়ী সিদ্ধিলাভের সোপানে উত্তীর্ণ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

চিত্র সম্বন্ধে আমাদের ভ্রম আমাদের শিক্ষার দোষে জন্মিয়াছে। বাল্যকাল হইতে সর্ব্বাঙ্গীন সুশিক্ষা হইলে এইরূপ ভ্রম কালে দেশ হইতে দূরীভূত হইবে।

শুনিলাম, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে চিত্রবিদ্যা সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা দিতে অনুরোধ করিয়াছেন। ইহা সুবিবেচনার কাজ হইয়াছে। তাঁহার বক্তৃতায় শিক্ষিত লোকদের কৌতূহল বৃদ্ধি হইলে, পরে যদি বিশ্ববিদ্যালয় স্কুলগুলিতে চিত্রবিদ্যার শিক্ষার গোড়াপত্তন ভাল করিয়া করাইতে পারেন, তাহা হইলে জাতীয় শিক্ষার একটি অভাব মোচন হইবে।

খয়রার রাজার প্রদত্ত টাকা হইতে, ভারতীয়

ললিতকলা (Indian Fine Arts) সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার জন্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একজন অধ্যাপক নিযুক্ত করিবেন, স্থির হইয়াছে। অধ্যাপনার সফলতা যোগ্য শিক্ষক ও যোগ্য ছাত্রের উপর নির্ভর করে। ভারতীয় ললিতকলা-বিষয়ে শিক্ষা দিবার লোক বেশী না থাকিলেও, সেরূপ লোকের একান্ত অভাব নাই। কিন্তু উপযুক্ত ছাত্র প্রথম প্রথম পাওয়া তত সহজ হইবে না। কারণ, বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার প্রবেশিকার পথ দিয়া যাঁহারা বিদ্যামন্দিরে প্রবেশ করেন নাই, তাঁহাদিগকে ছাত্র বলিয়া গ্রহণ করিবেন কি না, সন্দেহস্থল। সেইজন্য এখন হইতে চিত্রবিদ্যা শিক্ষার গোড়াপত্তন ভাল করিয়া করা হউক। তাহা হইলে, ললিতকলা অধ্যাপকের শ্রম সফল হইবে।

অবশ্য চিত্র ছাড়া অন্য ললিতকলাও আছে। কিন্তু একজন অধ্যাপকের দ্বারা নানা কলার শিক্ষা হইবে না।

১৩৩৫ পৌষ

নব্যতন্ত্রের বঙ্গীয় চিত্রকরসম্প্রদায়

নব্যতন্ত্রের বঙ্গীয় চিত্রকরসম্প্রদায় বলিতে কেহ যদি মনে করেন, আমাদের বড় বড় চিত্রকরেরা সবাই একই রীতি একই পদ্ধতির অনুসরণ করেন, তাহা হইলে তিনি ভুল করিবেন। তাঁহাদের মধ্যে সাদৃশ্য আছে বটে। কিন্তু পার্থক্যও খুব আছে।

নিজের বাড়ীর ছেলেদের সকলেরই ভাল লাগিবার কথা, কারণ তাহারা নিজের। কিন্তু যদি অন্যেরাও তাহাদের প্রশংসা করে, তবেই ঠিক্ মনে করা যাইতে পারে, যে, তাহাদের সদ্‌গুণ আছে। তেমনি, আমাদের পক্ষে বাঙালী চিত্রকরদিগকে শক্তিমান্ ও প্রতিভাশালী মনে করা স্বাভাবিক, কিন্তু যদি সমজদার বিদেশী ও বিপ্রদেশীরা তাঁহাদের প্রশংসা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা সমর্থিত ও দৃঢ়ীভূত হয়। যে-সব দেশের লোকদের সঙ্গে আমাদের প্রতিযোগিতা নাই, তথাকার সমজদার লোকেরা আমাদের শিল্পীদের প্রশংসা কবিযাছেন দোষ-ত্রুটির কথাও বলিয়াছেন। এই প্রকার উভয়দিগ্‌দর্শী সমালোচকদের প্রশংসার মূল্য আছে। নানাকারণে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ভাব জন্মিয়াছে। তাহা সত্ত্বেও যদি বিপ্রদেশী কোন যোগ্য সমালোচক আমাদের চিত্রশিল্পীদের গুণকীর্ত্তন করেন, তাহা হইলে তাহা শ্রদ্ধেয় মনে না কবিবাব কোন কারণ থাকে না।

মান্দ্রাজেয় "হিন্দু" তথাকার ও সমগ্র ভারতের একটি প্রধান খবরের কাগজ। কিছুদিন হইল তাহাতে শ্রীযুক্ত জী বেঙ্কটাচলম্ নব্যতন্ত্রের বাঙালী চিত্রকরদের চিত্রকলার পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচয় তিনি প্রথমে দেন। ভূমিকা স্বরূপ জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের সম্বন্ধে তিনি বলেন :—

The Tagores are outstanding personalities, not only in India, but in

the world. The most famous of them, Rabindranath Tagore, is hailed as, perhaps, the greatest living poet in the world. His two nephews, Abanindranath Tagore and Goganendranath Tagore, are no less great in their own art and are equally well-known in this country and elsewhere as leaders of a new art movement. A narrow lane form one of the crowded and busy streets of Calcutta leads you to a secluded square with stately buildings on its three sides, in which dwell the famous family of Tagores, who have been India's great cultural interpreters to the West. The two artist-brothers live in a mansion facing that of their great poet-uncle, and the whole environment is Indian : Indian furniture, Indian draperies; Indian utensils, all of exquisite beauty, are to be seen in the rooms. Here they dream, design, work and teach.

অবনীন্দ্রনাথের নিজের সম্বন্ধে বেঙ্কটাচলম্ বলেন—

Tagore is a most sensitive artist, in whose works one sees not only the subtle suggestiveness of the Hindu mind but the exquisite colouring and finish of Persian art and the perfected technique of Japanese painting. He borrows freely the methods and mannerisms of the Far-Eastern art, as it expresses more freely his real genius than the heavy, cumbersome Western technique in which he was trained.

সমালোচক জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, অর্দ্ধ শতাব্দীরও উপর ধরিয়া সরকারী আর্টস্কুল সকলে ভারতীয় ছাত্রেরা শিক্ষা পাইয়াও কেহ উল্লেখযোগ্য নূতন কিছু করিতে পারে নাই, অথচ পাশ্চাত্য রীতি ত্যাগ করিয়া প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতি এবং পারসীক, চৈনিক ও জাপানী পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া বা তাহার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহাদের কেহ কেহ বিশিষ্টরূপ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, ইহার কারণ কি? কারণ মোটামোটি এই, যে চৈনিক, পারসীক, জাপানী এবং প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় প্রকৃতির সহিত আধুনিক ভারতীয়দের প্রকৃতির যতটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, পাশ্চাত্য জাতিদের প্রকৃতির সহিত ততটা ঘনিষ্ঠ যোগ নাই।

পাশ্চাত্য চিত্রাঙ্কন রীতি ও পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া প্রাচ্য পথের পথিক প্রথমে হন অবনীন্দ্রনাথ। তিনিই প্রথম বিদ্রোহী। বেঙ্কটাচলম্ বলেন :—

The first one to raise the standard of revolt was Abanindranath Tagore: he was not merely a rebel but a constructive genius. His was the first effort to synthesise the refined delicacy of Japanese painting, the purity of Chinese art, the exquisite finish of Persian miniatures and the idealism of Hindu art. Tagore is essentially an experimentalist, as all great masters were.

অতঃপর সমালোচক অবনীন্দ্রনাথের কতকগুলি ছবির উল্লেখ ও প্রশংসা করিয়া সর্ব্বশেষে "শাহজাহানের পরলোকযাত্রা" ছবিখানির বর্ণনার আরম্ভে বলিয়াছেন :—

Restraint is the soul of art; and Tagore's great masterpiece, "The Passing of Shah Jehan," is a superb example of repose and restraint.

অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বেঙ্কটাচলমের শেষ কথা—

He does not bind himself to any

set of art traditions or conventions; hence the originality, the newness and the boldness of his art. He sums up in himself, in short, all that is great, good, beautiful and true in his country's art : is mysticism, its symbolism, its idealism, its suggestiveness; the sublime spirituality of his race, the daring imagination of his ancestors, the sensitive-emotional sensibility of his province and the utmost freedom of expression in life and art. He is, forsooth, his own ancestor.

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্বন্ধে বেঙ্কটাচলম্ বলেন, যে, তিনি হইতেছেন

a picturesque adventurer on the high seas of Indian art, and is an artist of versatile genius. He took to painting rather late in his life, and is a self-made artist. He never studied in any school of art or under any master. He was a connossieur of art before he took to creative work himself. A born artist, with leisure, comfort and money at his command, he was able to play with brush and colours as he liked, and some of the playful experiments of his artistic moods have given us new aesthetic joys. Goganendra's intuitions express themselves in gorgeous colours and delightful patterns : his fertile imagination conceives ideas and creates forms that are interestingly intriguing and fascinatingly puzzling. His originality is vivid, spontaneous and charming. His power of expression is varied and he stands out in India, among his colleagues, as not only the greatest cartoonist and caricaturist (to whom Bengal owes much of her progress in social reform) and a supreme painter of gorgeous sun-set landscapes, which drew the unstinted admiration and praise of the artists and art-critics in the salons of Paris, but as, perhaps the most idealistic and imaginative of cubistic and impressionistic artists in the world.

অতঃপর তাঁহার অনেকগুলি ছবির বিশেষত্ব ও সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করিয়া সমালোচক বলিতেছেন :—

Goganendranath is also a daring experimentalist like his brother, Abanindranath.

What things of rare beauty may Goganendranath yet bring from the spacious depths of his many-coloured moods? The world is the richer for an artist of his type and genius.

নন্দলাল বসু সম্বন্ধে বেঙ্কটাচলম্ বলেন :—

Next, perhaps, to Abanindranath Tagore, Nandalal Bose is the more well-known artist of modern India. As the Head of the School of Painting (Kalabhavan) of the Viswabharati University at Santiniketan and as one of the leaders of the Neo-Bengal School of Painting, he is widely recognized as one of the master-artists of the world. He has not the eclectic genius of his master Abanindranath Tagore, but he has in abundance the creative genius of a master-mind. He is distinctly himself and has not allowed any style or school of painting to influence him except his own country's classical art of Ajanta.

রবীন্দ্রনাথের সহিত বিদেশ ভ্রমণ করিয়া নন্দলাল চিত্রাঙ্কনের কারিগরী সম্বন্ধে কিছু হদিশ পাইয়াছেন, কিন্তু

they never influenced his art as they have done in the cases of other artists of India. Nandalal's art is typical of the Hindu genius; his great works show the sculpturesque effect of the ancients.

বেঙ্কটাচলমের মতে

Nandalal Bose has all the imaginative sensibility of a sensitive artist and the strength of a creative genius. He has a golden heart for a teacher and is beloved of his pupils. His students revere him and regard him with the greatest affection and look up to him as their friend and guide. His true greatness lies, like that of his compeer and co-student Venkatappa of Mysore, in his utter simplicity and the sincerity of his art.

প্রাচীন পৌরাণিক আখ্যায়িকায় এবং দেবদেবীর মূর্ত্তিতে নন্দলাল যে নূতন ভাব ও কাব্যরসের সঞ্চার করিয়াছেন, সমালোচক তাহার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। রূপকার নন্দলালের কারিগরীর বিশেষত্ব বেঙ্কটাচলম্ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

His greatest characteristic feature, as an artist, is the dynamic vitality of his lines. In this he is the nearest to the Ajantan masters; in fact he is the most Ajantan among modern Indian painters. He has been deeply influenced by this art of ancient India. We see it in every detail of Nandalal's art. Not that he has no originality; he has that in abundance In fact, it is given to few artists to invest well-known themes with the charm and freshness of a new conception, and Nandalal has coined new types from the richness of his imagination and the inner vision of his soul.

Nandalal's special contribution to modern art is this recreation of the forgotten art traditions of India. Nandalal is not a delicate colourist like Tagore or Venkatappa, but a master of lines, vigorous and virile. His lines always tend to move, sway, curve, ever suggesting motion. Nandalal is also a great illustrator of books; Rabindranath, the poet, owes much to him for illustrating his songs and poems in a delicate and sensitive way.

নন্দলালের অনেকগুলি ছবির উল্লেখ ও প্রশংসা দক্ষিণ ভারতের এই লেখকের সমালোচনায় দৃষ্ট হয়। তাঁহার মতে

His great masterpiece, "Shiva Mourning over Parvati," is a work to be ranked with the best painting ever done by any master under any clime.

Nandalal is unapproachable in work of this kind; he is a master-mind and the master-artist. But he has another side to his nature, unsuspected by many. His child-like heart ever keeps him in playful moods, and at times, mischievous; and paintings, sketches and drawings done in that mood make an irresistible appeal.

He is a dearly loved man, both as an artist and a teacher. May he be spared long for India!

ইংরেজী বাক্যগুলির সরল ও সংক্ষিপ্ত অনুবাদ বাংলায় করা দুঃসাধ্য বলিয়া তাহার চেষ্টা করিলাম না।

১৩৪৭ আষাঢ়

আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ

সম্প্রতি মেদিনীপুরে তথাকার সাহিত্য-পরিষদের উৎসব উপলক্ষ্যে আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলা সম্বন্ধে কিছু 'ঐতিহাসিক' আলোচনা হইয়াছিল, দৈনিক কাগজে এইরূপ দেখিয়াছি। বঙ্গে এই আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার সূত্রপাত সম্বন্ধে লিখিতে বা বক্তৃতা করিতে গিয়া কেহই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে বাদ দিতে পারেন না। অতএব, তিনি ইহার উদ্ভব সম্বন্ধে কি বলেন, তাহা আধুনিক ইণ্ডিয়ান আর্টের কোন তথ্যপ্রিয় ঐতিহাসিক কিংবা অ-বিশেষজ্ঞ বক্তা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না। তিনি সন ১৩৩৩ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের 'শান্তিনিকেতন পত্রে' লিখিয়াছিলেন, "বাংগলার কবি (রবীন্দ্রনাথ) আর্টের সূত্রপাত করেন, বাংগলার আর্টিস্ট (অবনীন্দ্রনাথ) সেই সূত্র ধ'রে একলা একলা কাজ ক'রে চলে কত দিন—"। অবনীন্দ্রনাথের এই উক্তি রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিপূর্তি-উৎসব উপলক্ষ্যে প্রকাশিত "গোল্ডেন বুক অব্ টাগোর" নামক গ্রন্থের উপক্রমণিকায় উদ্ধৃত হইয়া আছে।

'প্রবাসী' আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার কিঞ্চিৎ সেবা করিয়াছে। নূতন কিছু কেহ করিলে কাহাকেও না কাহাকেও তজ্জন্য কটু উক্তি সহ্য করিতে হয়। 'প্রবাসী'র সেবা অন্ততঃ এইটুকু, যে, সে তাহা সহ্য করিয়া অপর সকলকে সেই অপ্রিয় কর্তব্য পালনের দায় হইতে মুক্তি দিয়াছে। এই ব্যাপারটি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জবানি বর্ণিত হওয়া ভাল।

১৩৩২ সালের চৈত্র মাসে প্রবাসীর ২৫ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় যাঁহারা আনন্দ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের চিঠি ১৩৩৩ সালের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই চিঠি লিখিয়াছিলেন :—

ছেলেদের জন্যে বই লিখি কিন্তু সে-বই ছবি দিয়ে সাজিয়ে তোলার ভারও নিজে নিতে হয়। শুধু এই নয়, বক তৈরি করাতে ছুটতে হয় ফিরিঙ্গীর কাছে! হাফ্‌টোন এবং থ্রী-কলার বলে' দুটো জিনিস তখন ছাপাখানা থেকে অনেক দূরে অজ্ঞাতবাস করছে। এমন সময়ে রামানন্দ-বাবুর মাথায় খেয়াল উঠলো সচিত্র প্রবাসী প্রকাশ করার! আমি তখন আছি এলাহাবাদে চার্চ্চ-রোডে জজ সাহেবের বাংলায়, আর রামানন্দ-বাবু থাকেন ভরদ্বাজ-আশ্রমের কাছাকাছি আর-একটা বাসায়—দুজনেই প্রবাসী আমরা! ইণ্ডিয়ান প্রেসের চিন্তমণি-বাবু তখন নতুন নতুন ছাপাখানাটা সুরু করেছেন। একজন হিন্দুস্থানী চিত্রকর সে ছবি আঁকে বই সাজাতে। বাংলার চিত্রকর সবাই ভবিষ্য অবস্থায় তখন, কেবল সকাল হচ্ছে মাত্র। সেই সচিত্র মাসিক পত্রের আরম্ভের যুগে সেই সময়ে রামানন্দ-বাবুর দুঃসাহসে ভর করে' প্রবাসীর প্রথম সংখ্যার দেখা দেবার আয়োজন আরম্ভ হ'য়ে গেল। সচিত্র মাসিক পত্রিকা বার করার স্বপ্ন অনেক দিন এসেছিল আমাদের অনেকের মনে, কিন্তু সে পত্রিকা নিয়মিতভাবে প্রকাশের বিষয়ে সন্দেহ নিয়েই আস্‌তো ভাবনাটা। তাই রামানন্দ-বাবু যখন নিঃসংশয়ে ছবি ছাপানোর প্রস্তাবটা আমার কাছে পাড়লেন তখন ছোট ছোট ছেলে-মেয়েতে পরিপূর্ণ তাঁর সংসারটির দিকে চেয়ে আমি বলেছিলেম, কাগজটা চালাতে গিয়ে শেষ না বিপদে পড়েন! সেই প্রবাসী আর আজকের

প্রবাসী সমান ভাবে চলে' এল, নতুন নতুন আর্টিষ্ট এল ছবি দিতে 'প্রবাসী'তে! এ যে হ'ল তার জন্যে দায়ী আমি নয়, রামানন্দ-বাবু। নতুন বাংলার আর্টিষ্টদের ছবি প্রবাসীতে এবং তাঁর আল্‌বমে তাঁর রামায়ণে ছাপিয়ে বারে বারে সমালোচকের হাতে তাঁকে তিরস্কৃত হ'তে হয়েছে; আর আমরা আর্টিষ্টরা শুধু যে তাঁর দৌলতে বিনি পয়সায় দেশজোড়া বিজ্ঞাপন পেয়ে গেছি তা নয়, নিয়মিত দক্ষিণা কাঞ্চনমূল্য তাও পাচ্ছি এখনো। কে ছাপ্‌তো ঘরের কড়ি দিয়ে আমাদের ছেলে-মেয়েদের হাতের ছেলেখেলার ছবি সমস্ত, যদি না প্রবাসী বার করতেন রামানন্দ-বাবু? কোথায় ছিল তখন* "—", কোথায় "—", কোথায় "—", কোথায় বা "—"র পুরস্কার! প্রবাসীর সঙ্গে গোড়া থেকেই আমার বিনামূল্যে দেওয়া এবং নেওয়া সম্পর্ক বহু বৎসর আগে সেই প্রবাসে স্থির হ'য়ে গেছে। এখনকার আর্টিষ্ট তারা কেউ সত্যিই আমার ছাত্র—কেউ ছাত্র না হ'য়েও ঐ নামে চলে' যায়। সবাইকে প্রবাসী বিনা খরচে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে, সুতরাং তাদের সবার হ'য়ে আজ আমি প্রবাসীকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, আর আমার নিজের দিক্ থেকে বল্‌ছি, শোভন কীর্ত্তি তোমার হউক।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার উৎসাহদাত্রী বলিয়া যাঁহারা ভগিনী নিবেদিতার নাম করেন তাঁহারা ঠিক্‌ই করেন। তিনি শুধু ভারতবর্ষের নহে, অন্যান্য দেশেরও ললিতকলার মর্ম্মজ্ঞ ছিলেন। ভারতীয় চিত্রকলার নূতন পর্যায়ের উৎকর্ষ বুঝিতে ও মর্ম্মজ্ঞ হইতে সাহায্য করিবার নিমিত্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "মুমূর্ষু শাহজাহান" প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ চিত্রের ব্যাখ্যা তিনি 'মডার্ন রিভিয়ু'তেই করিতেন। কারণ ঐ সকল চিত্রের বহুবর্ণ প্রতিলিপি ইংরেজী মাসিক কাগজের মধ্যে একমাত্র উহাতেই ছাপা হইত (এবং এখনও উহাতেই হয়)। অতএব ভারতীয় চিত্রকলার সেবক বলিয়া ঐ ইংরেজী মাসিকেরও নাম করিলে সত্যের অপলাপ হয় না। ভগিনী নিবেদিতা মডার্ন রিভিয়ুতে অজন্টা গুহাবলীর স্থাপত্য ও ভাস্কর্য সম্বন্ধেও প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

* নামগুলি বাদ দিলাম। প্রবাসীর সম্পাদক।

অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুগামী শিল্পীগণ

১৩০৯ মাঘ – ফাল্গুন

বর্ত্তমান সংখ্যার চিত্র।

[অবনীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত 'বুদ্ধ ও সুজাতা' চিত্র

শাক্যসিংহ বহু বৎসর ধরিয়া চিন্তা করিয়া মানবের মুক্তির পথ আবিষ্কার করেন এবং তৎপরে বুদ্ধনামে পরিচিত হন। তিনি এই তপশ্চর্য্যার কয়েকবৎসর সেনানী নামক গ্রামের নিকট যাপন করেন। সুজাতানাম্নী সাধুশীলা নারী এই গ্রামের ভূম্যধিকারীর পত্নী ছিলেন। তাঁহার সন্তান না হওয়ায় তিনি বনদেবতার নিকট মানসিক করিয়াছিলেন যে পুত্রলাভ হইলে বনদেবতার পূজা দিবেন। কিছুদিন পরে তাঁহার একটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল। শিশুটি তিনমাসের হইলে তিনি স্বহস্তে পায়স প্রস্তুত করিয়া বনদেবতাকে দিতে যাইবার আয়োজন করিলেন। নিকটবর্ত্তী অরণ্যে যে বনস্পতি দেবতাকর্ত্তৃক অধ্যুষিত বলিয়া লোকে মনে করিত, সুজাতা তাহার সম্মুখস্থ ভূমি পরিষ্কার করিতে ও তাহার কাণ্ডের চারিদিকে রক্তবর্ণ সূত্র জড়াইতে রাধানাম্নী পরিচারিকাকে প্রেরণ করিলেন। রাধা তরুতলে ধ্যাননিরত সৌম্যমূর্ত্তি বুদ্ধদেবকে দেখিয়া তাঁহাকেই বনদেবতা মনে করিয়া সুজাতার গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইল, এবং কহিল, "বনদেবতা সাক্ষাৎ তরুতলে আবির্ভূত হইয়াছেন।" তাহা শুনিয়া সুজাতা বনস্পতিসমীপে গিয়া প্রণামানন্তর বুদ্ধদেবকে ভক্তির সহিত পায়সের পাত্র অর্পণ করেন। বুদ্ধদেব বহুকাল উপবাসের পর পায়স ভক্ষণ করিয়া বল লাভ করেন। তৎপরে তাঁহার সহিত সুজাতার কথোপকথন হয়। এই সমস্ত বিস্তৃতভাবে সুললিতভাষায় এডুইন আর্ণল্ডপ্রণীত লাইট অব্ এশিয়া নামক গ্রন্থের ৬ষ্ঠ সর্গে বর্ণিত আছে।

পুণ্যশ্লোক ঈশ্বরচন্দ্রবিদ্যাসাগর মহাশয় প্রণীত বেতাল-পঞ্চবিংশতির প্রথম উপাখ্যান এইরূপে আরব্ধ হইয়াছে।

"বারাণসী নগরীতে, প্রতাপমুকুট নামে, এক প্রবল-প্রতাপ নরপতি ছিলেন। তাঁহার মহাদেবী নামে প্রেয়সী মহিষী ও বজ্রমুকুট নামে হৃদয়নন্দন নন্দন ছিল। একদিন রাজকুমার, একমাত্র অমাত্যপুত্রকে সমভিব্যাহারে লইয়া, মৃগয়ায় গমন করিলেন। তিনি নানা বনে ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে এক নিবিড় অরণ্যে প্রবেশপূর্ব্বক, ঐ অরণ্যের মধ্যবর্ত্তী অতি মনোহর সরোবর সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, ঐ সরোবরের নির্ম্মল সলিলে হংস, বক, চক্রবাক প্রভৃতি নানাবিধ জলচর বিহঙ্গমগণ কেলি করিতেছে; প্রফুল্ল কমলসমূহের সৌরভে চারিদিক আমোদিত হইয়া আছে; মধুকরেরা মধুগন্ধে অন্ধ হইয়া, গুন্ গুন্ ধ্বনি করত, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে; তীরস্থিত তরুগণ অভিনব পল্লব, ফল, কুসুমসমূহে সুশোভিত রহিয়াছে; উহাদের ছায়া অতি স্নিগ্ধ; বিশেষতঃ শীতল সুগন্ধ গন্ধবহের মন্দ মন্দ সঞ্চার দ্বারা, পরম রমণীয় হইয়া আছে; তথায় উপস্থিতি মাত্র, শ্রান্ত ও আতপক্লান্তব্যক্তির শ্রান্তি ও ক্লান্তি দূর হয়।

"এই পরম রমণীয় স্থানে, কিয়ৎক্ষণ সঞ্চরণ করিয়া রাজকুমার অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন, এবং সমীপবর্ত্তী বকুলবৃক্ষের স্কন্ধে অশ্ববন্ধন ও সরোবরে অবগাহনপূর্ব্বক, স্নান করিলেন; অনন্তর অনতিদূরবর্ত্তী দেবাদিদেব মহাদেবের মন্দিরে

প্রবেশপূর্ব্বক, দর্শন, পূজা ও প্রণাম করিয়া, কিয়ৎক্ষণ পরে বহির্গত হইলেন। ঐ সময় মধ্যে এক রাজকন্যাও, স্বীয় সহচরীবর্গের সহিত, সরোবরের অপর পাবে উপস্থিত হইয়া, স্নান ও পূজা সমাপনপূর্ব্বক বৃক্ষের ছায়ায ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দৈবযোগে, তাঁহার ও বজ্রমুকুটের চারিচক্ষু একত্র হইল। তদীয় নিরুপম সৌন্দর্য্য দর্শনে নৃপনন্দন মোহিত হইলেন। রাজকুমারীও বজ্রমুকুটকে নয়নগোচর করিয়া, কৃতার্থম্মন্য হইয়া, শিরঃস্থিত পদ্ম হস্তে লইলেন; অনন্তর কর্ণসংযুক্ত করিয়া, দন্তদ্বারা ছেদনপূর্ব্বক, পদতলে নিক্ষিপ্ত করিলেন; পুনর্ব্বার গ্রহণ ও হৃদয়ে স্থাপন করিয়া, বারংবার রাজতনয়ের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে, স্বীয় প্রিয় বয়স্যাগণের সহিত স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।"

অবনীন্দ্রবাবু এই দৃশ্যের যে ছবি আঁকিয়াছেন, তাহাও বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রদত্ত হইল। তাঁহার অঙ্কিত মূল ছবি দুইখানি নানাবর্ণে রঞ্জিত। এইজন্য আমাদের প্রদত্ত প্রতিলিপি হইতে চিত্রদ্বয়ের সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ বুঝা যাইবে না। হাভেল সাহেব গত অক্টোবর মাসের স্টুডিওতে অবনীন্দ্রবাবুর চিত্রসমূহ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন যে "অবনীন্দ্রবাবু মোগল শাসনকালের ভারতীয় চিত্রকরগণের শিল্পে নিজ প্রতিভাবিকাশের উপযোগী উপাদান পাইয়াছেন; কিন্তু তা বলিয়া তিনি বিলোপপ্রাপ্ত চিত্রাঙ্কনরীতি বিশেষের অনুকারী মাত্র নহেন।" অর্থাৎ তাঁহার প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য আছে। হাভেল সাহেব আরও লিখিয়াছেন :— "While he is as yet far from achieving the marvellous certainty of line and the daintiness of finish found in the best Mogul work, there are a poetic charm and sentiment in the treatment of the old-world stories he delights to illustrate which are peculiarly his own." স্টুডিওতে প্রকাশিত ছবিগুলি দেখিয়া পাইয়োনীয়র লিখিয়াছেন :— "The reproductions given in the *Studio* of this artist's work are very fascinating. They reveal no a trace of English influence... In their *naive* grace of line, they suggest the art of Japan; but there is no mistaking their Indian origin (*Pioneer*, January 3, 1903). আমরা ভবিষ্যতে অবনীন্দ্রবাবুর আরও চিত্র প্রকাশিত করিব।

[রচনার মধ্যে প্রদত্ত চিত্রাদির প্রতিলিপি বাদ দেওয়া হয়েছে—সংকলন-সম্পাদক]।

১৩১৫ আষাঢ়
জয়পুর কলা-বিদ্যালয়

গত বৎসরের প্রবাসীতে জয়পুর সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে তথাকার মহারাজার কলাবিদ্যালয়ের বিষয়ে কিছু লিখিয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় বায়চৌধুরী ইহার প্রিন্সিপ্যাল। তিনি কলিকাতায় শিল্প শিখিবার পর লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া উপাধি প্রাপ্ত হন। ভাস্কর্য্যে তাঁহার বিশেষ নৈপুণ্য আছে।

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ দে জয়পুর কলা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। তিনি শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একজন শিষ্য, কলিকাতায় শিক্ষালাভ করিবার পর অন্যত্রও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। ইহাঁরা ভিন্ন আরও অনেক ভারতীয় উপযুক্ত শিক্ষাদাতা আছেন। এই বিদ্যালয়ে চারুশিল্প ও কারুশিল্প উভয়ই শিক্ষা দেওয়া হয়। জয়পুরের মাটী, পাথর, কাঠ ও ধাতুর নানাবিধ সুন্দর জিনিষ ভারতবর্ষে ও ইউরোপ আমেরিকায় সাদরে ক্রীত হয়। এই বিদ্যালয়টির মত একটি প্রতিষ্ঠান যে সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় শিল্পীদের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে, ইহা গৌরব ও সন্তোষের বিষয়। সম্প্রতি ইহার কতকগুলি শিল্পদ্রব্য বাঙ্গালোরের কলামন্দিরের প্রদর্শনীতে প্রেরিত হইয়াছিল। সবগুলিই প্রশংসিত হইয়াছে, এবং চীনামাটির পাত্র এবং মুক্তাদির দ্বারা ধাতুদ্রব্য খচিত করিবার কাজের জন্য বিদ্যালয় স্বর্ণপদক পাইয়াছে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ ও শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ দের কার্য্য প্রশংসার সহিত উল্লিখিত হইয়াছে। বাঙ্গালোর প্রদর্শনীর সম্পাদক প্রিন্সিপ্যাল রায়চৌধুরীকে লিখিয়াছেন—

"Your exhibits have opened the eyes of many regarding the artistic works produced in our country and tempted me also to send one of my students to your care for a few months to get training in porcelain and inlay work, if you can kindly permit."

১৩১৬ বৈশাখ

কলঙ্কভঞ্জন

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রিয় সুরেন্দ্র!

তোমার লক্ষ্মণসেনের পলায়ন চিত্রখানি সেন রাজের নির্ম্মল চরিত্রে অযথা কলঙ্ক আরোপ করিয়াছে জ্ঞান করিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়াছ এবং বোধ হয় ভাবিতেছ সে ছবিখানা না লিখিলেই ভাল ছিল! মৈত্র মহাশয়ের ঐতিহাসিক প্রমাণ পাঠে তোমার নিশ্চয়ই হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে যে লক্ষ্মণসেন বক্তিয়ার ও তাহার সপ্তদশ অশ্বারোহী একটা গালগল্প খাঁটি ইতিহাসও নয় প্রামাণিক সত্যও নয়। এখন এই প্রামাণিক সত্যের উপরে নির্ভর না করিয়া—অর্থাৎ সেন রাজা পলায়ন করেন নাই এই সত্যের খাতিরে ছবিখানি আঁকিতে বিরত না থাকিয়া—গল্প কথার উপরে তোমার করুণ সুন্দর চিত্রখানি ফুটাইয়া তুলিয়া তুমি ঠিক কাজ করিয়াছ কিনা ইহাই বিচারের বিষয়।

তোমার বোধ হয় বুঝিতে বাকি নাই যে ইতিহাসের রাজ্য আর শিল্পের রাজ্য এক নয়। ইস্কুলের পাঠ্য আর দিদিমার রূপকথায়, History আর Storyতে যেমন প্রভেদ এই দুই রাজ্যেও তেমনি প্রভেদ।

ইতিহাসের রাজ্যে প্রমাণ বলবন্ত, শিল্পের রাজ্যে প্রকাশই হচ্ছে সর্ব্বেসর্ব্বা। এখানেই ইতিহাসের সঙ্গে কাব্য ও শিল্পের পার্থক্য এবং এই পার্থক্য আছে বলিয়াই Historyটা fact হইয়াও নীরস আর Storyটা Paintingটা Poetryটা fact না হইয়াও সরস ও মনোহর।

বাল্মীকি বেদব্যাস ও আরব্য উপন্যাসের

অদ্বিতীয় লেখককে যদি fact মিলাইতে হইত তবে জগতে তিনখানি অমূল্য গ্রন্থের রচনা বন্ধ থাকিত; এবং জগৎশিল্পাগারে অনেক অতুলনীয় মূর্ত্তি ও চিত্র ওই একই কারণে প্রবেশলাভ করিত না।

মানুষ কোন কালেই যথাযথটি পাইয়া তৃপ্তিলাভ করেনা, তা সেটা যতই সত্য হউক না কেন। আমাদের মনপাখি এই যথাযথের কঠিন প্রাচীর বেষ্টনে পিঞ্জরাবদ্ধের মত থাকিতে কিছুতেই রাজি নয়, সেই জন্যই গাছের ফুল থাকিতে সে সোনার কর্ণফুলের, History থাকিতে Storyর জন্য লালায়িত। মানবজীবনে এই লালসা তৃপ্ত করে বলিয়াই শিল্পের ও কাব্যের আদর; তাহারা যথাযথকে অযথা এবং অযথাকে যেন যথাযথ রূপে প্রকাশ করিয়াও এই কারণে মনোহর। Factএর দাস art নয়, art এর পদতলে fact মাদ্রাজ মিউজিয়মে নটরাজ মূর্ত্তি দেখিয়াই কি? তাণ্ডব নৃত্যকারী মহাদেবের সেই মূর্ত্তি আর art এর মূর্ত্তি একই। ত্রিপুরাসুর একটা দুরন্ত fact রূপে ঠিক শরীর তত্ত্বানুযায়ী দুই হাত দুই পা এক মুণ্ড লইয়া পড়িয়া আছে আর তাহার উপরে অসম্ভব অযথা রূপ চার হাতে নটরাজ বা শিল্পদেবতা আনন্দে নৃত্য করিতেছেন।

তবেই দেখিতেছ ঐতিহাসিকের কাছে যে fact টার মূল্য আছে তুমি শিল্পী তোমার কাছে সেটার কোন মূল্য নাই বলিলেও হয়। ঐতিহাসিক যেটাকে fact নয় বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন, তোমার কাছে ঠিক সেই না factটাই বিশেষ প্রয়োজনীয় পদার্থ, কেননা সেই অসত্য পলায়ন কথার ভিতর দিয়াই তুমি "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ" এই মহাসত্য ঘোষণা করিবার সুযোগ পাইয়াছ।

শিল্প, সঙ্গীত ও কবিতা এ তিনেরই পদ্মের সঙ্গে তুলনা হয়। তাহাদের মূলে অসত্য ও অযথার পঙ্করাশি— কিন্তু যেখানটায় তাহাদের প্রকাশ বা বিকাশ সেখানে আলোক আর অকলঙ্ক মাধুরী।

মানুষের ভাগ্যচক্রের উপরে শনির দৃষ্টি আর শিল্পের উপরে fact এর দৃষ্টি সমান উপকারী।

এই দেখনা কেন; তুমি যদি ঐতিহাসিক factএর উপরে আস্থা স্থাপন করিতে, তবে এই সুন্দর ছবিটি তোমার আঁকাই হইত না। আবার যদি গাল গল্পের factটার অনুসরণ করিতে চাহিতে তবেও গোলে পড়িতে, কেননা তোমাকে আঁকিতে হইত সপ্তাদশ অশ্বারোহী পশ্চাতে ছুটিয়াছে—অগ্রে অগ্রে তাড়িত শৃগালপ্রায় বদ্ধ হতভাগ্য সেন রাজা! এরূপ করিলে বলিতাম তুমি মৈত্র মহাশয়ের কথামতো লক্ষ্মণসেনের পলায়নকলঙ্ক ও তৎসঙ্গে তোমার নিজের এবং এ হতভাগ্য গুরুরও কলঙ্ক চিরস্মরণীয় করিতে। কিন্তু আমি দেখিতেছি তুমি এ দুয়ের একটাও কর নাই! পাকা শিল্পীর যাহা হয় তোমারও তাহাই হইয়াছে।

পলায়নকলঙ্কস্বরূপ অসহ্য পঙ্ককে আশ্রয় করিয়া তোমার মনোমৃণাল অবাধে সিধা গিয়া ঠিক জায়গায় বিকাশলাভ করিয়াছে, বঙ্গারাজশ্রীর একটি নিষ্কলঙ্ক করুণ বিদায়ছবিতে। তোমার এ লক্ষ্মণসেন ইতিহাসের ছায়া নয় কিন্তু কালচক্রের মর্ম্মভেদী ঝন্‌ঝনার সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনিমাত্র।

কলিকাতা। শুভাকাঙ্ক্ষী
২রা চৈত্র, ১৩১৫। শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী "লক্ষ্মণসেনের পলায়ন" নামক একটি সুন্দর ছবি আঁকিয়াছেন। তদুপলক্ষ্যে গত বৎসরের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় শিল্পীর নৈপুণ্যের প্রশংসা করেন, কিন্তু ছবিটির যে ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই, তাহাও প্রদর্শন করেন। উপরে মুদ্রিত চিঠিখানি লিখিবার ইহাই কারণ। —প্রবাসীর সম্পাদক।]

অবনীন্দ্রনাথের চিত্রের সৌন্দর্য্য কোথায়।

তারাপ্রসন্ন ঘোষ

যদি এক কথায় বলিতে হয় অবনীন্দ্রনাথের চিত্রের সৌন্দর্য্য কোথায়, তবে উত্তর—অভ্যন্তরে। কিন্তু এক কথায় বলিলে কেহ বুঝিবেন না। একটু বিস্তারিত করিয়া বুঝাইতে হইবে। কিন্তু বিস্তারিত করিয়া বুঝাইবার পূর্বে কিছু ভূমিকার প্রয়োজন।

উচ্চ অঙ্গের চিত্র কিরূপ ও চিত্রের আসল সৌন্দর্য্য কোথায়? চিত্রের এসব লক্ষণ ঠিক করিবার সময় কবিতার ঐসব লক্ষণের সঙ্গে মিলাইয়া ঠিক করিতে পাবিলেই বেশ সুবিধা হয় ও সহজে বোঝা যায়। কারণ, চিত্র ও কাব্য একজাতীয় জিনিষ। কবিতা লেখা ও চিত্র করা দুইই ভাবুকের কাজ। কবি কথা গাঁথিয়া মনের ভাব প্রকাশ করেন, চিত্রকার কাগজ কাপড় বা অন্য কোন দ্রব্যের গাত্রে রং মাখাইয়া বা রেখা পাত করিয়া মনের ভাব প্রকাশ করেন। তাঁহাদেব মনের ভাব প্রকাশ করাই উভয়ের প্রধান উদ্দেশ্য। চিত্রে বা কাব্যে যিনি যত উচ্চভাব প্রকাশ করিতে পারেন তিনি তত বড় চিত্রকর বা তত বড় কবি। সেইরূপে যে চিত্রে বা যে কাব্যে যত উচ্চভাব আছে তাহা তত বড় চিত্র বা তত বড় কাব্য। ভাবই চিত্র বা কাব্যের প্রাণ।

প্রাণ রাখিবার জন্য যেমন একটা দেহের প্রয়োজন, তেমনি, কবি বা চিত্রকরের মনের ভাব বা কল্পনা বাঁধিয়া রাখিবার জন্য কাব্য বা চিত্রের প্রয়োজন। প্রাণটাই আসল মূল্যবান, প্রাণটা রাখিবার জন্য দেহ না হইলেই নয়, তাই দেহের যা' মূল্য। দেহ দেখিতে যতই কদর্য্য বা অঙ্গহীন হউক না কেন, প্রাণটা যদি থাকে তবে সেটা জগতে টিকিতে পারে। আর দেহ যতই সুঠাম ও সুন্দর হউক না কেন, প্রাণটা যদি না থাকে, তবে তাহাকে শীঘ্রই জগত হইতে বিদায় লইতে হয়। শুধু ছন্দের রচনাকৌশলে ও মধুর কথার মাধুর্য্যে কোন কবির লেখা বা শুধু রং ফলাইবার বাহারে ও আঁকার বাহাদুরীতে কোন চিত্রকরের চিত্র জগতে বেশী দিন টিকিতে পারে না। টিকিতে হইলেই ভাব থাকা নিতান্ত প্রয়োজন।

মোট কথা কবিতার ন্যায় চিত্র সমালোচনার সময় শুধু বাহিরের বিষয় লইয়া বিচার করিলে চলিবে না, তাহার যে প্রাণ তাহাকে বুঝিবার জন্য ভিতরে প্রবেশ করিতে হইবে, সেইখানেই তাহার সৌন্দর্য্য নিহিত আছে এবং চিত্র যে কত উচ্চ অঙ্গের সেইখানেই তাহার বিচার হইবে।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি অবনীন্দ্রনাথের চিত্রের আসল সৌন্দর্য্য অভ্যন্তরে। এখন দেখা যাক্ সত্য সত্যই তাই কি না। একটি চিত্র লউন। —"বন্দিনী সীতা।" * প্রথমেই চিত্রখানি দেখিলেই সকলেই ভাবিবেন একি, অবনীন্দ্রনাথ বাল্মীকির রামায়ণের মধ্যেও এক চালাইয়াছেন।

সকলেই জানেন সীতাকে লঙ্কায় গিয়া রাবণ অশোকবনে রাখিয়াছিলেন। পাষাণরচিত অন্ধকার কারাগৃহের মধ্যে সাধারণ বন্দিনীর মত রাখেন নাই। তবে চিত্রকর এমন অবাস্তব চিত্র আঁকিলেন কেন? এত একটা অতি বিসদৃশ ব্যাপার! গোড়াতেই ত বিষম ভুল। তার পর অঙ্কন-কুশলতার পরিচয় চিত্রে খুব বেশী নাই। মানব-শরীরতত্ত্ব যাহা প্রতি চিত্রকরের জানা নিতান্ত প্রয়োজন, "বন্দিনী-সীতার" চিত্রকর তাঁহার চিত্রে সে গুণের পরিচয় অধিক দিতে পারেন নাই। সীতার দেহ খানি কাষ্ঠ নির্মিত কি রক্ত মাংস যুক্ত তাহা বোঝা দায়। খুঁজিয়া খুঁজিয়া হয়ত আরও কত দোষ আপনারা দেখাইতে পারেন কিন্তু থাক আমরা সকল কথাই মানিয়া লইলাম। বাহিরের দিকে এখন আমরা চাহিব না, ও তাহা দেখিয়াই হতাশ

* এই চিত্রখানি ১৩১৪ সালের চৈত্র মাসের প্রবাসীতে বাহির হইয়াছে। —প্রবাসী সম্পাদক।

হইব না, একটু চেষ্টা করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখা যাক চিত্রখানায় কি আছে---প্রাণ আছে কি না।

রাবণ যে সীতাকে হরণ করিয়া আনিয়া অশোকবনে রাখিয়াছিলেন তাহা খুবই ঠিক। অবনীন্দ্রনাথ যে তাহা জানিতে চাহেন না তাহাও নহে। তিনি বাল্মীকির প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া অশোকবনে চেড়ীবেষ্টিতা, অশোকতরুতলে উপবিষ্টা, বিরসবদনা সীতাকেই দেখিয়াছিলেন, তবে আমরা যে চক্ষে দেখি, সাধারণ চিত্রকর যে চক্ষে দেখেন, তিনি সে চক্ষে দেখেন নাই। প্রতিভাবান চিত্রকর কেবল বাহিরের জিনিষ দেখিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে পারিলেন না। তিনি কেবল সোনার প্রতিমা সীতার বিরসবদন ও অশোকবনের শোভা নিজের চিত্রে ফুটাইয়া তুলিতে প্রয়াস পাইলেন না। এইখানেই যত গোলযোগ। এইখানেই সাধারণের সহিত প্রতিভাবানের পার্থক্য। আমরা সাধারণ লোক সৈকতে দাঁড়াইয়া সমুদ্র দেখিতেছি ও ভাবিতেছি, কি সুন্দর সীমাশূন্য ঘননীলজলরাশি, কি উত্তাল তরঙ্গ, কি আস্ফালন, তরঙ্গের আঘাতে কি সুন্দর শুভ্রফেণরাশি ফুটিয়া উঠিতেছে। বাহ্য সৌন্দর্য্য দেখিয়াই মুগ্ধ, তার অধিক আর যাইবার শক্তি নাই। কিন্তু প্রতিভাবান কবির চক্ষে যখন সমুদ্র পড়ে, তিনি শুধু তাহার বাহ্য সৌন্দর্য্যের আড়ম্বরে বিমুগ্ধ হন না। বারিধির ব্যাকুলতার কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য ধ্যানস্থ হইয়া মানস চক্ষে সাগরের অন্তরের কথা পাঠ করিতে আরম্ভ করেন ও তাহার চির চঞ্চলতার কারণ কাব্য কথায় গাঁথিয়া কত অব্যক্ত, অস্ফুট ভাষা ফুটাইয়া জগৎবাসীকে বিমুগ্ধ করিয়া তোলেন। প্রতিভাশালী চিত্রকর অবনীন্দ্রনাথ সেইরূপ বাহ্য সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ না হইয়া সীতার অন্তরের চিত্র—যাহা মর্ম্মচক্ষুর দৃষ্টির অতীত—ধরিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ধ্যানস্থ হইলেন। ধ্যানে যাহা দেখিলেন ও বুঝিলেন তাহাই তাঁহার "বন্দিনী সীতার" চিত্রে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

চিত্রকর সীতার অন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, পতিপ্রাণা আদর্শরমণীর হৃদয় আজ পতিবিরহে নিতান্তই খিন্ন ও মলিনা। তাহার মানসমুকুর আজ মসীলিপ্ত। নন্দনকানন তুল্য অশোকবনের চিত্র তাহাতে প্রতিফলিত হইয়া রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। ঐ যে নধর অশোক তরুবীথি, তাহা যেন জমাট বাঁধিয়া পাষাণ কারার প্রাচীর হইয়া উঠিয়াছে। ঐ যে নয়নতৃপ্তিকর সুকোমল প্রস্ফুটিত অশোকপুষ্পগুচ্ছ, তাহা যেন পাষাণ কারার ঘনীভূত অন্ধকার পুঞ্জ। ঐ যে পুষ্প-গন্ধ-বাহী পবনের স্পর্শসুখ তাহাও যেন মুকুরে পাষাণ প্রাচীরের কঠোর স্পর্শের ন্যায় প্রতিফলিত হইতেছে। অশোকতরুতলউপবিষ্ট সীতার এই আসল অন্তরের চিত্র এই প্রাণের চিত্র। চিত্রকর তাই অশোকবনের কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়া সীতাকে পাষাণ কারার মধ্যে বন্দিনী বেশেই আঁকিলেন।

আবার এই পাষাণ কারার মধ্যেও চিত্রকর বাতায়ন পথে আলোকের আভাস আনিয়া আপনার প্রতিভার আরও প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। সে আলোক, সেই সুখস্মৃতি, সীতার মানসরচিত কারাগারের একমাত্র বাতায়ন রামচন্দ্রের চিন্তাপথে সীমাহীন সমুদ্রের পরপার হইতে শত ঊর্মি উলঙ্ঘন করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। পতিপ্রাণা বিরহিনীর পতি-স্মৃতি-সুখ ভিন্ন অধিক সুখ আর কি আছে! সে সকল দুঃখ ভুলাইয়া দেয়। তাই যেন কারাগারে পুঞ্জীভূত অন্ধকার বাতায়নপথাগত আলোকের নিকট পরাস্ত হইয়া একটুকু সরিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই যেন বাতায়নের আলোক সীতার বিষণ্ণ মুখে পড়িয়া তাহা স্বর্গীয় প্রতিমার ন্যায় ফুটাইয়া তুলিয়াছে। সত্য সত্যই সীতার এরূপ সুন্দর চিত্র দেখিবার সৌভাগ্য আমাদের কখনও ঘটে নাই। পতিপ্রাণার এরূপ পবিত্র প্রতিমা, এরূপ সুন্দর চরিত্রব্যাখ্যা কোন চিত্রে এত প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে নাই।

প্রতিভাবান চিত্রকর তাঁহার প্রতিভাবলে "বন্দিনী সীতার" যে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা সব বুঝিতে পারি বা বুঝাইতে পারি এমন ক্ষমতা আমাদের নাই। তবে প্রাণের চিত্র প্রাণ দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া যতটুকু বুঝিতে পারিয়াছি তাহাই সরল

ভাবে লিপিবদ্ধ করিলাম।

অবনীন্দ্রনাথ যে কলা দেবীর উপাসক তাঁহার হেলায় পরিত্যক্ত হতশ্রী গুল্ম-লতা-মণ্ডিত-মন্দির বাহির হইতে দেখিলে চলিবে না। একবার আবর্জ্জনা সরাইয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করুন, দেখিবেন দেবী সত্য সত্যই দেবী বটেন। তাঁহার উজ্জ্বল প্রভায় শতাব্দীর হেলায় পরিত্যক্ত শৈবালাবৃত কনক ইষ্টক মন্দির গাত্রে তাহাদের পূর্ব্ব বিভায় ফুটিয়া উঠিতেছে ও বুঝিবেন জগতের বহু বিখ্যাত দেশের শুভ্র মর্ম্মরনির্ম্মিত কলাদেবীর মন্দির অপেক্ষা আমাদের হতভাগ্য দেশের অবহেলায় পরিত্যক্ত কলাদেবীর মন্দির বহু মূল্যবান।

রাঁচি।

১৩১৬ আষাঢ়

চিত্রপরিচয়।

[নন্দলাল বসুর দুটি চিত্র]

প্রবাসীতে আমরা যে সকল প্রবন্ধ, কবিতা ও গল্প ছাপি, সেগুলি সকল বিষয়ে নিখুঁত হইবে, ইহা বোধ হয় কেহই আশা করেন না; আমরাও মনে করি না যে তৎসমুদয় সর্ব্বপ্রকার দোষ ও ভ্রম শূন্য। পক্ষান্তরে আমরা যে সকল ছবি প্রকাশিত করি, তাহা নিখুঁত হওয়া চাই-ই, অনেকে বোধ হয় এরূপ মনে করেন; সুতরাং তাহা কাহারও ভাল না লাগিলে তিনি চিত্রকর ও সম্পাদকের সমালোচনার সময় মিতভাষা প্রয়োগ করেন না। কেহ সমালোচনা করিবেন না, ইহা আমাদের আশা, অনুরোধ বা ইচ্ছা নয়। আমাদের বক্তব্য এই যে প্রবাসীর লেখা যেমন নিখুঁত নয়, ছবিও সেইরূপ নিখুঁত নয়। প্রবন্ধাদির যেমন কোন না কোন গুণ আছে মনে করিয়া আমরা তৎসমুদয় ছাপিয়া থাকি, ছবিগুলিরও তদ্রূপ কোন না কোন গুণ আছে বলিয়াই ছাপি। চিত্রগুলিকে সর্ব্বগুণাধার বলিয়া আমরা মনে করি না। দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে কবিতা ও সঙ্গীত বুঝিতে, তাহার গুণগ্রহণ করিতে, যেমন শিক্ষা ও চেষ্টার প্রয়োজন, চিত্র বুঝিতে এবং তাহার গুণ গ্রহণ করিতেও তেমনই শিক্ষা ও চেষ্টা আবশ্যক। কবিতায় ঝঙ্কার থাকিলে, তাহার পদবিন্যাস সুললিত হইলে, তাহা একটা গুণ বটে, কিন্তু তাহা হইলেই যেমন কবিতা উৎকৃষ্ট হয় না, বা তদভাবে কবিতা একেবারে জঘন্য হইয়া যায় না, তদ্রূপ চিত্রের সুন্দর বর্ণবিন্যাস, রেখাপাত, বা সুন্দর নাক মুখ চোখের নিখুঁত অঙ্কন, চিত্রের একটি গুণ বটে, কিন্তু ঐগুলি একমাত্র, শ্রেষ্ঠ বা অবশ্য প্রয়োজনীয় গুণ নহে, বা উহাদের একের বা সমুদয়ের অভাবে চিত্র নিকৃষ্ট হইয়া যায় না। কাব্য ও চিত্রে কল্পনার (conception) শ্রেষ্ঠতা, সর্ব্বপ্রধান না হউক, একটি প্রধান জিনিষ। তাহার পর দ্রষ্টব্য, এই কল্পনা কবি বাক্যদ্বারা বা চিত্রকর রেখাবর্ণদ্বারা কেমন করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। কল্পনা ও কারিগরী উভয়ের শ্রেষ্ঠতায় চিত্রের শ্রেষ্ঠতা।

তৃতীয় বক্তব্য এই যে কবির যেমন স্বাধীন কল্পনার অধিকার আছে, চিত্রকরেরও তেমনি স্বাধীন কল্পনার অধিকার আছে। মহাভারতে

ব্যাসদেবের জটার বর্ণনা আছে বলিয়া চিত্রকরকেও ব্যাসদেবের জটা আঁকিতেই হইবে, অথবা রামায়ণে সীতার লঙ্কায় কারারোধ নাই বলিয়া চিত্রেও তাহা দিবাব জো নাই, এমন কোন কথা নাই।

দময়ন্তীর স্বয়ম্বর

মহাভারতের বনপর্ব্বে নলোপাখ্যানে এই স্বয়ম্ববের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। নলের ন্যায় ইন্দ্র অগ্নি যম ও বরুণ এই চারি দেবতাও দময়ন্তীর রূপে গুণে মুগ্ধ হইয়া প্রত্যেকেই ঠিক্ নলের রূপ ও বেশ ধারণ করিয়া স্বয়ম্বরসভায় উপস্থিত হন। এ দিকে দময়ন্তী পূর্ব্বেই হংসমুখে নলকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন। সুতরাং এক্ষণে তিনি, কে নল, তাহা বুঝিতে না পারিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইলেন। তিনি দেবগণের স্তুতি করায় তাঁহাদের প্রসাদে

"অনিমিষ নয়ন যে স্পন্দহীন কায়া।
অম্লান কুসুম অঙ্গে নাহি অঙ্গছায়া॥
বৈদর্ভী জানিলা তবে এ চারি অমর।
নল নরপতি দেখে ভূমির উপর॥
হৃষ্ট হয়ে শীঘ্রগতি মালা দিল গলে।
সাধু সাধু দেবতা গন্ধর্ব্ব লোকে বলে॥"

এই চিত্রখানি শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর অঙ্কিত। ইহার উৎকর্ষ হেতু ইহা কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের চিত্রশালার জন্য ক্রয় করা হইয়াছে। এই ছবিখানি দেখিলে অজন্তাগুহা চিত্রাবলীর কোন কোন চিত্র মনে পড়ে। যেমন গ্রিফিথ্‌স্ সাহেবের অজন্তাগুহাচিত্রাবলীর বহিতে একজন রাজাব অভিষেকের ছবি। পুরাকালে বামন দাসদাসী রাখা হইত। স্বয়ম্বরসভার ছবিখানি দেখিলে মনে হয় যেন স্বয়ম্বরসভায় সকলে চন্দনচর্চ্চিত দেহে উপস্থিত হইয়াছেন, এবং চন্দনের স্নিগ্ধ সৌরভ বায়ুমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হইতেছে। এই চিত্রে অঙ্কনপারিপাট্য চমৎকার হইয়াছে।

দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়

দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয় বাঙ্গালাদেশে আসিয়া ফুলবাবু হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার যে মূর্ত্তি গঠিত হয়, তাহাতে বীরত্বের কোন লক্ষণ দেখা যায় না। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর অঙ্কিত এই উৎকৃষ্ট ছবিখানিতে কুমারের দেহের গঠন, মুখাবয়ব এবং নয়নের দৃষ্টিতে শৌর্য্য ও তেজস্বিতা সূচিত হইয়াছে। ময়ূরপৃষ্ঠে আকাশপথে সঞ্চরণ দক্ষতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে। ইহাতে কোন আড়ষ্টতা নাই, অবলীলা ও স্বচ্ছন্দতা আছে।

১৩১৬ শ্রাবণ

বুদ্ধদেব ও সুজাতা।

অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় অঙ্কিত

এই ছবি খানি শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশযের অঙ্কিত। তাঁহার সৌজন্যে আমরা ইহার প্রতিলিপি মুদ্রিত করিবার অনুমতি পাইয়াছি। চিত্রের বিষয় বুদ্ধদেবের জীবনচরিত্র পাঠকেরা জানেন।

রাজকুমার শাক্যসিংহ বুদ্ধত্ব লাভেব পূর্ব্বে,

মুক্তিপথ নির্ণয়ের জন্য যে বটবৃক্ষমূলে বসিয়া ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন, তাহার নিকট সেনানী নামে একটি গ্রাম ছিল। ঐ গ্রামের এক সম্পন্ন ভূস্বামীর পত্নী সুজাতার অনেক বয়স পর্যান্ত পুত্র না হওয়ায় তিনি মানসিক করেন যে যদি তাঁহার একটি পুত্র হয়, তাহা হইলে তিনি বনদেবতাকে সুভোজ্য দ্রব্য ভোগ দিবেন। তাঁহার একটি সুন্দর পুত্র হইল। শিশুটি যখন তিন মাসের তখন সুজাতা বনদেবতাকে ভোগ দিতে গিয়া তরুমূলে বুদ্ধকে উপবিষ্ট দেখিয়া তাঁহাকেই দেবতা ভ্রমে তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন, এবং তাঁহারই সম্মুখে খাদ্যের পাত্র স্থাপন করিলেন। বুদ্ধ তাহা ভোজন করিলেন এবং সুজাতাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। কিন্তু ইহাও বলিলেন যে তিনি দেবতা নহেন, সুজাতারই মানব ভ্রাতা, পূর্ব্বে রাজপুত্র ছিলেন, এখন ছয় বৎসর ধরিয়া সেই আলোক খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন, যদ্দ্বারা সকল মানুষেরই জীবনপথের আঁধার দূর হইবে,—যদি তাহারা সেই জ্যোতি কি ও কোথায় তাহা জানিতে পারে।

ভাবই, কি চিত্রের কি কবিতার প্রাণ। আর সব অবান্তর বিষয়। এই চিত্রের ব্যক্ত করিবার বিষয়, সুজাতার ভক্তি এবং বুদ্ধের জীবপ্রীতিজাত আশীর্ব্বাদের ভাব। শিল্পী চিত্রের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ভাবকে মূর্ত্তি দিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে। চিত্রেব রচনা, অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন অংশের যথাস্থানে যথাযথ সন্নিবেশ, উত্তম হইয়াছে। তবে ছবির সে বাহ্য দর্শনীয় অংশ চক্ষুর তৃপ্তি সাধন করে, তাহা এবং কারিগরী সর্ব্বত্র আশানুরূপ হয় নাই। কিন্তু যেমন কোন কবিতা শ্রুতিমধুর না হইলেই তাহাকে অপকৃষ্ট বলা যায় না, তেমনি চিত্রের কোন কোন অংশ নয়নরঞ্জক বা কারিগরীতে নিখুঁত না হইলেই তাহাকেও অপকৃষ্ট বলা যায় না।

অর্দ্ধেন্দ্র বাবুর কয়েকটি ছবি সম্বন্ধে বিখ্যাত ভারতশিল্পব্যাখ্যাতা ও সমালোচক হ্যাভেল সাহেব বলেন :—

"I have now looked at Mr. Gangoly's paintings. They are full of true artistic feeling and he only wants to develope more technical skill by constant practice and observation of nature to do full justice to his artistic ideas. His composition generally is very expressive and full of good feeling."

Buddha and Sujata.

"This is a very well composed picture and the most pleasant in colour of the four. The figure of Buddha is excellent."

(Sd.) E. B. Havell

১৩১৬ পৌষ

[শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যু]

যুবক চিত্রশিল্পী শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় গত ২০শে নবেম্বর তারিখে ক্ষয়রোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ১২৯২ সালে বাখরগঞ্জ জেলার অন্তঃপাতী শুক্তাগড় গ্রামে সুরেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ২৪ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। তিনি দবিদ্রসন্তান ছিলেন। গত এপ্রিল মাসে তিনি একটি ১০০ টাকার চাকরী পান, কিন্তু তাহাতে তাঁহার স্বাধীনতার হানি হইবে বলিয়া তিনি উহা গ্রহণ করেন নাই। চিত্রবিদ্যা ব্যতিরেকে তিনি হ্যাটারসি তাঁতের কাজও বেশ জানিতেন, এবং সকলকে বিনা পারিশ্রমিককে উহা শিখাইতে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহার অনেকগুলি চিত্র প্রবাসী ও ভারতীতে এবং হ্যাভেল সাহেবের ভারতীয় ভাস্কর্য্য ও চিত্রবিষয়ক পুস্তকে বাহির হইয়াছে। তিনি নকলনবীস্ চিত্রকর ছিলেন না, এই অল্প বয়সেই সাধনার বলে বিশ্বশিল্পীর সৌন্দর্য্যরহস্যের আভাস পাইয়াছিলেন। তাঁহার চিত্রগুলি তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে।

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর একখানি পত্রে আমাদিগকে লিখিয়াছেন :—

"সুরেনের একান্ত দীন ও দরিদ্র অবস্থা হইলেও সে পয়সা উপায়ের অন্য পন্থা ছাড়িয়া এইকাযে লাগিয়াছিল। তাহার এমন দুরবস্থা যে আমি কম্বল কিনিয়া দিলে তবে সে শীত কাটাইয়াছে, নচেৎ শীতের দিনে সে একখানি চাদর মাত্র গায়ে দিয়া স্কুলে আসিত। এত দরিদ্র, তাহার পক্ষে ছবি আঁকা (তাও আবার দেশী ছবি) লইয়া পড়িয়া থাকা কতটা মনের তেজ আবশ্যক। তাছাড়া সুরেন আমাদের প্রাচীন শিল্পের সঙ্গে নিজের যতটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিল আমার আর কোন ছাত্র (নন্দলালও নয়) সেরূপ পারে নাই। আর্টিস্ট মাত্রেই দুই পথ অবলম্বন করে; এক প্রাচীন শিল্পের মধ্যে নিবিষ্ট হওয়া আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে প্রাচীনের সঙ্গে যোগ রাখিয়া নূতন নূতন সৃষ্টির দিকে অগ্রসর হওয়া। সুরেন্দ্রের জীবন প্রথম পথে গিয়াছে, নন্দলাল দ্বিতীয় পথে চলিতেছে।"

আমরা তাঁহার বিধবা মাতাঠাকুরাণী, বিধবা পত্নী, ভগিনীত্রয় ও ছোট ভাইকে, তাঁহার গুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুব মহাশয়কে এবং শ্রীমান্ নন্দলাল বসু প্রমুখ তাঁহার অনুরক্ত সতীর্থগণকে আমাদের গভীর সমবেদনা জানাইতেছি।

———

১৩২০ ফাল্গুন

চিত্রপরিচয়

শেষ বোঝা

চিত্রকব শিল্পাচার্য্য শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় চিত্রখানিতে কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন তাহা আমাদের অনুরোধে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। তাহাই নিম্নে প্রদত্ত হইল—

"চলিয়াছি, জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া তোমার বোঝা বহিয়া তোমার দিকে; আসিতেছ, কত জন্ম কত মৃত্যুর উপর দিয়া বোঝা নামাইতে আমার দিকে।

"চলিতে চলিতে খসিতেছে জীবনের পর জীবনবন্ধ, জানু নত হইতেছে তোমার আসার পথে বার বার; আকাশ তোমার নেশায় রাঙ্গিয়া উঠিতেছে দিনের পর দিন; দুই আঁখি তোমার আসার পথে চাহিয়া ঝুরিতেছে কত না বিরহ যুগ যুগান্তে।"

১৩৩৮ জ্যৈষ্ঠ

বাঙালী চিত্রকরদের কৃতিত্ব

লণ্ডনে নূতন ইণ্ডিয়া হাউসের প্রাচীরগাত্রে ছবি আঁকিয়া তাহা অলঙ্কৃত করিবার ভার গবর্ম্মেন্ট কয়েকজন বাঙালী চিত্রকরের উপর দেন। তাঁহারা সেই কাজ সুসম্পন্ন্ করিয়াছেন। লণ্ডনে সাউথ্ কেন্সিংটন্‌স্থিত আর্টস কলেজের প্রিন্সিপ্যাল বিখ্যাত চিত্রকর স্যার উইলিয়ম রোটেন্স্টাইন এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথকে লিখিয়াছেন :—

"Your old pupil Barman has done his work at India House admirably. He is a charming fellow and very gifted. I hope, when he returns, work of a like kind will be found for him. Indeed all the young artists have done their work well and they should prove useful servants to India."

"আপনার পুরাতন ছাত্র বর্ম্মন ইণ্ডিয়া হাউসে তাহার কাজ অতি প্রশংসনীয়রূপে করিয়াছে। সে মানুষটি শিষ্টস্বভাব, এবং খুব প্রতিভাশালী। আমি আশা করি, যখন সে দেশে ফিরিয়া যাইবে, এখানে তাহার করা কাজে অনুরূপ কাজ তাহাকে জুটাইয়া দেওয়া হইবে। বস্তুতঃ সমুদয় তরুণ শিল্পীরাই তাহাদেব কাজ উত্তমরূপে করিয়াছে, এবং তাহাদের ভারতবর্ষের নিপুণ সেবক হইবার কথা।"

১৩৩৮ পৌষ

নন্দলাল বসুর সম্বর্দ্ধনা

কলাকুশল শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয়ের পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হওয়ায় সম্প্রতি শান্তিনিকেতনে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ যে কবিতা উপহার দিয়া তাঁহাকে প্রীতি জানাইযাছেন, তাহা অন্যত্র মুদ্রিত হইল।

আমরা নন্দলাল বাবুর মানবিক সদ্‌গুণ, তাঁহার প্রতিভা, তাঁহার হাতের নৈপুণ্য এবং শিক্ষকের কাজে তাঁহার অনুরাগ ও দক্ষতার জন্য তাঁহার প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি

আশীর্ব্বাদ

পঞ্চাশ বছরের কিশোর গুণী
নন্দলালকে
সত্তর বছরের প্রবীণ যুবা
রবীন্দ্রনাথের আশীর্ব্বাদ।

৯ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮

নন্দন-নিকুঞ্জতলে রঞ্জনার ধারা
জন্ম আগে তাহার জলে তোমার স্নান সারা।
অঞ্জন সে কী অভিনব
লাগায়ে দিল নয়নে তব,
সৃষ্টি-করা দৃষ্টি তাই পেয়েছে আঁখিতারা॥

এনেছে তব জন্মডালা অমর ফুলরাজি,
রূপের লীলা-লিখন-ভরা পারিজাতের সাজি।
অপ্সরীর নৃত্যগুলি
তুলির মুখে এনেছ তুলি',
রেখার বাঁশি লেখায় তব উঠিল সুরে বাজি'॥

যে মায়াবিনী আলিম্পনা সবুজে নীলে লালে
কখনো আঁকে কখনো মোছে অসীম দেশে কালে.
মলিন মেঘে সন্ধ্যাকাশে
রঙীন উপহাসে যে হাসে
রং-জাগানো সোনার কাঠি সেই ছোঁয়ালো ভালে ॥

বিশ্ব সদা তোমার কাছে ইসারা করে কত,
তুমিও তা'রে ইসারা দাও আপন মনোমত।
বিধির সাথে কেমন ছলে
নীরবে তব আলাপ চলে,
সৃষ্টি বুঝি এমনিতরো ইসারা অবিরত॥

ছবির 'পরে পেয়েছ তুমি রবির বরাভয়.
ধূপছায়ার চপল মায়া ক'রেছ তুমি জয়।
তব আঁকন-পটের পরে
জানি গো চিরদিনের তরে
নটরাজের জটার রেখা জড়িত হ'য়ে রয়॥

চির-বালক ভুবন ছবি আঁকিয়া খেলা করে।
তাহারি তুমি সমবয়সী মাটির খেলাঘরে।
তোমার সেই তরুণতাকে
বয়স দিয়ে কভু কি ঢাকে,
অসীম পানে ভাসাও প্রাণ খেলার ভেলা পরে॥

তোমারি খেলা খেলিতে আজি উঠেছে কবি মেতে,
নববালক-জন্ম নেবে নূতন আলোকেতে।
ভাবনা তা'র ভাষায় ডোবা,—
মুক্ত চোখে বিশ্বশোভা
দেখাও তা'রে, ছুটেচে মন তোমার পথে যেতে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাসপূর্ণিমা
৯ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮

১৩৩৮ ফাল্গুন

লণ্ডনে ভারতীয় চিত্রকলা

আমরা আগে প্রবাসীতে লিখিয়াছি, লণ্ডনের ইণ্ডিয়া হাউসের অভ্যন্তর চিত্রভূষিত করিবার কাজে বাঙালী চারিজন চিত্রকরের কিরূপ প্রশংসা হইয়াছে। ঐরূপ আরও একটি প্রীতিকর সংবাদ আসিয়াছে। গত জানুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ভারতবর্ষের হাই কমিশনার স্যর ভূপেন্দ্রনাথ মিত্রের অনুমতি অনুসারে লণ্ডনের ইণ্ডিয়া সোসাইটীর উদ্যোগিতায় তথায় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ উকীলের চিত্রাবলীর একটি প্রদর্শনী খোলা হয়। চিত্রগুলির খুব প্রশংসা হইয়াছে। সারদা বাবুরা তিন ভাই চিত্রকর। যে-তিনজন বাঙালী চিত্রকর ইণ্ডিয়া হাউস ভূষিত করেন, তাঁহার ভাই রণদাচরণ উকীল তাঁহাদের অন্যতম। অন্য এক ভ্রাতা "রূপলেখা" নামক ইংরেজী ললিতকলাবিষয়ক পত্রিকার সংস্থাপক ও সম্পাদক বরদাচরণের হাতে লণ্ডনের এই প্রদর্শনীর ভার ছিল। সারদাবাবুর যে-সব ছবি প্রদর্শিত হইতেছে, তাহার মধ্যে একটি গত বৎসর দিল্লীর প্রদর্শনীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্র বলিয়া বড়লাটের "পেয়ালা" পুরস্কার পাইয়াছিল, এবং অন্য একটি মহীশূর প্রদর্শনীতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিত্র বলিয়া মহারাজার পুরস্কার পাইয়াছিল।

১৩৪১ মাঘ

লণ্ডনে ভারতীয় ললিতকলা প্রদর্শনী

লণ্ডনে ইণ্ডিয়া সোসাইটি নামক একটি সমিতি আছে। এই সমিতিই প্রথমে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী গীতাঞ্জলি প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ইঁহারা ভারতবর্ষের এবং যেসব প্রাচ্য দেশ ভারতবর্ষ দ্বারা প্রভাবিত ও ভারতবর্ষ যাহাদের দ্বারা প্রভাবিত, সেই সব দেশের ললিতকলা ও সাহিত্যাদির অনুশীলন করিয়া থাকেন। "ইণ্ডিয়ান আর্ট এণ্ড লেটার্স" নামক ইঁহাদের একখানি পত্রিকা

আছে। তাহা বৎসরে দুই বার বাহির হয়।

এই সমিতি গত ডিসেম্বর মাসে লণ্ডনে ভারতীয় নানা প্রকারের চিত্র, মূর্ত্তি, এবং স্থাপত্যের ফোটোগ্রাফ ও রেখা চিত্রের প্রদর্শনী খুলেন। প্রদর্শিত জিনিষগুলির সংখ্যা ছিল প্রায় ৫০০।

প্রদর্শনীটি খুলিবার তারিখ নির্দ্দিষ্ট ছিল ১০ই ডিসেম্বর। উহা খোলা হইবার আগে ঐ তারিখের টাইম্‌স্ উহার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাহাতে লিখিত ছিল :—

"It is a much better exhibition than the somewhat scrappy representation of contemporary Indian art that we have had hitherto in London would have led anybody to expect, which is to say that it has completely fulfilled its purpose."

টাইম্‌স্ আরও বলেন :—

"So far as can be judged the representation of the different parts of India is fairly well balanced, and it is unlikely that anything of special significance has been ignored."

টাইম্‌সে লিখিত হইয়াছে, যে, "A good many of the works are loans," "প্রদর্শিত সামগ্রীসমূহের অনেকগুলি ঋণ দেওয়া," অর্থাৎ সেগুলি আর্টিষ্টরা স্বয়ং পাঠান নাই, তৎসমুদয়ের ক্রেতা বা অন্য প্রকারের অধিকারীরা পাঠাইয়াছেন। যাঁহারা যাঁহারা ঋণ দিয়াছেন, তাঁহাদের কয়েক জনের নাম করিবার পর টাইম্‌স্ লিখিতেছেন :—

"The works are grouped according to States and Provinces. This makes for convenience, though it would be extremely rash for anybody but a person thoroughly acquainted with the whole history of Indian art to attempt a definition of local styles. The broad division is that between the work of the Bombay school and that from other parts of India. It is at Bombay that the application of Western methods of teaching has gone farther. Speaking generally it can be said that the results—in the first gallery—seem to show that such teaching can be digested without serious disturbance to the native tradition. A fair statement of the case would be to say that, having regard to contemporary conditions, the work from Bombay strikes one as being move businesslike, but that many of the things of the highest artistic interest are to be found elsewhere."

শেষ উদ্ধৃত বাক্যটিতে বোম্বাইয়ের কাজের সম্বন্ধে মন্তব্যটিকে, আর্টের দিক্ দিয়া, বোম্বাইয়ের শিল্পীরা আপনাদের প্রশংসা মনে করিবেন কিনা জানি না। তাহাতে যাহা বলা হইয়াছে সোজা কথায় তাহার মানে, বোম্বাইওয়ালারা ব্যবসা বুঝে ভাল্, কিন্তু উচ্চতম আর্টের নিদর্শন দেখিতে হইলে প্রদর্শনীর অন্যত্র যাইতে হইবে।

১১ই ডিসেম্বর টাইম্‌সে প্রদর্শনী খুলিবার সভার বৃত্তান্ত দেওয়া হয়। তাহার সভাপতি ছিলেন বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর লর্ড জেটল্যাণ্ড। পূর্ব্বে তিনি লর্ড রোনাল্ডশে ছিলেন। তিনি বলেন :—

"The art movement noticeable in India during recent years was the outcome of an instinctive impulse towards self-expression. Indian art had certainly been affected by contact with the art of Europe—more so in the West of India perhaps than in the East—and there had been occasions on which it

had been in danger of becoming little more than imitative. But when such a tendency had shown itself the movement had always languished, and he had little hesitation in saying that the recent art of India remained true to what, broadly speaking, might be said to have been throughout the centuries the distinguishing characteristic of Hindu as compared with European art— that the artist had aimed at giving expression to mental concepts than at reproducing the objects of the external world around him.

"It was the same spirit of revolt against the Westernization of India which had played so large a part in the National Movement that inspired the little circle of men who brought into being the new school of painting in Bengal."

বিলাতের রয়্যাল একাডেমীর সভাপতি স্যর উইলিয়ম লিউয়েলিন অতঃপর বলেন :—

"The exhibition was the first complete survey of modern Indian art that had been held in this or any other country, and he thought it would be of great interest to British artists. He quoted a comment made in *The Times* yesterday that the exhibition proved that 'practically all over India the native talent familiar to us in works of the past survives, and is well worth cultivating.' This, he thought, was a very important matter. The tendency today was to universalize every thing in all matters of life, and art had not escaped. They were glad to see work that indicated that India had developed on its own lines and not on Western lines."

অতঃপর সহকারী ভারত-সচিব মিঃ বাটলার কিছু বলেন। তাহাতে বোম্বাই বা বাংলা কিংবা বঙ্গে ভারতীয় আর্টের বা তাহার ইউরোপীয় বা বাঙালী প্রবর্ত্তকদের নিন্দা বা প্রশংসা ছিল না। তাঁহার বক্তৃতা হইতে কেবল দুটি বাক্য উদ্ধৃত করিলেই চলিবে।

"We in this country were apt to hear of India and her doings mainly in connection with politics, and it was a welcome change to politicians as much as to anybody to have an opportunity of assessing the great achievements of modern India in some other field. He was afraid that hitherto only those who had had the chance of visiting India had been able, apart from isolated examples, to realize that India today had an art that was the legitimate successor of all those priceless treasures which dated from the times before the British came to her country."

টাইম্‌সে যাঁহাদের বক্তৃতা বা তাহার সংক্ষিপ্তসার বাহির হইয়াছে তাহার মধ্যে কেবল মাত্র বর্দ্ধমানের মহাবাজা, আর কাহারও প্রশংসা বা নিন্দা না করিয়া, বোম্বাইয়ের আর্ট-স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল মিঃ সলোমনের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন :—

"He was glad to see the vigorous development of art in Western India under the guidance of Mr. Gladstone Solomon, the Principal of the Bombay School of Art."

অন্যান্য বিষয়ের মত আর্টের সম্বন্ধেও বর্দ্ধমানের মহারাজার মন্তব্যের মূল্য যাচাই করা অনাবশ্যক।

পরম্পরাগত ঐতিহ্য অনুযায়ী রীতির প্রশংসা কেহ কেহ করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন ইংরেজদের

মধ্যেও অনেকে তাহা করিলেও হ্যাভেল সাহেব প্রথমে তাহা করিয়া নিন্দাভাজন হইয়াছিলেন। সুতরাং আধুনিক সময়ে ভারতীয় আর্টের পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে হ্যাভেল সাহেবের প্রশংসা কেহ প্রসঙ্গক্রমে করিলে তাহা বেখাপ হইত না। কিন্তু কেহ তাঁহার প্রশংসা করিয়াছিলেন দেখিতেছি না; তবে তাঁহার নিন্দাও চোখে পড়িল না।

অনেকেই মনে কবেন, বিলাতী দৈনিক ম্যাঞ্চেস্টাব গার্ডিয়ানের মতের গুরুত্ব আছে। প্রদর্শনীটি সম্বন্ধে ঐ কাগজে লিখিত হইয়াছিল :—

"Indian art today is still conscious of its past and its rather muddled present. As a general criticism it may be justly said that those artists who have worked on traditional lines—whether of Buddhist or Hindu or Moslem inspiration—are in a fair way to laying the foundations of modern Indian art, which may well be no less than the great art of her past. Unfortunately, in this renaissance, with few teachers and a sub-conscious feeling that Indian art was Indian rather than universal, many Indian painters turned to Europe or the Far East. Although Indian art in the past has shown that it is capable of assimilating foreign pictorial modes, up to the present the influence of the West and of Japan has been deplorable. This exhibition shows that, If Indian artists are content to work on the basis of the great Buddhist, Hindu, and the Mogul schools, they may succeed in creating an art at least equal to the great art of India's past."

এই মত ঠিক হইলে বাঙালী চিত্রকরেরা ঠিক্ পথ ধরিয়াছেন বলিতে হইবে। স্যর মারে হ্যামিক্ এক সময় ভারতবর্ষে কাজ করিতেন। তিনি কোন বাঙালী ভদ্রলোককে যে ব্যক্তিগত চিঠি লিখিয়াছেন, তাহাতে প্রদর্শনীটি সম্বন্ধেও কিছু কথা আছে। তিনি লিখিয়াছেন :—

"We thoroughly enjoyed our visit to the opening and seeing your work and the pictures from your students. It is a beautiful Exhibition and much appreciated by many visitors. For myself, I think you in Bengal are working on better lines than Bombay—though I dare say for those who have not been to India the Bombay pictures have the greater appeal."

প্রদর্শনীটি সম্বন্ধে টাইম্‌স্ ও ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান ছাড়া অন্যান্য বিলাতী কাগজে মন্তব্য বাহির হইয়া থাকিলে তাহা আমাদের হস্তগত হয় নাই। উপরে যাঁহাদের মত উদ্ধৃত হইয়াছে, তাঁহারা ছাড়া প্রদর্শনীর প্রত্যক্ষদর্শী অন্য কোন ইংরেজের মতও আমরা অবগত নহি।

১৩৪১ ফাল্গুন

লণ্ডনে ভারতীয় চিত্রাদির প্রদর্শনী

গত ডিসেম্বর মাসে লণ্ডনে ভারতীয় চিত্র প্রভৃতি ললিতকলার যে প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে বিলাতী কাগজে প্রকাশিত কতকগুলি মত আগে প্রকাশ করিয়াছিলাম। পরে আরও কিছু এইরূপ মত হস্তগত হইয়াছে। তাহার কিছু কিছু নীচে উদ্ধৃত করিতেছি।

বর্লিংটন ম্যাগাজিনের সম্পাদক মিঃ ট্যাট্‌লক্ ডেলী টেলিগ্রাফে লিখিয়াছেন :—

What astonishes the English visitor is not any discernible differences between one part of India and another, but an essential unity of aesthetic feeling.

The most surprising impression is that the inhabitants of a country so vast as India have contrived so splendidly to "pull together".

The population of India is roughly equivalent to that of extra-Russian Europe. But if we were to envisage an exhibition of European art we should take it for granted that there would be many "clashes". This exhibition gives the impression very distinctly that, so far as art is concerned, India is much more closely knit than Europe. It is true that Bombay, best seen in gallery I, attracts the occidental eye most insistently, but that may be due to Mr. W. E. Gladstone Solomon's power of organization.

মিঃ ট্যাটলক্ বলিতেছেন, যে, যদিও ভারতবর্ষ রুশিয়া বাদে সমস্ত ইউরোপের সমান, তথাপি এত বড় দেশে ইহার ললিতকলাসৃষ্ট রসে একটি সামঞ্জস্য ও ঐক্য দৃষ্ট হয়। তিনি আরও বলিয়াছেন, যে, প্রদর্শনীর শ্রেষ্ঠ ছবিগুলি নিঃসন্দেহ সর্ব্বাধিক ভারতীয় ("The best pictures are Undoubtedly the most Indian")।

মর্নিং পোস্টের আর্ট-সমালোচক বলেন, এখন ভারতবর্ষে আর্টের মোটামুটি দুটি স্রোত প্রবাহিত। একটিকে বাংলা ও অন্যটিকে বোম্বাইয়ের সঙ্গে সংপৃক্ত বলা যাইতে পারে। বাংলা ভারতবর্ষের পরম্পরাগত রীতিসমূহের প্রতিনিধি, বোম্বাই পাশ্চাত্য য়্যানাটমি অনুশীলনের মূল্যের পরিচয় দেয়। তাহার পর এই সমালোচক লিখিতেছেন, বাংলা দেশ সমগ্র ভারতবর্ষে ভারতীয় ললিতকলার পুনরুজ্জীবনে ব্যাপৃত আছে। যথা—

"Bengal also is active in the renaissance of Indian art throughout the Peninsula. The thirty odd years' revival in Calcutta, based upon a continuity of India's artistic tradition, has been inspired by the lead of the Tagore family, and spread by Bengalee artists who removed to other parts of the country. Moreover, young students came from distant places to the School of Oriental Art at Calcutta, and the Institute founded by the Poet Rabindranath Tagore at Shantiniketan."

তাহার পর এই সমালোচক বলিতেছেন—

"Poetry, vigorous romance, and somewhat timid Western realism characterize Bengalee art..."

ললিতকলা-সমালোচক মিঃ ফ্রাঙ্ক রটর (Mr. Frank Rutter) সণ্ডে টাইম্‌সে লিখিয়াছেন :—

"The great lesson taught by the

current exhibition at the New Burlington Galleries is that Indian Artists are far more fruitfully inspired when following the noble traditions of their own country, than when they seek to imitate the superficial realism of Western academic art... While much from elsewhere also commands our admiration, it is most instructive to compare the work of the two principal schools, that of Calcutta and of Bombay. For of these two the latter has been far more influenced by European art; and its products have far less charm and distinction than those of the former, which has remained loyal to the Hindu and Moghul masters of the past.

"The renaissance of Indian art dates from rather more than generation ago, when, under the sympathetic guidance of Mr. E. B. Havell, the students of the Calcutta School of Art were persuaded to base their practice on the style of India's indigenous masterpieces rather than on that of imports from the West. London became aware of the rise of a new Calcutta School when the work of those two fine artists, Abanindranath Tagore and J. P. Gangooly, was seen in the first London Salon of the Allied Artists in 1908; and it is a pleasure to see the first so well represented in the present exhibition. There are many of his name among the exhibitors, and there is a very beautiful wash drawing, "Devatatma Himalays" (384), by the poet Rabindranath Tagore; but just as he was one of the earliest leaders of the revival, so Abanindranath Tagore remains the outstanding modern master of Bengal.

"Whether on the smaller scale of miniature painting or on the larger scale of such a decoration as Sarada Ukil's "Shiva's Grief" (115), the superiority of the traditional linear style is incontestable in this exhibition".

১৩৪২ মাঘ

বাঙালী চিত্রকরের বিলাতী সম্মান

দিল্লীপ্রবাসী বাঙালী চিত্রকর শ্রীযুক্ত বরদাচরণ উকীল লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটি অব আর্টসের সদস্য (Fellow) নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, ইহা আনন্দের বিষয়। তিনি "রূপলেখা" নামক ললিতকলাবিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রের সম্পাদক। কয়েক মাস পূর্ব্বে 'প্রবাসী'তে দিল্লীর চিত্রকর উকীল-ভ্রাতাদের শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দেওয়া হইয়াছিল। বাঙালীদের মধ্যে শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার ও শ্রীযুক্ত মুকুলচন্দ্র দে রয়্যাল সোসাইটি অব আর্টসের সদস্য।

১৩৪৪ বৈশাখ

দুর্গাপূজা-চিত্রাবলী। শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীবিষ্ণুপদ রায়চৌধুরী প্রণীত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৬। ক্রাউন চার পেজি ৭৩+ ॥/০ পৃষ্ঠা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কখন কখন এমন একটা কাজ করিয়া বসেন যাহার কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়া পর্য্যালোচনা করিলে যে পরিমাণ কল্পনার অভাব ও আড়ষ্ট গতানুগতিকতার প্রভাব লক্ষিত হয়, তাতে চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায় ও বিষ্ণুপদ রায়চৌধুরী মহাশয়দ্বয়ের এই পুস্তকটির প্রকাশ পুরাপুরি ব্যাখ্যাত হয় না। অতএব এই শিল্প, সাহিত্য, কল্পনার রূপকথাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন হঠাৎজাগ্রত শুভবুদ্ধির ফল বলিয়াই ধরিয়া লইতে হইবে। কষ্টকল্পিত অথবা কষ্ট-আহৃত 'থিসিস' প্রচার করিয়া পাণ্ডিত্য খ্যাতি অর্জ্জনই যে-পণ্ডিতকুলের চিরস্থায়ী আবেগ, তাঁহারা যে এই সরল, সুন্দর, চিত্রকথাটি প্রকাশ করিয়া বাংলার পাঠকসাধারণের মনোরঞ্জন চেস্টা করিবেন, ইহা আশ্চর্য্য হইলেও প্রশংসনীয়। পুস্তকটিতে কঠোর ধর্ম্মতত্ত্বকে এতটা সহজ ও উপভোগ্য আকারে পাঠকের হস্তে দেওয়া হইয়াছে, যাহা হিন্দুধর্ম্মে প্রচারের ইতিহাসে বর্ত্তমান কালে আর কোথাও হয় নাই। যাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম বিশ্বাস করেন না, তাঁহাদের নিকটও শুধু চিত্রসাহিত্যের দিক দিয়া ও পুরাণের সহজ ব্যাখ্যান হিসাবে পুস্তকটির আদর হইবে।

শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতিটি অপূর্ব্ব হইয়াছে। "ক্যামেরা" যে প্রাণের খবর কখনও পায় না এই চিত্রে চৈতন্যদেব সেই খবরটি পূর্ণ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

আমরা আশা করি বিশ্ববিদ্যালয়ের এই জাতীয় প্রচেস্টা এইখানেই শেষ হইবে না। যে মাটির আশ্রয়ে সরস ও সুন্দর তরুলতা প্রাণ পাইয়া ধরার বক্ষ অলঙ্কৃত করিয়া পৃথিবীবাসীকে আনন্দ দেয়, সেই মাটিই আবার আগুনের স্পর্শে ইস্টকের রূপ ধারণ করে। জ্ঞান ও বিদ্যাও তেমনই কখন বিদ্যার্থীকে পুস্টি দান করে, আবার কখন অতিপাণ্ডিত্যের তেজে এমন রূপ ধারণ করে যাহাতে বিদ্যার্থী সে জ্ঞান ও বিদ্যার প্রভাবে শুধু আহতই হয়—মনের, প্রাণের, জীবনের কোন আশ্রয় তাহাতে পায় না। সুতরাং শুষ্ক কঠিন প্রাণহীন বিদ্যার আড়ত হইয়া থাকাটা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষেই ভাল নহে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ নেতা শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মনে সম্ভবতঃ কোন নূতনতর প্রেরণার সঞ্চার হইয়াছে। ইহা অতি আনন্দ ও আশার কথা।

শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়

১৩৪৬ কার্ত্তিক

দেশ-বিদেশের কথা

বিদেশে একজন বাঙালী শিল্পীর সমাদর

শান্তিনিকেতন কলাভবনের প্রাক্তন ছাত্র ও বর্ত্তমানে কলিকাতা সরকারী আর্টস্কুলের প্রধান সহকারী শিক্ষক শিল্পী শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর কলাকুশলতা প্রবাসীর পাঠকগণের নিকট এবং বঙ্গের ও ভারতের শিল্পরসিকসমাজে সুপরিচিত। তাঁহার শিল্পনৈপুণ্যের বিস্তারিত পরিচয় অনেক বার প্রবাসীতে মুদ্রিত হইয়াছে। কিছু দিন আগে ইউরোপে গিয়া নানা স্থানে চিত্রপ্রদর্শনীর অনুষ্ঠান পূর্ব্বক সম্প্রতি দেশে ফিরিয়া কলিকাতায় ভাস্কর শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র রায়ের স্টুডিয়োতে তিনি একটি চিত্রপ্রদর্শনীর আয়োজন করিয়াছিলেন। ইউরোপে রমেন্দ্রবাবুর অঙ্কিত চিত্রাবলীর যে সমাদর হইয়াছিল এই উপলক্ষ্যে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

লণ্ডনে রমেন্দ্রবাবুর চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধনের সময় বিখ্যাত এচার (etcher) সর্ ম্যুরহেড বোন্ বলেন :

The artist's work, as everyone could see, was full of grace and charm. As a personal friend of Dr. Rabindranath Tagore he had been afraid at one time that mythology would engross modern Indian art; but it had been saved by its fervent elements of patriotism and its devote to the home and village life of the Indian people.

The exhibition consists of about 70 pieces of week and its chief value would seem to lie in its beautifully simple portrayal of Indian life. Sir Murithead Bone, for example, mentioned an Indian kitchen scene, observing that few English artists could convey such a sense of the beautiful in a portrayal at of an English kitchen.

(মর্ম্মার্থ) ..."এই শিল্পীর রচনা সুষমা ও মাধুর্য্যে পূর্ণ। এক সময় আমার আশঙ্কা হইয়াছিল, আধুনিক ভারতীয় শিল্পকলা পুরাণ-কাহিনীর মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া থাকিবে; কিন্তু [এই শিল্পীর রচনা দেখিয়া মনে হয়] ভারতবাসীর ঐকান্তিক স্বাদেশিকতা এবং পল্লীজীবন ও গার্হস্থ্য জীবনের প্রতি অনুরাগের বলে শিল্পকলা মুক্তিলাভ করিয়াছে।... এই প্রদর্শনীর প্রধান দ্রষ্টব্য, ভারতীয় জীবনযাত্রার সহজ সৌন্দর্য্যময় আলেখ্যাবলী। এই শিল্পী ভারতের এক রন্ধনশালার চিত্রে যে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন, এমন সৌন্দর্য্য জ্ঞানের পরিচয় কোন ইংরেজ শিল্পী কোন ইংরেজের রান্নাঘর আঁকিতে দিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ।"

'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' পত্র এই প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে রমেন্দ্র বাবুর চিত্র সম্বন্ধে বলেন:

Mr. Chakravarty is versatile not only in his use of media but also in his choice of subjects. Traditionally oriental in his use of line and flat colour, he is by no means traditional in his sympathetic way of depicting scenes from everyday life in India. Boys and girls at play, gipsies in their encampments, and domestic scenes are just as much his subjects as the more usual religious or mythological themes. Sir Meirhead Bone paid a warm tribute to the artist at the opening, pointing out that art marched on through the artist's love of the ordinary things of life. Since coming to England, Mr. Chakravorty has found time to look at the ordinary things of London life too. There are aquatints of Hampstead Heath and of a London fog in Camden Town.

(মর্ম্মার্থ) ..."চক্রবর্ত্তী মহাশয় শুধু শিল্পরচনার বিভিন্ন উপাদান নির্ব্বাচনে নয়, বিষয়-নির্ব্বাচনেও বৈচিত্র্য প্রদর্শন করিয়াছেন। রেখা ও বর্ণ-সম্পাতের পদ্ধতিতে তিনি প্রাচ্যধারানুবর্ত্তী, কিন্তু ভারতবর্ষের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার চিত্র অঙ্কনে তিনি

গতানুগতিক পন্থার অনুবর্ত্তী নহেন, শিশুদের, খেলাধূলা, গার্হস্থ্য জীবনযাত্রার চিত্র, বেদেদের চিত্র প্রভৃতি তিনি যেমন আঁকিয়াছেন, সেইরূপ তিনি পৌরাণিক চিত্রও আঁকিয়াছেন। সাধারণ ও সামান্য বিষয়ের প্রতি শিল্পীর অনুরাগ দ্বারাই শিল্পের প্রগতি সাধিত হইয়া থাকে, সর্ ম্যুরহেড বোন্ এই কথা বলিয়া শিল্পীকে অভিনন্দিত করিয়াছেন।"...

টাইম্স বলেন :

As a rule the work of contemporary Indian artists, when it is not rather awkwardly Westernized, declines into sentimentalized illustrations of traditional themes. Mr. Chakravorty keeps to the native tradition, and illustrates a certain number of classical themes, but, for the representation of everyday life and scenery, he has, so to speak, stiffened his style by Western example without losing the essential character of Indian art. It is a real fusion of styles. A special feature of his work is the extremely sympathetic handling of engraving methods; the flat tones with the emphasis on decorative patterning of aquatint, and the limitation of colour in prints from wood, for example, "Sisters" and "The Santal Mother", in water-colour; "Chitrangada and Arjak", in colour woodcut; "The Poet and the Dance" and "Ducks", in black and white woodcut; and "Hampstead Health" and "Winter Fog and Chickens", in aquatint, may be picked out from an exhibition which makes a more encouraging impression than any of contemporary Indian art that we have seen

(মর্ম্মার্থ) "আধুনিক ভারতীয় শিল্পীদের অনেক চিত্রেই দেখি, নয় সেগুলি অদ্ভুত রকম পাশ্চাত্যভাবাপন্ন, নয়ত পৌরাণিক কাহিনীর ভাবালু চিত্রণ। চক্রবর্ত্তী মহাশয় দেশীয় পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া অনেকগুলি পৌরাণিক চিত্র আঁকিয়াছেন। প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার দৃশ্যগুলি আঁকিতে গিয়া তিনি পাশ্চাত্য ধারাও গ্রহণ করিয়াছেন, তবে ভারতীয়তা বিসর্জ্জন দেন নাই।... এ পর্য্যন্ত আধুনিক ভারতীয় শিল্পীদের যে-কয়টি প্রদর্শনী আমরা দেখিয়াছি, তন্মধ্যে বর্ত্তমান প্রদর্শনীটি সর্ব্বাপেক্ষা মনোযোগ আকর্ষণ করে।"

স্থানাভাবে অন্য মন্তব্যগুলি উল্লেখ করা গেল না। রমেন্দ্রবাবু ইউরোপে ভ্রমণকালে বিশেষ ভাবে এচিং ও তৈলচিত্রাঙ্কনের চর্চ্চা করিয়াছিলেন। ইউরোপে অঙ্কিত তাঁহার একখানি তৈলচিত্র ও তিনখানি এচিঙের প্রতিলিপি বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত হইল।

অন্যান্য শিল্পী :
রবীন্দ্রনাথ-গগনেন্দ্রনাথ-অমৃত শেরগিল প্রমুখ

১৩১৪ আষাঢ়

প্রবাসী বাঙ্গালীর কথা।

বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস

প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের মধ্যে কেহ চিত্রবিদ্যায় সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন এমন জানা যায় নাই। আমরা পরে জানিতে পারিলাম যে কলিকাতার তৈলচিত্রকর শ্রীযুক্ত বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার জীবনের কিয়দংশকাল পশ্চিমোত্তর প্রদেশ প্রবাসে ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। তিনি এলাহাবাদের সাহগঞ্জ নামক পল্লীতে স্বীয় ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্বরূপ করিয়া যুক্তপ্রদেশের বড় বড় সহরগুলিতে, পঞ্জাবে এবং রাজপুতানায় দেশীয় রাজ্যসমূহে ভ্রমণ করিয়া ভারতীয় অনেক রাজা মহারাজা ও পদস্থ ব্যক্তির প্রতিকৃতি অঙ্কিত করেন।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত সাতগাছিয়া গ্রামে মাতুলালয়ে বামাপদ বাবুর জন্ম হয়। তাঁহার পিত্রালয় হুগলি, সিমলাগড় গ্রামে। তাঁহার পিতা পরোপকারী সরলহৃদয়, নৈষ্ঠিক হিন্দু এবং গ্রামের সকলের সম্মানভাজন ছিলেন এবং মাতামহ সংস্কৃত অধ্যাপকতা করিতেন। বামাপদ বাবুর মাতুলদ্বয় তাঁহাকে বড়ই ভাল বাসিতেন, তাঁহারা তাঁহাকে অধিক দিন তাঁহার পিত্রালয়ে থাকিতে দিতেন না। এই কারণে বামাপদ বাবুর বাল্যশিক্ষা বর্দ্ধমানের গ্রাম্য বিদ্যালয়েই হইয়াছিল। তাঁহার সাত আট বৎসর বয়সের সময় তিনি শ্রীধরপুরের ৺ ভুবনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। পরে তাঁহার মাতামহী তাঁহাকে অধ্যাপক পণ্ডিত করাইবার জন্য চতুষ্পাঠীতে পাঠাইয়া দেন। মাতুলদ্বয়ের অকাল মৃত্যু হইলে বামাপদ বাবু স্বগৃহে আসিয়া পিতা ও পিতৃব্যের তত্ত্বাবধানে পুনরায় ইংরাজী শিক্ষারম্ভ করেন। তখন নিজগ্রামে বা তন্নিকটে ইংরাজী বিদ্যালয় না থাকায় জনাই ট্রেনিং স্কুলে ভর্ত্তি হন। উহা ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন মহোদয় কর্ত্তৃক সংস্থাপিত হয়।

গ্রাম্য বিদ্যালয়ে এবং এখানে ছাত্রাবস্থায় বামাপদ বাবু স্বীয় ভবিষ্যৎ জীবনের আভাস দিয়াছিলেন। পাঠ্যবিষয়গুলিতে তাঁহার তত মনোযোগ ছিল না, বিশেষতঃ অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহার কিছুমাত্র অনুরাগ ছিল না। অঙ্কের সময় তিনি সচিত্র পুস্তকগুলি হইতে নানা প্রকার ছবি আঁকতেন এবং সহপাঠীদিগের Sketch বা Caricature আঁকিবার চেষ্টা করিতেন। শৈশবে অর্থাৎ পাঁচ ছয় বৎসর বয়সে তিনি মাতুলালয়ে থাকিয়া গ্রাম্য বারোয়ারীর সং দেখিয়া তাহার অনুকরণে সঙ্গীদের মাটির পুতুল গড়িয়া দিতেন। পরে শ্রীধরপুরের স্কুলে পড়িবার সময় মধ্যে মধ্যে সং গড়িয়া তাহাকে হরিতাল মাখাইয়া বাহির করিতেন। এবং কোন দলাদলি হইতে বিপক্ষদলের নানা প্রকার হাস্যোদ্দীপক বিকৃত মূর্ত্তি গড়িয়া নীরব ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিতেন। তাহাতে বিপক্ষ দলের যতই গাত্রদাহ হইত তিনি স্বদলের মধ্যে ততই প্রতিষ্ঠাভাজন হইতেন। জয়পুররাজ্যের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী স্বর্গীয় রাও কান্তিচন্দ্র বাহাদুর তখন জনাই ট্রেনিং স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। তিনি এক দিন চতুর্থ শ্রেণীর অঙ্ক পরীক্ষা করিতেন যান। বামাপদ বাবু ঐ শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। কিন্তু তিনি অঙ্কের পরিবর্ত্তে এক চিত্র আঁকিয়া বসেন। কান্তিবাবু অঙ্ক দেখিতে চাহিলে তিনি দেখাইতে না পারায় এতক্ষণ কাগজে পেন্সিল লইয়া বালক কি করিতেছিল, পরীক্ষকের জানিতে কৌতূহল জন্মিল। তিনি কাগজখানি লইয়া দেখেন যে তাহাতে একটী বালক অঙ্ক কষিতে না পারিয়া পেন্সিল মুখে দিয়া চুসিতেছে। কান্তি বাবু মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন এই কি তোমার অঙ্ককষা? বঙ্গের খ্যাতনামা ইংরাজী লেখক Mukherji's Magazine এবং Rais and Rayet-এর

সম্পাদক স্বর্গীয় শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় একবার পরীক্ষা করিতে গিয়া বামাপদ বাবুর উপর অতিশয় সন্তুস্ট হন। বামাপদ বাবু বলেন শম্ভুচন্দ্র বাবুর সুন্দর মুখশ্রী, ঢল ঢলে বড় বড় চক্ষু, গৌরবর্ণ সুগোল দেহ, পরিধানে কাশ্মিরী শালের চোগা, মাঝখানে সিঁতি, বাবরিকাটা চুল এবং সকল দিকেই বেশ ফিট ফাট চেহারা দেখিয়া তাঁহার মূর্ত্তি আঁকিবার লোভ সামলাইতে পারেন নাই। শম্ভুচন্দ্র বাবু পরে সে চিত্র দেখিয়া তত্রস্থ জমীদার এবং পরে বামাপদ বাবুর শ্বশুর শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে বলেন "এই বালককে অবিলম্বে আর্ট স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। চিত্র-শিল্পের দিকে ইহার স্বাভাবিক ঝোঁক আছে।" অনেকেই তাঁহাকে এরূপ উৎসাহ দেওয়ায় এবং তাঁহারও চিত্রবিদ্যা শিখিবার ইচ্ছা বলবতী হওয়ায় তিনি ট্রেনিং স্কুল ছাড়িয়া সরকারী আর্ট স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। তখন আর্ট স্কুল বহুবাজার বৈঠকখানায় ছিল এবং সুপ্রসিদ্ধ লক সাহেব তাহার অধ্যক্ষ ছিলেন। কিছুদিন এখানে শিক্ষালাভ করিবার পর তাঁহার তৈলচিত্র আঁকিবার ইচ্ছা হয় কিন্তু সে সময় আর্ট স্কুলে তৈলচিত্রাঙ্কন শিক্ষা দেওয়া হইত না। সুতরাং তিনি আর্ট স্কুল ত্যাগ করিয়া প্রথিতনামা প্রতিমূর্ত্তি চিত্রকর প্রমথনাথ মিত্র মহাশয়ের নিকট অয়েল পেন্টিং শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। এবং এই সময় সুকুমার শিল্পসম্বন্ধীয় ইংরাজী গ্রন্থসকল অধ্যয়ন করেন। অতঃপর বেকার (Becker) নামে একজন অভিজ্ঞ জার্মন্ চিত্রকর কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন। বামাপদ বাবু তাঁহার সন্ধান পাইয়া তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতে থাকেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার প্রীতিভাজন হন। বামাপদ বাবুর আগ্রহাতিশয় দেখিয়া তিনি যত্ন সহকারে তাঁহাকে চিত্রাঙ্কন ও পুরাতন চিত্রাদির সংস্কার বিষয়ক শিক্ষা দেন। বেকার সাহেব তাঁহাকে যথেস্ট স্নেহ করিতেন। ক্রমে উভয়ের মধ্যে এরূপ ঘনিষ্ঠতা হইল যে দুই জনে মিলিত হইয়া কাজকর্ম্ম করিতে লাগিলেন। এই সময় বামাপদ বাবুর কিছু কিছু উপার্জ্জন হইতে লাগিল।

১৮৭৯ অব্দে---"Calcutta Fine Art Exhibition" নামে যে শিল্প-প্রদর্শনী হয় তাহাতে স্বহস্তাঙ্কিত একখানি চিত্র পাঠাইতে বেকার সাহেব বামাপদ বাবুকে অনুরোধ করেন। তদনুসারে তিনি একটী তৈলচিত্র মূর্ত্তি আঁকিয়া পাঠান। উহা প্রদর্শনী সভা কর্ত্তৃক "the best figure subject in oil by a native of India" বলিয়া ধার্য্য হয়। বড়লাট লর্ড লিটন, ঐ সভার সভাপতি এবং ছোটলাট সার এষলি ইডেন, সহকারী সভাপতি ছিলেন। লক সাহেব প্রমুখ বিশেষজ্ঞগণ সভার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বাঙ্গালীর মধ্যে সর্ব্ব প্রথমে বামাপদ বাবুই স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত হন। কিছুদিন পরে বেকার সাহেব হঠাৎ কোথায় চলিয়া যান। বামাপদ বাবু তাঁহার অনুসন্ধান করিয়াও আর দেখা পান নাই। ইহার পর হইতে তিনি স্বাধীনভাবে ব্যবসায় চালাইতে লাগিলেন।

১৮৮১ অব্দে তিনি এলাহাবাদ গমন করেন এবং তাঁহার আত্মীয় তথাকার সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে কিছুদিন থাকিয়া পরে সাহগঞ্জ পল্লিতে সপরিবারে বাস করেন। এখানে অবস্থানকালে পৌরাণিক চিত্র অঙ্কিত করিয়া বিলাত হইতে নানা রঙ্গে ছাপাইয়া লইতে মনস্থ করেন কিন্তু নানা কারণে তখন তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। এখান হইতে তিনি লক্ষ্ণৌ যান। তথায় ডাক্তার রায় রামলাল চক্রবর্ত্তী বাহাদুর এবং ক্যানিং কলেজের অধ্যাপক এক্ষণে কলিকাতা British Indian Association-এর সহকারী সম্পাদক রায় রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী বাহাদুর তাঁহার যথেস্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। লক্ষ্ণৌ হইতে তিনি Tribune পত্রিকার তৎকালীন সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (এক্ষণে আমেরিকা প্রবাসী বাবা প্রেমানন্দ ভারতী) মহাশয়ের যত্নে লাহোর যাত্রা করেন। এখানে আসিয়া (Chief Court) চীফ কোর্টের জজ পণ্ডিত রামনারায়ণ, মাননীয় জস্টিস প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রায় বাহাদুর এবং সর্দ্দার দয়াল সিং প্রমুখ কয়েকজন প্রধান প্রধান ব্যক্তির চিত্র অঙ্কিত করেন। একবার লাহোর আর্ট স্কুল দেখিতে

যাইবার কালে তথাকার অধ্যক্ষ মিষ্টার কিপলিং-এর সহিত চিত্রবিদ্যা সম্বন্ধে তাঁহার আলাপ হয়। বামাপদ বাবুর পরিচয় পাইয়া প্রিন্সিপাল কিপলিং স্বীয় ছাত্রগণকে সম্বোধন করিয়া বলেন "একজন বাঙ্গালী চিত্রকর এতদুর আসিয়া তোমাদের নগরে চিত্র-বিদ্যার পরিচয় দিতেছেন আর তোমরা কি করিতেছ?" ইহাতে ছাত্রগণ ঈর্ষান্বিত অথবা উৎসাহযুক্ত হইয়াছিল কিনা বলা যায় না কিন্তু বামাপদ বাবু লাহোরের অভিজাত শ্রেণীর দ্বারা যথেষ্ট উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। সর্দ্দার দয়াল সিংহ প্রভৃতির প্রশংসাপত্র তাহার সাক্ষ্য দান করে।

লাহোর ত্যাগ করিয়া তিনি অমৃতসহর, অম্বালা, দিল্লী, মথুরা, বৃন্দাবন, আগ্রা, আলিগড়, গোয়ালিয়র, ভরতপুর, ধোলপুর, আলওয়ার, জয়পুর প্রভৃতি অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়া রাজা মহারাজাগণের চিত্র অঙ্কিত করিয়া যশ এবং অর্থলাভ করেন এবং সর্ব্বত্রই সকলকে সন্তোষ দান করেন। জয়পুরে রাও বাহাদুর কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। কিন্তু সে ক্ষেত্রে কোন কাজ হয় নাই। পরে মহারাজার তৎকালীন খাস্‌মন্ত্রী রাও সংসারচন্দ্র সেন বাহাদুরের সাহায্যে তিনি মহারাজা মাধো সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার প্রতিকৃতি অঙ্কিত করেন।

১৮৮৩ খৃস্টাব্দে প্রয়াগে বামাপদ বাবুর পিতার পরলোক প্রাপ্তি হয়। বামাপদ বাবু আরও কিছুকাল এলাহাবাদে থাকিয়া এবং পশ্চিমাঞ্চলের আরও কয়েক স্থান ঘুরিয়া কলিকাতায় গিয়া বাস করেন। কলিকাতার স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়, মাননীয় জজ সার রমেশচন্দ্র মিত্র, মিরর সম্পাদক মাননীয় নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়, রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর, স্বর্গীয় মিঃ মনোমোহন ঘোষ এবং মহারাজা সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রমুখ অনেক কৃতবিদ্য বাঙ্গালীর,— দ্বারবঙ্গের স্বর্গীয় মহারাজা লক্ষ্মীশ্বর সিংহ বাহাদুর, মুর্শিদাবাদ নসীপুরের মাননীয় রাজা রণজিৎ সিংহ বাহাদুর প্রমুখ রাজা ও ভূম্যধিকারীর এবং এডভোকেট জেনারেল মাননীয় উডরফ্, কলিকাতার কর্পোরেসনের সভাপতি লী সাহেব, সাহাবাদের ডিস্ট্রীক্ ও সেসন জজ গুডেয়ার ডে সাহেব, হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার মিঃ বেল্‌চেম্বার্স প্রমুখ কয়েকজন য়ুরোপীয়ের প্রতিকৃতি অঙ্কিত করেন।

কয়েকবৎসর পরে রাজা রবিবর্ম্মার অঙ্কিত চিত্রাদি দেখিয়া তাঁহার পূর্ব্ব কল্পনা অর্থাৎ পৌরাণিক চিত্র প্রকাশের ইচ্ছা নবীভূত হইয়া উঠে। ১৮৯০ অব্দে তিনি তাঁহার চিত্রিত "অর্জ্জুন ও উর্ব্বশী" এবং "উত্তরার নিকট অভিমন্যুর বিদায়" নামক দুইখানি চিত্র ছাপাইবার জন্য য়ুরোপে পাঠান। কলিকাতার জনৈক উদার হৃদয় এবং ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি এবিষয়ে তাঁহাকে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। 'প্রবাসীতে' ঐ দুইখানি ছবিই প্রকাশিত হইয়াছিল। অবশ্য এই দুখানি পৌরাণিক চিত্র হইতে বামাপদ বাবুর চিত্রাঙ্কন প্রতিভার বিচার করিলে ভ্রমে পতিত হইতে হইবে। এসম্বন্ধে তিনি নিজেই বলিয়াছেন "ছবিগুলির ছাপা যদিও মন্দ হয় নাই তথাচ মুল ছবির ন্যায় তত ভাল হয় নাই এবং ছাপান ছবিতে কএকটী দোষ স্পষ্টই দৃষ্ট হয় কিন্তু তাহার কোন উপায় নাই—অনেক চেষ্টা করিয়াও সংশোধন করাইতে পারি নাই; এদিকে সংশোধন করাইবার জন্য কিছু বেশী খরচ করিতে হইয়াছিল।" তাঁহার পৌরাণিক চিত্রের ন্যায় বঙ্গীয় গার্হ্যস্থ জীবনের কয়েকটী আদর্শ দৃশ্য, হাস্যোদ্দীপক দৃশ্য এবং উৎকৃষ্ট বাংলা উপন্যাস ও কাব্যনাটকাদি হইতে কতকগুলি দৃশ্য অঙ্কিত করিবার ইচ্ছা আছে। উপযুক্ত অর্থসাহায্য এবং উৎসাহ পাইলে উক্ত বাসনা তিনি কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন। ১৮৭৯ অব্দের যে সুকুমার শিল্প প্রদর্শনীতে তিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট তৈলচিত্রের জন্য স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ১৯০২ অব্দের পুনরায় সেই প্রদর্শনীতে তিনি বর্ত্তমান সম্রাটের প্রতিকৃতি, "কৃষ্ণনগরের উপকণ্ঠে জলঙ্গীতে সূর্য্যাস্ত" এবং মুর্শিদাবাদের নিকটবর্ত্তী স্থানে "আসন্নঝড়" এর দৃশ্য প্রেরণ করেন। প্রদর্শনীতে রক্ষিত বহু চিত্রকরের অসংখ্য চিত্রের মধ্যে বামাপদ বাবুর চিত্র সকলের চিত্ত

সমধিক আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। এবং দর্শকবৃন্দের ভূরি ভূরি প্রশংসাবাদ ও প্রদর্শনীসভাদত্ত স্বর্ণ পদক তাঁহার পরিশ্রম সার্থক করে। *"The Indian Daily News." এতদুপলক্ষে লেখেন—

** Mr. B. P. Banerjee, the artist who carried away the gold medal in the Fine Art Exhibition, Calcutta, and who has painted the portraits of some of the leading Chiefs and Rulers of India, had beautiful collection of oil paintings on view. The centre piece of the stall contained an exceptionally fine portrait in oils of the King-Emperor in full court robes, worn at the opening of Parliament, a likeness which is strikingly correct. This was copied from a cabinet photo and does the artist every credit. There were two other pictures exhibited by the same gentle man, which are deserving of special mention. They are Sunset at Jalanghee near Krishnagar, and "Approaching storm"–a scene depicted near Murshidabad."

১৩৩৯ বৈশাখ
চিত্রশিল্পী বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

কয়েক দিন হইল চিত্রশিল্পী বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ৭৪ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি পাশ্চাত্য রীতিতে ছবি আঁকিতেন। "শকুন্তলার প্রতি দুর্ব্বাসার অভিশাপ", "রাধিকার কলঙ্কভঞ্জন", প্রভৃতি তাঁহার কয়েকটি ছবির রঙীন প্রতিলিপির বাজারে কাট্‌তি আছে। তিনি দীর্ঘকাল বাংলা দেশের বাহিরে বিষয়কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন বলিয়া শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস বঙ্গের বাহিরের বাঙালীদের বৃত্তান্তে তাঁহার সম্বন্ধেও কিছু লিখিয়াছেন।

১৩৩৮ মাঘ
রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্কন

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কিত চারিটি ছবির প্রতিলিপি প্রবাসীর এই সংখ্যায় দিলাম। ছবিগুলির কোন নাম কবি দেন নাই, দেওয়া যায়ও না। কারণ, সেগুলি কোন বাস্তব মনুষ্য বা অপর জীব বা অপর জন্তুর প্রতিরূপ নহে, সম্পূর্ণরূপে কবির মানসসৃষ্টি। এই সব ছবি অন্য কোন চিত্রকর বা চিত্রকর-সম্প্রদায়ের ছবির মত নহে; কারণ কবি কোন চিত্রবিদ্যালয়ে বা বাড়িতে কোন চিত্রকরের নিকট শিক্ষালাভ করেন নাই। লিখিবার সময় যে কাটকুট হয় সেইগুলিকে রেখা দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত করিবার অভ্যাস থাকায় তাহা করিতে করিতে এই সকল রেখার সংযোগে নানাবিধ ছক উৎপন্ন হইত। ইহাই তাঁহার চিত্রাঙ্কন-অভ্যাসের উৎপত্তির ইতিহাস। তাঁহার

ছবিগুলিকে তিনি তাঁহার রেখার ছন্দোবদ্ধ ("my versification in lines") বলিয়াছেন। তিনি কলম দিয়া আঁকেন, তুলি দিয়া নহে। কখন কখন কলমের বাঁটের দিক্‌টাও ব্যবহার করেন, আঙুল দিয়াও রং দেন।

ছবির নাম দেওয়া সম্বন্ধে তিনি প্রবাসীর সম্পাদককে একখানি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন :--

"ছবিতে নাম দেওয়া একেবারেই অসম্ভব। তার কারণ বলি; আমি কোন বিষয় ভেবে আঁকিনে—দৈবক্রমে কোনো অজ্ঞাতকুলশীল চেহারা চলতি কলমের মুখে খাড়া হয়ে ওঠে। জনক রাজার লাঙলের ফলার মুখে যেমন জানকীর উদ্ভব:—কিন্তু সেই একটি মাত্র আকস্মিককে নাম দেওয়া সহজ ছিল—বিশেষত সে নাম যখন বিষয় সূচক নয়। আমার যে অনেকগুলি—তারা অনাহূত এসে হাজির—রেজিস্‌টার দেখে নাম মিলিয়ে নেব কোন্ উপায়ে। জানি, রূপের সঙ্গে নাম জুড়ে না দিলে পরিচয় সম্বন্ধে আরাম বোধ হয় না। তাই আমার প্রস্তাব এই, যাঁরা ছবি দেখবেন বা নেবেন, তাঁরা অনাম্নীকে নিজেই নাম দান করুন,—নামাশ্রয়হীনাকে নামের আশ্রয় দিন। অনাথাদের জন্যে কত আপিল বের করেন, অনামাদের জন্যে করতে দোষ কি? দেখবেন যেখানে এক নামের বেশী আশা করেন নি সেখানে বহুনামের দ্বারা ছবিগুলো নামজাদা হয়ে উঠবে। রূপসৃষ্টি পর্য্যন্ত আমার কাজ, তারপরে নামবৃষ্টি অপরের।"

কবির সমুদয় চিন্তা ও ভাব প্রকাশের জন্য তাঁহার প্রচুর শব্দসম্পদ ও যথেষ্ট লিপিনৈপুণ্য আছে। তাহা সত্ত্বেও যদি শব্দের দ্বারা ছাড়া তাঁহার অন্তরের কিছু জিনিষ রেখা ও রঙের সংযোগে উৎপন্ন রূপের দ্বারা প্রকাশ পায়, তাহা তাঁহা অপেক্ষা শব্দসম্পদে দরিদ্র কেহ কথার দ্বারা কেমন করিয়া ব্যক্ত করিবে? শব্দের দ্বারা ব্যক্ত করিবার হইলে তিনি নিজেই তাহা করিতেন।

অন্য দু-একটা কথা বলি।

প্যারিসের চিত্রশালা লুভ্রে লেওনার্ডো ডা ভীঞ্চির আঁকা মোনা লীজা নাম্নী মহিলার যে বিখ্যাত চিত্র আছে, তাহা কিংবা তাহার প্রতিলিপি আমাদের দেশের অনেকে দেখিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের আঁকা যে নারীমূর্ত্তিটির প্রতিলিপি এবার ছাপিয়াছি, তাহা মুখের ভাব মোনা লীজার রহস্যাচ্ছন্ন হাস্য আমার মনে পড়াইয়া দিয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট এই নারীর মুখ কি ভাব ব্যক্ত করিতেছে, বলা আরও কঠিন। ইহা কেবল হাসি নয়, কেবল কৌতুক নয়, কেবল বিরাগ নয়, ব্যঙ্গ নয়।

দীর্ঘ বহুমূর্ত্তিবিশিষ্ট ছবিটিতে কি ভিন্ন ভিন্ন জনের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির উপর একই বংশীধ্বনির ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া দেখান হইয়াছে? এই বাঁশী কে বাজাইতেছেন?

———

১৩৪২ পৌষ

উড়িষ্যার মূকবধির চিত্রকর

উড়িষ্যার মূকবধির চিত্রকর শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী চৌধুরী লন্ডনের রয়্যাল কলেজ অব আর্টে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া এ আর্ সি এ উপাধি পাইয়াছেন, এই সংবাদ অগ্রহায়ণের প্রবাসীতে দিয়াছিলাম। তাঁহার কৃতিত্ব অসামান্য সাহস, উদ্যম ও প্রতিভার পরিচায়ক। তাঁহার চেহারাও বুদ্ধির আলোকে দীপ্ত।

১৩৪৩ অগ্রহায়ণ

শিল্পী শ্রীমতী অমৃত শেরগিল

চিরকাল রসপিপাসুদের মনে আনন্দ সঞ্চার করবে, চিত্তবৃত্তির ক্ষুধা পরিতৃপ্ত করবে, শিল্পের কোন ক্ষেত্রেই এমন উচ্চাঙ্গের শিল্পসৃষ্টি নারীপ্রকৃতির পক্ষে একেবারেই সম্ভব কিনা, সে বিরোধসঙ্কুল আলোচনায় প্রবৃত্ত না হয়েও এ-কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, সহজ সৌন্দর্য্যবোধ নারীচিত্তের অঙ্গাঙ্গী : সেই সৌন্দর্য্যবোধ ব্যয়িত হয় সাধারণত তাঁদের পরিবেশকে রমণীয়, দৈনন্দিন কর্ম্মকে মধুর ক'রে তুলতে; তাঁরাই ত গৃহদীপ, অমর্ত্ত্য শ্রীর প্রতিরূপ মর্ত্ত্যলোকে। নারীর এই সহজ শ্রীজ্ঞানই পরিব্যাপ্ত হয় নানা ব্যবহারিক কারুকর্ম্মে, অলঙ্করণে; আমাদের দেশেও মেয়েদের নিপুণ হাত অনেক কাল অপরূপ কারুরচনায় পটু ছিল, এখনও সে-দক্ষতার চিহ্ন সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে যায় নি।

চিরন্তন মহিমার যোগ্য হোন বা না-হোন, আধুনিক যুগে মেয়েরা চিত্র ও মূর্ত্তি-রচনায় পুরুষের সমান স্থান অর্জ্জন করতে ব্রতী। বিদেশে শ্রীমতী লরা নাইট চিত্রশিল্পীরূপে বিশেষ সম্মান অর্জ্জন করেছেন। আমাদের দেশেও শ্রীমতী সুনয়নী দেবী, শ্রীমতী প্রতিমা দেবী, শ্রীমতী সুকুমারী দেবী ও অনেক তরুণী শিল্পীর রচনায় আমাদের শিল্প সমৃদ্ধ হয়েছে—বারান্তরে সে-কথা আলোচ্য। ভারতবর্ষের মহিলা শিল্পীদের মধ্যে সম্প্রতি যিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন সেই শ্রীমতী অমৃত শেরগিলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এইখানে আলোচ্য।

পঞ্জাবের এক সমৃদ্ধ ও অভিজাত পরিবারে ১৯১৩ সালে শ্রীমতী শেরগিলের জন্ম। উত্তরজীবনে যাঁরা শিল্পীরূপে বিখ্যাত হয়েছেন, সাধারণত বাল্যেই তাঁদের শিল্পানুরাগ অল্পবিস্তর পরিস্ফুট হ'তে দেখা যায়; শ্রীমতী শেরগিলের বেলাও তার ব্যত্যয় হয় নি। চিত্রবিদ্যা শিক্ষার জন্য ১৯২৪ সালে তাঁর পিতামাতা তাঁকে ফ্লোরেন্সে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু সেখানকার শিক্ষাপদ্ধতি তাঁর কাছে নীরস মনে হয়েছিল, তাই অল্পদিন পরেই তিনি স্বদেশে ফিরে আসেন। ১৯২৯ সালে শ্রীমতী শেরগিল শিল্পশিক্ষার জন্য পুনরায় বিদেশ যাত্রা করেন ও প্যারিসে গিয়ে গ্রাঁ শোমিয়েরে প্রতিষ্ঠানে পিয়ের ভাইয়াঁর শিক্ষাধীনে কিছুকাল থাকেন এবং পরে বিখ্যাত শিল্পশিক্ষা-প্রতিষ্ঠান একোল দে বোজার-এ অধ্যাপক লুসিয়া সিমোঁর কাছে তিনবৎসর শিক্ষালাভ করেন। এই প্রতিষ্ঠানে তিনিই প্রথম ভারতীয় শিক্ষার্থী। এইখানে ছাত্রাবস্থায় তিনি ক্রমান্বয় তিন বৎসর চিত্র-প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৩২ সালে প্যারিসে গ্রাঁ সালোতে শ্রীমতী শেরগিলের

"মূর্ত্তি" চিত্র প্রদর্শিত হয় ও শিল্প-সমালোচকদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং পর বৎসর তাঁর "তরুণী" চিত্র প্রদর্শিত হ'লে তিনি গ্রাঁ সালোর সদস্যপদে মনোনীত হন—এই পদে তিনিই সর্ব্বপ্রথম ভারতীয়। অন্যান্য সম্ভ্রান্ত কলা-প্রতিষ্ঠানেও তিনি চিত্র প্রদর্শন করতে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সম্প্রতি তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রে শিল্পচর্চ্চা করছেন।

শ্রীমতী শেরগিলের যে-চিত্রগুলি মুদ্রিত হ'ল তার মধ্যে তাঁর চিত্রকলার ক্রমপরিণতি স্পষ্টই লক্ষ্য করা যায়। "মূর্ত্তি" ও "তরুণী" চিত্র, অঙ্কনরীতি, বিষয়বস্তু ও ভাবে, সম্পূর্ণই বিদেশী; তাঁর অন্যান্য চিত্রে তাঁর স্বকীয়তা পরিস্ফুট। ভারতবর্ষের জীবনের নানা দৃশ্যই বর্ত্তমানে তাঁর চিত্রের উপজীব্য। ভারতবর্ষের দুঃখদৈন্যের রূপটিই তাঁর আধুনিক চিত্রে বিশেষ ক'রে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। সমৃদ্ধির মধ্যে পালিত হয়েও শ্রীমতী শেরগিলের নারীচিত্তকে দেশের এই দৈন্যপীড়িত রূপটি বিশেষ ভাবে স্পর্শ করেছে। অঙ্কনপদ্ধতি যে-দেশেরই হোক, তার ভাববস্তুর সঙ্গে যদি দেশের হৃদয়ের স্পর্শ না থাকে তা হ'লে যে কোন শিল্পসাধনাই সার্থক হ'তে পারে না, একথা তিনি জানেন এবং তাই জ্ঞানতই তিনি চিত্রপটে দেশের বেদনাময় করুণ দিকটাকেই রূপায়িত করে তুলবার ভার নিয়েছেন।

গুপ্ত

১৩৪৪ চৈত্র

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

একাত্তর বৎসর বয়সে শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুতে এক জন বড় চিত্রশিল্পী এবং মহানুভব ভদ্র ব্যক্তির তিরোভাব হইল। তিনি শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ বঙ্গে ও ভারতবর্ষে যে চিত্রাঙ্কন-রীতি প্রবর্ত্তিত করেন, তাঁহার অগ্রজ ঠিক্ সেই রীতির অনুসরণ করিতেন না। তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ছবির অঙ্কনরীতি কতকটা পৃথক পৃথক ছিল। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ছবি অঙ্কনে তিনি প্রতিভাশালী বড় ওস্তাদ ছিলেন। পাশ্চাত্য দেশসমূহে যাহা কিউবিষ্ট চিত্রাঙ্কনরীতি বলিয়া পরিচিত, তিনি নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া সেইরূপে একটি রীতি উদ্ভাবন করেন। ভারতবর্ষে তিনি এ-বিষয়ে এক ও অদ্বিতীয়।

"প্রাচ্য আর্টের ভারতীয় সমিতি"র তিনি প্রতিষ্ঠাতা ও দীর্ঘকাল তাহার পরিচালক ছিলেন। এই সমিতি বহু ছাত্রকে আর্ট শিক্ষা দিয়া এবং চিত্র-প্রদর্শনীর বন্দোবস্ত করিয়া বঙ্গে আর্ট শিক্ষা দিবার সহায়তা করিয়াছেন এবং সর্ব্বসাধারণকে আর্ট বুঝিতে ও তাহার রসাস্বাদন করিতে সাহায্য করিয়াছেন।

জোড়াসাঁকোতে রবীন্দ্রনাথের বৈঠকখানা-গৃহে "বিচিত্রা" নাম দিয়া সাহিত্য ও আর্টের আলোচনা ও অনুশীলনের জন্য যে-প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়, গগনেন্দ্রনাথ তাহার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

চিত্রাঙ্কন ভিন্ন অভিনয়েও তিনি সুনিপুণ ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের "ফাল্গুনী" ও "বৈকুণ্ঠের খাতা"র অভিনয়ে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল।

তিনি সাহিত্যিক ও চিত্রশিল্পীদের বদান্য উৎসাহদাতা ছিলেন। দু-এক জনের পাকা ঘরবাড়ী কলিকাতায় নিজ ব্যয়ে নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন

জানি। এরূপ দৃষ্টান্ত আরও থাকিতে পারে।

দেশের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনাদি কাজেও তিনি সাহায্য করিতেন। ইহা কম লোকেই জানে।

তাঁহাদের বাড়ীতে যে-সকল পুরাতন চিত্র ও অন্য বহুবিধ শিল্পদ্রব্যের সংগ্রহ আছে, তাহা খুব মূল্যবান।

গগনেন্দ্রনাথ মিষ্টভাষিতা ও সৌজন্যের দৃষ্টান্তস্থল ছিলেন।

১৩৪৫ আষাঢ়

শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের ললিতকলা প্রদর্শনী

গত ২০শে জ্যৈষ্ঠ কলিকাতার ১০ নং ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান ষ্ট্রীট ভবনে ভাস্কর শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র রায়ের ষ্টুডিয়োতে, তাঁহার সৌজন্যে, শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের ললিতকলা প্রদর্শনী খোলা হয়। ইহার দ্বার মোচন করেন, কংগ্রেস-সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু। এই প্রদর্শনীতে যত রকমের যত ছবি ও কিছু মূর্ত্তি রক্ষিত দেখিয়াছি, তাহার সবগুলি ভাল করিয়া দেখাইতে হইলে বৃহত্তর স্থানের আবশ্যক। আশা করি, আগামী বৎসর হইতে আশ্রমিক সংঘ বৃহত্তর স্থান পাইতে পারিবেন। এ বৎসর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদার, সুরেন্দ্রনাথ কর এবং অন্যান্য শিল্পীর এবং আশ্রমিক সংঘের সভ্যদিগের বহুচিত্রাদি প্রদর্শিত হইয়াছে। এক বার তাড়াতাড়ি চোখ বুলাইয়া লইলে এরূপ প্রদর্শনী হইতে যথোচিত আনন্দ ও শিক্ষা লাভ করা যায় না। তথাপি ভিড়ের মধ্যে যতটুকু পাওয়া যায়, তাহাই সঞ্চয় করিয়া রাখা ভাল।

সংঘের কর্ম্মকর্ত্তারা স্বভাবতঃ প্রথমেই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করিতে অনুরোধ করেন। দৈহিক অসামর্থ্যহেতু তিনি তাহা করিতে না পারায় শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর দ্বারা এই কাজটি সম্পন্ন হইয়াছে। ইহারও যথাযোগ্যতা আছে।

ভারতবর্ষীয় পুরাণ অনুসারে গণেশ গণের অধিপতি এবং সিদ্ধিদাতা। তাঁহাকে ঠিক্ কি অর্থে ও কারণে শাস্ত্রে গণপতি বলা হইয়াছে, জানি না। তাঁহার বধূকে কলাবধূ বলা হইয়াছে। ইহারও শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা খুঁজিয়া বাহির করিবার সুযোগ সম্প্রতি আমার নাই। আজকাল গণতন্ত্র গণ-আন্দোলন প্রভৃতি কথায় "গণ" শব্দের প্রয়োগ জনসমষ্টি অর্থে করা হইয়া থাকে। এবং কলা বলিতে চিত্রাঙ্কনাদি সুকুমার শিল্প (Fine Arts) ও কারুশিল্প (Crafts) বুঝায়। জনসমষ্টি আনন্দ ও সম্পদ্ রূপ সিদ্ধি লাভ করিতে পারে কলাকে বরণ করিয়া, অর্থাৎ সুকুমার শিল্প ও কারুশিল্পের (Arts and Crafts) সাহায্যে। সুতরাং জনসমষ্টির নেতা সুভাষচন্দ্র কলাপ্রদর্শনীর উদ্বোধন করায় কোন অসঙ্গতি হয় নাই, অনুষ্ঠানটি সুসঙ্গতই হইয়াছে।

ভাস্কর্য : স্থাপত্য : প্রত্নতত্ত্ব

১৩০৮ ভাদ্র

[ভাস্কর ম্‌হাত্রেকে সাহায্যের আবেদন]

আমরা গত সংখ্যায় "ভারতবর্ষের শিল্প" নামক প্রবন্ধে আমাদের পাঠকবর্গকে জানাইয়াছি যে, বিখ্যাত ভাস্কর ম্‌হাত্রেকে তাঁহার শিল্পশিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার জন্য ইউরোপ পাঠাইবার চেষ্টা হইতেছে। যাতায়াত এবং ইউরোপে তিন বৎসর থাকিয়া শিক্ষালাভার্থ আনুমানিক বার হাজার টাকার প্রয়োজন। এই টাকা সংগ্রহ করিবার জন্য বোম্বাইয়ের কয়েকজন বিখ্যাত লোক একটী নিবেদন পত্র প্রকাশিত করিয়াছেন। ম্‌হাত্রে মহাশয় আমাদিগকে উহার কয়েক খণ্ড পাঠাইয়া দিয়াছেন। উহা বিজ্ঞাপন স্তম্ভে মুদ্রিত হইল। আমরা আমাদের পাঠক পাঠিকাগণকে যথাসাধ্য চাঁদা দিতে অনুরোধ করিতেছি। চাঁদা নিবেদন পত্রে লিখিত ব্যক্তিদ্বয়ের নিকট পাঠাইতে হইবে। আমাদের নিকট প্রেরিত হইলে আমরা 'প্রবাসী'তে তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করিব এবং যথাস্থানে পাঠাইয়া দিব। ম্‌হাত্রের শিল্পনৈপুণ্যের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

১৩০৯ মাঘ-ফাল্গুন

[কাশীনাথ ম্‌হাত্রে নির্মিত শবরীবেশধারিণী পার্বতীর মূর্তি]

মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত কিরাত-প্রকরণে কথিত আছে যে মহর্ষিগণ অর্জ্জুনকে উগ্র তপস্যায় প্রবৃত্ত দেখিয়া মহাদেব সমীপে গিয়া নিবেদন করেন, "তিনি যে কি অভিপ্রায়ে তপস্যা করিতেছেন, তাহা আমরা কেহই অবগত নহি। তিনি ঐ তপস্যা দ্বারা আমাদিগের সকলকে উৎকণ্ঠিত করিয়াছেন; আপনি তাঁহাকে সাঁধুরূপে নিবারণ করুন।" শিব তাঁহাদিগকে বিষণ্ণ হইতে নিষেধ করিয়া অর্জ্জুনের অভিলাস জানিবার জন্য কিরাত-বেশ ধারণপূর্ব্বক সমান-বেশ ও সমান-ব্রতধারিণী পার্ব্বতীর সহিত সন্নিধানে গমন করেন। বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ ভাস্কর গণপৎ কাশীনাথ ম্‌হাত্রে শবরীবেশধারিণী পার্ব্বতীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণপূর্ব্বক দিল্লীদরবারপ্রদর্শনীতে পাঠাইয়াছিলেন। এই মূর্ত্তির জন্য তিনি প্রশংসা ও পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। এই সুন্দর মূর্ত্তিটির চিত্র আমরা প্রকাশ করিলাম। দিল্লীতে এই মূর্ত্তিটি যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই একবাক্যে ইহার প্রশংসা করিয়াছেন।

১৩১১ কার্ত্তিক

মর্ম্মর প্রস্তরে লক্ষ্মীমূর্ত্তি।

[শীতলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়]

দীনেশচন্দ্র সেন

কলিকাতা ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্র শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শ্বেতমর্ম্মর প্রস্তরে একটি লক্ষ্মীর মূর্ত্তি গড়িয়াছেন। সেই মূর্ত্তিটির তিন দিক্ হইতে তিনটি ফটোগ্রাফ লইয়া প্রবাসীর পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করা হইতেছে।

ভাস্করটি তরুণবয়স্ক এবং সুকুমার শিল্পে কোনরূপ শিক্ষা পান নাই, প্রস্তরের দ্বারা মূর্ত্তি গড়িবার তাঁহার এই প্রথম উদ্যম। প্রথম উদ্যমেই তিনি যে সফলতা লাভ করিয়াছেন, তাহা অনন্যসাধারণ।

দুই বৎসর অতীত হইল বরিশাল জেলার কীর্ত্তিপাশার জমিদার শ্রীযুক্ত রায় রোহিণীকুমার সেন চৌধুরী মহাশয়ের মৃজাপুরস্থিত ভাড়াটিয়া বাড়ীতে শীতলচন্দ্রের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তখন শীতলচন্দ্র মেডিক্যাল স্কুলে পড়িতেন, এবং অবসর পাইলে একটি ছুঁচ্ ও ছুরী লইয়া মোমবাতির দ্বারা পুতুল গড়িতেন। আমি যে পুতুলটি প্রথম দেখি তাহা একটি শিশুর; বিচিত্রগ্রীবাভঙ্গীযুক্ত ময়ূরটিকে দুইটি অনিন্দ্য বাহু দ্বারা জড়াইয়া ধরিয়া একটি স্মিতমুখ শিশু পশ্চাৎদিকে তাকাইয়া আছে। তাহার স্নিগ্ধ মধুর রূপটি হইতে একটী কোমল প্রভা উছলিয়া পড়িতেছে। এই ছবিটির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া আমি প্রশংসা করাতে শীতল আমাকে তাহার পুটলী খুলিয়া আরও কয়েকটি পুতুল দেখাইলেন। দ্বিতীয়টি সরস্বতী মূর্ত্তি, তাহার দাঁড়াইবার ভঙ্গীটি অপূর্ব্ব এবং গড়ন নিখুঁত। আর একটি নগ্না রমণী, কুঞ্চিত কেশদাম গ্রীবার উপর মনোরম স্তবকে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। চৌরঙ্গীতে ইটালীর মর্ম্মর প্রস্তরে যে সকল অপূর্ব্ব সুন্দর মূর্ত্তি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে, এ পুতুলগুলি যেন তাহাদেরই ক্ষুদ্র ও সুন্দর সংস্করণ।

এই পুতুলগুলি অনেকেই দেখিয়াছিলেন। সুবিখ্যাত চিত্রকর শ্রীযুক্ত শশীকুমার হেস তরুণভাস্করের কর্ম্মে বিশেষ প্রীতি প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে অবিলম্বে ইটালীতে যাইবার উপদেশ দেন এবং সন্তোষের জমিদার কবিবর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়চৌধুরী মহাশয় ইঁহার তথায় যাইয়া অধ্যয়নাদির ব্যয়ের ব্যবস্থা করিয়া দিতে অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। কিন্তু শীতলচন্দ্রের অভিভাবকগণ "ঘরমুখো বাঙ্গালী"— তাঁহাদের "গৃহ হ'তে আঙ্গিনা বিদেশ"; সে যে বরিশাল হইতে কলিকাতা আসিয়াছে, ইহাই তাঁহাদের অসামান্য সহিষ্ণুতা ও প্রশ্রয়ের ফলে—সুতরাং ইটালীতে যাওয়ার প্রস্তাব পণ্ড হইয়া গেল। এই অবস্থায় দীঘাপতিয়ার উদারচেতা কুমার শ্রীযুক্তশরৎকুমার রায় এম্-এ এবং শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়দ্বয় ইঁহাকে মর্ম্মর প্রস্তর ও যন্ত্রাদি কিনিবার জন্য যথাযোগ্য অর্থসাহায্য করেন। কলিকাতায় মূর্ত্তি গড়িবার উপযোগী মর্ম্মর প্রস্তর সুলভ নহে। একজন সাহেব একটি নাতিবৃহৎ ইটালীর মার্ব্বেলের বুকের জন্য আট শত টাকা চাহিয়াছিলেন। আর প্রায় সকল দোকানেই একরকমের উত্তর পাওয়া গিয়াছে— "আমরা মার্ব্বেলের ব্লক খুচরা বিক্রয় করি না, যদি নিতে চান, তবে অত্যন্ত বেশী দর দিতে হইবে।" যাহা হউক, বহুকষ্টে একখণ্ড নিকৃষ্ট শ্রেণীর শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তর আকার ও গুণানুসারে অত্যন্ত অধিক মূল্য দিয়া ক্রয় করা হইল। এই পাথরখানি কাটিতে যাইয়া দেখা গেল, ইহার মধ্যে অনেক অদৃষ্টপূর্ব্ব কালো দাগ বাহির হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু অনন্যোপায় হইয়া শীতলচন্দ্র ইহার দ্বারাই লক্ষ্মীমূর্ত্তি

গড়িয়াছেন। প্রস্তরখানি ১৮"X ৯" পরিমিত। ভাল পাথর না পাইলে মূর্ত্তি কাটিয়া গঠন করা বড় কঠিন। এক হয় পাথর অতি কোমল থাকে, ঘা দিলে বালির মত চূর্ণ হইয়া যায়, আর যদি কঠিন হয়, তবে ঘা দিলে দাগ পড়িতে চাহে না, সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের পক্ষে তাহা একবারে অনুপযোগী, যে ঘা পড়িলে তাহাতে দাগ পড়িবার সম্ভাবনা, সেরূপ ঘা পাইয়া অনেক সময়েই তাহা ভাঙ্গিয়া যায়। যে প্রস্তর দ্বারা মূর্ত্তিটি গঠিত হইয়াছে, তাহা এই দ্বিতীয় শ্রেণীর নিকৃষ্ট প্রস্তর।

অতিশয় সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্যের সহিত অনেকদিন কাজ করিয়া লক্ষ্মী মূর্ত্তিটি গঠিত হইয়াছে; এখনও ইহা একবারে সম্পূর্ণ হয় নাই। পাদপীঠের সান্নিধ্যে ফুল পল্লবযুক্ত কারুকার্য্য বাকী আছে এবং ভাস্করকে লক্ষ্মীর পা' দুখানি ধরিয়া মনের মতন করিয়া সাজাইতে হইবে। মূর্ত্তিটি শীঘ্রই বিক্রীত হইয়া মফঃস্বলে প্রেরিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, এই আশঙ্কায় কতকটা অসম্পূর্ণ অবস্থায়ই ফটোগ্রাফ লইতে হইয়াছে, শেষে ফটোগ্রাফ লওয়ার সুবিধা না হইতে পারে। প্রস্তর মূর্ত্তির ফটোগ্রাফ লওয়া বড় কঠিন, —হাফ্‌টোন ছবি কিরূপ হইয়াছে, তাহা আমরা এখনও দেখি নাই।

কিছু দিন হইল শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের গৃহে টী-পার্টিতে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ষ্টেটসম্যান সম্পাদক র‍্যাটক্লিফ সাহেব, সিস্টার নিবেদিতা, সিস্টার ক্রিস্টেন প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের নিকট লক্ষ্মীমূর্ত্তিটি উপস্থিত করা হইয়াছিল। তাঁহাদের সকলেই নবীন ভাস্করের অশিক্ষিত পটুতা লক্ষ্য করিয়া বিশেষ প্রীতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই মূর্ত্তি সম্বন্ধে আমি অনেকগুলি পত্র পাইয়াছি। তাহার কয়েকখানি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন :—

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

সেদিন আমাদেব এখানে জন কয়েক বন্ধু শীতলচন্দ্র বাবুর সেই প্রস্তরনির্ম্মিত লক্ষ্মীমূর্ত্তিটি দেখিতে আসিয়াছিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়, Sister নিবেদিতা, Mr. Ratclif প্রভৃতি সকলেই অতিশয় প্রশংসা করিলেন। কিছুমাত্র শিক্ষা না পাইয়া প্রস্তরের এরূপ মূর্ত্তি গড়া যে কি কঠিন ব্যাপার, তাহা যাঁহারা একবার পাথর কাটিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন। শীতল বাবু যদি রীতিমত শিক্ষালাভ করেন, তবে তিনি আমাদের দেশীয় শিল্পের যে কি মহৎ অভাব পূর্ণ করিতে পারিবেন, তাহা আর কি লিখিব। ইতি

২রা নবেম্বর, ১৯০৪, বিনত
কলিকাতা। শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দীঘাপতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায় এম্-এ মহাশয়ের পত্র।

শ্রদ্ধাস্পদ দীনেশ বাবু,

শীতল তাহার নির্ম্মিত অপূর্ব্ব marble Statuette টি আমায় দেখাইয়াছে। যে আর্টের ক, খ, গ পর্যন্তও কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিবার সুযোগ পায় নাই, তাহার পক্ষে প্রথম উদ্যমেই এহেন দুরূহ কর্ম্ম সম্পন্ন করা যে অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় তাহা বলাই বাহুল্য। শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তর কাটিয়া ছবি বাহির করা যে কতদূর কঠিন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। একস্থানে হাতুড়ীর একটা জোরে ঘা লাগিলেই পাথর যাইয়া সকল শ্রমই বিফল হইবার সম্ভাবনা; অথচ এ কার্য্য সে প্রথম উদ্যমেই সাধন করিয়াছে! ইহা আমাদের বাঙ্গালীর পক্ষে বড় অল্প শ্লাঘার বিষয় নহে। শীতল যে শুধু মর্ম্মরে মূর্ত্তি গড়িয়াই বাহাদুরী লইবার যোগ্য হইয়াছে, তাহা নহে। সে ইহাতে design, drapery, pose, expression ও execution এর যে নমুনা দিয়াছে—তাহা ইটালীর Statue-এর ন্যায় হইয়াছে। প্রথম উদ্যমেই যেরূপ সূক্ষ্মদর্শিতা ও কৃতিত্বের

পরিচয় দিয়াছে, তাহাতে ভবিষ্যতে যে সে একজন অসামান্য শিল্পী হইতে সমর্থ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইতি।

দীঘাপতিয়া রাজবাটী, ভবদীয়
১৬২নং লোয়ার সার্কুলার রোড, শ্রীশরৎকুমার রায়।
কলিকাতা, ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯০৪

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্-এ, বি-এল মহাশয়ের পত্র।

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন
সুহৃদ্বরেষু।

শ্রীশীতলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় খোদিত প্রস্তর লক্ষ্মীমূর্ত্তি সেদিন দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম। শীতলের এই প্রথম উদ্যম শুনিলাম, সে কখনও আর্ট স্কুলে পড়ে নাই। সে এরূপ সুন্দর মূর্ত্তি কল্পনায় আনিল কিরূপে এবং পাথরে গড়িল কিরূপে? আপনারা পূর্ব্বজন্ম মানেন না? এ ব্যাপারে সমন্বয় করিবেন কি দিয়া?

ভবদীয়
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

সিস্টার নিবেদিতা (Miss Margret Noble) লিখিয়াছেন :—

Dear Mr. Sen,

In my opinion the marble statuette which you shewed us yesterday is full of promise and power. I had not expected anything half so good. For a first attempt we thought it quite remarkable. Of course Shitol Chandra Bannerjee would need to prolong his studies in clay and to give immense labour and perseverence to the work of modelling. But I think if this could be done, under fine influences, he would one day become a very important man and India needs the revival of the art of sculpture so much that he need not fear poverty if this happens. Abundance of fortune waits on such work.

Mr. Abanindranath Tagore promised me yesterday that he would give your friend the benefit of his own experience and advice and I now that Mr. Havell would be glad to do the same. As for myself I need hardly speak.

Believe me, dear Mr. Sen, with sincere com gratualtions.

17, Bose Para Lane. Yours very truly,
Bagh Bazar, Calcutta. Sister Nivedita of
Oct. 7, 1904. Ram Krishna V.

শ্রদ্ধাস্পদা শ্রীমতী নিবেদিতা শীতলচন্দ্রের শিল্পায়ন সম্বন্ধে নানারূপে চেষ্টা পাইতেছেন, তিনি শিল্পীকে স্বগৃহে আহ্বান করিয়া লইয়া যাইয়া নানা উপদেশ দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ইঁহাকে প্রস্তর কাটিবার কতকগুলি যন্ত্র কিনিয়া দিয়াছেন।

এখন শিল্পী সম্বন্ধে গোটাকতক কথা লিখিয়া প্রবন্ধের শেষ করিব।

১৮৭৯ খৃঃ অব্দে বরিশালে কীর্ত্তিপাশায় ইঁহার জন্ম হয়। অতি অল্পবয়সে শীতলচন্দ্র পিতৃমাতৃহীন হন। এখন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই ইঁহার অভিভাবক। নিতান্ত দরিদ্র অবস্থায় পড়িয়া শীতলচন্দ্র কোনরূপ শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ পান নাই। পল্লী বিদ্যালয় হইতে মাইনর পরীক্ষা পাশ করিয়া কীর্ত্তিপাশার জমিদার শ্রীযুক্ত রোহিণী বাবুর সাহায্যে ইনি কলিকাতা ক্যাম্বেল স্কুলে অধ্যয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গতবৎসর উক্ত স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বাল্যকাল হইতে শিল্প সম্বন্ধে ইঁহার যে স্বাভাবিক শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহা আশ্চর্য্য। একদা রোহিণী বাবুর পরিবারস্থ কোন মহিলার জন্য একটি বহুমূল্য হার হ্যামিল্টনের বাড়ী হইতে ক্রয় করা হয়। জিনিষটি একটি চমৎকার মরোক্কো চর্ম্মের কেসের ভিতর পূরিয়া দেওয়া হইয়াছিল। শীতল সামান্য নেকড়াই

রং ফলাইয়া কয়েক খানি পাতলা কাঠের দ্বারা সেই কেস্‌টির মত একটি কেস প্রস্তুত করিয়াছিলেন। আমি তাহা দেখিয়াছি। খুব সূক্ষ্ম ভাবে পরিদর্শন না করিলে উক্ত কেসের মধ্যে কোন তারতম্য উপলব্ধি করা যায় না। চিত্রবিদ্যায়ও ইঁহার কতকটা "অশিক্ষিত পটুত্ব" জন্মিয়াছে। মৎকৃত রামায়ণী কথা নামক পুস্তকে ইঁহার অঙ্কিত দুইখানি ছবির হাফটোন প্রদত্ত হইয়াছে। সেই ছবি দুইখানি যে খুব উৎকৃষ্ট শ্রেণীর হইয়াছে একথা বলা যায় না। কিন্তু চিত্রবিদ্যায় অশিক্ষিত প্রথম উদ্যমের পক্ষে যে তাহা ক্ষমতার নিদর্শন, তৎসম্বন্ধে বোধ হয় মতদ্বৈধ হইবে না।

কিন্তু চিত্র হইতে ভাস্করকর্ম্মেই ইঁহার হস্ত সমধিক পরিষ্কার। মোমের যে সকল পুতুলের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহাদের একটা বিশেষত্ব ছিল। সচরাচর যে মোমবাতি বাজারে পাওয়া যায় সেগুলি দীর্ঘ কিন্তু তাহাদের পরিসর অতি অল্প। শীতলচন্দ্র সেই মোমবাতি গুলিই পুতুল গড়িবার জন্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। তাহাতে মূর্ত্তিগুলির হস্ত পদাদি প্রসারণ বা কোনরূপ বিচিত্র ভঙ্গীর জন্য স্থানের সংকুলান হয় না। সুতরাং ভাস্করকে সঙ্কীণ পরিমিত স্থানের মধ্যে মূর্ত্তিগুলির আকৃতি সীমাবদ্ধ রাখিতে হইয়াছে। এতৎসত্ত্বেও শীতল মূর্ত্তির নানা রূপ অধিষ্ঠান কল্পনায় আনিয়া তাহাদের স্বাভাবিকত্ব বজায় রাখিয়াছিলেন, নানাপ্রকার আপাতঃ অসম্ভব ও আশ্চর্য্য অবয়ব কল্পনা করিয়া সঙ্কীর্ণ স্থানে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। মূর্ত্তি মননের যে স্বাধীনতা তাহাতে প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহা শ্রেষ্ঠ শিল্পীগণই দেখাইতে পারেন। দুঃখের বিষয় মোমের মূর্ত্তিগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

১৩২১ ভাদ্র

মূর্ত্তি নির্ম্মাতা

হিরণ্ময় রায়চৌধুরী

শ্রীযুক্ত হিরন্ময় রায়চৌধুরী কলিকাতায় থাকিতে মূর্ত্তিনির্ম্মাণ শিল্পে দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। লণ্ডনের রয়্যাল কলেজ অব্ আর্টস্ হইতে তিনি উহার এসোসিয়েটের (Associate of the Royal College of Arts) ডিপ্লোমা পাইয়াছেন। ভারতবাসীদের মধ্যে সম্প্রতি কেবল তিনিই এই উপাধি পাইয়াছেন। তিনি এখন ধাতুর মূর্ত্তি ঢালিতে শিখিতেছেন, ডিসেম্বর মাসে দেশে ফিরিয়া আসিবেন।

লণ্ডনের রয়্যাল একাডেমীর তক্ষণ-বিভাগে শ্রীযুক্ত এফ্, এম্, (ফণীন্দ্রমোহন?) বসু নির্ম্মিত একটি "ক্রিস্ট বালকে"র ক্ষুদ্র ধাতব মূর্ত্তি দর্শকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। এই সংবাদটি মান্দ্রাজের দৈনিক নিউ ইণ্ডিয়ায় বাহির হইয়াছে। তাহাতে শিল্পীর কোন পরিচয় নাই।

১৩৩৩ ফাল্গুন

ভাস্কর দেবীপ্রসাদ

ভারতীয় শিল্পকলার আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যই ভারতীয় শিল্পের শ্রেষ্ঠ গৌরব। ইহা যে শুধু ভারতের শিল্পেরই বিশেষত্ব এমন নহে। পৃথিবীর সকল দেশেই দেখা যায় যে, মানুষের সৌন্দর্য্য-সৃজনের প্রচেষ্টা স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের ভিতর দিয়া যতটা অভিব্যক্ত হয়, আর কোন উপায়ে ততটা হয় না। এইজন্য ভারতীয় শিল্পের বর্ত্তমান যুগে আমরা শিল্পীদিগকে চিত্র অঙ্কনের দিকেই সকল আগ্রহ ঢালিয়া দিতে দেখিয়া কিছু আশঙ্কান্বিত হইয়া উঠিতেছিলাম। এই ভয় আমাদের হইতেছিল যে, যেমন বর্ত্তমান সাহিত্যে যাহা মহান্ ও অশেষ ধৈর্য্য ও প্রতিভার ফল, তাহার স্থান ক্ষণিকের আবেগ ও চেষ্টার ফল চুটকি লেখার দ্বারা পূর্ণ হইতেছে; তেম্‌নি বুঝি শিল্পেও আমরা স্থাপত্যের বিশালতা ও ভাস্কর্যের কঠিন তপস্যার পথ ছাড়িয়া দিয়া শুধু পটাঙ্কনের জলবিন্দু দিয়া জাতীয় প্রাণের প্রবল সৌন্দর্য্য পিপাসার নিবৃত্তির চেষ্টা করিব। কিন্তু, সৌভাগ্যের বিষয় যে, বর্ত্তমানে আমাদের জাতির ক্ষুদ্র ও সহজের প্রতি যে চির অবজ্ঞার ভাব তাহা আবার জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে। মাঝে মাঝে দেখিতেছি কোন কোন শিল্পী নিজ অন্তরের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিবার জন্য প্রাসাদ-তোরণ কিম্বা মূর্ত্তিগঠনের পথ অবলম্বন করিতেছেন। ইহা জাতীয় প্রাণশক্তির পূর্ণ জাগরণের পূর্ব্বাভাস বলিয়াই আমরা আনন্দ বোধ করিতেছি।

ভাস্কর্য্যে বর্ত্তমানে শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী বিশেষ প্রতিভা দেখাইতেছেন। তাঁহারা দ্বারা গঠিত একটি মূর্ত্তি এই বৎসর গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের এক্‌জিবিশনে প্রথম পুরস্কার লাভ করিয়াছে। মূর্ত্তি-গঠনে দেবীপ্রসাদের শিল্প-চাতুর্য্য ইয়োরোপের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদিগের সমান এবং সমালোচকগণ তাঁহার হস্তগঠিত মূর্ত্তির সহিত কোন কোন ইউরোপীয় মহাশিল্পীর রচনার তুলনা করিয়া দেবীপ্রসাদকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। একদিকে যেমন তাঁহার শিল্পে মৃত্তিকাকে জীবন্তের অনুকরণে প্রাণবান করিয়া তুলিবার অসাধারণ ক্ষমতা দেখা যায় অপর দিকে তেমনি সেই মূর্ত্তির মধ্যে পাওয়া যায় শিল্পীর সকল কিছুকে নূতন ও সুন্দর করিয়া দেখিবার শক্তির পরিচয়। যাহার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ তাহার চক্ষে যদি অকস্মাৎ উপযুক্ত রকম চশমা পরাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সে যেমন চতুর্দ্দিকের পৃথিবীকে নূতন চক্ষে দেখিয়া পুলকিত হইয়া উঠে, অথচ বুঝিতে পারে যে, সে যাহা দেখিতেছে তাহা সত্যই কল্পনা নহে; দেবীপ্রসাদের শিল্পের ভিতর দিয়া বাস্তবকে নূতন করিয়া দেখিয়া আমরাও সেইরূপ বুঝিতে পারি যে, আমরা এতদিন সৌন্দর্য্য দেখিতে শিখি নাই। শুধু দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও অবয়বের আকৃতি ব্যতীতও সূক্ষ্মতর আর কিছু আছে যাহা বাস্তবকে সৌন্দর্য্য দান করে। সেই অজানা "আর- কিছু"কে ধরিয়া মূর্ত্তি বা চিত্রে যে বাঁধিয়া ফেলিতে পারে সেই শিল্পী। দেবীপ্রসাদ শিল্পী।

১৩৩৫ পৌষ

ভারতীয় স্থপতি-বিদ্যা

শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় সিন্ধুদেশে মোহেন্-জো-দড়ো নামক স্থানে প্রাচীন এক সহর আবিষ্কার করায় জানা গিয়াছে, যে, পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বেও ভারতবর্ষে পাকা ঘরবাড়ী ছিল এবং স্থাপত্যের উন্নতি হইয়াছিল। তাহার অনেক পর হইতে, আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতে যে, ভারতের নানা প্রদেশে নানা প্রকারের স্থাপত্যরীতি এপর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে, তাহা খুব জানা কথা। যত প্রকার প্রয়োজনের যত রকম ঘরবাড়ীর সেকালে দরকার হইত, আমাদের দেশী মিস্ত্রীরা তাহা নির্ম্মাণ করিতে পারিত। এখনকার নূতন প্রয়োজনের জন্য যদি নূতন কোন রকম ইমারতের দরকার হয় তাও তারা বানাইতে না পারে এমন নয়। তথাপি বিদেশীর রাজত্বে বিদেশী প্রভাবে এমন সব ঘরবাড়ী নির্ম্মিত হইতেছে, যা মোটেই দেশী রীতির অনুযায়ী নয়—কতকগুলা ত এমন, যে, সেগুলোকে কোন রীতিরই অনুযায়ী বলা চলে না।

মানুষ যে-রকম বাড়ীতে থাকে, যে প্রকার গ্রামে সহরে পরিবেষ্টনের মধ্যে থাকে, তাহার প্রভাব তাহার মনের উপর পড়ে। এই জন্য স্থাপত্য-রীতিটা একটা বাজে জিনিষ নয়, কেবল সৌন্দর্য্য-অসৌন্দর্য্য, সৌখীনতা-অসৌখীনতার, ব্যাপারও নয়। তা ছাড়া, স্থাপত্যের উত্থানপতন উৎকর্ষ-অপকর্ষ অন্য সব শিল্প ও কলার উত্থানপতন উন্নতি অবনতির সহিত জড়িত। ভাস্কর্য্যে চিত্রাঙ্কন দারুশিল্প প্রভৃতির সহিত ইহার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। এই সব কারণে আমাদের দেশে স্থাপত্যের উন্নতির প্রয়োজন।

তাহার অর্থ এ নয়, যে, প্রাচীন যাহা ছিল, হুবহু ঠিক্ তাহার নকল করিতে হইবে। চিত্রবিদ্যাটিকে ঠিক্ দেশী করিবার জন্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নন্দলাল বসু প্রমুখ তাঁহার শিষ্যেরা এবং গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে প্রাচীনের নকলই করিয়াছেন, তা নয়। প্রাচীন তাঁহাদিগকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে, প্রেরণা দিয়াছে, উৎসাহ ভরসা দিয়াছে; কিন্তু তাঁহারা দেশী প্রাণ লইয়া নূতন চোখে দেখিয়া যাহা আঁকিবার তাহা আঁকিয়াছেন। সময় ও অবস্থা বদলাইয়াছে, দেশ বদলাইয়াছে: সুতরাং ঠিক্ প্রাচীনের পুনরাবির্ভাব অসম্ভব। কিন্তু প্রাচীনের সঙ্গে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব ও আবশ্যক।

স্থাপত্যেও এইরূপ চেষ্টা করিতে হইবে। বাংলা দেশে শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই চেষ্টা করিতেছেন। বাংলা দেশের বাহিরেও বাঙালীর দ্বারা যে এ চেষ্টা হইতেছে, তাহার কিছু বৃত্তান্ত আমরা পরে দিব। এখানে বলিতে সুখ বোধ হইতেছে, যে, বাগবাজারে নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়টি প্রধানতঃ যাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে নির্ম্মিত হইয়াছে তিনি স্থাপত্যব্যবসায়ী না হইলেও একটি সুন্দর খাঁটি দেশী জিনিষ তিনি রচনা করাইয়াছেন।

আমাদের এঞ্জিনীয়ারিং স্কুলকলেজগুলিতে স্থাপত্য শিখান হয় না। যদি হইত, তাহা হইলেও বোধ করি বিদেশী কিছু শিখান হইত, যেমন সরকারী আর্ট স্কুলগুলিতে অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া পাশ্চাত্য রেখা টানা ও রং দেওয়া শিখান হইয়া আসিতেছিল। এখন দেশের লোককেই দেশী স্থাপত্য শিখাইবার প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালন করিতে হইবে, দেশী স্থপতি ও রাজমিস্ত্রীদিগকে

দেশী রীতিতে অট্টালিকা নির্ম্মাণে উৎসাহ দিতে হইবে। কেহ কেহ উৎসাহ দিতেছেনও। কেবল ধনীরাই যে ইহা করিতে পারেন, এমন নয়। দেশী রীতিতে বাড়ী করিতে খরচ বেশী হয়, ইহা একটা ভুল ধারণা। মধ্যবিত্ত লোকেরাও দেশী ধরণের বাড়ী নির্ম্মাণের করাইতে পারেন।

১৩১০ ভাদ্র

পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

কপিলবস্তু ও পাটলিপুত্রের আবিষ্কর্ত্তা প্রত্নতত্ত্ববিৎ পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় গত ১৮ই শ্রাবণ রক্তামাশয় রোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার জীবনচরিত্র সম্বন্ধে তিনি গত জুন মাসে আমাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে তাঁহার জীবনের প্রধান প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যায়। তিনি এখন পরলোকে;সুতরাং এই পত্রখানি অবাধে মুদ্রিত করিতে পারা যায়।

পাণিহাটী
১৪ই জুন, ১৯০৩।

সুপ্রিয় রামানন্দ বাবু মহাশয়,

আমাকে ক্ষমা করিবেন; আমি ঠিক সময়ে আমার জীবন-চরিত লিখিতে পারি নাই। কারণ আমার অবকাশ অতি অল্প, বিশেষতঃ, আমার জীবনে কিছুই অসাধারণ নাই।

আমার বয়স প্রায় পঞ্চাশ হইবে। ছেলেবেলা আমি নাকি বড় দুরন্ত ছিলাম। যতদূর মনে পড়ে, আমি বড় খেলায় মত্ত থাকিতাম। লেখাপড়ার দিকে বড় মন যাইত না। সুতরাং বিদ্যালয়ে বড় পুরস্কার পাই নাই।

তবে আমার মনে ঝোঁক কোন কোন বিষয়ে বড়ই হইত। ইতিহাস, ভূগোল ও মানচিত্রে আমাকে কেহ পরাস্ত করিতে পারে নাই, এবং যীশুখৃষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তকেও আমি পুরস্কার পাইতাম। আমি আগড়পাড়ায় বিবির (খৃষ্টীয়) বিদ্যালয়ে পড়িয়াছিলাম। তথা ১৮৬৭ খৃস্টাব্দে প্রবেশিকা (Entrance) শ্রেণীতে না উঠাইয়া দেওয়ায় আমি পিতামাতার অজ্ঞাতে সোদপুর-বিদ্যালয়ে পড়ি; এবং যদিও আমি বড় ভাল বিদ্যার্থী ছিলাম না, এবং শিক্ষকেরা যত্ন করিতেন না, তথাপি আমিই সকল ভাল ছেলেদিগকে পাছে রাখিয়া একক প্রবেশিকা-পরীক্ষায় ১৮৬৮ বৎসরে উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম। তৎপর বৎসরে মেডিক্যালকলেজে ডাক্তারী পড়িতে যাই। কিন্তু পিতার দুঃসময় হওয়াতে আমাকে ক্ষান্ত হইতে হইল।

তারপর যে সময় বসিয়াছিলাম, তখন বাঙ্গলা ভাষা নিজ চেষ্টায় শিক্ষা করি,—তাহাতে পূর্ব্বে একান্ত কাঁচা ছিলাম,—এবং পদ্য রচনা করিতে শিখি। ক্রমে ক্রমে গদ্য-পদ্যে নাটকাদিও লিখিতে আরম্ভ করিলাম।

পর বৎসরে লক্ষ্ণৌয়ে যাই, এবং ক্যানিং কলেজে পুনরায় পড়িতে আরম্ভ করি। ইতি পূর্ব্বে Epic poemএ (বীর-কাব্যে) আমার মন বড় আকৃষ্ট হইয়াছিল; এবং ভারতবর্ষের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা দেখিয়া আমি এক ওজস্বী বীরকাব্য রচনা করিতে আরম্ভ করি। প্রথম সর্গ শেষ হয়, ও ছাপাই; ও দ্বিতীয় সর্গ কতকটা লিখি। এমন সময়ে বঙ্গীয় সম্পাদক-মহাশয়েরা আমার এই নূতন সৃষ্টি দেখিয়া

এরূপ কড়া নজরে চাহিলেন যে, আমাকে সে বিষয়ে নিরস্ত হইতে হইল। যদিও আমি তাহাতে ভয় পাই নাই,—কিন্তু আমার জীবনের স্রোত অন্য দিকে যাইল।

প্রথমতঃ আমার পিতার অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল। দ্বিতীয়তঃ, আমার দৃষ্টি লক্ষ্ণৌয়ের নবাবী বা বাদ্‌শাহী তত্ত্বে আকৃস্ট হইল। কারণ আমি দেখিলাম যে আমাদের দেশের শিল্পকার্য্য একবারে লুপ্ত হইতেছে, এবং লক্ষ্ণৌয়ের অট্টালিকা অধিকাংশ সেই সময়ে ধ্বংস পাইতে ছিল। এই কারণে আমি Pictorial Lucknow, History, People and Architecture লিখি। সেই জন্যই আমি চিত্র লিখিতে শিখি। ইতিপূর্ব্বে আমি এফ এ, উত্তীর্ণ ও বি এ, পরীক্ষায় ১৮৭৩ সালে ফেল হই।

তখন আমার বড়ই দুর্দ্দশা হইয়াছিল। যাহা হউক, আমার লক্ষ্ণৌ-পুস্তক দেখিয়া অনেক সাহেবেরা আমার প্রতি অসন্তোষের সহিত খুসী হইয়াছিল। অসন্তোষের কারণ এই, যে আমি লক্ষ্ণৌয়ের বাদ্‌শাদেব প্রতি কোম্পানিবাহাদুরের অসদ্‌ব্যবহারের বিষয়ে কিছু কিছু বড় সাহেবদের বিরোধী মত উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। যাহা হউক, এক সাহেব আমাকে একটি যৎসামান্য চাকরি দিলেন এবং ১৮৮২ বা ৮৩ সালে তখনকার ছোটলাট সাহেব সার্ আলফেড্ লায়েল আমাকে Government Arehaeologist অর্থাৎ সরকারী পুরাতত্ত্বানুসন্ধাতা করেন। সেই সময় হইতে ভারতবর্ষীয় পুরাতত্ত্বে আকৃষ্ট হই। উক্ত লাট সাহেব আমার কার্য্যে বিশেষ খুসী ছিলেন; কিন্তু আমার লক্ষ্ণৌ পুস্তক প্রকাশ সম্বন্ধে বলেন যে, You Bengalees have a smack (?) for writing seditions things; if you publish the book, I wont prosecute you, but then I wont employ you". সেজন্য আমার pictorial Lucknow প্রকাশিত হয় নাই।

এদিকে কনিংহাম সাহেব রাজকার্য্য হইতে অবসর লওয়াতে ১৮৮৫ সালে পুরাতত্ত্ব বিভাগের পুনঃ গঠন হয়। তাহাতে আমার এক বড় চাকরির জন্য ছোটলাট সুপারিষ করেন। কিন্তু সাদা চামড়া না থাকাতে তাহা হয় নাই; এবং যে সাহেব (ডাক্তার ফুহরার) আমার প্রাপ্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইল, এবং যাহার সহকারী আমি হইয়াছিলাম সে আমাকে চাকরিচ্যুত করিতে চেস্টা করিল। সেই জন্য আমি P W. Department-এ (পূর্ত্তবিভাগে) ফিরিয়া যাই। তখন আমি ঝান্সীতে যাই, এবং ললিতপুর আদি স্থানে পুরাতত্ত্ব আবিষ্কার করি। তাহার ফল এক বৃহৎ Report and Protfolio of Drawings। Sir A P. Macdonell-এর আজ্ঞায় যাহা গবর্ণমেন্ট ১৮৯৯ সনে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছেন।

পুনরায় আমার চাকরি উক্ত ডাক্তারের পরামর্শে যায়। তখন সার্ চার্লস এলিয়ট বঙ্গের ছোটলাট, আমাকে কলিকাতায় আনেন, এবং বঙ্গীয় পুরাতত্ত্বাধ্যক্ষ করেন। তাঁহার আমলে আমি মগধ, মিথিলা, এবং উড়িষ্যায় প্রত্ন-তত্ত্ব অনুসন্ধান করি। প্রথমে আমার কার্য্যে প্রশংসা হয়; আমি Archaeological gallery of the Imperial museum দ্বিগুণ করি। কিন্তু কিছুকাল পরে আমার স্বাধীন তত্ত্ব ও ভাব দেখিয়া নীচেকার সাহেবেরা আমার বিরোধী হয়। তজ্জন্য আমার Behar and Orissa Reports and drawings ছাপা হয় নাই, এবং শেষে আমার আবার কর্ম্ম যায়। আবার অবিচারের কথা শুনুন—আমাকে প্রায় এক বৎসর বিনা বেতনে কার্য্য করিতে হইয়াছিল। ১৮৮৬ সালে P. W. D. Secreatariat যে চাকরি পাইলে আমি বুন্দেলখণ্ডে পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধান করি। তখন ঝান্সীতে ওয়ার্ড (ward) সাহেব কমিশনার ছিলেন, তিনি নেটিভ দিগের সহিত সদ্‌ব্যবহার করিতেন। তিনি বুন্দেলখণ্ডীয় রাজাদের অট্টালিকার গঠন দেখিয়া তদনুকরণে আমাকে স্থানীয় বিদ্যালয়ের Design করিতে বলেন। আমার নক্সা (design) দেখিয়া অনেকে খুসী হইয়াছিলেন। আর হার্ডি সাহেব, তথাকার কলেক্টর মাজিস্ট্রেট, আমা দ্বারা ঝান্সি হাঁসপাতালের নক্সা করান।

১৮৮৭-৮ সালে আমি বুন্দেলখণ্ডে চান্দেলীয়

পুরাতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া ছবি সহ দুইটি বড় রিপোর্ট লিখি। তাহা ১৮৯৯ সালে সার্ আন্টনী ম্যাকডনেলের আদেশে ছাপা হয়। তাহার পরে আগ্রায় যাই। এখানে চাকরি যায়।

তখন সার্ চার্লশ এলিয়ট, বঙ্গীয় লাট সাহেব, আমাকে কলিকাতায় আনাইয়া যাদুঘরে (museum-এ) পুরাতত্ত্বাধ্যক্ষ করেন। ১৮৯১-৪ পর্য্যন্ত বিহার ও উড়িষ্যার পুরাতত্ত্ব করি। পরে ১৮৯৭-৮ সালে পাটনায় গিয়া প্রাচীন পাটলিপুত্র অনুসন্ধানে অনেক খনন ও আবিষ্কার করি। পাটলিপুত্র রিপোর্টও গবর্ণমেন্ট ছাপে।

পরে ডাক্তার ফুহরার কর্ম্মচ্যুত হইলে তাহার পদে আমি ১৮৯৯ সালে লক্ষ্ণৌ যাই। আমাকে কপিলবস্তু আদি আবিষ্কার করিতে নেপাল-তরাইয়ে পাঠান হয়। গোরক্ষপুরের উত্তরে তলিবার উত্তরে তিলোরা কোটে আমি কপিলবস্তুর স্থির নির্ণয় করি। অনেক খনন করিয়া ও আবিষ্কার করি। পরে রুমিনদেই নামক স্থানে বুদ্ধদেবের জন্মস্থানের অনুসন্ধান পাই। পর বৎসর ভারত গবর্ণমেন্ট আমার নেপাল রিপোর্ট সচিত্র ছাপায়। তাহাতে আমার নাম বিলাত পর্য্যন্ত হইয়াছে।

পরে আমি বঙ্গীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগে কর্ম্ম পাই। তথা হইতে গত বৎসরে সিমলা লাহোর আদিতে গিয়াছিলাম। এখনো বঙ্গীয় কর্ম্মে আছি এবং বিহার, বঙ্গ, উড়িষ্যা ও আসামে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। সাধারণ ভাবে পুরাতত্ত্ব করিতেছি।

পাটলিপুত্র রিপোর্ট লিখিবার সময়ে অশোক-সম্রাট-বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করিতে হইয়াছিল। তদ্দ্বারায় জানিলাম যে ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা মহা ভুল। অশোকের সময় ২৭০ বৎসর খৃষ্টাব্দ পূর্ব্বে নহে—তাহা ৩২৫ বৎসর। এবং মৌর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত গ্রীকদের Sandracottus নহে। অশোকই Sandracottus ছিলেন। এবিষয়ে এক পুস্তক লক্ষ্ণৌয়ে মুদ্রাঙ্কিত করি এবং এক্ষণে পুনরায় লিখিতেছি। অধ্যাপক রীস্ ডেভিডস এ বিষয়ে আমার প্রশংসা করিয়াছেন।

যদিও সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেট আদি পুরাতত্ত্ববিভাগে দেশীয় পুরাতত্ত্ববিদ্দিগকে কর্ম্ম দিতে আদেশ করিয়াছেন, তথাপি আমরা ভাল কর্ম্ম পাইতেছি না। সেই কারণে এক্ষণে আমার আবিষ্কারের পথ বন্ধ হইয়াছে।

সাহেবী রাজত্বে ইয়োরোপীয় মহামূর্খও মহা পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইয়াছে এবং কার্য্য করিতেছে। ডাক্তার ফুহরারের বিদ্যাহীনতা গবর্ণমেণ্টকে জানিতে ১৫ বৎসর লাগিয়াছিল। বোধ হয় আরো ১৫ বৎসরে গবর্ণমেণ্ট আমার উক্ত বচন মানিবেন।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

১৪-৬-০৩।

এলাহাবাদের প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রথমে পত্রদ্বারা আমাকে পূর্ণবাবুর সহিত পরিচিত করিয়া দেন। পূর্ণবাবু সম্পর্কে অবিনাশবাবুর ভ্রাতা হইতেন। এলাহাবাদ কিছুদিন পূর্ণবাবুর কার্য্যের হেডকোয়াটার ছিল। তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমার সাউথরোডের বাসায় আমার সহিত দেখা করিতে আসেন। স্বনামধন্য আবিষ্কর্ত্তার শুনিলেই আমাদের কেমন একটা জাঁকাল চেহারা দেখিবার আশা হয়। বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, একটি অতি সাদাসিদে, খর্ব্বকায়, দীর্ঘশিখাধারী (কারণ তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন), প্রৌঢ় ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। পূর্ণবাবু দেখিতে শুষ্ক ও শীর্ণ ছিলেন। খুব ঝাঁঝাল ও স্বাধীনচেতা লোক ছিলেন। বিধাতা তাঁহাকে চাকরীর জন্য গড়েন নাই। তিনি বাহিরে দেখিতে শুষ্ক ও প্রকৃতিতে ঝাঁঝাল ছিলেন বটে, কিন্তু বাস্তবিক সুরসিক, সরস প্রকৃতির লোক ছিলেন। সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন; যখন অন্য কাজে নিযুক্ত থাকিতেন, তখনও প্রায়ই একটানা একটা গান বা সুর আলাপ

করিতেন। কোন অট্টালিকা বা অন্যকোন ছোট বা বড় জিনিষ দেখিয়া সহজেই অতিশীঘ্র তাহার যথাযথ চিত্র আঁকিতে পারিতেন। আমরা যখন গতবৎসর রাফেএলের "মাতৃদেবী মূৰ্ত্তি" প্রকাশ করি, তখন পূর্ণবাবু অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন; বলিয়াছিলেন, "চিত্রখানি ঠিক্ সজীব।" তিনি হিন্দু ছিলেন; কিন্তু খৃষ্টীয় চিত্র বলিয়া অনাদর করেন নাই; কারণ তিনি কলারসজ্ঞ, সুতরাং জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে চিত্রসৌন্দর্য্য উপভোগে সমর্থ ছিলেন।

তাঁহার পত্রে লক্ষ্ণৌবিষয়ক একটি পুস্তকের উল্লেখ আছে। উহা মুদ্রিত হইয়াছিল, কিন্তু পত্রে উল্লিখিত কারণবশতঃ প্রকাশিত হয় নাই। উহার একখণ্ড আমার নিকট আছে। পুস্তকখানি উৎকৃষ্ট ও চিত্তাকর্ষক; বৃহৎ ২৫০ পৃষ্ঠা পরিমিত। উহাতে এমন বিস্তর তথ্য আছে, যাহা অন্য কোন পুস্তকে নাই: এরূপ অনেক ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত আছে, যাহা সাধারণের অপরিজ্ঞাত, ও অনেক দুর্লভ পুস্তক ও সরকারী কাগজপত্র হইতে সংগৃহীত। ইহা তিনভাগে বিভক্ত, যথা—রাজনৈতিক ইতিহাস, জাতিতত্ত্ব (Ethnology) এবং স্থাপত্য। প্রথমভাগে মুসলমান ও ইংরাজ শাসনকালের বৃত্তান্ত আছে। ইংরাজেরা অযোধ্যা দখল করিয়া অন্যায় কবিয়াছিলেন কিনা, তাহা এই অংশ পড়িলে বুঝা যাইবে। দ্বিতীয়ভাগে পুরাতন লক্ষ্ণৌনিবাসী হিন্দু ও মুসলমানদিগের সামাজিক ও পারিবারিক জীবন, চরিত্র, শিক্ষা, নরনারীর পরিচ্ছদ, পৰ্ব্ব, রঙ্গ তামাসা, শিল্প, কলা, প্রভৃতির বৃত্তান্ত আছে; বেগমদিগের জীবনের বর্ণনা আছে। তৃতীয়ভাগে লক্ষ্ণৌয়ের হর্ম্ম্যাদির পুরাতত্ত্ব, স্থাপত্য এবং সমুদয় প্রাসাদ, সমাধিমন্দির ও উদ্যানের বিবরণ আছে। তদ্ভিন্ন পূর্ণবাবুর অঙ্কিত নিম্নলিখিত চিত্রগুলি আছে :— সাদতখাঁ হইতে ওয়াজিদ্ আলি শাহ পর্য্যন্ত দশজন অযোধ্যার নবাব উজিরের ছবি, সাদতআলি খাঁ ও কর্ণেল জন বেলীর একত্র চা-পান, মহম্মদ আলি শাহ, জেনারেল আউট্রাম, কৈসরবাগ-লুণ্ঠন (মার্চ্চ, ১৮৫৮), প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স (বৰ্ত্তমান সম্রাট এডওয়ার্ড) কর্ত্তৃক লক্ষ্ণৌয়ের অবসরপ্রাপ্ত সৈন্যগণের অভিনন্দন, গুলির আড্ডা ও গুলিখোরদের নেশার ভিন্নভিন্ন অবস্থা, পূর্ব্বেকার বিচার, বেগমের চুলবাঁধা, বেগমের পানসাজা, বেগমদিগের সম্মুখে ডোমনীদের গীতবাদ্য, বিদ্যুতের আলোকে প্রণয়ী-যুগলের মিলন, নবাবসাহেবের সম্মুখে নাচ। এই পুস্তকখানি এক্ষণে প্রকাশিত হইলে ভাল হয়।

পূর্ণবাবু তরুণবয়সে যে "বীরকাব্য" রচনা করিয়া একসর্গ ছাপাইয়াছিলেন, তাহার নাম "ভারতীয়ম্।" উহা ১৮৭৫ সালে ছাপা হয়। উহা সংস্কৃত কবিতার মত লঘুগুরু উচ্চারণ করিয়া পঠিতব্য। উহার কীটদষ্ট এক খণ্ড পূর্ণবাবু আমাকে উপহার দিয়াছিলেন। বিদেশী শত্রুর আক্রমণ হইতে স্বদেশ রক্ষার জন্য যেখানে এক বীর সৈনিকদিগকে উৎসাহিত করিতেছেন, আমরা সেইস্থানটি নমুনাস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"চল, মম সঙ্গে চল," কহে বীরেন্দ্র গম্ভীরে,
এস, বীরবৃন্দ এস,—শত্রু দেখিব কীদৃশ;
অদৃষ্টে যা আছে, হবে,—মৃত্যু আলিঙ্গিব সুখে,
যদা মাতৃভূমি হায় কবলিত শত্রুগ্রাসে;
জননীর ঋণ শুধি মারিব; মরিব নহে।
কি কার্য্য বহিয়া আর দেহভার মাংসপিণ্ড,
যদা স্বাধীনতা যায়, আসে দাসত্বশৃঙ্খল!
কি লাভ সহিয়া বল ওহে পরের প্রভুত্ব,
যদা মনঃ, ধৰ্ম্ম, রাজ্য, বিদেশীর পদানত,
ইচ্ছাহীন যন্ত্র হয়ে তারে তুষিতে সেবিতে?
কি সুখ বাঁচিয়া আর, আমাদের ভোগ্য সৰ্ব্ব

অপরে ভুঞ্জিবে যবে,—খাব আমরা উচ্ছিষ্ট,
মনুষ্যত্ব হারাইয়া,—মনস্ফূর্ত্তি না রহিবে?
নহে কি সকলি নষ্ট, যবে হব পরাধীন?
জন্ম আমাদের নহে পর-শৃঙ্খল বহিতে;—
জগতে মোদের আসা নহে করিতে দাসত্ব;—
স্বধর্ম্ম সেবিতে কিন্তু থাকি সংসারে স্বাধীন।
অতএব ভ্রাতৃবৃন্দ এস এস ত্বরা সবে;
দাসত্ব অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ শত শত গুণে।"

এই বক্তৃতায় পূর্ণবাবুর স্বাধীন প্রকৃতির সুস্পষ্ট প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। লঘুগুরু ভেদ করিয়া পড়িলে এই বীরভাবপূর্ণ পংক্তিগুলি বেশ ওজস্বী বলিয়া প্রতীত হইবে।

গত বৎসরের প্রবাসীতে পূর্ণবাবু একটি ক্ষুদ্র সচিত্র প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সময়াভাবে ও বাঙ্গালালেখার অভ্যাস লুপ্ত হওয়ায় আর লিখিতে পারেন নাই। গতবৎসর প্রবাসীতে তাঁহার কপিলবস্তু আবিষ্কার সম্বন্ধে একটি সচিত্র প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। বিখ্যাত ঐতিহাসিক লেখক বাবু অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় উহার লেখক। চিত্রগুলি পূর্ণবাবুর গৃহীত ফোটোগ্রাফ হইতে প্রস্তুত হইয়াছিল। অক্ষয়বাবু এসম্বন্ধে আরও অনেক প্রবন্ধ লিখিবেন বলিয়াছিলেন। পূর্ণবাবু আমাকে কপিলবস্তুর অনেক ফোটোগ্রাফ দিয়াছিলেন। তাহার অধিকাংশ অক্ষয়বাবুর নিকট এখনও পড়িয়া রহিয়াছে। অক্ষয়বাবু পূর্ণবাবুর "পাটলিপুত্র" সম্বন্ধেও একটি প্রবন্ধ গতবৎসর লিখিয়াছিলেন এবং আরও লিখিবেন বলিয়াছিলেন।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় অনেক প্রাচীন মুদ্রা, অলঙ্কার, মৃণ্ময় ও প্রস্তরমূর্ত্তি, প্রভৃতি নানাবিধ পুরাতত্ত্বসম্বন্ধীয় সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল গবর্ণমেন্ট উপযুক্ত মূল্য দিয়া গ্রহণ করিলে মিউজিয়মের লাভ হয় এবং তাঁহার পুত্রদ্বয়ও উপকৃত হন। পুরাতন দ্রব্য চিনিয়া সংগ্রহ করিবার তাঁহার অসামান্য ক্ষমতা ছিল। গত বৎসর এলাহাবাদে থাকিতে তিনি কেবলমাত্র কয়েক দিনের জন্য প্রাচীন কৌশাম্বীর ধ্বংসাবশেষে গিয়া বিস্তর অতি প্রাচীন তাম্র ও রৌপ্যমুদ্রা, স্ফটিকের মালা ও অলঙ্কার, মৃণ্ময় ও প্রস্তরমূর্ত্তি, ক্ষুদ্র মৃণ্ময়মূর্ত্তি প্রস্তুত করিবার প্রস্তরে খোদিত ছাঁচ, প্রভৃতি লইয়া আসেন। তিনি আরও কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিলে এই সকল সম্বন্ধে সচিত্র প্রবন্ধ প্রবাসীতে প্রকাশিত করিতে পারিতাম। আমাকে ফোটোগ্রাফ লইতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু প্রাচীন মুদ্রাদির ফোটোগ্রাফ লওয়া সহজ নহে বলিয়া আমি ও কাজে হাত দিতে সাহস করি নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে আমাকে লিখিয়াছিলেন, আসাম যাইতেছি, প্রবাসীর জন্য নূতন নূতন ফোটোগ্রাফ পাঠাইব।

দারিদ্র্যের সহিত, রাজপুরুষদের অবিচারের সহিত সংগ্রাম করিয়া তিনি এখন শান্তিলাভ করিয়াছেন। তিনি তেজস্বিতা ও স্বাধীনচিত্ততার জন্য পুনঃ পুনঃ কর্ম্মচ্যুত হইয়াও যে বারবার কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার অসামান্য যোগ্যতা ও কর্ম্মিষ্ঠতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। দুঃখের বিষয়, গবর্ণমেন্ট ত তাঁহার গুণের যথোচিত আদর করেন নাই; আমরা তদপেক্ষাও কম করিয়াছি। বলিতে কি কত নগণ্য লোকের মৃত্যুর পর আমাদের খবরের কাগজসমূহে জীবনচরিত বাহির হয়; কিন্তু তাঁহার সমসাময়িকগণের মধ্যে অদ্বিতীয় ভারতবাসী পুরাতত্ত্বানুসন্ধাতা পূর্ণবাবুর সম্বন্ধে তাহা হয় নাই।

১৩৩১ পৌষ

ভারতবর্ষীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব

[রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও দয়ারাম সহ্নীর আবিষ্কার]

কোন দরিদ্র, নিরক্ষর, অনশনক্লিষ্ট ব্যাধিগ্রস্ত, ভগ্ন কুটীরবাসী, প্রায়-নগ্ন মানুষ যদি তাহার ধনী বিদ্বান্ সুপুষ্ট, সুস্থ, অট্টালিকাবাসী, সুন্দরপরিচ্ছদপরিহিত পূর্ব্বপুরুষের অস্তিত্বের প্রমাণ পায়, তাহা হইলে তাহার দ্বারা তাঁহার বর্ত্তমান দুর্দ্দশা দূর হয় না। এইজন্য প্রত্যেক মানুষ ও প্রত্যেক জাতি প্রধানতঃ নিজ-নিজ বর্ত্তমান অবস্থার চিন্তাই অধিক-পরিমাণে করিয়া থাকে। কিন্তু তাহা হইলেও অতীত ইতিহাস জানিবার ইচ্ছা স্বাভাবিক এবং কৌতূহল-পরিতৃপ্তিতেই ইতিহাসের সার্থকতা শেষ হয় না। এবিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা না করিয়া এই একটা কথা বলিলেই এখানে চলিবে, যে, যদি কোন দুর্দ্দশাগ্রস্ত জাতি দেখে, যে, তাহাদেরই দেশে বহু প্রাচীনকালে সভ্যতা ও সমৃদ্ধি ছিল, তাহা হইলে তাহাদের মনে এই বিশ্বাস জন্মে, যে, তাহাদের দুর্দ্দশা মাটির দোষে, জলবাবুর দোষে বা বংশের দোষে ঘটে নাই, অন্যান্য কারণে ঘটিয়াছে; সুতরাং প্রতিকার হইতে পারে। এইপ্রকারে জাতীয় নৈরাশ্য ও অবসাদের পরিবর্ত্তে আশা ও উদ্যমের আবির্ভাব হইতে পারে।

ইতিহাস-চর্চ্চার পণ্ডিতজনের বোধ্য ও আলোচ্য অন্যান্য প্রয়োজন ও উপকারিতার বিষয় বিবেচনা না করিয়া শুধু উল্লিখিত কারণেই আমাদের ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা সম্বন্ধে কৌতূহল থাকিতে পারে। ঐ সভ্যতা আর্য্য, কিম্বা দ্রাবিড়, কিম্বা উভয়ের সংমিশ্রণজাত, অথবা আরও অন্যবিধ কোন সভ্যতার মিশ্রণ তাহার সহিত হইয়াছে, তাহাতে আমাদের বক্ষ্যমাণ উদ্দেশ্য সাধনে ব্যাঘাত জন্মিবে না। আমরা ভারতীয়, এবং পূর্ব্বের যাঁহারা এদেশে ছিলেন তাঁহারাও ভারতীয়; আমরা তাঁহাদের সকলেরই উত্তরাধিকারী। ইহা জানাই আমাদের পক্ষে আপাততঃ যথেষ্ট।

এত দিন ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার বয়স সম্বন্ধে ইউরোপীয় এবং তাঁহাদের অনুচর ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিকেরা যেরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া আসিতেছিলেন, সিন্ধুদেশে মোহেঞ্জদড়ো নামক স্থানে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এবং পঞ্জাবের হারাপ্পা নামক স্থানে রায়বাহাদুর দয়ারাম সহ্নী মহাশয়ের আবিষ্কৃত ভূগর্ভ হইতে উত্তোলিত প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন-সকল দেখিয়া তাহার পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। আগে যাহা ভাবা গিয়াছিল, এখন দেখা যাইতেছে, ভারতীয় সভ্যতা তাহা অপেক্ষা আরও কয়েক হাজার বৎসর প্রাচীন।

এই-সকল নিদর্শন হইতে যে-সব ঐতিহাসিক তত্ত্ব নির্ণীত হইতে পারে, তাহার আলোচনা করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। অন্যত্র প্রকাশিত প্রবন্ধে তাহার কিছু আলোচনা দৃষ্ট হইবে।

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বে যুগান্তরসাধক এইরূপ আবিষ্কার দুইজন ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিকের দ্বারা হওয়ায় আমরা আহ্লাদিত হইয়াছি। রাখাল-বাবুর আবিষ্কারের কথা আমরা বহুপূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম; কিন্তু সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কর্ম্মচারীরা উহার কাজের বিষয় বে-সরকারী কোন কাগজাদিতে আগেই কিছু লিখিতে পারেন না, শুনিয়াছি এইরূপ

একটা কি নিয়ম আছে। এইজন্য রাখাল-বাবুর দ্বারা এবিষয়ে কিছু লিখাইবার চেষ্টা করি নাই। কিন্তু ঐ বিভাগের কর্ত্তা মার্শ্যাল্ সাহেবের সম্বন্ধে বোধ হয় ঐ নিয়ম খাটে না। সেইজন্য তিনি তাঁহার বিভাগের কর্ম্মীদ্বয়ের আবিষ্ক্রিয়ার বৃত্তান্ত বিলাতের ইলাষ্ট্রেটেড্, লণ্ডন্ নিউসে লেখেন। তাহা দেখিয়া তথাকার কোন-কোন প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিত নিদর্শনগুলির প্রাচীনত্ব মার্শ্যাল্‌সাহেব যাহা বলিয়াছিলেন তাহা অপেক্ষা অধিক বলেন, এবং তৎসমুদয়ের সহিত পশ্চিম এসিয়ার সুমেরীয় সভ্যতার নিদর্শনের সাদৃশ্য প্রদর্শন করেন। অতঃপর মার্শ্যাল্ সাহেব ভারতীয় নানা কাগজে তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীন বিভাগের গৌরব জানাইবার জন্য এই বিষয়ে প্রবন্ধ লেখেন। অবশ্য তল্লিখিত বিলাতী ও ভারতীয় প্রবন্ধসকলে আবিষ্কারকদিগের গৌরব অপেক্ষা প্রত্নতত্ত্ববিভাগের মহিমাই অধিক পরিস্ফুট হইয়াছিল। তাহা স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের বোধ হয়, কর্ত্তা মার্শ্যাল সাহেব প্রথমে আবিষ্কারগুলির গুরুত্ব স্বয়ং বুঝিতে পারেন নাই; তাহা যদি গোড়াতেই পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহার বিভাগের কীর্ত্তিপ্রচারে এত বিলম্ব ঘটিত না! এইজন্য আমাদের অনুমান হয়, যে, তাঁহাকে অন্যের সাহায্যে ব্যাপারটি বুঝিতে হইয়াছে।

যাহা হউক, দয়ারাম সহ্‌নীর ও রাখাল-বাবুর নামটা একেবারেই চাপা না পড়ায় আমরা সুখী হইয়াছি।

রাজশাহী জেলায় পাহাড়পুরের প্রাচীন কীর্ত্তি খুঁড়িয়া বাহির করিবার যে-চেষ্টা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধুরন্ধর- প্রত্নতাত্ত্বিক করিয়াছিলেন এবং যে-চেষ্টার ফলে কয়েকটা নূতন কীর্ত্তি-সম্বন্ধে সালিসী নিষ্পত্তি করিতে হইতেছে, তাহা অপেক্ষা রাখাল-বাবুর খনন-চেষ্টা বেশী বিখ্যাত হইয়া পড়াটা অবশ্য বড়ই দুঃখের বিষয় হইয়াছে। কিন্তু সুখের বিষয় ইহাতে "প্রবাসী"র কোন হাত ছিল না!

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখপত্র কলিকাতা রিভিউয়ে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করা হইয়াছে, যে, বাংলা দেশে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কেহই প্রত্নতাত্ত্বিকের পংক্তিতে আসন পাইতে পারেন না। তা সত্ত্বেও এরূপ অঘটন ঘড়া বড়ই অন্যায় হইয়াছে। কিন্তু আহ্লাদের বিষয় এই, যে, ইহাতেও "প্রবাসী"র কোন হাত ছিল না।

সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় এই, যে, প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগে কাজ করিবার সময়, বর্ত্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক দেবদত্ত ভাণ্ডারকর যে মোহেঞ্জদড়ো নামক জায়গাটাকে খননের অযোগ্য ও আধুনিক বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়া দিয়াছিলেন, সেই জায়গাটাই এই তাচ্ছিল্যের প্রতিশোধস্বরূপ অকৃতী রাখালদাসকে ডাকিয়া নিজের কুক্ষিগত অনেক জিনিষ লোকচক্ষুর সম্মুখে ধরিবার জন্য প্ররোচিত করিয়াছে। তথাপি ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য, যে, এইসব নিদর্শন "নিশার স্বপন সম" অলীক এবং প্রত্নতত্ত্ববিভাগের রিপোর্ট হইতে নিম্নে উদ্ধৃত বাক্যগুলিই ধ্রুব সত্য।

"...I also visited what is called *Mohen-jo-daro*. Seven miles south-east of Dokri in Larkana district. We had received glowing accounts of this spot, and I had great hopes of finding it to be as interesting as the ruins of the Mirpur Khas *stupa* before they were dug out. But on visiting the place I was greatly disappointed. Here are spread the remains of an old place for about three-fourths of a mile. Near the western edge is a tower on a mound nearly seventy feet high from the ground-level. from which the mound

gradually rises. Of the top portion only the inner core has remained consisting of sun-dried brick work. The bottom of it appears to have been reached most probably by treasure-hunters, who, I was told, frequently excavated the most promising spots here. Close by towards the west and south are six mounds, but of far less height, and there seems to have been a river once running between the tower mound and the other heaps. On the north side of the tower again are vestiges of an old brick road running up. The bricks as a rule are of modern type and are not of large dimensions like the old. There are not doubt some here which look old, but they are few and far between. Not a single carved moulded brick I was able to discover here. What a contrast to the Mirpur Khas *stupa*, where cart-loads of such bricks were found before it was excavated! The probabilities, therefore, are that the *Mohen-jo-daro* does not represent the remains of a Buddhist *stupa* or of any ancient monument. According to the local tradition, these are the ruins of a town only two hundred years old, and the *daro* or tower itself a part of the bastion guarding its west side. This seems to be not incorrect, because the bricks here found, as just said are of the modern type, and there is a total lack of carved terracottas amidst the whole ruins..."

D. R. Bhandarkar, M. A.
Superintendent, Archaeological Survey,
Western Circle.

Poona, 30th June 1912.

*Extract from Progress Report of the Archaeological Survey of India, Western Circle, for the years ending 31st March, 1912. (part 1.) IX Excavation pp. 4—5.

১৩৩৩ বৈশাখ

অতি প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার অবশিষ্ট প্রমাণ

এযাবৎ প্রস্তর মূর্ত্তি, শিলালিপি, মুদ্রা প্রভৃতি ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার প্রমাণ ঋগ্বেদাদি প্রাচীন গ্রন্থ ছাড়া আর যাহা ছিল, তাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে খৃষ্টপূর্ব্ব সহস্র বৎসর পূর্ব্বেরও নহে। কিন্তু শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় সিন্ধুদেশের মোহেন-জো-দড়ো নামক স্থানে এবং শ্রীযুক্ত দয়ারাম সাহনী পঞ্জাবের হরপ্পা নামক স্থানে যখন অতি প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শনস্বরূপ অট্টালিকা, সীলমোহর, অলঙ্কার, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি আবিষ্কার করিলেন, তখন পাশ্চাত্য পণ্ডিতদেরও মতে ঐ সভ্যতার বয়স খৃষ্টপূর্ব্ব তিন হাজার বৎসর অনুমিত হইল। বালুচীস্তানেও এইরূপ সভ্যতার চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে। মোহেন-জো-দড়োতে এপর্য্যন্ত যত দূর খনিত হইয়াছে, তাহাতেই তত্রত্য ভারতীয় সভ্যতার বয়স এখন হইতে ৫০০০ বৎসর

আগেকার বলিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের দ্বারা অনুমিত হইয়াছে। তাঁহারা ভারতীয় কোন জিনিষকে যথাসম্ভব আধুনিক প্রমাণ করিতে যতটা উৎসাহী,প্রাচীন বলিয়া প্রচার করিতে ততটা উৎসাহী নহেন। অতএব এক্ষেত্রে তাঁহাদের কথা পক্ষপাতদুষ্ট বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। তাঁহারা আরও বলেন, যে, মোহেন-জো-দড়োর বর্ত্তমান স্তরের আরও অনেক নীচে পর্য্যন্ত প্রাচীনতর সভ্যতার নিদর্শন আছে। তন্মধ্যে প্রাচীনতমগুলি হয় ত ৮/৯ হাজার বৎসব পূর্ব্বের।

যাহা হউক, ৫০০০ বৎসর আগে যে সভ্যতা সিন্ধুদেশে ছিল, তাহা বেশ উচ্চ রকমের ছিল বলিয়াই মনে হয়। কারণ, দেখা যাইতেছে, যে, তখন লিপি প্রচলিত ছিল। আমরা যে তিনটি সীল মোহরের প্রতিলিপি দিলাম, তাহা হইতে তখনকার অক্ষরের চেহারা বুঝা যাইবে। উহা একপ্রকার চিত্রলিপি (Pictograph)। ঐ লিপি ও তাহার ভাষা এখনও পঠিত হয় নাই। মোহেন্-জো-দড়োতে একটি ছোট রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রাচীন বাবিলোনীয় লিপি আছে। যদি প্রাচীন বাবিলোনীয় এবং প্রাচীন সিন্ধুদেশীয় উভয় অক্ষরে লিখিত একই কথা কোন প্রাচীন জিনিষে অতঃপর পাওয়া যায়, তাহা হইলে প্রাচীন সিন্ধু দেশের লিপি পড়িবার সুবিধা হইবে।

প্রাচীন সিন্ধুদেশের বাসভবন বেশ প্রশস্ত ও ইষ্টক নির্ম্মিত ছিল। কামরাগুলি বড় বড় ছিল, এবং এক একটি কুঠরী সংলগ্ন আলাদা কূপ ও পাকা স্নানাগার ছিল। তা ছাড়া, রাস্তার দুপাশে প্রায় দুই হাত নীচে ইটের পাকা নর্দ্দামা ছিল। নর্দ্দামাগুলি ইটে আচ্ছাদিত। প্রত্যেক বাড়ী হইতে সংকীর্ণতর নর্দ্দামা দিয়া জল আসিয়া রাস্তার নর্দ্দমায় পড়িত। বর্ত্তমান কালে ত আমরা খুব সভ্য হইয়াছি মনে করি, কিন্তু এখনও আমাদের অধিকাংশ শহরে পাকা ইষ্টকাবৃত ভাল নর্দ্দামা নাই, গ্রামে ত নাই-ই; এবং অধিকাংশ বাড়ীতেই স্নানাগার নাই। পাকা স্নানাগার এবং প্রত্যেক বাসকক্ষসংলগ্ন স্নানাগার ভারতীয় ধনী লোকদের গৃহেও দুর্লভ। অতএব ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে সিন্ধুদেশের লোকেরা কতদূর সভ্য হইয়াছিল, তাহা অনুমেয়। তাহাদের গৃহে যে সব বিলাসদ্রব্য পাওয়া যাইতেছে, তাহাতেও তাহাদের সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়।

তাহারা কিন্তু তখনও লোহার ও তাহার ব্যবহারের সহিত পরিচিত ছিল না; তামা, সোনা, রূপা, সীসা ও পারার ব্যবহার জানিত। অস্ত্রশস্ত্র পাথরের বা তামার হইত। সোনার এমন চমৎকার গড়নের ও এমন সুন্দর পালিশ-করা অলঙ্কার পাওয়া গিয়াছে, যে, স্যার্ জন মার্শ্যালের মতে তাহা লণ্ডনের উৎকৃষ্ট স্যাক্‌রার দোকানের গয়নার সমতুল্য।

সীলমোহরে অঙ্কিত অনেক জন্তুর মূর্ত্তি দেখিয়া মনে হয়, যে, তখনকার লোকেরা সুনিপুণ শিল্পী ছিল। আমরা যে তিনটি সীলের ছবি দিলাম, তাহার একটিতে উৎকীর্ণ ককুদ্‌বিশিষ্ট বৃষের মূর্ত্তি দেখিলেই আমাদের মতের সত্যতা উপলব্ধ হইবে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অনুমান করিতেছেন, যে, এই ভারতীয় সভ্যতা "আর্য্য" সভ্যতা ছিল না, ইহা প্রাগ-আর্য্য, সম্ভবতঃ দ্রাবিড় ছিল, এবং ইহা সুমেরীয় সভ্যতার মত। তাঁহারা লিপি হইতে, সীলমোহরে বৃষমূর্ত্তির বাহুল্য হইতে, এবং এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত দুটি প্রস্তর মূর্ত্তির মুখের ছাঁচ হইতে এইরূপ অনুমান করেন। যাহা হউক, এই প্রাচীন ভারতীয়েরা আর্য্য হউক বা না হউক, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না; বর্ত্তমানেও সমুদয় ভারতীয়, এমন কি সমুদয় সভ্যতম ভারতীয়, আর্য্যবংশোদ্ভব নহে। দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন সভ্যতা আর্য্য

সভ্যতা ছিল না, তাৎকালিক আর্য্য সভ্যতা অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল না। উহা ছিল দ্রাবিড়। যাহারা আর্য্য নহে, তাহারাও মানুষ; তাহাদের মধ্যেও খুব সভ্য ও প্রতিভাশালী মানুষ জন্মিয়াছে ও জন্মিতেছে।

সিন্ধুদেশে আবিষ্কৃত প্রাচীন লিপি সুমেরীয় লিপির মত বলা হইয়াছে। সম্ভবতঃ উহা সিন্ধুদেশ হইতেই অন্যত্র গিয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত পৃথিবীর সমুদয় লিপিই মূলে চিত্রলিপি হইতে উদ্ভূত। ভারতবর্ষে যত লিপি ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ও যুগে প্রচলিত হইয়াছে তাহারাও সম্ভবতঃ চিত্রলিপি হইতে উদ্ভূত। সিন্ধুদেশের প্রাচীন চিত্রলিপি যে ভারতীয় অন্যান্য কোন কোন তদপেক্ষা আধুনিক লিপির "পূর্ব্বপুরুষ" নহে, তাহা জোর করিয়া বলা যায় না।

সীলমোহরে বৃষমূর্ত্তির প্রাচুর্য্য "শৈব" ধর্ম্মের প্রাগৈতিহাসিক প্রকার-ভেদের অস্তিত্ব সূচনা করে কি না, তাহা অনুসন্ধেয়।

প্রস্তরমূর্ত্তি দুটির মধ্যে যেটির ছবি প্রকাশিত হইয়াছে ও যাহার প্রতিলিপি আমরা দিলাম, তাহা হইতে জোর করিয়া বলা যায় না যে, প্রাচীন সিন্ধুদেশবাসীরা আর্য্য ছিল না। ভারতবর্ষে পরবর্ত্তী বহু যুগে প্রস্তর মূর্ত্তি বাস্তব মানুষের সদৃশ (realistic) ছিল না। এদেশে যে অসংখ্য বৌদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহা ঠিক সেকালের কোন মানুষের মত নহে, তাহা কল্পিত কোন না কোন আদর্শ অনুযায়ী। সিন্ধুদেশে প্রাপ্ত প্রাচীন দুটি মূর্ত্তিও ঠিক তাৎকালিক বাস্তব জীবিত মানুষের মত কি না, বলা যায় না। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, ঐরূপ মুখাবয়ব ভারতবর্ষে এখনও অনেক মানুষের আছে। তাহাদের মুখ আর্য্য ছাঁচের বলিবেন কি না, সে আলাদা কথা।

আমরা যে মূর্ত্তিটির ছবি দিলাম, তাহা চূণ পাথরের (limestone-এর) তৈরী। তাহার উপর মিহি শাদা আস্তর আছে। চোখ দুটি ঝিনুক-খণ্ড দ্বারা খচিত। পোষাকে যে ছিটের নক্সা দেখা যাইতেছে, তাহা গৈরিক মাটীর রঙের। মূর্ত্তিটির গোঁফ কামান। তখন বোধ হয় দাড়ী রাখা ও গোঁফ কামান ফ্যাশন ছিল। মূর্ত্তিটি যে কাহার, তাহা বলিবার উপায় নাই।

এই প্রাচীন সিন্ধুদেশবাসীদের ধর্ম্ম কি ছিল, এখনও নির্ণীত হয় নাই। কাচের মত মসৃণ ও চিক্কণ জিনিষের আস্তরে ঢাকা একটি নীল রঙের মৃণ্ময় চিত্রিত ফলক পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে একটি মূর্ত্তি (সম্ভবতঃ উপাস্য দেবতা) সিংহাসনে বসিয়া আছেন। উপবেশন-ভঙ্গী পদ্মাসনের মত। তাঁহার দক্ষিণে ও বামে একজন করিয়া উপাসক নতজানু উপবিষ্ট; প্রত্যেকের পশ্চাতে একটি নাগ অর্থাৎ সর্প। ফলকের পৃষ্ঠদেশে তাৎকালিক লিপিতে কিছু লেখা আছে। পরবর্ত্তী ভারতীয় ধর্ম্মমতসমূহ এবং পরবর্ত্তী শিল্পের সহিত এই প্রাগৈতিহাসিক ধর্ম্ম ও শিল্পের সম্পর্ক নির্ণীত হইলে ভারতের ইতিহাসে নূতন আলোকপাত হইবে।

একটি সীল পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে অশ্বত্থবৃক্ষের চিত্র আছে। পাতাগুলি যে অশ্বত্থের তাহা সুস্পষ্ট। বৃক্ষের কাণ্ড হইতে দুদিকে দুটি হরিণের মুখ বাহির হইয়াছে। অশ্বত্থ, বট প্রভৃতি বৃক্ষ ভারতবর্ষে অনেক প্রাচীন কাল হইতে ধর্ম্ম ও পূজার সহিত সংশ্লিষ্ট। এই সীলটিও কোন ধর্ম্মের পরিচায়ক হইতে পারে।

প্রাচীন অট্টালিকা, নর্দ্দামা, স্নানাগার প্রভৃতিতে যে সব ইট ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা খুব পরিষ্কার করিয়া চাঁছাছোলা। সেকালে চুণ-সুরকি বা অন্য কোন রকমের মশলা গাঁথনীতে ব্যবহৃত হইত না। এইজন্য ইটগুলির পৃষ্ঠদেশ খুব সমতল ও মসৃণ করিতে হইত এবং জোড়গুলিও খুব নৈপুণ্যের সহিত খাপ খাওয়াইতে হইত।

১৩৩৭ আষাঢ়
অধ্যাপক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

অকালে অধ্যাপক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে ভারতবর্ষ একজন শ্রেষ্ঠ প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক হারাইল। সিন্ধুদেশে তৎকর্ত্তৃক মোহেন-জো-দড়ো আবিষ্কার তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। তিনি আরও অনেক আবিষ্ক্রিয়ার জন্য বিখ্যাত। ঔপন্যাসিক বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি ছিল।

১৩৩৮ বৈশাখ
সিন্ধুদেশে দ্রষ্টব্য স্থান

সিন্ধুদেশে যত দ্রষ্টব্য স্থান আছে, সবগুলির উল্লেখ বা কোনটির বিশেষ বর্ণনা করা এখানে চলিবে না। একটি প্রাচীন এবং একটি আধুনিক স্থানে উল্লেখ মাত্র করিব।

ভারতবর্ষে এ পর্য্যন্ত যত প্রাচীন নগর আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার সবগুলিরই ঐতিহাসিক উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু সিন্ধুদেশে মোহেন-জো-দড়ো নামক স্থান পরলোকগত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আবিষ্কার করেন, তাহা প্রাগৈতিহাসিক। "মোহেন-জো-দড়ো" নামটির অর্থ মোহেন বা মোহনের উঁচু ঢিবি। এখানে ভিন্ন ভিন্ন যুগের তিনটি শহরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। আধুনিকতম নগরটি মোটামুটি ৫০০০ বৎসর আগেকার। আরও প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ আরও গভীর স্তরে আছে অনুমিত হইয়াছে, কিন্তু জল বাহির হওয়ায় তাহা এখনও খনিত হয় নাই। রাখালবাবু যাহা খনন করাইয়াছিলেন, তাহার একটি স্থান প্রত্নতত্ত্ববিভাগের মোহেন-জো-দড়ো স্থিত কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার ও শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত সৌজন্য সহকারে আমাকে দেখাইয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। শীতকালে সেখানে গেলে ভাল করিয়া দেখিবার সুবিধা হয়। গরমের সময় দুই প্রহর রৌদ্রে দেখা আরামদায়ক নহে। কথাপ্রসঙ্গে অবগত হইলাম, সিন্ধুদেশে আরও চব্বিশটি স্থান আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহার কোন-কোনটিতে হয়ত মোহেন-জো-দড়ো অপেক্ষাও প্রাচীনতর সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যাইতে পারে। এগুলি এখনও যথারীতি খনিত হয় নাই।

মোহেন-জো-দড়ো ডোকরী নামক রেলওয়ে স্টেশন হইতে যাওয়া সুবিধাজনক। এই স্টেশন করাচী হইতে প্রায় ২৮০ মাইল। স্টেশন হইতে মোহেন-জো-দড়ো প্রায় ৯ মাইল। টঙ্গা বা মোটর গাড়ীতে যাওয়া যায়। রাস্তা ভাল। মোহেন-জো-দড়োতে আবিষ্কৃত কতক জিনিষ তথাকার মিউজিয়মে আছে। খুব মূল্যবান অনেক

জিনিষ বিলাতে ও আমেরিকায় প্রেরিত হইয়াছে। কিছু কলিকাতার মিউজিয়মে আসিয়াছে। স্থানটির সচিত্র বৃত্তান্ত প্রত্নতত্ত্ববিভাগের ডিরেক্টর স্যর জন মার্শ্যাল লিখিয়াছেন। তাহা তিন চারি মাস পরে বাহির হইবে শুনিলাম।

এই প্রকার স্থান খনন করিয়া ভারতবর্ষের লুপ্ত সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কারে যত টাকা খরচ হয়, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী টাকা খরচ করিয়া আরও অনেক স্থান খনন করা উচিত।...

১৩৩৯ বৈশাখ

মোহেন্‌জো-দাড়ো ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

মোহেন্‌জো-দাড়ো এবং তাহার প্রাচীনত্ব আবিষ্কার সম্বন্ধে পরলোকগত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যাহা করিয়াছিলেন, তাহা যথাসম্ভব চাপা দিয়া তাঁহার কৃতিত্বগৌরব কমাইবার চেষ্টা তিনি বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতেই হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পরও হইয়াছে। এখন সেই চেষ্টার অবসান হওয়া উচিত। কয়েক মাস হইল, ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর-জেনার্যাল স্যর জন মার্শ্যাল সাহেবের দ্বারা সম্পাদিত ও অংশতঃ লিখিত মোহেন্‌জো-দাড়ো সম্বন্ধে বৃহৎ সচিত্র ও বহুমূল্য পুস্তক বাহির হইয়াছে। তাহাতে রাখালবাবুর কাজ সম্বন্ধে মার্শ্যাল সাহেব যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে রাখালবাবুর প্রত্নতাত্ত্বিক প্রতিভা ও কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। মার্শ্যাল সাহেবের নিজের লেখা কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

The site [of Mohenjo-daro] had long been known to district officials in sind, and had been visited more than once by local archaeological officers, but it was not until 1922, when Mr. R. D. Banerji started to dig there, that the prehistoric character of its remains was revealed... Mr. Banerji himself was quick to appreciate the value of his discovery and lost not time in following it up... The few structural remains of that [Indus] civilization which he unearthed were built of bricks identical with those used in the Buddhist Stupa and Monastery, and bore so close a resemblance to the latter that even now it is not always easy to discriminate between them. Nevertheless, Mr. Banerji divined, and rightly divined, that these earlier remains, must have antidated the Buddhist structures, which were only a foot or two above them, by some two or three thousand years. That was no small achievement!" Mohenjo-daro and the Indus Civilization, vol. I, pp. 10-11.

মার্শ্যাল সাহেব অন্যত্র লিখিয়াছেন :—

"Three other scholars whose names I cannot pass over in silence, are the late Mr. R. D. Banerji, to whom belongs the credit of having discovered, if not

Mohenjo-daro itself, at any rate its high antiquity,..."—Ibid., vol I, page x.

মার্শ্যাল সাহেবের পুস্তকখানির প্রকাশক—আর্থার প্রব্‌স্থেন লণ্ডন; মূল্য বার গিনি—১৬৮ টাকা। আমরা উহা সমালোচনার্থ প্রকাশকের নিকট হইতে পাইয়াছি বলিয়া উহা হইতে পরে নানা তথ্য ও ছবি সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিব—ক্রয় করা সহজ হইত না।

১৩৩৮ ফাল্গুন

বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতি

কুমার শরৎকুমার রায়ের সভাপতিত্বে বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির গত বার্ষিক অধিবেশনের যে সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত লিবার্টিতে বাহির হইয়াছে, তাহাতে দেখিলাম গত বৎসর ৩২টি প্রাচীন জিনিষ সমিতির মিউজিয়মের জন্য সংগৃহীত ও তথায় রক্ষিত হইয়াছে। এই ৩২টির মধ্যে ১২টি বিষ্ণু, সূর্য্য, উমা-মহেশ্বর, ব্রহ্মা, এবং বরাহ অবতারের প্রস্তরমূর্ত্তি। এইগুলি হইতে পাল-রাজাদিগের আমলের শিল্পের ক্রমবিকাশ বুঝা যায়। তদ্ভিন্ন ২০টি নূতন মুদ্রা সংগৃহীত হইয়াছে। তাহার মধ্যে একটি বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। উহা রাজ্ঞী দিদ্দার রাজত্বকালের। এই রাজ্ঞীর বিষয়ে সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে লোকের আগ্রহ হইবে।

শিল্প-বিষয়ে নানা আলোচনা

১৩১৯ শ্রাবণ

ভারতবর্ষীয় শিল্পকলা ও তাহার আদর্শ

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী

ইংলণ্ডে যখন ন্যাশন্যাল আর্ট গ্যালারি প্রথম দেখিলাম, তখন মনে হইল এ যেন একটি ভাবের স্বর্গলোক, এখানে যেন বাস্তব পৃথিবীর সমস্ত দৃশ্যসীমারেখা অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কোথায় ব্যবসা-বাণিজ্যের নানামুখী ব্যস্ততাময় কর্ম্ম-স্রোত, কোথায় রাষ্ট্রীয় কলেবরের অগণিত শিরাধমনীর নিয়ত বহমান জীবনের আবেগচাঞ্চল্য—লণ্ডন সহরের চারিদিকের জনসমুদ্রের কর্ম্মসমুদ্রের ফেনতরঙ্গের কল্লোলের সঙ্গে সেই শান্তসমাহিত চিত্রশালাটির যেন কোথাও যোগ নাই। তাহার কারণ ন্যাশন্যাল গ্যালরিতে ইতালীয় চিত্রমালার সংখ্যাই অধিক এবং সেই চিত্রগুলি ভগবান্ খৃষ্টের লোকাতীত দৈবীলীলার বিচিত্র পুরাণকাহিনীর নানা পরিকল্পনা। তাহারা অদৃশ্য জগতের রহস্য-পরিপূর, সুতরাং দৃশ্যজগতের সঙ্গে তাহাদের বৈপরীত্য ও বৈসাদৃশ্য অত্যন্ত বেশি।

সেই ত্রয়োদশ শতাব্দীর শিল্পের আদিগুরু গিয়োটোর চিত্র হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সায়েনায়, ফ্লোরেন্সে, ভেনিসে ও অন্যান্য ইতালীয় সহরে চিত্রকলার যেসকল নব নব দল সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাদের চিত্রগুলি ন্যাশন্যাল গ্যালারিতে ক্রমানুসারে সজ্জিত হইয়াছে। চিত্রের বিষয় প্রায় এক—ঐ খৃষ্টীয় পুরাণ। এক খৃষ্টের জন্মবার্ত্তা ঘোষণা সম্বন্ধেই (Annunciation) কত অসংখ্য চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, কত গির্জ্জার প্রাচীরে প্রাচীরে—তাহাদের প্রতিলিপি আনিয়া আজ সকল ইউরোপীয় চিত্রশালা রক্ষা করিতেছে।

এখন অবশ্য কালের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যে মধ্যযুগে এই অধিকাংশ চিত্রের উদ্ভব হইয়াছিল, সেই যুগকে ইউরোপ এখন অন্ধযুগ বলিয়া থাকে। তখন স্বর্গ, দেবদূত, সাধুসন্ন্যাসী তাহার কল্পনাকে মুগ্ধ করিয়াছিল, এখন সেসকল অলীক ও কাল্পনিক কথা—অতীন্দ্রিয় কোন লোককেই ইউরোপ স্বীকার করিতে চায় না। তখন বিশ্বাস মানুষের চিত্তসিংহাসনে একলা অধীশ্বর হইয়া বসিয়াছিল, এখন বিজ্ঞান তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে।

তথাপি এসমস্ত চিত্রই ন্যাশন্যাল—বিশেষভাবে ব্রিটিশ বা ইতালীয় বা অন্য কোন জাতীয় নহে। ফ্রাএঞ্জেলিকো, বেলিনি, লিওনার্ডোডাভিন্সি প্রভৃতিকে অনুন্নত যুগের মানুষ বলিলেও তাহাদের কল্পনাসম্পদ্ হইতে ইউরোপ বঞ্চিত হইতে চায় না। এমন কি তাহাদের পরবর্ত্তী ডচ্ চিত্রকরগণ যেমন রুবেনস্ ভ্যানডাইক্, কিম্বা ব্রিটিশ চিত্রকরগণ যেমন টার্ণার কি হগার্থ,—তাহাদিগকেও মধ্যযুগীয় কিম্বা অল্পকাল পরবর্ত্তী ফ্লোরেন্সের ওস্তাদ্ শিল্পীদের সঙ্গে কোন অংশেই কেহ তুলনীয় মনে করে না। মধ্যযুগের ভক্তিধর্ম্মের প্রতি আধুনিক ইউরোপ যতই অবজ্ঞাশীল হৌক্—সেই ভক্তিভাবপ্রসূত আর্ট যে একটি বড় উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, সে সম্বন্ধে কোন আধুনিকতম আধুনিকেরও মনে লেশমাত্র সংশয় নাই। ইউরোপে যদি আবার কোন সময়ে ধর্ম্মের নবযুগ আসে, তখন সেই মধ্যযুগের সাধনার এবং সেই ভক্তিলীলায়িত শিল্পের তলব পড়িবেই—কারণ তাহাব মধ্যে অধ্যাত্মসত্যের একটি নিত্যরূপ আছে।

আমার কাছে এইটেই চমৎকার লাগে যে কি ন্যাশন্যাল গ্যালারিতে কি পারীনগরের লুভ্র্এ ইউরোপীয় মানুষ আপনার যুগযুগের শিল্পসাধনার শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলি সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। সেখানকার চিত্রগুলি এখন হয় ত কেবলমাত্র কলাকুশলগুণী বা কলাশিক্ষার্থীর কৌতূহল নিবৃত্ত করিয়া থাকে—তাহার সঙ্গে সমস্ত ইউরোপের জীবনের বড় সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায় না। যে

ফ্রান্সে এক সময় বড় বড় ইতালীয় চিত্রকর চিত্রকলার আদর্শস্থানীয় ছিলেন, সেখানে এখন নগ্ন স্ত্রীমূর্ত্তির চিত্র সর্ব্বত্রই আদৃত হইতেছে। কিন্তু আধুনিককালের এই প্রহসন কি একদিন মরীচিকার মত দিগন্তরালে বিলীন হইয়া যাইবে না? যে আর্ট গ্যালারিতে আজ শিক্ষার্থিগণ প্রাচীন শিল্পীর রচনা নকল করিবার জন্য রং ও তুলি হাতে বসিয়াছে, একদিন তাহারা নিশ্চয় বুঝিবে যে কেবল আকারের সৌষ্ঠব, রং ফলানো, পরিপ্রেক্ষণ— এই সমস্ত জিনিসই শিল্পের প্রাণ নহে, তাহার যথার্থপ্রাণ একটি অধ্যাত্ম আদর্শ যাহা চিরন্তন কাল ধরিয়া মানুষের আত্মাকে আনন্দময় জ্যোতির্ম্ময় করিয়া রাখিতে সমর্থ।

আমাদের দেশে প্রাচীন শিল্প অল্পে অল্পে উদ্ধার হইতেছে, নূতন শিল্পও তাহার প্রেরণায় জাগিবার উপক্রম কবিতেছে। কিন্তু হায়, আমাদের শিল্পকে আমবা কোথায় তেমনি করিয়া পরে পরে স্তরে স্তরে সাজাইলাম? বিদেশী ঐতিহাসিক আমাদের কানে মন্ত্র দিতেছে যে ভারতবর্ষে পূর্ব্বকালে আর্ট ছিল না--বৌদ্ধযুগে অশোকের কালে কনিষ্ক প্রভৃতি রাজাদের সময়ে যেটুকু আর্ট দেখ, সে কেবল গ্রীক্‌দের অনুকরণে হইয়াছিল—তাহার পূর্ব্বে বা পরে শিল্পের নামগন্ধ নাই।

ভারতবর্ষের নিজস্ব কোন আর্ট নাই বলাও যা আর ভারতবর্ষকে বর্ব্বরদেশের সমপর্য্যায়ভুক্ত কবাও একই কথা হইয়া দাঁড়ায়। ভারতবর্ষে তত্ত্ববিদ্যা ছিল অথচ সৌন্দর্য্যদৃষ্টি ছিল না, সে চিন্তা করিয়াছে কিন্তু বোধ করিতে পারে নাই—তাহার মানে এই যে তাহার মস্তিষ্কের সহিত তাহার স্নায়ুতন্তুর কোন সংযোগ ছিল না—সে এমন একটি সভ্যতার ফল ফলাইয়াছে যাহার আঁটি মাত্র আছে, শাঁস কোথাও নাই। এমন অদ্ভুত কথা যে বিংশশতাব্দীর সভ্যতা-গর্ব্বান্ধ কোন পণ্ডিত লোক কল্পনা করিতেও পারে, ইহাই আমাব কাছে সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হয়। তথাপি ভারতশিল্প সম্বন্ধে সেই পণ্ডিত প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ কি বলেন তাহা দেখা যাক্।

নেপালের সীমান্তপ্রদেশে পিপ্রবতে যে প্রাচীনতম একটি স্তূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহাতে শাক্যগণ বুদ্ধের ভস্মরক্ষা করিয়াছে বলিয়া পণ্ডিতগণের বিশ্বাস, তাহার তারিখ ইঁহারা ৪৫০ B. C স্থির করেন। তখন গ্রীক্‌রা আসে নাই। তবে ভারতবর্ষীয়গণ এ স্তূপরচনা কোথা হইতে শিখিল? উত্তর "Perhaps from Babylonia!" এই perhaps-টি নিছক ঐতিহাসিক।

ইহার পর আড়াই শত বৎসর পর্য্যন্ত আর কোন শিল্প নাই—তার মানে পাওয়া যায় নাই। তারপর একেবারে অশোকের কাল—তাঁহার স্তম্ভ স্তূপ গুহাচিত্র প্রভৃতি। মধ্য ভারতবর্ষে বরহূত ও ভূপালে সাঞ্চী স্তূপ আছে—বুদ্ধগয়াতেও আছে। অশোকের প্রস্তর রেলিংএর চিত্রমালাও নানাস্থানে পাওয়া গিয়াছে। স্তূপরচনা কোথা হইতে শিক্ষা হইয়াছে তাহাতো জানিলাম, এখন অশোক রেলিংএর চিত্রমালায় যেসকল যক্ষ রক্ষ নাগ প্রভৃতির ভাস্কর্য্য দেখা যায়, সে শিক্ষা কোথা হইতে হইল? গ্রীকদের নিকট হইতে। অশোকস্তম্ভও গ্রীক্ ও পার্সিপলিটান্ অর্থাৎ পারস্যদেশীয় স্তম্ভেরই রূপান্তর মাত্র। সম্রাট্ অশোক নানাদেশে ধর্ম্মপ্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার সময়কার শিল্পের এই অনুকরণ সহজ হইয়াছিল।

তাবপর শক ও কুশানদিগের সময়ে অর্থাৎ কণিষ্ক হুবিষ্ক প্রভৃতি রাজাদিগের রাজত্বকালে, যখন রোমে এবং সর্ব্বত্রই গ্রীক্ শিল্প অপ্রতিহত প্রভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছে, তখন গান্ধারদেশে এক শিল্পযুগ আসে। পেশবার ও পঞ্জাবের নানা স্থানে এই শিল্পের অজস্র উপকরণ বাহির হইয়াছে— কলিকাতা, লাহোর, ব্রিটিশ মিউজিয়ম প্রভৃতি মিউজিয়মে তাহা দেখা যায়। সেগুলি 'হুবহু' গ্রীক্— কারণ বুদ্ধের মূর্ত্তি দেখিলে হঠাৎ অ্যাপোলো বলিয়া ভ্রম হয়। দেবতাদের মূর্ত্তিগুলিও গ্রীক্‌দেরই মত। বুদ্ধ যে তখন দেবতারূপে পূজিত হইতে আরম্ভ করিয়াছেন তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। যেমন গান্ধারে তেমনি দক্ষিণে অমরাবতীতে এই একই ধরণের শিল্প দেখা যায়। দক্ষিণে তখন অন্ধ্র রাজাদের রাজত্ব।

কিন্তু এই সময়ে অজন্তাগুহার চিত্রাবলীরও জন্ম হইয়াছিল, সে তো গ্রীক অনুকরণে হয় নাই। তবেই তো মুস্কিল। তবে সে আবার কাহার অনুকরণ তাহা গবেষণার দ্বারা বাহির করা তো বিষম গোলযোগের ব্যাপার। গ্রীফীথ্স্ ফারগুসন্ হেন মানুষেরাও যে এই চিত্রাবলীর প্রভূত সুখ্যাতি করিয়াছেন। এমনকি গ্রীফীথ্স্ ফ্লোরেন্স ভেনিসের চিত্র হইতেও অজন্তাগুহার চিত্রকে উচ্চ আসন দিয়াছেন—

"The Florentine could have put better drawing and the Venetian better colour, but neither could have thrown greater expression into it." সুতরাং অজন্তাগুহার চিত্রাবলী যখন গ্রীক্ অনুকরণ বলিবার উপায় নাই, তখন ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ লিখিতেছেন—

"Their foreign origin is apparent, but nobody knows where the artists came from or what their models were." অর্থাৎ তাহাদের বৈদেশিক উৎপত্তি সুস্পষ্ট প্রতীয়মান, তবে কোন্ বৈদেশিক শিল্পীরা আসিয়াছিল, তাহাদের শিল্পের আদর্শ কি ছিল তাহা কেহই জানে না। ইহারও নাম যদি ইতিহাস হয়—তবে আমাদের পুরাণতন্ত্র প্রভৃতিকে ইতিহাস বলিতে দোষ কি! ভিন্‌সেণ্ট স্মিথের এরূপ বলিবার যুক্তি—সাহিত্যে তখন বাণভট্টের কাদম্বরীর 'tawdry and insincere rhetoric' দেখা যাইতেছে, চারিদিকে কোথাও কোন চিন্তার বা চেষ্টার পরিচয় নাই। সুতরাং হয় ত পুলকেশিন্ প্রভৃতি চালুক্য রাজাদের কালে বিদেশ হইতে কোন চিত্রকরের দল আসিয়া অজন্তা গুহাকে চিত্রশোভিত করিয়া থাকিবে। ধন্য সেই অখ্যাতনামা অজ্ঞাতকুলশীল বিদেশী ঐতিহাসিকের মস্তিষ্কসম্ভূত চিত্রকরের দল!

যাক্, তারপর? তারপর ভারতবর্ষে আর আর্ট নাই। কারণ ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ্ একটি আশ্চর্য্য লাইন কলমের এক আঁচড়ে লিখিয়া ফেলিয়াছেন—সে পংক্তিটি এই—

"After A D. 300, Indian sculpture hardly deserves to be reckoned as Art." তারপর মোগল সম্রাটদের আমলে স্যারাসেন শিল্প জাগিয়া উঠে, কিন্তু তাহাতে হিন্দুজাতির কোন কৃতিত্ব নাই! ভারতবর্ষের আর্টের ইতিহাসে একটা ধারাবাহিকতা নাই, তাহার ক্রমবিকাশ আলোচনা করিয়া দেখিবারও কোন সম্ভাব নাই। এই তো পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মোটামুটি সিদ্ধান্ত। আমি তাঁহাদের সকল কথা যথাযথ ভাবেই লিপিবদ্ধ করিলাম।

আমরা এতদিন পর্য্যন্ত এই সিদ্ধান্তকে মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলাম, কারণ স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান করিয়া আমাদের দেশের কোন বিষয়ের ইতিহাস আলোচনা করিবার শক্তি আমরা রাখি না। পাশ্চাত্য গুরুগণ যাহা বলেন তাহা আমরা বেদবাক্যের মত শিরোধার্য্য করিয়া লই।

শ্রীযুক্ত ই, বি, হ্যাভেল বহুকাল ভারতবর্ষে ছিলেন। কলিকাতার গভর্ণমেণ্ট স্কুল অব্ আর্টের তিনি অধ্যক্ষ ছিলেন, সুতরাং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সাক্ষাৎভাবে জানিবার এবং ভারতবর্ষীয় সমাজ, অধ্যাত্মতত্ত্ব, সাহিত্য প্রভৃতি ভাল করিয়া আলোচনা করিবার সুযোগ তিনি লাভ করিয়াছিলেন।

সম্প্রতি তিনি একটি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন— তাহার নাম "The Ideals of Indian Art"। সেই পুস্তকে তিনি প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের সিদ্ধান্ত একেবারে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াছেন এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসে আর্ট যে কত বড় একটি শক্তি, তাহার ক্রমবিকাশের ধারা যে আজও পর্য্যন্ত অব্যাহতভাবে চলিয়া আসিতেছে তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। প্রকৃত আর্টকে চিনিতে হইলে একটা অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন, কেবল উপর উপর দেখিয়া এটা অমুকের অনুকরণ বা এ অংশটা অমুক দেশ হইতে আসিয়াছে এরূপ স্থির করা মূঢ়তা—হ্যাভেলের পুস্তক পড়িয়া সে কথা বেশ বুঝিয়াছি। ভারতবর্ষের ধর্ম্মতত্ত্বের সঙ্গে অধ্যাত্মসাধনার সঙ্গে তাহার শিল্পসাহিত্যের যে একটি ভিতরের যোগ আছে—ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম সাধনার বিশেষত্ব কোথায়

তাহা না জানিলে যে তাহার শিল্পসাহিত্যের মর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ করা যায় না—সে কথাও এই পুস্তক সপ্রমাণ করিয়াছে। আর্টের প্রাণ যদি সেই গভীর অধ্যাত্মতত্ত্ব হয়, তবে জানিতে হইবে যে সে কোন দিন মরিবার নয়, ফুরাইবারও নয়—তাহার কাজ নিঃসন্দেহ যুগে যুগে ভিতরে ভিতরে হইয়া আসিয়াছে এবং আজি পর্য্যন্ত হইতেছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কেমন করিয়া তাহার সংবাদ পাইবেন?

গ্রন্থের ভূমিকায় হ্যাভেল দুঃখ করিয়াছেন যে ভিক্টোরিয়া আলবার্ট মিউজিয়মের ভারতবর্ষীয় আর্ট বিভাগে সরকারী রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে যে ভারতবর্ষীয় পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্ত্তি বীভৎস—ভারতবর্ষ আর্ট কাহাকে বলে তাহা জানেই না। হ্যাভেল বলেন, ইহার কারণ, যাঁহারা লেখেন তাঁহারা পাশ্চাত্য সংস্কারে আপাদমস্তক এমনি নিমজ্জিত যে একবার মনেও করেন না যে হিন্দুশিল্পীকে এমন সকল বিগ্রহ (symbol) দ্বারা ভাবপ্রকাশ করিতে হইয়াছে, যাহা হিন্দু জনসাধারণের নিকটেই সুগোচর। যেমন ধর অধ্যাত্মচেতনাকে এদেশে তৃতীয় চক্ষু বলা হইয়াছে। সুতরাং তৃতীয় চক্ষু দেখিয়া এবং তাহার অর্থ না জানিয়া কেহ যদি তাহাকে বীভৎস কি কদর্য্য বলে তবে সে কি নিজের মূঢ়তার পবিচয় দেয় না? এরূপ ভুল বুঝিবার আরও কারণ আছে। আধুনিক পাশ্চাত্য আর্ট অল্পসংখ্যক কলাবিলাসী ব্যক্তির মধ্যেই আবদ্ধ কিন্তু হিন্দুশিল্প কোনদিন সেরূপ ছিল না। হিন্দুর দর্শন, হিন্দুর অধ্যাত্মসাধনার গভীরতম উপলব্ধিগুলিকে সকল হিন্দুর নিকটে সুগোচর করিয়া তোলাই হিন্দুশিল্পের মুখ্য অভিপ্রায় ছিল। সেইজন্য যেসকল ইঙ্গিত, রূপ বা চিহ্নের সহিত হিন্দুগণ পরিচিত ছিলেন, শিল্পীকে ভাবপ্রকাশের বেলায় তাহাদেরি সাহায্য লইতে হইয়াছে। অবশ্য ইহাতে শিল্পসৃষ্টির সামঞ্জস্য ও সৌষ্ঠববিধানের নিত্যনিয়মগুলি রক্ষিত হইয়াছে কি লঙ্ঘিত হইয়াছে তাহা স্বতন্ত্রভাবে বিচার্য্য, কিন্তু কি ভাব প্রকাশের চেষ্টা হইয়াছে এবং কোন্ বিশেষ রূপ অবলম্বনের দ্বারা সেই চেষ্টা আপনাকে সফল করিয়াছে, গোড়ায় তাহা না জানিয়া সরাসরি বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া কি কাহারও পক্ষে উচিত?

হ্যাভেল যে আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহ সত্য, কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসে যেমন এক যুগের সঙ্গে অন্য যুগের সম্বন্ধ নির্ণয় দুরূহ—জাতিধর্ম্ম প্রভৃতির এত বিরোধ মাঝখানে আসিয়া জমিয়া পড়ে—ঠিক্ সেই প্রকার আর্টের মধ্যেও এত বৈচিত্র্য আছে—আদর্শের এবং তাহার বাহ্যপ্রকাশের—যে সেইসমস্ত বিরোধবিচ্ছিন্নতাকে একটা ঐক্যসূত্রের মধ্যে গাঁথিয়া তোলা একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার।

একটা দৃষ্টান্ত দিই। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে একটা স্থূল সংস্কার এইরূপ আছে যে, বৌদ্ধযুগ বৈদিক যুগের একটা বিরোধী যুগ, এবং পৌরাণিকযুগে হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থানকালে বৌদ্ধধর্ম্ম এ দেশ হইতে চিরবিদায় প্রাপ্ত হইয়াছে। বৈদিকযুগ বলিতে ইঁহারা যাগযজ্ঞাদিবহুল ক্রিয়াকাণ্ডই বোঝেন, উপনিষদের ব্রহ্মবাদকে চোখে দেখিয়াও দেখিতে পান্‌না। বস্তুত উপনিষদীয় ব্রহ্মোপলব্ধির তত্ত্ব ও সাধনাই যে বৌদ্ধধর্ম্মে বিকাশ লাভ করিয়াছিল, উপনিষদীয় সর্ব্বানুভূতি ও বৌদ্ধ বিশ্বমৈত্রীর সঙ্গে যে সাধনার দিক্ দিয়া কোন বিচ্ছেদ নাই, উপনিষদে যাহা ধ্যানল ছিল বৌদ্ধধর্ম্মে তাহাই চরিত্র ও সাধনার বিষয়ীভূত হইবার উপক্রম করিয়াছিল মাত্র—অভিব্যক্তির এই সূক্ষ্মক্রমটি পাশ্চাত্য পণ্ডিতের স্থূল দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া যায়। যিশুর ধর্ম্মকে ইহুদীয় প্রাচীন ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা যেমন ভুল, কারণ যিশু পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাধকগণের বাণীকে আপনার ব্যক্তিত্বের মধ্যে মূর্ত্তিদান করিয়াছিলেন মাত্র—ঠিক্ তেমনি উপনিষদ হইতে বুদ্ধদেবের ধর্ম্মকে বিচ্ছিন্ন করা সেই একই রকমের ভুল, কারণ এক্ষেত্রেও একজন মহাপুরুষ সমস্ত কালের বাণীকে আপনার জীবনের দ্বারা সার্থক করিয়াছিলেন মাত্র। কবির বাণী যে বস্তুতই তপস্বীর তপস্যার অপেক্ষা রাখে—নহিলে সে বাণীর গভীরতা কে পরিমাণ করিবে?

পৌরাণিক ধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মকে এদেশ হইতে তাড়াইয়াছে, ইহাও আর একটি ভ্রান্ত সংস্কার। বৌদ্ধধর্ম্মের অবসান কালে যে সময়ে দ্রাবিড়, শক, হুন প্রভৃতি বহু অনার্য্য জাতি আর্য্যজাতির সহিত সম্মিশ্রণে ধর্ম্মে, সমাজে একটা বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়াছিল, সেই সময় একটা প্রবল স্বাজাত্যের ভাব বৈদেশিক প্লাবনকে ঠেকাইবার জন্য উঠিয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছিল। তখন অনার্য্য দেবদেবী, অনার্য্য আচার-ব্যবহার সমস্তকেই শোধিত-সংস্কৃত- রূপান্তরিত করিয়া লইবার যে প্রয়াস তাহা কোন হিসাবেই বৌদ্ধধর্ম্ম-বিরুদ্ধ নহে। বৌদ্ধ নির্ব্বাণতত্ত্বই হিন্দুর বিশুদ্ধ অদ্বৈততত্ত্ব হইয়াছিল, বৌদ্ধ ত্রিত্বই হিন্দু ত্রিমূর্ত্তি হইয়াছিল, বৌদ্ধ অবতারবাদই হিন্দুর নারায়ণপূজায় পরিণত হইয়াছিল, বৌদ্ধ তন্ত্রসাধনা হিন্দুর উপাসনাপদ্ধতির মধ্যে কত ঢুকিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই কথাই বরং বলা উচিত যে নব্য হিন্দুধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মকে আত্মসাৎ করিয়া লইয়া তাহার বিচিত্র বিশৃঙ্খলাকে ও বৈদেশিকতাকে স্বাজাত্যের শৃঙ্খলবন্ধনে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়াছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের এই ধর্ম্মবিপ্লবের ইতিহাসের সঙ্গে অন্যান্য দেশের একই ইতিহাসের এত গুরুতর প্রভেদ যে যদি কোন বিদেশীর কাছে ভারতবর্ষের ইতিহাসের পর্য্যায়গুলি অত্যন্ত অসংলগ্ন ও বিক্ষিপ্ত বলিয়া মনে হয়, তবে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই।

জাপানী লেখক ওকাকুরা সান্ তাঁহার "Ideals of the East" নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে আর্টের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে চীন, জাপান ও ভারতবর্ষে কোন মতবিভেদ নাই। কারণ এসকল দেশেই আর্ট একটি বড় অধ্যাত্মবোধ হইতে উৎসারিত হইয়াছে এবং সেই অধ্যাত্মবোধের মূল উৎসও এই ভারতবর্ষেই।

ইউরোপে মধ্যযুগে আর্টের সঙ্গে ধর্ম্মবোধের এই যোগ ছিল—ধর্ম্মসংস্কারের যুগে পিউরিট্যান-প্রভাবে সে যোগ ছিন্ন হইয়া যায়। কিন্তু সে যে কত বড় বিচ্ছেদ তাহা কেহ ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া দেখে নাই। তাহার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত আর্টকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রসজ্ঞ সমাজের মধ্যে বাঁধা রাখিয়া ক্ষীণপ্রাণ ও বিলাসী করিয়া তোলা হইয়াছে—সমস্ত জাতীয় প্রাণধারার সঙ্গে তাহার যোগ নাই--সে নীতিছাড়া ধর্ম্মছাড়া—সৌন্দর্য্যকে সে এমন একটি আকাশকুসুম করিয়া রাখিয়াছে যাহার মূল যুগযুগান্তরের মাটীর মধ্যে দৃঢ়রূপে নিহিত নহে।

হ্যাভেল বলেন ভারতবর্ষে এই বিচ্ছেদ আজ পর্য্যন্তও ঘটে নাই। সেইজন্য ভারতবর্ষীয় আর্টের উৎপত্তি অনুসন্ধান করিতে হইলে যে পরিপূর্ণ অধ্যাত্মবোধ এদেশে প্রথম জাগ্রত হইয়াছিল—তাহার সংবাদ সর্ব্বপ্রথমে লইতে হইবে। সে কবে? যে দিন "প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে, প্রথম সামরব তব তপোবনে।" সেই বৈদিক কালে।

কিন্তু বৈদিক কালে তো কোন আর্ট নাই—আমরা তো শুনিয়া আসিয়াছি যে গ্রীক্ আগমনের পর হইতেই গান্ধার শিল্পাদিতে আর্টের উদ্ভব। মাতৃগর্ভে দশমাস যখন শিশু বাস করে, তখন তো সে ভূমিষ্ঠ হয় না, সুতরাং তখন তাহার অস্তিত্বই নাই একথা কি বলা যায়? ঠিক তেমনি গ্রীকোরোমান্ ভাস্করগণ আসিবার অনেক পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় আর্টের তত্ত্বের সূচনা হইয়া গিয়াছে। যখন মিত্র বরুণ অগ্নি মরুৎ প্রভৃতি দেবতাগণ মানুষের প্রত্যক্ষ সঙ্গী—অগ্নি যজ্ঞে পৌরোহিত্য করেন, উষা ধনধান্য বর্ষণ করেন, পূষণ তাপের দ্বারা জগতকে পোষণ করেন, মরুৎগণ অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক ইন্দ্রের মেঘগুলিকে দশদিকে বিক্ষিপ্ত করেন, পর্জ্জন্যদেব স্বয়ং বিদ্যুতের স্বর্ণকশা দ্বারা তাহাদিগকে অভিক্ষিপ্ত করিয়া সমস্ত ধরণীর তাপ জুড়াইয়া দেন, শস্যকে উদ্ভিন্ন করেন— শুধু তাই নয়—যখন সমস্ত শক্তি একই শক্তির রূপান্তর—যে তেজোময় অমৃতময় শক্তি আকাশে থাকিয়া সমস্ত জানিতেছেন এবং অন্তরলোকেও সমস্তই জানিতেছেন, সেই এক অনাদ্যনন্ত মহান্ আত্মার দ্বারা সমস্ত নিখিলচরাচর পরিব্যাপ্ত—এই মহাসত্য উপনিষদ্কার ঋষিদিগের নির্ম্মল প্রজ্ঞালোকে উদ্ভাসিত হইল—ঠিক্ সেই সময়েই সেই বহুশতাব্দীপরের এলোরা অজন্তার গুহাচিত্রনিচয় এবং

ভারতবর্ষের অন্যান্য নানা আশ্চর্য্য শিল্পরচনার প্রথম সম্ভাবনা জাগিয়া উঠিল। সমস্ত বিশ্বভুবনের যিনি আত্মা, তিনি জীবাত্মার সঙ্গে এক—একেবারে অচ্ছেদ্য ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ—এই তত্ত্বই ভারতীয় শিল্পকলার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব। উপনিষদ এই তত্ত্বকেই সর্ব্বানুভূতি বলিয়াছেন—সর্ব্বানুভূতি মানে সকল পদার্থের মধ্যে পরমাত্মাকে অনুভব করা। যাহা বিশেষ নামধারণ করিয়া, বিশেষ প্রয়োজন সাধন করিয়া, বিশেষ একটি রূপের মধ্যে নানা বিকার বিকল্প লাভ করিতেছে, তাহা সেই নামরূপের সীমা যে অতিক্রম করিয়া অনন্ত অপরিসীম হইয়া আছে—যেখানে তাহার প্রাণ, যেখানে আনন্দ, যেখানে তাহার বাস্তবিক সত্তা—কি আশ্চর্য্য দিব্যদৃষ্টিতে সেই কোন্ সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই ভারতবর্ষের ঋষিগণ তাহা দেখিয়াছিলেন এবং সেই জন্যই এমন দ্বন্দ্বমূলক সব কথা নিঃসঙ্কোচে নির্ভয়ে বলিয়া গিয়াছেন যাহার অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া শক্ত—তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তস্বন্তিকে—তিনি চলেন, অথচ চলেন না, তিনি দূরে আছেন অথচ নিকটেও আছেন। যেখানে সমস্ত চলা সেখানে তাঁহার অনন্ত শান্তি সমস্ত ধারণ করিয়া আছে, যেখানে সমস্ত অবসান সেইখানে তাঁহার সৃষ্টির উদ্যম নব নব কর্ম্মচক্র রচনার আনন্দে পরিপূর্ণ। তিনি সমস্ত সীমাকে অতিক্রম করিয়া দূরাৎ সুদূরে রহিয়াছেন, অথচ তিনি এত নিকটে যে আকাশ ও কাল তাঁহার পক্ষে বাধাস্বরূপ হয়না। এই যে সীমাকে অনন্তে ব্যাপ্ত করিয়া পরিপূর্ণ করিয়া দেখা, ভারতীয় আর্টে ইহারি পরিচয় আমরা ক্রমাগতই পাইব।

একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে যাঁহারা এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয় শিল্পকলা লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন তাঁহারা কেহই বৈদিক যুগের এই জীবাত্মা-পরমাত্মার যোগের তত্ত্বটিকে ভাল করিয়া ধরেনও নাই এবং তাহার সঙ্গে যে ভারতের শিল্পকলার কোন নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে তাহাও তাঁহাদের ধারণার মধ্যেই আসে নাই।

না আসিবার কারণ আছে। যেখানে প্রথম ভারতীয় শিল্পকীর্ত্তি পাওয়া যায়, সে বৌদ্ধ স্তূপ। আমি পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে বৌদ্ধযুগের সঙ্গে বৈদিকযুগের সম্বন্ধ বিরোধী সম্বন্ধ বলিয়াই মনে হয়—সুতরাং বৌদ্ধস্তূপ স্তম্ভ গুহাচিত্রমালার মধ্যে বৈদিক যুগের কোন প্রভাব কল্পনা করা কি করিয়া চলে?

আমি একটু পূর্ব্বে বলিয়াছি যে বৌদ্ধ বিশ্বমৈত্রীর সাধনা এবং উপনিষদের সর্ব্বানুভূতির সাধনা একই জিনিষ। বুদ্ধদেব কেবল ধর্ম্মের তত্ত্বাঙ্গের দিকটা চাপা দিয়া তাহার সাধনাঙ্গের উপরে অধিকতর জোর দিয়াছিলেন—মুক্তি কি, আত্মা কি তাহা গোড়ায় আলোচনা ও বিচার না করিয়া সেই পথে একটু একটু করিয়া চলার অভ্যাস অধিকতর প্রয়োজনীয় মনে করিয়াছিলেন। Creed of Buddha নামক একটি গ্রন্থ পাঠ করিয়া এ কথার স্পষ্ট সাক্ষ্য পাওয়া যায়। সুতরাং পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বৌদ্ধধর্ম্মকে উপনিষদীর ধর্ম্মের একটি বিশেষ বিকাশ রূপে দেখিলে বৌদ্ধযুগের আর্টকে একেবারে আধ্যাত্মিকতাশূন্য গ্রীকোরোমান শিল্পের নকল বলিয়া বিদায় দেওয়া যায় না।

কিন্তু সাঞ্চী বরহুত অমরাবতী প্রভৃতির স্তূপ ও ভাস্কর্য্য যে অনুকরণ নয় এ কথার প্রমাণ কোথায়? যাহা প্রত্যক্ষ দিবালোকের মত দেখা যাইতেছে, তাহাকে গায়ের জোরে অস্বীকার করা তো চলে না। তাহার পূর্ব্বে ভারতবর্ষে কোন্ আর্ট ছিল?

হ্যাভেল সে কথা অস্বীকার করেন না। তিনি এই যুগকে Transition অর্থাৎ পরিবর্ত্তনের মুখের একটা যুগ বলিয়াছেন। এই সময়ে ভারতবর্ষ নানা দেশ হইতে শিল্পসম্ভার সংগ্রহ করিতেছিল—সেই সংগ্রহের কার্য্যের পরে যে যুগ আসিল তাহাই সৃষ্টির যুগ—তখনই যে তত্ত্বের কথা আলোচনা করিতেছিলাম তাহার প্রয়োজন হইয়াছিল। যেটা মাঝখানের একটা পর্ব্ব তাহাকে প্রারম্ভ মনে করাতেই ভুল হইয়াছে কারণ আর্ট মানে তো কতগুলি ছবি ভাস্কর্য্য রং ও মালমসলা নহে, তাহার প্রাণই হইতেছে একটি তত্ত্ব, একটি আইডিয়া—যাহা নিয়ামক ও প্রবর্ত্তক রূপে

থাকিয়া তাহাকে নানা রচনাতে সার্থক করিয়া তুলিতেছে। সুতরাং প্রারম্ভ খুঁজিতে হইলে সেই আইডিয়াতে যাইতে হইবে—আরকিয়লজিতে নহে।

ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ প্রভৃতির ন্যায় হ্যাভেল বরহুত ও সাঞ্চী স্তূপকেও সম্পূর্ণরূপে গ্রীক নকল বা পারস্য নকল বলিতেও প্রস্তুত নহেন। ভারতবর্ষীয় অনার্য্য দ্রাবিড়গণ যে শিল্পনিপুণ ছিল তাহা সকলেরই জানা কথা। সম্রাট্ অশোক যখন স্তূপাদি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তখন তিনি যে অনার্য্য শিল্পীদিগের সাহায্য পান্ নাই, এ কথা বলা চলে না। পারস্য দেশের স্তম্ভের ন্যায় অনেক বৈদেশিক অনুকরণচিহ্নের বিদ্যমানতা সত্ত্বেও সেই সময়ের স্তূপ ও ভাস্কর্য্যের মধ্যে এদেশীয় স্বকীয় সৃষ্টিরও অনেক লক্ষণ রহিয়াছে। অশোকেব পূর্ব্বে ভারতবর্ষের কাষ্ঠের স্থাপত্য প্রচলিত ছিল, সেগুলি চিহ্নমাত্রে বিলুপ্ত হইয়াছে—কিন্তু যদি কোন দিন গঙ্গাগর্ভ হইতে বা রাজপুতানার মরুভূমি হইতে মিসর ও ক্রীটের ন্যায় প্রাচীন কালের সকল কীর্ত্তি বাহির হইয়া পড়ে, তখন অশোকের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে যে শিল্পচেষ্টা কিরূপ ছিল তাহা জানিতে কাহারও বিলম্ব হইবে না এবং সংশয়েরও কোন স্থান থাকিবে না।

অশোক রেলিংয়ের চিত্রমালায় কোন বড় ভাবের পরিচয় পাওয়া যায় না সত্য। বুদ্ধমূর্ত্তি তখনও দেবমূর্ত্তি রূপে পূজিত হইতে আরম্ভ করে নাই। যেসকল যক্ষ রক্ষ লোকপাল প্রভৃতির মূর্ত্তি দেখা যায়, তাহারা নৈসর্গিক (naturalistic) ভাবেই বেশি পূর্ণ—এই নৈসর্গিকতার একটা নবীন ভাব সেই চিত্রমালার মধ্যে স্ফুট বটে।

হ্যাভেল বলেন যে, এই একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা গিয়াছে যে ভারতবর্ষের উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব যেখানে গিয়া পড়ে নাই, সেইখানেই এই নৈসর্গিকতার ভাব আর্টে দেখা যায়।

তিনি বলেন চীন আর্টেরও ইহাই বিশেষত্ব। মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম চীনে যাইবার পূর্ব্বে চীনদেবতারা ঠিক্ অশোকের স্তূপের এইসকল প্রাকৃত দেবতাদের মতই আকারপ্রকারবিশিষ্ট ছিলেন।

যাহাই হৌক্ এই যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আর যখন নালন্দা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপতি হইয়াছিল সেই সময় পর্য্যন্ত এই নানাস্থানের নানা সংগ্রহকার্য্য চলিয়াছিল। এই সংগ্রহের যুগের পরেই সৃষ্টির যুগ—আদিম দ্রাবিড়শিল্প, পার্সিপলিটান্ অর্থাৎ পারস্যের শিল্প,—গ্রীকোরোমান্-গান্ধারশিল্প—এসমস্তই একত্র করিয়া সমস্তকে একটি বড় অধ্যাত্মবোধের দ্বারা, শুষ্ক অরণির মধ্যে অগ্নি সম্প্রদানের ন্যায়, পূর্ণ করিয়া এক অভিনব ভারতবর্ষীয় শিল্পরচনার কাল পরে উপস্থিত হইল।

যখন মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মে বুদ্ধ ভগবান বলিয়া পূজিত হইতে লাগিলেন, তখনই সংগ্রহের যুগ শেষ হইয়া আসিল। তখন যেমন ইউরোপে মধ্যযুগে কত কত শিল্পী খৃষ্টের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সমস্ত জীবনের ঘটনাকে কত কত চিত্রে স্থাপত্যে অঙ্কিত করিয়া গিয়াছে, তেমনি এই সময়ে, কত মন্দিরে, কত বিহারচৈত্যে, কত গিরিগুহায়—যেখানে যেখানে বিশ্বপ্রকৃতির কোন আশ্চর্য্য রূপ খুলিয়া গিয়াছে, এবং মানুষের পূজা আসিয়া সেই রূপের উপরে একটি ভক্তির রহস্য মাখাইয়া দিয়াছে—সেই-সেইখানে ভগবান অমিতাভ ভারতবর্ষীয় শিল্পীচিত্তের সমস্ত ভক্তি ও কল্পনাকে লুণ্ঠন করিয়া লইলেন। তাঁহার প্রবুদ্ধ সকলবন্ধমুক্ত দেবমূর্ত্তিতে সমস্ত ভারতবর্ষ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। সিংহলে, জাভায়, চীনে সর্ব্বত্র সেই মূর্ত্তি লোকহৃদয়ে আপনার অমর সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিল।

ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ গান্ধারশিল্পকে ভারতবর্ষীয় শিল্পের জনক বলিয়াছেন। সেই শিল্পে বুদ্ধের তপোমূর্ত্তিকে একটা জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কাল করিয়া গড়িয়াছে। কিন্তু এই যুগে যথার্থ ভারতশিল্পী তাঁহাকে প্রাচীন মহাকাব্যোক্ত নরসিংহ করিয়া গড়িল—তাঁহার ললাট দীপ্ত, লোচনদ্বয় স্নিগ্ধ, বর্ণ গৌরোজ্জ্বল, শরীর বীর্য্যশালী, তিনি পদ্মাসনে আসীন! তিনি যে ভিতরে যথার্থই সকল বাসনাপাশ হইতে মুক্ত হইয়া পরম শান্তিলাভ করিয়াছেন, এ তাহারি মূর্ত্তি! মানুষের

ভক্তি এই নরোত্তমের মধ্যে যে দিব্য সৌন্দর্য্যকে দেখিয়াছে, কোন্ বাহ্য সৌন্দর্য্য তাহার সঙ্গে তুলনীয় হয়! গ্রীক্‌শিল্পকে ভারতশিল্পের জনক বলা বাস্তবিকই কি হাস্যাস্পদ!

সিংহলে ও জাভায় বুদ্ধের যে অবলোকিতেশ্বরের মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, কোন দেশের কোন স্থাপত্যে তাহার তুলনা মিলে না! বুদ্ধ পদ্মাসনে বসিয়া আছেন, তাঁহার উষ্ণীষের উপরে একটি ক্ষুদ্র ধ্যানীবুদ্ধমূর্ত্তি। মহাযান বৌদ্ধসম্প্রদায়ের বিশ্বাস ছিল যে পূর্ব্বে এক আদি বুদ্ধ ছিলেন, তাঁহার বহু হইবার বাসনা হইল—সেই বাসনার নাম প্রজ্ঞা—আদি বুদ্ধে এবং প্রজ্ঞায় মিলিয়া কয়েকটি ধ্যানীবুদ্ধ সৃষ্টি করিলেন—সমস্ত সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার মধ্যে তাঁহারা নিগূঢ় ভাবে বিরাজমান। এই অবলোকিতেশ্বরের উষ্ণীষস্থাপিত ধ্যানীবুদ্ধের নাম অমিতাভ। যাক্ তারপর, পিপ্পল পত্রের ন্যায় একটি জ্যোতির্মণ্ডল বুদ্ধের মস্তক আবৃত করিয়া আছে, তাঁহার বামকরতলে ধর্ম্মচক্র মুদ্রাচিহ্ন—তাঁহার দক্ষিণকরতল উদার উন্মুক্ত—তাহাতে বরমুদ্রা চিহ্ন বিদ্যমান। তিনি ধ্যাননিমগ্ন, সমস্ত শরীরের উর্দ্ধভাগ ঋজু, দক্ষিণ পদতল মেলিয়া দিয়াছেন তাহা একটি শতদলের উপরে স্থাপিত—সেই শতদল নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের চিহ্ন। আধ্যাত্মিক শান্তির এমন আশ্চর্য্য প্রবল প্রকাশ—চীন জাপানের কোন বুদ্ধমূর্ত্তিতে দেখা যায় নাই।

ধ্যানীবুদ্ধের এই কল্পনা কি আপনি কোন মূর্ত্তিকারের মাথায় আসিয়াছিল? না—নিশ্চয়ই এই ধ্যানপরায়ণতা, এই যোগনিমগ্নতা বৈদ্যুতশক্তির মত সমস্ত দেশের আকাশকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছিল—সূচীভেদ্য তিমির রহস্যাবগুণ্ঠন ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুদ্দীর্ণ হইয়া উন্মোচিত হইবার উপক্রম করিতেছিল। ইউরোপীয় শিল্পী যেমন নানা প্রকার বাহ্যিক কসরৎ করিয়া শিল্পের হাত পাকায়, আমাদের দেশে তেম্‌নি এই ধ্যানশীলতাকে অভ্যাস করিতে হইত—ইহারি জন্য এদেশের শিল্পী আপনার শিল্পবিষয়ে তন্ময় হইয়া একাত্ম হইয়া যাইতে পারিতেন এবং সেরূপ একাত্মভাব ভিন্ন এরূপ সত্যশিল্প কখনই ফুটিত না।

এইসকল ধ্যানমূর্ত্তি কাহারা অতি যত্নে কুঁদিয়া তুলিয়াছে? আজ তাহাদের নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত—কারণ তাহারা নামের লোভে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় নাই। সেইজন্য দেখা যায় যে ভারতশিল্পে চিত্রকলার চেয়ে ভাস্কর্য্যই বেশি। যাহা সকলের চেয়ে দুরূহ ও পরিশ্রমসাধ্য এবং সকলের চেয়ে দীর্ঘকালস্থায়ী সেই কার্য্যেই ভারতশিল্পী আপনার মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়াছে। যেখানে সমস্ত দেশের পূজা আসিয়া মিলিত হইয়াছে— সেইখানে দেবমন্দিরের এক পার্শ্বে সেও আপনার শিল্পপূজাকে বহন করিয়া আনিয়াছে—তাহার শ্রেষ্ঠ কল্পনার পূজা, নির্ম্মল সৌন্দর্য্যানুভবের পূজা, পরিপূর্ণ আত্মবিস্মৃতির পূজা—পরমধ্যানের অনুধ্যানের পূজা! ইহাই তো মানবের শ্রেষ্ঠ আর্ট—যেখানে মানুষ ধ্যানে যে গভীরতম উপলব্ধির চিত্রের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছে, তাহাকে অতি যত্নে পাথরের মধ্য হইতে ফুটাইয়া তুলিয়া অনন্তকালের মধ্যে অমর করিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

যাহাই হোক্ বৌদ্ধধর্ম্মের পরিণামে এই যে আদর্শ মনুষ্য বা যাহা একই কথা মানবরূপী দেবতার পূজা জাগিল, তাহা কেবলমাত্র বৌদ্ধদের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিল না। জৈনদের মধ্যে, ব্রাহ্মণদের মধ্যেও সেই একই ভাবের প্রভাব এই সময়ে লক্ষ্য করা যায়। তাহার কারণ মতামতের দিক্ দিয়া জৈনধর্ম্মে, আর্য্যধর্ম্মে, বৌদ্ধধর্ম্মে যতই অনৈক্য থাকুক্—ইহারা সকলেই একটি জায়গায় মেলে যে বাসনাবন্ধন হইতে মুক্তি মানুষ যে বহু তপস্যার দ্বারা অর্জ্জন করিয়া থাকে তাহাই মানুষের শ্রেষ্ঠরূপ।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বৈদিকধর্ম্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের, বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে পৌরাণিকধর্ম্মের যেসকল আত্যন্তিক বিরোধ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কল্পনা করিয়া থাকেন, তাহা সত্য নহে। বস্তুত, ইহারা একটি অন্যটির পরিণাম—পৌরাণিক ধর্ম্ম যে বৌদ্ধধর্ম্মেরই পরিণাম তাহা একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলেই প্রতীতি হইবে।

বৌদ্ধধর্ম্মে ভক্তিবাদ উপস্থিত হইলে যখন বুদ্ধ আর মানুষ রহিলেন না, দেবতা হইলেন, তখন তিনি এক অজর অমর আদি বুদ্ধের প্রজ্ঞাপ্রসূত মানসরূপী ধ্যানী বুদ্ধের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন। এই ধ্যানী বুদ্ধগণ পরিপূর্ণ অধ্যাত্ম ভাবমাত্র; কালে কালে ইঁহারাই মানবের মধ্যে মানবরূপ ধরিয়া পৃথিবীতে মঙ্গল সাধন করিয়া যান্। মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মে এই অবতারবাদের প্রথম উৎপত্তি, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়া আসিয়াছি।

পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম এই অবতারবাদের তত্ত্বটিকেই আরও ব্যাপকতর গভীরতর করিয়া লইয়াছে। যে তত্ত্ব কেবল একজন মহাপুরুষকে আশ্রয় করিয়াছিল, তাহাকে সমস্ত বিশ্বব্যাপী একটি বিরাটতত্ত্বে পৌরাণিক ভক্তিধর্ম্ম মুক্তিদান করিল। সেই বিশ্বতত্ত্বটি কি? সেটি আমাদের দেশের চিরপরিচিত প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব। বিশ্বকে পুরুষ এবং স্ত্রী এই দ্বৈতশক্তির লীলাক্ষেত্র করিয়া দেখা।

প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা, অর্থাৎ ত্রিগুণের অধীন হইয়া কার্য্য করে, পুরুষ অথবা আত্মা ত্রিগুণাতীত, অর্থাৎ দ্রষ্টা এবং সাক্ষী মাত্র। এই ত্রিগুণতত্ত্ব পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার গীতাপাঠের ভূমিকায় যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা এই :—ত্রিগুণ অর্থাৎ সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণ। তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ এইরূপ :— সত্ত্বগুণের পরিচায়ক লক্ষণ দুইটি, প্রকাশ এবং আনন্দ। প্রকাশ এবং আনন্দের বাধা হইতেছে জড়তা বা অবসাদ ও অশান্তি বা প্রবৃত্তিচাঞ্চল্য। জড়তায় প্রকাশ বাধাগ্রস্ত হয়, প্রবৃত্তিচাঞ্চল্যজনিত অশান্তিতে আনন্দ বাধাগ্রস্ত হয়। জড়তার বাধার নাম তমোগুণ, প্রবৃত্তিচাঞ্চল্যের বাধার নাম রজোগুণ। রজোগুণ তমোগুণের বিপরীত—তমঃ মানে অসাড়তা—তাহার বাধাজনিত যে চাঞ্চল্য ও দুঃখ তাহাই রজোগুণ। সুতরাং এই তিনগুণের ক্রম এইরূপ—নীচে তমোগুণ তার উপরে রজোগুণ—ও সর্ব্বোপরি সত্ত্বগুণ। ব্যষ্টিসত্তা মাত্রেই আমরা এই ত্রিগুণের পরস্পরের দ্বন্দ্ব দেখিতে পাই—প্রত্যেক বস্তুই সেখানে জড়তা ছাড়াইয়া উদ্যমে এবং উদ্যম ছাড়াইয়া আনন্দে ও প্রকাশে বা যাহা একই কথা তাহার বাস্তবিক সত্তায় অধিরূঢ় হইতে চাহিতেছে। কিন্তু সমষ্টিসত্তায় এরূপ কোন বাধার সম্ভাবনা নাই বলিয়া সেইখানে সাত্ত্বিক আনন্দ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান।

ঐ প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্বকেই শিব ও শক্তি প্রভৃতি বিচিত্র রূপকে ধ্যান করিবার একটা উদ্যোগ পৌরাণিক কালে লক্ষ্য করা যায়। এলিফ্যাণ্টা প্রভৃতি গুহাতে ত্রিমূর্ত্তি অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের সম্মিলিত মূর্ত্তি খোদিত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মে এই ত্রিমূর্ত্তিই বুদ্ধ সঙ্ঘ ও ধর্ম্ম নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। বোধ হয় এই তিনের আইডিয়াটা এক সময়ে আমাদের দেশকে খুব অধিকার করিয়াছিল—দুই দিকে দুই কোটি এবং মাঝখানে তাহার সামঞ্জস্য। ইহার সঙ্গে হিগেলের Thesis Antithesis Synthesis তত্ত্বের সাদৃশ্য আছে—আমরা যাহাই ভাবি তাহা দ্বন্দ্বমূলক—আলো ভাবি তো তাহার উল্টা অন্ধকার আছে—ভাল ভাবি তো মন্দ আছে—এই দ্বন্দ্ব আবার মিলিত হয় একটি Absolute-এ বা পরিপূর্ণে—নহিলে দ্বৈত পাকাপাকি ভাবে থাকিয়াই যায়। অবশ্য ত্রিমূর্ত্তির আইডিয়াতে এই দ্বৈতাশ্রয়ী অদ্বৈততত্ত্বের কোন স্থান নাই—তবে সেখানেও ঐ একটি আইডিয়া ছিল যে একদিকে আরম্ভ অন্যদিকে পরিণাম মাঝখানে স্থিতি—একদিকে ব্রহ্মা অন্যদিকে মহেশ্বর মাঝখানে বিষ্ণু।

ঐতিহাসিক দিক্ দিয়া আলোচনা করিতে গেলে ত্রিমূর্ত্তির এই তিন দেবতার মধ্যে শিব স্পষ্টতই অনার্য্য দেবতা। তাঁহার ভূত প্রেত প্রভৃতি দলবল, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আনুষঙ্গিক রূপে যে লিঙ্গপূজা এদেশে প্রচলিত আছে, প্রভৃতি নানা অনার্য্য চিহ্নই তাহার সাক্ষী। বিষ্ণুর সঙ্গে সঙ্গে যে গোপবেশী শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা জড়িত হইয়া আছে, তাহাকেও অনার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা কঠিন নহে। সুতরাং বৌদ্ধযুগের অবসানকালে দ্রাবিড় ও আর্য্য সভ্যতা মিলিত হইয়া গিয়া যে একটি আশ্চর্য্য বৈচিত্র্য লাভ করিয়াছিল, একথা নিঃসন্দেহরূপে

ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। কলাবিদ্যায় দ্রাবিড়গণ নিপুণ ছিল, তত্ত্বজ্ঞানে আর্য্যগণের শ্রেষ্ঠত্ব ছিল—কলার সঙ্গে তত্ত্বের মনোহর সম্মিলন ঘটিতেই অনার্য্য দেবতাগণ একটি বৃহৎ আইডিয়ার মহিমা পাইলেন—তাঁহারা একটি বৃহৎ বিশ্বতত্ত্বের বিগ্রহরূপ হইয়া উঠিলেন। সেই তত্ত্বই প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব, যাহার কথা বলিতেছিলাম।

যাহাই হৌক এই ত্রিমূর্ত্তির মধ্যে আবার প্রত্যেকেরই পুরুষ ও প্রকৃতি এই দুই দিকই বিদ্যমান। ব্রহ্মা যেখানে পুরুষ সেখানে তিনি বিশুদ্ধসত্তা মাত্র, যেখানে প্রকৃতি সেখানে সৃষ্টিকর্ত্তা। বিষ্ণু যেখানে পুরুষ সেখানে চিৎশক্তি, যেখানে প্রকৃতি সেখানে রক্ষাকর্ত্তা পালনকর্ত্তা। শিব যেখানে পুরুষ সেখানে বিশুদ্ধ মঙ্গল, যেখানে প্রকৃতি সেখানে প্রলয়কর্ত্তা।

প্রকৃতিরাজ্যে ত্রিগুণের পরস্পরের দ্বন্দ্বাদ্বন্দ্বির জন্য ভালমন্দ সুন্দরঅসুন্দর জন্মমৃত্যু সুখদুঃখ প্রভৃতি যেসকল বিরোধ বৈপরীত্য দেখা যায়, সমষ্টিসত্তার মধ্যে সেসকলের কোন স্থান নাই, কারণ সমষ্টিসত্তা ত্রিগুণাতীত—এই ভাবটি সকল দেবতারই ভিতরকার ভাব। শিব প্রলয়কারী ভীষণ রুদ্র দেবতা—কিন্তু তিনিই মঙ্গল—সকল বাহ্য প্রাকৃতিক অমঙ্গালের অন্তরতর স্থানে যে মঙ্গল রহিয়াছে, সেই মঙ্গল তিনি। কালী করালী—সংহার প্রলয়কারিণী মহাশক্তি—অথচ তিনিই বিশ্বমাতা—প্রাকৃতিক সমস্ত ভীষণতার অন্তরতর স্থানে একটি পূর্ণ প্রেম ও মঙ্গালের ভাব নিত্য বিরাজিত—তাহাই কালীর যথার্থ স্বরূপ।

হ্যাভেল বলেন ত্রিমূর্ত্তির যেসকল স্থাপত্য পাওয়া যায় তাহা হইতে স্পষ্টতই মনে হয় যে হিমালয়ের অনেক দৃশ্যের অভিব্যঞ্জনা ঐসকল তত্ত্বকে রূপ দান করিবার কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছে। খুব সম্ভব ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এ তিনই সূর্য্যের ভিন্ন ভিন্ন সময়ের রূপ। ব্রহ্মা উদয়কালীন সূর্য্য—যখন ভুবনকমল মুকুলিত হইতেছে; বিষ্ণু মধ্যাহ্ন রবি—শেষ নাগের উপরে অনন্ত বিশ্বসমুদ্রের উপরে নিদ্রিত—শেষ নাগ অনন্তকালের চিহ্ন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে বেষ্টন করিয়া আছে; এবং মহেশ্বর অস্তকালীন ভানু এবং সেই জন্যই শশিমৌলি—কারণ সূর্য্য অস্তগমন করিলে অন্ধকার-অসুরগণকে দলন করিবার নিমিত্ত তিনি চন্দ্রকে মস্তকে ধারণ করিয়াছেন। বিশ্বপ্রকৃতির সহিত এইসকল দেবমূর্ত্তির যোগ কিছুমাত্র অসম্ভব নহে; কারণ ভারতবর্ষের সমস্ত ধ্যান ধারণা উপাসনা বিশ্বপ্রকৃতির প্রভাবকে সর্ব্বত্রই স্বীকার করিয়াছে। এমনকি আমার মনে হয় গায়ত্রী মন্ত্রও আদিম সৌরোপাসনার সঙ্গে জড়িত হইয়া আছে—যে জন্য ত্রিসন্ধ্যা তাহাকে ধ্যান করিবার নির্দ্দেশ সকল আর্য্য সন্তানের সম্বন্ধেই বর্ত্তমান। স্মরণাতীত কাল হইতে প্রভাতে ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত এদেশে ধ্যানের প্রশস্ত কাল বলিয়া কথিত হইয়া আসিতেছে, সেই সময় প্রত্যহই অন্ধকারের গর্ভ হইতে বিশ্বপদ্ম উন্মীলিত হয়—প্রত্যহের সেই নবীন সৃষ্টির মধ্যে সেইজন্য শিল্পী ব্রহ্মার মূর্ত্তি ধ্যান করিয়াছে। লিডেন মিউজিয়মে জবদ্বীপ হইতে ব্রহ্মামূর্ত্তি আনীত হইয়াছে। আমাদের দেশে জল হইতে সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে এরূপ বিশ্বাস আছে, তাই ব্রহ্মার বাহনও হংস—মানস-সরোবরবাসী। সেই হেতু হিমালয়ের মধ্যে এই আর্টের প্রেরণা জাগিয়াছিল, হ্যাভেল এই অনুমান করিতেছেন।

তারপর বিষ্ণুমূর্ত্তি—বর্ণ গভীর নীল—হিমালয়ের মধ্যাহ্ন আকাশের মত। ঋজুস্তম্ভের মতন মূর্ত্তি, কারণ তিনি সমস্ত বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছেন, তাঁহার বাহন গরুড়—দিগন্তবিস্তৃত পক্ষ মেলিয়া দিয়া নিস্পন্দ নিশ্চল হইয়া আছে। হিমাচলের পক্ষবিস্তারকারী নীল পর্ব্বতমালার সঙ্গে ইহার সাদৃশ্য আছে। বিষ্ণুর সুদর্শনচক্র দশদিকে বিকীর্ণ সূর্য্যরশ্মির সঙ্গে তুলনীয়।

তারপর শিব—প্রলয়-দেবতা। হিমালয়ের প্রচণ্ড ঝটিকা, দাবানল, ভূমিকম্প, শৈলস্খলন প্রভৃতি এই রুদ্র দেবতাকে হয়ত সৃষ্টি করিয়া থাকিবে; অথচ এসমস্ত দুর্য্যোগ বিপদ্‌পাতসত্ত্বেও হিমাচলের উত্তুঙ্গ অভ্রভেদী মহিমা যেমন অক্ষুণ্ণ অপরিম্লান, প্রভাতে সূর্য্যালোকে মেঘনির্ম্মুক্ত ধ্যাননিমগ্ন তাহার নীলকণ্ঠ যেমন আশ্চর্য্য—সায়াহ্নে অন্ধকারজটাজূটগহন

জটিলতার উপর চন্দ্রকলার নির্ম্মল কিরণধারা যেমন মনোরম—এই প্রলয়ঙ্কর ভীষণ দেবতার অন্তরতর স্থানে তেমনি একটি নিশ্চলগম্ভীর ধ্যানমৌন মহিমা বিরাজ করিতেছে।

কালিদাসও মেঘদূতে কৈলাসবর্ণনায় সেই কথা লিখিয়াছেন :—

শৃঙ্গোচ্ছায়ৈঃ কুমুদবিশদৈর্যো বিতত্যস্থিতঃ খং
রাশীভূত প্রতিদিনমিব ত্র্যম্বকস্যাট্টহাসঃ॥

কৈলাসপর্ব্বত কুমুদবিশদতা ও শৃঙ্গের উত্তুঙ্গতার দ্বারা আকাশকে ব্যাপ্ত করিয়া প্রতিদিন ত্র্যম্বকের রাশীভূত অট্টহাস্যের ন্যায় স্থিত হইয়া আছে। কালিদাসের এই শ্লোকটি হিমালয়ের সঙ্গে শিবের সারূপ্য ঘোষণা করে। হিমালয়ের তুষারজটা হইতেই গঙ্গা প্রভৃতির ধারা বিনির্গত হইয়াছে, শিবের জটা হইতে গঙ্গা নিঃসৃত হইবার পুরাণকথাও সর্ব্বজনবিদিত।

হ্যাভেল ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব এই তিন দেবতাকেই হিমালয়ের দেবতা বলিলেও বাস্তবিকই একা শিব ভিন্ন আর কাহারও মধ্যে হিমালয়ের ভাবসঙ্গতি বড় দেখা যায় না। ব্রহ্মার হংস বা বিষ্ণুর নীলবর্ণ তাঁহাদিগকে হিমালয়ের সঙ্গে যুক্ত করিবার যথেষ্ট কারণ নহে। অবশ্য শিব যে স্পষ্টতই হিমালয়ের দেবতা সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই।

এই ত্রিমূর্ত্তির সম্মিলিত চিত্র এলিফ্যান্টা গুহায় দেখিতে পাওয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তথাপি ইহা বিরল। তাহার কারণ এই যে ভারতবর্ষে বিষ্ণু ও শিব এই দুই দেবতা ব্রহ্মাকে সরাইয়া দিয়া পরস্পরের মধ্যে তাঁহাদের পূজক ভাগ করিয়া লইয়াছেন। বিষ্ণুর ভাগে পড়িয়াছে উত্তর ভারতবর্ষ যেখানে অধিকাংশ বৈষ্ণবসম্প্রদায় দেখা যায়, শিবের ভাগে পড়িয়াছে দাক্ষিণাত্য যেখানে শৈবসম্প্রদায়ের লোক বেশি।

অথচ বিষ্ণু ও শিব প্রত্যেকেই তাঁহাদের নিজের নিজের উপাসকের নিকটে ত্রিমূর্ত্তি একাধারে। বিষ্ণু যুগে যুগে অভিব্যক্তির নানা পর্য্যায়ে অবতীর্ণ হইয়া ধরণীকে রক্ষা ও পালন করিয়াছেন; এলোরার ভাস্কর্য্যে বিষ্ণুর সেই দশাবতারের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। বিষ্ণুর গোপবেশী মূর্ত্তিই কৃষ্ণমূর্ত্তি।

এলিফ্যান্টাতে এলোরাতে শিবের তাণ্ডব নৃত্যের মূর্ত্তি আছে। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু সেইরূপ মূর্ত্তি চিত্রিত করাতে অনেকের নিকটে ব্যঙ্গভাজন হইয়াছেন। ভগবানের যে বিরাট আনন্দ হইতে সমস্ত জন্ম লইতেছে, স্থিতি করিতেছে, এবং যাঁহার আনন্দে সমস্ত বিলীন হইতেছে, তাঁহার সেই বিরাট্ আনন্দে তিনি উচ্ছ্বসিত হইয়া নৃত্য করিতেছেন। তাঁহার হাতে ডিমি ডিমি ডমরু বাজিতেছে—সেই ডমরুর ধ্বনি এই চরাচর জীবনের যে একটি অশ্রুত স্পন্দন, যাহা অনাদিকাল আকাশে ক্রন্দন করিতেছে, যে জন্য বৈদিক ঋষি আকাশকে ক্রন্দসী রোদসী বলিয়াছেন—এত বড় একটা মহাশ্চর্য্য মহাগম্ভীর ভাব কি অনায়াস অবলীলার সঙ্গে ভারতবর্ষীয় শিল্পী কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে!

ভারতশিল্পে এই ত্রিমূর্ত্তির ভাস্কর্য্যে শ্রেষ্ঠ পুরুষের আদর্শকে দৈবভাবে পূর্ণ করিয়া কিরূপে ধ্যান করা হইয়াছে তাহা আমরা দেখিলাম। দেখা গেল যে বৌদ্ধধর্ম্ম হইতেই এ ভাবটি এদেশীয় শিল্পী লাভ করিয়াছে। এখন শ্রেষ্ঠ নারীর আদর্শকে কোন্ দৈবভাবে পূর্ণ করিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা হইয়াছে, তাহা দেখিলেই শিল্পসাধনার পূর্ণাঙ্গ দেখা হয় না কি?

ত্রিমূর্ত্তির প্রত্যেকটিরই এক একটি স্ত্রীজুড়ি রহিয়াছে। ব্রহ্মার পাশাপাশি সরস্বতী, বিষ্ণুর পাশাপাশি লক্ষ্মী, মহেশ্বরের পাশাপাশি গৌরী। সৃষ্টিকর্ত্তার সঙ্গে সৃষ্টিতত্ত্বের সৌন্দর্য্যতত্ত্বের ও সকল বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী রহিয়াছেন—তেমনি যিনি পালনকর্ত্তা তাঁহার স্ত্রীরূপ লক্ষ্মী, সকল সমৃদ্ধি ও সম্পদ্, এবং যিনি প্রলয়কর্ত্তা তাঁহার স্ত্রীরূপ মহাশক্তি, কালী ও দুর্গা।

বৌদ্ধযুগে যখন বুদ্ধ দেবতারূপে পূজিত হইতে

আরম্ভ করিয়াছেন তখনও স্ত্রীলোকের মূর্ত্তি বৌদ্ধশিল্পে স্বাভাবিক ও সাধারণই রহিয়া গিয়াছে—তাহাতে কোন আইডিয়া দেওয়া হয় নাই। বৌদ্ধধর্ম্মে যখন ভিক্ষুর সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষুণীরা নির্ব্বাণপদকামিনী হইলেন, তখন তাঁহাদের সমাজবন্ধন ও লোকাচার খসিয়া গেল। তথাপি তাঁহারা খৃষ্টীয়ধর্ম্মের কুমারী তাপসীগণের ন্যায় আজন্ম কৌমার্য্য রক্ষা করিলেও তাঁহাদিগকে কোন শিল্পী আপনার ধ্যানের বিষয় করিয়া তুলিল না।

সুতরাং বৌদ্ধযুগে এই ভিক্ষুণীর আদর্শ থাকা সত্ত্বেও তখন এবং তাহার পরে সকল কাব্যে ও শিল্পে স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য নিতান্ত স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভাবেই চিত্রিত হইয়া চলিল।

তন্বীশ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ
শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং
যা তত্র স্যাদ্ যুবতিবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ।

এই বর্ণনাই প্রাচীন সাহিত্যে শিল্পে স্ত্রীমূর্ত্তির চরম আদর্শ। কিন্তু এই যে বাহ্য সৌন্দর্য্যের প্রকাশ, এই যে ভোগের চিত্র, ভারতবর্ষ কখনই এইখানে থামিয়া যাইতে পারে নাই—যে সৌন্দর্য্য তপস্যার দ্বারা পূত নির্ম্মল অন্তরতর সৌন্দর্য্য নহে তাহা কখনই ভারতবর্ষীয় চিত্তকে চিরদিনের মত ভুলাইতে পারে না।

সেই জন্যই ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ কবির কাব্যে নারীর আদর্শের যে একটি পরিপূর্ণ চিত্র পাওয়া যায় তাহা যে-কোন সাহিত্যে দুর্লভ। কবি কালিদাস পার্ব্বতীকে বাহ্য-সৌন্দর্য্যের সমস্ত আয়োজনের দ্বারা সম্পূর্ণ করিয়া আঁকিয়াছেন—অকাল-বসন্তকে ডাকিয়া আনিয়া যদি কোথাও কিছু অভাব থাকে তাহাও পূরণ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু সেই সৌন্দর্য্যকে সহায় করিয়া কাম যখন অনুত্তরঙ্গ নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় ধ্যানমগ্ন যোগীশ্বরের ধ্যানভঙ্গ করিতে উদ্যত হইল, তখন তাঁহার অধ্যাত্মনেত্রের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ কামকে এক নিমেষে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিল। তখন গৌরী তাঁহার রূপকে নিন্দা করিয়া তপস্যায় নিরত হইলেন, অগ্নিতপা হইয়া অপর্ণা হইয়া আপনার বাহ্যরূপকে দগ্ধ করিয়া যখন তাঁহার আত্মার নির্ম্মলতর রূপ জাগিল, তখনই ছদ্মবেশী মহাদেব আসিয়া তাঁহার মন পরীক্ষা করিয়া তাঁহার কাছে ধরা দিলেন। এত বড় আশ্চর্য্য স্ত্রীসৌন্দর্য্য কোন্ কবির হাতে কোন্ শিল্পীর হাতে এমন নিপুণভাবে চিত্রিত হইয়াছে?

পার্ব্বতীর এই তপোমূর্ত্তিই দাক্ষিণাত্যের অনেক মন্দিরে দেখা যায়।

আমি জানি কোনো কোনো পাঠকের মনে অনিবার্য্যরূপে এই প্রশ্ন উঠিবে যে আমাদের দেশে এইসকল মূর্ত্তিপূজা হইতে যে ধর্ম্মের মধ্যে নানা বিকার উপস্থিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে কি বলিতে চাও? আর্টের দিক্ দিয়া এইসকল মূর্ত্তির সার্থকতার ব্যাখ্যা করিলে কি সেই বিকারকে মুখস পরাইয়া রাখা হইবে না?

ইহার উত্তর বর্ত্তমান প্রবন্ধে কখনই সম্পূর্ণরূপে দেওয়া যায় না, কারণ ইহা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গ। এখানে কেবল এই কথাই বলি যে আমি খুব মনে করি, যে, আমাদের দেশে শিল্পের সাধনার সঙ্গে যেখানে আধ্যাত্মিক সাধনাকে ঘোলাইয়া দেওয়া হইয়াছে, সেইখানেই এমন একটি অন্যায়কে আমরা স্থান দিয়াছি যাহা শিল্প এবং ধর্ম্ম উভয়েরই প্রাণঘাতী। আমাদের দেশের শিল্প অধ্যাত্মসাধনা হইতে প্রাণ পাইয়াছে ইহা হ্যাভেল্ পুনঃ পুনঃ প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি এবং বিশেষভাবে আর একজন শিল্পরসজ্ঞ কুমারস্বামী মহোদয় এই কথাও যেন বলিতে চান্ যে ইহার দ্বারা ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম সাধনাও খুব একটি উচ্চশিখরে অধিরোহণ করিয়াছে—কিন্তু বস্তুত তাহা নহে। কালীকে আদ্যাশক্তির রূপক ও শিবকে প্রলয়কারী মহাশক্তি ও মঙ্গলের আধার বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেও তাহার সঙ্গে সঙ্গে যেসকল লৌকিক কাহিনীর ও আচারের বীভৎসতা আছে, তাহার চিত্র কি করিয়া অন্তর্হিত করিবে? বস্তুত যেখানে শিল্পী ধ্যানের দ্বারা একটি

বড় বিশ্বতত্ত্বকে মূর্ত্তিতে পরিকল্পনা করিয়াছে, সেখানে তাহা বিশুদ্ধ শিল্পহিসাবে অসামান্য এবং চিরকাল মানুষ তাহাকে বিস্ময়বিমুগ্ধদৃষ্টিতে দেখিবে এবং আদর করিবে—কারণ একটি পরমসত্য তাহার মধ্যে নিত্যরূপ লাভ করিয়াছে। কিন্তু যখনই মনে করা হইয়াছে যে শিল্পের বিষয় পূজার বিষয়, তখনই যাহা ভাব তাহা বিকৃত হইয়া দূষিত হইয়া আপনাকে আপনি নষ্ট করিয়াছে—এ বিষয়ে সন্দেহ কি হইতে পারে? শ্রেষ্ঠ শিল্প, শ্রেষ্ঠ সাহিত্য, শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান—এসমস্তই ধর্ম্মসাধনার পক্ষে সহায়—কারণ অধ্যাত্মবোধ তো একটি শূন্যতার বোধ নয়—সে সকল খণ্ডবোধকে একটি অখণ্ড আনন্দবোধের মধ্যে বিলীন করিয়া দেয় মাত্র। কিন্তু তাই বলিয়া কি কোন খণ্ড বোধ সেই পরিপূর্ণ আনন্দবোধের সমান হইতে পারে—কাহাকে দিয়াও কি তাহার অভাব পূরণ হয়? শেক্‌সপীয়র পড়িয়া মানবচরিত্রের নানা দুর্ভেদ্য জটিল রহস্য সম্বন্ধে আমার দৃষ্টি খুলিয়া যায় বলিয়া মনুষ্যপ্রকৃতিকে উদার বিস্তৃত ভাবে আমি দেখিতে সক্ষম হই। এ বেশ কথা, আমার ধর্ম্মবোধকে ইহা বাড়াইয়া দেয় বই কমায় না—কিন্তু যদি আমার এমন দুর্ম্মতি ঘটে যে আমি শেক্‌সপীয়রের গ্রন্থকে তেল সিঁদুর মাখাইয়া বিবিধ উপচারে প্রত্যহ পূজা করিতে বসিয়া যাই, তবে তাহা কি শেক্‌পীয়রের দোষ হইবে?

শিল্পকে শিল্পহিসাবেই দেখ, তাহাকে মূঢ়ের মত পূজার বিষয় করিয়া তুলিয়ো না। নিকৃষ্ট অধিকারীর পক্ষে মূর্ত্তির সাহায্যে অনন্তস্বরূপ ভগবানকে ধ্যান করিবার সুবিধা হয়, এসকল ফাঁকিবাজির দ্বারা মানুষকে অমানুষ করিয়া তোলা হয় মাত্র। আর এই উপায়ে ধর্ম্মই যদি যায়, তবে শিল্প কোথা হইতে প্রাণ পাইবে? সেই জন্যই বহুকাল পর্য্যন্ত সমস্ত শিল্পসাহিত্য এদেশে তেমন একটি বৃহৎ বিশ্বরূপ লাভ করে নাই যাহা নিখিলমানবের সম্পত্তির মধ্যে পরিগণিত হইতে পারিবে।

কিন্তু তাই বলিয়া উল্টা ভ্রমেও যেন না পড়ি! একথা যেন না বলি, যে এইসকল শিল্প আমাদের দেশের অনিষ্ট করিয়াছে, অতএব ইহারা বর্জ্জনীয়। ইউরোপে মধ্যযুগের আর্টের মর্য্যাদা এখন কেহ দেয় না, কিন্তু আর্টগ্যালারিতে, কত গির্জ্জার দেয়ালে তাহারা চিরকাল ধরিয়া স্থান পাইয়া গিয়াছে—যদি কোন দিন আবার এখনকার আর্ট তাহার বিলাস ও সৌখীনতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নূতন কালের সকল বিরুদ্ধ বিচিত্রশক্তির এক আশ্চর্য্য মিলনসেতু রূপে এক মহাধর্ম্মকে চায়, তখন সকল যুগের শ্রেষ্ঠ আর্টকে যে ডাক পড়িবেই। তেম্‌নি ভারতবর্ষে যে মহাযুগে বৌদ্ধধর্ম্ম কতগুলি শুষ্ক নীতি ও আচার ছাড়াইয়া এক মহাভক্তিধর্ম্মে পরিণত হইল, যে যুগে কবি কালিদাস পৌরাণিক আদর্শকে তাঁহার অমর কাব্যসকলে উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিলেন, এলিফ্যান্টা-ইলোরার ভাস্করগণ পাথরের মধ্য হইতে উত্তুঙ্গহিমাচলগিরিবিহারী দেবতাদিগের মূর্ত্তি কর্ত্তিত করিয়া বাহিব করিল, সেই বিরাট্ যুগ কি আমাদের জাতীয় ইতিহাসের ভবিষ্যৎ বৃহৎ বিকাশের দিনে কোন কাজেই লাগিবে না? আমাদের দেশে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালে যেসকল আশ্চর্য শিল্প, গভীর অধ্যাত্মতত্ত্ব, সাধনার নিগূঢ় রহস্য, সৃষ্ট হইয়াছে, চিন্তিত হইয়াছে, আবিষ্কৃত হইয়াছে—তাহারা কি এদেশের ভবিষ্যৎ জীবনের আয়োজনের মধ্যে কোথাও স্থান পাইবে না—কেবল বাহিরের এইসকল ফেনবুদ্বুদ, বিদেশের অন্ধ অনুকরণ—ইহাদের মধ্যে কি আমাদের সমস্ত চেষ্টা ও চিন্তা নিশ্চিন্তভাবে পর্য্যবসিত হইবে? আমরা যদি মূঢ় হই, অন্ধ হই, তথাপি বিদেশীর চক্ষে ভারতবর্ষের যে একটি গৌরবের চিত্র জাগিতেছে—তাহা নিশ্চয়ই সত্য—বাহির হইতে সেই সত্য-দৃষ্টি আমাদের দৃষ্টিকে খুলিয়া দিক্।

কোন্ বাণী ভারতবর্ষের সকলের চেয়ে বড় বাণী? তাহা এই যে, সমস্ত যাহা কিছু আছে তাহা তাঁহারি প্রাণে কম্পিত হইতেছে—তাঁহারি আনন্দের মধ্যে রহিয়াছে। সেই আনন্দকে যিনি জানেন তিনি আর কিছু হইতেই ভয় প্রাপ্ত হন্ না। তিনি সকলের মধ্যে প্রবেশ লাভ করেন।

বিদেশীই আজ এই কথা বলিতেছে যে আর

কোন দেশের কাব্যে বিশ্বপ্রকৃতিকে মানুষের জীবনের এমন একান্ত সহচর, সঙ্গী, বন্ধু করিয়া তোলা হয় নাই যেমন রামায়ণ মহাভারতে কালিদাস ভবভূতির কাব্যে হইযাছে। 'তপোবন' প্রবন্ধে 'শকুন্তলার' সমালোচনায় কবি রবীন্দ্রনাথও সেই একই কথা বলিয়াছেন। সেই তপোবনের সর্ব্বানুভূতি যদি বাস্তবিকই ভারতবর্ষের চিত্তের পক্ষে অত্যন্ত সত্য জিনিস না হইত, তবে এ দেশীয় সাহিত্যে তাহার এমন সুস্পষ্ট সুদৃঢ় নিদর্শন কি এমন করিয়া পাওয়া যাইত?

সাঞ্চীর অমরাবতীর চিত্রাবলীতে যে বোধিদ্রুমতলে ভগবান বুদ্ধ উপবেশন করিয়াছিলেন, তথায় বন্যকরীরা পর্য্যন্ত অর্ঘ্য বহন করিয়া আসিতেছে, বনের পশুরা মানুষের সঙ্গে একত্র হইয়া বুদ্ধের পদচিহ্ন, বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্রকে বন্দনা করিতেছে—এ চিত্র কি কোন দেশের চিত্রশালাতে দেখা যায়? এই যে সমস্ত চরাচরের সঙ্গে যোগযুক্ত হইয়া আছে মানুষ—সে যে বিচ্ছিন্ন নয় স্বতন্ত্র নয়—এই অনুভূতিই কি ভারতবর্ষের সকলের চেয়ে বড় অনুভূতি নয়? ভারতবর্ষীয় শিল্পী তাই তাহার চিত্রের মধ্যে কোথাও কোন ফাঁক রাখেনা, সমস্ত চরাচরকে সে নিমন্ত্রণ করিয়া টানিয়া আনে—আর ইউরোপীয় চিত্রকরকে আর সমস্ত খাটো করিয়া ছোট করিয়া মানুষের মাহাত্ম্যকে বড় করিয়া তুলিতে হয়। বিচিত্রতার মধ্যে ঐক্যকে সুস্পষ্ট ধ্রুবরূপে দেখাইয়া দেওয়াই এ দেশীয় শিল্পীর প্রধান কাজ। কিন্তু ভারতের শিল্প-লক্ষ্মীকে বলা যাইতে পারে—

> শুনে তোমার মুখের বাণী
> আস্‌বে ঘিরে বনের প্রাণী
> তবু হয়ত তোমার আপন ঘরে—
> পাষাণ হিয়া গল্‌বেনা।

তাই সকলের চেয়ে মজা এই যে ইউরোপীয়গণের মধ্যে যে মূঢ় এই ভারতবর্ষীয় প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ লাভ না করিয়া গান্ধারশিল্পকে স্তুতিবাদ করে, কিম্বা মোগলদের শিল্পকীর্ত্তিকে গৌরবজনক বলিয়া কীর্ত্তন করে, পাষাণ-হিয়া তাহাদেরি চশ্‌মা পরিয়া নিজের দেশকে দেখিবার ও বিচার করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। অথচ ফর্গুসন্ প্রভৃতির মনেও আসে নাই যে মোগলকীর্ত্তির বারো আনা প্রশংসাই হিন্দু শিল্পীর প্রাপ্য। আকবর হিন্দুমুসলমানের মধ্যে মিলনসাধনের জন্য যে উদ্যোগী ছিলেন, তাহার মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্য যেমনি থাক্—যে ব্যক্তি একবার তাঁহার ফতেপুর শিক্রিতে গিয়াছে সেই বুঝিয়াছে হিন্দুভাব সেই সম্রাটের চিত্তকে কতদূর অধিকার করিয়াছিল। ফতেপুর শিক্রির প্রায় সমস্তটাতেই হিন্দু শিল্পীর হাত, জাহাঙ্গীরের আগ্রার প্রাসাদেও তাই। আবুল ফজ্‌ল্ লিখিয়াছেন "হিন্দুদের চিত্র আমাদের ধারণাকে অতিক্রম করিয়া যায়, সমস্ত জগতে তাহার তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া শক্ত।" তাজমহল--যাহা জগতের বিস্ময়--সেই 'নন্দনের ফুলরাশি'কে কে সৌন্দর্য্য-স্বপ্নলোক হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে? হিন্দু শিল্পী। মুসলমান তো কেবল ভারতবর্ষেই আসে নাই---আরবে, পারস্যে, ঈজিপ্‌টে কোথায় মুসলমানের শিল্প ভারতবর্ষের মত এমন উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে?

এইবার উপসংহারে একটা বড় প্রশ্ন আমাদের আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবার আছে! যে আর্ট এক সময়ে ধর্ম্মের সঙ্গে যোগ রক্ষা করিয়া এমন আশ্চর্য্য সার্থকতা লাভ করিয়াছিল, সে কি এখন সেইদিক্ দিয়াই পুনর্ব্বার জাগিতে পারিবে? ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন সমাজের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাকেও কি নূতন রাস্তা লইতে হইবেনা?

ভবিষ্যতের কথা আমি জানিনা—কোন্ পথ ধরিয়া আর্ট এদেশে আপনাকে সার্থক করিবে তাহাও বলিবার অধিকার আমার নাই।

তবে এটুকু নির্ভয়ে বলিতে পারি যে যতই আমাদের দেশ কি, তাহার ইতিহাস কি, তাহার ধর্ম্ম কি, সমাজতত্ত্ব কি, তাহার সৌন্দর্য্যরচনা কিরূপ তাহা আমরা সকল দিক্ দিয়া আবিষ্কার করিব—ততই অন্যান্য সকল সাধনার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পসাধনাও এদেশে প্রাণ পাইবে। আজ যেটুকু শিল্পসাধনার ঢেউ

বাংলাদেশে উঠিয়াছে তাহা সেই কারণেই উঠিয়াছে—কিন্তু এখনও তাহাকে বহুদিন ধরিয়া নিজেকে চিনিতে হইবে এবং তারপর কালের উপযোগী করিয়া আপনার শিল্পকে সৃষ্টি করিতে হইবে। ভাবী মানবের শিল্প, কি এদেশে, কি ইউরোপে, একটি বড় বিশ্বগ্রাসী, সর্ব্বতোমুখী আধ্যাত্মিক বোধের সঙ্গে যুক্ত হইবার অপেক্ষায় আছে—সেই বোধের দ্বারা সমস্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে—তখনি প্রাচীনে যাহা হইয়া গিয়াছে তাহার ভিতরের ভাবটিকে গ্রহণ করিয়া তাহার বাহিরের রূপটির নকল করিবার কোন প্রয়োজন হইবেনা—তখন যাহাই আঁকা যাইবে তাহাব মধ্যে বিশ্বমানবের অখণ্ডরূপের একটি ছায়া পড়িবে—তখন বিশ্বজগতের কাছে আমাদের লজ্জা দূর হইবে।

১৩২০ অগ্রহায়ণ

ভাস্কর্য্যে শিশুচিত্র

ভাব বিজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া কাব্যরূপে জনসমাজে প্রাণমাতান সঙ্গীতের অবতারণা করে। ভাষাকাব্যই হউক আর দৃশ্যকাব্যই হউক, উহা বিজ্ঞানের সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গড়িয়া না উঠিলে, মানবজীবনে সুফল ও কল্যাণ আনয়ন করিতে সমর্থ হয় না।

ভাস্কর্য্য দৃশ্যকাব্য; ভাস্কর্য্য ও বিজ্ঞানে ভেদের কল্পনায় গভীর অজ্ঞানান্ধতার পরিচয় পাওয়া যায়।

কল্পনার ভিতরে প্রাণটাকে সর্ব্বদা ডুবাইয়া রাখিতে পারিলে যে একটা আত্মারাম সমগ্র হৃদয় মনকে অধিকার করিয়া বসে, উহার মমতা মানবপ্রাণে বড় প্রবল; উহা মাকড়সার জালের মত মানুষের সকল কার্য্যকরী শক্তিকে তন্দ্রাময় মোহে জড়াইয়া ফেলে। সে মমতার স্রোতে সংসারে ভাসিয়া যায়। সেই রস-সম্ভোগের তুলনায় সংসারের সকল সুখ ও প্রীতি অতীব স্থূল ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয় এবং সংসারের সঙ্গে সঙ্গে যাহা কিছু প্রাকৃত ও সরল চক্ষুর প্রত্যক্ষীভূত সে সকলই অকাম্য ও অভোগ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বিজ্ঞান সুন্দরী অনাদৃতা অবলার মত মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া কল্পনার কুজ্ঝটিকার মধ্যে পথ হারাইয়া ফেলে: এইরূপে মানবপ্রাণের সকল কর্ম্মজ্ঞান ও মহৎভাব কল্পনাব আকারে উঠিয়া উঠিয়া আকাশে বিলীন হয়—জনসমাজ যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া যায়। ভাব ও বিজ্ঞানের বিচ্ছেদের ইহাই বিষময় ফল। আমরা ভারতবাসী আজ সেই বিষের জ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়া নীরবে কাঁদিয়া মরিতেছি।

বলিতেছিলাম ভাব ও বিজ্ঞানে (Idea and technique) বিরোধ অসম্ভব কল্পনা। চিত্র ও ভাস্কর্য্যের বিজ্ঞানাংশের অনুশীলনের ফলে প্রতিপাদ্য বিষয়ে ভাবহানি ঘটে এরূপ ধারণা নিতান্ত অমূলক, সুতরাং অসত্য। মানবপ্রকৃতি মূলতঃ সকল দেশে ও সকল সমাজে এক। বিভিন্ন দেশের বিভিন্নরূপ সাধনার ফলে সমষ্টিগতভাবে, বাহিরের দিক দিয়া মানবচরিত্রে পার্থক্য লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিলে সবই এক। একমাত্র কবিই মানবপ্রকৃতির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া মানবের হৃদয়-বীণার তারে অঙ্গুলী সঞ্চালন করিতে সমর্থ হয়েন। দৃশ্যকাব্যে কবির প্রতিভা অধিকতর সার্থকতায় মণ্ডিত হইয়া প্রতিভাত হয়, সুতরাং দৃশ্যকাব্য মানবসমাজে অশেষ ফলোপদায়ক। সকল দৃশ্যকাব্যের মধ্যে ভাস্কর্য্য অন্যতম।

এই প্রবন্ধান্তর্গত পাঁচখানি চিত্রে ভাস্কর্য্যে নিপুণ ভাস্কর শিশুজীবনের বিচিত্র ইতিহাস কেমন

সুন্দর শোভন প্রাণস্পর্শী ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন তাহারই নিদর্শন সংগৃহীত হইয়াছে।

প্রথম চিত্রখানির (The First Steps) দিকে চাহিবা মাত্রই, পণ্ডিত মূর্খ, বালবৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে সকলের প্রাণেই ভাস্কর্য্যের প্রতিপাদ্য বিষয়টি প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। দৃশ্যকাব্য স্বপ্রকাশ, টিকাটিপ্পনি দ্বারা বুঝাইবার প্রয়োজন হয় না; ইহাতেই চিত্র ও ভাস্কর্য্য কিম্বা নাটকের সার্থকতা। "চলি চলি পা পা" বলিয়া মাতা শিশুসন্তানকে প্রথম চলিতে শিখাইতেছেন; এই প্রথম শিক্ষার আনন্দ ও সাবধান তন্ময়তা মাতা পুত্রের ভঙ্গীতে চমৎকার প্রকাশ পাইয়াছে। নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মময় জীবনস্রোতে এমন সুন্দর কাব্যজবা যিনি সস্নেহে ভাসাইয়া দিতে জানেন তিনিই ত যথার্থ কবি।

দ্বিতীয় চিত্রখানিতে (Brother's Kiss) "ভাইয়ের চুমু" খাওয়ার দৃশ্য প্রদর্শিত হইয়াছে। বড় ভাইটী হৈ হৈ করিয়া সারারাজ্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। কুল কুড়াইয়া, ফুল ছিঁড়িয়া, পুকুরের পাড়ে ঘাটের পথে ঘুরিয়া বেড়ান হইতেছিল; হঠাৎ কি মনে করিয়া ছুটিয়া আসিল মায়ের কাছে; নিজেও প্রকাণ্ড লম্বা বীর কিনা! মায়ের কোলে ভাইএর মুখখানি নাগাল পাওয়াও কঠিন, কাজেই টানিয়া ভাই-এর কচি মুখখানি নীচুতে নামাইয়া আনিয়া চুমো খাওয়া হইতেছে। মায়ের মুখেরই বা কি সুন্দর ভাব,—শিরীষ কুসুমের মত কোমল, পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নার মত নির্ম্মল। যে মন্ত্রবলে মানবপ্রাণের ভাব এমন সুন্দর করিয়া ভাস্কর্য্যে প্রতিফলিত করিতে পারা যায়, সেই মন্ত্রশক্তির সাধনকল্পে চিত্রকর বা ভাস্করের কোন্ স্বার্থ অপরিহার্য্য থাকিতে পারে, কোন্ ক্লেশ অবহনীয় থাকিতে পারে?

তৃতীয় চিত্রখানিও (Shower Bath) বড়ই সুন্দর। নাদুস নুদুস দুইটী ভাইবোন, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের খনি। লুকাইয়া ঝরণায় স্নান করিতে আসিয়াছে। বোনটী পিছনদিক হইতে ঠেলিয়া ভাইটীকে জলের নীচের লইয়া যাইতেছে। কপালে হঠাৎ ঠাণ্ডাজল লাগাতে ভাইটীর মুখখানিতে কেমন সুন্দর একটী ভাবের অবতারণা হইয়াছে। বোনটীর সোহাগে-গলা মুখখানিই বা কি সুন্দর! ছবিখানির দিকে চাহিলেই স্নেহ ও আনন্দের পুতুল এই শিশু দুইটীকে বুকে জড়াইয়া ধরিবার জন্য হাত দুখানি যেন অলক্ষিতে প্রসারিত হয়; দর্শকের হৃদয়ে এই আবেগময় স্নেহের অবতারণা করিতে সমর্থ হওয়াতেই, ভাস্করের কবিত্ব ও কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

চতুর্থ চিত্রখানিও (Children in the Fountain) আপনার পরিচয় আপনিই প্রদান করে। শিশুরা জল কাদা লইয়া মাখামাখি, হুড়াহুড়ি করিতেছে। শৈশবে নির্ম্মল সরলতার সঙ্গে প্রথম খেলা আরম্ভ হয়, সেই মুকুল জীবনের মধুময় স্মৃতি কর্ম্মক্লান্ত জীবনে জাগরূক করিয়া যে ভাস্কর মানুষের প্রাণে আনন্দ বিতরণ করেন, তিনি প্রশংসাভাজন।

পঞ্চম চিত্রখানি (Confidence) আরও চমৎকার। শিশু খেলা করিতেছিল, হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল মাকে কিছু বলিতে হইবে। কত যেন জরুরী গোপন কথা। তাই মায়ের কানে কানে বলা হইতেছে। মায়ের কান পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া গোপন কথাটী বলা দেহের দৈর্ঘ্যে কুলাইয়া উঠিতেছে না, তাই ডিঙি মারিয়া, মায়ের গলা জড়াইয়া আকাশ-পাতাল বলা হইতেছে। গেপনীয় কথার মধ্যে ত "মা তুই যে বলেছিলি আজ আমায় খেলনা কিনে দিবি!" এমন প্রাণের কথাটী পশুপক্ষী, তরুলতা, নরকিন্নর কেহই শুনিতে পাইবে না! এমনি সুন্দর কত শত ভাবের অসংখ্য স্রোতস্বিনী মানবপ্রাণের উপর দিয়া নিরন্তর তর তর বেগে বহিয়া চলিয়াছে। কবি তাহারই দুই একটীকে কখনও কখনও ধরিয়া আনিয়া, আকার দান করিয়া আমাদের আনন্দের জন্য মজুত করিয়া রাখেন।

তাই বলিতেছিলাম ভাস্কর্য্যে বিজ্ঞানাংশের অনুশীলনের কথা। ভাস্কর্য্য বলিতে আমরা আকৃতি বা মূর্ত্তি বুঝিয়া থাকি। মূর্ত্তির ধারণা করিতে গিয়া আমাদিগকে অপরিহার্য্যরূপে একটা দেহের ধারণা করিতে হয়; দেহের কথা ভাবিতে গেলে অস্থি

পঞ্জর, রক্ত মাংস ইত্যাদি দেহের সকল উপাদানের তত্ত্ব অনুধাবন করিতে হয়। এ-সকল লইয়াই দেহ। ভাবকে আকার দানের কথা বলিতে গিয়া আকারের সঙ্গে যে দেহের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, সেই দেহের দেহত্বের কথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না। দৃশ্যকাব্যের বিজ্ঞানাংশকে বাদ দিতে গেলে চলিবে না। দৃশ্যকাব্যের বিজ্ঞানাংশকে বাদ দিতে গেলে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। বিজ্ঞানহীন ভাস্কর্য্য কল্পনার তন্দ্রা আনিতে পারে কিন্তু তাহা ছাড়া মানুষের আর কোনই কাজে লাগে না। ফুলটীর দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া সুগন্ধের সন্ধানে সারা ফুলবন ঘুরিয়া বেড়াইলে ফুলমালীকে যেমন হতাশ মনে ফিরিয়া আসিতে হয়, ভাস্কর্য্যের শিল্পাংশের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিয়া কবিত্বময় ভাস্কর্য্যসৃষ্টির আকাঙ্ক্ষাও তেমনি শূন্যে বিলীন হইয়া যায়। মানবের এই কর্ম্মের যুগে সকল কার্য্য-করনী শক্তি হইতে প্রসূত না হইলে সমাজের কখনও কল্যাণ হইতে পারে না। প্রাকৃত এবং চক্ষুগোচর সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে আমাদের চিত্র, ভাস্কর্য্য ও নাটকের কাব্যসৌধ গড়িয়া না উঠিলে আমাদের অন্তরের দৈন্য ও বাহিরের ক্লেশ কিছুতেই ঘুচিবে না। চিত্র ও ভাস্কর্য্যে ভাব ও বিজ্ঞান, যখন "দোঁহে দোঁহা লাগি" নিগূঢ় প্রেমে মত্ত হইয়া বদ্ধ আলিঙ্গানে একীভূতপ্রাণে মূর্ত্তিময় হইয়া জনসমাজে দেখা দেয়, তখনই সমাজে সকল অশ্রুজলের মধ্য দিয়া আনন্দের হাসি ফুটিয়া উঠে।

লণ্ডন শ্রীঅশ্বিনীকুমার বর্ম্মণ।
২৯শে আগস্ট।

১৩২৭ বৈশাখ

দেশী ও বিদেশী

[মেদিনীপুর সাহিত্য সম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণ

দীনেশচন্দ্র সেন

আমরা জাতীয় জীবনের এক সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়েছি। আমরা পল্লীর আনন্দে বিভোর ছিলুম—আজ কোন্ মহাশক্তি টিকি ধোরে আমাদেরকে ঘর থেকে বাইরে নিয়ে জীবন সংগ্রামের সম্মুখীন করেছে। আমাদের ঘরের স্নিগ্ধ প্রদীপটি নিবু নিবু, বাইরের তীব্র বৈদ্যুতিক আলো আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে শুধু,—এখনও আমরা তা' করায়ত্ত করতে পারিনি। এইবার বাইরের সংঘর্ষ এসে পড়েছে। যাঁরা দোবে খিল দিয়ে বাইরের এই বন্যা ঠেকিয়ে রাখতে চাইছেন, তাঁরা পারবেন না। প্রবাদ আছে মিসেস পার্টিংটন আটলান্টিক সাগরকে তাঁর কুঁড়ের দিকে অগ্রসর স্রোতে দেখে ঝাঁটা হাতে তার গতিরোধ করতে দাঁড়িয়েছিলেন। যাঁরা প্রাচীন পাততাড়ি বগলদাবায় কোরে নিজকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইবেন তাঁরা তা পারবেন না—কিছুতেই পারবেন না। একটা সামঞ্জস্যের দিন এসেছে। কিছু ছেড়ে দিতে হবে—কিছু কিছু বাইরে থেকে নিতেও হবে।

এই বন্যায় আমাদের সব তলিয়ে না যায়—সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এখনও খুব ভরসার কারণ পাওয়া যায়নি। জাতীয় জীবনের একটা কলরব শোনা যাচ্ছে মাত্র; এ কি নব জাগরণ, না অন্তিম চীৎকার? আমরা শিল্প, সাহিত্য, প্রভৃতি সর্ব্ব বিষয়েই পরায়ত্ত হয়ে পোড়ে আছি। আমরা এখনও নিজেকে চিনতে পারিনি। যেদিন আমরা নিজের শক্তি বুঝতে

পার্‌ব, সেদিন আমাদের জীবনেব ভরসা হবে।

ধরুন আমাদের চিত্রশিল্প। রবিবর্ম্মার "গঙ্গার অবতরণ" একখানি প্রসিদ্ধ চিত্র; এই আলেখ্যে শিবঠাকুর ঠিক সাহেবের মত দু পা ফাঁক কোরে কোমরে হাত দিয়ে উর্দ্ধমুখে দাঁড়িয়ে আছেন, যেন এই মাত্র মুখ হোতে চুরুটটা পোড়ে গেছে। দেশীয় লোক কি প্রতীক্ষার ভাবে উপরের দিকে চেয়ে দাঁড়ান না? রবিবর্ম্মা পুণায় কি তা দেখেন নি? তবে এই উৎকট ভঙ্গীর অনুকরণ কর্‌তে গেলেন কেন? শকুন্তলা-বিদায়ের ছবি আর-একজন প্রসিদ্ধ চিত্রকার এঁকেছেন। তাতে দেখ্‌তে পাবেন—কণ্বমুনি পাদ্রীর মত বেশ পোবে পাদ্রীর ভঙ্গীতে শকুন্তলাকে আশীর্ব্বাদ কর্‌ছেন। আমার বন্ধু শশীকুমার হেশ ইটালীতে চিত্র বিদ্যা শিক্ষা কোরে দিগ্‌গজ চিত্রকর হোয়ে ফিরে এসে "কর্ণকুন্তী" নামক একখানি চিত্র আঁক্‌লেন। ঠিক মেম-সাহেব সাড়ী পোরে গালে আঙ্গুল ঠেকিয়ে বোসে আছেন, তাঁকে আমাদের কুন্তী বোলে মেনে নিতে হবে। অনেক নবীন চিত্রকরের হাতের আঁকা ছবি দেখেছি; তাঁরা কিছুতে সাহেবের মুখের হাসি, তাদের দাঁড়াবার, কথা বল্‌বার ভঙ্গী ভুল্‌তে পারেন না, বাঙ্গালী নর-নারী আঁক্‌তে গিয়ে সেইসকল বিদেশী ভঙ্গীর রেখা ছবির মুখে চোখে ফুটে ওঠেন চারদিকে দেশীয় লোকের মধ্যে বাস কোরে তাঁদেরই একজন হোয়ে আমরা যে কতটা আত্মবিস্মৃত হোতে পারি, তা আর কি বল্‌ব। অবনীন্দ্র-বাবুর স্কুলের কোনো কোনো চিত্র-কর বোসে বোসে তুলি ঘোষে ঘোষে ছবি নকল কর্‌ছেন; দেশীয় ধারা রক্ষা কোরে যাচ্ছেন—প্রাচীন নর্ত্তন ভঙ্গী, মুদ্রা, এবং হাত পা আঁক্‌বার প্রাচীন রীতি আয়ত্ত কর্‌তে চাচ্ছেন—কিন্তু বাঙ্গালী জাতি সেই বহু পূর্ব্বের রীতিতে আঁকা ছবি দেখে বুঝ্‌তে পার্‌ছে না এগুলি ঠিক তাদেরই ছবি না বিদেশের। কিন্তু বর্ত্তমান জীবনের যতটা প্রতিচ্ছায়া ছবির উপর পড়্‌বে, ছবি ততটা জীবন্ত হবে। বাঙ্গালী-জীবন লক্ষ্য করবার মত চক্ষু কয়জনের যে এদেশে আছে তা' জানি না। গগন-বাবু তাঁর বিরূপবজ্রে রহস্য করতে গিয়ে কতকগুলি ছবিতে বাঙ্গালীজীবনের কিছু আভাস দিয়েছেন, কিন্তু আমাদের জীবনে কি ভাল কিছুই নেই যা' থেকে চিত্রকর প্রেরণা পেতে পারেন? এখুনি কি প্রদীপের শিখা নিবে গেছে, আরতির ধূপ-ধূনোর গন্ধ বাতাসে মিশে গেছে? বাঙ্গালী জীবনের যে প্রেমের বন্যায় নদীয়া শান্তিপুর ভেসে গিয়ে তা' বিশ্বকে প্লাবিত কর্‌বার প্রয়াস পেয়েছিল, সে প্রেমের বন্যা কি একবারে থেমে গেছে?

বাঙ্গালী চিত্রকর, চোখ খুলে নিজের চারদিক্ দেখে ছবি আঁক্‌তে শেখ, ছবি দেখে আর কতকাল ছবি আঁক্‌বে, কতকাল আর সস্তাদরের বিলাতী ছবি দেখে নকল কর্‌বে? জাপানী ঢং এমন কি মোগ্‌লাই শিল্প-কলা দেখে আমরা খানিকটা বিস্ময় বোধ করতে পারি, কিন্তু তাতে আমাদের প্রাণের তৃষ্ণা মিট্‌বে না। র‍্যাফেল মাইকেল-এঞ্জেলোকে চিত্রশালা হোতে দূর কোরে দিতে হবে না,—যে দেশের যেটি ভাল তা' আয়ত্ত কর্‌তে হবে বই কি। কিন্তু আমরা ঘর যেন না ভুলি, আমাদের সুখদুঃখ যা আমাদের কাছে বড়—তা' যেন তুচ্ছ কর্‌তে না শিখি। ম্যাডোনার মুখ নকল না কোরে নিজের মায়ের মুখ দেখে আঁক্‌লে ছবি আঁকা সার্থক হবে। ম্যাডোনো হোতে যশোদা ও মেনকা বরং দেশে অনেক কাছে, তাঁদের ভাব বাঙ্গলা সাহিত্যে ছড়িয়ে আছে, এবং আমাদের কুঁড়েঘরে সে রসের জীবন্ত ধারা এখনও বয়ে যাচ্ছে!

একথা বোধ হয় বলা যায় যে বাঙ্গালীর মত সুকুমার ভাবের চর্চ্চা ভারতের অন্যান্য জাতিরা অল্পই করেছেন। মনস্তত্ত্বের এরূপ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এদেশের অন্যত্র আছে কি না আমি জানি না। উদাহরণ-স্থলে দানকেলিকৌমুদীর একটি স্থানের উল্লেখ কর্‌ছি। প্রথম শ্লোকটির জীব-গোস্বামীকৃত ব্যাখ্যাটি পাঠ করুন; দেখ্‌বেন্ "কিলকিঞ্চিৎ" ভাবটি কি অপূর্ব্ব ভাবে চোখের কাছে ধোরে দেওয়া হয়েছে! শ্লোকটিতে মান, লজ্জা, অশ্রু ও হাসিতে মিশে চক্ষের চাউনি কি আশ্চর্য্য জটিল মনস্তত্ত্বের

আভাস দেখাচ্ছে! কবি প্রেমিকার চাউনিটিকে ফুলকলির সঙ্গে উপমা দিয়ে গেছেন. কিন্তু সে কথা মুখ ফুটে বলেননি; এই প্রচ্ছন্ন তুলনায় নায়িকার চাউনির কি সুন্দর ও গূঢ় অর্থ ধরা পোড়ে গেছে! নায়কের অসতর্কতায় নায়িকা লোকজনের মাঝে কতকটা অপ্রতিভ হোয়ে পড়েছেন—তখন তাঁর চাউনিটি কেমন হোয়েছে কবি বলে যাচ্ছেন—কতকটা রাগ ও গঞ্জনাশীল ভঙ্গীতে চোখ রক্তিম হোয়েছে. যেন পাপ্‌ড়ির উপর সূর্য্যের কিরণ এসে পড়েছে; ভয়ে ও ত্রস্ততায় চোখে জল এসেছে, যেন এক বিন্দু নীহার কুঁড়ির উপর টলটল কর্‌ছে; নায়কের অসতর্ক আহ্বানে তিনি ক্রুদ্ধা হোয়েছেন, কিন্তু তা' রোধ কর্‌বার শক্তি হৃদয়ে নেই, এজন্য সেই চাউনি সাড়া দিচ্ছে না এবং দিচ্ছেও, যেমন কোরে ফুলের কলিটি হাওয়ার জোরকে ঠেকিয়ে রাখ্‌তে চায়, অথচ সেই জোরে শেষে ধরা দিয়ে আস্তে আস্তে দল খুলে প্রসন্নতা দেখায়। "স্তবকিনী" শব্দটি হোতে চাউনির নানা গভীর রস এই ভাবে নিঙ্‌ড়িয়ে বার করা হোয়েছে। একটা চোখের ইসারা যে ভাব জগতের কতটা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ঐশ্বর্য্য দেখাতে পারে—তার পরিচয় এই শ্লোকটিতে আছে। রূপ-গোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি বই পড়্‌লে পাঠকের চোখের সাম্‌নে ভাবের এক নূতন রাজ্য খুলে যাবে। চৈতন্যদেবের চোখের চাউনিতে শত শত স্বর্গীয় ভাবের ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। তা' থেকে রূপ-গোস্বামী এই সকল তত্ত্ব বুঝেছেন। পদকর্ত্তারা তাঁদের লেখনী-মুখে সেইসকল তত্ত্ব প্রচার করেছেন। লেখনী যা' পেরেছে তুলি কি তা' পারে না? একজন বৈষ্ণব কবি লিখেছেন—"নায়িকার চোখদুটি স্থির ভ্রমরের মত—যেন মধুতে মত্ত হোয়ে আছে, উড়্‌তে পার্‌ছে না।" প্রেম-বিভোর চোখের আবেশ বুঝাতে এর চাইতে সরস ভাষা কোথায় জুট্‌বে? "মধু মাতল কিয়ে উড়ুই না পার" চোখের এই ভাব কি তুলিতে ফোটে না? তা' না হলে বঙ্গে যে স্বর্গের মানুষ এসেছিলেন, সেই চৈতন্যদেবকে চিত্রকর জগতের কাছে এঁকে দেখাবেন কি কোরে? তাঁর দিব্য চোখের চাউনি কি আমরা এত শীঘ্র ভুলে গেলাম? অন্যত্র কবি অপাঙ্গ-দৃষ্টির কথায় লিখেছেন "কালো তারা চোখের এক কোণে এসে পড়েছে—যেন ইন্দীবরের মাঝ থেকে হাওয়ায় জোর কোরে ভ্রমরটিকে ঠেলে এক কোণে এনেছে।" এই অপাঙ্গ-দৃষ্টি কি ছবিতে আঁকা যায় না? "যাঁহা যাঁহা তরল বিলোকন পড়ই। তাঁহা তাঁহা নীল উৎপল ভরই"—এই ছত্রে কবি প্রেমিকের যে নীলস্নিগ্ধ চাউনির ইঙ্গিত দিয়েছেন তা' কবি হোতে চিত্রকরই বেশী স্পষ্ট কোরে দেখাতে পারেন। চোখের দৃষ্টির study বাঙ্গালা কবিরা যে-রকম কোরে গেছেন. সেরকম অন্য কোথায়ও তো দেখিনি; তার পাশে বাঙ্গালার চিত্রকর চুপটি কোরে বোসে আছেন, যেন তিনি তাঁদের কেউ নন্! ভাবের বৈচিত্র্য চোখে মুখে ফোটাবার মত মালমস্‌লা বাঙ্গালীর সাহিত্যে বাঙ্গালীর ঘরে অনেক আছে। তা' নিয়ে চর্চ্চা কর্‌লে বাঙ্গালী চিত্রকর প্রথম শ্রেণীর আসন অনায়াসে দখল করতে পারেন। সে পথ ছেড়ে দিয়ে আমরা গ্রীক আদর্শের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন ও নরদেহে স্নায়ুর সমাবেশ বিস্ময়ে হাঁ কোরে দেখ্‌ছি। গঠনের যে পূর্ণতা আমাদের নেই, তা' নিয়ে হতাশ ভাবে নিজ জাতিকে ধিক্কার দিচ্ছি। অথচ সূক্ষ্মতর ভাবের সৌন্দর্য্য, যাতে আমরা জয়ী হয়েছি, সেটি কাছের জায়গা থেকে আবিষ্কার কর্‌বার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছি। কেবল শরীরের গঠন ও হাত পায়ের ভঙ্গী নকল কোরে কি হবে? আগমনী গান থেকে, রামপ্রসাদের ভাব থেকে—এখনও নরনারীরা এদেশে যে অপূর্ব্ব ত্যাগ ও স্নেহ দেখিয়ে থাকেন তা থেকে তুলি জীবন্ত রস গ্রহণ করুক। এইটি বিশেষ কোরে জান্‌তে হবে, যে আমরা সুকুমারবৃত্তিগুলিকে তপস্যার রাজ্যে নিয়ে পৌঁছিয়েছি। অন্য কোনো জাতি সেই মাত্রায় তাদের চর্চ্চা করেননি। এই তপস্যার জিনিষটা তুলির রেখায় অভিব্যক্ত কর্‌তে পার্‌লে, জগৎ তা দেখে মুগ্ধ হবে। আমাদের ঢাকার মস্‌লিন,—আমাদের মনোহরসাই গান—একান্তভাবে বঙ্গের নিজস্ব—তা হারিয়ে ফেলে যদি আমরা

এর থান বুনে কৃতিত্ব দেখাই কিম্বা অর্গানের গানের নকল করি—তা'হলে আমাদের জোরের জায়গাটা ছেড়ে দেওয়া হয়। এসকল বাইরের পাওয়া জিনিষ যে আমরা একবারে ছেড়ে দিয়ে বস্‌ব—তা বল্‌ছি না। হয়ত নিত্যকার দর্‌কারের জন্য সেসকল সাজসরঞ্জামেরই দিকে বেশী লক্ষ্য রাখ্‌তে হবে—কিন্তু আমাদের শিল্পসাহিত্যের তুঙ্গ মণিমন্দির ভেঙ্গে ফেল্‌লে—যেন ঊষার কপাল থেকে অরুণ রাগ মুছে ফেলা হবে। যা' কিছু এ দেশের গৌরবের, তার জন্য বড় একটা স্থান রেখে শেষে বাজারের হিসেব-নিকেশের ফর্দ্দ প্রস্তুত কর্‌তে হবে।

বিদেশী লোকের প্রশংসার একটা মূল্য আছে, কিন্তু তাকে মনের ভিতর বাড়িয়ে ভাবা উচিত নয়। ধরুন, আমাদের ঠাকুর-দেবতার পূজো—এর সঙ্গে বঙ্গীয় নর-নারীর কতখানি অশ্রুজল, কতটা উৎকণ্ঠা, কত নিশি-জাগরণ, ধন্না দেওয়া, উপবাস করা এবং চন্দন ঘষা ও শঙ্খধ্বনি হোতে আরম্ভ কোরে, চামর ব্যজন ও আরতির কথা আমাদের মনের পর্দ্দায় পর্দ্দায় জড়িত হোয়ে আছে—এগুলি জাতীয় চিরন্তন তপস্যার সামগ্রী। এই তপস্যাকে চিত্র বা সাহিত্যে উজ্জ্বল কোরে দেখাতে পার্‌লে, জগৎবাসী আমাদের তপস্যায় বিশ্বাস কর্‌বে, নতুবা দেবদেবী আঁকতে গিয়ে যদি তুমি জাতীয় পূজার ভাবটি ছেড়ে দিয়ে উদ্ভট কল্পনার সাহায্যে যা কিছু একটা গোড়ে তোল এবং যদি সেই সস্তা কল্পনায় কতকটা বাহাদুরী থাকে—তবে হয়ত ভিন্নদেশবাসী লোকেরা সাময়িক ভাবে তার পক্ষ পাতী হতেও পারেন। তাঁদের যা ভাল লাগে তাই যদি চেষ্টা কোরে গড়্‌তে থাক, —তবে হয়ত বিশ্ব-সভ্যতার এক কোণে স্থানলাভ কোরে দাঁড়াতে পেরেছ বোলে একটা দর্পও হোতে পারে। কিন্তু তুমি যে পর্য্যন্ত নিজেকে আবিষ্কার কোরে নিজের মূলধন ব্যয় কর্‌তে না পেরেছ সেপর্য্যন্ত তুমি এই শিল্প-সাহিত্যের রাজ্যে স্থায়ী শ্রদ্ধার আসন পাবে না। তাই একান্তমনে তোমার বিশেষত্ব কি, তোমার তপস্যা ও শক্তি কোথায় তা' আবিষ্কার কর্‌তে চেষ্টা কর। নতুবা আফিসেও তুমি কেরানী, শিল্প-সাহিত্যেও তুমি কেরানী—নকল ভিন্ন তোমার অন্য কাজ নেই; তোমায় চিরকালই তা'হলে একটা নিম্নের পংক্তিতে স্থান হবে। যে জাতির মঠধারী এখনও জগৎগুরু বোলে স্পর্দ্ধার পরিচয় দিয়ে থাকেন, তার আর গৌরব তা'হলে রইল কি? একটা সাড়া পোড়ে গেছে, জগতকে আমাদের জিনিষ দেখাতে হবে, কিন্তু নিজের ঘরের জিনিষ ফেলে বাইরের নকলনবিশী করলে সার্ব্বজনীনত্ব লাভ হবে না—পৃথিবীর প্রত্যেক বড় প্রতিভার উপর তার দেশের ও জাতির যে শীল মোহরটি আছে সেটি খুইয়ে ফেলে কেউ বড় হননি, বাল্মীকিও নয়, সেক্‌শ্‌পীয়ারও নয়।...

১৩৪৬ আষাঢ়

রূপশিল্প

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলীর রূপশিল্প বইখানি পড়ে আনন্দ পেয়েছি।

শরীরে যখন শক্তি থাকে যথেষ্ট মাত্রার চেয়ে বেশি তখন যে কোনো একটা উপলক্ষ্যে এমন কি বিনা উপলক্ষ্যে একচোট ঘুরে আসতে ইচ্ছে হয়। মনের সম্বন্ধেও তাই। তার উদ্যমের সঞ্চয় পর্যাপ্তের

চেয়ে বেশি থাকলে কারণে অকারণে কলম চালাবার জন্যে তাকে তাগাদা দিতে হয় না। আমার বর্তমান অবস্থায় তাগাদা দিয়েও ফল পাওয়া কঠিন হয়েছে তবু এইমাত্র পড়া শেষ ক'রেই উঠে পড়েছি উৎসাহের তাজা অবস্থায় কিছু একটা লিখে ফেলবার জন্যে। উৎসাহের কারণ আছে। চিত্রকলার স্বকীয় রহস্যটা যে কী তা আমি কখনো কখনো বোঝাতে ইচ্ছা করেছি কিন্তু ভাল করে বুঝিয়ে উঠতে পারি নি। শিল্পরসিক অর্দ্ধেন্দ্রকুমার এই অল্প কয়েকটি পাতায় সেই কথাটি বুঝিয়েছেন। তার ভাষা যেমন সহজ তেমনি সরস। এই রচনায় পাণ্ডিত্য বোঝা হয়ে উঠে লেখনীকে মন্থর ক'রে তোলে নি। বিষয়টা তর্কের নয় বোধের। সেই জন্যেই সহজ নয় তাকে সহজে বোঝানো।

সমস্ত রসসৃষ্টির আদর্শ যে তার নিজেরই মধ্যে, তার বাইরে নয় এ কথাটা অন্তত চিত্রকলায় সাধারণ লোকে সহজে মানতে চায় না। কোকিল-কণ্ঠের প্রশংসা অনেক শোনা গেছে কিন্তু কোকিলের কুহু কুহু ডাকের অবিকল অনুকরণেই যে কণ্ঠের সার্থকতা, অর্থাৎ হরবোলাই যে সব চেয়ে বড় ওস্তাদ এমন কথা কেউ বলে না। মেঘমল্লারে যখন বর্ষার গান চলে তখন তার মধ্যে না থাকে ঝর ঝর বৃষ্টির অনুকরণ না থাকে ঘড় ঘড় বজ্রের ডাক। তবু কোনো বাস্তব-বিলাসী তাকে অবাস্তব ব'লে নিন্দে করে না। অথচ ছবির মধ্যে এমন একটা জীবের চেহারা চোখে পড়তে পারে প্রাণীবৃত্তান্তের কোনো বিশেষ জন্তুর সঙ্গে যা মেলে না, তার মধ্যে জন্তুত্বের প্রকাশ প্রবল হ'লেও সাধারণে ছবিটাকে অসত্য ব'লে অপবাদ দিয়ে বসে। গ্রন্থকার সেই রকম জন্তুর দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়েছেন প্রাণীবৃত্তান্তে ওটা অশ্রদ্ধেয় কিন্তু চিত্রকলায় ওটা সত্যই। অর্থাৎ ছবির প্রাণী আপন সত্যতা আপনার মধ্যেই নিয়ে আসে। প্রকৃতির সৃষ্টির মধ্যে তাকে সনাক্ত করবার সাক্ষী খুঁজতে হয় না। সাধারণ দর্শক ছবি দেখলেই জিজ্ঞাসা করে এর অর্থ কী? অর্থাৎ এটা হাতি, না ঘোড়া, বন না পাহাড়? ভুলে যায় অর্থকে খুঁজতে হয় ভাষায়, ছবিতে খুঁজি ছবিকেই। অর্থাৎ ছবির পাহাড়ে সাদৃশ্য পাহাড়ের যদিবা থাকে তবু সব ছাড়িয়ে তার মধ্যে একটি মুখ্য জিনিষ পাওয়া যায় যা কেবল মাত্র সেই ছবিরই নিজস্ব, যা চিত্রকরের একান্ত আপন তুলির। প্রকৃতির রাজ্য মায়ার খেলা। ইন্দ্রিয়বোধের দ্বার দিয়ে কল্পনাদৃষ্টির প্রাঙ্গণে তার ইন্দ্রজাল। সেই মায়াবিনী প্রকৃতির সঙ্গে রসপিপাসু মানুষের কারবার। উদ্ভিদবিজ্ঞানী পদ্মকে সওয়াল জবাব ক'রে ক'রে যে তত্ত্ব আদায় করেন সেটা মায়ার আবরণ খসিয়ে দিয়ে, তাতে বুদ্ধি পরিতৃপ্ত হয়। কিন্তু পদ্মরূপেই যে পদ্মের চরম প্রকাশ, তাকে দেখেই রূপবিলাসী বলেন বাস্ আর কোনো অর্থ চাই নে ও নিজেতেই নিজে সার্থক। কোন্ মায়ার গুণে পদ্ম মনকে টানে চোখকে ভোলায় সে তত্ত্ব খুঁজে বের করবে এমন ল্যাবরেটরি নেই। তার স্বজাতীয় অন্যান্য ফুলের সঙ্গে সাদৃশ্য বিশ্লেষণ ক'রে পদ্মফুলের শ্রেণী নির্ণয় করা যায়। কিন্তু কোঠায় বন্দী করার কাজ জ্ঞানের কাজ বোধের কাজ নয়। এই বোধের আমন্ত্রণ প্রকৃতির মায়ার মহলে, সেখানে ছবিতে দেখা দেয় তার অন্যপ্রমাণ-নিরপেক্ষ স্বকীয় বিশেষ রূপ। সেই প্রকাশেই তার চরম অর্থ। সেই চরম অর্থ যদি তার কাছ থেকে পাই অর্থাৎ সে যদি মনের কাছে আপন একান্ত নিজকীয়তায় বিদ্যমান হয়ে ওঠে শিল্পকলার অভাবনীয় জাদুতে, সে যদি চিত্তদ্বারে আঘাত ক'রে বলতে পারে অয়মহংভোন, তবে তার কাছ থেকে তাকেই ছাড়া দ্বিতীয় কোনো অর্থ খুঁজতে যাওয়া মূঢ়তা। কিন্তু আর কিছুর সন্ধানে আছে যার মন তার কানে এই ডাক পৌঁছয় না। অর্থের ধ্যানে নিবিষ্ট থেকে রসলোকের অতিথিকে সে ফিরিয়ে দেয়, যে অতিথি ভাগ্যক্রমে দৈবাৎ আসে।

প্রকৃতির কারখানা ঘরে সমাপ্ত রূপের কীর্তি যত আছে তার চেয়ে অনেক আছে অপূর্ণ রূপের ইঙ্গিত। আছে তা মেঘের স্তরে, পাতার স্তবকে, জলের হিল্লোলে। তা ছাড়া সমাপ্ত সৃষ্টির থেকেও উপচে পড়চে ইঙ্গিত, সাপের ফণায়, পাখীর পেখমে,

বলাকার উড়ে চলায়। ঐশ্বর্য্যের উদ্বৃত্ত ছড়াছড়ি যায় ভাণ্ডারের বাইরে। তারা উপেক্ষিত হয় সাধারণের দৃষ্টিতে। তাদের মধ্যে রেখায় বর্ণে ভঙ্গীতে রয়ে গেছে সৃষ্টির অর্থসঙ্কেত। এইসব অর্থ ধরা পড়ে রূপকারের চোখে। তিনি ইসারাগুলিকে নিয়ে বিধাতার সৃষ্টিক্ষেত্রে বানিয়ে তোলেন মানুষের সৃষ্টি, উভয়ের মধ্যে সঙ্কেতের যোগ আছে তবু আছে প্রকাশের পার্থক্য। সেই অন্তরঙ্গ যোগের গুণে এই পার্থক্য সৃষ্টিছাড়া হ'তে পারে না।

মানুষের সকল উদ্ভাবনার মূলে তার কল্পনাবৃত্তি। সেই কল্পনার মধ্যে এই প্রেরণা রয়ে গেছে যে মানুষ নকল করবে না—রচনা করবে। লোমশ জন্তুর চামড়াতেই তার গাত্রবস্ত্র। তার বদলে নগ্নদেহ মানুষের আছে কল্পনা। আদিম অক্ষম অবস্থায় পশুর আস্ত চামড়া চুরি করেই মানুষ শীত বাঁচিয়েছে; তাকে বলা যায় পশুর হুবহু নকল। ঐ নকলে সৃষ্টিনিপুণ মানুষের সম্মান থাকে না। যত ক্ষণ না সে পশুলোম থেকে পশম, পশম থেকে শাল বানিয়েছে তত ক্ষণ যদি বা তার শীত নিবারণ হয়ে থাকে লজ্জা নিবারণ হয় নি। যে সকল কারিগর প্রকৃতির অবিকল নকল করে, তারা চুরি করে প্রকৃতির কাছ থেকে। এই চৌর্যনৈপুণ্য দেখেই যারা বাহবা দেয় তারা মানব-শিল্পের মর্যাদা বোঝে না।

গ্রন্থকার তাঁর গ্রন্থের শেষ ভাগে যে কথাটা বলেছেন সেটা প্রণিধানের যোগ্য। সেটা বুঝিয়ে বলা যাক। শিল্পের পরম মূল্য তার নিজের পূর্ণতাতেই। প্রয়োজনের দাম বিচার ক'রে তার দাম ধরা হয় না। কিন্তু মানুষ আদিকাল থেকেই চেষ্টা করেছে শিল্পকে আপন প্রয়োজনের সঙ্গে জড়িত ক'রে আপন জীবনযাত্রাকে সুন্দর ক'রে তুলতে। কেন না তার জীবনযাত্রার পথে পদে পদে আনন্দ আছে; আনন্দ তার পানে আহারে মৃগয়ায় রণজয়গৌরবে। এই আনন্দকে প্রকাশ করে সুন্দর, সুন্দরকে পরিস্ফুট করে শিল্প। জলের ঘড়া, রাঁধবার হাঁড়ি, পানপাত্র, অন্নের থালি, মৃগয়ার উপকরণ, যুদ্ধের অস্ত্র, ভ্রমণের রথ, বসবার আসন, শোবার খাট, গায়ের কাপড, পায়ের জুতো এই সমস্ত নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজনের সামগ্রীতে মানুষ কেবল যে আপন প্রয়োজন সাধন করে তা নয়, আনন্দ প্রকাশ করে, যে আনন্দ অনির্বচনীয়। যে যুগে যে দেশে মানুষ জীবনের আনন্দকে জীবনের বিচিত্র ব্যবহারে প্রকাশ করতে আপনার কার্পণ্য বা অক্ষমতা প্রমাণ করে সে যুগের সে দেশের ধনমান প্রচুর থাকতে পারে কিন্তু তার চিত্তদৈন্য শোচনীয়। এমন এক দিন ছিল যখন দেশের সর্বত্রই জলভরণের ঘট ছিল রমণীয়; কিন্তু আজ যখন দেখি কেরোসিনের টিনে জল ভরে নিয়ে আসে এবং সেটা কারো চক্ষুশূল হয় না তখন বুঝি এ কালের মুনাফার থলি এবং বি.এ.; এম. এ-র ডিগ্রির উপরে অলক্ষ্মী বাসা করেছে।

এই উপলক্ষ্যে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে, সে হচ্চে গান। গ্রন্থকার গ্রন্থের আরম্ভভাগে এই প্রসঙ্গে নিজের বক্তব্য কিছু বলেছেন। আমারও কিছু বলবার আছে। এক জায়গায় তিনি বলেছেন "দশ-বারো শতকের প্রাচীন পারস্য দেশের নিত্যব্যবহারের পানপাত্রগুলি ঐ একই সুরে বাঁধা।" এখানে সুর শব্দের তিনি প্রয়োগ করেছেন অনির্বচনীয়তাকে বোঝাতে। সুর অনির্বচনীয়ের প্রধান বাহন। কিন্তু মানুষ কেবল যে ব্যবহার্য সামগ্রীর সঙ্গেই অনির্বচনীয়কে প্রকাশ করতে চেয়েছে তা নয় তার চেয়ে অনেক বেশি ব্যাকুল হয়ে চেয়েছে আপন সুখদুঃখ ভালোবাসার সহযোগে। অর্থাৎ যে সব শব্দ তার হৃদয়াবেগের সংবাদমাত্র দেয় শিল্পকলার দ্বারা তার মধ্যে সে অসীমের ব্যঞ্জনা আনতে চায়। আদিকাল থেকেই মানুষ তাই শব্দের সঙ্গে সুরকে মিলিয়ে গান গেয়েছে। একথা মানি শব্দের নিজেরই একটা শিল্প আছে, ছন্দ তার প্রধান অঙ্গ। কিন্তু ছন্দ তার একলার নয় গানেরও বটে। এ ছাড়া কাব্যের আছে বিশেষ ভাবে শব্দ যোজনা ও শব্দ বাছাই। তা হোক তবু দেখা গেছে মানুষ যেমন চেয়েছে কাব্যকে তেমনি চেয়েছে গানকে। জানি নে ইতিহাসে কবে মানুষের ভাষা এমন

অন্যথা ছিল যখন সুর তাকে অবজ্ঞা ক'রে তাকে পর ব'লে বর্জন করেছে। আমার তো মনে হয় এই সম্বন্ধের মধ্যে যেটুকু পরত্ব আছে তাতে পরকীয়া প্রীতি বাড়ে বই কমে না। প্রিয়জনকে একথা বলবার বেদনা মনে সহজেই জাগে, যে "ভালোবাসিবে বলে ভালোবাসি নে"। ভাষা যদি নিজেই স্বীকার করে বাক্যটাতে সবটা বলা হোলো না, সে অবস্থায় ভৈরবীর সঙ্গে সে মিতালি করলে ওস্তাদরা কি বলবেন অসবর্ণ মিলনে সঙ্গীতের জাত গেল? অপর পক্ষে নির্বাক ভৈরবী একটা এব্‌স্ট্রাক্ট আবেগ প্রকাশ করতে পারে কিন্তু ঠিক ঐ কাব্যের কথাটি বলতে গেলে সে বোবা। অথচ বলতে গেলে যেমন দরকার কথার তেমনি দরকার সুরেরও। তাহলে কি হুকুম হবে দরকারটাকেই সমূলে উচ্ছেদ করা চাই? মানুষ কি এ হুকুম মানবে?

প্রিয়া বল্‌চেন,

চূড়াটি তোমার যে রঙের রাঙালে, প্রিয়,
সে রঙে আমার চুনরি রাঙিয়ে দিয়ো।

এ কাব্য! এর মধ্যে একটি হৃদয়াবেগ নিবিড় হয়ে আছে; কানাড়ার স্পর্শে সে উচ্ছলিত হয়ে উঠল, কিন্তু শুধুমাত্র কানাড়ার আলাপে এর বাণী থাকে বোবা হয়ে। বাণীর যোগে কানাড়া একটি বিশেষ রস পেয়েছে, তার দাম কম নয়। চিরদিনই মানুষ কথার সঙ্গে সুর জড়িয়ে গান গেয়ে এসেছে—সুর বড়ো কি কথা বড়ো এ তর্ক ওঠেই নি। যদি নিতান্তই তর্ক তোলা হয় তাহলে আমি বলব এক্ষেত্রে সঙ্গীতই স্বামী—ভাষাকে সে আপন গোত্রে তুলে নিয়েছে। এই দাম্পত্যকে মানুষ চিরদিনই স্বীকার করেছে আনন্দের সঙ্গে। একটি পুরানো গান আছে "কাল আসিবে বলে গেল, কেন এলো না।" এ তো একটা সংবাদ মাত্র কিন্তু খাম্বাজ সুরের জিয়ন্‌কাঠি লাগবামাত্র সংবাদের নির্জীবতা থেকে শিল্পের প্রাণলোকে বাণীটি মাথা তুলে উঠল। এমনি ক'রেই পারসিক রূপকার নিত্যব্যবহারের জিনিষকে শিল্পের অমরাবতীতে উত্তীর্ণ ক'রে দিয়েছে। যাঁরা সুরে কথা মিলিয়ে দিয়ে গান রচনা করেন তাঁদেরও ঐ এক উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যে সঙ্গীতেরই সার্থকতা অগ্রগণ্য।

গ্রন্থকর্তা গ্রন্থের আরম্ভেই পার্টিশনের মামলা তুলেছেন। তিনি ভাষা ও সুরের মধ্যে "বিবদমান বৈরীভাব" দেখ্‌তে পেয়েছেন। তা যদি সত্য হ'ত তাহলে সাহিত্যে কাব্যের স্থান থাকত না। কবিতায় আছে অগীত সঙ্গীত, তার সীমানায় যদি গীত সঙ্গীতের ব্যবধান অলঙ্ঘ্য হয় তাহলে তো স্বভাবতই গানের সৃষ্টি হ'তে পারে না। কোনো নারীর পায়ে চলার ভঙ্গী সুন্দর হ'তে পারে, কিন্তু যদি তার মন লাগে তা হ'লে সে-কি তার সেই ভঙ্গীকে নৃত্যকলায় জাগিয়ে তুলতে পারে না? পায়ে চলার শিল্প যেমন নাচ, বাক্যের শিল্পরূপ তেমনি গান। অবশ্য আরো এক জাতের শিল্প আছে তাকে বলে কাব্য।

য়ুরোপের দেশবিশ্রুত সঙ্গীতশিল্পী গ্লুক-এর (Gluck) অন্য পরিচয় না হোক তাঁর খ্যাতির পরিচয় হয়তো এদেশেও অনেকের কাছে অগোচর নয়। এইখানে তাঁর বচন উদ্ধৃত ক'রে দিই :—

My idea was that the relation of music to poetry was much the same as that harmonious colouring and well-disposed light and shade to an accurate drawing which animates the figures without altering their outlines.

সঙ্গীতকলা বলো চিত্রকলা বলো, মূর্তিকলা বলো একান্ত স্বাতন্ত্র্যে আপন অবিমিশ্র বিশুদ্ধতা প্রকাশ করতেও পারে স্বীকার করি। সঙ্গীতে যেমন যন্ত্রবাদন আলাপ বা আধুনিক কালে যেমন বিষয়নিরপেক্ষ ছবি বা মূর্তি। কিন্তু আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত অধিকাংশ স্থলে ভাষায় প্রকাশযোগ্য বিষয়ের সঙ্গে যোগরক্ষা ক'রেই তারা আপন গৌরব রক্ষা করেছে। বেটোফেন প্রভৃতি মহৎপ্রতিভাশালী গুণীদের রচিত একান্ত সুর-আশ্রয়ী সিম্‌ফোনি-জাতীয় সঙ্গীত য়ুরোপীয় সংস্কৃতির নিত্যসম্পদ ব'লে সেখানকার সকল সমজদাররা কীর্তিত করে এসেছেন। অথচ তেমনি বাগ্‌নার প্রভৃতি গুণীদের রচিত সাহিত্যবিষয়সমাশ্রিত পার্সিফাল প্রভৃতি অপেরা পাশ্চাত্য মহাদেশে প্রভূত সম্মান পেয়েছে। ঐ

সঙ্গীত যা বলতে চেয়েছে তা বাণীর সহযোগিতা ছাড়া ব্যক্ত হ'তেই পারে না। ঐ সকল অপেরার সাহিত্যবিষয়ও পরিপূর্ণ প্রকাশের জন্যে সঙ্গীতের অপেক্ষা করেছে।

আমাদের দেশে সাহিত্যসজ্জা-বর্জিত সঙ্গীত কণ্ঠের বা বীণা প্রভৃতি যন্ত্রের আলাপে প্রকাশ পায়। বিখ্যাত গুণীদের রচিত সঙ্গীতের মহৎ রূপসৃষ্টি ব'লে তারা বিশেষ শিল্প আকারে রক্ষিত ও কালে কালে ঘোষিত হয়ে আসে নি। তানসেন প্রভৃতির রচনা নানা কণ্ঠে পরিবর্তিত ও বিকৃত হ'তে হ'তে যুগ-প্রবাহে ভেসে এসেছে বাক্যের তরী আশ্রয় ক'রে। অনেক স্থলেই সে তরী সামান্য ডিঙি বা ভেলা। কাজ চালাবার জন্যে যাঁরা সে তরী বানিয়েছেন তাঁরা যদি সে তরীকে অকিঞ্চিৎকর না ক'রে শিল্পভূষিত করতে পারতেন তাহলে বাহনের উৎকর্ষে আরোহীর সম্মানের লাঘব হ'তই যে তা কেমন ক'রে বলব? তানসেন প্রভৃতির গানে সাহিত্যের উৎকর্ষ যে সর্বত্র উপেক্ষিত হয়েছে তাও তো সত্য নয়। এ কথা মনে রাখতে হবে সঙ্গীতের সেবকতায় বাক্যকে গৌণভাবে আশ্রয় করলেও বাক্য আপন ধর্ম সম্পূর্ণ ভুলতে পারে না, তার অর্থের জীর্ণ চীরের মধ্য দিয়েও সাহিত্যের কুলশীল বেরিয়ে পড়ে। রাধিকা বলছেন, "লইরে মোরি শ্যাম এঁদোরিয়া, কৈসে ধরুঁ মেরে শিরো পর গাগরিয়া।" অর্থাৎ শ্যাম আমার কলসীর বিড়েটা সরিয়ে নিয়েছেন এখন আমি মাথার উপরে গাগরি ধরি কি ক'রে? যদি সঙ্গীত আদেশ করে এই জল আনার ব্যাঘাতের কথাটা একেবারে ভুলে যাও, কেবল মনে রাখো পূরবী রাগিণীর রূপ আমি বলব, আমি না পারি একে ভুলতে না পারি ওকে। আমার কানে বাজতে থাকে, ইথে মথুরা উথে গোকুল নগরী বীচে মিলে মোহে নন্দকো নঙ্গারিয়া,—এক দিকে রইল মথুরা আব এক দিকে গোকুল নগরী; মাঝখানে মিলল আমার সঙ্গে নন্দের নন্দন কিন্তু করি কী, সে যে আমার মাথার বিড়ে নিয়ে গেল আমি জল ধরতে যাই কি ক'রে।—কথা আর সুরের ফাঁকে ফাঁকে এই খবরটা ধরা পড়ল যে বিড়ের শোকটা ছলনা। গোপিনীর কর্তব্যের বিড়ে গেছে হারিয়ে, সে সাধ ক'রেই ধরা পড়েছে মথুরা আর বৃন্দাবনের মাঝখানটাতে। এ তো খাঁটি সাহিত্য আর এর সহচরী পূরবী তো খাঁটি সঙ্গীত—দুইয়ের একাত্মতা তো মনে নিবিড় ক'রে বাজছে, শাস্ত্র মেনে কি এদের জোড় ভেঙে দিতে হবে? পার্সিফাল অপেরার বুকে গানের ওস্তাদ যদি সার্জারির ছুরি চালাতে আসেন তাহলে সবাই মিলে দেবে তাকে পাগলাগারদে চালান ক'রে।

নিরর্থক শব্দ আশ্রয় করে সঙ্গীত তেলেনা সারগম সৃষ্টি করেছে। গীতকলায় তাদের স্থান উচ্চ শ্রেণীর নয়। তানসেন প্রভৃতি গুণীদের রচনা সাহিত্যভাষা অবলম্বনেই আজ পর্যন্ত টিঁকে আছে। সে ভাষা সাহিত্যের কোঠায় সব সময়ে উচ্চাসনের অধিকারী হয় না। তবু তাদের অভাবে রসের কিছু অভাব যদি ঘটত তাহলে সঙ্গীতে দেখা দিত তেলেনা-বর্গেরই আধিপত্য। বস্তুত অকিঞ্চিৎকর হ'লেও গানে সাহিত্য গৌণ নয়। সূর্যের আলো মেঘের স্তর পেলে বাষ্পপুঞ্জে আপন রং ফলিয়ে দেয়। অতি সামান্য বাক্যকেও রঙিয়ে তোলবার সুযোগ পায় গান। "গুরুজি কালো কম্বল আমাকে কিনে দাও", মুখের কথায় এটা তুচ্ছ। কিন্তু পরজ রাগে এটাকে টেনে তোলে বৈরাগ্যের ব্যাকুলতায়। কিন্তু এর জো নেই তোম তানানায়। সূর্যকিরণ যে তুচ্ছ মেঘের বাষ্পকেই মহিমা দেয় তা নয়, তাজমহলকেও ক'রে তোলে অপরূপ।

এই তো গেল এক দিকের কথা, এখন ছবির দিকে তাকাও। বিষয়বস্তুহীন ছবির নিছক বিশুদ্ধ রূপ আমার ভালোই লাগে, যেমন ভালো লাগে বাক্যহারা সঙ্গীতের আলাপ। বস্তুত আমার নিজের ঝোঁক্ ঐদিকে। কিন্তু ছবি যদি সাহিত্য বিষয়কে অবলম্বন ক'রেও আপন সতীত্ব রক্ষা করতে পারে সেও তো কম কথা নয়। বরবুদরের পাথরে খোদা জাতককাহিনী সাহিত্যেরই মূর্তিরূপ, এতে শিল্পকলার অমরতাকে ক্ষুণ্ণ করে নি। তেমনি মধ্যযুগের ইটালীর চিত্রকরের

দ্বিজেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ • আশ্বিন ১৩৪৮

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় • পৌষ ১৩২৫

মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী • অগ্রহায়ণ ১৩৩৬

প্রাণকৃষ্ণ আচার্য • আষাঢ় ১৩৪৩

পূরণচন্দ নাহার • আষাঢ় ১৩৪৩
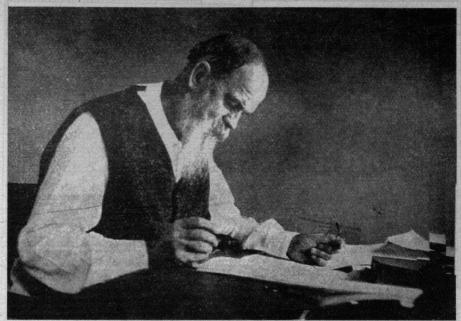
সি এফ এন্ডরুজ • বৈশাখ ১৩৪৭

আশুতোষ চৌধুরী • আষাঢ় ১৩৩১

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী • ফাল্গুন ১৩৪৮
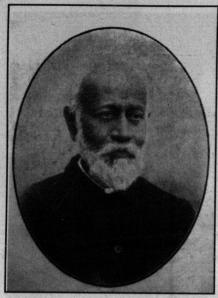
বামনদাস বসু • পৌষ ১৩৩৭

টি সদাশিব আইয়ার • মাঘ ১৩৩৪

মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় • ফাল্গুন ১৩৪১

গুরুসদয় দত্ত • শ্রাবণ ১৩৪৮

সরোজনলিনী দত্ত • মাঘ ১৩৩৪
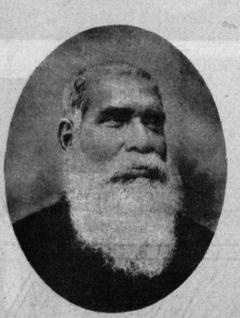
শৈলবালা দেবী • পৌষ ১৩৪১

লেডি নির্মলা সরকার • ফাল্গুন ১৩৪১

উমা দেবী • চৈত্র ১৩৩৭

জেন এডাম্‌স • আশ্বিন ১৩৪২

হেমনলিনী দেবী • শ্রাবণ ১৩৪৩

স্যর মহম্মদ আজিজুল হক • পৌষ ১৩৪৮

শশিভূষণ নিয়োগী • কার্তিক ১৩৩৬
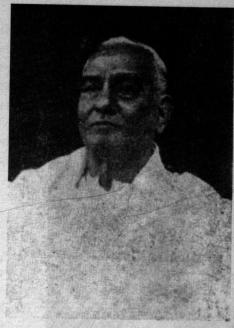
সুন্দরীমোহন দাস • চৈত্র ১৩৪৩

নৃপেন্দ্রনাথ সরকার • অগ্রহায়ণ ১৩৪২

জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় • ভাদ্র ১৩৪০

মির্জা এম ইসমাইল • জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩
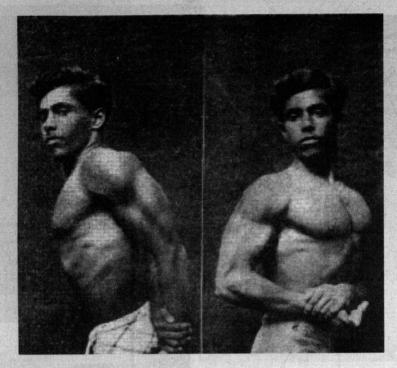
ব্যায়াম-সাধক কানাইলাল মুখোপাধ্যায় • আষাঢ় ১৩৩৮

ভীম ভবানী • অগ্রহায়ণ ১৩২৯

তুলিকায় খৃষ্টকাহিনী যে অপরূপ মহিমা লাভ করেছে কলারসিক তাকে কি সাহিত্যিক বিষয় সংসর্গের অপবাদে জাত তুলে গাল দেবেন? প্রত্যেক কলার স্বাতন্ত্র্য আছে, আছে ব'লেই পরস্পরকে আতিথ্য দেবার পথ তারা কৃপণের মতো অবরুদ্ধ ক'রে রাখে নি। এ নিয়ে দলাদলি করবার উত্তেজনা আমি ঠিক বুঝতে পারি নে। ছাপাখানা চলতি হবার পূর্বে এক সময়ে গান গেয়েই কাব্য পড়া-হ'ত। তেমনি ক'রেই মানুষ বরাবর কথার আশ্রয়েই সঙ্গীতকে চালনা ক'রে এসেছে। —আজকেই দেখি এ ক্ষেত্রেও কম্যুনালিজমের হাওয়া বইল। এই হাওয়ায় যে ধুলো ওড়ায় তাতে সত্য হয় আচ্ছন্ন।

মংপু
২৫/৫/৩৯

শিল্প-বিতর্ক :
অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়-সুকুমার রায়-রমাপ্রসাদ চন্দ ও প্রবাসী-সম্পাদক

১৩১৬ ভাদ্র

সম্পাদকের বক্তব্য

"ভারতীয় চিত্রকলা" সম্বন্ধে, এবং সাধারণতঃ চিত্রসম্বন্ধে, আমার জ্ঞান অতি সামান্য। আমি, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাঁহার শিষ্য ও সহচরগণ যে রীতিতে ছবি আঁকেন, তাহাতে বেশ কবিত্ব দেখিতে পাই। ইহাকেই আমি ছবির সৌন্দর্য্য মনে করি। তাঁহাদের অঙ্কিত সকল ছবিই যে ভাল বা সুন্দর, তাহা তাঁহারাও মনে করেন না। কোন চিত্রে অঙ্কিত প্রত্যেক ব্যক্তি সুন্দর না হইলেও, একজনও সুন্দর না হইলেও, সেই চিত্র সুন্দর হইতে পারে। পক্ষান্তরে একখানা ছবির প্রত্যেক নরনারীর মুখ চোখ নাক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিখুঁত হইলেও সে ছবি সুন্দর না হইতে পারে। ছবিতে চিত্রিত ব্যক্তিগণকে যে দেহে সুন্দর হইতেই হইবে, ইহা কেন মনে করা হয়? সংসারে বিধাতার সৃষ্ট নরনারীর মধ্যে সকলেই কি সুন্দর? অধিকাংশই কি সুন্দর? অনেকে মনে করেন, ইতিহাসপুরাণকাব্যপ্রথিত নরনারীকে সুন্দর হইতেই হইবে। কিন্তু তাহা কি ঠিক? ইন্দোরের প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী অহল্যাবাঈ সুন্দরী ছিলেন না। এইরূপ হয়ত আরো অনেকের দৈহিক সৌন্দর্য্য ছিল না।

তৎপরে আমার বক্তব্য এই যে, দৈহিক সৌন্দর্য্যের আদর্শও অনেকের ভিন্ন ভিন্ন। আমি যাহাকে সুন্দর মনে করি, আপনি তাহাকে সুন্দর মনে করেন না। এক দেশ বা প্রদেশের সৌন্দর্য্যের আদর্শ অন্য দেশ বা প্রদেশের সৌন্দর্য্যের আদর্শ হইতে ভিন্ন। আমি ইহা স্বীকার করি না যে "ভারতীয় রীতি"তে অঙ্কিত সকল ছবির পুরুষ ও নারীমূর্ত্তির দেহ অসুন্দর। অনেকগুলির মূর্ত্তি সুন্দর।

চিত্রে দৈহিক সৌন্দর্য্য ব্যক্ত করিবার দুই রীতি আছে—(১) স্বাভাবিক সুন্দর নরনারীদেহের ফোটগ্রাফের মত অনুকরণ; (২) কবিরা যেমন উপমা দ্বারা কথায় সৌন্দর্য্য ব্যক্ত করেন, ঠিক সেই রীতিতে নরনারীদেহ অঙ্কিত করিয়া সৌন্দর্য্য সূচনা। এই শেষোক্ত রীতির কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা আমি গত মাসের প্রবাসীতে করিয়াছি। ইহাই প্রাচ্য এবং ভারতীয় রীতি। ইহাকে অনেকে "অস্বাভাবিক" আখ্যা দেন। ইহা অবাস্তব বটে। বাস্তবিক প্রাচ্য রীতি idealistic এবং আধুনিক-পাশ্চাত্য রীতি realistic।

রাফেল একজন শ্রেষ্ঠ চিত্রকর ছিলেন ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু তাঁহারও কোন কোন শ্রেষ্ঠ ম্যাডোনা দৈহিক সৌন্দর্য্যের জন্য বিখ্যাত নহেন। মাতৃভাব ও দেবীভাবের মিলনেই তাঁহার মাতৃমূর্ত্তিগুলির শ্রেষ্ঠত্ব। তাঁহার ম্যাডোনাগুলির মধ্যে ম্যাডোনা ডিলা সেডিয়া বোধ হয় দৈহিক সৌন্দর্য্যে প্রথমস্থানীয়া। কিন্তু এই চিত্র তাঁহার সুন্দরতম চিত্র নহে। আমি আরও অনেক বিখ্যাত উৎকৃষ্ট মধ্যযুগের ইউরোপীয় ছবির নাম করিতে পারি, যাহার মূর্ত্তিগুলি সুন্দর নয়। এইরূপ আধুনিক পাশ্চাত্য অনেক শ্রেষ্ঠ ছবিরও নাম করিতে পারি। চিত্রাঙ্কিত মূর্ত্তির দৈহিক সৌন্দর্য্য ও চিত্রের সৌন্দর্য্য, এ দুটি আলাদা জিনিষ। বিলাসিনী কোন সুন্দরী রাণীর দেহের ও বিলাসলীলার সুললিত বর্ণনাপূর্ণ কবিতা শ্রেষ্ঠ কবিতা নহে, কিন্তু রূপহীনা পুণ্যবতী রাণী অহল্যাবাঈর অন্তরাত্মার সৌন্দর্য্য যে কবিতায় ফুটিয়া উঠে তাহা শ্রেষ্ঠ কবিতা। চিত্রেও এই ভিতরের সৌন্দর্য্যই আমাদের বাঞ্ছিত ধন। আবার

ইহাও ঠিক যে সীতা সুন্দরী ছিলেন এবং দেবী-স্বভাবাও ছিলেন। কিন্তু আমরা সুন্দরী বলিয়া তাঁহার পূজা করি না, দেবী বলিয়াই করি। আমার শেষ বক্তব্য এই যে কাব্য ও চিত্র উভয়েই বাহ্য ও আন্তর সৌন্দর্য্য ও সুষমার যোগ সোণায় সোহাগা। দৈহিক সৌন্দর্য্যের মূল্য আছে, নতুবা ভগবান্ সুন্দব দেহের সৃষ্টি করিতেন না। কিন্তু দেহের সৌন্দর্য্য না থাকিলেও চলে, তাহাতে আমরা দরিদ্র হই না। কিন্তু অন্তরের সৌন্দর্য্য না থাকিলে আমরা বাস্তবিকই দরিদ্র ও কৃপাপাত্র হইয়া পড়ি।

দেহের সৌন্দর্য্য থাকিলেই যদি চিত্র সুন্দর হইত, তাহা হইলে বর্ষে বর্ষে দোকানদারেরা যে সকল রঙ্গীন ছবিযুক্ত ক্যালেণ্ডার বা পঞ্জিকাপত্র উপহার দেয়, সেগুলা রাফেলের ছবি অপেক্ষা মূল্যবান হইত। অনেকে বোধ হয় সেইরূপই মনে করে। কারণ দেখিতে পাই, গৃহে গৃহে সেই ছবি যত্ন করিয়া লোকে বাঁধাইয়া রাখে। আমি সামান্য যাহা বুঝি লিখিলাম। যোগ্যতর ব্যক্তি কলম ধরিলে ভাল হয়।

১৩১৬ আশ্বিন

ভারতীয় চিত্রকলা।

(১)

"প্রবাসীর" ভাদ্রসংখ্যায় শ্রীযুক্ত বিমলাংশুপ্রকাশ রায় মহাশয় ভারতের নূতন চিত্রপদ্ধতি সম্বন্ধে যে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন, ইতিপূর্ব্বে সম্পাদকীয় মন্তব্যে আপনি তাহার সদুত্তর দিয়াছেন।

কথাটার একটা স্পষ্ট বোঝাপাড়া আবশ্যক। বর্ত্তমানকালে লেখক তথা শিল্পিসম্প্রদায় ও সাধারণের সহিত যে সম্পর্ক আছে, অতীতকালে তাহা ছিল না। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ঐতিহাসিক যুগের পূর্ব্বে যে সকল বিরাট শিল্পের নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা কোনও শ্রেণীবিশেষ কিম্বা জনসাধারণের স্তুতিনিন্দাবাদের উপর লক্ষ্য করিয়া রচিত হয় নাই। বর্ত্তমানকালে এই ভাবটীর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বঙ্গের নূতনপন্থী চিত্রকরগণ যে সমস্ত চিত্র প্রকাশ করিতেছেন তাহার দোষ ত্রুটী ভ্রম ও প্রমাদের জন্য তাঁহারা দায়ী; তথাপি সাধারণের প্রচলিত মত ও আদর্শে তাঁহারা যে আঘাত করিতেছেন, তাহার একটা কৈফিযৎ দিতে তাঁহারা বাধ্য। এক কথায় তাঁহাদের উত্তর এই :— "আমরা যখন ভারতের কথা, ভারতের উপাখ্যান চিত্রে লিখিতে বসি, তখন কোনও প্রচলিত সৌন্দর্য্যের আদর্শে তাহা লিখিতে চেষ্টা করি না, মুক্তচক্ষে অন্তরের মধ্যে অবগাহন করিয়া যে ধ্যানমূর্ত্তির আভাস পাই, তাহারই রূপকল্পনা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করি।"

ভারতের শিল্প, ভারতের সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে আবদ্ধ। সংস্কৃত কাব্যে ও সাহিত্যে যে কল্পনা-জগতের সৃষ্টি করা হইয়াছে, বঙ্গের নবীন চিত্রকরগণ তাহারই প্রতিমূর্ত্তি এরূপভাবে চিত্রে লিখিতে চেষ্টা পাইতেছেন, যাহাতে সংস্কৃত সাহিত্যের অনুরূপই একটা অলৌকিক অতিপার্থিব ভাব আছে, যাহা বিংশ শতাব্দীর দৈনন্দিন বাস্তব জগত হইতে বহুদূরে অবস্থিত এবং উহা হইতে সর্ব্বাংশে পৃথক ও বিপরীত। যে পরিমাণে আমাদের দেশের চিত্রকরগণ ঐ ভাবটী তাঁহাদের চিত্রপটে রসের

মূর্ত্তিতে উপলব্ধি করিতে পারেন সেই পরিমাণে তাঁহাদের কৃতিত্ব। আমাদের পুরাণে, কাব্যে, কাহিনীতে যে 'আদর্শ'— যে 'ভাবনা' পরিকল্পিত হইয়াছে, তাহা যে ভাষাকে আশ্রয় করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, বঙ্গের চিত্রকরগণ তাঁহাদের রচনাপদ্ধতিতে তাহারই অনুরূপ শক্তিশালী এমন একটী ভাষা সৃষ্টি করিতে চেষ্ট পাইতেছেন, যাহাতে ঐ ভাবগুলি যথার্থরূপে প্রকাশ করিবার উপযোগিতা আছে। এই ভাবরাশি যে অভিনবত্ব ও বিচিত্রতার মহিমায় মণ্ডিত, তাহার ভাষাও তদনুরূপ বিচিত্র ও উদ্‌ভ্রান্ত। এই ভাব ও ভাষার যে সামঞ্জস্য, সে ঐকতানিকতা বঙ্গীয় শিল্পীর আরাধনার বস্তু, তদ্ব্যতীত আর কোনও সৌন্দর্য্যের আদর্শ তাঁহাদের রচনায় স্থান পাইবে না। ভারতের নবীন শিল্পীর লক্ষ্যই এই যে,—ভারতের বিশিষ্ট ভাবগুলির যে ব্যক্তিগত সৌন্দর্য্য আছে, তাহাই হৃদয়ের মধ্যে গভীর ভাবে উপলব্ধি করা,—এবং সেই 'ভাবনা'রাশি যথাসাধ্য চিত্রে প্রতিফলিত করা, যাহাতে সহস্র সহস্র বৎসর ভারতবর্ষের হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইয়া আসিয়াছে। ভারতের প্রাচীন কাব্যে, গুহায়, শিলাপটে যে অখণ্ড বিরাট সৌন্দর্য্য পুঞ্জীভূত হইয়া আছে, য়ুরোপের শিল্পের ক্ষুদ্র "প্রকৃতি-দর্পণে" তাহার ছায়া অদ্যাপিও পড়ে নাই। ভারতশিল্পের প্রসঙ্গে "বাহ্যিক সৌন্দর্য্য", "ভাবের সৌন্দর্য্য" প্রভৃতির কথার অবতারণা ভাষার অপব্যবহার। সমগ্র মানবজাতির শিল্পের ইতিহাসে যে সহস্রবিধ সৌন্দর্য্যের আদর্শ রচিত হইযাছে, ভারতশিল্পের বর্ণনীয় বস্তু তাহার আদিপুরুষ।

বিষয়টা কঠিন বটে, তথাপি আমাদের পক্ষে কথাটা আরও গুরুতর হইয়াছে তিনটী কারণে। (১) চিত্রবিদ্যা বা যে কোন শিল্পশাস্ত্রের "কি এবং কেন", কেবল কথায় বুঝাইয়া বলা যায় না, রীতিমত হাতে কলমে চাক্ষুষ প্রমাণের দ্বারা বুঝিতে হয়। তাহার সাক্ষ্য প্রবাসীতে ক্রমান্বয়ে মুদ্রিত চিত্রের আলোচনায় যাহা বুঝিতে চাহেন না তাহাও পত্রপ্রেরকের বোধগম্য হইতেছে। (২) বঙ্গের চিত্রসমালোচকগণ সাধারণ শিল্পবিদ্যা সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ। (৩) বঙ্গের তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায় বিলাতের যে তৃতীয় শ্রেণীর মামুলী গ্রীকশিল্পের আদর্শ লইয়া, আর্য্যশিল্পের বিশালত্ব আক্রমণ করিতেছেন, তাহার দৈন্য ও খর্ব্বতা য়ুরোপের বিদ্বৎসমাজ বহুপূর্ব্বে স্বীকার করিয়াছেন। এই গ্রীক আদর্শের "ঠুলিটী" যতদিন আমাদের চক্ষু জুড়িয়া বসিয়া থাকিবে, ততদিন ভারতশিল্পের বিরাট সৌন্দর্য্য অন্তরের সহিত অনুভব করা আমাদের পক্ষে বিড়ম্বনা।

শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

(২)

মহাদেবের শ্মশ্রুমুণ্ডন।

প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর বিখ্যাত "শিবতাণ্ডব" চিত্রের প্রতিলিপি কয়েক মাস পূর্ব্বে "প্রবাসী"তে প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং সম্প্রতি সাহিত্য পত্রে তাহার সমালোচনা নয়, সদালোচনাও নয়, কিন্তু কুৎসা জল্পনা বাহির হইয়াছে। সমালোচক 'হাড়গিলা' ইত্যাদি সুমধুর সম্ভাষণ করিয়াই ক্ষান্ত হ'ন নাই, মহাদেবের শ্মশ্রুমুণ্ডন ছল ধরিয়া ভদ্রসন্তানকে ইতর ভাষায় গালি দিয়াছেন। সাহিত্যপত্রের সমালোচনালেখকের গালিবর্ষণপটুতা দেশবিখ্যাত ও আমাদের নিকট চিরপুরাতন, কিন্তু

ভারতশিল্প ও দেবমূর্ত্তি সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণা (?) বিশেষ বিস্ময়কর ও আমাদের কাছে এক অপূর্ব্ব সামগ্রী বলিয়া ঠেকিতেছে;—এক কথায় যেন অনধিকার চর্চ্চা বলিয়াই বোধ হইতেছে।

এই মহাদেবের শ্মশ্রুমুণ্ডন যেটাকে তিনি এত গুরুতর অপরাধ বলিয়া ধরিতেছেন—সেই শ্মশ্রু আমরা প্রাচীন ভারতের কোনো মহাদেবমূর্ত্তিতে, পুরাণ উপপুরাণ কাব্য সাহিত্যে কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। রূপমালা স্তবমালা প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ ও শিল্পশাস্ত্র যেগুলি বিশেষ করিয়া শিল্পিগণের জন্য রচিত তাহার কোথাও মহাদেবের দাড়ি বহিয়া গঙ্গা নামিতেছেন, কিম্বা গিরিসুতা সেই বিকট দাড়ির উকুন বাছিতেছেন এরূপ বর্ণনা আছে বলিয়া মনেতো পড়ে না। বাংলা দেশে আসিয়া মহাদেব কখন কখন ছদ্মবেশে শ্বশুর ও শাশুড়ি এবং কন্যাযাত্রীকে ভয় দেখাইয়াছেন বটে, কিন্তু সেও অল্পক্ষণের জন্য। তাঁহার নিজমূর্ত্তি তিনি কখনো কোথাও এক রাশ দাড়ি দিয়া ঢাকেন নাই—অধুনাতন বাংলা দেশের কালীমূর্ত্তির পদতলেও নয়, পুরাকালে ত্রিমূর্ত্তিমন্দিরেও নয়। আমাদের দেশের ভক্ত কবি ও শিল্পী এমন কি কুমারটুলীর কুমারগণকেও তিনি গৌরীভুজলতাবেষ্টিত নীলকণ্ঠরূপে দেখা দিয়া কৃতকৃতার্থ করিয়াছেন। কেবল কেন যে তিনি 'সমালোচক' মহাশয়কে বিকট শ্মশ্রুরাজিমণ্ডিত রূপে দেখা দিয়া ছলনা করিতেছেন বুঝিতে পারি না। বোধ হয় তিনি নিজের শ্মশ্রু গুম্ফ মুণ্ডিত করিয়া মানুষ হইয়াও নিজেকে স্বল্প-রোম দেবতারূপে চালাইতে চাহেন, সেইজন্য রুদ্রের কোপে পড়িয়াছেন। এখন তিনি সে রুদ্রকোপ হইতে বিমুক্ত হইবার জন্য শঙ্করের অবতার ভগবান শঙ্করাচার্য্যের সর্ব্বজনবিদিত শিবস্তোত্র পাঠ করুন। অথবা পিঙ্গল দাড়ির অন্তরালে মহাদেবনীল কণ্ঠ কেমন শোভা ধরিয়াছে, তাহার একটি বর্ণনা পুরাণাদি হইতে উদ্ধৃত করিয়া আমাদিগকে শুনাইয়া দিন। নচেৎ—।

শ্রীঃ।

[যাঁহারা শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয়ের এই চিত্রখানির উৎকর্ষ বুঝিতে চান, তাঁহারা সেপ্টেম্বর মাসের মডার্ন রিভিউয়ে ভগিনী নিবেদিতা ও ডাক্তার কুমারস্বামীর তৎসম্বন্ধে মন্তব্য পাঠ করুন। কিন্তু যদি কেহ তাঁহাদের ইংরাজী বুঝিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া Original হইতেই হইবে। প্রবাসীর সম্পাদক।]

১৩১৭ আষাঢ়

ভারতীয় চিত্র-কলা

শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

প্রবাসী সম্পাদকেষু :—

চৈত্রের "প্রবাসীতে" মুদ্রিত শাহজাহানের "তাজ-নির্ম্মাণ-স্বপ্ন" সম্বন্ধে বৈশাখের "সাহিত্যে" যে সমালোচনা বাহির হইয়াছে, সে বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে। পত্রখানি আপনার পত্রিকায় স্থান দিলে বাধিত হইব। ভারতীয় প্রাচীন চিত্র-কলার 'বাহন' বলিয়া "প্রবাসী" ইতিপূর্ব্বেই খ্যাতি লাভ করিয়াছে। সুতরাং আমার বক্তব্য প্রবাসীতে স্থান পাইবে সন্দেহ নাই।

"সাহিত্যের" সমালোচক ভারতীয়

'নূতন'-চিত্রপদ্ধতি লক্ষ্য করিয়া মাসে মাসে তাঁহার অননুকরণীয় ভাষায় যে গালি বর্ষণ করিতেছেন তাহার সারাংশ এই :—

"ভারতীয় চিত্রকলার মূল সূত্রই বোধ করি এই যে, 'এমন বস্তু আঁকিবে, বা এমন বিকৃত করিয়া আঁকিবে যে স্বাভাবিক বস্তুর সহিত তাহার কোনও সৌসাদৃশ্য না থাকে, লোকে চিনিতে না পারে' অর্থাৎ, 'স্বভাব-বিরোধীতাই তথাকথিত ভারতীয় চিত্রকলার প্রাণ। স্বাভাবিকতার শ্রাদ্ধই প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলার একমাত্র উদ্দেশ্য। পানের দোকানে ও পুরাতন পঞ্জিকার পৃষ্ঠায় ভারতীয় চিত্রকলার যে আদর্শ দেখা যায় ভারতীয় শিল্পের নূতন পন্থীগণের চিত্র, সৌন্দর্য্যে কল্পনায় বা বমনোদ্দীপক বর্ণবিন্যাসে তাহাদের অপেক্ষা কোনও অংশে হীন নহে। ভারতীয় চিত্রকলার অনুশাসনে আঙ্গুল ও পা অস্বাভাবিক ও অতিরিক্ত লম্বা করা হয়'। 'এনাটমি'র বিরুদ্ধে হইলেই যে কোনও চিত্র ভারতীয় চিত্রশালার যাদুঘরের যোগ্য হয়। যে 'স্বাধীন কল্পনায়' মহাদেব হাড়গিলে, জগন্মাতা পার্ব্বতী লালসাময়ী নারী, ও মানুষের হাত পা যোজনবিস্তৃত বিকারে পরিণত হয়, তাহা কল্পনা অভিধানের যোগ্য নহে। 'ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতি' অনুসারে চিত্রিত চিত্রগুলি স্বভাবের এত বিরুদ্ধ ও 'লতানে' কেন হয় তাহাও আমরা বুঝিতে পারি নাই।"

উক্ত মন্তব্যগুলির মূলে যে কথাটি স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে সেটি এই যে, প্রকৃতির যথার্থ অণুকরণ, 'নিখুৎ ফটোগ্রাফ' না হইলে কোনও চিত্র 'শিল্প' অভিধানের যোগ্য নহে। অর্থাৎ শিল্পের একমাত্র উদ্দেশ্য জড়জগতের আবয়বিক অনুকরণ। জড়জগতের প্রতিকৃতি যাহা আমাদের চক্ষুর দর্পণে (retina) অহরহঃ প্রতিফলিত হইতেছে—ইহাই যে শিল্পের প্রতিপাদ্য বস্তু একথা কোনও বেদে পুরাণে বাইবেলে কোরাণে নাই। সুতরাং 'সবজান্তা' 'সাহিত্য'-সমালোচকের mandate শিরোধার্য্য করিতে পারিলাম না। স্বাভাবিকতাই শিল্পের উদ্দিষ্ট বস্তু নহে। প্রকৃতির আকার অবয়ব 'মাছিমারা কেরাণীর' মত নকল করিতে না পারিলেও তাহা চিত্রের বিষয় ও উচ্চশ্রেণীর শিল্প হইতে পারে। মনুর সময় হইতে সাহিত্য পত্রিকার অভ্যুদয় পর্য্যন্ত পৃথিবীর সকল যুগের সকল জাতির শিল্পিগণ কেহই স্বভাবের নকলনবীশি করেন নাই। মানুষের মস্তিষ্কের মধ্য দিয়া প্রকৃতির ছায়া চিরকালই রূপান্তরিত হইয়া অর্থাৎ স্বভাবের চাক্ষুষ প্রতিকৃতি (retinal image) হইতে অনেকটা ভিন্নরূপ ধারণ করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। মানুষের ভাবনা দ্বারা প্রকৃতির রূপ অবিকল থাকে না—উহা রঞ্জিত ও বিকৃত হয়—জড় প্রকৃতি মনুষ্যপ্রকৃতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। 'ফটোগ্রাফের প্লেটে' বা মানুষের চক্ষের (retina) উপর প্রকৃতির যে আবয়বিক ছায়া পড়ে, ঠিক সেই মূর্ত্তির নকল করা কোনও শিল্পী শিল্পের চরম উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। পক্ষান্তরে প্রকৃতির রূপ, শিল্পের আখ্যান বস্তু করিতে হইলে তাহাকে শিল্পীর প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিতে হয়।

"All style in imitative art *i.e.*, art that represents real forms, involves an alteration of the appearances presented by reality—*The Rendering of Nature in Greek Art* by E Loewy, 1907.

বাস্তবিকতা, উচ্চশ্রেণীর শিল্পের অতি নগণ্য অংশ। জগতে সকল জাতির শিল্পের মধ্যে গ্রীক-শিল্প বাস্তবিকতাকে অধিক প্রশ্রয় দিয়াছে। তথাপি গ্রীকশিল্পের বাস্তবিকতার যুগে, প্রকৃতির প্রতিকৃতি অনেক সময় 'আসল' হইতে অনেক 'খাস্তা'। সিকান্দারের রাজত্বকালে গ্রীকশিল্পে বাস্তবিকতার আদর্শের চরম দৃষ্টান্ত দেখা যায়। এই যুগের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য্যে এমন অনেক মূর্ত্তির পরিকল্পনা হইয়াছে যাহার অস্তিত্ব জড়জগতে নাই।

"What is most noteworthy is that even in the representation of actual human persons *e.g.*, in athlete statues and upon grave monuments, Greek sculpture in the best period seems not to have aimed at exact portraiture".—Tarbell, *History of Greek Art.*

"The Greek conventional face cannot be

found in real life, no living head presenting so large a facial angle. . The face of Greek Art represents an impossible perfection".—Lafcadio Hearn, *Gleanings in Buddha Fields*.

'স্বাভাবিকতার শ্রাদ্ধ' করা কেবল ভারতীয় চিত্র-কলার নিজস্ব নহে, অবনীন্দ্রনাথের 'দশশালা বন্দোবস্তা' নহে।

'সাহিত্য'-সমালোচকের আর এক অভিযোগ ভারতীয় নূতন পদ্ধতির চিত্রে "আঙ্গুল ও পা অস্বাভাবিক ও অতিবিস্তু লম্বা করা হয়। বিশেষতঃ আঙ্গুলগুলি স্বভাবের এত বিরুদ্ধ ও লতানে হয় কেন তাহা বুঝিতে পারি নাই।" স্বভাবের ঠিক অনুরূপ না হইলেই যে মূর্ত্তিকল্পনা 'স্বভাবের বিরুদ্ধ' কিসে হয় তাহা বুঝিতে পারি না। 'আজানুলম্বিত বাহু', 'আকর্ণবিস্তৃত নয়ন' 'ব্যূঢ়োরস্ক' 'বৃষস্কন্ধ' 'পদ্মহস্ত' 'নবদূর্ব্বাদলশ্যাম', প্রভৃতির মনুষ্যকল্পনা যদি 'উদ্ভট' ও 'স্বভাববিরুদ্ধ' না হয়, পুরাণোক্ত মহাপুরুষগণের চিত্রকল্পনায় ঐরূপ 'উদ্ভট ও স্বভাববিরুদ্ধ' রীতির অনুসরণে ভারতশিল্পীর অধিকার আছে। ভারতের প্রাচীন চিত্রে ও ভাস্কর্য্যে পুরাণকারের তথাকথিত "উদ্ভট ও স্বভাববিরুদ্ধ" কল্পনা অক্ষরে অক্ষরে অনূদিত হইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যে বর্ণিত কল্পলোকের মানুষগুলির অবয়ব ও প্রকৃতি যদি অতিরঞ্জিত বা অত্যুক্ত বলিয়া বোধ না হয়, তাহা চিত্রে অনুবাদ করিলে এত প্রতিবাদের কারণ কি? রামায়ণ ও ভাগবতের নায়ক যে উচ্চশ্রেণীর মানবত্বের কল্পনা তাহার মূর্ত্তি বিংশশতাব্দীর 'রেমো' 'শ্যেমো'র 'মডেলে' রচিত হইতে পারে না। তাহার 'এনাটমি' স্বতন্ত্র—অতিপ্রাকৃত হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতির বিরুদ্ধ নহে। বাস্তবিক জগতে এইরূপ (Ethnically superior type) আদর্শ শরীরের অভ্যুদয় যুগযুগান্তরেও সম্ভব কিনা জানি না।

ভারতশিল্পের সৌন্দর্য্য ও বিশেষত্ব কি এবং কি পরিমাণে বাঙ্গালার নূতন পন্থী চিত্রকরগণ তাহা উপলব্ধি করিয়াছেন তাহা প্রবন্ধে লিখিয়া বুঝাইবার বস্তু নহে। 'এনাটমি' 'পার্সপেক্‌টিভ্' 'লাইট এণ্ড সেড' প্রভৃতি গ্রীক আদর্শের ঠুলি যতদিন আমাদের চক্ষু জুড়িয়া থাকিবে ততদিন ভারতশিল্পের রহস্য অনুসন্ধান করা আমাদের পক্ষে বিড়ম্বনা।

'তাজ নির্ম্মাণের স্বপ্নে' অবনীন্দ্রনাথের অশ্বকল্পনা সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, বিষয়টির কাল ভাব ও বর্ণনা অনুসারে যে রসের অবতারণা শিল্পীর উদ্দেশ্যে তাহার উপযোগী মডেল 'কুকের' অশ্বশালা হইতে সংগ্রহ করা যায় না। Landseer বা Rosa Bondheur-র রচিত অশ্বশ্রেণী বাস্তবিক হিসাবে হুবহু হইলেও এইরূপ শ্রেণীর চিত্রের পক্ষে ঐরূপ আদর্শের কোনও মূল্য নাই। এখানে যে জাতির অশ্বের সমাবেশ আবশ্যক তাহার অলৌকিক অতিপ্রাকৃত ভাব আখ্যান-বস্তুর সহিত একসুরে রচিত হইবে। কল্পিত অশ্বের সূচ্যগ্র মুখ, 'এনাটমি'র হিসাবে অত্যুক্তি হইতে পারে, কিন্তু আখ্যান-বস্তুর হিসাবে এই অত্যুক্তির আবশ্যক হইয়াছিল। 'পীরের আস্তানায়' মাটির ঘোড়াও অবস্থাবিশেষে শিল্পের আখ্যান-বস্তু হইতে পারে এবং শিল্পকলার হিসাবে উৎকৃষ্ট রসের সমাবেশ করিতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত Edmund Dulac-এর রচিত ওমর খ্যায়ামের চিত্রাবলীতে প্রকটিত হইয়াছে। অত্যুক্তির কথা ছাড়িয়া দিলেও যে জাতির অশ্ব এখানে চিত্রিত হইয়াছে 'এনাটমি'র হিসাবে বোধ হয় তাহা স্বভাববিরুদ্ধ নহে। আমি তাঞ্জোর পুস্তকাগারে অশ্বশাস্ত্রের একখানি সুরঞ্জিত সচিত্র সংস্কৃত গ্রন্থে ইহারই অনুরূপ অশ্বের চিত্র দেখিয়াছি। মূল শ্লোকটি লিখিয়া আনিতে পারি নাই বলিয়া ঐ অশ্বের জাতি বর্ণনা উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। এই সূত্রে জাপানী চিত্রকরগণের জীবচিত্রাঙ্কনরীতি তুলনা ও আলোচনার যোগ্য।

"When we say that Japanese Art is prone to exaggeration let us not be misunderstood. Exaggeration may be used in an artistic sense. A painter is fully possessed by a thought: in order that it may be grasped by others, he goes into exaggeration. He is struck, for instance, by the elegance of the shape of the deer, he overdoes at pleasure, the slenderness of the limbs and the smallness of the feet of the

animal, in the same way that the Indians and the Chinese exaggerate the contours of the elephant. He is not drawing a stag, he is drawing the stag by means of a process which we will call the artistic excess of the races of the far East"—Ary Renan.

"শাহজাহান ঘোড়ায় চড়িয়া স্বপ্ন দেখিতেছেন দেয়ালে, চেয়ারে, বা ঘানীগাছে ঠেশ দিয়া নহে" ইত্যাদি ব্যঙ্গোক্তির উত্তরে মেনুষীর বর্ণনার মূল উদ্ধৃত করিলাম :—

"When Shah Jahan went to the war in the Deccan, he took his Queen Taj Bibi with him. At Zainabad she died in child-birth. There, in a beautiful garden, on the fort-side of the river, she was first buried, on this side the battlefield; on that, in its garden, the little tomb of Taj Bibi. On Fridays, Shah Jahan would ride across the river alone, to pray"

উপরোক্ত বর্ণনায় ঘোড়ায় চড়িয়া স্বপ্ন দেখিবার রহস্য সমালোচকের উপলব্ধি হইবে। কিন্তু "ন তথা বাধতে স্কন্ধং যথা 'বাধতি' বাধতে"। সমালোচক সার জোসুয়া রেণল্ডের অবতারণা করিয়া শিল্পসাহিত্যের অপরিসীম 'ষত্বণত্ব' জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। যে শিল্পের আদর্শ অবলম্বনে ভারত-শিল্প-সাধনার 'ডিক্রী' 'ডিস্‌মিস' হইতেছে, সমালোচক সেই শিল্পের ইতিহাস সম্বন্ধে যে শিশুসুলভ অজ্ঞানতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার স্পর্দ্ধা ও অহঙ্কার বাস্তবিকই উপভোগ্য। "যত পারো গালি দাও সত্য কথা বলিতে ছাড়িব না।" 'সাহিত্যের' চিত্র সমালোচনা "অনধিকার চর্চ্চা"। আমাদের দেশে তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের শিল্প সম্বন্ধে যে জ্ঞান তাহা অত্যন্ত অসম্বন্ধ ও অসম্পূর্ণ—কদাচিৎ মাসিক পত্রিকার দুই এক খানি হাফটোন চিত্র ও য়ুরোপের চিত্রশালার আবর্জ্জনা, তৃতীয় শ্রেণীর নমুনা হইতে সংগৃহীত। শপথ করিয়া বলিতে পারি সমালোচকগণের মধ্যে একজনও য়ুরোপীয় শিল্পের প্রতিপাদ্য বস্তু, গতি, বা ইতিহাস আনুপূর্ব্বিক আলোচনা করিবার অবসর পান নাই। মাইকেল এঞ্জেলো, রাফেল ইত্যাদি শিল্পিগণের আদর্শের তথাকথিত তুলনা করিয়া ভারতের চিত্রকল্পনা 'উদ্ভট' বলিয়া উপহাস করেন—অথচ ঐ শিল্পিগণের 'গালভরা' নাম ভিন্ন আর কিছুই পরিপাক করিতে পারেন নাই। ভারতশিল্পের আলোচনায় যাঁহারা মাইকেল এঞ্জেলো, রাফেল ইত্যাদিকে গুরু ধরিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যে উক্ত শিল্পিগণের প্রসিদ্ধ নামের দোহাই দিয়া ভারতে তাহাদের কীর্ত্তি জাহির করিবেন না, নিজের বুদ্ধিতে তাহাদের সাধনা, উদ্দেশ্য ও বক্তব্য কি বুঝিতে চেষ্টা করিবেন—গলদেশের উপর ভগবান্ যে মুণ্ডটি দিয়াছেন তাহার সদ্ব্যবহার করিবেন।

১৩১৭ শ্রাবণ

ভারতীয় চিত্রশিল্প

শ্রীসুকুমার রায়

ভারতীয় চিত্রকলা সম্বন্ধে অনেক আলোচনাদি হইয়া গিয়াছে। আষাঢ়ের "প্রবাসী"তেও শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এ বিষয়ে কিছু লিখিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, এত চেষ্টাচরিত্র সত্ত্বেও আমাদের ন্যায় স্থূলবুদ্ধি লোকের কাছে ব্যাপারটা আদৌ পরিষ্কার হইয়া উঠিতেছে না। বিশেষতঃ

ভারতশিল্প প্রসঙ্গে গ্রীক ও অন্যান্য শিল্প প্রভৃতি নানাবিষয়ে অবতারণা ও সমালোচনা করায় অবস্থাটা নিতান্তই জটিল হইয়া উঠিয়াছে। অর্দ্ধেন্দ্র বাবু, বা অপর কোন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি, যদি অনুগ্রহ করিয়া সহজ গদ্যে আমাদের আপত্তি ও সন্দেহাদির মীমাংসা করিয়া দেন, তবে অনুগৃহীত হইব।

বোঝা গেল, ভারত শিল্পক্ষেত্রে বাস্তবিকতার কোন সমাদর নাই। মক্ষিকাম্ন মসীজীবিবৎ দৃষ্টবস্তুর হুবহু অনুকরণ করিয়া যাওয়া ভারতীয় শিল্পের (শুধু ভারতীয় কেন, কোন শিল্পেরই) উদ্দেশ্য নহে। ভারতীয় চিত্রশিল্পী প্রাকৃত ব্যাপারের কোনও ধার ধারেন না। তিনি "এনাটমি, পারস্‌পেকটিভ্ প্রভৃতি গ্রীকশিল্পের ঠুলি" চোখে দিয়া শিল্পসাধনা করেন না। চিত্রাঙ্কনকালে, চিত্রের উপাখ্যান বস্তুর বাস্তবিক আকৃতি কিরূপ, তাহার বর্ণ লাল নীল কি সবুজ, এ সকল বিষয়ে বিন্দুমাত্রও মনোযোগ দেওয়া তিনি আবশ্যক বোধ করেন না। তিনি চিত্রবর্ণিত বিষয়ের চিন্তায় ধ্যানস্থ হইয়া মনশ্চক্ষে তাহার যেরূপ চেহারা দেখেন ঠিক তেম্‌নিটি করিয়া তাহাকে চিত্রিত করেন। প্রকৃতিস্থ অবস্থায় সেটা তাঁহার কাছে যেরূপ বোধ হয়, অথবা তাহার যে লোকপ্রসিদ্ধ আকৃতি তাঁহার চর্ম্মচক্ষে প্রতিভাত হয়, সে সকল বাস্তব ব্যাপার—facts of nature—সুতরাং সেগুলির সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই। মনোময় পুষ্পকরথে চড়িয়া কল্পনার মুক্ত আকাশে বিচরণ করাই তাঁহার বিশেষত্ব। জড়জগতে কি ঘটে না ঘটে, কোন্‌টা সম্ভব কোন্‌টা অসম্ভব, এ সকল আদৌ ভারতশিল্পের আলোচ্য বিষয় নহে। শিল্পক্ষেত্রে Nature-কে লইয়া টানাহ্যাঁচড়া ও-সা ওই বিজ্ঞানসর্ব্বস্ব, জড়বুদ্ধিপ্রধান পাশ্চাত্যজগতেই সাজে—ইত্যাদি। তবে কি আমরা ইহাই বুঝিয়া লইব যে ভারতীয় চিত্রশিল্পে চিত্রবিজ্ঞানের কোন স্থান নাই?

ভারতশিল্প অন্যান্য শিল্প অপেক্ষা "শ্রেষ্ঠ" কিসে? আদর্শের উচ্চতাবশতঃ? না এই পদ্ধতি অনুযায়ী চিত্রগুলির সৌন্দর্য্যাধিক্য বশতঃ? শ্রেষ্ঠ অশ্রেষ্ঠ বিচারে প্রণালী কি? কোন্ বিশেষ সৌন্দর্য্য ভারতশিল্পের একচেটিয়া সামগ্রী? শুনিতে পাই, "আধ্যাত্মিকতা"ই ভারতশিল্পের প্রাণ ও তাহার শ্রেষ্ঠতার কারণ। এই তথাকথিত "আধ্যাত্মিকতা" কিরূপ বস্তু? চিত্রের নায়ক নায়িকার চোখে মুখে যদি একটু তন্দ্রার ভাব দেখা গেল অথবা চারিদিকে কুহেলিকার সৃষ্টি করিয়া শিল্পী যদি তন্মধ্যে একটু আলোকের আভাস দিলেন তবেই কি আধ্যাত্মিকতার চূড়ান্ত হইল? তদুপরি যদি চিত্রে ভাবের অস্পষ্টতা লক্ষিত হয়, এবং নায়ক বা নায়িকা যদি এনাটমি শাস্ত্রকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া তাঁহাদের অস্থিহীন অঙ্গভঙ্গীর কিঞ্চিৎ বাড়াবাড়ি করিয়া বসেন তবে ত সোনায় সোহাগা। প্রায়ই ত দেখা যায় শিল্পের মধ্যে জাতীয় ভাব ও প্রকৃতির একটা ছাপ রহিয়াছে। ভারতশিল্পের উপরে যে ভারতীয় ধর্ম্মভাবের একটা ছায়া পড়িবে তাহাতে বিচিত্র কি? কিন্তু ইহাতেই কি শিল্পের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হইল, এবং শিল্প একবারে "ঐশ্বরিকতার অভিব্যক্তি" হইয়া দাঁড়াইল?

কিন্তু "ভারতীয় শিল্পের সৌন্দর্য্য বাহিরে নয় ভিতরে"। চিত্রের যেটুকু বহিরংশ, যাহা শুধু চোখে দেখা যায়, সেইটুকুই তাহার যথা সর্ব্বস্ব নহে। তাহার প্রাণটি, অর্থাৎ শিল্পী তাঁহার হৃদয়ের যে ভাবের দ্বারা তাহাকে অনুরঞ্জিত করিয়াছেন সেই ভাবটিই, তাহার আসল সৌন্দর্য্য (যদি ভাবটি চিত্রে বোধগম্য হইয়া থাকে)। শিল্পমাত্রই রেখাবর্ণাদি দ্বারা মনের ভাবকে ব্যক্ত করিবার চেষ্টা। ইহা ভারতশিল্পের একচেটিয়া সম্পত্তি নহে—সকল শিল্পেরই ইহা একটা সাধারণ লক্ষণ। তবে, কেহ সোজাসুজি বক্তব্য বলিয়া যান, কেহ বা তাহাতে কবিত্ব উপমা অলঙ্কারাদি যোগ করিয়া দেন। কেহ প্রকৃতির দৃশ্য-বৈচিত্র্যের মধ্যে, কেহ নরনারীর মুখশ্রীতে বর্ণনীয় বিষয় দেখিতে পান,—আবার কেহবা কল্পনার স্বপ্নরাজ্য হইতে চিত্রের উপাদান সংগ্রহ করেন। কিন্তু যিনি যে পথেই চলুন না কেন, সকলেরই গুরু Nature। জগতে নিরবচ্ছিন্ন কল্পনার কোনও অস্তিত্ব নাই। বাস্তবজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়াই—Nature-কে অবলম্বন করিয়াই—কল্পনার উৎপত্তি। যাহাকে কল্পনার ঘর

বলিয়া কল্পনা করি তাহার ইঁট সুর্‌কি মালমশলা সবই Nature হইতে চুরি। এরূপ না হইলে একজনের ভাব অপরের বোধগম্য হওয়া সম্ভবপর হইত না।

শিল্পী যে ভাবকে ব্যক্ত করিতে চাহেন, তাঃ র সহায়তার জন্য তিনি অতিরঞ্জনের আশ্রয় লইতে পারেন, এবং Nature হইতে সংগৃহীত উপাদানগুলি আবশ্যক মত গ্রহণ বা বর্জ্জন করিতে পারেন—ইহা কেহ অস্বীকার করে না। যে রসের অবতারণা করা শিল্পীর উদ্দেশ্য তাহা যদি চিত্রে পরিস্ফুট হইয়া থাকে, তবেই শিল্পী সাফল্য লাভ করিলেন বলিতে হইবে। কিন্তু নব্য ভারতশিল্পে সময়ে সময়ে অপ্রাসঙ্গিক অদ্ভুতরসের যে প্রাচুর্য্য দেখা যায় সেগুলিও কি ভারতশিল্পের সাফল্যের নিদর্শন? চিত্রব্যাখ্যাদিতে ইহার সমর্থনে এই যুক্তি দেওয়া হয় যে, কাব্যে আজানুলম্বিত বাহু, আকর্ণবিস্তৃত নয়ন, নবদুর্ব্বাদলশ্যাম প্রভৃতি অতিশয়োক্তিতে যখন কেহ আপত্তি করে না, তখন চিত্রশিল্পেও এবম্বিধ আতিশয্য কখনই প্রতিবাদযোগ্য হইতে পারে না। কিন্তু চিত্র ও কাব্যের মধ্যে যে একটা মৌলিক প্রভেদ আছে সেটাকে উড়াইয়া দিলে চলিবে কেন? কাব্যের 'ভাষা' নামক জিনিষটা কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট শব্দ, বা তৎসূচক চিহ্নাদি, দ্বারা ভাববিনিময়ের একটা সাঙ্কেতিক উপায় মাত্র। কিন্তু চিত্রের ভাষায় মূলতঃ এরূপ কোন কৃত্রিমতা নাই। কবি তাঁহার মানসমূর্ত্তিকে ভাষায় বর্ণনা করেন, কিন্তু চিত্রকর সেই মূর্ত্তিটিকেই চক্ষের সমক্ষে ধরিয়া দিতে চেষ্টা করেন। কবির পরোক্ষচিত্রে যে অতিশয়োক্তি দুষণীয় বোধ হয় না, শিল্পে "তাহা অক্ষরে অক্ষরে অনূদিত" হইয়া প্রত্যক্ষমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলে, তাহাকে "উদ্ভট" ছাড়া আর কি বলা যায়?

কাব্যের ন্যায়, শিল্পেও অলঙ্কার ও উপমার স্থান আছে—কিন্তু সেই অলঙ্কার ও উপমা ব্যাপারটাই যখন সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিতে চায়, তখনই আশঙ্কার কথা—বিশেষতঃ কাব্যের কৃত্রিম উপমাপদ্ধতিকেই যখন "উচ্চশিল্পের" আদর্শ ধরিয়া লওয়া হয়। আরও ভয়ের কারণ এই যে, ভারতশিল্পোৎসাহিগণ "আর কোনও সৌন্দর্য্যের আদর্শ তাঁহাদের রচনায় স্থান পাইবে না" কেবল এই বলিয়াই ক্ষান্ত নহেন, তাঁহারা দস্তুরমত কোমর বাঁধিয়া ইউরোপীয় শিল্পের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত! ইঁহাদের মতে "ভারতশিল্প" 'লেবেল' যাহাতে আঁটা নাই, তাহা আমাদের আলোচ্য হইতেই পা'রে না এবং তাহাতে আমাদের শিক্ষণীয় কিছু থাকা অসম্ভব! যুক্তিস্বরূপ বৈদেশিক ভাষার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া বলা হয়, "বিদেশীর ভাষায় কাব্য লিখিয়া কে কবে যশস্বী হইয়াছে"? তবে কি এই যুক্তি অনুসারে বিদেশীর ভাষার চর্চ্চা করাও নিষিদ্ধ হইবে? তাছাড়া, দুইটা স্বতন্ত্র ভাষার মধ্যে যে সকল মৌলিক প্রভেদ দেখা যায়, আদর্শ ও উপায়ের আত্যন্তিক অনৈক্য সত্ত্বেও ভিন্ন ভিন্ন চিত্রশিল্পের মধ্যে এ প্রকার বিভিন্নতা কুত্রাপি লক্ষিত হওয়া সম্ভব নহে। কারণ, চিত্রের ভাষা মূলতঃ এবং স্বভাবতঃ বিশ্বজনীন।

সৌভাগ্যের বিষয় যাঁহারা হাতে কলমে "ভারতশিল্প কি" তাহা দেখাইতেছেন, তাঁহারা অনেক সময়েই কার্য্যক্ষেত্রে এই সকল বিচিত্র মতের একান্ত বশ্যতা প্রদর্শন করেন নাই। বেশীকথায় কাজ কি, হ্যাবেল সাহেবের মতে "অবনীন্দ্র বাবুর চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি ইউরোপীয় ও ভারতীয় পদ্ধতির সংমিশ্রণ"! ইহাতে অবনীন্দ্র বাবু ও তাঁহার শিষ্যগণের অঙ্কিত চিত্রাদির "ভারতীয়ত্ব" কিছু ক্ষুণ্ণ হইতে পারে কিন্তু তজ্জন্য ঐ সকল চিত্র "খেলো" হইয়া গিয়াছে, আশা করি এরূপ কথা কেহ বলিবেন না। এই জাতীয় অনেক চিত্রেই যে সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, চিত্রের "ভারতীয়তা"ই তাহার একমাত্র অথবা সর্ব্বপ্রধান কারণ বলিয়া বোধ হয় না। শিল্পকে যিনি যে ভাবে দেখিতেছেন তিনি সেই ভাবে তাহার সাধনা করিবেন। গ্রীকশিল্প বা রোমীয়শিল্প ঐ পথে গিয়াছে, অতএব তোমার আমার ও পথে গতির্নাস্তি—এ কোন্ দেশীয় যুক্তি? আমাদের আর অন্য গতি নাই, "এই যে ভারতশিল্পরূপ কল্পতরু—আইস, আমরা ইহারই সুশীতল ছায়ায়" বসিয়া বর্ত্তমান ইউরোপীয় শিল্পকে মর্ত্তমান দেখাই!

ভারতশিল্প প্রচারার্থিগণ শিল্পকে যে ভাবে দেখিতেছেন, কেহ যদি ঠিক সে ভাবে না দেখে, তবেই কি তাহাকে "উচ্চশিল্পের" রসগ্রহণে অক্ষম ঠাওরাইতে হইবে? সকল লোকে এক পথে যায় না—সকলের রুচি বা প্রকৃতিও এক নহে। মনকে রাফেল, রস্কিন, বা শুক্রাচার্য্যের দোহাই দিয়া একটা বিশেষ ছাঁচে ঢালিবার চেষ্টা নিষ্প্রয়োজন এবং সে চেষ্টা সফল হইবার সম্ভাবনাও কম। প্রকৃত শিল্পী অন্তর্নিহিত শিল্পবৃত্তির চরিতার্থতার জন্যই শিল্প সাধনা করেন—"ভারতীয়" শিল্প, "গ্রীক" শিল্প প্রভৃতি নামধারী System বা প্রথা বিশেষের খাতিরে নহে।

নব্যপন্থী চিত্রকরগণ শিল্পের যে আদর্শ পাইয়াছেন, তাঁহারা নিষ্ঠার সহিত তাহার অনুসরণ করিবেন, ইহাতে কাহারও আপত্তির কারণ হইতে পারে না। হয়ত, ভাবপ্রদান শিল্পের এরূপ একটা পুনরুত্থান বর্ত্তমান সময়ে এদেশে বিশেষ আবশ্যক হইয়া থাকিবে। প্রতিক্রিয়ার স্বাভাবিক নিয়মানুসারে বাড়াবাড়ির মাত্রাটাও একটু উৎকট হইয়া পড়া কিছু বিচিত্র নহে। কিন্তু ব্যাধি অপেক্ষা চিকিৎসাটা যেন ভয়ঙ্কর হইয়া না উঠে। নব্যশিল্পের শাস্ত্রকারগণ যদি অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া, কল্পনার দিব্য চস্‌মাটির উপর অত্যধিক মায়া বশতঃ চিত্র বিজ্ঞানের 'ঠুলি'টিকে আবর্জ্জনাস্তানে ফেলিয়া দেন, এবং নিজ শিল্পের মধ্যে একটা বিশেষ অনন্যলভ্য 'দৈব' সম্পদ কল্পনা করিয়া "এই আদর্শই সকলের অবশ্য শিরোধার্য্য" বলিয়া জেদ্ ধরেন, ও একাধারে বাদী, উকিল, জজ ও জুরি হইয়া যাবতীয় শিল্পের দোষগুণ মীমাংসায় প্রবৃত্ত হ'ন, তবেই ভয় হয় বুঝি বা অজাযুদ্ধে, ঋষিশ্রাদ্ধে প্রভাতে মেঘডম্বুরে'র ন্যায় সব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়ায় পরিণত হয়।

১৩১৭ আশ্বিন

ভারতীয় চিত্রকলা

শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রাবণের "প্রবাসীতে" শ্রীযুক্ত সুকুমার রায় 'ভারতীয় চিত্রশিল্প' সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন এবং আষাঢ়ের "প্রবাসীতে" প্রকাশিত আমার মন্তব্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি আক্ষেপ করিয়াছেন যে "এত চেষ্টাচরিত্র সত্ত্বেও আমাদের ন্যায় স্থূলবুদ্ধি লোকের কাছে ব্যাপারটা আদৌ পরিষ্কার হইয়া উঠিতেছে না"। ইতিপূর্ব্বেই আমি বলিয়াছি শিল্পজগতের সূক্ষ্ম তত্ত্ব কেবল কথায় বুঝান যায় না। য়ুরোপীয় শিল্পের ধারা ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের যে সংস্কার আছে, তাহা সম্পূর্ণ দূরে রাখিয়া যথার্থ শ্রদ্ধার চক্ষে ভারতের প্রাচীন শিল্পের বহু নিদর্শনে তাহার অন্তঃস্থল অনুসন্ধান করিতে হইবে। যতদিন বাঙ্গালীর শিক্ষিত সম্প্রদায় বাঙ্গলা সাহিত্য ঘৃণার চক্ষে, অবজ্ঞার চক্ষে, য়ুরোপীয় সাহিত্যের মাপকাটিতে বিচার করিয়াছেন ততদিন বাঙ্গলার প্রাচীন সাহিত্যের সৌন্দর্য্যভাণ্ডার তাঁহাদের পক্ষে রুদ্ধদ্বার ছিল। এইখানে বলিয়া রাখি আমাদের সমসাময়িক বাঙ্গলা সাহিত্য যে বিলাতী ধাত্রীর স্তন্যে প্রতিপালিত হইয়াছে, বাঙ্গলার নূতন শিল্পিগণের প্রধান কর্ত্তব্য তাহার স্পর্শ ও প্রভাব হইতে ভারতের সনাতন আদর্শকে রক্ষা করা। জগতের আন্তর্জাতিক সাধনার হিসাবে ভারতের শিল্পসাধনার নিজস্ব অক্ষুণ্ণ রাখা কত বড় ধর্ম্ম, কত বড় দায়িত্ব তাহা আমাদের

শিক্ষিত সম্প্রদায় যদি না বুঝেন তাহা হইলে আমরা নিরুপায়।

শিল্পশাস্ত্রের রহস্য কেবল কথায় উপব কথা গাঁথিয়া প্রকাশ করা যায় না। শিল্পরসের বিশেষত্ব কেবল বৈজ্ঞানিক যুক্তিবলে বুঝান যায় না, কারণ উহা অনুভূতির বিষয় অন্তর দিয়া বুঝিতে হয়। ভারতশিল্পের বিশিষ্ট ভাবগুলি যদি অন্তরের দ্বারা অনুভূত না হয় তবে তাহা কেবল যুক্তি দ্বারা বুঝিতে পারিব না। এ সম্বন্ধে রায় মহাশয় বিশেষজ্ঞের মীমাংসার আহ্বান করিয়াছেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে বিশেষজ্ঞের উক্তি অনেকেরই পক্ষে গুরুপাক হইবে। কোনও শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞের জ্ঞানের তখনই আবশ্যক হয়, যখন ঐ শাস্ত্রের মূল সূত্রগুলি আমাদের আয়ত্ত হইয়াছে। দুঃখের সহিত বলিতে হয় শিক্ষিত বঙ্গবাসী শিল্পশাস্ত্রের সাধারণ তত্ত্বগুলি একবারেই আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। সুতরাং আমার ন্যায় "হেতুড়ের" হাতেই এখন তাঁহাদের বিড়ম্বিত হইতে হইবে।

ভারতশিল্পের আলোচনায় যে-সকল আদর্শের অবতারণা করা হয় সেই আদর্শসমূহ যে-সকল তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, সমালোচকগণ মনে করেন যে সেই তথ্য ও সেই আদর্শগুলি, শিল্পশাস্ত্রের সনাতন তথ্য, সার্ব্বজনীন আদর্শ। (Nature এবং art) প্রকৃতি ও শিল্পের সম্বন্ধ-বিষয়ে যে বিশেষ মতটী প্রচার করিতেছেন, তাঁহাদের বিশ্বাস, এই মতবাদ নানা দেশের নানা শিল্পের আভ্যন্তরিক সাধারণ রহস্যগুলির উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং তাহা শিল্পশাস্ত্রের সনাতন সত্য ও অবশ্যপালনীয় নীতি। মোটকথা তাঁহাদের ধারণা এই যে দুইপাতা ইংরাজী সাহিত্য, ইংরাজী বিজ্ঞান পড়িয়া, জাতিকাল-নির্ব্বিশেষে সমগ্র মানবের শিল্পসাধনার মূল সূত্রগুলি আয়ত্ত করিয়াছেন। আলোচকগণ শিল্পবিজ্ঞানের যে অংশটী লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছেন ইহা আধুনিক কালের য়ুরোপীয় শিল্পের নগণ্য সাধনার বর্ব্বর অনুকরণ। য়ুরোপীয় চিত্রশিল্পের সমগ্র সাধনা অনুসারেও চিত্রবিজ্ঞানের পরিসীমা নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। 'চিত্রবিজ্ঞান' বলিতে যে বৃহত্তর জ্ঞান, যে সার্ব্বজনীন দর্শনের সূচনা হয় য়ুরোপীয় শিল্পেই তাহার চরম বিকাশ হয় নাই। রায় মহাশয় চিত্রবিজ্ঞান বলিতে যাহা বুঝিয়াছেন তাহা য়ুরোপের কোনও বিশেষযুগের শিল্পিসম্প্রদায়ের প্রথাবিশেষ মাত্র। সুতরাং তাঁহার অভিধানে, শুধু ভারতশিল্পের কেন য়ুরোপের অন্য যুগের অন্য সম্প্রদায়ের চিত্রশিল্পেরও কোনও স্থান নাই। তাহা হইলেও উক্ত যুগের বা উক্ত দেশের চিত্রশিল্প শিল্পজগৎ হইতে নির্ব্বাসিত হইল না। ভারতীয় চিত্রশিল্পে ইংরাজী চিত্রবিজ্ঞানের কোনও স্থান নাই ইহাই বুঝিতে হইবে। তথাপি চিত্রবিজ্ঞানের বৃহত্তর দৃষ্টিতে Elgin Marbles ও Hokusai-র কালীর আঁচড়, Aubrey Beardsley-র চিত্র ও নেপালের বৌদ্ধপাট একই সামগ্রী। শিল্পবিজ্ঞানের বৃহত্তর আদর্শের সীমা কি তাহা অন্বেষণ করিতে হইলে আদিমকাল হইতে সমগ্র মানবজাতির বহুমুখী শিল্পসাধনার সম্যক অনুশীলন আবশ্যক। ভারতশিল্প অন্যান্য শিল্প অপেক্ষা "শ্রেষ্ঠ" কিসে বুঝিতে হইলে "অন্যান্য" শিল্পের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্থাপন অবশ্য কর্ত্তব্য। যে দুই বস্তুর তুলনা করিতে হয়, উভয়ের প্রকৃতি বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে। সৌন্দর্য্যের নানা আদর্শের অনুভূতি না হইলে ভারতশিল্পের উদ্দিষ্ট 'বিশেষ সৌন্দর্য্যটী' বুঝিবেন কি করিয়া। আমাদের শিল্পবিদ্যার Laboratory-তে এমন lancet নাই যাহা ভারতশিল্পের কলেবর ব্যবচ্ছেদ করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারে উহা কি বস্তু।

ভারতশিল্পের বিশেষত্ব কি বুঝিতে হইলে, উহা যে প্রাচীন সাধনা ও ভাবরাশি অবলম্বন করিয়া উদ্ভূত ও বর্দ্ধিত হইয়াছে তাহার বিশেষত্ব কি বুঝা আবশ্যক। এই সাধনা ও ভাবরাশি যে সাহিত্যের মূর্ত্তিতে দানা বাঁধিয়া আছে উহার সহিত সহৃদয় সর্ব্বাঙ্গীন পরিচয় আবশ্যক। প্রাচীন ভারতের সাহিত্য ও শিল্প যেরূপ পরস্পরকে প্রভাবিত ও পরিপুষ্ট করিয়াছে, তাহাতে এককে অন্যটী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে কোনটীরই যথার্থ প্রকৃতি ও বিশেষত্ব উপলব্ধি করা যায় না। বিশেষতঃ ভারতের

সৌভাগ্যবশতঃ বা দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতের প্রাচীনযুগের শিল্প যে পৌত্তলিক ধর্ম্মবাদের ছায়ায় পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে এবং স্থানে স্থানে ঐ ধর্ম্মবাদের সহিত এমন অভিন্নভাবে জড়িত হইয়া আছে, যে-সেই ধর্ম্মতত্ত্বের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি একটু স্নেহের চক্ষে না হউক, একটু অনুকম্পার চক্ষে না দেখিলে ভারতশিল্পের আদর্শ হৃদয়ঙ্গম করা আধুনিক শিক্ষিত ভারতবাসীর পক্ষেও বিড়ম্বনা। কেবল পৌত্তলিকতার উপলক্ষে, প্রাচীন ভারতীয় পৌরাণিক সাহিত্যের মধ্যে, আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই, তরবারির ব্যবধান স্থাপন করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে অহিন্দু-য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের অপেক্ষা আমাদের দেশের শ্রেণী বিশেষের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অবস্থা কিছু শোচনীয়। ফ্রান্সের জনৈক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত যে ভক্তির চক্ষে ভারতের দেবতত্ত্বের (iconography) অনুশীলন করিতেছেন আমাদের দেশের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি ভারতের অনেক পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ ও পুরাণাদি সে চক্ষে দেখেন না। যাঁহারা ভারতের প্রাচীন সাধনা ও চিন্তা য়ুরোপের 'নবজ্ঞান'-সুলভ কুসংস্কারের চক্ষে দেখেন তাঁহাদের পক্ষে ভারতের প্রাচীন সাধনার একাংশ চিরকালই "উদ্ভট", "অস্পষ্ট" ও "কুহেলকিময়" বলিয়া প্রতীত হইবে।

সমালোচক "facts of nature" "anatomy" শাস্ত্র প্রভৃতি তাঁহার চিত্রবিজ্ঞানের যে আইনের ধারায় ভারতশিল্পকে দণ্ডিত করিয়াছেন, সে আইনে ইংলণ্ডের Rossetti, Burne-Jones প্রভৃতির চিত্র "অশিক্ষিত-পটু-'পটুয়ার' হিজিবিজি।" Leonardo da Vinci anatomy শাস্ত্রে অদ্বিতীয় ছিলেন। সুতরাং তাঁহার উক্তি এ সম্বন্ধে প্রণিধানের যোগ্য :— "That drawing is best which by its action best expresses the passion that animates the figure."

ভারতের কাব্য পুরাণাদিতে যে কল্পলোকেব বর্ণনা আছে বাস্তবিক জগতে তাহার কোনও অস্তিত্ব নাই। সুতরাং পুরাণাদির বর্ণনীয় বস্তু চিত্রে অনুবাদ করিতে হইলে বাস্তবপ্রথার অবলম্বনে হইতে পারে না। ঐতিহাসিক চিত্র বা সাধারণ মূর্ত্তি চিত্রণে যে রীতি অবশ্যপ্রতিপালনীয়, সংস্কৃত সাহিত্যের কাব্য ও পুরাণাদির বর্ণনীয় মহাপুরুষগণের চিত্রে তাহা প্রযোজ্য নহে। বঙ্গীয় চিত্র শিল্পের বর্ণনীয় বস্তুতে সমালোচকগণ যে রীতির বা আদর্শের অভাব দেখিতেছেন তাহা সযত্নে পরিহার করাই নূতনপন্থী বঙ্গীয় শিল্পিগণের মূল মন্ত্র। রামায়ণের নায়কের বর্ণনায় "আজানুলম্বিত বাহু" প্রভৃতি বিশেষণ কেবল কবিকল্পনার অত্যুক্তি নহে, তত্তৎবিশিষ্ট প্রকৃতি দ্বারা রামচরিত্রকে উচ্চশ্রেণীর মানবত্বে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে, যাহার আদর্শে বাস্তবিক জগতের সাধারণ-অবয়বী মানুষ হইতে সর্ব্বথা ভিন্ন ও বহু উচ্চে। সুতরাং তত্তৎ মহাপুরুষের চিত্রে উক্ত বিশেষণগুলি কবিকল্পনার অত্যুক্তি বলিয়া ছাঁটিয়া ফেলিয়া দিলে, তাহাদের ব্যক্তিগত মহিমা ও অলৌকিকতা চিত্রে প্রকাশ করা অসম্ভব হয়। পৌরাণিক পুরুষগুলি যে আদর্শ গঠিত তাহা যথাযথ চিত্রে প্রকাশ করিতে না পারিলে পৌরাণিক চিত্রের সার্থকতা কি? হইতে পারে পৌরাণিক কল্পলোকে বিচরণ করিবার যাঁহাদের রুচি নাই এবং উক্ত জগতের বর্ণিত অতিপ্রাকৃত মানবত্বে যাঁহারা কোনও আদর্শ বা অবলম্বন পান না তাঁহাদের পক্ষে পৌরাণিক আদর্শ শিল্পে যথাযথ অনুবাদ হইল কি না, তাহা একই কথা। পৌরাণিক সাহিত্যের আদর্শ ও বর্ণনীয় সামগ্রী যাঁহাদের চক্ষে 'অদ্ভুত' বা 'উদ্ভট' তাহা চিত্রে অনুবাদ করিলেও তাঁহাদের গ্রহণীয় নহে। অন্য দেশের শিল্পে পৌরাণিক নায়কাদির চিত্রণে যে প্রথা অবলম্বিত হইয়াছে তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিলে কথাটা সহজ হইবে। Arthur সম্বন্ধে ইংলণ্ডে যে রূপকথা প্রচলিত আছে আমাদের দেশের পুরাণের বর্ণনীয় বস্তুর সহিত তাহার অনেকটা সাদৃশ্য দেখা যায়। 'Arthurian Legend'-এ যে অলৌকিক রসের অবতারণা আছে, যে নূতন শ্রেণীর মানবত্বের বর্ণনা আছে তাহা চিত্রে অনুবাদ করিতে Burne-Jones স্বাভাবিকতার আদর্শ ও অস্থি-বিদ্যার আইন পরিত্যাগ করিয়াছেন। Burne-Jones-র চিত্রাবলীর সহিত

যাঁহাদের পরিচয় নাই* তাঁহাদের পক্ষে কথাটা পরিপাক করা কঠিন হইতে পারে, তথাপি প্রমাণ স্বরূপ উক্ত শিল্পীর চিত্রাঙ্কনরীতির প্রথার উল্লেখ করিতেছি।

"This impression of intense langour and graceful stiffness Burne-Jones produced by means of many systematic deviations from nature to which he subjected his figures. In the first place he makes them eight and a half head high, sometimes more, and to suit them he makes his palace-doors of extraordinary height for their breadth. Having made his figure very long he still more exaggerates this effect by raising the hips. * * * *

"In the endeavour to translate them, the artist has been obliged to seek for new words, that is to say for *unusual attitudes*, he has been forced to invent positions, to bend his limbs in strange contortions, to intensify the facial expressions. The peculiarity of gesture follows of necessity from the suggestiveness of the idea. He must 'realistically' portray the world he has set himself to represent:"—*British Contemporary Art*, BY R. DE LA. SIZERANNE, 1898.

রায় মহাশয় বলিয়াছেন 'কাব্যের ভাষা নামক জিনিষটা কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট শব্দ বা তৎসূচক চিহ্নাদির দ্বারা ভাব বিনিময়ের একটা সাঙ্কেতিক উপায় মাত্র। কিন্তু চিত্রের ভাষায় মূলতঃ এরূপ কোনও কৃত্রিমতা নাই।' রায় মহাশয় তাঁহার ইংরাজী চিত্রবিজ্ঞানের পাতা উল্টাইলেই দেখিতে পাইবেন, যে এই "কৃত্রিমতা" বা Conventionalism চিত্রবিজ্ঞানের প্রাণ ও প্রধান সম্পত্তি। এই তথাকথিত 'কৃত্রিমতা' কি শিল্পে, কি সাহিত্যে সকল ভাষারই বিশিষ্ট সামগ্রী। কোনও বিশেষ ভাবপরম্পরা যে ভাষার মধ্যে আত্মপ্রকাশ লাভ করিতে চায় তাহা ঐ ভাবরাশির বিশিষ্ট আদর্শে উহার উপযোগী করিয়া লয়। ক্রমশঃ ঐ ভাষা ঐ ভাবগুলি প্রকাশ করিবার একটা বিশেষ শক্তি সঞ্চয় করে। Spenserর ভাষার অদ্ভুত শব্দসঙ্কাম, সংস্কৃত সাহিত্যের অলৌকিক অলঙ্কারধ্বনি, অথবা বঙ্গীয় বৈষ্ণব কবিগণের 'দুষ্ট পরিভাষা' অনেকের চক্ষে 'কৃত্রিম' হইতে পারে, কিন্তু এই কৃত্রিমতা বা Convention আবর্জ্জনা বলিয়া ত্যাগ করিলে উহাদের মধ্যে সাহিত্যের সামগ্রী কিছু থাকে কি না তাহা চিন্তনীয়। য়ুরোপীয় রীতিতে চিত্রিত মূর্ত্তিতে (Portrait) গলদেশে মুখের উপরি ভাগের ছায়ার (Shadow) সন্নিবেশ, অনেকের চক্ষে শ্মশ্রুর কল্পনা বলিয়া বোধ হয়। আমি অনেকের মুখে শুনিয়াছি চিত্রিত মূর্ত্তির একাংশ অপরাংশ অপেক্ষা "কাল" কেন করা হয় তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। এখানে বুঝিতে হইবে যে (Light and Shadow) আলো ও ছায়ার উপলক্ষে য়ুরোপীয় মূর্ত্তিচিত্রকর যে বিশিষ্ট ভাষার বা Conventionর আশ্রয় লইয়াছেন তাহা উক্ত সম্প্রদায়ের ভাষায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট "উদ্ভট" "অদ্ভুত" ও "কৃত্রিম"। "ভিন্ন ভিন্ন চিত্রশিল্পের মধ্যে, দুইটা স্বতন্ত্র ভাষার মধ্যে যে সকল মৌলিক প্রভেদ দেখা যায় এ প্রকারবিভিন্নতা কুত্রাপি লক্ষিত হওয়া সম্ভব কি না" ইহা অনুমানসাপেক্ষ নহে, তত্তৎ চিত্রশিল্পের গভীর আলোচনা ও অনুশীলনসাপেক্ষ। এই মৌলিক ভাষাগত অনৈক্য, য়ুরোপের শত শত বিভিন্ন আদর্শের শিল্প-সম্প্রদায় (School) সৃষ্টি করিয়াছে। তাহাদের নাম মাত্র উল্লেখ করিলেও প্রবন্ধের কলেবর পূর্ণ হইয়া যায়।

য়ুরোপের আধুনিক শিল্পীসমাজ ভারতীয় ও অন্যান্য প্রাচ্যশিল্পের "উদ্ভট" আদর্শ কি চক্ষে দেখিতেছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত মন্তব্যে উপলব্ধি হইবে। বলা বাহুল্য এই দৃষ্টিস্থান সমগ্র মানবের আন্তর্জাতিক শিল্পবিজ্ঞানের সনাতন আদর্শ। প্রাচ্যজাতির শিল্পে য়ুরোপীয় শিল্পীসমাজ যে

* ইংলণ্ডের সারস্বত সমাজে Burne-Jonesর স্থান Tennyson অপেক্ষা অনেক উচ্চে। আমাদের দেশের অনেক শিক্ষিত পুরুষ Tennysonর কবিতাবলী আদ্যোপান্ত আবৃত্তি করিতে পারেন অথচ একশত জনের মধ্যে এক জন Burne-Jonesর নাম শুনিয়াছেন কি না সন্দেহ।

অননুভূতপূর্ব্ব নূতন সামগ্রীর সন্ধান পাইয়াছেন, তাহা তাঁহাদের প্রচলিত বিজ্ঞানের আদর্শে গঠিত নহে বলিয়া "উদ্ভট" কি "বিভীষিকাময়" বলিয়া প্রত্যাখান করিতে হইবে তাহা নহে—নূতন সম্পত্তির হিসাবে, প্রচলিত শিল্পবিজ্ঞানের সাম্রাজ্য প্রাচীন ক্ষুদ্র ক্ষেত্রের প্রাচীর অতিক্রম করিয়া, বৃহত্তর উন্নততর পরিধিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

"Scarcely more than a hundred years ago art meant for a cultivated European, Graeco-Roman sculpture and the art of the high Renaissance, with the acceptance of a few Chinese lacquers and porcelains as curious decorative trifles. Then came the admission that Gothic art was not barbarous, that the Primitives must be reckoned with, and the discovery of early Greek art The acceptance of Gothic and Byzantine art as great and noble expressions of human feeling, which was due in no small degree to Ruskin's teaching, made a breach in the well arranged scheme of our aesthetics, a breach through which ever new claimants to our admiring recognition have poured.

When once we have admitted that the Graeco-Roman and *high Renaissance views of art*—and for our purposes we may conceive these as practically identical—*are not the only right ones*, we have admitted that artistic expression need not necessarily take effect through a scientifically complete representation of natural appearances, and the painting of China and Japan, the drawings of Persian potters and illuminators, the ivories, bronzes, and textiles of the early Mahomedan craftsmen, all claim a right to serious consideration. And now, finally, the claim is being brought forward on behalf of the sculptures of India, Java, and Ceylon These claims have got to be faced; we can no longer hide behind the Elgin marbles and refuse to look; we have not longer any system of aesthetics which can rule out, *a priori*, even the most fantastic and unreal artistic forms. *They must be judged in themselves and by their own standards.*

To the European mind of to-day, saturated as it is with some centuries of representative art, there is always some essential difficulty in thus shifting the point of view to one in which likeness to natural appearances, as we understand them, can no longer be used as the chief criterion of value."—Roger Fry,—Quarterly Review, January, 1910.

১৩১৭ অগ্রহায়ণ

ভারতীয় চিত্রকলা

শ্রীসুকুমার রায়

আশ্বিনের "প্রবাসীতে" শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ভারতশিল্পসমস্যার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তিনি যদি আমার বক্তব্যগুলিকে একটু বুঝিতে চেষ্টা করিতেন তবে কতকটা সুবিধা হইত। কুসংস্কার ও শ্রদ্ধাহীনতা যে সত্য নির্ণয়ের পক্ষে মস্ত বাধা তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু আমার ধারণা এই যে, শিক্ষিতসমাজ- কর্ত্তৃক ভারতশিল্পের প্রকৃত মর্ম্মোপলব্ধির পথে অর্দ্ধেন্দ্রবাবু প্রমুখ শিল্পোৎসাহি- গণের ব্যাখ্যাদিও একটা কম অন্তরায় নহে। এ

বিষয়ে আমার বক্তব্য সংক্ষেপতঃ এই :— (১) ভারত শিল্পের আদর্শ ও বিশেষত্ব বিষয়ে ইঁহারা যাহা বলিতেছেন তাহা খুব সমীচীন বোধ হয় না। যে বস্তুটাকে ইঁহারা "ভারতশিল্প" আখ্যা দিয়াছেন সেটা শিল্পের একটা অসম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অংশ মাত্র। (২) উক্ত আদর্শের সহিত পাশ্চাত্য বাস্তব শিল্পের যে অহি-নকুল সম্বন্ধ কল্পনা করা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ অমূলক ও অযৌক্তিক, এবং প্রকৃতি ও শিল্পের সম্বন্ধ বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা সম্ভূত। "শিল্প-জগতের সূক্ষ্মতত্ত্ব" সম্বন্ধে সূক্ষ্মতর গবেষণায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে এই সকল বিষয়ে একটা পরিষ্কার বোঝাপড়া হওয়া প্রয়োজন।

শিল্পজগতের বাজারে ভারত শিল্প বা অপর কোন শিল্পের দর কিরূপ, তাহা জানিবার জন্য আমার কিছুমাত্র ব্যস্ততা নাই। Rosseti, Burne-Jones, Spencer বা বৈষ্ণব-কবিদিগের বিরুদ্ধে আমার কোনও অভিযোগ নাই, সুতরাং বর্ত্তমান আলোচনা ক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে সদলে হাজির করিবার কারণ বুঝিলাম না। হিন্দুশাস্ত্র ও পুরাণ-বিদ্বেষী, পৌত্তলিক শিল্পের বিরুদ্ধে উদ্যতমুষল কোন অজ্ঞাত প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় যে প্রচণ্ড কটাক্ষপাত করিয়াছেন উপস্থিত আলোচনা প্রসঙ্গে তাহার প্রাসঙ্গিকতা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। শিল্পের উৎকর্ষ পরিমাপক কোন আইন বা আদর্শ মাপকাঠি সম্বন্ধে আমি কোথাও কোন মত জাহির করি নাই। কিন্তু গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ছাড়িবেন কেন? তিনি স্বয়ং কতকগুলি "উদ্ভট" মত খাড়া করিয়া আমার স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়াছেন।

অর্দ্ধেন্দ্রবাবুর মতে পুরাণাদিবর্ণিত কল্পলোকের বস্তুকল্পনাকে চিত্রে যথাযথ ভাবে (অর্থাৎ "অক্ষরে অক্ষরে!") অনুবাদ করাই ভারতশিল্পের উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য সাধু সন্দেহ নাই। উক্ত কল্পনাগুলিকে উদ্ভট জ্ঞানে "ছাঁটিয়া ফেলিবার" প্রস্তাব কেহ করিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই। কিন্তু সত্যসত্যই "পৌরাণিক কল্পলোকে বিচরণ করিবার যাঁহাদের রুচি নাই" সে দুর্ভাগ্যদের অবস্থা কি হইবে? তাঁহাদের পক্ষে কি শিল্পচর্চ্চা নিষিদ্ধ হইবে? বাস্তব জগতে কি "উচ্চশিল্পের" উপযোগী মালমসলার কিছু অভাব পড়িয়াছে? প্রকৃতির রাজ্যে যিনি উচ্চ সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছেন, অর্দ্ধেন্দ্রবাবুর ভারতশিল্পে যদি তাঁহার কোন স্থান না থাকে, তবে সে শিল্পকে নিতান্তই অসম্পূর্ণ বলিতে হইবে।

গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বলিতেছেন 'আজানুলম্বিত বাহু' প্রভৃতি বর্ণনার দ্বারা নায়ককে "উচ্চশ্রেণীর মানবত্বে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে, যাহার আদর্শ বাস্তবিক জগতের সাধারণ অবয়বী মানুষের আদর্শ হইতে সর্ব্বথা ভিন্ন!" এই "আদর্শ" জিনিষটা কোথা হইতে আসিল? এই সকল অতিশয়োক্তি কি কেবলই নিরঙ্কুশ কল্পনামাত্র? যেটা 'আছে' সেটার সহিত সম্যক্ পরিচয় না হইলে, যেটা 'হইতে পারিত' বা 'হইলে ভাল হইত' সেটাকে পরিষ্কাররূপে বোঝা যায় না। অতিপ্রাকৃত ও অবাস্তব আদর্শকে বুঝিতে হইলে প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ থাকা প্রয়োজন, বাস্তব জগতের অসম্পূর্ণতার সহিত পরিচয় আবশ্যক। প্রকৃতির অর্থাৎ জড়প্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতির—অপূর্ণ বৈচিত্র্যের মধ্যেই পূর্ণতার আদর্শ ও idea নিহিত রহিয়াছে। Realism ও Ideaslism, বাস্তব শিল্প ও ভাবপ্রধান শিল্প, শিল্পের দুই দিক মাত্র। উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ থাকা দূরে থাকুক একটার সহায়তা ব্যতীত আর একটা কখনও সম্যক সার্থকতা লাভ করিতে পারে না। Realism শিল্পের মূল ভিত্তি Idealismএ তাহার ব্যক্তিত্বের বিকাশ, এবং উভয়ের সমন্বয়ে তাহার পূর্ণ সফলতা। অর্দ্ধেন্দ্র বাবুর ভারতশিল্প যদি পাশ্চাত্য বাস্তবশিল্পের সংঘর্ষে আসিলেই আশু শিল্পলীলা সংবরণের আশঙ্কা থাকে, তবে সে শিল্পের রীতিমত এলোপ্যাথি চিকিৎসা আবশ্যাক বুঝিতে হইবে।

গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন, "রায় মহাশয় চিত্রবিজ্ঞান বলিতে যাহা বুঝিয়াছেন তাহা য়ুরোপীয় শিল্পের...প্রথা বিশেষ মাত্র।" বিলক্ষণ! "প্রথা বিশেষ মাত্র"ই যদি বুঝিব, তবে তাহাকে "বিজ্ঞান" নামে অভিহিত করিব কেন? অর্দ্ধেন্দ্র বাবুর অভিধানে

"বিজ্ঞান" শব্দের অর্থ কি তাহা জানি না, কিন্তু সাধারণ লোকে বিজ্ঞান বলিতে Systematized knowledge বা সুনিয়ন্ত্রিত জ্ঞান বুঝিয়া থাকে। চিত্রবিজ্ঞান অর্থে "যদ্দৃষ্টংতল্লিখিতং" নীতি নহে। অস্থিবিদ্যায় পাণ্ডিত্যকেও চিত্রবিজ্ঞান বলা যায় না। 'মানবজাতির বহুমুখী শিল্পসাধনার' সীমা বা সমষ্টির নামও চিত্রবিজ্ঞান নহে। আলোকবিজ্ঞান (Optics) ও তৎ সংক্রান্ত শারীরবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের সার্ব্বজনীন সত্যের উপর চিত্রবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা। চিত্রবিজ্ঞানকে বুঝিতে হইলে কেবল কতকগুলি "আইন" মুখস্থ করিলে চলিবে না—দৃশ্য সৌন্দর্য্যের অন্তরালে যে সকল বিচিত্র নিয়ম কার্য্য করিতেছে "উহার সহিত সহৃদয় সর্ব্বাঙ্গীন পরিচয় আবশ্যক", (ভাব প্রকাশের সহায়তার জন্যই আবশ্যক, অনুকরণবিদ্যা জাহির করিবার জন্য নহে)। অবশ্য বিজ্ঞানই শিল্পরাজ্যের নিয়ন্তা নহে, এবং প্রকৃতিকে বিজ্ঞানের ঘানিতে নিংড়াইলেই খাঁটি শিল্পরস নিস্যন্দিত হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া শিল্পের বিজ্ঞানাংশকে উড়াইয়া দিলে চলিবে না। বিজ্ঞানের facts ইংরাজের পক্ষে যেরূপ সত্য, অর্দ্ধেন্দ্র বাবুর পক্ষেও তদ্রূপ। শিল্পে কেবল বাস্তব সৌন্দর্য্যটাই যে সর্ব্বেসর্ব্বা হওয়া উচিত নয়, এ সম্বন্ধে অনেক সারগর্ভ যুক্তি দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু তন্মধ্যে প্রাকৃতিক সত্য বিষয়ে অজ্ঞতা বা তৎপ্রকাশে অক্ষমতা একটা খুব উঁচুদরের কৈফিয়ৎ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। শিল্প ও প্রকৃতির মধ্যে যখন একটা কৃত্রিম বিরোধ জাগিয়া উঠে, তখনই শিল্প উৎকেন্দ্র হইয়া কতকগুলি ফ্যাশান রচনাভঙ্গী ও ভড়ং (Mannerism) মাত্রে পর্য্যবসিত হইতে থাকে। শিল্পের সার্ব্বজনীনতার কথা উঠিলেই এক শ্রেণীর লোকে ভারতশিল্পের জাতিগত স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্ব লোপের অমূলক আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠেন, এবং "ভারতের শিল্পসাধনার নিজস্ব অক্ষুণ্ণ রাখা কত বড় ধর্ম্ম, কত বড় দায়িত্ব" তাহা বুঝাইবার জন্য অনর্থক আকাশ পাতাল তোলপাড় করিয়া তোলেন।

কোনও বস্তু বা ভাব ও তৎসূচক ভাষাগত সঙ্কেতের মধ্যে কোনও সম্পর্ক বা সৌসাদৃশ্য দেখা যায় না। 'পা' এই লিপি বা শব্দটির সহিত শরীরের অবয়ব বিশেষের কোনও সাক্ষাৎ যোগ নাই; একজন বিদেশীয়ের পক্ষে শব্দটা শব্দ মাত্র, লিপিটা আঁচড় মাত্র—সুতরাং নিরর্থক। "কিন্তু চিত্রের ভাষায় মূলতঃ এরূপ কোন কৃত্রিমতা নাই।" 'পা' বুঝাইতে হইলে পা আঁকিয়া দেখাইতে হইবে। জগতে হাজার হাজার পা দেখিতে পাই, তাহার কোন দুটিই এক রকম নহে, অথচ সবগুলির মধ্যেই একটা মৌলিক সাদৃশ্য রহিয়াছে—অর্থাৎ সবগুলিই একটা আদর্শ pattern বা ছাঁচের রূপান্তর (variation) মাত্র। সকল বস্তুরই patternটীকে বজায় রাখিয়া ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন ধরণের আদর্শের কল্পনা করিয়া থাকে; কিন্তু "আদর্শ ও উপায়ের আত্যন্তিক অনৈক্য সত্ত্বেও" এক শিল্পী "মানুষ" বুঝাইতে চাহিলে অপর শিল্পীর তৎস্থানে "হস্তী" বা "ঢেঁকি" বুঝিবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। ইহা অবশ্য নিতান্ত স্থূল বিষয়ের কথা হইল—কিন্তু মানসিক ভাব বর্ণনের সময়ে কি হইবে? মানসিক অবস্থাকে আমরা সাক্ষাৎ ভাবে দেখিতে পাই না। মানুষের মনে দুঃখ, ক্রোধ, হিংসা, ভয় প্রভৃতি ভাবের উদয় হইলে তাহার মুখশ্রী ও শরীরভঙ্গীর যে সকল বিকার লক্ষিত হয়, মানসিক ভাবের ঐ সকল বহিঃপ্রকাশ হইতেই চিত্রে সেই ভাবগুলি ব্যক্ত করিবার সঙ্কেত পাওয়া যায়। অবাস্তব কল্পনা সম্বন্ধেও সেই কথা। অবাস্তবকে কতকগুলি জ্ঞাত বাস্তবের রূপান্তর বা নূতন রকম সমাবেশ রূপেই (in terms of known Realities) আমরা কল্পনা করিয়া থাকি। সুতরাং, "অলৌকিক রসের অবতারণা" করিতে হইলে লৌকিকের জ্ঞানটা একটু বিশেষ মাত্রায়ই আবশ্যক। একই বস্তুর অসংখ্য বিচিত্র রূপের মধ্য হইতে তাহার আদর্শ চেহারা বা মূল ভাবটিকে ধরিবার চেষ্টা হইতেই Convention এর উৎপত্তি। এই Convention এর অর্থ কৃত্রিমতা নহে। কিন্তু অর্দ্ধেন্দ্রবাবু আশ্বাস দিয়াছেন যে, "ইংরাজী চিত্রবিজ্ঞানের পাতা উল্টাইলেই" দেখিতে পাইব যে "কৃত্রিমতা চিত্র বিজ্ঞানের প্রাণ বা প্রধান সম্পত্তি!"

সেই অপরূপ চিত্রবিজ্ঞানের সন্ধান কোথায় পাওয়া যায় জানাইলে বাধিত হইব। চিত্রের ভাষার যেখানে উৎপত্তি, যেটা তাহার মূল ভিত্তি, অর্দ্ধেন্দ্রবাবুর ভারতশিল্প, তাহার সহিত পরিচয় স্থাপন দূরে থাকুক, তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেও নারাজ! অথচ এদিকে খুব এক্‌টা "বিশিষ্ট ভাষায়" আত্মপ্রকাশ করিবার উৎকট চেষ্টাও রহিয়াছে। "ঢাল নাই তলোয়ার নাই খাম্‌চা মারেঙ্গো!"

শিল্পে ব্যক্তিগত এবং জাতিগত স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্বের স্থান আছে—কিন্তু, সেটা "মৌলিক ভাষাগত অনৈক্য" নহে—অলঙ্কার, রচনাভঙ্গী, আদর্শ ও বক্তব্য বিষয়ের পার্থক্য মাত্র। এই পার্থক্য খুব গুরুতর হইতে পারে সন্দেহ নাই; কিন্তু তথাপি ইউরোপীয় Pre-Raphaelite গণ যে ভাষার ব্যবহার করেন Impressionist গণও সেই ভাষাই ব্যবহার করেন; প্রকৃতির নিখুঁৎ নকলনবীশের যে ভাষা নব্য ভারতশিল্পের উদ্ভটতম কল্পনানবীশেরও সেই ভাষা। অবশ্য শিল্পকে উপলব্ধি করিতে হইলে শিল্পের আখ্যানবস্তুর সহিত সম্যক পরিচয় আবশ্যক। শিল্পী আলো ও ছায়ার বৈচিত্র্যমূলক কোনও সৌন্দর্য্যকে চিত্রে ব্যক্ত করিয়াছেন; কিন্তু আমার উক্ত বিষয়ক বিদ্যার দৌড় হয়ত "গাছের পাতা সবুজ," "আকাশের রং নীল" ইত্যাদিবৎ কতকগুলি স্থূল সংস্কার পর্য্যন্ত। সুতরাং চিত্রবর্ণিত নিতান্ত স্বাভাবিক সত্যটিও আমার নিকট অদ্ভুত প্রতীয়মান হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু অর্দ্ধেন্দ্র বাবু এই ব্যাপার হইতে এই তত্ত্বোদঘাটন করিয়াছেন যে চিত্রের Light and Shade, আলো ও ছায়া জিনিসটাও একটা Convention বা "বিশিষ্ট ভাষা"! এই মৌলিক তত্ত্বাবিষ্কারের বাহাদুরীটা কাহার জানিবার জন্য উৎসুক রহিলাম।

[এই লেখাটি গত মাসে স্থানাভাবে মুদ্রিত হয় নাই। —প্রবাসী সম্পাদক।]

১৩২০ আশ্বিন

পতন

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দিল্লীতে নব রাজধানী প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্বকর্ম্মাকে ডাকা যাইবে কি P. W. D.র বড়-সাহেবকে তলব দেওয়া হইবে এই বিতণ্ডার ঢেউ আমাদের মানসিক জড়তার উপরে কোনদিন আসিয়া আঘাত করে নাই;—উচ্চশিক্ষার উচ্চ ডালে মন আমাদের পরমসুখে জ্ঞানফল ভক্ষণ করিতে ব্যস্ত, ভারতীয় স্থপতিগণের কপাল, ভারত স্থাপত্য-শিল্প ও সেই শিল্পের বিজয়-ধ্বজার সহিত ভাঙিয়া পড়ুক তাহাতে আমাদের ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কিন্তু হায়, যে বৃক্ষের ডালে আমরা ভর দিতে চাহি সেই বৃক্ষ যে বিশ্বকর্ম্মার মন্দিরের সুদৃঢ় প্রস্তরভিত্তিকে বিদীর্ণ বিচূর্ণ করিয়া নিজের এবং আমাদেরও পতন অবশ্যম্ভাবী করিয়া তুলিয়াছে সেটা সুনিশ্চিত। এমন একদিন আসিবে যেদিন দেখিব আমরা সম্পূর্ণ সুসভ্য হইয়া উঠিয়াছি অথচ সভ্যতার যে প্রধান লক্ষণ স্থাপত্য এবং শিল্প বিষয়ে কৃতিত্ব, তাহার চিহ্নমাত্র আমাদের নাই; আমরা দাঁড়ে বসিয়া মুখস্থ বুলি আওড়াইতেছি কিন্তু নিজের বাসাটা পর্য্যন্ত নিজেরা প্রস্তুত করিয়া লইতে ভুলিয়া গিয়াছি। উচ্চশিক্ষার উচ্চতার সঙ্গে আমাদের পিতৃপুরুষের কীর্ত্তিস্তম্ভের চূড়া যদি উচ্চতর হইয়া না ওঠে তবে কোন্ লাভ? ফলন্ত গাছ শুখাইয়া দিয়া, মাথায় উপরে ছাত ফাটাইয়া আমার সাধের উচ্চশিক্ষার পরগাছা বজায় থাক—একটাই যদি আমাদের

মনোগত অভিপ্রায় হয় তবে বলিয়া রাখি প্রলয়-ঝড় যেদিন আসিবে সেদিন দেখিবে যে পরগাছার মূলে এমন কিছু নাই যেটাকে আঁকড়িয়া সে নিজেকে এবং পরমুখাপেক্ষী আমাদের খাড়া রাখিতে পারে।

এমন লোক আমরা দেখিয়াছি যে সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী বিষ্ণুকে দর্শন করিবার জন্য সূর্য্যের দিকে চাহিয়া চাহিয়া চক্ষের মাথা এবং নিজের আশপাশের সামগ্রীগুলা দেখিবার ক্ষমতাটারও ইহকাল পরকাল খাইয়া বসিয়াছে। আমরাও ঠিক সেইরূপেই করিতেছি। বিশ্বব্যাপিনী কোন-এক বিশ্ববিদ্যাকে দেখিবার আশায় শূন্যে দৃষ্টিপাত করিয়া করিয়া আমাদের দৃষ্টিশক্তি এতই সূক্ষ্ম করিয়া আনিয়াছি যে বিশ্বকর্ম্মা যে আমাদের কাছেই ছিলেন এবং এখনও সেখানে অপেক্ষা করিতেছেন এটা আমরা ধারণার মধ্যেই আনিতে পারিতেছি না। তথাকথিত উচ্চশিক্ষা বা বিশ্ববিদ্যা অথবা আর-একটা-কিছু—আমাদিগকে যে-লোকে বাস করিতে হইবে, যাহা লইয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, তাহা হইতে আমাদের মনোযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া এমন একটা লোকান্তরের দিকে আমাদের লইয়া চলিয়াছে যেখানে মানুষ নিজের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান হারাইয়া না-স্বর্গ না-মর্ত্তের মাঝে কক্ষচ্যুত একটা উৎপাত গ্রহের মত কেবলি ঘুরিতে ঘুরিতে নিজেকে ছাই করিয়া লোপ করিয়া দিবার চেষ্টাতেই নিযুক্ত থাকে। আমরা যে নিজেকে কক্ষচ্যুত হইতে দিয়া গৃহহারা হইতে বসিয়াছি, এবং এইভাবে আরও কিছুকাল চলিলে আমাদের ঘরবাড়ী, আমাদের মন্দির মঠ, আমাদের মতে গঠিত হইতে না দিয়া P W D র বড়-সাহেবদের মতে গঠন করিয়া চলিলে অল্পকালের মধ্যেই স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য শিল্পে আমাদের যাহা ছিল, যাহা এখনও আছে এবং যাহা পরেও থাকা উচিত তাহার যে কিছুই থাকিবে না, ইহাই হ্যাভেল সাহেব তাঁহার নব-প্রকাশিত Indian Architecture নামক গ্রন্থের* পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে সুস্পষ্ট ও সপ্রমাণিত করিয়াছেন।

আগ্রার তাজ হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রীকমন্দিরের ছাঁচে গঠিত আধুনিক ও সুসভ্য লক্ষ্ণৌর পোষ্টআফিস পর্য্যন্ত আমাদের স্থাপত্য-কীর্ত্তির আদ্যন্ত ইতিহাস চিত্রের পর চিত্র দিয়া তিনি এমন করিয়া আমাদের সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছেন যে বিশ্বকর্ম্মার ইন্দ্রসভায় আর P. W D.র সেনেট্ হাউসে কি আকাশ পাতাল প্রভেদ তাহা বুঝিতে কাহারও বাকি রহে না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ভারতের যে কীর্ত্তিস্তম্ভগুলা ঠিক আমাদের, সেইগুলাকেই ফার্গুসন্ প্রমুখ বিদেশীয় পণ্ডিতগণের মতে মত দিয়া আমরা কতকাল আমাদের নয় বলিয়া বেশ নিশ্চিন্ত আছি;—আর আমাদের নয়টা আমাদেরই হয়, ইহাই একজন সাহেব আমাদের হইয়া জগতে ঘোষণা দিতেছেন। ইহার পর আমরা আর যেন নিজেকে বিশ্বকর্ম্মার পৌরোহিত্যের অধিকারী ভাবিয়া গর্ব্বভরে অনুসন্ধান-সমিতি ও মূর্ত্তিভবন গঠন করিতে না চলি। স্থাপত্যশিল্পে আমাদের যাহা ছিল তাহা বুঝিয়া লইতে, যাহা আছে তাহা বজায় রাখিতে, হ্যাভেল সাহেব শিল্পভাণ্ডারের চাবি আমাদের হাতে তুলিয়া দিয়াছেন; সুসভ্য আমরা হয় তো সে হাতের নিধি পায়ে ঠেলিয়া চলিয়া যাইব! বিশ্বকর্ম্মার রথ আমাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া যখন চলিয়া যাইতেছে, শিক্ষিত আমরা হয় তো বা তখন টাউন হলে স্মৃতিসভা নয় তো শিক্ষা-ভিক্ষা লইয়া ব্যস্ত আছি। এমনি করিয়াই আমরা আমাদের ইহকাল পরকাল ও অক্ষয় কীর্ত্তি বজায় রাখিতেছি, বোধ হইতেছে।

হ্যাভেল সাহেবের পুস্তকখানি শুধু চোখ বুলাইয়া পড়িয়া যাইবার সামগ্রী নয়। তাহাতে ভারতীয় স্থাপত্যের চিত্র পরম্পরার অন্তরাল হইতে, শিল্পে আমাদের যাহা ছিল, তাহার যাহা এখনও আছে এবং তাহার যাহা আসিতেছে তাহার ত্রিমূর্ত্তি প্রকাশ

* Indian Architecture : its Psychology. Structure and History from the First Muhammadan Invasion of the Present Day Crown 4to. cloth. Rs. 26-4. With lumerous Illustrations By E B. Havell

পাইতেছে। এই তিন দেবতার যথাযথ ভাগ না বুঝাইয়া দিয়া আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্বজিৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে অগ্রসর হইয়াছি। শিব ছাড়িয়া শক্তিকে আনিতে গেলে যে বিপদ, বিশ্বকর্ম্মাকে ছাড়িয়া বিশ্ববিদ্যাকে আয়ত্ত করিতে গেলেও সেই বিপদ।

১৩২০ কার্ত্তিক

মূর্ত্তি সংগ্রহ

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ

"পবেষামুপকারার্থং যজ্জীবিত সজীবতি।"

সুপ্রসিদ্ধ চিত্র-কলাচার্য্য শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি, আই, ই মহোদয় আশ্বিনের "প্রবাসী" পত্রে "পত্তন" নামক প্রস্তাবে, অধ্যাপক হেভেলের নবপ্রকাশিত "ভারতীয় স্থাপত্য" নামক গ্রন্থের প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

"আশ্চর্য্যের বিষয় এই সে ভারতের যে কীর্ত্তিস্তম্ভগুলা ঠিক আমাদের, সেইগুলাকেই ফার্গুসনপ্রমুখ বিদেশীয় পণ্ডিতগণের মতে মত দিয়া আমরা কতকাল আমাদের নয় বলিয়া বেশ নিশ্চিন্ত আছি;—আর আমাদের নয়টা আমাদেরই হয়, ইহাই একজন সাহেব আমাদের হইয়া জগতে ঘোষণা দিতেছেন। ইহার পর আমরা যেন নিজেকে বিশ্বকর্ম্মার পৌরোহিত্যের অধিকারী ভাবিয়া গর্ব্বভরে অনুসন্ধান সমিতি ও মূর্ত্তিভবন গঠন কবিতে না চলি।" (৭০১ পৃষ্ঠা)

"আমরা" বলিতে যদি যে দুই একটী লোক প্রাচীন শিল্পের দিকে সময় সময় দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক বোধ করেন শুধু তাঁহাদিগকেই বুঝায়—অপর সাধারণত "কেবা আঁখি মেলে" বলিয়া নিস্পন্দ—তাহা হইলে উদ্ধৃত বাক্যের প্রথমাংশ সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। ৺রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ফার্গুসনপ্রমুখ বিদেশীয় পণ্ডিতগণের মতের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া আর এক হিসাবে "আমাদের নয়টা আমাদেরই হয়" বলিয়া অনেক দিন পূর্ব্বেই ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। হেভেলের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে যে দুই একজন বাঙ্গালী এ বিষয়ের আলোচনা করিতেন, তাঁহারা রাজেন্দ্রলালের অনুসরণ করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। আমার স্মরণ হয়, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ রাজেন্দ্রলালের অনুসরণ করিয়া, বোম্বাই-এর "ইস্ট এণ্ড ওয়েস্ট" পত্রে ভারতীয় স্থাপত্য সম্বন্ধে কয়েকটি প্রস্তাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। ফার্গুসনই হউন, মিত্রই হউন, আর হেভেলই হউন, আমরা অন্ধভাবে কাহারও অনুসরণের পক্ষপাতী নহি। কিন্তু রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে বাদ দিয়া, শুধু ফার্গুসনপ্রমুখ বিদেশী পণ্ডিতগণকে এবং অধ্যাপক হেভেলকে লইয়া, ভারতীয় স্থাপত্যের আলোচনার "পত্তন" সমীচীন মনে হয় না।

উদ্ধৃত বাক্যের উপসংহারে, আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহারও যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে সংশয় হয়। হেভেল তাঁহার নবপ্রকাশিত গ্রন্থে আমাদের (ভারতবাসীগণের) নয়কে হয় বলিয়া ঘোষণা দিতেছেন বলিয়াই কি কোনও বাঙ্গালী বা ভারতবাসী আর নিজেকে "বিশ্বকর্ম্মার পৌরোহিত্যের" অধিকারী ভাবিতে পারিবেন না? "বিশ্বকর্ম্মার পৌরোহিত্যে"র অর্থ কি? বিশ্বকর্ম্মা ভারতের আদর্শ শিল্পী। প্রাচীন শিল্পের নিদর্শন-নিচয়ের মধ্যে যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মহান্, তাহাই উপকথায় বিশ্বকর্ম্মার কৃত বলিয়া কথিত। সুতরাং "বিশ্বকর্ম্মার পৌরোহিত্য" অর্থ

ভারতীয় প্রাচীন শিল্পের মহিমাপ্রচার করিয়া ভারতবাসীর হৃদয়ে তৎপ্রতি ভক্তি সঞ্চারিত করা। হেভেল সাহেব পুস্তক লিখিয়াছেন বলিয়াই কি এদেশের লোকের "নিজেকে বিশ্বকর্ম্মার পৌরোহিত্যের অধিকারী" ভাবিবার অধিকার বিলুপ্ত হইয়াছে? শুধু তাহাই নয়, "গর্ব্বভরে অনুসন্ধান সমিতি ও মূর্ত্তিভবন গঠন"ও নিষেধ। এখানে আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ খলিফা ওমারকেও পরাভূত করিয়াছেন। খলিফা ওমার, কোরান থাকিতে অন্য কোন গ্রন্থের প্রয়োজন নাই বলিয়া, এলেকজেন্ড্রিয়ার গ্রন্থাগার পোড়াইবার আদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু ভবিষ্যতে নূতন গ্রন্থ রচনা সম্বন্ধে তিনিও নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায় না। হেভেল সাহেবের নূতন গ্রন্থ হাতে পাইয়া অবনীন্দ্রবাবু ভবিষ্যতে ভারতীয় শিল্প বিষয়ে গ্রন্থরচনার কল্পনা বা তজ্জন্য উপকরণ সংগ্রহ এবং সংগৃহীত উপাদান সংরক্ষণের আয়োজন পর্য্যন্ত নিষেধ করিয়াছেন। খলিফা ওমারের অগ্নিকাণ্ড সত্ত্বেও মুসলমানেরা গ্রীস ও রোমের দর্শনবিজ্ঞানের আলোচনা ছাড়েন নাই; পরন্তু য়ুরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের শিক্ষা দীক্ষায় য়ুরোপবাসীর গুরুগিরি পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। অবনীবাবুর "পত্তন" পড়িয়া অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী, নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রমুখ ব্রাহ্মণ-সন্তানগণ যে বিশ্বকর্ম্মার পৌরোহিত্যের অধিকার সম্বন্ধে সহসা দাবী ত্যাগ করিবেন, এরূপ মনে হয় না।

"পত্তন" প্রবন্ধে "অনুসন্ধান সমিতির" ও "মূর্ত্তিভবনের" পাণ্ডাদিগের সম্বন্ধে ব্যবহার পত্তন করিয়া যুগপৎ অপর একখানি পত্রিকায়—আশ্বিনের "ভারতীতে" (৫৮৮—৫৯১পৃঃ)—অবনীন্দ্র বাবু "প্রাণ প্রতিষ্ঠা" করিয়াছেন। "প্রাণ প্রতিষ্ঠায়" প্রাণের কথা স্পষ্টাক্ষরে বলা হইয়াছে। যথা

"এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে Havell সাহেবের Indian Architecture নামক পুস্তকের সমালোচনা অসম্ভব এবং আমার উদ্দেশ্যও তাহা নহে। কিন্তু মূর্ত্তিভবন-স্থাপন এবং যাদুমন্ত্রের অনুসন্ধান করিয়া ড়ানোতে যে আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবেনা সেই কথাই বলিতে চাহি।"

সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে কথাটা "পত্তনে" এবং "প্রাণ প্রতিষ্ঠায়" জ্বালাময়ী ভাষায় মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা হেভেলের গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্ব হইতেই অবনীন্দ্রবাবুর প্রাণে জাগরূক ছিল। অবনীন্দ্রবাবুর ন্যায় স্বনামধন্য ভাব-নায়কের কথা উপেক্ষিত হওয়া উচিত নহে। যাঁহাদিগকে একরূপ প্রাণে বধ করিবার জন্য "প্রাণপ্রতিষ্ঠা" প্রচার করিয়াছেন তাঁহাদের কর্ত্তব্য, তাঁহার (অবনীন্দ্র বাবুর) প্রত্যেকটি কথা বিশেষ রূপে বিচার করিয়া, যাহা গ্রহণীয় তাহা গ্রহণ করেন, এবং যাহা বর্জ্জনীয় বিবেচিত হয়, সাধারণের নিকট তাহার সম্বন্ধেও একটি কৈফিয়ৎ দেন। এই হিসাবেই এই প্রস্তাবে "প্রাণ প্রতিষ্ঠার"ও আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রথমতঃ—মূর্ত্তি অনুসন্ধানকারীদিগের বিরুদ্ধে অবনীন্দ্র বাবুর অভিযোগ। তিনি বলেন—

"যে দীঘির জল হইতে মূর্ত্তি উদ্ধার করিতেছি, সেই দীঘির ধারেই হয়ত মূর্ত্তি-রচয়িতার কোন বংশধর উপবাসে, মরিতেছে, তাহার দিকে কি আমাদের দৃষ্টি কোন দিন পড়িয়াছে।"

"ভাঙা মূর্ত্তির ধূলা ঝাড়িয়া তত লাভ নাই, যত লাভ যাহারা মূর্ত্তিকে গঠন করে তাহাদের জীর্ণ দেহের ধূলা, শীর্ণ মুখের মলিনতা ঘুচাইয়া দেওয়াতে।"

"যাহারা মূর্ত্তি গঠন করে তাহাদের জীর্ণ দেহের ধূলা, শীর্ণ মুখের মলিনতা ঘুচাইয়া দেওয়া" মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য ও পুণ্য কর্ম্ম। কিন্তু তাহা করিবে কে? যাহার শক্তি আছে সেইত করিবে। যাঁহারা এখন মফস্বলে নিয়মমত মূর্ত্তির অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, তাহাদের অনেকের সহিতই আমার পরিচয় আছে। ভাস্কর বা চিত্রকরগণের কথা দূরে থাকুক, নিকট আত্মীয়গণের "জীর্ণদেহের ধূলা এবং শীর্ণ মুখের মলিনতা" ঘুচাইয়া দেওয়ার সামর্থ্যও তাঁহাদের নাই। তাহার উপর সময়সাধ্য এবং ব্যয়সাধ্য অতৃপ্ত অনুসন্ধানস্পৃহা তাঁহাদের জীবনকে ভারবহ

করিয়া রাখিয়াছে। অবনীন্দ্র বাবু তুলি হাতে করিয়া, বাস্তব মানব-আকৃতি সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া যে ভাবে চিত্র অঙ্কিত করিয়া থাকেন, লেখনী লইয়াও এবার মানব-প্রকৃতি সম্বন্ধে সেই রূপ ঔদাসীন্য দেখাইয়াছেন। "যদি সাহেবের মত মূর্ত্তি সংগ্রহেরই বাতিক আমাদের সম্পূর্ণ চাগিয়া উঠে" এই নিষ্ঠুর ভাষা যখন তিনি প্রয়োগ করিতেছিলেন, তখন কি তাঁহার স্মরণ ছিল না যে, বেসরকারী মূর্ত্তি সংগ্রাহকগণের আর্থিক বিশেষ কোন সুবিধা হওয়ার আশা নাই। তাঁহারা যে ভাবের প্রেরণায় কষ্টলব্ধ অবসর সময়টুকু কষ্টকর মূর্ত্তি-সংগ্রহ-কার্য্যে ব্যয় করেন, সেই ভাবকে "বাতিক চাগা" বলিয়া উপহাস করা চিত্তবৃত্তির আলেখ্য-রচয়িতা শিল্পীর মুখে শোভা পায় না।

মূর্ত্তি-অনুসন্ধানকারীগণের মধ্যে যাঁহারা "দীঘির জল হইতে মূর্ত্তি উদ্ধারের" "যত্ন করেন" তাঁহাদের মধ্যে কেবল একজনকে জানি, যিনি ধনী বলিয়া কথিত হইতে পারেন এবং যাঁহার দুই চারিখানা দামী ছবি কিনিযা দুএকজন ভাস্কর বা চিত্রকরকে কিছু উৎসাহ দানের শক্তি থাকিলেও থাকিতে পারে। কিন্তু তাঁহার স্বাধীন রুচি আছে; বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষায় সে রুচি পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। য়ুরোপের প্রধান প্রধান চিত্রশালা এবং শিল্পশালা দর্শনের ফলে তাহা পরিমার্জ্জিত হইয়াছে। ইহার উপরে একটি জিনিসে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ আছে—সেটী ইতিহাস। অবনীন্দ্র বাবু "পত্তনে" বা "প্রাণ প্রতিষ্ঠায়" ইতিহাসের নামও করেন নাই। যাঁহারা শিল্পী বা শিল্পীর পৃষ্ঠপোষক তাঁহাদের জন্য যেমন কর্ম্মক্ষেত্র উন্মুক্ত. যাহারা ঐতিহাসিক বা ইতিহাসানুরাগী তাঁহাদের জন্যও কর্ম্মক্ষেত্র তেমনি উন্মুক্ত। উচ্চ অঙ্গের শিল্পানুরাগী ব্যক্তিগণ কখনও ইতিহাসে অবজ্ঞা করেন নাই। রস্কিনের Stones of Venice নামক বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থের প্রথম অংশের নাম Foundation বা "পত্তন"। এই "পত্তনে"রও আলোচ্য বিষয় ইতিহাস। যাঁহারা ইতিহাসের উপাদান জ্ঞানে মূর্ত্তি সংগ্রহ করেন, তাঁহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়া জনসমাজে তাঁহাদিগকে খাটো করিয়া শিল্পের বিশেষ যে কিছু উপকার হইবে তাহা মনে হয় না। বরং তাঁহাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া সুঝাইয়া, আধুনিক শিল্পীদিগের কিছু সুবিধা করা যাইতে পারে। যাঁহারা "রমেশ ভবনের" উদ্যোগ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলে, তাঁহারা বোধ হয় অবনীন্দ্র বাবুর মনোমত মন্দির গড়িতে রাজি হইবেন। যাঁহারা ইতিহাস-চর্চ্চার সুবিধার জন্য "মূর্ত্তি-ভবন" প্রতিষ্ঠার কল্পনা রাখেন, তাঁহারাও সম্পূর্ণতা সম্পাদনের জন্য যেসকল নিদর্শন নাই তাহাদের প্রতিকৃতি রাখিতে বাধ্য হইবেন এবং প্রতিকৃতি-গঠন-নিপুণ শিল্পী নিয়োগ করিতেও বাধ্য হইবেন। সুতরাং "মূর্ত্তি-ভবন" প্রতিষ্ঠার স্পৃহা যদি কোথাও জাগিয়া থাকে, তবে তাহাকে অভিসম্পাত না করিয়া, আশীর্ব্বাদ করাই কর্ত্তব্য। তাহাতে উভয় পক্ষেরই কল্যাণ। মূর্ত্তি সংগ্রহের ফলে কিরূপে জাতীয় শিল্প উন্নতি লাভ করিতে পারে, তাহা বারান্তরে দেখাইব।

১৩২০ অগ্রহায়ণ

ভারতের প্রাচীন চিত্রকলা

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ

যাহা দেখিলে বা শুনিলে, মানব-মনে উদ্দীপনাসূচক আত্মবিস্মৃতি উপস্থিত হয়, তাহার নাম ললিতকলা। ললিতকলা উপভোগের সদ্য ফল, যোগ,—মনুষ্যের সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে যাহা সত্য—শিব—সুন্দর তাহাতে [অহং হইতে নিরুদ্ধ] চিত্তবৃত্তির লয়;—পরিণাম ফল, নবজীবন লাভ। ললিতকলানিচয়ের মধ্যে চিত্রকলার স্থান অতি উচ্চ। "হরিভক্তিবিলাসে" [১৮শ বিলাসে] গোপালভট্ট "চিত্রজা প্রতিমার" মহিমা সম্বন্ধে "হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র" হইতে নিম্নোক্ত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন;—

"কান্তিভূষণ ভাবাঢ্যাশ্চিত্রে যস্মাৎ স্ফুটং স্থিতাঃ।
অতঃ সান্নিধ্যমায়াতি চিত্রজাসু জনার্দ্দনঃ॥
তস্মাচ্চিত্রার্চ্চনে পুণ্যং স্মৃতং শতগুণং বুধৈঃ॥
চিত্রস্থং পুণ্ডরীকাক্ষং সবিলাসং সবিভ্রমং।
দৃষ্ট্বা বিমুচ্যতে পাপৈ র্জ্জন্মকোটিষু সঞ্চিতৈঃ॥
তস্মাচ্ছু ভার্থিভি ধীরৈর্মহাপুণ্য-জিগীষয়া।
পটস্থঃ পূজনীয়স্তু দেবো নারায়ণঃ প্রভুরিতি"॥*

"যেহেতু চিত্রে কান্তি (শোভা), ভূষণ এবং ভাব প্রভৃতি স্পষ্ট প্রকাশ পায়, এই নিমিত্ত, চিত্রজা প্রতিমানিচয়ে ভগবান (উপাসকের) নিকটে আগমন করেন (অর্থাৎ চিত্রজা প্রতিমা দর্শন করিলে উপাসক ভগবানকে নিকটস্থ মনে করেন)। এই নিমিত্ত জ্ঞানিগণ বলেন,—চিত্র পূজায় শত গুণ পুণ্য। বিলাস (লালিত্য) এবং বিভ্রমসম্পন্ন চিত্রলিখিত নারায়ণকে দর্শন করিলে কোটী জন্মের সঞ্চিত পাপরাশি হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। অতএব যাঁহারা ধীর এবং শুভ ইচ্ছা করেন, তাঁহারা মহাপুণ্য লাভ করিবার জন্য পটে অঙ্কিত প্রভু নারায়ণকে পূজা করিবেন।"

শোভা এবং ভাবময় দেবতার চিত্র উপাসকের বা দর্শকের সালোক্য এবং সাযুজ্য লাভের সহায়তা করে। শোভাময় চিত্রমাত্রই চিত্তরঞ্জন করে এবং বিশুদ্ধভাবময় চিত্র চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন করে। চিত্রকলা লোকশিক্ষার একটি উৎকৃষ্ট উপায়, চিত্রকর সমাজের গুরু স্থানীয়। সুতরাং চিত্রকলার পরিপোষণ এবং উৎকর্ষসাধন উন্নতিশীল মনুষ্যসমাজের অবশ্য কর্ত্তব্য।

ইংরেজ-অভ্যুদয়ের সময় ভারতবর্ষের অন্যান্য ললিতকলার ন্যায় চিত্রকলাও অধঃপতিত জীবন্মৃত অবস্থায় ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে, সরকারী কলাবিদ্যালয়নিচয়ে, পাশ্চাত্য চিত্রকলা-রীতি প্রচলনের যত্ন হইয়াছিল। কিন্তু সে যত্ন সফল হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা হইয়াছে। এই যুগের দেশীয় প্রবর্ত্তক শ্রীযুত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বিদেশীয় পৃষ্ঠপোষক [কলিকাতা স্কুল অব আর্টের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ] ই, বি, হেভেল মহোদয়। ইহাঁদিগের প্রতিষ্ঠিত নব্যচিত্রকর সম্প্রদায়ের মূল সূত্র "পাশ্চাত্য চিত্রকলারীতি বর্জ্জন এবং প্রাচীন দেশীয় চিত্রকলার পুনরুজ্জীবন।" এই মহান্ উদ্দেশ্য সাধনকল্পে শ্রীযুত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তদীয় অগ্রজ শ্রীযুত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর আপনাদিগের সামর্থ্য নিয়োগ করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই, মুক্তহস্তে অর্থও ব্যয় করিতেছেন। কিন্তু ফল যাহা এ পর্য্যন্ত ফলিয়াছে, তৎসম্বন্ধে দেশীয় লোকের মধ্যে মতভেদ আছে। "যে দিন থেকে বাঙ্গালাদেশে চিত্রকলা আবার নব কলেবর ধারণ করেছে, তার পরদিন থেকেই তার অনুকূল এবং প্রতিকূল সমালোচনা সুরু হয়েছে। এবং এই মতদ্বৈধ থেকে সাহিত্যসমাজে একটি দলাদলির সৃষ্টি হবার উপক্রম

* শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় কর্ত্তৃক প্রথম উদ্ধৃত। Dawn, April, 1912.

হয়েছে।"* সাহিত্য-সমাজে [যাঁহারা মাসিক পত্রের লেখক ও পাঠক তাঁহাদের মধ্যে] এইরূপ মতদ্বৈধ। সাহিত্য-সমাজের বহির্ভূত জনসাধারণ [যাঁহারা আর্টস্টুডিওর এবং রাজা রবিবর্ম্মার চিত্রের প্রতিলিপি ক্রয় করিয়া সাগ্রহে গৃহ সজ্জিত করেন, তাঁহারা] এই নব্যতন্ত্রের চিত্রকর-গণের চিত্র সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন। এই মতদ্বৈধের এবং ঔদাসীন্যের কারণ কি? যাঁহারা নবচিত্রকলার পক্ষপাতী তাঁহারা বলেন, ইহার কারণ অপর পক্ষের অজ্ঞতা; পাশ্চাত্য রীতিতে অঙ্কিত অপকৃষ্ট চিত্রের সহিত পরিচয়ে সঞ্জাত রুচি-বিকৃতি। কেবল যে অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত লোকেই নবচিত্রকলার মাহাত্ম্য অনুভবে অসমর্থ এমন নহে, যাঁহারা সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শী এবং দেশীয় রীতিনীতির একান্ত পক্ষপাতী, এমন অনেক লোকেও নব্য চিত্রকলাকে একরূপ ঘৃণার চক্ষেই দেখিয়া থাকেন। একজন সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণপণ্ডিত বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির চিত্রশালা দেখিতে যাইবার সময়, হঠাৎ পথের মধ্যে থামিয়া, লেখককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"মহাশয়, একটি কথা। আজকাল ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতির নমুনা বলিয়া যে-সকল চিত্র প্রকাশিত হইতেছে, আপনাদের সংগৃহীত মূর্ত্তিগুলি ত সেই রকমের নয়?" এই শ্রেণীর লোকের মত উপেক্ষার বস্তু নয়।† প্রাচীন চিত্রকলাপদ্ধতি অনাদর করিবার লোক ইহাঁরা নহেন। সুতরাং প্রাচীন চিত্রকলাপদ্ধতি কি তাহা সাবধানে আলোচ্য।

বিংশ শতাব্দীতে আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ যে-মতের পরিপোষণার্থ দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, দেবপ্রতিমা গঠন বা অঙ্কন সম্বন্ধে ষোড়শ শতাব্দীর একজন বৈষ্ণব লেখকও সেই মতেরই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। গোপালভট্ট ("হরিভক্তিবিলাস", ৮। ৪) লিখিয়াছেন—

ভক্ত্যৈব ভগবন্মূর্ত্তি প্রাদুর্ভাবোঽপি চেদ্ভবেৎ।
কর্ত্তব্যোঽথাপ্যুপায়োঽত্র পূর্ব্বৈঃ সদ্ভিঃ প্রদর্শিতঃ॥

"যদিও ভক্তিবলেই ভগবানের মূর্ত্তি কল্পিত হইতে পারে, তথাপি পুরাকালের সাধুগণের প্রদর্শিত উপায়ই এক্ষেত্রে অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।"

এইরূপ ভূমিকা করিয়া গোপালভট্ট ["হরিভক্তি-বিলাসের"] "শ্রীমূর্ত্তি-প্রাদুর্ভাব" নামক অষ্টাদশবিলাসে প্রতিমা নির্ম্মাণ সম্বন্ধে বহুবিধ শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। গোপালভট্টের এই নিবন্ধ, বরাহমিহির প্রণীত "বৃহৎসংহিতা"র "প্রতিমা লক্ষণ" নামক ৫৭ অধ্যায় এবং তাহার টীকা এবং "মৎস্য পুরাণ" অবলম্বন করিয়া এই প্রবন্ধে প্রাচীন চিত্রকলারীতির পরিচয় প্রদান করিতে যত্ন করিব।

গোপালভট্টকৃত "মৎস্যপুরাণের" মতে প্রতিমা চারি প্রকার,—চিত্রজা, লেপ্যা (মৃণ্ময়ী), শাস্ত্রোৎকীর্ণা (পাষাণ বা কাষ্ঠ নির্ম্মিত) এবং পাকজা (ধাতুমূর্ত্তি)।

* "বঙ্গ সাহিত্যের নবযুগ" (বীরবল), ভারতী, আশ্বিন, ১৩২০।

† এই "সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত" মহাশয় "সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শী এবং দেশীয় রীতিনীতির একান্ত পক্ষপাতী" হইতে পারেন; কিন্তু "প্রাচীন চিত্রকলা পদ্ধতি"র সহিত তাঁহার পরিচয় কতটুকু, তাহার কোন উল্লেখ নাই। পাশ্চাত্য সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শী এবং পাশ্চাত্য রীতিনীতির একান্ত পক্ষপাতী হইলেই যেমন পাশ্চাত্য চিত্রকলা সম্বন্ধে কিছু বলিবার অধিকার জন্মে না, প্রাচ্য সম্বন্ধেও তদ্রূপ। আমরা আর দশজনের মত ইংরাজী লেখা পড়া শিখিয়াও তদ্দ্বারা ইউরোপীয় চিত্রকলা বুঝিবার সামর্থ্য লাভ করি নাই। ইংরাজী কাব্যনাটকের রসজ্ঞ হইতে হইলেও আমাদের মত সাধারণ লোকদিগকে টেন ডাউডেন আদি সমালোচকদের আশ্রয় লইতে হয়। অথচ রসায়ন, ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব গণিত প্রভৃতি বিষয়ে সুপণ্ডিত অনেক লোকও মনে করেন যে, চিত্রের রসজ্ঞ হইতে হইলে বিশেষভাবে কোন অধ্যয়ন, অনুশীলন বা চিন্তার প্রয়োজন হয় না।—সম্পাদক।

"পটে কুড্যে চ পাত্রে চ চিত্রজা প্রতিমা স্মৃতা।"

"পটে, ভিত্তিগাত্রে এবং পাত্রগাত্রে অঙ্কিত প্রতিমাকে চিত্রজা প্রতিমা বলে।" প্রতিমা সম্বন্ধে শাস্ত্রের প্রধান ব্যবস্থা, —প্রতিমার অবয়বে পরিমাণ। এই পরিমাণের মূল অঙ্ক (unit) প্রতিমার "স্বকীয় অঙ্গুল।" প্রতিমাকে যত দীর্ঘ করিবার অভিপ্রায়, সেই দৈর্ঘ্যকে ১০৮ ভাগ করিলে, প্রত্যেক ভাগকে "স্বাঙ্গুল" বা স্বকীয় অঙ্গুল বলে। এই ১০৮ স্বাঙ্গুল দৈর্ঘ্য কল্পনাপ্রসূত নয়, স্বভাবের অনুকরণ মাত্র। বরাহমিহির "পুরুষ- লক্ষণ" প্রসঙ্গে (বৃহৎ সংহিতা, ৬।১০৫) লিখিয়াছেন—

"অষ্টশতং ষণ্নবতিঃ পরিমাণং চতুরশীতিরিতি পুংসাম্।
উত্তমসমহীননামঙ্গুলসঙ্খ্যা স্বমানেন॥*

"স্বকীয় অঙ্গুল অনুসারে উত্তম পুরুষের পরিমাণ ১০৮ অঙ্গুল, মধ্যম শ্রেণীর পুরুষের পরিমাণ ৯৬ অঙ্গুল, এবং হীন পুরুষের পরিমাণ ৮৪ অঙ্গুল।"

টীকাকার ভট্টোৎপল লিখিয়াছেন,— "ভূপাদসংযোগ" হইতে "শিরোমধ্য" পর্য্যন্ত সূত্র ধরিয়া, পুরুষকে মাপিতে হইবে। গোপালভট্ট স্বাঙ্গুলের সংজ্ঞা প্রদান করিয়া "পুরাণ তন্ত্রাদি" গ্রন্থ হইতে প্রতিমাব বিভিন্ন অবয়বের পরিমাণ সংগ্রহ করিয়া দিয়া, উপসংহারে বলিয়াছেন—

"অন্যচ্চালিখিতং কার্যং লোকদৃষ্ট্যাঽখিলং বুধৈঃ।"

"এতদ্ভিন্ন যাহা এখানে লিখিত হয় নাই, পণ্ডিতগণ লোক-মধ্যে সেই সেই অঙ্গের সৌষ্ঠবাদি দেখিয়া, তাহা সম্পাদন করিবেন।" "হরিভক্তিবিলাসে"র টীকাকার "লোকদৃষ্ট্যা"র অর্থ লিখিয়াছেন, "লোকেষু তত্তদঙ্গ সৌষ্ঠবাদি দৃষ্ট্যা"।

বরাহমিহির (৫৭।১৪) শাস্ত্রোৎকীর্ণা প্রতিমার মানের সহিত চিত্রজা প্রতিমার মানের কিরূপ প্রভেদ তাহার উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হয়েন নাই। যথা—

"দ্বাত্রিংশৎপরিণাহাচ্চতুর্দশায়ামতোঽঙ্গুলানি শিরঃ।
দ্বাদশ তু চিত্রকর্ম্মণি দৃশ্যন্তে বিংশতিরদৃশ্যাঃ॥"

"প্রতিমার মস্তকের পরিধি ৩২ অঙ্গুল এবং দৈর্ঘ্যে ১৪ অঙ্গুল; চিত্রে পরিধির ১২ অঙ্গুল দেখিতে পাওয়া যায়, অপর ২০ অঙ্গুল অদৃশ্য থাকে।" চিত্রকরের জন্য গোলাকার অবয়বের বিস্তার এবং ভাস্করের জন্য পরিধির মান প্রদত্ত হইয়াছে।† প্রতিমার অঙ্গসৌষ্ঠব এবং চাহনির ও হাসির ভঙ্গি সম্পাদন বিষয়ে গোপালভট্ট "হয়শীর্ষীয়ে"র এই বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"লোকেষু লক্ষণং দৃষ্ট্বা হসিতাদি নিরীক্ষণং।
তথা তথৈব কর্ত্তব্যমূহ্যং যত্নেন দেশিকৈঃ॥"

টীকা। "লক্ষণং অঙ্গসৌষ্ঠব প্রকারং। যথা মুখস্য পূর্ণচন্দ্রাদ্যাকারেণ শ্রীনেত্রয়োশ্চ পদ্মপত্রেণ সাদৃশ্যমিত্যাদি। তত্তদঙ্গংবা কিঞ্চ। নিরীক্ষণ-মবলোকনং হসিতাদি চ দৃষ্ট্বা। তথা তেন লোকোত্তর-বিষয়ক দৃষ্টলক্ষণ-প্রকারেণ বীপ্সা তদার্ট্যার্থী তত্তল্লক্ষণঞ্চ সামুদ্রকাদ্যযুক্তং। সাক্ষাৎকস্মিংশ্চিৎ সুপুরুষে দৃশ্যমানঞ্চ জ্ঞেয়ং।"

"লোকের অঙ্গসৌষ্ঠব বা অবয়বলক্ষণ এবং হাসির এবং চাহনির ভঙ্গী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, আচার্য্য যত্নপূর্ব্বক ঠিক সেইরূপ গঠন করিবেন।"

ভারতীয় চিত্রকলা এবং ভাস্করকলা ধর্ম্মের অঙ্গ। শিল্পশাস্ত্রের বিধিনিষেধ ও ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধিনিষেধের ন্যায় পুণ্য-পাপকর এবং কল্যাণ-অকল্যাণকর। প্রতিমা অঙ্কনে কি কি নিষিদ্ধ, তাহা "মৎস্যপুরাণে" (২৫৯।১৫-২১) এই রূপে ব্যবস্থিত হইয়াছে—

"নাধিকাঙ্গানহীনাঙ্গাঃ কর্ত্তব্যা দেবতা ক্বচিৎ॥
স্বামিনং ঘাতয়েন্ন্যূনা করালবদনা তথা।
অধিকা শিল্পিনং হন্যাৎ কৃশা চৈষার্থনাশিনী॥

* শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় আমাকে এই বচনটি দেখাইয়া দিয়াছেন।

† বিস্তারের তিনগুণ পরিধি।

কৃশোদরী তু দুর্ভিক্ষং নির্মাংসা ধননাশিনী।
বক্রনাশা তু দুঃখায় সংক্ষিপ্তাঙ্গী ভয়ঙ্করী॥
*　　*　　*　　*
সম্পূর্ণাবয়বা যা তু আয়ুর্লক্ষ্মীপ্রদা সদা॥"

"দেবতার প্রতিমা কখনও অধিকাঙ্গী বা হীনাঙ্গী করিবে না। প্রতিমার বদন যদি ন্যূন বা ভয়ঙ্কর হয়, তবে স্বামীকে নাশ করে; অধিকাঙ্গী প্রতিমা শিল্পীকে বধ করে, কৃশাঙ্গী প্রতিমা অর্থনাশ করে। কৃশোদরী প্রতিমা দুর্ভিক্ষ উৎপাদন করে এবং অস্থিচর্ম্মসার (মাংসহীন) প্রতিমা ধন নাশ করে। যে প্রতিমার নাসা বক্র তাহা দুঃখ উৎপাদন করে, এবং যে প্রতিমা সংক্ষিপ্তাঙ্গ তাহা ভয়োৎপাদন করে। * * * যে প্রতিমা সম্পূর্ণাবয়বা তাহাই সর্ব্বদা আয়ু এবং ধনবৃদ্ধি করে।"

প্রতিমাকে কান্তি-বিলাস-বিভ্রমময়ী করিতে হইলে কোন্ রীতির অনুসরণ করিতে হইবে, এই-সকল শাস্ত্রবচনে তাহাই বিহিত হইয়াছে। দুইদিক দেখিয়াই এই-সকল নিয়ম প্রণীত হইয়াছে। একদিক্, নিসর্গনিষ্ঠা (fidelity)—সুপুরুষের অবয়বে এবং মুখভঙ্গীতে যাহা কিছু শোভন তাহার অনুকরণ। কিন্তু সুপুরুষের সমুদয় সুলক্ষণ একাধারে কেবল সামুদ্রিক শাস্ত্রেই দেখা যায়, লোক-সমাজে অতি বিরল। সুতরাং সর্ব্বপ্রকার সন্নিবেশে অবস্থাকেও কতকটা কল্পনার কার্য্য (ideality) বলিতে হইবে। নিসর্গনিষ্ঠা এবং কল্পনা (fidelity এবং ideality) এই উভয়ের সমন্বয় সাধনই আমাদের চিত্রকলার সৌন্দর্য্যসৃষ্টির আদর্শ, তাই শকুন্তলার বর্ণনা করিতে গিয়া, মহাকবি লিখিয়াছেন—

"চিত্রে নিবেশ্য পরিকল্পিত সত্ত্বযোগ।"
"পটেতে লিখিয়া আগে বিধাতা করেছে পরে জীবন সঞ্চার।"

শিল্পশাস্ত্রে প্রতিমার অবয়ব-কান্তি-সম্পাদনের নিয়ম সংস্থাপিত হইয়াছে, কি নিয়মে প্রতিমাকে "ভাবাঢ্য" করিতে হইবে তাহার কোন ব্যবস্থা নাই এবং থাকিতেও পারে না। ভাবাঢ্যতা বা সত্ত্বযোগ-পরিকল্পনা সৃষ্টিক্ষম প্রতিভার কার্য্য। কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে সেরূপ প্রতিভার বিকাশ অসম্ভব। শিল্পী কিরূপ শিক্ষা-দীক্ষা-সম্পন্ন হইবেন এবং কি প্রণালীতে কার্য্যারম্ভ করিবেন গোপালভট্টধৃত মৎস্য পুরাণের নিম্নোক্ত বচনে তাহা বিবৃত হইয়াছে—

"বিবিক্তে সংবৃতে স্থানে স্থপতিঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
পূর্ব্ববৎ কালদেশজ্ঞঃ শাস্ত্রজ্ঞঃ শুক্লভূষণঃ॥
প্রযতো নিয়তাহারো দেবতাধ্যানতৎপরঃ।
যজমানানুকূল্যেন বিদ্বান্ কর্ম্ম সমাচরেৎ॥
*　　*　　*　　*
শুক্লৈর্গন্ধৈশ্চ পুষ্পৈশ্চ দ্রব্যং সংপূজ্য ভক্তিতঃ।
স্বস্তিবাচন কং কৃত্বা প্রতিমাং সংবিভাজয়েৎ॥

"সংযতেন্দ্রিয়, দেশকালজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ, মিতাহারী, দেবতাধ্যানতৎপর, বিদ্বান, শুক্লবসন শিল্পী (স্থপতি) যত্নবান হইয়া যজমানের কল্যাণের নিমিত্ত আবৃত নির্জ্জন স্থানে কার্য্য করিবে। * * শ্বেতচন্দন এবং শ্বেত পুষ্পের দ্বারা দ্রব্যকে (শিলা বা পটাদি উপাদান) ভক্তিভরে পূজা করিয়া স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক প্রতিমাকে বিভাগ করিবে।"

ভারতীয় চিত্রকলাপদ্ধতি সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার অতি সংক্ষিপ্ত সারমর্ম্ম মাত্র প্রদত্ত হইল। ষোড়শ শতাব্দীতে মোগলচিত্রকলার অভ্যুদয়ের সমসময়ে এই রীতিই যে যথাসম্ভব অনুসৃত হইত, গোপালভট্টের নিবন্ধই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। এই রীতির ফলে ভারতীয় চিত্রকলা এবং ভাস্করকলা কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিল, সে সম্বন্ধে দুই চারিটি প্রমাণ দিব। ভারতের চিত্রকলার ইতিহাসে প্রথম স্থান অজন্টার গুহা-চিত্রাবলীর। মিসেস্ হেরিংহাম (Mrs. Herringham) প্রতিলিপি প্রস্তুত করিবার জন্য তথায় গমন করিয়াছিলেন। শ্রীযুত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যয়ে এবং তাঁহার নেতৃত্বে শ্রীযুত সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং শ্রীযুত অসিতকুমার হালদার অজন্টার গুহা-চিত্রের প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়াছেন। মিসেস্ হেরিংহাম বলেন, অজন্টাচিত্রের, (The outline is in its final state

firm but modulated and realistic) বাহ্যরেখা সমাপ্তিকালে দৃঢ়তার সহিত অঙ্কিত অথচ ঢলঢল-ভাবময় এবং স্বভাবসঙ্গত।* মিসেস্ হেরিংহাম ১৭নং গুহায় অঙ্কিত চিত্র সম্বন্ধে বলেন†—

"Further, in Cave 17 there are three paintings by one hand very different from all the rest They are (1) a hunt of lions and black buck; (2) a hunt of elephants, and (3) an elephant salaaming in a king's court—the companion picture to No.2 These pictures are composed in a light and shade scheme which can *scarcely be paralled in Italy before the seventeenth century. They are nearly monochrome (warm and cool greys understood), except that the foliage and grass are dull green. The whole posing and grouping is curiously natural and modern, the drawing easy, light and sketchy and the painting suggestively laid in with solid brush strokes—in the flesh, not unlike some modern French painting. The animals—horses, elephants, dogs and black buck—are extremely well-drawn*".

অর্থাৎ ১৭ নং গুহায় একই হাতের অঙ্কিত তিনখানি ছবি আছে। এই তিনখানি চিত্র অজণ্টার অন্যান্য চিত্র হইতে স্বতন্ত্র। প্রথম চিত্রেব বিষয় সিংহ এবং কৃষ্ণমৃগ শিকার; দ্বিতীয়, হাতী শিকার; তৃতীয়, একটি হাতী রাজদরবারে নমস্কার করিতেছে। এই চিত্রগুলিতে আলো ও ছায়া যথাবিধি পাশাপাশি রাখিয়া বর্ত্তুলাকৃতি দেখান হইয়াছে। আলো ও ছায়ার এরূপ সমাবেশ সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী ইতালীয় কোন চিত্রে দেখা যায় না। চিত্রিত বিভিন্ন প্রাণীর অবয়ববিন্যাসভঙ্গী এবং সমষ্টির সমাবেশভঙ্গী স্বাভাবিক এবং আধুনিক চিত্রকলা-সম্মত। অনেকানেক বিষয়ে এই সকল চিত্র আধুনিক ফরাসী চিত্রের সহিত তুলনীয়।

এই তিনখানি চিত্র কোনও বিদেশীয় চিত্রকরের কৃত বলিয়া অনুমান করা যায় না, কেননা তৎকালে ভারতবর্ষের বাহিরে এরূপ উচ্চ অঙ্গের চিত্র অঙ্কিত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। এই-সকল চিত্রের প্রধান গুণ স্বাভাবিকতা এবং তজ্জন্য আলো ও ছায়ার সুসমাবেশ। শাস্ত্রে দেবতা অঙ্কনের রীতি বিহিত হইয়াছে, মনুষ্য পশু পক্ষী প্রভৃতি অঙ্কনের রীতি উক্ত হয় নাই। দেবপ্রতিমা অঙ্কনের রীতি-প্রসঙ্গে শাস্ত্রকারগণ যেরূপ নিসর্গনিষ্ঠা দেখাইয়াছেন তাহাতে মনে হয় লৌকিকচিত্র অঙ্কনে নিসর্গই চিত্রকরের আদর্শ বলিয়া গণ্য হইত। নিসর্গানুসরণরীতির চরমোৎকর্ষ অজন্তার এই ১৭ নং গুহায় তিনখানি চিত্রে দৃষ্ট হয়। তৎকালে এইরূপ স্বভাবসম্মত-লৌকিকচিত্র-অঙ্কন-ক্ষম অনেক চিত্রকরই যে ভারতবর্ষে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল ভাস, কালিদাস, হর্ষ, ভবভূতি প্রভৃতি কবিগণের নাটকসমূহে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কালিদাসের "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্" নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কে ভারতীয় লৌকিক চিত্রকলারীতির কিছু আভাস পাওয়া যায়। ধীবর হইতে প্রাপ্ত স্বীয় অঙ্গুরীয় দর্শন করিয়া, দুষ্মন্তের স্মরণ হইয়াছে, তিনি যথার্থই শকুন্তলাকে গোপনে বিবাহ করিয়াছিলেন, এবং নিরপরাধিনীর প্রত্যাখ্যানজনিত পশ্চাত্তাপ তাঁহার হৃদয়কে দগ্ধ করিতেছে। দুষ্মন্ত স্বহস্তে চিত্রফলকে শকুন্তলার একখানি প্রতিকৃতি লিখিয়াছেন। তিনি বিদূষকের সহিত মাধবীমণ্ডপে বসিয়া বিলাপ করিতেছেন, এমন সময় চতুরিকা চিত্রফলহস্তে প্রবেশ করিয়া "চিত্রগতা" শকুন্তলাকে দেখাইলেন। অমনি বিদূষক বলিয়া উঠিলেন—

"সাধু বয়স্য! মধুরাবস্থানদর্শনীয়ঃ ভাবাননুপ্রবেশঃ। স্খলিত ইব মে দৃষ্টিঃ নিম্নোন্নতপ্রদেশে।"

"সাধু সাধু! সুবিনাস্ত অঙ্গে ভাবের অভিব্যঞ্জন সুন্দর হইয়াছে। (সমতল চিত্রফলকে) অবয়বের নিম্ন

* *Festival of Empire, Indian Section Guide and Catalogues* P. 29.

† Quoted in V. A Smith's *A History of Fine Art in India and Ceylon*, Oxford, 1911, Pp. 293-294

এবং উন্নত অংশগুলি এমন সুন্দর করিয়া দেখান হইয়াছে যে প্রকৃত নিম্নোন্নত প্রদেশ দেখিবার সময় যেমন নেত্রগোলকের গতিস্খলন হয় এই চিত্রদর্শনের সময়েও সেইরূপ দৃষ্টিস্খলন হইতেছে।"

আলো ও ছায়ার সম্যক্ সমাবেশ ভিন্ন কি চিত্রের নিম্নোন্নত প্রদেশে দৃষ্টিস্খলন সম্ভব? এই চিত্র বর্ণনা যে কালিদাসের কল্পনাপ্রসূত নয়, অজণ্টার ১৭ নং গুহার তিনখানি চিত্র তাহার সাক্ষী। কালিদাস স্বচক্ষে ওরূপ অনেক চিত্র দেখিয়াছিলেন বলিয়াই লিখিতে পারিয়াছেন,—"স্খলতি ইব মে দৃষ্টিঃ নিম্নোন্নতপ্রদেশে!" বিদূষকের এই প্রশংসাবাক্য বিরহবিধুর দুষ্মন্তের হৃদয়ের ব্যথা যেন একটু অপসারিত করিল। দুষ্মন্ত সুনিপুণ শিল্পিসুলভ বিনয় সহকারে বলিলেন—

"যদ্‌যৎ সাধু ন চিত্রে স্যাৎ ক্রিয়তে তত্তদন্যথা।
তথাপি তস্য লাবণ্যং রেখয়া কিঞ্চিদন্বিতম্॥"

"যাহা চিত্রে অবিকল অঙ্কিত করা যায় না তাহা অন্য প্রকারে অঙ্কিত করিতে হয়। তথাপি তুলিকার রেখার দ্বারা তাঁহার লাবণ্য কথঞ্চিৎ প্রকাশিত হইয়াছে।"

চিত্রখানি অর্দ্ধলিখিত হইয়াছিল মাত্র। তাই দুষ্মন্ত চতুরিকাকে বর্ত্তিকা (তুলিকা) আনিতে পাঠাইলেন। বিদূষক সেই অবসরে জিজ্ঞাসা করিলেন, —"আর কি লিখিতে বাকী আছে?" রাজা উত্তর করিলেন—

"কার্য্যা সৈকতলীনহংসমিথুনা স্রোতবহা মালিনী।
পাদাস্তামভিতো নিষন্নহরিণা গৌরীগুরোঃ পাবনাঃ।
শাখালম্বিতবল্কলস্য চ তরো র্নিম্মাতুমিচ্ছাম্যধঃ
শৃঙ্গে কৃষ্ণমৃগস্য বামনয়নং কণ্ডূয়মানাং মৃগীম্॥"

"হংসমিথুন-সুশোভিতা তটশালিনী মালিনী নদী লিখিতে হইবে; মালিনীর উভয়পার্শ্বস্থ মৃগদলমণ্ডিত হিমাদ্রি পবিত্র পাদদেশ লিখিতে হইবে। যাহার শাখা হইতে (মুনিজনের পরিধেয়) বল্কল ঝুলিতেছে এইরূপ তরুর অধোদেশে কৃষ্ণমৃগের শৃঙ্গে মৃগী বামনয়ন কণ্ডূয়ন করিতেছে এইরূপ চিত্র নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা করি।"

কালিদাস এস্থলে যেরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য Landscape অঙ্কনের প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা যথাযথ অঙ্কিত করিতে হইলে, বিভিন্ন বস্তুর দূরত্ব এবং আপেক্ষিক আকার (Perspective) প্রদর্শন আবশ্যক। কালিদাসের এই একটি শ্লোকই সাক্ষ্য দান করিতেছে, যথাযথ প্রাকৃতিক দৃশ্য লিখিবার জন্য ভারতীয় চিত্রকর কিরূপ যত্নবান্ ছিলেন; কতদূর সফলকাম হইয়াছিলেন, নিদর্শনাভাবে, তাহা বলা কঠিন। চীনদেশীয় চিত্রকরগণ প্রাকৃতিক দৃশ্য লিখনের নৈপুণ্য কতক পরিমাণে হয়ত ভারতশিল্পীর নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। চীনদেশের দৃশ্যচিত্রে আলো ও ছায়া সন্নিবেশের চেষ্টার কোনও চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। তাই বলিয়া চীনচিত্রকরের শিক্ষাগুরু ভারতশিল্পীও সে বিষয়ে উদাসীন ছিলেন এরূপ অনুমান সমীচীন নহে।

অজন্তার ১৭ নং গুহার চিত্র এবং কালিদাসের শকুন্তলা প্রায় একই কালের সৃষ্টি। ভারতের শিল্প-সাহিত্যবিজ্ঞানের এবং সার্ব্বভৌম রাষ্ট্র-সংস্থানের সেই গৌরবময় যুগের শেষ সীমায় ভবভূতি দণ্ডায়মান। ভবভূতির সময়ে কিরূপ উচ্চ অঙ্গের চিত্র লিখিত হইত 'উত্তররামচরিতের' চিত্র-দর্শন-নামক প্রথম অঙ্কই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। যে সময়ে ভবভূতি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন তাহার পর শতাব্দীতে (খৃষ্টীয় নবম শতাব্দে) গৌড়াধিপ ধর্ম্মপাল এবং দেবপালের রাজত্বকালে বরেন্দ্র দেশে ধীমান এবং বিতপাল নামক দুইজন প্রতিভাশালী শিল্পী প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। বিতপাল ধীমানের পুত্র। উভয়ে চিত্রজা, পাকজা, এবং শাস্ত্রোৎকীর্ণা, এই ত্রিবিধা প্রতিমা নির্ম্মাণেই পটু ছিলেন, এবং সারা বাঙ্গালা, মগধ, এবং নেপালের শিল্পীগণ ইহাঁদিগকে গুরুপদে বরণ কবিয়াছিলেন। ধীমান এবং বিতপাল যে কলারীতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন বৌদ্ধ নরপালগণের সময় তাহা অক্ষুণ্ণ ছিল, বৈষ্ণব বর্ম্ম-বংশের এবং সেন-বংশের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অধঃপতনের

সূত্রপাত হইয়াছিল, এবং মুসলমান বিজয়ের ফলে বিলুপ্ত হইয়াছিল। ইহাই তারানাথের প্রদত্ত বাঙ্গালার শিল্পেতিহাসের সার মর্ম্ম।

এ পর্য্যন্ত বাঙ্গলা দেশে ধীমানের ও বিতপালের প্রতিষ্ঠিত রীতিতে অঙ্কিত পাল ও সেন নরপালগণের সময়ের চিত্রজা প্রতিমার কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় নাই, কিন্তু শাস্ত্রোৎকীর্ণা অনেক পাষাণ-প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে। এই-সকল প্রতিমা সম্পূর্ণাঙ্গ (statue in round) নহে, প্রস্তরফলকে আংশিকভাবে উৎকীর্ণ (relief sculpture) এক প্রকার অর্দ্ধচিত্র (half drawing)। এইরূপ দুইখানি পাষাণ-প্রতিমার চিত্র হইতে বাঙ্গলার প্রাচীন শিল্পরীতির কথঞ্চিৎ পরিচয় দিতে যত্ন করিব।

প্রথম চিত্র, সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মার প্রতিমা। প্রতিমাখানি বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীযুত যামিনীকান্ত মুন্সী রাজসাহী জেলার তানোর থানার অন্তর্গত বারোপুটা গ্রাম হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। হেমাদ্রির "ব্রতখণ্ডে" "বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর" হইতে ব্রহ্মার মূর্ত্তির এই বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে—

"ব্রহ্মাণং কারয়েদ্বিদ্বান্ দেবং সৌম্যং চতুর্ভুজম্।
বদ্ধ পদ্মাসনস্তুষ্টং তথা কৃষ্ণাজিনাম্বরম্॥
জটাধরং চতুর্বাহুং সপ্তহংসরথস্থিতং।
বামে ন্যস্তেতরকরস্তস্যৈকন্দোর্যুগং ভবেৎ (?)॥
এতস্মিন্ দক্ষিণে পাণাবক্ষমালা তথা শুভা।
কমণ্ডলুং দ্বিতীয়েচ সর্ব্বাভরণধারিণম্॥
সর্ব্বলক্ষণযুক্তাস্যং শান্তিরূপস্য পার্থিব।
পদ্মপত্রদলাগ্রাভং ধ্যানসংমিলিতেক্ষণম্।
অর্চ্চায়াঙ্কারয়েদ্দেবং চিত্রে বা বাস্তুকর্ম্মাণি॥

"মৎস্য পুরাণে" (২৬০।৪০) ব্রহ্মার প্রতিমা নির্ম্মাণের যে ব্যবস্থা আছে তাহাতে বাহন সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, "হংসারূঢ় ক্বচিৎকার্য্য, ক্বচিচ্চ কমলাসন।" আমাদের চিত্রের ব্রহ্মামূর্ত্তি শাস্ত্রানুরূপ নহে। শিল্পীর স্বাধীন রুচি এই বৈষম্যের কারণ। তথাপি চিত্রের ব্রহ্মায় শাস্ত্রমতে ব্রহ্মার যাহাতে ব্রহ্মাত্ব তাহা আশ্চর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। শিল্পীর অবয়ব-গঠন-কৌশল উচ্চ অঙ্গের না হইলেও অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। দক্ষিণ নিম্ন হস্তের জপের মালা যেন চলিতেছে। সমগ্র প্রতিমায় সৌম্যতা এবং শান্তিরূপ সুন্দর প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু শিল্পীর প্রতিভার প্রধান পরিচয়স্থল তিনখানি মুখ (চতুর্থ অদৃশ্য)। তিনখানি মুখই "ধ্যানসংমিলিতেক্ষণ", এবং অপার্থিব সুষমামণ্ডিত। এই তিনখানি মুখের দিকে তাকাইলে, মনে হয়,—

"ঐ দেখা যায় আনন্দধাম ভবজলধির পারে
জ্যোতির্ম্ময়;
কত যোগীন্দ্র ঋষিমুনিগণ না জানি কি ধ্যানে মগন"—

যেন সেই আনন্দধামের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। হিন্দুশিল্পী গ্রীক শিল্পীর মত পৌত্তলিক ছিলেন না। হিন্দু শিল্পীর নির্ম্মিত প্রতিমা অজ্ঞানের উপাস্য পুত্তলিকা নয়, যিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ তাঁহার উদ্দেশ্যে আত্মজ্ঞান-পরিস্ফুট প্রেমপুষ্পাঞ্জলি! ব্রহ্মার পারিপার্শ্বিক সাবিত্রী এবং সরস্বতীর মূর্ত্তি গঠনে শিল্পী তেমন কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। বাহন হংস স্বভাবসম্মত না হইলেও সু- কৌশলে উৎকীর্ণ, যেন ধীরে ধীরে হংস-গতি চলিয়া যাইতেছে।

দ্বিতীয় চিত্র, বিষ্ণুর প্রতিমা। এই প্রতিমাখানি ভগ্ন হইলেও দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত যোগীগুম্ফার মন্দিরে এখনও পূজিত হইতেছে। প্রতিমার জানুর নিম্নভাগ অযত্নে উৎকীর্ণ, কারণ এই অংশ মন্দিরের বহির্ভাগস্থ দর্শকের দৃষ্টিগোচর হইত না। এই বিষ্ণুপ্রতিমার সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে হইলে পদদ্বয় উপেক্ষা করিয়া উর্দ্ধভাগে চিত্তসংযোগ করিতে হইবে। প্রতিমার মুখ যেমন কান্ত তেমন ভাবাঢ্য। এই প্রসন্ন গম্ভীর মুখমণ্ডলে জগৎমাতার বিশ্বজনীন প্রীতি এবং ন্যায়পরতা সুন্দররূপে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। হস্তচতুষ্টয়, বক্ষঃস্থল এবং কটিদেশ গঠনে শিল্পী অত্যাশ্চর্য্য স্বভাবানুকরণসামর্থ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। এই অনুকরণে খুঁটিনাটি উপেক্ষিত হইয়া প্রতি অঙ্গে অপার্থিব কমনীয়তা সংক্রামিত করিয়াছে। শান্তিদ দক্ষিণনিম্ন হস্ত যথার্থই যেন শান্তিধারা ঢালিতেছে। আজানুলম্বিনী বনমালা বনফুলের মালার মতই

এলাইয়া পড়িয়াছে। এই "সৌম্যরূপঃ সুদর্শনঃ" প্রতিমায় শাস্ত্রজ্ঞ এবং দেবতাধ্যানতৎপর শিল্পী—

"লোকেষু লক্ষণং দৃষ্ট্বা হসিতাদি নিরীক্ষণং
তথা তথৈব"—

গড়িয়া তুলিয়াছেন।

হেভেলও ভারতীয় ভাস্করকলার মূলে এই নিসর্গনিষ্ঠা লক্ষ্য করিয়াছেন। যাঁহারা বলেন হিন্দুহৃদয়ে নিসর্গ প্রেমের অভাব বশতঃ হিন্দুস্থানে ললিতকলা অভ্যুদয়ের অবসর পায় নাই তাঁহাদের উত্তরে হেভেল বলেন—

"The sculptor who carved the great bull at Mamallapuram and elephants at Kanarak were as perfect master of their art as the Greeks. Both the realism of such works as these and the idealism of the sublime Buddha at Anuradhapura, of the four-armed Siva of the Madras Museum, or of the Four-headed Brahma at Leyden proceed from a reverent and profound study of nature, and neither the one nor the o her could have been achieved without it."*

"যে-সকল ভাস্কর নামল্লপুরের বৃহৎ বৃষ এবং কণারকের হস্তী উৎকীর্ণ করিয়াছেন তাঁহারা শিল্পনৈপুণ্যে গ্রীকগণের সমকক্ষ ছিলেন। এইরূপ মূর্ত্তির স্বাভাবিকতা এবং অনুরাধপুরের বুদ্ধমূর্ত্তির, মান্দ্রাজের যাদুঘরের চতুর্ভুজ শিবের, এবং লেডেনের চতুর্মুখ ব্রহ্মা-মূর্ত্তি কল্পনা-কৌশল এতদুভয়ই শ্রদ্ধাপূর্ণ এবং গভীর নিসর্গনিষ্ঠার ফল। নিসর্গনিষ্ঠা ব্যতীত স্বাভাবিকতা অথবা কল্পনাকৌশল দুটীর একটিও আয়ত্ত করা যাইত না।"

মুসলমানবিজয়ের পরবর্ত্তী সার্দ্ধ তিনশত বৎসরের হিন্দুস্থানের চিত্রকলার ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে সম্রাট্ আকবরের যত্নের ফলে মোগল চিত্রকলার অভ্যুদয় এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে সাহজাহাঁর সময় ইহার পূর্ণ পরিণতি। মোগলচিত্রকলার লাবণ্য এখন সর্ব্বত্রই আদরলাভ করিয়াছে, সুতরাং এস্থানে তাঁহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। মোগলচিত্রকলা বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় চিত্রকরের আদর্শ হইতে পারে কি না ইহাই আলোচ্য। চিত্রকলা আমাদিগের কি উপকার সাধন করিতে পারে; হয়শীর্ষের ভাষায় চিত্র মানুষকে ভগবানের সান্নিধ্যে লইয়া যাইতে পারে ("অতঃ সান্নিধ্যমায়াতি চিত্রজাদু জনার্দ্দনঃ")—মানুষের হৃদয়ে, নামে ভক্তি জীবে দয়া সঞ্চারিত করিতে পারে—অসম্পূর্ণ মানুষকে পূর্ণতার দিকে চালিত করিতে পারে। কিন্তু মোগলচিত্রকলা বিলাসীর ভোগের বস্তু, ত্যাগীর বা যোগীর কেহ নয়; চিত্তহারী হইলেও উচ্চভাবোদ্দীপক নয়; ইহার ভিতর দিয়া উদ্দাম কল্পনা এবং গভীর আধ্যাত্মিকতা প্রকাশ পাইতে পারে নাই।*

তারপর অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু চিত্রকলা। ডাক্তার কুমারস্বামী ইহার নাম রাখিয়াছেন "রাজপুত চিত্রকলা," এবং ভাবাঢ্যতায় মোগল চিত্রকলা অপেক্ষা ইহাকে উচ্চতর স্থান দান করিয়াছেন। কিন্তু পুরাতনের সহিত তুলনায় রাজপুত

* Havell, *the Ideals of Indian Art*, London, 1911, pp. 162-163

* "The dominant themes in the art of the Period (Mogul Period) were therefore not religions, but the romance of love and of war, the legends of Musalman and Rajput chivalry, the pageantry of state ceremonial and portraiture"—*The Ideals of Indian Art*, p. 141.

"On the whole, study of the multitude of examples of the outturn of Indo-Persian or Mughul school leaves the impression on my mind that its place in the art history of the world is that of a minor, not a major art. The best examples are charming, pretty, graceful, and so forth, but lack greatness. They are all too small to possess the dignity and breadth of large pictures, while they rarely display much imaginative power, and never, hardly ever, any serious religions emotion" V. A. Smith, *A History of Fine Art in India and Ceylon*, p. 497.

চিত্রকলার স্থান কোথায়? এ স্থলে হেভেলের মত উদ্ধৃত করিলেই যথেষ্ট হইবে। যথা—

"From the sixteenth century the creative impulse in Hindu art began to diminish, though its technical traditions have maintained their vitality down to modern times."†

"ষোড়শ শতাব্দী হইতে হিন্দু শিল্পের সৃষ্টিক্ষমতা হ্রাস হইয়া আসিতেছে। যদিও হিন্দুশিল্পের বহিরঙ্গ-রচনা-রীতি-বিষয়ক সংস্কার অদ্যাপি সজীব রহিয়াছে।"

উপসংহারে বাঙ্গালার নব্য চিত্রকলার কথা। কিন্তু আশ্বিনের এবং কার্ত্তিকের "প্রবাসী" ও "ভারতী" পত্রে প্রকাশিত বাদানুবাদের পরে সকলে আমাকে নব্য চিত্রকলার নিরপেক্ষ সমালোচনার অধিকারী বলিয়া স্বীকার করিতে চাহিবেন কি না সন্দেহ। আমিও এ প্রবন্ধে সেই চেষ্টা করিব না। চিত্রকলা অনুভবের সামগ্রী। সুতরাং এ বিষয়ে আমি যাহা অনুভব করিয়াছি তাহা বলিলে ক্ষতি নাই। কলিকাতার ওরিয়েণ্টেল আর্ট সোসাইটীর একজন নব্যচিত্রকলানুরাগী সদাশয় সাধক সদস্যকে কিছুদিন পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "বলুন ত, ভারতের প্রাচীন চিত্রকলার এবং ভাস্করকলার মহিমা উপভোগ করিতে পারি, কিন্তু নব্য চিত্রকলা বুঝিতে পারি না কেন?" যাঁহাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম তিনি বচনবাগীশ নহেন, সুতরাং কথা কহিয়া আমাকে নিরস্ত করিতে চাহিলেন না, কিন্তু ব্যথিত হইলেন। আমিও সুজনের প্রাণে ব্যথা দিয়াছি বলিয়া কিছু সন্তপ্ত হইলাম। তারপর "প্রাণপ্রতিষ্ঠা" (ভারতী, আশ্বিন, ৫৮৮-৫৯১ পৃঃ) পাঠ করিয়া নব্যচিত্রকলার প্রাণের কথা জানিতে পারিলাম। সে কথা, 'বিষ্ণুর চার হাতের পরিচয় ততটা প্রয়োজনীয় নয় যতটা বিষ্ণুমূর্ত্তি-রচয়িতার দুই হাতের বরাভয়।' এ যুগে বিষ্ণুমূর্ত্তি রচিয়াছে কে যাঁহার বরাভয় মাগিতে হইবে? আমরা তাঁহার সন্ধান পাই নাই, হেভেলও তাঁহার সন্ধান পান নাই। তাই ১৯১১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থের উপসংহারে ভবিষ্য দিকে তাকাইয়া লিখিয়াছেন—††

"For behind all this intellectual and administrative chaos there remains in India a native living tradition of art, deep-rooted in the ancient culture of Hindusim, richer and more full of strength than all the eclectic learning of the modern academies and art-guilds of Europe; only waiting for the spiritual and intellectual quickening which will renew its old creative instinct. The new impulse will come, as Emerson has said, not at the call of a legislature · it will come, as always, unannounced, and spring up between the feet of brave and earnest men.

অর্থাৎ প্রাচীন হিন্দুত্বের মধ্যে শিল্পের সজীব বীজ নিহিত রহিয়াছে। সেই জীব প্রাচীন সৃষ্টিক্ষমতা পুনরায় লাভ করিবে—এখনও করে নাই—পুনরায় লাভ করিবে, কখন-না-কখন দেশের লোকের আধ্যাত্মিক বৃত্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তি সম্যক্ জাগরিত হইবে। বাঙ্গালার এই জাগরণের উপায় কি? বাঙ্গালী যখন আধ্যাত্মিক, মানসিক, শারীরিক, সকল প্রকার বলে প্রাচ্য ভূখণ্ডে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিল—বাঙ্গালার প্রজা যখন অরাজকতা নিবারণের জন্য রাজা নির্ব্বাচন করিত, বাঙ্গালার রাজা যখন "ভোজ—মৎস্য—কুরু—যদু—যবন—অবন্তী—গান্ধার—প্রভৃতি জনপদের প্রণতিপরায়ণ নৃপতিপুঞ্জের গগনভেদী সাধুবাদের মধ্যে কান্যকুব্জের রাজপাট হইতে এক রাজা তুলিয়া দিয়া আর এক রাজা বসাইত, বাঙ্গালার শ্রমণ যখন হিমালয় লঙ্ঘন করিয়া মধ্য এসিয়ার অধিত্যকায় "ওঁ মনিপদ্মে হুঁ" মন্ত্রের বীজ ছড়াইত, এবং যে কবিতাকুঞ্জের শেষ প্রতিধ্বনি জয়দেবের "গীতগোবিন্দ", বাঙ্গালার সেই কবিতাকুঞ্জের পিকগণ যখন মধুর গম্ভীর স্বরে গান করিত—তখন বাঙ্গালার নিয়তাহার, সংযতেন্দ্রিয়, দেশকালজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ, দেবতাধ্যানতৎপর শিল্পীগণ যে স্বর্গীয় সুষমাময় নূতন জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন,

† *The Ideals of Indian Art*, p 140.

†† *Ibid*, pp. 143-144.

সাত শত বৎসরের পলি ঝাড়িয়া তাহার উদ্ধার সাধন, মন্দিরে মন্দিরে তাহার প্রতিষ্ঠা, এবং তন্ত্রমন্ত্র যোগে তাহার উপাসনা এই জাগরণের উপায়। কিন্তু হায়! "তাহার কথা হেথা কেহ ত বলে না, করে মিছে শুধু কোলাহল।"*

সম্পাদকের বক্তব্য

* রমাপ্রসাদ বাবু অজণ্টার কয়েকখানি ছবি 'স্বাভাবিক' বলিয়া তাহার উল্লেখ ও প্রশংসা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু তথাকার অধিকাংশ ছবির প্রতিলিপি পুস্তকে ও ফোটোগ্রাফে যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে সেগুলিকে ত কোন ক্রমেই 'স্বাভাবিক' বলা যায় না। অথচ হ্যাভেল প্রভৃতি সেগুলিরও প্রশংসা করিয়াছেন। ভারতের নানা স্থানে শতশত প্রাচীন প্রস্তরমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। তাহার অধিকাংশই 'অস্বাভাবিক'। অথচ হ্যাভেল প্রভৃতি যোগ্য সমালোচকগণ সেগুলির প্রশংসা করিয়াছেন। যাঁহারা ললিতকলা বুঝিতে চান, তাঁহাদের এরূপ প্রশংসার কারণ অনুসন্ধান করা উচিত। হ্যাভেল প্রভৃতির প্রশংসা যদি এক ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হয়, তাহা হইলে অন্যত্রও অন্ততঃ বিবেচ্য হওয়া উচিত। এস্থলে ইহাও বলা উচিত যে হ্যাভেল, ভগিনী নিবেদিতা, প্রভৃতি, আধুনিক বঙ্গীয় চিত্রকরগণের চিত্রের বিশেষ অনুরাগী।—সম্পাদক।

সম্পাদকের মন্তব্য। আমি যদি রমাপ্রসাদবাবুর প্রবন্ধটি বুঝিয়া থাকি, তাহা হইলে, তাঁহার মতে "স্বাভাবিকতা" (realism) মূর্ত্তির একটি উৎকর্ষলক্ষণ এবং তাঁহার উদাহৃত মূর্ত্তি দুটিও স্বাভাবিক। ঐ মূর্ত্তি দুটি (যাহাদের প্রতিলিপি প্রবন্ধের সঙ্গে দেওয়া হইল) যদি স্বাভাবিক হয়, তাহা হইলে অবনীন্দ্রবাবু এবং তাঁহার ছাত্রদের আঁকা এরূপ অনেক ছবির নাম করিতে পারি, যেগুলি ঐরূপ স্বাভাবিক।

আমি আমাদের দেশের আমার মত শিক্ষিত ব্যক্তিদের চেয়ে দেশী ও বিদেশী ছবি কম ঘাঁটিয়াছি বলিয়া বোধ হয় না। দেশীয় আধুনিক ভিন্ন ভিন্ন রীতির ছবি ছাপিয়া অর্থ—"নষ্ট" করিয়াছি এবং বিদ্রূপভাজন হইয়াছি সমুদয় ভারতবর্ষীয় সম্পাদকের চেয়ে বেশী। তাহাতে আমার চিত্রকলা সম্বন্ধে কিছু বলিবার অধিকার জন্মিয়াছে এরূপ মনে হয় না। তবে, আমার ধারণা এই হইয়াছে যে অবনীন্দ্র বাবু ও তাঁহার ছাত্রেরা চিত্রকলার প্রাণের সন্ধান পাইয়াছেন, এবং অনেকে অতি উৎকৃষ্ট ছবি আঁকিয়াছেন। সঙ্গীতনিপুণ ওস্তাদের দু একটা মুদ্রাদোষে যেমন তাঁহার গুণ ঢাকা পড়ে না, তেমনি নবীন শিল্পীদের কোন কোন ছবিতে mannerism-এর আতিশয্য থাকিলেও তাহা ধর্ত্তব্য নয়; এবং এই mannerism সব ছবিতেই আছে এরূপ মনে করা ভুল। হ্যাভেল সাহেবের মত যদি অন্য বিষয়ে গ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে, নবীন শিল্পীদের তিনি যে প্রশংসা করিয়াছেন, তাহা অবজ্ঞেয় না হইতে পারে।

আমি এক সময়ে রবিবর্ম্মা ও তাঁহার সম্প্রদায়ের গোঁড়া ছিলাম। আমার লেখা তাঁহার সচিত্র ইংরাজি জীবনচরিত এখনও বাজারে বিক্রী হয়। আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ। ৫।৬ বৎসর পূর্ব্বে ছবি সম্বন্ধে স্বর্গীয়া ভগিনী নিবেদিতার সহিত উত্তেজিত ভাবে চিঠি লিখিয়া রবিবর্ম্মার পক্ষাবলম্বনপূর্ব্বক তর্ক করিয়াছিলাম। আমার চিঠির উত্তরে সেই মনস্বিনী বত্রিশ পৃষ্ঠা এক চিঠি লিখিয়া, একটু বিবেচনার পর, তাহা আমাকে পাঠান নাই; তাঁহার এই চিঠি বোধ হয় এখনও আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের নিকট আছে। পরে স্বর্গীয়া লেখিকারই মুখে শুনিয়াছি যে তিনি এই ভাবিয়া আমাকে ইহা পাঠান নাই যে

আমি ছবি দেখিতে দেখিতে উহার মর্ম্মজ্ঞ হইব, তর্ক দ্বারা আমার চোখ খুলিবে না। মর্ম্মজ্ঞ হইয়াছি কি না, জানি না; কিন্তু এখন, তাঁহার যেরূপ ছবি ভাল লাগিত, আমিও তদ্রূপ ছবির অনুরাগী হইয়াছি।

আমার আর একটি ধারণা জন্মিয়াছে যে যেমন ছন্দঃপতন না ঘটাইয়া পদ্য লিখিতে পারিলেই কবি হওয়া যায় না, বা ছন্দে ভুল থাকিলেই কবিতার উৎকর্ষ লুপ্ত হয় না; তদ্রূপ প্রকৃত বস্তুর বা ইতর প্রাণীর বা মানুষের ভিন্ন ভিন্ন অংশের মাপ, আকার, রং, ইত্যাদি ঠিক রাখিয়া ছবি আঁকিতে পারিলেই ললিতকলাকুশল (আর্টিষ্ট) হওয়া যায় না, বা ঐসব বিষয়ে কিছু ব্যতিক্রম হইলেই চিত্রকলা হিসাবে ছবিখানা অপকৃষ্ট হইয়া যায় না। পক্ষান্তরে, ছন্দঃপতনও উৎকৃষ্ট কবির লক্ষণ নয়, "অস্বাভাবিকতা"ও উৎকৃষ্ট আর্টিষ্টের লক্ষণ নয়।

এ বিষয়ে কাহারও সহিত তর্ক করিবার ইচ্ছা নাই। আমার যাহা অভিজ্ঞতা ও মত, তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম। কেবলমাত্র স্বভাবের অনুকরণ বা বস্তুতন্ত্রতা যে আর্ট নহে, তাহা বুঝিতে আমার অনেক সময় লাগিয়াছে।

—সম্পাদক।

১৩২৭ জ্যৈষ্ঠ

আধুনিক ভারতবর্ষীয় চিত্রকলা

গতমাসের প্রবাসীতে প্রকাশিত "দেশী ও বিদেশী" প্রবন্ধে রবিবর্ম্মার গঙ্গাবতরণ ছবির এবং ধুরন্ধরের শকুন্তলা বিদায়ের কিছু দোষের উল্লেখ আছে। গঙ্গাবতরণ ছবিটি আমরাও ভাল মনে করি না। কিন্তু স্পর্দ্ধা ও শক্তির ব্যঞ্জনার জন্য পা ফাঁক করিয়া কোমরে হাত দিয়া দাঁড়ান, কেবল ইংরেজদের ভঙ্গী নয়; এদেশেও এ 'ভঙ্গী' দৃষ্ট হয়। গঙ্গাবতরণ-কালে শিবের মনে যে শুধু "প্রতীক্ষার ভাব" নয়, স্পর্দ্ধাও ছিল, তাহা মূল রামায়ণের বালকাণ্ডের ৩৪ সর্গের বর্ণনায় বুঝা যায়; যথা—জাহ্নবী "পতনকালে মনে করিলেন, আমি প্রবাহ বলে শঙ্করকে লইয়া রসাতলে প্রবেশ করিব। ব্যোমকেশ জাহ্নবীর অন্তরে এইরূপ গর্ব্বের সঞ্চার হইয়াছে বুঝিয়া, ক্রোধভরে তাঁহাকে আপনার জটাজূট মধ্যে তিরোহিত করিলেন।" শকুন্তলা-বিদায়ের ছবিতে কন্বমুনির যেরূপ পরিচ্ছদ আঁকা আছে আমরা সেইরূপ পরিচ্ছদ-পরিহিত অনেক সন্ন্যাসী দেখিয়াছি; উহা পাদ্রিদের নিকট হইতে ধারকরা নয়। "দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ" করার রীতি এবং ভঙ্গীও দেশী, বিলাত হইতে ধারকরা নহে।

দীনেশ-বাবু লিখিয়াছেন, "অবনীন্দ্র-বাবুর স্কুলের কোনো কোনো চিত্রকর বোসে বোসে তুলি ঘোষে ঘোষে ছবি নকল করছেন।" অবশ্য, অবনীন্দ্র-বাবুর কোন শিষ্যই বাঙ্গালী-জীবনের কিছু আঁকেন নাই, দীনেশ-বাবু এ কথা বলেন নাই। কিন্তু পরে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে পাঠকদের এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা হইতে পারে। এই

জন্য, স্মরণ করাইয়া দেওয়া দরকার. নন্দলাল বাবুর "পৌষ পার্ব্বণ", "বাউল", "ষষ্ঠী পূজা", গগন-বাবুর "পুরীর মন্দির দ্বারে প্রতীক্ষা", "বর্ষায়", "শ্রীচৈতন্যের গৃহত্যাগ", "শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব", সুরেন্দ্রনাথ করের "হাতে খড়ি", "পথের সাথী", "বহিন্", শ্রীমতী প্রতিমা দেবীর "গুণ-টানা", মুকুলচন্দ্র দের "গ্রহণে স্নান", সারদাচরণ উকীলের "শেষ খেয়া", প্রভৃতি বিস্তর ছবি বাঙ্গালী জীবনের ছবি। তাড়াতাড়ি যে-কটা মনে পড়িল, লিখিলাম। পূর্ণ তালিকা দেওয়া কঠিন, সে চেষ্টা করিলাম না। এই তালিকা হইতেই দীনেশ-বাবুর স্মরণ হইবে, যে, গগন-বাবু "আমাদের জীবনে" "ভাল কিছু"ও দেখিয়াছেন এবং আঁকিয়াছেন। দীনেশ-বাবু যে "যশোদা"র উল্লেখ করিয়াছেন, অসিতকুমাব হালদার, শৈলেন্দ্রনাথ দে প্রভৃতি তাঁহার ছবিও আঁকিয়াছেন।

জীবনচিত্র ও অন্য প্রসঙ্গ

প্রাসঙ্গিক কথা

বর্তমান সংকলনের নানা পর্যায়ে 'জীবনচিত্র' ছড়িয়ে আছে। ধর্ম-সমাজসংস্কার-সাহিত্য-রাজনীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলিতে যাঁরা বিশিষ্ট চরিত্র, তাঁদের চিত্রাঙ্কন রামানন্দ করেছেন। এক্ষেত্রে অবশ্যস্বীকার্য ওইসকল পর্যায়ে গৃহীত বিখ্যাত মানুষগুলির জীবনের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দিকও ছিল। যথা, শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনচিত্র আছে ব্রাহ্মসমাজ অংশে। আবার লেখকরূপেও তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। এধরনের কথা অন্য অনেক বিখ্যাত পুরুষদের সম্বন্ধে বলা যায়। তবে এমন-কিছু চরিত্র ছিলেন যাঁদের মিশ্র পরিচয়, অর্থাৎ নির্দিষ্টভাবে তাঁদের উল্লিখিত কোনো পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। সংকলনের এই অংশে তাঁদেরই গ্রহণ করা হয়েছে। জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর জীবনপ্রসঙ্গে *প্রবাসী*-র মন্তব্যে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা বাদ পড়েছে। তিনি ১৮৯৩ সালে শিকাগোয় অনুষ্ঠিত পার্লামেন্ট অব রিলিজিয়নে থিয়োজফিক্যাল সোসাইটির পক্ষে অংশ নিয়েছিলেন। সে-কথা ওই ধর্মসভায় বিখ্যাত-হয়ে-ওঠা স্বামী বিবেকানন্দের তাৎক্ষণিক চিঠিতে পাওয়া যায়।

প্রবাসী-র এক মূল্যবান অংশ—বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দেহান্ত-সংবাদ—সেইসঙ্গে প্রাসঙ্গিক তথ্য। তাদের অনেকগুলি জীবনচিত্র পর্যায়ে সংকলিত হয়েছে। কোনো কোনো ব্যক্তি আবার ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন যদি সেই পর্যায়ের বিষয়বস্তুর সঙ্গে উক্ত ব্যক্তির জীবনের ঘনিষ্ঠতর সংযোগ থাকে। যেমন, শিবনাথ শাস্ত্রীর মতো মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনচিত্র আছে ব্রাহ্মসমাজ পর্যায়ে। ওই সমাজের সংগঠনে তাঁদের ছিল বিরাট ভূমিকা। এইভাবে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনচিত্র আছে রাজনীতি পর্যায়ে। স্মর্তব্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ উৎকৃষ্ট বাংলায় আত্মজীবনী লিখেছেন, বা সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন সাংবাদিক ও শিক্ষাব্রতী। তা ছাড়া 'শিক্ষা ও সংস্কৃতি' খণ্ডে প্রচুর বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রসঙ্গ আছে।

'জীবনচিত্র' পর্যায়ে আমরা প্রধানত বিশিষ্ট বাঙালিদের সম্বন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্য ও কিছু সাধারণ তথ্য সংকলন করেছি। তা ছাড়া কয়েক জন বিশিষ্ট অবাঙালির কথাও গৃহীত হয়েছে। এঁদের কথা সম্পাদক অধিক আকারে সর্বভারতে প্রচারিত তাঁর ইংরেজি মাসিক পত্রিকা *মডার্ণ রিভিউ*-তে প্রকাশ করেছেন। অনেক খ্যাতনামা অবাঙালির কথা পাওয়া যাবে 'রাজনীতি' খণ্ডে।

বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যুর পরে শোকনিবন্ধ লেখার সময়ে রামানন্দ মোটামুটি জীবনের ইতিবাচক দিকগুলি তুলে ধরতেন—নেতিবাচক দিক বাদ দিয়ে। দৃষ্টান্ত, অ্যানি বেসান্টের রাজনৈতিক জীবনের কঠোর সমালোচনা তিনি *মডার্ণ রিভিউ* পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে করেছেন। কিন্তু *প্রবাসী*-তে তাঁর বিষয়ে মন্তব্যকালে তাঁর ভারতপ্রেম সম্বন্ধে ইতিবাচক কথাই রামানন্দ বলেন। একইভাবে লিখেছেন দীনেশচন্দ্র সেন সম্বন্ধে, যাঁর বিষয়ে রামানন্দ পূর্বে অনেক কটাক্ষ করেছেন, কিংবা প্যান ইসলাম মতে

বিশ্বাসী মহম্মদ ইসমাইল শিরাজি কিংবা স্যার মহম্মদ ইকবাল সম্বন্ধেও। ইকবাল পাকিস্তান পরিকল্পনার আদি সমর্থক।

জীবনচিত্রগুলি ভারত বিশেষত বাংলার সাংস্কৃতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে মূল্যবান উপাদান। অনেক চরিত্রই একালের স্মৃতিতে কার্যত হারিয়ে গেছে। কিন্তু ওই যুগে তাঁরা বিশিষ্ট মানুষ। ইতিহাসের ধারাবাহিক রূপেব কথা জানতে হলে ওইসকল চরিত্র সম্বন্ধে ধারণা থাকা প্রয়োজন। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, রামানন্দ শোকসংবাদ লেখার সময়ে অযথা ভাবাবেগে বিচলিত না হয়ে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের সামগ্রিক ভূমিকার পর্যালোচনা করেছেন। লেখাগুলি তথ্যপূর্ণ এবং বিচারশীল।

প্রবাসে বাঙালিদের নানা সমস্যার কথা সম্বন্ধে রামানন্দ প্রায়ই মন্তব্য করেছেন। একদা প্রবাসী রামানন্দ বিষয়টি সম্বন্ধে খুবই স্পর্শকাতর ছিলেন। উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে পাশ্চাত্য-শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙালিরা নানা প্রয়োজনে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েন। সেসব জায়গায় সামাজিক জীবনে বাঙালিদের উজ্জ্বল ভূমিকা ছিল। তাঁরা সেদিন বৃহত্তর ভারতবর্ষে সমাজসংস্কারে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনে, আইনব্যবসায়ে, রাজনৈতিক জীবনে সংগঠকের স্থান অধিকার করেছিলেন। তা স্বীকৃতও হত। কিন্তু ক্রমে যতই উদ্দিষ্ট স্থানগুলির মানুষ উপযুক্ত শিক্ষালাভ করে নিজ প্রদেশে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হলেন, ততই বাঙালিদের ভূমিকা অগ্রাহ্য করার প্রবণতা দেখা দিল। এবং বাঙালিবিদ্বেষও শুরু হয়ে গেল। স্বাধিকারপ্রতিষ্ঠার সৎচেষ্টায় রামানন্দর আপত্তি ছিল না। কিন্তু অকারণ বিদ্বেষ এবং অপরের ন্যায্য অধিকার হরণ করার প্রচেষ্টাকে তিনি সমালোচনা না করে পারেননি। এই ধরনের বেশ কয়েকটি লেখা সংকলনে আছে। তা ছাড়া জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের লেখা 'বঙ্গের বাহিরে বাঙালী' তিনি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেছেন। অতীব মূল্যবান সেই লেখায় একদা বৃহত্তর ভারতবর্ষে বাঙালিদের কর্মকীর্তির সুষ্ঠু পরিচয় মেলে। জ্ঞানেন্দ্রমোহনের প্রয়াণবার্তা দেবার পরে তিনি দীর্ঘ আকারে জ্ঞানেন্দ্রমোহন সম্বন্ধে একাধিক লেখা ছেপেছেন। এ বিষয়ে ১৩৪৬ জ্যৈষ্ঠের 'জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস ও প্রবাসী'র সম্পাদকীয় মন্তব্য দ্রষ্টব্য। লেখাটি সংকলনের 'সাহিত্য' অধ্যায়ে গৃহীত হয়েছে। জ্ঞানেন্দ্রমোহনের নানা বিষয়ের বহু বচনা *প্রবাসী*-তেই বেরিয়েছে। 'বঙ্গের বাহিরে বাঙালী' গ্রন্থাকারেও প্রকাশিত হয়। এটি সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক নথি।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাঙালির যত উচ্চাসনই থাক, শেষ পর্যন্ত জাতীয় ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি না থাকলে কোনো জাতি উন্নতি বজায় রাখতে পারে না। বাঙালি ব্যবসা-বাণিজ্যে উদাসীন, তার মূল্য তাকে দিতে হয়েছে। রামানন্দ এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন। তাই যেখানেই ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে বাঙালির কোনো কৃতিত্ব দেখেছেন, সেখানেই বিশেষ গুরুত্ব-সহ সম্পাদকীয়তে তার উল্লেখ করেছেন।

জীবনচিত্র

১৩১০ ফাল্গুন

[বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়]

জাতি বর্ণনির্ব্বিশেষে সমুদয় স্বদেশপ্রেমিক ভারতবাসীর শ্রদ্ধাভাজন মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, ডি, এল্‌ মহাশয় ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে অবসরগ্রহণ করিয়াছেন। আমরা শুনিয়াছি, প্রধানতঃ ৬০ বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়ার পর আর চাকরী করিবেন না বলিয়া তিনি রাজকার্য্য হইতে অবসর লইলেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে তাঁহার জন্ম হয়। সুতরাং অবসরগ্রহণকালে তাঁহার বয়স ৬০ বৎসর ৬ দিন হইয়াছিল। বয়ঃকনিষ্ঠদিগের জজিয়তীলাভের অন্তরায় হইতে অনিচ্ছুক হওয়া তাঁহার মত ধার্ম্মিক পুরুষের পক্ষে স্বাভাবিক।

তাঁহার দেহ দেখিতে ক্ষীণ; কিন্তু তাঁহার মানসিক বল অক্ষুণ্ণ আছে। তাঁহার শ্রমশক্তিও অসাধারণ। সুতরাং তিনি যে তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট কাল বহু পরিমাণে মাতৃভূমির সেবায় যাপন করিতে পারিবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বঙ্গে বহুনেতার ঝগড়ায় আসল দেশহিতকর কার্য্য অধিক হইতেছে না। কোন নেতা চরিত্রবান্‌ নহেন, কেহ বা নিতান্ত স্বার্থপর, কেহ স্থিরবুদ্ধি ও প্রাজ্ঞ নহেন, কেহ বা ভগ্নদেহ; বঙ্গের দশা ইত্যাকার। এমত অবস্থায় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মত ধার্ম্মিক, চরিত্রবান্‌, পরার্থপর, শান্ত, ধীরবুদ্ধি ও স্বাধীনচেতা পুরুষের নিকট যে আমরা অনেক মঙ্গলের আশা করি, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। তিনি দারিদ্র্য হইতে ঐশ্বর্য্যে উপনীত হইয়াছেন, কিন্তু কখনও কাহারও তোষামোদ করেন নাই, স্বার্থসিদ্ধির জন্য জলকে উঁচু বা নীচু বলেন নাই, সম্মানলাভের জন্য অগৌরবের কাজ করেন নাই।

গুরুদাসবাবুর পূর্ব্বপুরুষেরা বাকরগঞ্জ জেলার অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার পিতা ও মাতা উভয়েই ধর্ম্মনিরত ছিলেন। তাঁহার বয়স যখন ৩ বৎসর পূর্ণ হয় নাই, তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। জননী নানা প্রকার কষ্টের মধ্যে তাঁহাকে মানুষ করেন। কেবল সাধারণ অর্থে মানুষ করেন নাই, মানুষের মত মানুষ করেন। মাতার নিকট হইতে তিনি বিনয় ও ভগবদ্‌ভক্তি লাভ করিয়াছেন।

তিনি হেয়ার স্কুলের ছাত্র। ১৮৫৯ সালে ডিসেম্বর মাসে অর্থাৎ ১৫ বৎসর বয়স পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে তিনি এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পান এবং প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হন। তাহার পর এফ্‌, এ, বি এ ও এম্‌ এ পরীক্ষায় প্রথমস্থান অধিকার করেন। তিনি ২১ বৎসর বয়সে প্রেসিডেন্সী কলেজের সহকারী গণিতাধ্যাপক নিযুক্ত হন। ২২ বৎসর বয়সে বি এল্‌ পরীক্ষায় প্রথমস্থান অধিকার করেন। ঐ বয়সে জেনারেল এসেম্ব্লির কলেজে গণিতের অধ্যাপক হন। তাঁহার ইংরাজী পাটীগণিত এই সময়ে রচিত হয়। এই বৎসর (১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে) তিনি বহরমপুর কলেজের আইন অধ্যাপক নিযুক্ত হন, এবং সেই খানেই ওকালতী ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ১৮৭২ সালে তিনি জননীদেবীর ইচ্ছায় কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন। ১৮৭৭ সালে ডি, এল্‌ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি তাঁহার সত্যনিষ্ঠা, তীক্ষ্ণ বিচারশক্তি ও গভীর আইনজ্ঞানে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে জজের পদে নিযুক্ত করিবার জন্য গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ করেন। তদনুসারে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত

হন। তিনি তখন একজন প্রধান কংগ্রেসওয়ালা ছিলেন।

তাঁহার বিচারপতিত্ব সম্বন্ধে হাইকোর্টের উকীল ও ব্যারিস্টরগণ যাহা বলিয়াছেন, তদতিরিক্ত আর কিছু বলিবার দরকার নাই। তিনি ১৫ বৎসর ধরিয়া অসাধারণ পাণ্ডিত্য, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, স্বাধীনতা, শিষ্টাচার ও ধর্ম্মবুদ্ধি সহকারে বিচার কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। এড্‌ভোকেট জেনারেল উড্রফ্ সাহেব বলেন, "বিচারপতি রূপে তাঁহার চরিত্র আদর্শস্থানীয় ছিল, তাঁহার মক্কেলদের মধ্যে কেহই বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বিচারে অসন্তুষ্ট হন নাই। তিনি উভয় পক্ষের ব্যবহারাজীবগণের যুক্তিতর্ক পক্ষপাতশূন্য ভাবে আদ্যন্ত শুনিতেন, এবং কাহারও ভুল ভ্রান্তি ঘটিলে তাহাকে তাহা বুঝাইয়া দিতেন। তিনি সর্ব্বদা নেল্‌সনের ন্যায় কর্তব্যপালনের চেষ্টা করিতেন।" বাস্তবিক শারীরিক দুর্ব্বলতা ও পীড়া অগ্রাহ্য করিয়া সুবিচারের জন্য তাঁহার মত পরিশ্রম করিতে অল্প জজকেই দেখা যায়।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ১৮৭৮ সালে ঠাকুর আইনের অধ্যাপক ও ১৮৭৯ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য নিযুক্ত হন। ১৮৮৫ সাল হইতে ক্রমান্বয়ে চারি বৎসর তিনি সিণ্ডিকেটের সভ্য নির্ব্বাচিত হন। এই সময়ে তিনি ভারত সভার সভ্য হইয়া মাতৃভূমির কল্যাণসাধনে প্রবৃত্ত হন। ১৮৮৬ হইতে ১৮৮৮ পর্য্যন্ত তিন বৎসর কাল তিনি সহরতলীর মিউনিসিপাল কমিশনার হইয়া উহার অনেক হিতসাধন করেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্সেলর নিযুক্ত হন। দ্বিতীয়বার এই গৌরবজনক পদ পাইয়া তিনি ১৮৯২ সালে উহা ত্যাগ করেন। তাঁহারই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কোন শ্রেণীর উপাধিধারিগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য নির্ব্বাচনের অধিকার পান। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্রবে যে রূপ বিচক্ষণতার সহিত কাজ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার সহযোগী মাত্রেই অবগত আছেন।

তিনি দেশহিতকর অনেক কাজ নীরবে গোপনে করিয়াছেন। তাঁহার শেষ কীর্ত্তিটি তাঁহাকে দেশের শিক্ষিত ব্যক্তি সকলের হৃদয়ে উচ্চস্থান প্রদান করিয়াছে। তিনি ১৯০২ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সভ্য নিযুক্ত হন এবং অন্যান্য সভ্যগণের সহিত অনেক বিষয়ে এক মত হইতে না পারায় নিজের এক স্বতন্ত্র মন্তব্য লেখেন। এই মন্তব্যে একটিও কড়া কথা নাই, কিন্তু ইহার আদ্যন্ত প্রবল যুক্তিতে পূর্ণ। যখন কমিশনের অন্যান্য সভ্যগণ নানাস্থানে সাক্ষ্য লইতে লইতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখনও বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মন দিয়া, বিবেচনা পূর্ব্বক সকল সাক্ষীকে নানাবিধ প্রশ্ন করিয়াছিলেন। আমরা শুনিয়াছি যে পেড়্‌লার সাহেব এলাহাবাদে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জননী পুত্রকে বিচারপতির আসনে উপবিষ্ট দেখিয়া ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে স্বর্গলাভ করেন। এমন পুত্র রাখিয়া সংসারত্যাগ কয়জন মাতার ভাগ্যে ঘটে? গুরুদাস বাবুর মাতৃভক্তির কথা অনেকেই জানেন।

———

১৩২৫ পৌষ

সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৪ বৎসর বয়সে সজ্ঞানে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি অতি অমায়িক, নিরহঙ্কার, পণ্ডিত, হিন্দু-আচার-নিষ্ঠ, ও সচ্চরিত্র লোক ছিলেন। তিনি দরিদ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া নিজের বুদ্ধিমত্তা, সংযম ও পরিশ্রম দ্বারা বিদ্যা ও ধন অৰ্জ্জন করেন, এবং পুত্রদিগকে বিদ্যালাভের সুযোগ প্রদান করেন। তাহার ফলে তাঁহারা সকলেই মোটা মাহিনার চাক্‌রী করিতেছেন।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসমূহে সর্ব্বোচ্চস্থান লাভ করেন। হাইকোর্টে ওকালতীতে প্রতিষ্ঠালাভের পর তিনি যখন জজ নিযুক্ত হন, তখন এরূপ নিয়ম ছিল না যে হাইকোর্টের জজদিগকে ৬০ বৎসর বয়সে অবসর লইতেই হইবে। তথাপি তিনি ষাট বৎসর বয়সেই জজিয়তী ছাড়িয়া দেন। তাহার কারণ তিনটি। তিনি তাঁহার অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ যোগ্য উকীলদের জজিয়তী লাভের পথে কন্টকস্বরূপ থাকিতে ইচ্ছা করেন নাই; তিনি চাকরী হইতে অবসর লইয়া দেশের যুবকদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতির জন্য অধিকতর পরিশ্রম করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন; এবং তাঁহার এ আশঙ্কাও ছিল, যে, কি, জানি যদি বার্দ্ধক্যবশতঃ বিচারকার্য্য পূর্ব্ববৎ কর্ত্তব্যপরায়ণতার সহিত করিতে না পারেন।

তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চান্সেলার হইয়াছিলেন; এই পদে থাকিয়া এবং তাহার পরেও দেশমধ্যে বিদ্যার আলোক বিকিরণে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। লর্ড কার্জ্জনের আমলে যে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বসে, তিনি তাহার অন্যতম সভ্য নিযুক্ত হন। কমিশন সাক্ষ্যগ্রহণ উপলক্ষ্যে নানাস্থানে ভ্রমণ করেন। তৎকালে অন্যতম ইংরেজ সভ্য পেড্‌লার সাহেব বলিয়াছিলেন, আমরা সবাই যখন একই প্রশ্নের পুনঃপুনঃ উত্তর শ্রবণে এবং একই প্রকার আলোচনায় ক্লান্ত ও অমনোযোগী হইয়া পড়িতাম, তখনও বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সজাগ ও সতর্ক থাকিয়া জেরা করিতে ব্যস্ত থাকিতেন। কমিশন যখন এলাহাবাদে যায়, তখন প্রবাসীর সম্পাদক তথাকার একটি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। কমিশন ঐ কলেজ দেখিতে গেলে আমরা তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলাম, এবং গুরুদাস বাবুকে নমস্কার করিয়া বলিলাম, "আমি আপনার সহিত একবার নারিকেলডাঙায় সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম।" তিনি বলিলেন, "আপনাকে আমি চিনি", এবং এরূপ কোন কোন কথা বলিলেন, যাহাতে বুঝা গেল যে সেই সাক্ষাৎকারের কথা তাঁহার মনে আছে। তাহা তখন হইতে বহুবৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। বাস্তবিক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতিশক্তি খুব ভাল ছিল। কমিশন এলাহাবাদের পূর্ব্বোক্ত কলেজের বিজ্ঞান-অধ্যাপনার শ্রেণী, যন্ত্রাগার, লাইব্রেরী, প্রভৃতি দেখিয়া যথাকালে ছাত্রনিবাস দেখিতে গেলেন। অন্য সভ্যেরা ভাসাভাসা রকমে দেখিলেন। গুরুদাস বাবু ছাত্রদের অধ্যাপকের ব্যাখ্যা আদি টুকিবার খাতা, পাঠচর্চ্চার খাতা, পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠার পার্শ্বে লিখিত টীকা টিপ্পনী, প্রভৃতি দেখিতে লাগিলেন, এবং কাহাকেও কাহাকেও দেখাইয়া দিলেন যে তাহারা যেরূপ নোট লইয়াছে অধ্যাপক নিশ্চয়ই ঠিক্ সেরূপ বলেন নাই। এখনও মনে পড়িতেছে, তিনি

কয়েকজন ছাত্রকে coefficient কথাটির বানান জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; কারণ সম্ভবতঃ কাহারও কাহারও খাতায় উহার ভুল বানান দেখিয়াছিলেন। প্রশ্নের উত্তরেও একজন কি দুজন ভুল করিয়াছিল বলিয়া মনে পড়িতেছে। এইরূপ স্মরণ হইতেছে, কমিশনের এলাহাবাদে সাক্ষ্যগ্রহণের সময় গুরুদাস বাবুর সম্বর্দ্ধনার জন্য মাননীয় জজ প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাংলার হাতায় একটি সান্ধ্যসমিতির আয়োজন হইয়াছিল। তাহার একটি ক্ষুদ্র ঘটনা মনে পড়িতেছে। গুরুদাস বাবু একান্তে মৃদুস্বরে এই লেখককে জিজ্ঞাসা করিলেন, Mr. S. Sinha (ব্যারিষ্টার মিঃ সচ্চিদানন্দ সিংহ) কি বাঙালী? অনুমান করি, জিজ্ঞাসার কারণ এই, যে, মিষ্টার সিন্‌হা বাঙালী হইলে উহাঁর সহিত তিনি বাংলাতেই কথা বলিবেন, এবং যদি তিনি বাঙালী না হন তাহা হইলে ইংরেজীতে কথা বলিবেন, এবং এমন কিছু বলিবেন না যাহা কেবল বাঙালীরই শ্রবণ ও আলোচনার যোগ্য। কারণ গুরুদাস বাবু দেশী ও বিলাতী পোষাক পরিহিত সব বাঙালীর সঙ্গে বাংলাই বলিতেছিলেন।

কমিশনের অধিকাংশ সভ্যের সহিত গুরুদাস বাবুব কতকগুলি প্রধান বিষয়ে মতভেদ হওয়ায় তিনি একটি স্বতন্ত্র মন্তব্য লেখেন। উহা রিপোর্টে প্রকাশিত হয়। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র যাহাতে সংকীর্ণতর না হয়, এই মন্তব্যে গুরুদাস বাবু সুযুক্তি সহকারে তাহার চেষ্টা করেন। এই মন্তব্যটি লর্ড কার্জন পছন্দ করেন নাই; শুনিয়াছি এই জবর্‌দস্ত লাট এক গোপনীয় মন্তব্যে এ কথা লেখেন যে তিনি গুরুদাসবাবু এবং তাঁহার অযোগ্য মক্কেল কলিকাতার ছাত্র (and his unworthy client the Calcutta student)-কে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন না। (না দেখিবারই কথা; কুমৎলবে বাধা পড়িলে কে কবে বিঘ্নোৎপাদককে সম্মান করিয়া থাকে?) সংবাদপত্রে কর্জনের মন্তব্যের কথা প্রকাশিতও হইয়াছিল; কিন্তু সর্‌কার পক্ষ হইতে কোন প্রতিবাদ হয় নাই। যাহা হউক, গুরুদাস বাবুর এই স্বতন্ত্র মিনিট দ্বারা দেশের কিছু উপকার হইয়াছিল। তিনি সাধারণতঃ রাজপুরুষদের মতের বা কার্য্যের বিরুদ্ধে কিছু বলিতেন না, বা করিতেন না।

আমাদের মনে পড়ে, যৌবনকালে (বোধ হয় ২৮ বৎসর পূর্ব্বে) যখন তাঁহার নারিকেলডাঙার বাড়ীতে দেখা করিতে যাই, তখন পাশ্চাত্য ধরণের আস্‌বাবে সুসজ্জিত অতি পরিষ্কার একটি ক্ষুদ্র কক্ষে বসিয়া তাঁহার জন্য অল্পক্ষণ অপেক্ষা করিবামাত্র তিনি আসিলেন। ঐ কক্ষে একটি পরিষ্কার পিতলের পিল্‌সুজের উপর একটি পিতলের প্রদীপ ছিল। আলোকের অন্য ব্যবস্থা ছিল না।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চালচলন ও পরিচ্ছদ খুব সাদাসিধা রকমের ছিল।

তিনি আইনসম্বন্ধীয় বহি ছাড়া, গণিত, শিক্ষা, ও ধর্ম্মবিষয়ক পুস্তক লিখিয়াছিলেন। এগুলি দেখিবার আমাদের সুযোগ হয় নাই। বাংলায় গান রচনা করাও তাঁহার অভ্যাস ছিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সাহিত্য পরিষৎ রবিবাবুর যে সম্বর্দ্ধনা করেন, তাহাতে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রবিবাবুর সম্বন্ধে বহুবৎসর পূর্ব্বে যে একটি গান বা কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করেন। শুনিয়াছি, শিক্ষা সম্বন্ধে গুরুদাস বাবু ইংরেজীতে যে বহি লিখিয়াছেন, তাহাতে কেবল বালক ও যুবকদের শিক্ষার কথাই আছে। বালিকাদের সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াছেন, কিম্বা তাহার বিরোধী ছিলেন, বলিতে পারি না। সম্ভবতঃ বালকবালিকাদের বিবাহ সম্বন্ধে যেমন, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়েও তেমনি তিনি আধুনিক দেশাচারের সম্পূর্ণ অনুবর্ত্তন করিতেন।

সভাসমিতিতে নিমন্ত্রিত হইলে তিনি ছোট বড় বিচার করিতেন না। ছোট ছোট ছেলেদের সভাতেও উপস্থিত হইতেন। তিনি নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্ম্মমতে ও আচারে নিষ্ঠাবান্ থাকিলেও, কোন সম্প্রদায়ের বিদ্বেষ্টা ছিলেন না। অনেক শুভ অনুষ্ঠানে তিনি নানা সম্প্রদায়ের লোকের সহিত যোগ দিতেন। ধর্ম্মকার্য্য অন্য সম্প্রদায়ের হইলেও তিনি তাহাতে অশ্রদ্ধা দেখাইতেন না। আমাদের মনে পড়ে, একবার ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসবের নগরকীর্তন একটি রাস্তা দিয়া যাইতেছিল। তখন জজ গুরুদাস বাবু হাইকোর্ট হইতে বাড়ী ফিরিতেছিলেন। কোন কোন বড় মানুষের গাড়ী কীর্ত্তনকারীদের জনতা ভেদ করিয়া চলিয়া গেল; গুরুদাস বাবু নিজ কোচম্যানকে তাহা করিতে নিষেধ করিলেন, তাঁহার গাড়ী পশ্চাতে পশ্চাতে চলিল, ডাইনে যে রাস্তায় যাইবেন, কীর্ত্তনের দল তাহার মোড় অতিক্রম করিয়া যাইবার পর, তিনি গৃহাভিমুখে গাড়ী হাঁকাইতে আদেশ করিলেন।

—

১৩১৬ পৌষ

[রমেশচন্দ্র দত্ত]

স্বর্গীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের মত নানাবিষয়িণী প্রতিভাসম্পন্ন অসাধারণ পুরুষ ভারতবর্ষে আর কেহ রহিলেন না। তাঁহা অপেক্ষা বড় বক্তা, বড় লেখক, বড় সংস্কারক আছেন, কিন্তু একাই জাতীয় জীবনের বহু ক্ষেত্রে তাঁহার মত শক্তিশালী আমাদের মধ্যে আর কেহ নাই। তিনি বাঙ্গলা ও ইংরাজীতে নানা বিষয়ে পুস্তক লিখিয়াছিলেন; তাঁহার লিখিত উপন্যাস, কবিতা, ইতিহাস, অর্থনীতি, ভ্রমণবৃত্তান্ত, প্রভৃতি সমস্তই আগ্রহের সহিত পঠিত হয়। শাসনকার্য্যে তিনি নিজ শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার শাসনাধীনে ময়মনসিংহে অপরাধের পরিমাণ অনেক কমিয়া গিয়াছিল। বন্যা ও দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট লোকদিগের দুঃখবিমোচনে তিনি বিশেষ কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছিলেন। বড়োদায় যে শিক্ষা, রাজস্ব ও শাসনকার্য্যে নানাবিধ উন্নতি হইতেছে, তাহার প্রশংসার অংশ তাঁহারও প্রাপ্য। তাঁহার ঋগ্বেদের বাঙ্গালা অনুবাদ নির্ভুল কিম্বা সন্তোষজনক না হইলেও বৈদিকসংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ উহা হইতে ঋগ্‌বেদ জিনিষটি কি তাহা বুঝিতে পারে। তিনি অন্যান্য কোন কোন হিন্দুশাস্ত্রও প্রকাশ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের শিল্পসকল কেমন করিয়া লোপ পাইল, তাহা দেখাইয়া তিনি আমাদের চোখ খুলিয়া দিয়াছেন। জমির খাজানা যে আমাদিগকে অত্যন্ত বেশী দিতে হয়, তাহাও তিনি দেখাইয়াছেন।

আমরা যখন বাঁকুড়া ইস্কুলে পড়িতাম, তখন তিনি তথাকার জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট্ও পরে ম্যাজিস্ট্রেট্ হন। তৎকালে তাঁহার দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ পুরুষোচিত দেহ আমাদের মনে বিস্ময় ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করিত। তখন তাঁহার সম্বন্ধে কত গল্পই শুনিতাম। এখন একটা মনে পড়িতেছে, কিন্তু এত বৎসর পরে ইহার সত্যতা সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারি না। একবার বাঁকুড়ার একজন ইংরেজ এক ভোজে রমেশদত্ত ও সিভিল সার্জ্জন আর্ এল্ দত্ত মহাশয়দ্বয়কে আলাদা এক টেবিলে খাইতে

দিয়াছিল। রমেশদত্ত মহাশয় তাহার পর এক ভোজ দিয়া ঐ ইংরেজ ও তাহার সহচরদিগকে অপাংক্তেয়ের মত দূরে একটা টেবিলে খাইতে দিয়াছিলেন। এই গল্প আমরা যখন শুনি তখন আমাদের বালকহৃদয়ে বড় আমোদ বোধ হইয়াছিল। আমাদের মনে পড়ে দত্ত মহাশয় সে কালে ময়ূরপুচ্ছের কলমে লিখিতে ভাল বাসিতেন। মধ্যে মধ্যে তাঁহার এজলাসে ধনী লোকেরা আসামী হইলে ব্যারিষ্টার আসিত। আমরা ব্যারিষ্টাররূপ ক্বচিৎদৃষ্ট জীবকে দেখিতে ও তাহার বক্তৃতা শুনিতে যাইতাম। ব্যারিষ্টার মহাশয় গোঁফে তা দিয়া* সাক্ষীদিগকে নানা জেরা করিয়া ও ধমক দিয়া নাকাল করিতে চেষ্টা করিতেছেন, দত্ত মহাশয় ধীর ভাবে তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন ও সাক্ষ্য লিখিতেছেন, এই সব আমরা দেখিতাম।

তিনি বালকদের সঙ্গে বড় সস্নেহ ব্যবহার করিতেন। সে কালে বাঁকুড়া ইস্কুলে ইংরাজী পড়া ও ইংরাজী বলার পরীক্ষা ও পুরস্কার হইত। দত্ত মহাশয়ের কাছে আমরা কয়েকবার উপস্থিত হইয়া পুরস্কৃত হইয়াছিলাম। আর একবার তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর ইংরাজী সাহিত্যের পরীক্ষা করেন। আমরা সেবার ল্যাম্ব্‌স্‌ টেলস্‌ ফ্রম্‌ শেক্‌সপীয়ার পড়িতাম। তিনি বড় lenient অর্থাৎ নরম পরীক্ষক ছিলেন; এই জন্য আমাদের ১০০র মধ্যে ৯৬ নম্বর দেওয়ায়, আমাদের ভক্তিভাজন হেড্‌মাস্টার চন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয় অসন্তুষ্ট হইয়া দত্ত মহাশয়কে গিয়া বলেন, "মহাশয়, আপনি ছোট ছেলেদের এত নম্বর দেন, এটা ভাল নয়; তাহারা অহঙ্কৃত হইয়া উঠিবে, এবং তাহাতে ভবিষ্যতে তাহাদের আর উন্নতি হইবে না।" দত্ত মহাশয় বলেন, যে, "এ বোধ হয় ইংরাজী কিছু জানে কিম্বা খুব মুখস্থ করেছে। আমি বেশী ভুল পাই নাই।" তার পর হেড্‌মাস্টার মহাশয়ের চেষ্টায় ৬ নম্বর কমিয়া আমার ভাগ্যে ৯০ নম্বর প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল। সে কালে হেড্‌মাস্টার মহাশয়েরা ছেলেদের ভবিষ্যতের জন্য এইরূপ যত্ন ও চিন্তা করিতেন। এখনও কেহ কেহ করেন না, এমন নয়। দত্ত মহাশয়ের প্রদত্ত বিশেষ পুরস্কারের বহিটি এখনও আমার কাছে আছে। অনেক বৎসর পরে আমি যখন সিটিকলেজে ইংরাজী সাহিত্যের শিক্ষক ছিলাম, তখন দত্ত মহাশয়ের সামান্য একটু কাজ করায় তাঁহার সঙ্গে পার্ক ষ্ট্রীটে পরিচিত হইবার সুযোগ ঘটে। তখন সেই বহিটি তাঁহাকে দেখাই। তিনি হাসিয়া বলেন, "দেখুন আমি কেমন ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা; আপনাকে ইংরাজীর জন্য পুরস্কার দিয়াছিলাম, আপনি এখন ইংরাজীরই অধ্যাপক হইয়াছেন।"

বাল্যকালে আমরা তাঁহার উপন্যাসগুলি পড়িয়া স্বদেশপ্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত হই। তাঁহার স্বদেশপ্রেম অন্তঃসলিলা নদীর মত ছিল। তাহাতে ভাবুকতার আতিশয্য, আড়ম্বর, লোকদেখান উচ্ছ্বাস ছিল না। ভারতের গৌরব ভারতবাসীকে ও বিদেশীকে বুঝাইবার জন্য তিনি কত বহি লিখিয়াছেন, কত চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি যে যে কাজের সংশ্রবে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে কিছু বলিতে বা লিখিতে গেলে, অন্যের প্রাপ্য প্রশংসা পূর্ণমাত্রায় দিতেন, অন্যে কি করিয়াছে, তাহা বলিতেন, নিজের কার্য্যের কথা প্রায়ই বলিতেন না। তিনি বড় পরিশ্রমী, প্রফুল্লচিত্ত ও আশাশীল মানুষ ছিলেন। অনুৎসাহ বা নৈরাশ্য তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিত না। তাঁহার প্রকৃতি এরূপ মধুর ও সৌজন্যপূর্ণ ছিল যে শক্ত কথাও অপরের মনে কষ্ট না দিয়া বলিবার ক্ষমতা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল।

* তখন ব্যারিষ্টারদের গোঁফ থাকিত; বিবর্ত্তনবশে খসিয়া পড়ে নাই।

১৩১৭ আষাঢ়

স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত*

শ্রীবীরেশ্বর গোস্বামী

যে সব স্মরণীয় মহাত্মারা এযুগে নিজ অনন্যসাধারণ প্রতিভাবলে বাঙ্গালীর যশঃসৌরভ দেশদেশান্তরে বিকীর্ণ করিয়াছেন, রমেশচন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রধানতম। সমগ্র বঙ্গদেশ শুধু কেন, তাঁহার অকস্মাৎ মৃত্যুতে সমগ্র ভারতবর্ষ, জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে আজ এই অসামান্য প্রতিভাবান সর্ব্বগুণালঙ্কৃত মহাপুরুষের জন্য একবাক্যে রোদন করিতেছে।

জন্ম ও বংশ বিবরণ।

রমেশচন্দ্র যে কুল উজ্জ্বল করিয়াছিলেন সেই প্রথিত রামবাগানের দত্ত বংশ, বহু দিন, এমন কি ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সময় হইতেই,—আভিজাত্যে, বংশমর্য্যাদায়, ঐশ্বর্য্যে ও বিদ্যাগৌরবে এই কলিকাতা মহানগরীর মধ্যে বিশেষ গণনীয়। কলিকাতায় এরূপ গুণিগণালঙ্কৃত বংশ আর ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রমেশচন্দ্রের প্রপিতামহ ৺নীলমণি দত্ত তখনকার হিন্দু সমাজের একজন উদারচেতা নেতা বলিয়া সাধারণ্যে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার খুল্লপিতামহ ৺রসময় দত্ত তদানীন্তন্ সময়কার প্রধান দুটী সম্ভ্রান্ত উচ্চ পদ,—সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষের ও ছোট আদালতের বিচারকের—এই দুই পদেই ক্রমান্বয়ে সমারূঢ় হন ও সমলঙ্কৃত করেন। লর্ড বেন্টিঙ্ক কর্ত্তৃক প্রথমে যখন এদেশীয়দের জন্য ডেপুটি কলেক্টারের উচ্চপদ সৃষ্টি হয় রমেশচন্দ্রের পিতা ঈশানচন্দ্র সেই উচ্চপদে প্রথমে নিযুক্ত হন। তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত ৺গোবিন্দচন্দ্র দত্ত মহাশয় হিন্দু কালেজের একজন বিখ্যাত সীনিয়র্ স্কলার ও ইংরাজী কবিতা রচনায় বিশেষ খ্যাত ছিলেন। যদিও তাঁহার সমধিক যশস্বিনী কন্যা তরু দত্তের নামে পিতার যশঃপ্রভা ম্লান হইয়াছে তথাপি ইংরাজী কবিতা রচনায় তখনকার "ইজুর" সমাজে গোবিন্দ বাবুর যশঃ বড় কম ছিল না।* তিনি মাইকেল, ভূদেবচন্দ্র, রাজনারায়ণ প্রভৃতি এজুর দলের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন। গোবিন্দ চন্দ্রের কন্যা কুমারী তরু দত্তের নাম সমধিক পরিচিত। শ্রীমতী কবিতা লিখিয়া স্বদেশে বিদেশে অক্ষয় যশোলাভ কবিয়া গিয়াছেন। বিদেশী ভাষায় লিখিয়া কখনও কেহ তুল্যগুণশালী হইলেও সেই ভাষার লেখকদের সমতুল্য কীর্ত্তি অর্জ্জন করিতে পারেন না। ব্যাপার যখন এইরূপ, তখন কুমারী তরুদত্তের "Sheaves Gleaned from A French Field" নামক কবিতা পুস্তক যখন প্রচারিত হয় তখন বিলাতের প্রসিদ্ধ 'এথিনিয়ম্' পত্রিকা সমালোচনা-স্থলে বলিয়াছিলেন যে, "এইরূপ ধরণের কবিতা রচনা যে কোনো উচ্চশিক্ষিতা ইংরাজ মহিলার পক্ষে গৌরব-জনক কিন্তু শ্রীমতী তরুদত্তের পক্ষে ইহা অমানুষী ক্ষমতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই।" † কতদূর উচ্চ প্রতিভাশালিনী হইলে

* বারাণসী বঙ্গসাহিত্য সমাজ গৃহে (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বারাণসীস্থ শাখা) ২৩ চৈত্র, ১৩১৬ তারিখে উক্ত সভায় বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

* গোবিন্দ বাবুর ইংরাজী কবিতা রচনা আধুনিক বাঙ্গালী পাঠকদের নিকট অপরিচিত। তাঁহার কবিতাগ্রন্থও এখন সুপ্রাপ্য নহে। তদানীন্তন সময়ে তাঁহার "A Lovelorn Moslem Girl's Song"— প্রভৃতি কবিতা প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। কেবল তাহার প্রথম ছত্র আমার স্মরণ আছে— "My heart is like a desert wide, its only palm is dead"

† "It would be highly creditable performance for an educated English lady of considerable literary attainments but for Miss Toru it is simply miraculous." বলা বাহুল্য ইহা

ইংরাজজাতির নিকট এরূপ সম্মান লাভ করা যাইতে পারে পাঠকেরা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। রমেশচন্দ্রের আর এক খুল্লতাত শ্রীযুক্ত শশীচন্দ্র দত্ত তখনকার একজন ভাল ইংরাজীকবিতা-লেখক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিযাছিলেন। তাঁহার "A Vision of Sumeru", "Bengaliana" প্রভৃতি গ্রন্থ তখনকার পাঠকসমাজে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। তিনি একজন কলিকাতার জস্টিস্ অফ্ দি পীস্ ছিলেন। ইহা ব্যতীত J C.D.O.C.D. প্রভৃতি স্বাক্ষরবিশিষ্ট কবিতা রেভারেণ্ড্ লালবেহারী দে সম্পাদিত "বেঙ্গল মেগাজিন্" ও তাহার পরের "ন্যাশানেল্ ম্যাগাজিন্" প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইত। আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের নিকট এ সম্বন্ধে একটী মজার গল্প শুনিয়াছি। যখন মাইকেল মধুসূদন মান্দ্রাজে অবস্থান করিতেছিলেন তখন Calcutta Review পত্রিকাতে M. S. D. স্বাক্ষরিত কবিতাগুলিকেও রামবাগানের দত্তবংশীয় কোনো যুবকের লেখা মনে করিয়া 'রিবিউর' কোনো সমালোচক লিখিয়াছিলেন—"One benighted nursling sings from Madras". এই সাহিত্যনিরত কাব্যকলাকুশল বংশে অনুকূল পরিবেষ্টনের মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়া তরুণবয়স্ক রমেশচন্দ্রের প্রতিভা বিশেষ সাহায্য, শিক্ষা ও পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল একথা অস্বীকার করা যায় না।

এই সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত পরিবারে ১৮৪৮ খৃঃ ১৩ই আগস্ট তারিখে রমেশচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁহার শৈশবজীবন পিতার সহিত বাঙ্গালার বহুপ্রদেশ ভ্রমণে ব্যয়িত হয়। ডেপুটী কালেক্টার হইয়া তাঁহার পিতাকে জলপথ ও স্থলপথে বাঙ্গালার বহুগ্রাম ও নগরের মধ্য দিয়া ভ্রমণ করিতে হইত। সে সব ভ্রমণের সুখকর স্মৃতি তাঁহার মনে জাগরূক ছিল। তখন রেল হয় নাই, এরূপ ভ্রমণ বেশ আমোদজনক ও উপভোগ্য ছিল।

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কথা, লর্ড ক্যানিংয়ের রাজপ্রতিনিধিরূপে এদেশে আগমনের কথা, পাবনায় অবস্থানকালীন তথায় বহু তোপধ্বনির মধ্যে ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্র (প্রোক্লামেশনের) কথা, সিপাহীবিপ্লবের কথা—এসব কথা তাঁহার বাল্যস্মৃতিতে উজ্জ্বলভাবে মুদ্রিত ছিল। এরূপ বহুস্থান ও বহু লোকের সংঘর্ষে আসিয়া রমেশচন্দ্র তাঁহার স্বাভাবিক লোক-চরিত্রাভিজ্ঞানের অনেক শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন।

বাল্যজীবন।

শৈশবেই তিনি পিতামাতাকে হারাইয়াছিলেন। তাঁহারা ভ্রাতা ভগিনী কয়টী তাঁহাদের খুল্লতাত শশীচন্দ্র দত্তের তত্ত্বাবধানে থাকেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে শশী বাবু নিজে একজন সাহিত্যিক ও ইংরাজী সাহিত্যে প্রগাঢ় অনুরাগী ছিলেন। রমেশচন্দ্রের সাহিত্যানুরাগ খুল্লতাতের অনুকূল শিক্ষা ও সংসর্গে স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। রমেশচন্দ্রের ছাত্রজীবনের কৃতকার্য্যতা তাঁহার জীবনের ভাবী উন্নতির সূচনা করিয়া দিয়াছিল। তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় তাঁহার সহপাঠী ছাত্রদের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন।

এফ, এ, পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। এ সময় এমন একটী ঘটনা ঘটিল যে তাঁহার ভাগ্য-স্রোত সম্পূর্ণ বিভিন্ন খাদে প্রবাহিত করিল। তাঁহার আর বি, এ, পরীক্ষা দেওয়া হইল না। মাইকেল মধুসূদনের জীবনের সেই বিচিত্র পরিবর্ত্তনের মত রমেশচন্দ্রের জীবনের এই পরিবর্ত্তন বঙ্গদেশের ও সাহিত্যের কম স্মরণীয় ঘটনা নহে। সেই বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা তাঁহার [?]।

বিলাত-যাত্রা।

ইহাতে রমেশচন্দ্রের জীবনের ও তাঁহার সতীর্থ অপর দুইটী যুবকের জীবনস্রোতও সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত করিয়াছিল। তাঁহারাও ইংলন্ড গমনে তাঁহাদের বন্ধুর সঙ্গী হইয়াছিলেন। তাঁহারা সুপ্রথিতনামা শ্রীযুক্ত

স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া উদ্ধৃত হইল সুতরাং ইহাতে ভ্রম থাকা আশ্চর্য্য নয়।

বিহারীলাল গুপ্ত ও দেশপূজ্য শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিন জনের অকৃত্রিম আজীবনব্যাপী বন্ধুত্ব আমাদের দেশের ইতিহাসের একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। যদিও ভবিষ্যতে তিন বন্ধুতে জীবনের তিন পথে চালিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের এ অচ্ছেদ্য সৌহার্দ্দ্য বন্ধন কখনও শ্লথ হয় নাই। ১৮৬৮ সালে ৩রা মার্চ্চ তারিখের প্রাতঃকালে এ তিন জন যুবক বিলাতযাত্রা করিলেন। এ তিন জনের মধ্যে একজন, অর্থাৎ সুরেন্দ্রনাথ পিতার সম্মতিক্রমে ও অপর দুই জন আত্মীয় স্বজনের অনুমতি না লইয়াই নিশাযোগে গৃহ হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বের সময়ের বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে বিলাতযাত্রা যে কি বিষম যুগবিপ্লব-কর ঘটনা বলিয়া বোধ হইত, —বিলাত-গমনাভিলাষী ও বিলাত-প্রত্যাগত যুবক ও তাঁহার আত্মীয়েরা যে কি সামাজিক নিগ্রহ ভোগ করিতে বাধ্য হইতেন তাহা আজকালকার শিথিল সমাজ-বন্ধনের দিনে অনুমান করাও দুঃসাধ্য হইবে। সুতরাং বিলাতপ্রবাসীর আত্মীয়েরা বিশেষ উদারচেতা ও নির্ভীক না হইলে একার্য্যে অগ্রসর হইতে সাহসী হইতেন না। সেজন্যই বোধ হয় অসম্মতির আশঙ্কা করিয়া উক্ত যুবকদ্বয় আত্মীয়দের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই, গোপনে গৃহ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন! তাঁহারা যে জাহাজে বিলাত যাইবেন তাহাতে তিন বন্ধুর যাইবার স্থান (berth) রিজার্ভ করিবার সময় “সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যো ও দুটী বন্ধু” এই ছদ্ম নামে টিকিট ক্রয় করিতে হইয়াছিল! ইহাতেই বিলাতযাত্রা তখনকার সময়ের যে কি গুরুতর ব্যাপার ছিল পাঠকেরা তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবেন! মাইকেল মধুসূদনের খ্রীস্টান হওয়া, খ্রীস্টান পাদ্রিদের কাছে লুকাইয়া থাকা ও পরে বিলাত গমনে, সমাজে কিরূপ তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিল তাহার উজ্জ্বলচিত্র যোগীন্দ্র বাবুর জীবনচরিতে আলোচনা করিয়া দেখিলে পাঠকেরা সহজেই এ কথা হৃদয়ঙ্গম করিবেন।

যে যাহা হউক, বিলাতে উপস্থিত হইয়া তিন জনেই ১৮৬৯ খৃঃ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইলেন। ইহাঁদের মধ্যে রমেশচন্দ্র সমস্ত পরীক্ষার্থীদের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষার পরীক্ষাতে অবলীলাক্রমে সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ইংরাজী ভাষার পরীক্ষাতে তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। সিভিল সার্ভিসের কঠিন পরীক্ষায় তিন শত জন ইংরাজ পরীক্ষার্থীদের মধ্যে তাহাদের নিজের মাতৃভাষার পরীক্ষায় একজন বিদেশী ২১ বৎসরের তরুণবয়স্ক ছাত্র যে অপর সকল ইংরাজ প্রতিদ্বন্দ্বীদের বহুদূরে রাখিয়া সসম্মানে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন রমেশচন্দ্রের ইহা কম প্রশংসার কথা নহে। তিনি উত্তর জীবনে যে অসামান্য কৃতিত্ব ও প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন তাঁহার ছাত্রজীবনেও তাহার উজ্জ্বল রেখাপাত ছিল।

ইংলণ্ডে অধ্যয়ন, য়ুরোপভ্রমণ ও দেশে প্রত্যাবর্ত্তন।

এখনকার মত তখন ইংরাজের সঙ্গে ভারতবাসীর, বিশেষতঃ বাঙ্গালীর, একটা প্রতিযোগিতা ও রেষারেষির ভাব ছিল না। তখনকার বিলাতপ্রবাসী বাঙ্গালী ভদ্র ইংরাজ পরিবারে সহজেই সাদরে অভর্থিত ও গৃহীত হইতেন। এখনকার মত, তখন ইংরাজসমাজে, বাঙ্গালীর প্রতি একটা অবজ্ঞা ও ঘৃণার ভাব আসে নাই—তখন বেজওয়াটার (Bayeswater) পল্লীর কোন অজ্ঞাত অখ্যাত সঙ্কীর্ণ “Rooms” ভাড়া করিয়া ও আত্মীয় স্বজনের প্রিয় ও হিতকর সঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন বাঙ্গালীকে কেবলমাত্র নীরস কর্ত্তব্যভার লইয়া কারাদণ্ডের ন্যায় প্রবাস-জীবন যাপন করিতে হইত না। কোনো রাজপুরুষের রক্তচক্ষুও প্রদর্শিত হইত না, এবং এই হতভাগ্য ভারতীয় ছাত্রদের প্রবাস-জীবনের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যের সম্বন্ধে সদা সর্ব্বদা শাসন ও ব্যবস্থা নিয়োজিত হয় নাই। প্রতিপদে পুলিশ প্রহরীর সতর্ক প্রহরায়, ইংরাজসমাজে তাহাদের সম্পূর্ণ অবজ্ঞাত জীবনকে আরও বিড়ম্বিত করিয়া তোলে নাই! সকল বিষয়েই এনার্কিস্ট-

দলভুক্ত এই সন্দেহের লাঞ্ছনা ও অবমাননা তাহাদের ভোগ করিতে হয় নাই। রমেশচন্দ্র ও তাঁহার বন্ধুদ্বয় বহু ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত ইংরাজপরিবারে সাদরে গৃহীত হইয়াছিলেন। ১৮৬৮ সালের বিখ্যাত পার্লিয়ামেন্টের নির্ব্বাচনেব সময়, যখন মহামতি গ্ল্যাড্‌ষ্টোনের প্রথম নেতৃত্বে লিবারেল সম্প্রদায় জয়ী হইয়া রাজ্যশাসনক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন—ইংরাজী ইতিহাসের সেই একটী স্মরণীয় যুগের ঘটনা রমেশচন্দ্রের স্বচক্ষে দেখিবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। তিনি গ্ল্যাড্‌ষ্টোন ও ডিসরেলির বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন। ফসেট্ ও ব্রাইট,—ভারতের তখনকার সর্ব্বোত্তম ইংরাজ বন্ধুদ্বয়ের সহিত—তাঁহার পরিচয়সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। যে সব সভায় জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল বক্তৃতা কবিতেন বা ডিকেন্স স্বীয় অমর উপন্যাসাবলী হইতে অংশবিশেষ পাঠ করিয়া ইংরাজ শ্রোতৃবর্গকে পুলকিত করিতেন সেই সব 'অভিরূপ-ভূয়িষ্ঠ' সভায় রমেশচন্দ্র প্রায়ই উপস্থিত থাকিতেন। তখনকার প্রসিদ্ধ ইংরাজদের মধ্যে কোন কোনও মনীষীর সঙ্গে তাঁহার বন্ধুত্ব ঘটিয়াছিল। তাঁহার নিজের শিক্ষকদের মধ্যে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যের অধ্যাপক হেন্‌রি মর্লি এবং সংস্কৃতভাষাবিশারদ্, পাণিনি-সম্পাদক অধ্যাপক গোল্ড্‌ষ্টুকরের নাম উল্লেখযোগ্য। মোটের উপর তিনি এদেশে ফিরিবার সময় বিলাতপ্রবাসের অনেক সুখকর স্মৃতি সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের লিখিত গত বৎসরের মাঘ মাসের প্রবাসীতে রমেশচন্দ্রের সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে সে প্রবন্ধ পাঠ করিয়া অনেকে জানিয়াছেন রমেশচন্দ্র ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ব্যারিষ্টার ও সিভিলসর্ভিসের আনুষঙ্গিক সকল পরীক্ষায়ই উত্তীর্ণ হইয়া তিন বন্ধু একত্রে য়্যুরোপ পরিভ্রমণে বাহির হইয়া ক্রমান্বয়ে স্কট্‌ল্যাণ্ড, আয়ার্ল্যাণ্ড্, ফ্রান্স্, জর্ম্মাণী, সুইট্‌জর্লাণ্ড্ ও ইটালী প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়া আসেন। এ সময়ের একটী বিশেষ কৌতুককর ঘটনা এস্থলে উল্লেখযোগ্য। ১৮৭১ খৃঃ আগষ্ট মাসে তিন বন্ধুতে ফ্রান্স দেশ পরিদর্শনার্থে পারী নগরীতে যাত্রা করেন। তখন কমিউনিষ্ট্ (Communist) সম্প্রদায় অপরূপ সৌন্দর্য্যশালিনী নগরীগণপ্রধানা মহানগরী পারীর অনেকগুলি সুশোভন হর্ম্ম্যরাজি নষ্ট করিয়া ফেলে। সেই আক্রোশে স্থানীয় গভর্ণমেন্টপক্ষীয় সৈন্যসমূহ নবাগত যে কোনো আগন্তুককেই গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিতেছিল। এ তিনজন বিদেশী যুবককে "কমিউনিষ্ট্" সন্দেহ করিয়া এক রাত্রের জন্য ফরাসী-কারাগারে কয়েদ করিয়া রাখে। তাঁহাদের বিফল ক্রোধ, তর্জ্জন ও তিরস্কার ও ভয়প্রদর্শনে কিছুই ফলোদয় হয় নাই। প্রভাত হইলে সৈনিকের কর্ত্তৃপক্ষদের, এই হতভাগ্য 'কমিউনিষ্টদের' উপর ক্রোধ প্রশমিত হইল। তাহারা ইহাঁদের কাছে তাঁহাদের 'পাসপোর্ট' দেখিয়া ও ব্রিটিশ প্রজার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ প্রভৃতি যুক্তি শুনিয়া তাঁহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিল। এরূপে এক রাত্রি ফরাসী-কারাভোগের অকারণ লাঞ্ছনার পর কোনো গতিকে অব্যাহতি লাভ করেন। যদি কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে এ ঘটনা ঘটিত তাহা হইলে ব্যাপারটা এরূপ সহজে মিটিত না ও হয়ত ইহাতেই ভারতের এই তিনটী অসমসাহসী সন্তানের জীবনলীলা এইখানেই শেষ হইত!

প্রথম কর্ম্ম-জীবন।

যে সৌভাগ্য ও কৃতিত্ব রমেশচন্দ্রের ছাত্রজীবন যশোবিমণ্ডিত করিয়াছিল তাঁহার প্রথম কর্ম্ম-জীবন হইতেই তাঁহার কৃতিত্বের পুরস্কারস্বরূপ সেই যশঃ চিরজীবনের জন্য অক্ষুণ্ণ থাকে। কর্ম্ম-জীবনে এরূপ যশোভাগ্য উচ্চপদস্থ বাঙ্গালীর বড় একটা ঘটিতে দেখা যায় না। ১৮৭১ সাল হইতে ১৮৮২ সাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালার বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া তাঁহার ঊর্দ্ধতন সকল কর্ম্মচারীর প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। ১৮৭৪ সালে নদীয়া মহকুমায় দুর্ভিক্ষনিবারণকার্য্যে যখন ব্রতী হন তখন তরুণস্কন্ধে গুরু কার্য্যভার আসিয়া পড়িল। সেই ১৮৭০ খৃঃ ১২৮১ সাল বাঙ্গালার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় থাকিবে! একদিকে দারুণ দুর্ভিক্ষ,

অপরদিকে ভীষণ মহামারী— উভয়েই সেই বৎসরের ভয়ানক Cyclone-এর অবশ্যম্ভাবী শোচনীয় পরিণাম! সেই বিষম ঝড়ে বঙ্গের প্রায় লক্ষাধিক লোক আকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়! রমেশচন্দ্র বরিশাল প্রদেশস্থ গঙ্গার মোহানাস্থ দক্ষিণ শাহবাজপুরে শাসনকার্য্যের পুনঃসংস্কার করিতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। (তাঁহার "মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত" এই স্থানেই রচিত হয়, ১২৮৪ সালে ইহা রচিত হইয়া তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অবিনাশচন্দ্রের নামে উৎসর্গীকৃত হয়, অভিজ্ঞ পাঠক তাঁহার সেই উৎসর্গপত্রের কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করিবেন।) সে যাহা হউক, দক্ষিণ শাহবাজপুরের তখন শোচনীয় অবস্থা! দুর্ভিক্ষ যে ধ্বংস-কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিল, সে বৎসরের সেই ভয়ানক ঝঞ্ঝাবাত্যা ও বিসূচিকারূপ মহামারী নিয়তির সে ক্রুর কার্য্যের শেষকে নিঃশেষ করিতেছিল! সমস্ত দ্বীপটী মৃতদেহে সমাচ্ছন্ন! বহু নরনারীর গলিত শব বৃক্ষশাখায় দোদুল্যমান! নদীস্রোতের সঙ্গে, তড়াগে, দীর্ঘিকায়, সর্ব্বত্র এই পূতিগন্ধময় শবদেহ ভাসমান! সমস্ত দেশ শবদেহে যেন এক ভয়ঙ্কর সংগ্রামক্ষেত্রের ন্যায় দেখাইতেছিল! অবসর বুঝিয়া ডাকাত ও লুঠেরার উপদ্রবও বাড়িয়া উঠিল। এই ভয়ঙ্কর বিভীষিকাপূর্ণ স্থানে, এরূপ দারুণ দুর্ব্বিপাক ও মহামারীর মধ্যে, পাঁচ বৎসর অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে রমেশচন্দ্র সুশাসন-কৌশলে সে প্রদেশে শান্তি ও উন্নতি পুনঃসংস্থাপন করিলেন।

প্রথম সাহিত্যজীবন।

রমেশচন্দ্রের কর্ম্মশীলতা তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্বের আর একটী প্রধান সহায়। কি গার্হস্থ্য জীবনে, কি ছাত্রাবস্থায়, কি সাহিত্যজীবনে, কি কর্ম্মক্ষেত্রে, সর্ব্বত্রই—তাঁহার মত কর্ত্তব্যনিষ্ঠ শ্রমসহিষ্ণু কর্ম্মবীর বাঙ্গালী অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান লেখক যে কয়বারই তাঁহার সাক্ষাৎসৌভাগ্যে গৌরবান্বিত বোধ করিয়াছে—সে কয়বারই তাঁহাকে কোনো না কোনও একটী কাজে ব্যাপৃত দেখিয়াছে। এক দিন মধ্যাহ্নে তাঁহার লাউডনষ্ট্রীটস্থ ভবনে গিয়া দেখি যে তিনি রাশি রাশি পুস্তকস্তূপের মধ্যে, যোগনিরত তাপসের ন্যায় স্বকার্য্যে যেন নিমগ্ন রহিয়াছেন!—এজন্য বিশেষ কার্য্য না লইয়া তাঁহাকে সহজে বিরক্ত করিতে সঙ্কোচ হইত। অধিকাংশ বাঙ্গালী-জীবনের অবসরকাল-বিনোদনের একমাত্র উপায় যেরূপ নিরবচ্ছিন্ন আলস্যচর্চ্চা বা তুচ্ছ আমোদপ্রমোদ, কর্ম্মবীর রমেশচন্দ্র জীবনের তিলমাত্র সময় সেরূপ আলস্যে বা তুচ্ছ কার্য্যে কখনও ব্যয়িত করিতেন না। শাহবাজপুরের কঠোর পরিশ্রমযুক্ত রাজকার্য্যের মধ্যে ক্ষণিক অবসরকালেও তিনি সাহিত্যচর্চ্চা সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন থাকিতেন না. তখনও তাঁহার নিরলস লেখনী তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমশীলতার পরিচয় দিয়া গিয়াছে। প্রথমে "য়ুরোপে তিন বৎসর" শীর্ষক একখানি ক্ষুদ্র ইংরাজী পুস্তকে তাঁহার ইংলণ্ডপ্রবাসের ও ইংরাজ জাতির রীতিনীতি প্রভৃতির কৌতুককর আলোচনাময় এক পুস্তক রচনা করেন। যত দূর জানা গিয়াছে ইহাই তাঁহার প্রথম রচনা—তাহার পর "বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস" শীর্ষক আর একখানি ক্ষুদ্র ইংরাজী গ্রন্থ রচিত হয়। শেষোক্ত গ্রন্থ মৌলিক চিন্তা বা আবিষ্কারে উজ্জ্বল নহে, বিশেষ, এ গ্রন্থে ইংরাজাধিকারের পর বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ। রমেশচন্দ্রের পূর্ব্বে আরও তিনখানি বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস রচিত হইয়াছিল। তাঁহাদের রচয়িতাদের নাম যথাক্রমে, পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন, শ্রীযুক্তবাবু রাজনারায়ণ বসু ও শ্রীযুক্তবাবু মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। এতন্মধ্যে বসু মহাশয়ের "বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্য" ও ন্যায়রত্ন মহাশয়ের "বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" নাম্নী পুস্তিকা সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের গ্রন্থ সেকেলে পণ্ডিতী সমালোচনা, যে সমালোচনার গুণে মাইকেলের মেঘনাদবধ ৺প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট অসার ও অলঙ্কারদুষ্ট বিবেচিত হইয়াছিল—ও বসু মহাশয়ের সমালোচনাপুস্তক তদানীন্তন "এজু" সমাজের সমালোচনার দৃষ্টান্তস্থল বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে। রমেশচন্দ্রের গ্রন্থ

শেষোক্ত শ্রেণীর দ্বিতীয় গ্রন্থ। বর্ণনাসংগ্রহে বা মৌলিকতায় ইহার কোনো বিশেষত্ব নাই তবে অনুমান চতুর্বিংশ বৎসর বয়স্ক রমেশচন্দ্রের রচনা বলিয়া এস্থলে উল্লিখিত হইল। ইহা মিঃ লালবেহারী দে মহাশয়ের সম্পাদিত তখনকার শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্র "Bengal Magazine" পত্রে ক্রমশঃপ্রকাশ্য প্রবন্ধে ও "Arcyde" এই স্বাক্ষরে প্রকাশিত হয়। দীনেশবাবুর বহুশ্রম ও মৌলিক প্রামাণিক গ্রন্থের পর উক্ত গ্রন্থত্রয়ের আর কোনো অধিক মূল্যই নাই। এদেশের কৃষকদের দুরবস্থা সম্বন্ধে আর একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক রমেশচন্দ্রের দ্বিতীয় গ্রন্থ। যে চিন্তা তাঁহার আজীবন ছিল—যাহাদের উন্নতির আলোচনায় ভারতের এই মহামতি সন্তানের জীবনের শ্রেষ্ঠাংশ ব্যয়িত হয়—উত্তরজীবনে যে বিষয় লইয়া ভারতের সর্ব্ববিষয়বিশারদ কর্জ্জনের সঙ্গে তাঁহার মসীযুদ্ধ বাধিয়া যায়— সেই দৈববিড়ম্বিত দরিদ্র নিরন্ন হতভাগ্যদের জন্য যে প্রথম হইতেই তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছিল এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায়ই তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয়। এ সব রচনা তাঁহার শ্রম ও যত্নসম্ভূত নহে, সাহিত্যিক ব্যায়ামমাত্র, কিন্তু যে সব গ্রন্থ রচনায় তাঁহার যশঃসৌরভ চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইল সে সব গ্রন্থ ইংরাজীতে রচিত নহে, ইহা তাঁহার [?]

বাঙ্গালা উপন্যাস রচনা।

রমেশচন্দ্র যদি কেবলমাত্র এই কয়খানি বাঙ্গালা উপন্যাস রচনা করিয়া যাইতেন তাহা হইলেও তাঁহার নাম অমর হইয়া থাকিত। সে যাহা হউক, তাঁহার বাঙ্গালা রচনার ইতিহাস কৌতূহলজনক। অনেকেই অবগত আছেন যে তখনকার সময় শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মধ্যে বাঙ্গালা সাহিত্যের ও বাঙ্গালা ভাষার কোনও আদর ছিল না। একদিকে বাঙ্গালাভাষায় কোনও সুপাঠ্য বা শিক্ষনীয় বিষয় আদৌ রচিত হইতে পারে না তখনকার বাঙ্গালা শিক্ষিতসম্প্রদায়ের এই বদ্ধমূল কুসংস্কারে—অপর দিকে আমাদিগের সংস্কৃতানুরাগী পণ্ডিতসম্প্রদায়ের নিকট ইহা স্ত্রীলোকের আলোচ্যভাষা বিবেচনায় বাঙ্গালা ভাষা অনাদৃত ছিল। তখন এই দোটানা স্রোতের মধ্যে পড়িয়া আমাদের দীনা মাতৃভাষা, তাঁহার উভয়সম্প্রদায়ভুক্ত শিক্ষিত সন্তানদের দ্বারায়, সম্পূর্ণ অবজ্ঞাত হইয়া অজ্ঞাতবাস যাপন করিতেছিলেন। তখন কে বুঝিতে পারিয়াছিল যে এই দীনা অনাদৃতার ক্ষীণকণ্ঠ সময়ে রৌদ্রসিংহগর্জ্জনবৎ তীব্র ও কারুণ্যে পাষাণদ্রাবী হইয়া বঙ্গীয় পাঠকসমাজকে চমকিত করিতে সমর্থ? কে জানিত যে উচ্চ সুরের সকল তানই সময়ে ইহার কণ্ঠে ধ্বনিত হইতে পারিবে? যে মহাপুরুষ বাঙ্গালা সাহিত্যের এই স্রোত সম্পূর্ণ বিভিন্ন খাদে পরিচালিত করিয়া ইহার মধ্যে অপূর্ব্ব গতি ও বলের সঞ্চার করিয়াছিলেন—যিনি বঙ্গাসাহিত্যে নূতন জীবনীশক্তি আনয়ন করিয়াছিলেন তিনি আর কেহ নন—তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বঙ্গীয় লেখক অমর ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর তাঁহার স্মরণার্থ যে মহতী সভা সমাহূত হয় তাহাতে রবীন্দ্রনাথ যে সুন্দর প্রবন্ধ পাঠ করেন, সেই প্রবন্ধের একস্থলে লিখিয়াছেন যে দীনা বঙ্গভাষা যখন যেখানে তাঁহাকে ডাকিয়াছে তখনই তিনি প্রসন্ন চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়াছেন। বস্তুতঃ এই অসামান্য কৃতী লেখক অন্যান্য ইংরাজীলিপিকুশল বাঙ্গালী লেখককে মাতৃভাষার আলোচনায় ব্রতী করাইয়া, দ্বিতীয়তঃ অক্ষম লেখকদের অসার রচনারূপ আবর্জ্জনাস্তূপ কঠোর সমালোচনা-সম্মার্জ্জনী-প্রয়োগে পরিষ্কার করিয়া এই গঠন ও সংস্কাররূপ দ্বৈতকার্য্যে তাঁহার বিচিত্র ক্ষমতাশালী লেখনীকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। কার্য্যক্ষেত্রে রমেশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার আলাপ হয়। রমেশচন্দ্রের প্রতিভার পরিচয় পাইয়া যেদিন বঙ্কিম তাঁহাকে বঙ্গভাষার গ্রন্থরচনা-কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছিলেন সেদিন বাঙ্গালা সাহিত্যের একটী স্মরণীয় দিন!—সেদিন স্বর্গে দেবতা দুন্দুভিনিনাদ করিয়া ও বঙ্গসাহিত্য-কলালক্ষ্মী তাঁহার এ কৃতী সন্তানকে অপরিম্লান যশোমাল্য দিয়া চিরদিনের জন্য বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। একদিন কথায় কথায় বঙ্কিম

রমেশচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন—"তুমি বাঙ্গালাভাষায় লেখনা কেন?" রমেশচন্দ্র বিস্মিত হইয়া উত্তর দিলেন, "আমি বাঙ্গালা লিখিব! আমি বাঙ্গালা রচনাপদ্ধতির কি জানি?" বঙ্কিম বলিলেন, "সে কি একটা কাজের কথা? তোমরা শিক্ষিত লোক, তোমরা যে পদ্ধতিতে লিখিবে তাহাই রচনাপদ্ধতি হইবে। তোমার যদি প্রতিভা থাকে, রচনাপদ্ধতির জন্য তোমাকে ভাবিতে হইবে না রচনাপদ্ধতি নিজেই আসিবে!" বঙ্কিম তখন (এখনও) বঙ্গসাহিত্যের Dictator, তাঁহার বঙ্গদর্শন ও তাঁহার উপন্যাসাবলী বঙ্গীয় সাহিত্যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। তাঁহার মুখে এরূপ উৎসাহবাক্য শুনিয়া রমেশচন্দ্র বাঙ্গালা-রচনা-কার্য্যে অগ্রসর হইলেন। ১৭৭৪ [১৮৭৪] হইতে ১৮৮০ সালের মধ্যে রচিত তাঁহার উপন্যাস চতুষ্টয় তাঁহার এই চেষ্টার ফল! বঙ্কিমচন্দ্র সাহ্লাদে ও সগৌরবে এই গ্রন্থ কয়খানি বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। তখনকার অন্যান্য শ্রেষ্ঠ মাসিক—ভারতী, বান্ধব, আর্য্যদর্শন, জ্ঞানাঙ্কুর—প্রভৃতি পত্রে এ সব গ্রন্থের উচ্চ প্রশংসা বাহির হইয়াছিল। তদবধি ইহা বঙ্গভাষার উচ্চশ্রেণীর স্থায়ী সাহিত্যের (classicsএর) অঙ্গীভূত হইয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বোক্তগুলি ঐতিহাসিক উপন্যাস—দুই এক বৎসরের পরেই আবার রমেশচন্দ্র সামাজিক উপন্যাস রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। সংসার ও সমাজ এই শ্রেণীর দুইখানি গ্রন্থ—একখানি অন্যের পরিশিষ্ট (sequel)। উক্ত উপন্যাস কয়খানির মধ্যে আবার দুখানি ইংরাজীতে তিনি অনুবাদ করিয়া "Lake of Palms" ও "Slave Girl of Agra" নামকরণ করিয়াছেন।

উপন্যাস কয়খানির সমালোচনা।

রমেশচন্দ্রের উক্ত কয়খানি উপন্যাস-গ্রন্থের বিস্তৃত দোষ গুণ আলোচনার এ স্থান ও সময় নহে। সে সম্বন্ধে স্বতন্ত্র দীর্ঘ আলোচনা করা আবশ্যক। প্রবন্ধান্তরে সে আলোচনার ইচ্ছা রহিল। তবে এস্থলে সংক্ষেপে একথা বলা অপ্রাসঙ্গিক নহে যে বঙ্কিমচন্দ্রের "রাজসিংহের" পর অন্য কোনও বাঙ্গালী লেখক ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিয়া রমেশচন্দ্রের তুল্য যশঃ অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। যদিও শেষ জীবনে তাঁহার Economic History প্রভৃতির তুলনায় তিনি তাঁহার উপন্যাস গ্রন্থকয়খানিকে সেরূপ মূল্যবান বলিয়া মনে করিতেন না—এমন কি, বর্ত্তমান লেখককে কথাপ্রসঙ্গে উক্ত গ্রন্থকয়খানির তুচ্ছতার সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছিলেন—তথাপি সকল দিক বিবেচনা করিলে তাঁহার উক্ত গ্রন্থগুলি—বিশেষতঃ সুলিখিত ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি—তাঁহার শতবর্ষ, উপন্যাসবিরল বঙ্গ-সাহিত্যে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। যদিও পরবর্ত্তী ইতিহাসে তাঁহার উপন্যাসবর্ণিত ঐতিহাসিক চরিত্র সম্বন্ধে তাঁহার মত কতক পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল—তথাপি উক্ত গ্রন্থসমূহের স্বাভাবিক বর্ণনা, চরিত্রচিত্রণ, বিচিত্র ঘটনাসংস্থানের মনোহারিত্ব প্রভৃতি গুণে ঐ সব গ্রন্থ য়্যুরোপীয় যে কোনো শ্রেষ্ঠ উপন্যাসিকের লেখার সঙ্গে তুলনীয়। "মাধবীকঙ্কণ", "জীবনসন্ধ্যা" ও "জীবনপ্রভাতের" অনেক দৃশ্য ও চরিত্র, অনেক অক্ষম লেখকের উপন্যাস-বর্ণিত চিত্রের মত, কেবল শব্দের সমষ্টিমাত্র নহে কিন্তু বর্ণনার সজীবতায় পাঠকের মানস-চক্ষে প্রত্যক্ষবৎ উজ্জ্বল বলিয়া বোধ হয়। অভিজ্ঞ পাঠক চরিত্রচিত্রণের সফল দৃষ্টান্তের মধ্যে তাঁহার জয়সিংহ, শিবাজী, আওরঙ্গজেব, যশোবন্তসিংহ, প্রতাপসিংহ, মানসিংহ, রঘুনাথজী হাবিলদার প্রভৃতি ঐতিহাসিক চিত্র; বিষয়সংস্থানের মধ্যে শিবাজী ও জয়সিংহের কথোপকথন, সায়েস্তা খাঁর সভা হইতে মহাদেওজী ব্রাহ্মণ নামধারী ছদ্মবেশী শিবাজীর কথোপকথন ও কৌশল, তাহার পর যশোবন্ত সিংহকে তাঁহার পক্ষভুক্ত করা, যুদ্ধের পূর্ব্বে মদ্যপ মোরাদ ও চতুর আওরঙ্গজেবের কৌশল বর্ণন, শিবাজী ও জয়সিংহের কথোপকথন, হলদীঘাটার পর প্রতাপসিংহ ও শক্তের পুনর্ম্মিলন; বর্ণনার মধ্যে, জীবন সন্ধ্যার আহেরিয়া বর্ণনা, জীবনপ্রভাতের চতুরচূড়ামণি শিবাজী কর্ত্তৃক পুনা দুর্গ অবরোধ, মাধবীকঙ্কণে আগ্রা ও দিল্লী

মহানগরীতে মোগলদের ভূতপূর্ব্ব সুখৈশ্বর্য্যের চিত্র পাঠকের মানসনেত্রে পরিদৃষ্ট ঘটনাবৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠে। পূর্ব্বোক্তগুণে ঐ সব গ্রন্থের ঐ সব অধ্যায় স্কটের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস "কেনিল্বর্থ" গ্রন্থের রাজ্ঞী এলিজাবেথের রাজসভা বা লিষ্টারের "কেনিল্বর্থ" উৎসব বর্ণনার অনুপম চিত্রের মত সমুজ্জল। পাঠকগণ রমেশচন্দ্রের দিল্লী ও আগ্রার বর্ণনার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের (রাজসিংহে বর্ণিত) দিল্লী ও আগ্রার বর্ণনার চিত্র তুলনা করিলে দেখিবেন যে শেষোক্ত ঐন্দ্রজালিকের মোহিনী তুলিকার বিচিত্র চিত্রের সমান না হউক রমেশচন্দ্রের ঐ সব চিত্র অধিক হীন হইবে না।

তাঁহার সামাজিক উপন্যাসগুলিতে তিনি প্রচলিত সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে (যেমন সংসারে, বিধবাবিবাহ প্রথা সমর্থন করিতে গিয়া) বঙ্গীয় পাঠকের শ্রেণীবিশেষের নিকট অপ্রিয় হইয়াছিলেন। তাঁহার সামাজিক মত এস্থানে আলোচনা করিব না, তবে সংসার ও সমাজ উপন্যাসের সাহিত্যশিল্প প্রশংসনীয়। বিধবাবিবাহ আইনসঙ্গত হইলেও হিন্দুসংস্কারকে এখনও প্রবল বেগে আঘাত করে। রমেশচন্দ্রের সমাজ ও সংসার প্রকাশের সময় ত দূরের কথা (১২৮২ বঙ্গাব্দে সংসার ও ১৩০০ অব্দে সমাজ প্রকাশিত হয়) এখনও ইহা হিন্দু সমাজকে কোনো ঘটনা উপলক্ষে কম আন্দোলিত করে নাই। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রন্থের বর্ণিত নায়ক ও নায়িকা শরত ও সুধামুখীর প্রণয়-চিত্র সাহিত্যশিল্পহিসাবে আদৌ উপেক্ষণীয় নহে। বিরুদ্ধ সংস্কারসত্ত্বেও পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করা অসামান্য সাহিত্যশিল্পের কাজ—যিনি Kingsley চিত্রিত Puritan পরিবারের কঠোরসংযমশাসিতা কন্যার প্রণয়-চিত্র বা শাস্ত্রী মহাশয়ের যুগান্তর গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন তিনি আমাদের এ কথার যাথার্থ্য বিশেষভাবে অনুভব করিবেন।

(আগামীবারে সমাপ্য)

১৩১৭ শ্রাবণ

স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীবীরেশ্বর গোস্বামী

শাসন ও সংস্কারকার্য্য।

তখন মহামতি লর্ড রিপনের রাজ্যশাসনকাল। সকল বিষয়েই জেতা ও বিজিতের মধ্যে যে বিষম প্রভেদ পরিলক্ষিত হয় তাঁহার সমদর্শী উদার অন্তঃকরণ তাহা সহ্য করিতে পারিল না। তাহার ফলে ইলবার্ট বিলের উৎপত্তি। এই বিলের প্রস্তাবিত বিষয় যদ্যপি আইনে পরিণত হইতে পারিত তবে রাজা প্রজার মধ্যে এ চিরাগত প্রভেদের মূলে কুঠারাঘাত হইত তাহার সন্দেহ মাত্র নাই। এ দেশে আমাদের স্বায়ত্তশাসন যতটুকু আয়ত্ত হইয়াছে সকলেরই মূলভিত্তি তিনি। সকলেই জানেন যে ইলবার্ট বিলের প্রস্তাবিত স্বায়ত্তশাসনের কিছুই পরে টিকে নাই। মহদাশয় রিপনের এই সদাশয়তা আর কাজে পরিণত হইতে পারিল না বরঞ্চ বিপরীত উৎপত্তি হইল! হতভাগ্য ভারতবাসীদের দুঃখ দুর্দ্দশার কথঞ্চিৎ লাঘব করিতে গিয়া এই মহামনা ইংরাজ স্বদেশে বিদেশে অপদস্থ হইলেন। এই ইলবার্ট বিলে তখন দেশময় যে কি

তুমুল ঝটিকা উঠিয়াছিল এখন তাহা অনুমান করাও দুঃসাধ্য! ইংরাজ ও ভারতবাসী, শাসিত ও শাস্তা, —দুই জাতির মধ্যে মনোমালিন্য তখন খুব প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। সেই সঙ্কটসময়ে, রমেশচন্দ্র বাঙ্গালার এক সর্ব্বাপেক্ষা উচ্ছৃঙ্খল প্রদেশের শাসনকার্য্যে প্রেরিত হন। তখন এদেশীয়দিগকে কোনো প্রদেশের শাসনকার্য্যরূপ উচ্চভার প্রদান করা যুক্তিযুক্ত হইবে কি না এ দুরূহ সমস্যার মীমাংসা অনেক উচ্চপদস্থ ইংরাজকর্ত্তৃপক্ষের মস্তিষ্ক বিচলিত করিতেছিল। অ্যাংলো ইন্ডিয়ান পত্রের সম্পাদকেরা এরূপ কল্পনাই অসম্ভব বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল। কিন্তু বাখরগঞ্জ প্রদেশ সম্যক্ সুশাসিত করিয়া রমেশচন্দ্র সেই দুরূহ সমস্যার সফল সমাধান করিলেন। ১৮৮৩ হইতে ১৮৮৫ খৃঃ পর্য্যন্ত তিনি বরিশালের মাজিস্ট্রেট ছিলেন। এ সময়ের মধ্যে তাঁহার অধীনস্থ সকল ইংরাজ কর্ম্মচারীই জয়েন্ট্ ও আসিষ্টাণ্ট্ ম্যাজিস্ট্রেট, সিভিল সার্জ্জন্ ও পুলিস সুপারিন্টেন্ডেন্ট্, অপর দিকে এ দেশীয় কর্ম্মচারীবর্গ ও বরিশালের সাধারণ প্রজাপুঞ্জ, সকলেই একবাক্যে তাঁহার শাসনকার্য্যের বিজয় ঘোষণা করিতে লাগিল। কর্ত্তৃপক্ষও তাঁহার শাসনের প্রশংসা করিয়া বাৎসরিক রেজল্যুশনে লিপিবদ্ধ করিলেন। এমন কি স্বয়ং ভারতের তদানীন্তন রাজপ্রতিনিধি লর্ড রিপন এ দেশ হইতে যাইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে ডাকাইয়া বলিয়াছিলেন যে এ দেশ হইতে যাইবার পূর্ব্বে তাঁহার সহিত আলাপ করিবার ইচ্ছাতেই রমেশচন্দ্রকে তিনি ডাকাইয়া আনিয়াছেন। তিনি বলিলেন যে "তোমার শাসনকার্য্যের সাফল্যের সংবাদ ইংলণ্ডে প্রচারিত হওয়া চাই। ব্রিটিশ রাজপুরুষেরা জানুক যে ভারতবাসীরাও উচ্চ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার ও উচ্চ শাসনভার পাইবার সম্পূর্ণ যোগ্য"। এ সব কথায় একদিকে যেমন মহামতি রিপনের সদুদার চরিত্র অপর দিকে সেরূপ রমেশচন্দ্রের কার্য্যদক্ষতা সূচিত হইতেছে।

বঙ্গীয় প্রজাসত্ত্ব আইন ও ঋগ্বেদের অনুবাদ।

ইহার পর রমেশচন্দ্র তাঁহার আজীবনব্যাপী চিন্তার বিষয়—ভারতের চিরদুঃখী কৃষকবর্গের কথা—কিসে তাহাদের অবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতি হইতে পারে, কিসে তাহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইতে পারে—সে বিষয়ে মনোনিবেশ করিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে বহুপূর্ব্বে প্রজাসত্ত্বের ও তাহাদের দেয় খাজানার সম্বন্ধে তিনি ক্ষুদ্রপুস্তিকা লিখিয়াছিলেন এতদিন তাহা কর্ত্তৃপক্ষের অনুগ্রহদৃষ্টিলাভ করে নাই। যখন রমেশচন্দ্রের বহু অনুযোগ ক্রমে স্যার আন্টনি ম্যাক্‌ডোনাল্ডের (অধুনা লর্ড ম্যাক্‌ডোনাল্ড্)—তদানীন্তন রেভিনিউ সেক্রেটারী,—চেতনা হইল, তিনি রমেশচন্দ্রের বিশেষ সাহায্যে ও পরামর্শে বঙ্গীয় প্রজাসত্ত্ব আইনের এক পাণ্ডুলিপি করেন। ১৮৮৫ খৃঃ লর্ড ডফারিনের ব্যবস্থা-সভায় "বঙ্গের প্রজাসত্ত্ব আইন" বিধিবদ্ধ হইয়া রমেশচন্দ্রের ঐকান্তিক চেষ্টা ও আন্দোলনের সাফল্য সূচনা করে। লর্ড ম্যাক্‌ডোনাল্ড্ এ বিষয়ে রমেশচন্দ্র দত্ত কৃত অমূল্য সাহায্য ও পরামর্শের কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন ও ভবিষ্য জীবনেও এ কথা কখনও তিনি ভুলিয়া যান নাই।

চতুর্দ্দশবর্ষের প্রগাঢ় পরিশ্রমজনক চাকুরীর পর তিনি দুই বৎসরের অবসর লইলেন। (১৮৮৫ হইতে ১৮৮৭ খৃঃ)। এই দুই বৎসর অবকাশের প্রথম বৎসর তিনি ভারতে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এই বৎসর তিনি 'সংসার' উপন্যাস রচনা করেন।

পূর্ব্বে উপন্যাস সমালোচনা উপলক্ষে বলিয়াছি যে এ পুস্তকই পরে "The Lake Palms" নামে অনুবাদিত হইয়াছিল। কিন্তু এ সাহিত্যিক চর্চ্চা ছাড়িয়া যখন কতিপয় পণ্ডিতের সাহায্যে তিনি ঋগ্বেদের বাঙ্গালা অনুবাদ করিতে উদ্যত হইলেন তখন দেশব্যাপী এক তুমুল আন্দোলন উঠিয়াছিল। রমেশচন্দ্র দুইটী বিভিন্ন ও বিপরীতগামী আন্দোলনের ঘূর্ণাবর্ত্তে আসিয়া পড়িয়াছিলেন। এক, পাশ্চাত্যভাষায়

ও বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত অথচ সংস্কৃতানুরাগী বঙ্কিমপ্রমুখ শিক্ষিতসম্প্রদায়। ইঁহাদের সংখ্যা এখনকার তুলনায়, তখন অপেক্ষাকৃত অল্প। দ্বিতীয়, অধ্যাপক-পণ্ডিতবর্গচালিত গোঁড়া হিন্দুসমাজ। বঙ্কিমচন্দ্র এ অনুবাদের উচ্চ জয়ধ্বনি করিয়া সাদরে আবাহন করিয়া লইলেন। বঙ্কিমচন্দ্র এ অনুবাদগ্রন্থের যে উচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন অনেকের তাহা স্মরণ না থাকিতে পারে এজন্য এস্থলে উহা উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি লিখিয়াছিলেন যে অন্য যুগে জন্মিলে রমেশচন্দ্র দ্বিতীয় বেদোদ্ধার-কর্ত্তা বেদব্যাস বলিয়া পরিগণিত হইতেন। য়ুরোপে এ ঘটনা ঘটিলে তাঁহার উচ্চ জয়জয়কার পড়িয়া যাইত। এই ত এক পক্ষের কথা। অপর পক্ষ এদিকে প্রতি মাসে, প্রতি সপ্তাহে তাঁহাকে তীব্র কুৎসিত গালাগালি দিয়া মাসিক সাপ্তাহিকের কলেবর পূর্ণ করিতে লাগিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহুবিবাহ ও বিধবাবিবাহের আন্দোলনের পর এরূপ তীব্র আন্দোলন আর কি না সন্দেহ! রমেশচন্দ্র এক্ষেত্রেও তাঁহার অভ্যস্ত বলিষ্ঠ মনস্বিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। যিনি শত্রুপক্ষের গালাগালি বা তীব্র তিরস্কারের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নীরবে নিজের কাজ সমাধা করিয়া তুলিলেন। ১৮৮৬ সালের প্রারম্ভেই সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইল। ইহাই ঋগ্বেদের বঙ্গভাষায় একমাত্র অনুবাদ।

দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার বিলাতযাত্রা, প্রাচীন ভারত সম্বন্ধীয় ইতিহাস ও কমিশনারের পদে নিয়োগ।

দেশভ্রমণে রমেশচন্দ্রের একান্ত অনুরাগ পরিলক্ষিত হইত। ১৮৮৬ খৃঃ প্রারম্ভেই তিনি সংস্কৃতভাষায় লিখিত কাশ্মীরের ইতিহাসের (রাজতরঙ্গিণীর) বিখ্যাত ইংরাজী অনুবাদক সহোদর অগ্রজ যোগেশচন্দ্র ও বাল্যসুহৃদ্ বিহারীলাল গুপ্ত মহাশয়ের সহিত য়্যুরোপ ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। নর্থকেপ্,নর্ওয়ে. সুইডেন্ প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়া যথাক্রমে বেল্জিয়াম্, হলাণ্ড, অষ্ট্রিয়া, জর্ম্মানি প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। য়্যুরোপের প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাসে সুপণ্ডিত রমেশচন্দ্র অতঃপর টাইরোলের (Tyrol) মধ্য দিয়া, গ্রীক ও রোমীয় কাব্যেতিহাসে প্রসিদ্ধ নগরসমূহ—রোম্, পাইসা (Pisa), বোলোনা, নেপলস্, এড্রিয়াটিক উপসাগরের সাম্রাজ্ঞী বলিয়া প্রথিতা, রোমান কবিদের অতুলনীয় বর্ণচিত্রে উদ্ভাসিতা নগরীপ্রধানা ভেনিস্, কবিগুরু দান্তের জন্মভূমি, যাহাকে বায়রণ অকৃতজ্ঞ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন সেই ইতিহাসবিশ্রুত ফ্লরেন্স্ নগরী* ও মিলান্ প্রভৃতি স্থান দর্শন করিলেন। ভিস্যুভিয়সের অগ্নিস্রাবী গহ্বরমুখ (crater) ও উক্ত ভীষণ আগ্নেয়গিরি স্মরণাতীত কাল হইতে যে দুটী প্রাচীন নগরীকে আপনার করাল বহ্নিপ্লাবনে নষ্ট করিয়াছিল—কালে যাহা ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া গিয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে ঢাকিয়া পড়ে—পরে অনুসন্ধিৎসু প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের ঐকান্তিক যত্নে ভূগর্ভ হইতে উদ্ধৃত হইয়া বহুপূর্ব্বযুগের সভ্যতা ও সমাজের উজ্জ্বল সাক্ষ্যস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে—ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সেই দুটী নগরী—হরকিউলেনিয়ম্ ও পম্পিয়াই (Herculaneum and Pompeii) দেখিয়া নয়ন সার্থক করিয়াছিলেন। ইহার পর জেনোয়া নগর হইতে তিনি ফ্রান্স ও তথা হইতে ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিলেন। কিছু দিন পরেই তিনি সপরিবারে ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসেন।

দীর্ঘ অবসরের পর তাঁহাকে পাবনা ও তথা হইতে ময়মনসিংহ প্রদেশে নিযুক্ত হইতে হইল। তথাকার রমেশচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী একজন প্রবীণ ম্যাজিষ্ট্রেট নিজের অবিমৃশ্যকারিতায় উক্ত প্রদেশের হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে মনোমালিন্য বর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছিলেন; রমেশচন্দ্র ঐ প্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়াই নিজের সুশাসনগুণে সেই অশান্ত প্রদেশ অল্প দিনেই সুশান্ত করিয়াছিলেন। চল্লিশ লক্ষ

* "Ungrateful Florence, Dante sleeps afar."

লোকের বাস ময়মনসিংহে—লোক সংখ্যায় বাঙ্গালার একটী সর্ব্বপ্রধান প্রদেশ। এরূপ বড় জেলার শাসনভার পাইয়াও, গুরুতর রাজকার্য্যের মধ্যেও, ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করিয়া, ১৮৮৮ ও ১৮৯০ সালের মধ্যে কি করিয়া তাঁহার "প্রাচীন ভারতের সভ্যতার ইতিহাস" (History of the Civilzation in Ancient India) শীর্ষক বৃহৎ তিন খণ্ডে সমাপ্ত গ্রন্থ প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে এখনও ইহা একমাত্র প্রামাণ্য ইতিহাস। এরূপ বহু বিষয়ের বহুদিনের প্রগাঢ় অধ্যয়ন ও আলোচনার ফল, এরূপ বহ্বায়াসসাধ্য শ্রমসাধ্য সময়সাধ্য ব্যাপারে হস্তক্ষেপ ও সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন ইহা তাঁহার অসাধারণ শ্রমশীলতার উজ্জ্বল নিদর্শন সন্দেহ নাই। কঠোর রাজকার্য্যের জন্য দিবসে তাঁহার নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ ছিল না। নিশীথকালে পর্য্যন্ত, এমন কি কখনও কখনও সমস্ত রাত্রি ধরিয়া তিনি রচনা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। এরূপ শ্রমসহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায় বাঙ্গালী-চরিত্রে অনন্য-দুর্লভ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ডিষ্ট্রীক্ট অফিসার যখন নৌকাযোগে রাজকার্য্যে ভ্রমণার্থ বহির্গত হইতেন তখন তাঁহার বোট পুস্তক, প্রুফ্‌শীট্ ও পাণ্ডুলিপিতে পরিপূর্ণ থাকিত! সে-যাহা হউক কয়েক বৎসরে উক্ত ইতিহাস গ্রন্থের কয়েকটী ভারতীয় ও একটী বিলাতী সংস্করণ মুদ্রিত ও বিক্রীত হইয়া গিয়াছে।

১৮৯০ সালে নাবালক বর্দ্ধমানাধিপতির অভিভাবক স্বরূপে ও তথা হইতে যথাক্রমে দিনাজপুরে ও মেদিনীপুরের শাসনভার প্রাপ্ত হন। সরকার বাহাদুরও তাঁহার রাজকার্য্য ও সাহিত্য-চর্চ্চায় সন্তুষ্ট হইয়া ১৮৯২ সালে তাঁহাকে সি, আই, ই, খেতাব প্রদান করেন। সেই বৎসরের গুরুতর শ্রম ও বর্দ্ধমান এবং দিনাজপুরের ম্যালেরিয়া-বিষে জর্জ্জরিত হইয়া তাঁহাকে দীর্ঘ অবকাশ লইতে বাধ্য করিল।

এই দীর্ঘ অবসরের মধ্যে শরৎ ও শীতে তিনি কাশ্মীর, মসুরি, হরিদ্বার প্রভৃতি উত্তর-ভারতবর্ষের প্রদেশে তাঁহার বাল্যসহচর প্রিয় সুহৃদ বিহারীলাল গুপ্ত মহোদয়ের সহিত ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। ১৮৯৩ সালে তিনি য়্যুরোপ ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। এই সময় তিনি মিঃ লিওটার্ড, বাবু দেবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির সঙ্গে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ স্থাপন করেন। বিলাতে গিয়াও তিনি ম্যালেরিয়ার হাত হইতে সম্পূর্ণ পরিত্রাণ পান নাই। তিনি বোর্ণমাউথ্ (Bornemouth) নামক সমুদ্র-তীরবর্ত্তী নগরে ভগ্নস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য বাস করিতে লাগিলেন। শুনা যায় এখানেও পুস্তক ও পাণ্ডুলিপিতে রাত্রিদিন ব্যাপৃত থাকাতে তাঁহার ল্যাণ্ডলেডি তাঁহার টেবিল হইতে কাগজ পত্র পুস্তকাদি সরাইয়া দিয়াছিলেন। রোগমুক্ত হইয়া জর্ম্মানীয় প্রসিদ্ধ Wisbadenএর Mineral bathsএ স্নান ও জলাদি পান করিয়া সুস্থ হইলেন। এইখানে জর্ম্মান ভাষার ব্যাকরণ ও প্রথম শিক্ষা পড়িয়া তাঁহার অবসর বিনোদন হইত বটে কিন্তু সে ভাষায় অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। ফরাসী ভাষায় তাঁহার অধিকতর দক্ষতা জন্মিয়াছিল। এ ভাষার ঐতিহাসিকগণকে তিনি ইংরাজ ঐতিহাসিকদের অপেক্ষা উচ্চে স্থান দিতেন। ভারতীয় বিদ্যালয়ে ফরাসী ও জর্ম্মান ভাষায় কেন শিক্ষা দেওয়া হয় না এজন্য তিনি আক্ষেপ করিতেন। কি ইতিহাস, কি ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব, কি উচ্চ বিজ্ঞানের চর্চ্চায় ঐ দুটী ভাষায় বিশেষ জ্ঞান থাকা উচিত এই ধারণা তাঁহার ছিল।

রমেশচন্দ্র অস্থায়ী কমিশনার, কর্ম্মত্যাগ, দীর্ঘ বিলাত-প্রবাস ও মহাভারতাদির ইংরাজী অনুবাদ

এই বারেই ঠেকাঠেকি! এখন রমেশচন্দ্রের কমিশনার পদে নির্ব্বাচনের কথা উঠিতেছে! তাঁহার শোচনীয় মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাঁহার জীবনী ও কার্য্যাবলীর যতগুলি সমালোচনা দেখিয়াছিলাম তাহার মধ্যে "ইণ্ডিয়ান ম্যাগেজিন ও রিভিউ" পত্রিকায়

প্রকাশিত প্রবন্ধ ও অল্পের ভিতর "বেঙ্গলীর" প্রবন্ধে প্রকাশিত সমালোচনাই উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হইয়াছিল। বর্ত্তমান লেখকের এ অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধে উক্ত দুটী পত্রিকারই প্রবন্ধ হইতে অনেক উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে এজন্য উভয়ের নিকট বর্ত্তমান লেখক ঋণী। "বেঙ্গলী"-সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ রমেশচন্দ্রের সহাধ্যায়ী, আবাল্যসহচর ও চিরজীবন অকৃত্রিম সুহৃদ্। এজন্য রমেশচন্দ্রের জীবনের কার্য্যাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাঁহার যত জানা সম্ভব এরূপ সুবিধা আর কাহারও ছিল না। এজন্য বেঙ্গলীর প্রকাশিত বৃত্তান্তও বেশ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় কেহই রমেশচন্দ্রের জীবনের এ গূঢ় কথা সত্য স্পষ্ট ও নির্ভীকভাবে সমালোচনা করেন নাই! কেন যে এরূপ প্রদীপ্ত প্রতিভাশালী রমেশচন্দ্র সিভিল সর্ভিসের উজ্জলতম রত্ন বলিয়া সর্ব্বত্র পরিগণিত হইয়াও ২৬ বৎসর প্রশংসাজনক রাজকার্য্যের পর, সমস্ত ভবিষ্যতের উন্নতির জলাঞ্জলি দিয়া, সহসা কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন এ রহস্যের কেহই সফল সমাধান করেন নাই। অনেকে অনেক রকম কল্পনা জল্পনা করিয়াছেন কিন্তু বেঙ্গলী-সম্পাদকের মুখে আমরা এ বিষয়ে সত্যাসত্যের মীমাংসার জন্য কৌতূহলী ছিলাম কিন্তু দুঃখের বিষয় সুরেন্দ্রনাথ (যদি 'বেঙ্গালীর' প্রবন্ধলেখক স্বয়ং সম্পাদকই হয়েন) এ সম্বন্ধে যে উত্তর দিয়াছেন তাহাতে সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারি নাই, সত্যের খাতিরে একথা স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য। দেশের স্বায়ত্ত শাসন ও ভবিষ্যৎ উন্নতির আলোচনায় অধিকতর স্বাধীনতা ও শান্ত-সমাহিত-চিত্তে সরস্বতীর উপাসনায় জীবনের শেষ কয় বৎসর অতিবাহিত করিবার বাসনায় তিনি কমলার স্বর্ণ-মন্দিরের প্রলোভন সম্বরণ করিয়াছিলেন! এ কথা আমাদের মনে লাগে নাই—অন্ততঃ এক দিনও যে রমেশচন্দ্রের সাক্ষাৎসৌভাগ্য পাইয়াছে—একদিনও তাঁহার মনের কথা শুনিয়াছে সে কখনই এ কথায় সায় দিবে না! কোনো কোনো সমালোচক আবার রমেশচন্দ্রের উৰ্দ্ধতন একজন অক্ষম কর্ম্মচারীকে ফেলিয়া তাঁহাকে যে কমিশনার নির্ব্বাচিত করা হইল এ ঘটনা উচ্চ কণ্ঠে সগৌরবে আড়ম্বরের সহিত ঘোষণা করিয়াছেন! কিন্তু এ সর্ভিসের একজন সর্ব্ববাদীসম্মত প্রতিভাশালী ব্যক্তি চিরজীবনের সুশাসনের খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া শেষবয়সে যে সর্ভিসে প্রত্যেক সিভিলিয়ানই কার্য্যশেষে স্থায়ীভাবে কমিশনারের পদ প্রাপ্ত হয় সে সর্ভিসের একজন সর্ব্বোত্তম রত্ন বলিয়া সর্ব্বত্র গৃহীত ও সম্মানিত হইয়াও, লেফ্‌টেনেন্ট্ গর্ভনর হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য রমেশচন্দ্র, অস্থায়ীভাবে কমিশনার হইয়াই অবসর গ্রহণ করিলেন—হায়, এ কথার যথার্থ উত্তর আজ কে দিবে? বহু পূর্ব্বে "সাধনা" পত্রে ও কয়েক বৎসর পূর্ব্বে "প্রদীপ" পত্রে চন্দ্রনাথ বাবু ও শ্রীশবাবুর প্রকাশিত "বঙ্কিম-প্রসঙ্গে" বঙ্কিমচন্দ্র এ কথার যথার্থ উত্তর দিয়াছেন। তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন— "চাকুরী আমার জীবনের অভিশাপ!"—আজকালকার দিনে ইহার অধিক আর কি উত্তর দিব?

যাঁহারা উৰ্দ্ধতন অক্ষম কর্ম্মচারীকে অবহেলা করিয়া রমেশচন্দ্রের অস্থায়ী ভাবে কমিশনার নিযুক্ত হওয়ায় উচ্চকণ্ঠে জয়নাদ করিয়াছেন তাঁহাদের স্মরণার্থ একটী বিস্মৃত কথা স্মরণ করাইতেছি। রমেশচন্দ্র Administration Reportএ বাৎসরিক গভর্মেণ্ট Resolutionএ বহুবার বহু প্রশংসাবাদ পাইলেও কৃষ্ণচর্ম্মের সঙ্গে দোষ কিরূপ অভেদ্যভাবে জড়িত যে পাণ্ডিত্যেও সে গাঢ় কালিমা তিরোহিত করিয়া মনে উদারতা আনিয়া দেয় নাই!— রমেশচন্দ্র যখন বৰ্দ্ধমানের অস্থায়ী কমিশনার নিযুক্ত হন তখন তাঁহার অধীন গ্রীয়ার্সনপ্রমুখ অনেকগুলি ম্যাজিষ্ট্রেট, জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি, সংখ্যায় ৫/৭ জন হইবেন, মনে পড়িতেছে ২ বা ২॥ বৎসরের জন্য সহসা ফার্লো (furlough) নিয়া বসিলেন! এই এক সময়ে, এক যোগে ছুটী গ্রহণ—কি বলিব, এই 'ফর্লোবির্ষা'! (বৈয়াকরণ মহাশয়েরা মাপ করিবেন) মন্দ লোকে মন্দ ভাবেই গ্রহণ করিয়াছিল—দেশী কাগজ পত্রও এঘটনা বড় সুচক্ষে দেখে নাই! বিশেষ গ্রীয়ার্সনের

মত ব্যক্তির এরূপ কার্য্যে যোগ—সেই গ্রীয়ার্সন, যিনি প্রাচ্য ভাষাবিজ্ঞান ও প্রাচ্য বিষয়েরই আলোচনায় জন্ম কাটাইয়াছেন—দেশী সম্বাদপত্রের সম্পাদকেরা নেহাৎ মোলায়েম ভাবে সমালোচনা করেন নাই—ইহাতে ভবভূতির অতুলনীয় ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয় না কি যে "প্রভবতি শুচির্বিম্বোদ্‌গ্রাহে মণির্ন মৃদাংচয়ঃ"—রমেশচন্দ্রের নির্ম্মল যশের উজ্জ্বল প্রতিবিম্ব কয়জন গ্রহণে সমর্থ?

দীর্ঘ ৭ বৎসর ধরিয়া (১৮৯৭ হইতে ১৯০৪ পর্য্যন্ত) তিনি বিলাতে বাস করেন। ইহার মধ্যে একবার লক্ষ্ণৌ- কংগ্রেসের সভাপতি হন। সেবার ও আর একবার ১৯০২ সালে তিনি ভারতবর্ষে আসেন। এই সময়ের রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক সকল গ্রন্থাদিই তাঁহার বিলাতে রচিত হয়। ১৮৯৭ সালে তাঁহার সর্ব্ব কনিষ্ঠা কন্যা বিমলা ও সহধর্ম্মিণীর সমভিব্যাহারে বিলাত যাত্রা করেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ অজয় দত্ত তাঁহাদের পূর্ব্ব হইতেই বিলাতে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের Christ Church কালেজে বি, এ, ডিগ্রী লইয়া ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই সময়েই রমেশচন্দ্র লণ্ডন য়ুনিভার্সিটী কালেজের ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ভারতের বিষয়ে রাজনৈতিক আর দুইজন তাঁহার সহযোগী ছিলেন, দাদাভাই নওরোজী ও উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। নওরোজী পরে পার্লিয়ামেন্টের সদস্য নির্ব্বাচিত হন—সপ্ততিবর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ নওরোজীর ভারতবর্ষের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম তাঁহাকে ভারতবাসীমাত্রেরই নিকট প্রিয় করিয়াছে। বস্তুতঃ উনবিংশ শতাব্দীর শেষে এই তিনজন মনস্বীর ভারতবাসীর দুঃখ দুর্দ্দশা মোচন করিবার জন্য অক্লান্ত ও নিঃস্বার্থ পরিশ্রম একটী চিরস্মরণীয় ঘটনা।

এই রাজনৈতিক আলোচনার মধ্যেও রমেশচন্দ্র তাঁহার প্রিয় সাহিত্যচর্চ্চা ভুলেন নাই। ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে What is bred in the bone will not come out of the flesh. রমেশচন্দ্রেরও ঠিক তাই হইয়াছিল। একটু অনুকূল অবসর পাইয়াই তিনি মহাভারত ও রামায়ণের ইংরাজীতে পদ্যানুবাদ করিবাব বৃহৎ সঙ্কল্প মনোমধ্যে স্থান দিলেন। মহাভারতের কতকটা অনুবাদ করিয়া অধ্যাপক মোক্ষমূলরকে তাঁহার পুস্তক সম্বন্ধে অভিমত জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। নবতি সহস্র শ্লোকে সম্পূর্ণ মহাভারত পাঠ্যাকারে অনুবাদ একপ্রকার অসম্ভব—প্রবীণ ঋষিকল্প অধ্যাপক উত্তরে এ মত প্রকাশ করিলেন। কিন্তু যখন রমেশচন্দ্র আবার উক্ত গ্রন্থের অনুবাদ সম্পূর্ণ করিয়া অধ্যাপককে একখণ্ড উপহার পাঠাইয়াছিলেন তখন তিনি অতিমাত্র প্রীত হইয়া গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দিতে সম্মত হইয়াছিলেন। ইহাই অধ্যাপকের জীবনের শেষ কার্য্য। রমেশচন্দ্রের রামায়ণ ও মহাভারত বিখ্যাত Temple Classics Seriesএ প্রকাশিত হইয়া কয়েক বৎসরের মধ্যে প্রত্যেক পুস্তক ১৫০০০ হাজার কাপি করিয়া বিক্রীত হইয়া গেছে। ইংরাজ জনসাধারণ এ সংস্করণের সানন্দে অভিনন্দন করিয়া লইয়াছিল। শুনা যায় এ গ্রন্থদ্বয়ের সমধিক প্রচারের জন্য ইহা লোকপ্রিয় Every Man's Library সংস্করণে শীঘ্র প্রকাশিত হইবে।

লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের সভাপতি।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে রমেশচন্দ্র ইংলণ্ডে প্রবাসকালের মধ্যে ইংরাজ জনসাধারণ কর্ত্তৃক বহুবার দুর্ভিক্ষ মহামারী সীমান্ত-যুদ্ধে প্রপীড়িত এ হতভাগ্য দেশের সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে আহুত হন। তিনিও তাঁহার অভ্যস্ত অভিজ্ঞতা, সত্যনিষ্ঠা, নির্ভীকতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার সহিত ব্রিটিশ জনসাধারণের কৌতূহল উদ্রেক করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার এ নিঃস্বার্থ দেশহিতৈষণা তাঁহার দেশবাসীরা ভুলে নাই। তাহারা তাহাদের জাতীয় মহাসভার সভাপতিপদে বরণরূপ সর্ব্বোচ্চ সম্মান তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিল। পূর্ব্বে যাঁহারা তাঁহাকে চাক্ষুষ দেখে নাই তাঁহারা সভামণ্ডপে তাঁহার প্রতিভাদীপ্ত উজ্জ্বল নয়ন, গম্ভীর মুখকান্তি, সরস্বতীর সুখকুঞ্জের ন্যায় বিশাল ললাট, উন্নত বলিষ্ঠ দেহ ও মেঘমন্দ্র তেজস্বিনী বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল। তিনি স্বীয়

বক্তৃতায় কংগ্রেসের স্রোত ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। দুর্ভরকর-পীড়িত কৃষক ও খামখেয়ালি-খাজানা-দায়গ্রস্ত জমিদার উভয় শ্রেণীর জন্যই তিনি ওকালতি করিয়াছিলেন। এসম্বন্ধে অনুসন্ধান, বিষয় সংস্থানে ও পুঙ্খানুপুঙ্খ statistics প্রয়োগে তিনি ইংরাজকেও বিস্মিত করিয়াছিলেন।

কর্জ্জনের সহিত মসীযুদ্ধ ও Economic History of India.

ইহার ফলে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলে সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত ও সর্ব্বকার্য্যে বিশারদ কর্জ্জন তাঁহাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। তিনি উক্ত রাজপ্রতিনিধির সমক্ষে রাইয়তী ও জমিদারী ভূসম্পত্তির দেয় খাজানার একটা স্থায়ীভাবে সীমা নির্দ্দেশ করিতে অনুরোধ ও স্বদেশীদের জন্য দেশের শাসনকার্য্যে কিঞ্চিৎ অধিকার, প্রাদেশিক ও ইম্পীরিয়াল মন্ত্রণাসভায় অধিক সদস্য নিয়োগ প্রভৃতি বিষয়ের সম্বন্ধে অনুরোধ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ তর্ক হইল। তর্কের পর কর্জ্জন এই প্রশ্ন করিলেন—সে প্রশ্ন তিনি তাহার পর অনেক বার অনেককেই করিয়াছেন—যে, "After all is not the rule of one man the best form of rule in India?"—দুঃখের বিষয় যে ভারতসচিব তাঁহার প্রেরিত আদুরে রাজপ্রতিনিধির উর্ব্বরমস্তিষ্কে one-man rule theoryটা পাকিবার আর অবসর দিলেন না।

রমেশচন্দ্র এরূপ সহজে ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না। তাঁহার Open Letters to Lord Curzon প্রথমে পুস্তিকাকারে ও ইংলণ্ডে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। ইহার পর বিলাত গিয়া ভারত হইতে প্রত্যাগত যশস্বী অ্যাংলোইণ্ডিয়ান্ ভারত- শাসনকর্ত্তাদের সঙ্গে একত্রে সহি করিয়া ভারতসচিবকে ১৯০০ সালের ডিসেম্বর মাসে এক দরখাস্ত পেশ করিলেন। ভারতের জমির খাজানা আদায়ের একটা সীমা নির্দ্দেশ এই দরখাস্তের উদ্দেশ্য ছিল।

বাধ্য হইয়া লর্ড কর্জ্জনকে জানুয়ারী ১৯০২ সালে ইহার উত্তর দিতে হইয়াছিল। তিনি একটী Resolutionএ তাঁহার Land Revenue Policyটী ব্যক্ত করিলেন। কৃষকদের অবস্থার সম্বন্ধ কোনো অনুসন্ধান নাই, কমিশনে উপস্থিত দেশীয় মনস্বী অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ হইল না—এই মারাত্মক বিষয়ে, যেখানে কত মূক শতসহস্র ভারতসন্তানের মরণ বাঁচন নির্ভর করিতেছে—সে বিষয়ে কেবলমাত্র রাজকর্ম্মচারীদের মতমাত্রের উপর নির্ভর করিয়া এক Resolutionএই এ বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া দিলেন!

কর্জ্জনের এ অকিঞ্চিৎকর Resolution কালের ফুৎকারে কোথায় উড়িয়া গিয়াছে কিন্তু রমেশচন্দ্র প্রগাঢ় পরিশ্রম অধ্যয়ন ও অনুসন্ধানের পর ২০০ শত Blue Book আদ্যোপান্ত তন্ন তন্ন করিয়া ব্রিটিশ রাজত্বের প্রারম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত রাজস্ব, জমির বন্দোবস্ত ও দেশীয় শিল্পের ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়া যে পুস্তক রচনা করিলেন—তাঁহার সেই Economic History of India ও Victorian Era তাঁহার শেষ জীবনের অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ। ইহা যে-কোনো দেশের যে-কোনো ঐতিহাসিকের গৌরবের সামগ্রী। এতৎসত্ত্বেও আবার পাইওনীয়ার তাঁহার অভ্যস্ত সুরুচির সহিত রমেশচন্দ্রের মৃত্যুকালীন তীব্র বিদ্রূপের সুরে সমালোচনায় একথা বলিয়াছিলেন যে "রমেশচন্দ্র জীবনে অনেক বিষয়েই চালাকি করিতে গিয়াছিলেন কিন্তু Land Revenue সম্বন্ধে কর্জ্জনের সহিত যখন যাদু চালাকি করিতে যান তখন অভিজ্ঞ (!) কর্জ্জনের কাছে বেশ জব্দ হইতে হইয়াছিল! কর্জ্জনের Land Revenue Policy সম্বন্ধে Resolution রূপ Nasmyth Hammer এর আঘাতে বাছাকে আর রা-কাড়িতে হয় নাই!" এরূপ পক্ষপাতমূলক কথায় কাহারো কোনো ক্ষতি নাই কিন্তু ভবিষ্যদ্বংশীয় লোকেরা ও সত্যপ্রিয় সমদর্শী ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষ লেখনী বিচার করিবে যে এ Nasmyth Hammer কাহার, কর্জ্জনের না রমেশচন্দ্রের? পাইওনীয়ারের চন্দ্রে ধূলি নিক্ষেপ রূপ বাতুলের প্রলাপে কিছুই ক্ষতি নাই— রমেশের

যশঃ ধূলিমলিন করিবার তাহার প্রয়াস ঠিক মণিতে ধূলি লেপন—"কিমপৈতি রজোভিরৌর্ব্বরৈবকীর্ণস্য মণের্মহার্ঘতা"?

'মণি কাদব লপটায় রে
তথি কি মণিক গুণ যায় রে?'

উপসংহার।

রমেশচন্দ্র যখন বরোদার দেওয়ানের পদে প্রতিষ্ঠিত হন তখন কিরূপে পূর্ব্বসঞ্চিত দরিদ্রের পীড়াজনক বহুল করভার মার্জ্জনা করাইয়া, চুঙ্গির (octroi) মাশুল লোপ করিয়া, ধনীদের দেয় Income Tax স্থাপন করিয়া, আমদানীর দ্রব্যের উপর কষ্টকর মাশুল তিরোহিত করিয়া, বিচার ও শাসন বিভাগ সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া, ভবিষ্যতে উভয় বিভাগের উচ্চপদ নির্ব্বাচনপ্রণালীর উপর স্থাপনা করিয়া—ভবিষ্যতে যোগ্য কর্ম্মচারী নিয়োগের পথ করিয়া দিয়া—এক কথায় ক্ষুদ্র গ্রাম হইতে উচ্চ তালুকগুলিতেও সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া—মহামতি গায়কবাড়ের আদেশে প্রথম শিক্ষা অবৈতনিক করিয়া, রাজব্যয়ে চালিত তুলার কল প্রভৃতি প্রাইভেট সওদাগরদের হস্তে দিয়া, কল নির্ম্মাণে রাজার সহিত প্রজার অসম প্রতিযোগিতা দূর করিয়া যে "দরিদ্রকা দোস্ত" "গরীবের মা বাপ"—ঐ দেশে এ সম্মানিত উপাধিলাভ করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার থাকিলেও এ সময় নহে।

তাঁহার Decentralization Committeeর সভ্য হওয়াকেও তাঁহার শেষ জীবনের অমূল্য ঘটনা মনে করিনা। তবে সাহিত্যিক রমেশচন্দ্র, দেশবৎসল রমেশচন্দ্র, শাসনকর্ত্তা রমেশচন্দ্র এই ত্রিমূর্ত্তির ভিতর খাঁটি মূর্ত্তি যাঁহার দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছে—যিনি সেই ভিতরের মানুষটীকে দেখিয়াছেন, তাঁহার উৎসাহবাণী কয়টী সাহিত্যচর্চ্চায় জীবনের পাথেয়স্বরূপ মানিয়া অগ্রসর হইয়াছেন তিনিই ধন্য হইয়াছেন সন্দেহ নাই। যদি সেই প্রকৃত মানুষটীকে আপনাদের দেখাইতে পারিতাম তবে মনের ক্ষোভ মিটিত। কি বরোদায় দেওয়ানের শরচ্চন্দ্রালোকিত রাজপ্রাসাদে 'গর্‌ক' সময়ের নাচগানের মধ্যে—সেই বিভিন্নজাতি ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অতিথি অভ্যাগতের মধ্যে, সেই গুজরাটী ভাটিয়া, ওস্‌ওয়ান্, মরাঠী, জৈন ও পার্শী নিমন্ত্রিত স্ত্রীপুরুষদের মধ্যে, কি স্বপরিবারে স্বগৃহে আত্মীয় বালকের সঙ্গে বালকের ক্রীড়ায় যোগদানে, কি বন্ধুবর্গের সঙ্গে সরল অমায়িক ব্যবহারে নিভৃত জীবনে, যে রমেশচন্দ্রের সঙ্গে এরূপ পরিচয়ে গৌরবান্বিত বোধ করিয়াছে সে প্রকৃত মানুষটীর কতক সন্ধান পাইয়াছে সন্দেহ নাই। তাঁহার বন্ধুবৎসলতা অমায়িকতা বিদ্যোৎসাহ তাঁহাকে সর্ব্বজনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল।

কবিবর রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "এই কথা স্মরণে মুদ্রিত করিয়া সেই বাংলা লেখকদিগের গুরু, বাংলা পাঠকদিগের সুহৃদ্ এবং সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা মাতৃবৎসল প্রতিভাশালী সন্তানের নিকট হইতে বিদায়গ্রহণ করি, যিনি জীবনের সায়াহ্ন আসিবার পূর্ব্বেই, নূতন অবকাশে নূতন উদ্যমে নূতন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার প্রারম্ভেই, আপনার অপরিম্লান প্রতিভারশ্মি সংহরণ করিয়া বঙ্গসাহিত্যাকাশ ক্ষীণতর জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভের কোনো বর্ষশেষে পশ্চিম দিগন্তসীমায় অকালে অস্তমিত হইলেন।"

১৩১৭ ফাল্গুন

স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ

প্রসিদ্ধ অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা; অমিয় নিমাই চরিত, কালাচাঁদ গীতা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের রচয়িতা; পরম তেজস্বী, অথচ বিনয়ী ভক্ত বৈষ্ণব শিশিরকুমারের মৃত্যুতে বঙ্গদেশ একটি সুসন্তান হারাইয়াছে।

শিশিরকুমার যৌবনের প্রারম্ভকাল হইতেই লোকসেবায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮/১৯ বৎসর বয়সে তিনি নীলকরদিগের অত্যাচারে প্রপীড়িত রায়তদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়া লেখনীধারণ করেন এবং হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকায় ক্রমাগত অত্যাচারকাহিনী নির্ভীকভাবে প্রকাশ করিতে থাকেন। ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারীরাও তখন নীলকর সাহেবদের পৃষ্ঠপোষক ছিল; তাহাদের ভ্রুকুটিও যুবক শিশিরকুমারকে ব্রতভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। মুসলমান রায়তেরা কৃতজ্ঞতাভরে শিশিরকুমারকে "সিন্নিবাবু" বলিয়া সম্মান দেখাইত।

শিশিরকুমার মাতৃভক্ত ছিলেন। তাঁহাদের বাসগ্রাম পৌলা মাগুরা সামান্য গ্রাম; সেখানে বাজার হাট কিছুই ছিল না। শিশিরকুমার ভ্রাতাদিগের সহযোগিতায় সেখানে বাজার বসাইয়া মায়ের নামে নাম রাখেন "অমৃতবাজার" এবং তাহা হইতে সমগ্র গ্রাম তাঁহার মায়ের নামেই পরিচিত হইয়া আসিতেছে।

গ্রামের অধিকতর উন্নতি করিবার জন্য শিশিরকুমার স্বগ্রামে সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করিবার সঙ্কল্প করিয়া কলিকাতায় আসেন এবং নিজ হাতে ছাপাখানার কম্পোজ, ছাপা প্রভৃতি কাজ শিখিয়া স্বগ্রামে একটি কাঠের প্রেস ও কিছু পুরাতন হরপ লইয়া "অমৃত প্রবোধিনী পত্রিকা" নামে বাংলা পাক্ষিক পত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। এই পত্রিকা সেই সুদূর মফস্বলে অধিকদিন স্থায়ী হইতে পারে নাই।

সেই সময় সভ্রাতা শিশিরকুমারের উদ্যোগে গ্রামে ভ্রাতৃসভা, ব্রহ্মসভা ও হরিসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভায় তাঁহারা বক্তৃতা দিতেন এবং দুঃস্থ নরনারীকে সাহায্য করিবার ব্যবস্থা করিতেন। এমন কি তাঁহারা অন্ত্যজ জাতির শব সৎকার পর্য্যন্ত করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না।

শিশিরকুমারের পিতা বিশেষ সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার সেই গুণ পুত্রগণে বর্ত্তিয়াছিল, এবং শিশিরকুমারে তাহা সবিশেষ স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছিল। তাঁহারা যাত্রার দল করিয়াছিলেন; শিশিরকুমার অভিনয়ের পালা ও গান রচনা করিতেন; তাঁহার রচিত গানগুলির পদ বড় সুমধুর ও কবিত্বময় হইত। স্বর্গীয় দিনবন্ধু মিত্র ইহাঁদের ভ্রাতৃপ্রেম দেখিয়া ইহাঁদের বলিতেন "সুখী পরিবার"।

ইহাঁদের সর্ব্বকনিষ্ঠ ভাই হীরালাল ১৬ বৎসর বয়সে জগতের নরনারীর দুঃখে ব্যথিত হইয়া ভাবাবেগে আত্মহত্যা করেন। তিনি বলিয়াছিলেন—জগতের দুঃখ নিবারণে আমি যদি কিছু না করিতে পারি তবে আমার মরণই মঙ্গল!

শিশিরকুমারের প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর তিনি অবলম্বন স্বরূপ পুনরায় এক সাপ্তাহিক বাংলা সংবাদপত্র প্রচার করেন এবং তাহার নাম রাখেন "অমৃতবাজার পত্রিকা"। অতি অল্প দিনেই ইহার নির্ভীক উক্তির প্রতি সরকারের নজর পড়ে; এবং ৫ মাস পূর্ণ না হইতেই অমৃতবাজার পত্রিকার

বিরুদ্ধে মোকদ্দমা আরম্ভ হয়। আট মাস মোকদ্দমার পর যদিও শিশিরকুমার অব্যাহতি লাভ করেন তথাপি তাঁহার পরিবার নিঃস্ব হইয়া পড়েন।

এই সময় আবার যশোহরে ম্যালেরিয়ার ভীষণ প্রাদুর্ভাব হওয়ায় শিশিরকুমার অধিক সুদে এক শত টাকা কর্জ্জ করিয়া সপরিবারে কলিকাতায় আসেন। এই সব কারণে দুমাস পত্রিকা বন্ধ ছিল। কলিকাতায় আসিয়া উহা পুনঃ প্রচারিত হইতে লাগিল এবং উহার অর্দ্ধেক ইংরাজি অর্দ্ধেক বাংলা হইল। ইংরাজি প্রবন্ধ শিশিরকুমারই মনে মনে রচনা করিয়া একেবারে হরপে কম্পোজ করিতেন, কাগজে লিখিতে হইত না।

দুই সপ্তাহের মধ্যে শিশিরকুমারের তীব্র ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও নির্ভীক মতপ্রকাশের জন্য পত্রিকা প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিল। শিশিরকুমারের দেশভক্তি ও নেশন সংগঠনের চেষ্টা কর্ত্তৃপক্ষেরও সম্মান আদায় করিল। সার এশলি ইডেন, বাংলার ভূতপূর্ব্ব ছোট লাট, অমৃতবাজার পত্রিকাকে সরকারী কাগজ করিবার প্রস্তাব করেন; কিন্তু শিশিরকুমার বলেন—দেশে অন্তত একখানাও স্বাধীন মতের কাগজ থাকা দরকার! ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ছোটলাট দেশীয় ভাষায় পরিচালিত সংবাদ পত্রের পরিচালন সম্বন্ধে এক কঠিন আইন প্রচার করিলেন। অমৃতবাজার পত্রিকা আইন প্রচারের পরদিনই সম্পূর্ণ ইংরাজি হইয়া সেই আইনের লোলুপ কবল এড়াইল। এই সময় হইতে দেশের সকলবিধ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে শিশিরকুমার অগ্রণী হইয়া দেশের অশেষবিধ কল্যাণের সহায় হইয়াছিলেন।

অন্তজীবনে তিনি ধর্ম্মসাধনে মনোনিবেশ করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মের গোঁড়া হইয়া উঠেন। সেই সাধনার ফলস্বরূপ তাঁহার বিরচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থরাজি সকল সম্প্রদায়েরই শ্রদ্ধার সামগ্রী হইয়াছে। শেষ দশায় শিশিরকুমার যথার্থ বৈষ্ণবের বিনয় ভক্তি বৈরাগ্য ও যোগ লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। ভারতবর্ষের জীবনের ইহাই পরিণতি—জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তির সমন্বয় করাই ভারতের সাধনা। শিশিরকুমার ভারতের সুসন্তান ছিলেন এ বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই।

১৩২৩ বৈশাখ

ব্যোমকেশ মুস্তফী।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের মৃত্যুতে বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। তিনি ধনী ছিলেন না, বিদ্বান ছিলেন না, প্রতিভাশালী ছিলেন না; বাগ্মী ছিলেন না, বিখ্যাত সাহিত্যিক ছিলেন না; কিন্তু হিতব্রত ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের জন্য তিনি বহুবৎসর ধরিয়া অক্লান্তভাবে অবিরত নিঃস্বার্থ পরিশ্রম করিয়া আসিতেছিলেন। ইহা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে যে তিনি এই কার্য্যে অকাতরে সময় ও শক্তিনিয়োগ না করিলে পরিষদ যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, ইহার সেরূপ উন্নতি এখনও হইত না। ব্যোমকেশ বাবুর সাংসারিক অসচ্ছলতা খুব ছিল। তিনি পরিষদের

জন্য যত পরিশ্রম করিতেন, যত সময় দিতেন, অর্থোপার্জ্জনে তাহা নিয়োগ করিলে সম্ভবতঃ সাংসারিক অবস্থার অনেকটা উন্নতি করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া পরিষদেরই সেবা করিয়া গেলেন। ইহাই তাঁহার মহত্ত্ব। এরূপ মহত্ত্ব কোথাও সুলভ নহে। বাংলাদেশের "গণ্যমান"দের তালিকায় যে তাঁহার মত লোকের নাম নাই, ইহা ভালই। অকপট সেবকদের জন্য যে নিভৃত নিলয় নির্দ্দিষ্ট আছে, তথায় তাঁহার জন্য আসন বিছান ছিল। সেই স্থান অধিকার করিতে তিনি চলিয়া গেলেন।

মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৪৭ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। তিনি ক্ষয়রোগে ভুগিতেছিলেন।

১৩২৪ আশ্বিন

সারদাচরণ মিত্র।

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ সারদাচরণ মিত্র মহাশয় সম্প্রতি দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি বাল্যে ও যৌবনে একজন ধীমান্ ছাত্র ছিলেন, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ সম্মান প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ; তাহা তিনি পাইয়াছিলেন। হাইকোর্টে ওকালতীতে কৃতিত্ব লাভ করিবার পর তিনি জজ নিযুক্ত হন। জজিয়তীতে তিনি বিচারপটুতা ও স্বাধীনচিত্ততার পরিচয় দিয়াছিলেন। বঙ্গ বিভাগের পর স্বদেশী আন্দোলনের সময় কোন কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি তাঁহার সুবিচার ও স্বাধীন চিত্ততায় কোন কোন সরকারী কর্ম্মচারীর অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। তিনি "স্বরাজ" কথাটির যে-রূপ সুব্যাখ্যা তাঁহার একটি রায়ে করেন, তাহাও বৈধ আন্দোলনকারীদের পক্ষে সুবিধাজনক হইয়াছিল।

তিনি কেবল ওকালতী ও জজিয়তী করেন নাই; দেশের অন্য অনেক কাজেও হাত দিয়াছিলেন, —যদিও অনেকগুলিতে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সহযোগিতায় তিনি প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ প্রকাশ করেন। বিদ্যাপতির পদাবলী এই গ্রন্থে নিবিষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার রচিত "উৎকলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" প্রবাসীতে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি অনেক বৎসর বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের এবং সাহিত্যসভার সভাপতি ছিলেন। সমগ্র ভারতবর্ষে সমুদয় দেশভাষায় দেবনাগরী লিপি যাহাতে ব্যবহৃত হয়, এইজন্য একলিপিবিস্তারপরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি ইহার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। এই পরিষৎ হইতে "দেবনাগর" নামক একটি সাময়িক পত্র কিছুদিন বাহির হইয়াছিল। তাহাতে বাংলা, হিন্দী, ওড়িয়া, মরাঠী, গুজরাতী, তামিল, তেলুগু, প্রভৃতি ভাষায় রচিত প্রবন্ধ নাগরী অক্ষরে ছাপা হইত।

তিনি বাঙালী কায়স্থদের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বৈবাহিক আদান প্রদান চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। নিজের পরিবারে রাঢ়ী ও বঙ্গজ কায়স্থ শ্রেণীর মধ্যে এইরূপ বিবাহ দিয়া এ

বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি শুধু বাঙালী কায়স্থদের মধ্যে এইপ্রকার একতা সম্পাদনের চেষ্টা করিয়া ক্ষান্ত হন নাই; বিহার, আগ্রা-অযোধ্যা, প্রভৃতির কায়স্থদের সঙ্গেও এইরূপ মিলনের পক্ষপাতী এবং তজ্জন্য যত্নবান্ ছিলেন। বরপণ রহিত করিতে তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং তজ্জন্য নিজের পরিবারে ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল, যে, কায়স্থরা ক্ষত্রিয়। তাঁহার সম্পাদিত "কায়স্থ-পত্রিকায়" এই মত প্রচারিত হইত, এবং কায়স্থ সভা দ্বারা কায়স্থদের মধ্যে উপনয়ন সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইতেছে।

তিনি কিছুদিন বেথুনকলেজ কমিটির সম্পাদক ছিলেন। তিনি হিন্দুসমাজভুক্ত ছিলেন, কিন্তু মহাকালী পাঠশালাব মত বালিকাদিগকে প্রধানতঃ স্তোত্রপাঠ, নৈবেদ্য সাজান ও শিবপূজা শিক্ষা দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। বালিকারা যাহাতে জ্ঞানলাভ করিতে পারে, এবং গৃহস্থালির কাজ ভাল করিয়া করিতে পারে, প্রধানতঃ এইরূপ শিক্ষারই সপক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

তিনি শিক্ষিত লোকদের কৃষিবৃত্তি অবলম্বনের পক্ষে ছিলেন, এবং নিজেও কিছু কিছু চাষ করিয়াছিলেন। চিনির কারখানা প্রভৃতিতেও তিনি মন দিয়াছিলেন।

তাঁহার জন্মস্থান পানিসেয়ালা গ্রাম তাঁহার খুব প্রিয় ছিল। তিনি সেখানে প্রায়ই যাইতেন, এবং তথাকার রাস্তা ঘাট পুষ্করিণী নর্দামা প্রভৃতির উন্নতির জন্য অনেক চেষ্টা ও অর্থব্যয় করিযাছিলেন। তাঁহার ঐ গ্রামের ম্যালেরিয়া নিবারণের চেষ্টা অনেকটা সফল হইয়াছিল।

১৩২৫ জ্যৈষ্ঠ

পিয়ার্সন সাহেবের গ্রেপ্তার সংবাদ।

কাগজে দেখিলাম চীনের রাজধানী পেকিং শহরে ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ রাজনৈতিক অপরাধে পিয়ার্সন সাহেবকে গ্রেপ্তার করিয়া শাংঘাই লইয়া গিয়াছেন। তিনি কি "অপরাধ" করিয়াছেন, এখনও জানা যায় নাই। আমরা তাঁহাকে সাধু, শান্ত, ও মহৎপ্রকৃতির লোক বলিয়া জানি। তিনি ভারতবর্ষের লোকদের অকৃত্রিম বন্ধু। দক্ষিণআফ্রিকায় ভারতীয়দের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া তিনি ও মিঃ এণ্ড্রুজ্ তাহাদের দুঃখ ও লাঞ্ছনা নিবারণের জন্য প্রভূত চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং তাহার কিছু ফলও হইয়াছিল। যাঁহারা একটি মাছিকেও আঘাত করিতে অনিচ্ছুক, কিন্তু সত্য ন্যায়ের জন্য প্রাণ দিতেও পশ্চাৎপদ হন না, পিয়ার্সন সাহেবকে আমরা সেই শ্রেণীর লোক বলিয়া মনে করি।

১৩৩০ কার্ত্তিক

উইলিয়ম্ উইন্‌ষ্টান্‌লী পিয়ার্সন্

শান্তিনিকেতন আশ্রমের অন্যতম অধ্যাপক, ভারতবর্ষের অকৃত্রিম বন্ধু, সকল জাতির স্বাধীনতার একান্ত অনুরাগী, মানবপ্রেমিক উইলিয়ম্ উইন্‌ষ্টান্‌লী পিয়ার্সনের মহাশয়ের ইটালীতে আকস্মিক মৃত্যুসংবাদে অত্যন্ত ব্যথিত হইলাম।

১৩২৭ অগ্রহায়ণ

বিশ্বপর্য্যটক লর্ড রোনাল্‌ড্‌শে।

বাংলাদেশের বর্ত্তমান গভর্ণার লর্ড রোনাল্‌ড্‌শে বহু দেশ পর্য্যটন করিয়া অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। তেরো বৎসর আগে তিনি পর্য্যটন করিতে করিতে চীনদেশে যান। যখন বৃটিশ-অধিকৃত চীনদেশের টেঞ্জিয়ে শহরে গিয়া উপস্থিত হন, তখন সেখানে প্রবাসীর পাঠকদের পরিচিত পুরাতন লেখক শ্রীযুক্ত রামলাল সরকার্ ডাক্তার ছিলেন। তাঁর ডাক্তারখানায় লর্ড রোনাল্‌ড্‌শে উপস্থিত হইলে তিনি অভ্যাগতকে না চিনিয়াও খাতির করিয়া বসিতে চৌকী দেন ও জিজ্ঞাসা করেন—তাঁর কি চাই? লর্ড রোনাল্‌ড্‌শে চোখের পীড়ার ঔষধ কিছু বোরিক-এসিড চাহিয়া বলেন—ঔষধটি যেন কমিশনার অফ্ কাষ্টমস্ মিষ্টার মেজের কাছে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। রামলাল-বাবু তখন অভ্যাগত রোগীর সাম্‌নে একটুক্‌রা কাগজ ও পেন্সিল দিয়া তাঁর নাম লিখিয়া দিতে অনুরোধ করেন। পর্য্যটক রোগী তখন ডাক্তারকে নাম লিখিয়া দেন—লর্ড রোনাল্‌ড্‌শে। রামলাল-বাবু একজন অভিজাত লর্ডের সাদাসিধা চালচলন দেখিয়া ও অমায়িক ব্যবহারে প্রীত হইয়া অভ্যাগত লর্ডের একটি ফটোগ্রাফ লইবার প্রস্তাব করেন। লর্ড রোনাল্‌ড্‌শে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া পরদিন বেলা দশটার সময় পুনরায় ডাক্তারখানায় আসিতে প্রতিশ্রুত হন। পরদিন ১০টার সময় রামলাল-বাবু ক্যামেরা সাজাইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; ঠিক কাঁটায় কাঁটায় দশটায় সময় লর্ড রোনাল্‌ড্‌শে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং রামলাল-বাবু তাঁর বসা ও দাঁড়ানো দুই ধরণের দুখানি ফটোগ্রাফ তুলিয়া লইলেন। লর্ড রোনাল্‌ড্‌শে ফটোগ্রাফের নেগেটিভ দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলে রামলাল-বাবু তাঁর নোটবুক বাহির করিয়া লর্ড পর্য্যটকের ভ্রমণকাহিনী লিখিয়া দিতে অনুরোধ করেন। লর্ড রোনাল্ডশে তাতে লেখেন যে তিনি ইংলণ্ড হইতে রওনা হইয়া প্রথমে কানাডায় যান; সেখান হইতে ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্ হইয়া জাপানে আসেন; সেখান হইতে দাঞ্চুরিয়া ঘুরিয়া টেঞ্জিয়ে উপস্থিত হন। তার পর তিনি বর্ম্মা দেখিয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পরে পাব্‌লিক সার্ভিসেস্ কমিশনে নিযুক্ত হইয়া ভারতের বিভিন্ন প্রদেশেও পর্য্যটন করেন।

১৩২৭ চৈত্র

সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

লেফ্‌টেন্যাণ্ট্‌-কর্ন্যাল্‌ সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় একজন বিখ্যাত অস্ত্রচিকিৎসক ছিলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের যতগুলি পরীক্ষা দিয়াছিলেন সবগুলিতেই খুব কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। যে-সকল কর্ম্মীর চেষ্টায় বেলগাছিয়ায় কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যে তাঁহার স্বাধীনচিন্ততা প্রকাশ পাইত। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে শুশ্রূষাকারীর দল এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পল্টন গঠনের জন্য খুব পরিশ্রম করিয়াছিলেন, এবং তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে অনারারি লেফ্‌টেন্যাণ্ট্‌-কর্ন্যাল্‌ উপাধি প্রদান করেন।

স্যার্‌ রাসবিহারী ঘোষ

স্যার্‌ রাসবিহারী ঘোষ আইনজ্ঞদিগের অগ্রণী এবং অতিশয় বিদ্বান্‌ ও মনস্বী ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স পঁচাত্তরের উপর হইয়াছিল; কিন্তু মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্ব পর্য্যন্তও তিনি প্রখর বুদ্ধি ও অগাধ আইনজ্ঞান সহকারে ওকালতী করিয়া গিয়াছেন। এত বয়সেও তাঁহার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার বা স্মৃতিশক্তির হ্রাস হয় নাই। শেষ বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার অধ্যয়নে অনুরাগ প্রবল ছিল। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তিনি অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহার লাইব্রেরীতে বিস্তর পুস্তক ছিল। তাঁহার বক্তৃতায় তাঁহার বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি, পাণ্ডিত্য এবং রচনাপটুতার পরিচয় পাওয়া যাইত। লর্ড কর্জন্‌ যখন পাশ্চাত্য মহাদেশকে সত্যবাদিতার আকর এবং প্রাচ্য মহাদেশকে মিথ্যার কার্‌খানা বলিয়া মিথ্যা নিন্দাবাদ প্রচার করেন, তখন কলিকাতার টাউন হলে জনসাধারণের প্রতিবাদ-সভার সভাপতিরূপে ঘোষ মহাশয় একটি তেজস্বিতা-ও-গাম্ভীর্য্যপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

তিনি ওকালতী করিয়া লক্ষ-লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। দানও তেমনি প্রচুর পরিমাণে করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি কৃত্রী ছাত্র; উহাকে তিনি প্রায় চব্বিশ লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি একলক্ষ টাকা দান করেন। জাতীয় শিক্ষাপরিষদের তিনি সভাপতি ছিলেন। ইহাকে তিনি তাঁহার শেষ উইল দ্বারা আট হইতে দশলক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। ঠিক্‌ কত লক্ষ বলা যাইতেছে না এইজন্য, যে, তাঁহার বিস্তর সম্পত্তি নানা কোম্পানীর অংশের আকারে আছে। তাহার সাময়িক বাজার দর অনুসারে মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি হইতে পারে। তাঁহার বর্দ্ধমান-জেলাস্থিত জন্মগ্রামের ইংরেজী বিদ্যালয়কে তিনি দেড়লক্ষ টাকা, এবং আইন-বহি ছাড়া তাঁহার লাইব্রেরীর আর-সব রকমের বহি

দান করিয়া গিয়াছেন। তদ্ভিন্ন ঐ গ্রামে একটি শিবমন্দিরের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়া গিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি প্রথমে দশ লক্ষ, তাহার পর এগার লক্ষের উপর এবং শেষ উইল দ্বারা আড়াই লক্ষ টাকা দিয়া গিয়াছেন। প্রথম দুটি দানের যথোচিত সদ্ব্যবহার এবং যথেষ্ট ফললাভ এখনও হইয়া উঠে নাই। কৰ্ম্মীদের নিয়োগ-প্রণালী কিরূপ হইলে এবং অন্য বন্দোবস্ত কিরূপ হইলে, সুফল হইতে পারিত, বলা সহজ নহে। কারণ কৌশলী লোকের পক্ষে প্রভুত্ব-রক্ষা ও অনুগতপালন চেষ্টার পথ আবিষ্কার করা দুঃসাধ্য নহে। রাসবিহারী বাবুর শেষ দান আড়াই লক্ষ টাকা হইতে কৃষির উন্নতির জন্য এমন লোকদিগকে বৃত্তি দেওয়া হইবে, যাঁহারা ভ্রমণ করিয়া এবিষয়ে জ্ঞান লাভ ও বিস্তার করিবেন। উদ্দেশ্যে সাধু। যদি দাতার টাকায় কাহারো হাওয়া খাইবার ব্যবস্থা না হয়, যদি কৃষিবিৎ শ্রমপটু কৰ্ত্তব্যনিষ্ঠ উৎসাহী লোক বৃত্তি পান, তাহা হইলে ঘোষ-মহাশয়ের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ তাঁহার দান পাওয়ায় বড় ভাল হইল। ইহা না পাইলে পরিষৎ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের প্রদত্ত বহুলক্ষপরিমিত দান হইতেও কালক্রমে বঞ্চিত হইতেন। এখন আর সে ভয় রহিল না। অধিকন্তু রাসবিহারী-বাবুর টাকায় পরিষৎ তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র আরও বিস্তৃত করিতে পারিবেন। তাঁহারা বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের সময় হইতে বৃত্তিশিক্ষা-বিভাগে অনেক ছাত্রকে জীবিকা উপার্জ্জনের উপযোগী সুশিক্ষা দিয়া আসিতেছেন। এখন আরও বেশী ছাত্রকে আরও বেশীরকম বৃত্তি শিক্ষা দিতে পারিবেন।

রাসবিহারী-বাবু তাঁহার জীবনে ভাল কাজ যাহা করিয়া গেলেন, তাহার জন্য আমরা ঈশ্বরের নিকট ও তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। কিন্তু তাঁহার বুদ্ধিমত্তা, বিদ্যাবত্তা ও স্বাধীনচিত্ততার কথা মনে পড়িলে, এই দুঃখের কথা স্বভাবতই মনে আসে, যে, তিনি কোন স্বাধীন গণতন্ত্র পরিচালিত দেশের লোক হইলে তাঁহার দ্বারা আরো কত কাজ হইতে পারিত। এদেশে তিনি ওকালতী করিলেন, আইনের ২/১ খানা বহি লিখিলেন, টাকা রোজগার করিলেন, সৎকার্য্যে লক্ষলক্ষ টাকা দান করিলেন, ইংরেজ আম্‌লাতন্ত্র ও শাসকের সমালোচনা করিয়া বক্তৃতা করিলেন, দুই-একটা আইন প্রণয়নকালে কিছু পরামর্শ দিলেন ও কিছু বাধা দিলেন। স্বাধীন দেশে জন্মিলে তিনি দেশপতি বা প্রধান মন্ত্রী হইতে পারিতেন, এবং জাতীয় উন্নতিবিধায়ক নানারূপ ব্যবস্থা ও চেষ্টা করিতে পারিতেন, দেশকালের উপযোগী উৎকৃষ্ট শিক্ষাপ্রণালীর প্রবর্ত্তন করিতে পারিতেন, এবং হয়ত আইনের ভাষ্য ছাড়া তদপেক্ষা স্থায়ী ও উৎকৃষ্ট মানসসন্তান রাখিয়া যাইতে পারিতেন।

১৩২৮ আশ্বিন

কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন

কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন আয়ুর্বৈদিক গ্রন্থ প্রকাশ এবং ঔষধ প্রস্তুত করা ব্যতীত নানা সার্ব্বজনিক কাজের সহিত যুক্ত ছিলেন। দৈনিক "বেঙ্গালী" কাগজের এবং হিতবাদীর কার্য্যকারিতা বহুপরিমাণে তাঁহার চেষ্টা ও উৎসাহের ফল। তিনি বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের পর স্বদেশী আন্দোলনের সময় উহার একজন কর্ম্মী ছিলেন। বঙ্গলক্ষ্মী কাপড়ের কল তিনি বহু বৎসর চালাইয়াছিলেন। অসবর্ণ বিবাহ প্রচলনের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন, এবং তাহার সমর্থনার্থ আহূত সভার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।

১৩২৯ শ্রাবণ

মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়

মনস্বী ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোক গমনে বাংলাদেশ একজন অনাড়ম্বর উদারপ্রকৃতি জ্ঞানী সেবকের সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। তিনি এডুকেশন গেজেট সম্পাদন করিতেন। এবং তাহাতে দলের বিচার না করিয়া, উদারভাবে নানা পত্রিকা হইতে প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিতেন। তিনি সাতিশয় পিতৃভক্ত ছিলেন এবং পিতার আদর্শ অনুসারে জীবনযাপন করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন হিন্দু আদর্শ যে মহিলাদের উচ্চশিক্ষার বিরোধী নহে, তাহার প্রমাণ তিনি নিজের জীবনে দিয়া গিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিতা শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী ও শ্রীমতী অনুরূপা দেবী তাঁহার কন্যা। তাঁহার যত্নে তাঁহারা উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন।

১৩৪১ ফাল্গুন

দেশ-বিদেশের কথা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দিরে চিত্র-প্রতিষ্ঠা-

[মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়]

সম্প্রতি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দিরে দুই জন বাঙালী মনীষীর চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাঁরা যথাক্রমে মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, বি-ই, বিদ্যারত্ন, এম্-আর-এ-এস, এবং রায় মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় বাহাদুর। স্যর যদুনাথ সরকার মহাশয় চিত্র দুইখানি উন্মোচন করিয়া একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। মুকুন্দবাবুর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ পরিচয় থাকায় বক্তৃতার এই অংশটি বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। মুকুন্দবাবুর প্রসঙ্গে তিনি বলেন—

৺মুকুন্দদেব যেমন তাঁহার আকৃতির সৌসাদৃশ্যে তেমনি তাঁহার চরিত্রগুণে স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতি অতি উজ্জ্বলভাবে আনিয়া দিতেন। তিনি পিতার সেই বুঢ়োরস্ক শালপ্রাংশু দেহ, সেই প্রশস্ত নির্ম্মল ললাট, সেই সৌম্য সহাস বদন পাইয়াছিলেন। আর ভূদেববাবুর মতই ছিল তাঁহার স্থির বুদ্ধি, আত্মসংযম, গভীর সংসারজ্ঞান, নিজসুখে নিস্পৃহতা, লোকহিত-পরায়ণতা ' আমাদের মহাকবি ভারতের আদর্শ নৃপতির বর্ণনায় বলিয়াছেন—

স্বসুখ-নিরভিলাষঃ খিদ্যতে লোকহেতো প্রতিদিনম্।

এই দুটি ব্রাহ্মণ সন্তানের জীবনেও ঠিক সেই কথা সত্য প্রমাণ হইয়াছিল।

পিতাপুত্র দু-জনের চরিত্রেই একাধারে নৈতিক দৃঢ়তা ও জীবের প্রতি অগাধ দয়া মিলিত ছিল। তাঁহাদের হৃদয়ে করুণা আর চোখের কোণে বিশুদ্ধ রসজ্ঞান উঁকি মারিত। তাঁহারা সরকারী কর্ম্ম উপলক্ষে বঙ্গ ও বিহারের অনেক শহরে বাস করিয়াছিলেন, সর্ব্বত্রই তাঁহাদের অদম্য ন্যায়পরায়ণতা ও বিশ্বমানবপ্রীতির কথা লোকের মনে আছে।

মুকুন্দবাবুব সহিত আমার তিন পুরুষের পরিচয়। ভূদেববাবু আমায় পিতার গুরুস্থানীয় ছিলেন, বন্ধু বলিলে অসঙ্গত হইবে, কারণ বাবা তাঁহার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। ভূদেববাবু রেল-সুবিধা হইবার পূর্ব্বে আমাদেব বাজশাহীস্থ পৈত্রিক গ্রামে একবার গিয়াছিলেন। আর, মুকুন্দবাবুর সঙ্গে আমি অনেক বৎসর পাটনায় ছিলাম, সর্ব্বদাই সাক্ষাৎ হইত। তিনি অবসর লইয়া কাশী যাইবার পরও আমি সেখানে অনেক বার তাঁহার অসিধামে গিয়া দেখা করি। এই সব সুযোগে তাঁহার নিকট ভূদেববাবু মাইকেল প্রভৃতির অনেক গল্প এবং মুকুন্দবাবুর নিজ জীবনের অনেক কাহিনী শুনি; এগুলি যেমন শিক্ষাপ্রদ তেমনি মনোরম। ইহার কয়টি মাত্র "সদালাপ" ও "ভূদেব-চরিত" গ্রন্থে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও স্থানে স্থানে নাম বদলাইয়া।

শেষবার যখন তাঁহার নিকট যাই, তখন দেখি যে তিনি শয্যাশায়ী, বাতে আক্রান্ত, হাত-পা ফ্লানেলের মোজা ও দাস্তানা দিয়া জড়াইয়া কষ্ট লাঘবের চেষ্টায় আছেন। রোগটি অত্যন্ত ক্লেশকর, তাঁহার তখন বয়সও খুব অধিক, কিন্তু ব্যাধি তাঁহাকে জয় করিতে পারে নাই, শারীরিক যন্ত্রণার মধ্যেও তাঁহার সেই পূর্ব্বপরিচিত শান্ত সরস বাণী ভিন্ন আর কিছুই শুনিলাম না; হাসিয়া আমাকে বিদায় দিলেন।

তিনি জীবনে অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু ঠিক ভূদেববাবুর মতই, তাহা নিজ ভোগে ব্যয় না করিয়া নানাবিধ লোকহিতকর কার্য্যে দান করিতেন। একটি দৃষ্টান্তে তাঁহার চরিত্রের অসাধারণতা দেখাইতেছি—

সেবার পাটনায় বিহার ন্যাশানাল কলেজ অর্থাভাবে ডুব ডুব হইয়াছে, উহা রক্ষার জন্য সভা হইল, সব ন্যাশানাল নেতারা লম্বা লম্বা বক্তৃতা

করিলেন, কিন্তু পয়সা দিলেন না। একমাত্র মুকুন্দবাবু কোম্পানীর কাগজ দান করিলেন, বলিলেন যে ইহা হইতে অন্ততঃ কিছু স্থায়ী আয় হইবে।

মুকুন্দবাবু জীবনে অনেক দুঃখ পাইয়াছিলেন। পুত্র সোমদেব থার্ড ইয়ারে উঠিয়া অকালে মারা গেল। পুত্র প্রতিমরাম দেব আমার কলেজে প্রথম হইত, সেও ডেপুটী পদ পাইয়া, অসামান্য নাম ও উন্নতি অর্জ্জন করিয়া, মহাযুদ্ধের পরবর্ত্তী সেই ভীষণ ইনফ্লুএঞ্জা রোগে হঠাৎ সকলকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। মুকুন্দবাবুও শেষবয়সে ব্যাধিতে পড়িলেন। কিন্তু এই মহাপুরুষের ধৈর্য্য ও ধর্ম্মজ্ঞান তাঁহাকে এ-সব রোগশোক নীরবে সহ্য করিতে সমর্থ করিয়াছিল। এমন হৃদয়বল ভূদেব-পুত্রেরই সম্ভবে।

বঙ্গসাহিত্যে মুকুন্দদেবের অনেক দান আছে, তাহা চিরদিনই আদৃত হইবে, কারণ তাহার মধ্যে অনেক মূল্যবান তথ্য নিহিত। "নেপালে ছত্রী," "সদালাপ" ও "ভূদেবচরিত" অনেকেই পড়িয়াছেন। তাহা ভিন্ন অনেক সত্য সদ্‌গল্প তাঁহার মুখ হইতে শুনিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল।

[মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়]

মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। ১৩২৭-১৩৩১ সাল পর্যন্ত তিনি ইহার চিত্রশালাধ্যক্ষ ছিলেন। পরিষদ-মন্দিরের যে-অংশে চিত্রশালা আছে তাহা রমেশ-ভবন নামে পরিচিত। এই রমেশ-ভবনের পরিকল্পনা গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের। তিনি একাধারে প্রত্নতাত্ত্বিক ও সুসাহিত্যিক ছিলেন। ভাস্কর্য্য বিষয়েও তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁহার পুস্তকাবলীই ইহাব প্রমাণ। "Orinna and Hor Ramaina," "Viveknanda—a study", "Handbook to the Sculptures in the Museum of the Bangiya Sahitya Parishad" প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক তিনি লিখিয়াছেন। ইহা ছাড়া দক্ষিণ-ভারতীয় মুর্ত্তিতত্ত্ব সম্বন্ধেও অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বিগত ১৩৩২ সালে গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় পরলোকগমন করেন।

- ১৩৩০ পৌষ

পরলোকগত কস্তুরীরঙ্গা আয়াঙ্গার

মান্দ্রাজের সুপ্রসিদ্ধ "হিন্দু" পত্রিকার স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক প্রায় এক বৎসরকাল রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন। গত ১২ই ডিসেম্বর সকালবেলা তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। আয়াঙ্গার মহাশয় জীবনের প্রথমভাগে কয়েম্বাটোরে ওকালতি করিতেন, পরে মাদ্রাজে আসেন। তাঁহার সম্পাদিত ফৌজদারী-কার্য্যবিধি-আইনের একটি টীকাসংবলিত সংস্করণ আছে। "হিন্দু" পত্রিকাখানি পূর্ব্বে জি সুব্রহ্মণ্য আয়ার কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইত। ১৯০৫ সালে আয়াঙ্গার মহাশয় তাহা কিনিয়া লন। এই কয় বৎসর

যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিয়া কাগজখানিকে ইংরেজী ভাষায় লিখিত দেশীয় সংবাদপত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন করিয়া তুলিয়াছেন। ইহার স্বাধীন মতবাদ গভর্মেণ্টকে চিরদিনই ব্যতিব্যস্ত করিয়া আসিয়াছে। যুদ্ধের সময় কাগজখানিকে ইংলণ্ডে যাইতে দেওয়া হইত না, অথচ আয়াঙ্গার মহাশয়কে গভর্মেণ্টের খরচায় ইয়োরোপের যুদ্ধভূমিতে ও ইংলণ্ডে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। আয়াঙ্গার মহাশয় বরাবরই জাতীয়-দলভুক্ত ছিলেন। নাগপুর কংগ্রেস হইতে তিনি অসহযোগনীতি প্রচারে যোগ দেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের যে সিভিল্ ডিস্ওবিডিয়েন্স-কমিটি ভারত পরিভ্রমণ করিয়া তথ্য সংগ্রহ করে, আয়াঙ্গার মহাশয় তাহার সভ্য ছিলেন। তিনি কাউন্সিল প্রবেশের বিরুদ্ধে মত দেন। ইহার পরেই তিনি অসুখে পড়েন ও এতদিন ভুগিয়া পরলোকে চলিয়া গেলেন।

অ, ঘ

১৩৩১ বৈশাখ

রসিক লাল দত্ত

আর্ এল্ দত্ত নামে পরিচিত ডাক্তার রসিক লাল দত্ত খুব বড় চিকিৎসক ছিলেন। তাঁহার জীবনের বড় বড় কথা খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে। তাহার পুনরাবৃত্তি না করিয়া আমরা একটি অজ্ঞাত ছোট ঘটনার বিষয় বলিতেছি।

সে ৪০ বৎসরেরও আগেকার কথা। তখন ডাক্তার দত্ত বাঁকুড়ার সিবিল সার্জ্জন্।

সেই সময়ে বাঁকুড়ার ম্যাজিস্ট্রেট্ এণ্ডার্সন্ সাহেব, ঘরে আগুন লাগিলে তাহা নিবাইবার জন্য স্কুলের ছেলেদের একটি ফায়ার ব্রিগেড্ বা অগ্নি-নির্বাপক দল গড়িয়াছিলেন। তাহাদের একটা দম্‌কল, কতকগুলি বাল্‌তি, বাঁশের সিঁড়ি, প্রভৃতি ছিল। কোথাও আগুন লাগিলেই বীগ্‌ল্ বাজিত, আর অম্‌নি ছেলেরা ও তাহাদের নেতারা দম্‌কল, বাল্‌তি প্রভৃতি লইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইত। এক দিন কতকগুলি বালক জেলখানার অদূরবর্ত্তী পোদ্দার পুকুরের পাড়ের একটি বাড়ীতে বসিয়া গল্প করিতেছে, এমন সময় জেলের নিকট একখানা ছোট খড়ের ঘরে আগুন লাগার খবর তাহারা পাইল। তাহারা তৎক্ষণাৎ ঘরটার দিকে গেল। ডাক্তার দত্ত জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন, জেল দেখিতে আসিয়াছিলেন। তিনিও বাহির হইয়া আসিলেন। তখনও দম্‌কল সিঁড়ি আদি আসিয়া পৌঁছে নাই। দু-একজন ছেলে ঘরটার যে-যে দিকের চালে তখনও আগুন লাগে নাই, তাহার খড় টানিয়া ফেলিবার ও তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য কোন প্রকারে চালে উঠিয়া পড়িল। একটি বালক উঠিবার ইচ্ছা সত্ত্বেও উঠিতে পারিতেছিল না। ডাক্তার দত্ত তাহা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ নুইয়া ঘাড় পাতিয়া দিলেন। বালক তাঁহার কাঁধে চড়িয়া চালে উঠিল। তাহার পর সকলের চেষ্টায় আগুন বিস্তৃত হইতে না পারায়, নিকটস্থ অন্য সব ঘর রক্ষা পাইল।

১৩৩১ আষাঢ়

শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী

শ্রীযুক্ত স্যার্ আশুতোষ চৌধুরী রাজসাহী জেলার এক প্রাচীন জমিদার-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতা ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন এবং উভয়ত্র খ্যাতি অর্জ্জন করেন। কেম্ব্রিজে শিক্ষালাভ করা ভিন্ন তিনি বিলাতে ব্যারিষ্টারীর জন্যও অধ্যয়নাদি করেন, এবং ব্যারিষ্টার হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যবহারাজীবের কার্য্য আরম্ভ করেন। আইনব্যবসায়ে কালক্রমে তাঁহার খুব পসার হইয়াছিল। তিনি যখন হাইকোর্টের জজিয়তী গ্রহণ করেন, তখন তাঁহাকে মাসিক অনেক হাজার টাকা কম আয়ে তাহা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। হাইকোর্টেব অরিজিন্যাল্ বিভাগে ভারতীয় জজ্‌দের মধ্যে তিনিই প্রথমে বিচারপতিত্ব করেন। ১৯২১ সালে তিনি জজিয়তী হইতে অবসর গ্রহণ করেন, এবং আবার ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করেন। কিন্তু জজিয়তী করিবার সময়েই তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। কিন্তু কিছু কাল পূর্ব্বে তাঁহার পত্নী শ্রীমতী প্রতিভা দেবী মহাশযার মৃত্যুতে তাঁহার স্বাস্থ্য আরও খারাপ হয়। তিনি আর সারিয়া উঠিতে পারেন নাই। গত ৯ই জ্যৈষ্ঠ তাঁহার কলিকাতাস্থ ভবনে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ব্যারিষ্টারীতে যখন তাঁহার খুব পসার ও প্রতিপত্তি তখনও তিনি কার্য্য-বাহুল্যের মধ্যে নানা লোকহিতকর সার্ব্বজনিক কাজে যোগ দিতেন। দেশের কল্যাণ সাধনের ইচ্ছা তাঁহার ছিল।

১৯০৪ সালে তিনি বর্দ্ধমানে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের সভাপতি হন। সেই সময়ে তাঁহার অভিভাষণে তিনি প্রথম বলেন, যে, "পরাধীন জাতির কোন রাষ্ট্রনীতি নাই" ("এ সব্‌জেক্ট্ নেশ্যন্ হ্যাজ নো পলিটিক্‌স্")। তৎকালে এই উক্তি লইয়া খুব আলোচনা হইয়াছিল, এবং বঙ্গের রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টার উপর উহার প্রভাব অনুভূত হইয়াছিল।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে চৌধুরী মহাশয় দিনাজপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি বাংলার ভূস্বামী-সভার সংস্থাপক ও প্রথম অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন। তিনি জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ্ এবং কলিকাতা ন্যাশন্যাল্ কলেজের অন্যতম সংস্থাপক ছিলেন। এই ন্যাশন্যাল্ কলেজের যে বিভাগে ব্যবহারিক বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা বরাবর সুপরিচালিত হইয়া আসিতেছে। ইহা হইতে উত্তীর্ণ অনেক ছাত্র যোগ্যতার সহিত কার্‌খানা আদিতে কাজ করিতেছেন। ইহা সম্প্রতি শিয়ালদহ স্টেশন্ হইতে ৬ মাইল দূরবর্ত্তী যাদবপুর নামক স্থানে নিজের বাড়ীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। চৌধুরী মহাশয় যেমন বে-সরকারী জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের সহিত প্রথম হইতে যুক্ত ছিলেন, তেম্‌নি গবর্ণমেণ্ট্ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট এবং সিণ্ডিকেটেরও সভ্য ছিলেন। বস্তুতঃ আমাদের দেশে শিক্ষার বিস্তৃতি ও উন্নতি এত কম হইয়াছে, ইহাতে বৈচিত্র্য এত কম, এবং ইহা এরূপ কম রকম-ওয়ারি, যে, শুধু সর্‌কারী বা শুধু বে-সর্‌কারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি

দ্বারা দেশের শৈক্ষিক প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে না। সকলপ্রকার বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠানেরই দোষ-ত্রুটি আছে, সংশোধন ও সংস্কারের প্রয়োজন আছে; কিন্তু জাতীয় ক্ষতি না করিয়া কোনপ্রকার প্রতিষ্ঠানকেই বিলুপ্ত করা চলে না। সম্ভবতঃ চৌধুরী মহাশয়ের ধারণাও এইরূপ ছিল বলিয়া তিনি উভয়বিধ প্রতিষ্ঠানেরই সহিত যোগ রক্ষা করিতেন।

যেসকল সার্ব্বজনীন প্রচেষ্টায় খুব হুজুক আছে, কোলাহল আছে, উত্তেজনা-উন্মাদনা ও বিদেশে হইতে আমদানি হাত-তালি পাইবার সম্ভাবনা আছে, তাহার সহিত যুক্ত থাকিলে খুব নামজাদা হওয়া যায়। কিন্তু এমন অনেক ভাল কাজ আছে, যাহাতে এসব কিছু নাই। তাহা করিলে সমাজের উন্নতি হয়, লোকের বিমল আনন্দ বিধান করা যায়, আত্মপ্রসাদ লাভ হয়, কিন্তু হাততালি পাওয়া যায় না, নামজাদা হওয়া যায় না। চৌধুরী মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী প্রতিভা দেবী, তাঁহার স্বামীর সম্পূর্ণ অনুমোদন ও সহযোগিতায়, "সঙ্গীতসংঘ" নামক সঙ্গীত শিক্ষার প্রতিষ্ঠান আমরণ চালাইয়া ছিলেন। তাহার জন্য তিনি সময়, শক্তি, অর্থ, হৃদয়ের ঐশ্বর্য্য নিয়োগ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। জাতির হৃদয়মনের উৎকর্ষ সাধনার্থ সঙ্গীত ও অন্যান্য ললিতকলার অনুশীলন আবশ্যক। এদেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোক এখনও এবিষয়ে উদাসীন। চৌধুরী মহাশয় সর্ব্বতোমুখী শিক্ষার এবং সকল দিকে প্রবুদ্ধমনা হইবার মর্য্যাদা বুঝিতেন। এইজন্য তিনি পত্নীর মৃত্যুর পরেও সঙ্গীত-সংঘ বজায় রাখিয়াছিলেন। তিনি ভারতীয় চিত্রকলারও রসজ্ঞ ছিলেন। ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যখন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার কোন কোন সভ্য প্রাচ্য কলার অনুশীলনার্থ স্থাপিত ইণ্ডিয়ান্ সোসাইটি অব্ ওরিয়েণ্ট্যাল আর্ট নামক ভারতীয় সমিতির সামান্য সর্‌কারী সাহায্য বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তখন তিনি তাহাতে বাধা দিয়াছিলেন।

চৌধুরী মহাশয় সদালাপী, মিষ্টভাষী, বিনয়নম্র ও অমায়িক লোক ছিলেন। যেমন কাজের লোক ভিন্ন সংসার চলে না, তেম্‌নি কেবল কাজের লোকই পৃথিবীতে থাকিলে লোকালয়ের আনন্দ ও শ্রী-সৌন্দর্য্য থাকে না। তজ্জন্য সামাজিকতারও প্রয়োজন আছে। চৌধুরী মহাশয় যে কাজের লোক ছিলেন না, তাহা নহে কিন্তু তিনি সামাজিকতার জন্যও লোকপ্রিয় ছিলেন। সেই জন্য তাঁহার অভাবে কলিকাতার বাঙালী সমাজের এক অংশ অন্যতম ভূষণ হারাইয়াছে।

১৩৩১ কার্ত্তিক

ভূপেন্দ্রনাথ বসু

ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের মৃত্যুতে বাংলাদেশ একজন কৃতীসন্তান হারাইলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বুদ্ধিমান্ ও বিদ্বান্ ছাত্র ছিলেন। তাঁহার ব্যবসা এটর্নীগিরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু দেশের হিতকল্পে তিনি যে সকল চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহার জন্যই লোকে এখন তাঁহাকে স্মরণ করিতেছে। তিনি যৌবনকাল হইতেই আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভৃতি বয়োজ্যেষ্ঠদিগের সহিত রাজনীতিক্ষেত্রে দেশের সেবায় প্রবৃত্ত হন। বঙ্গবিভাগের পর বাঙালীদের মধ্যে আবার সমগ্র বাংলাকে একপ্রদেশভুক্ত করিবার জন্য যে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হয়, তাহার তিনি অন্যতম নেতা ছিলেন। স্বদেশী দ্রব্যের প্রচলন এবং বিলাতী পণ্য, বিশেষতঃ বিলাতী বস্ত্র, বর্জ্জনের চেষ্টা ঐ আন্দোলনের অঙ্গীভূত ছিল। এক্ষেত্রেও ভূপেন্দ্রবাবু বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ যে কালক্রমে আবার একপ্রদেশভুক্ত হইয়াছে, তাহা অংশতঃ এদেশে ও বিলাতে ভূপেন্দ্র-বাবুর চেষ্টার ফল। তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সের এবং কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছিলেন। তাহার বাগ্মিতা প্রশংসনীয় ছিল।

তিনি কেবলমাত্র রাজনৈতিক উন্নতিরই প্রয়াসী ছিলেন না; সমাজসংস্কারও আবশ্যক মনে করিতেন। এই জন্য তিনি ভিন্ন-ভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ আইনসিদ্ধ করিবার নিমিত্ত ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় একটি বিল্ উপস্থিত করেন। তাহা পাস্ হয় নাই। কিন্তু তৎসম্পর্কে যে আলোচনা ও আন্দোলন হইয়াছিল, তাহার দ্বারা পরে শ্রীযুক্ত হরি সিং গৌড়ের সিবিল বিবাহ আইন্‌বিধিবদ্ধ হইবার পথ প্রস্তুত হইয়াছিল।

ভূপেন্দ্র-বাবু জীবনের শেষ কয়বৎসর রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। কিন্তু পদমর্য্যাদা বা অর্থলাভের জন্য তিনি রাজকার্য্য গ্রহণ করেন নাই; নিজ জ্ঞান-বুদ্ধি-অনুসারে দেশের উপকার করিতে পারিবেন বলিয়া রাজকর্ম্মচারী হইয়াছিলেন। তাঁহার অভিপ্রেত দেশের উপকার হইয়াছিল কি না, তাহা এখানে আলোচ্য নহে; কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য ভাল ছিল। তাঁহার রাজকার্য্য-গ্রহণ-সম্পর্কে আমাদের কেবল এই দুঃখ প্রকাশ করা এখানে অসঙ্গত হইবে না, যে, অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাহার আয়ুঃক্ষয় হওয়ায় তিনি অকালে প্রাণত্যাগ করিলেন; নতুবা তাঁহার দ্বারা দেশের আরও সেবা হইবার সম্ভাবনা ছিল। তিনি শেষ বয়সে নিদারুণ শোক পাইয়াছিলেন; কিন্তু তাহা ধৈর্য্যের সহিত ঈশ্বর বিশ্বাসী পুরুষের ন্যায় সহ্য করিয়াছিলেন।

১৩৩২ অগ্রহায়ণ

অধ্যাপক সারদারঞ্জন রায়

অধ্যাপক সারদারঞ্জন রায় মহাশয় মৃত্যুকালে বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তৎপূর্ব্বে তিনি ঐ কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। যখন তিনি ঐ কলেজে কাজ করিতে আসেন, তখন উহা মেট্রোপলিটান ইন্সটিটিউশ্যন্ নামে পরিচিত ছিল।

তাঁহার শিক্ষক-জীবনের প্রথম অবস্থায় তিনি ছাত্রদের মধ্যে গণিতজ্ঞ বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। শিক্ষিতসমাজেও গণিতজ্ঞ বলিয়াই তাঁহার নাম ছিল। তিনি তখন ইংরেজীতে বীজগণিতের একখানি উৎকৃষ্ট পাঠ্য-পুস্তক লিখিয়াছিলেন। পরে তিনি ছাত্রদের পাঠ্য কয়েকখানি সংস্কৃত কাব্যের সটীক ও সানুবাদ সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া সংস্কৃতজ্ঞ বলিয়া পরিচিত হন। ছাত্রদের জন্য পূর্ব্বে পুর্ব্বে যে সব সংস্কৃত কাব্যের সটীক সংস্করণ বাহির হইত, অধ্যাপক সারদারঞ্জন রায়ের সংস্করণগুলি তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রণালীতে লিখিত হইয়াছিল বলিয়া ছাত্রদের মধ্যে সেগুলির খুব চলন হয়। তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণেরও চর্চ্চা করিতেন। সিদ্ধান্তকৌমুদীর তৎকৃত সংস্করণের সন্ধিপ্রকরণের হস্তলিপি তিনি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

ছাত্ররূপে এক বিদ্যার চর্চ্চা করিয়া ও তাহাতে পারদর্শী হইয়া পরে অন্য বিদ্যায় মনোযোগ দেওয়ার দৃষ্টান্ত আরও আছে। যেমন, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ছাত্ররূপে বিজ্ঞানের চর্চ্চাই সমধিক করিয়াছিলেন, এবং রসায়নী বিদ্যাতে এম্-এ হইয়াছিলেন। তিনি বিজ্ঞানের ঐ শাখায় পারদর্শিতার জন্যই প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিও পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার স্মৃতি রক্ষিত হইবে রাসায়নিক বলিয়া নহে, সাহিত্যিক বলিয়া এবং দার্শনিক চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধের লেখক বলিয়াই ভবিষ্যৎ বংশের লোকে তাঁহাকে জানিবে।

সারদারঞ্জন যৌবনকালে ক্রিকেট খেলোয়াড় বলিয়া বিখ্যাত হন। প্রৌঢ় বয়সে, এমন কি বার্দ্ধক্যেও, তিনি ভাল খেলোয়াড় ছিলেন। যুবকদের মধ্যে পুরুষোচিত খেলার প্রচলন ও উৎসাহদানের জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। নিজের দৃষ্টান্ত তাহার মধ্যে প্রধান। তাঁহার কয়েকজন ভ্রাতাও ক্রিকেট খেলায় দক্ষ।

সারদারঞ্জন চিকিৎসা-বিদ্যার চর্চ্চাও করিতেন। আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব এবিষয়ে তাঁহার পরামর্শ চাহিলে তিনি তাহা দিতেন।

তাঁহার প্রধান "বাতিক" ছিল মাছ ধরা। ছুটির সময় গিরিডি প্রভৃতি স্থানে এবং অন্য সময়ে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে তিনি মাছধরায় কখন কখন সমস্ত দিন কাটাইয়া দিতেন।

বিখ্যাত শিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ ও লেখক স্বর্গীয় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের তিনি জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন।

১৩৩২ মাঘ
মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়

মোটর গাড়ীর ধাক্কায় আহত হইয়া মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়ের অকালে আকস্মিক মৃত্যু দুঃখের কারণ হইয়াছে।

১৯০১ সালে যে বার কলিকাতায় বীডন্‌স্কোয়ারে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, তখন মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতিরূপে তেজস্বিতাব্যঞ্জক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহার শ্রেণীস্থ রাজারাজড়ারা ওরূপ বক্তৃতা প্রায় করেন না। নাটোরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সের অধিবেশনের কার্য্য প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় সুসম্পন্ন হইয়াছিল। মুর্শিদাবাদের প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সেও তাঁহার বক্তৃতা বেশ হইয়াছিল। বঙ্গবিভাগ উপলক্ষ্যে আন্দোলনের সময় কলিকাতায় টাউনহলে প্রতিবাদ সভায় তিনি মন খুলিয়া বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

তিনি বাংলা গদ্যে ও পদ্যে সুলেখক ছিলেন, এবং কয়েকখানি বহি লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি বিখ্যাত গল্পলেখক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সহিত অনেক বৎসর "মানসী ও মর্ম্মবাণী" মাসিক পত্র সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন।

তিনি গীতবাদ্য ও চিত্রকলার অনুরাগী ছিলেন, এবং স্বয়ং সুদক্ষ বাদক ছিলেন।

ক্রিকেট্ প্রভৃতি খেলার তাঁহার সখ্ ছিল, এবং নিজেও খেলোয়াড় ছিলেন ও খেলার দলের জন্য অর্থব্যয় করিতেন।

তিনি দয়ালু, দানশীল ও মিষ্টভাষী লোক ছিলেন।

১৩৩৩ জ্যৈষ্ঠ
চন্দ্রকান্ত দেব ও যতীন্দ্রনাথ সুর

মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে সহস্রাধিক দাঙ্গাকারীকে হটাইয়া লইয়া যাইতে অকস্মাৎ কলের কামানের গুলিতে চন্দ্রকান্ত দেব ও যতীন্দ্রনাথ সুর যুবকদ্বয়ের মৃত্যু আত্মীয় বিয়োগের শোকের মতো মর্ম্মে বিঁধিয়াছে। ধন্য তাঁহাদের সাহস, ধন্য তাঁহাদের স্বতঃউৎসারিত মানবপ্রেম, যাহা তাঁহাদিগকে হেলায় প্রাণ দিতে সমর্থ করিল। ধন্য তাঁহাদের লাঠিখেলার নৈপুণ্য যাহার ভয়ে এতগুলা উত্তেজনা-উন্মত্ত লোক হটিয়া পলাইতেছিল। তাঁহাদিগকে প্রীতি ও শ্রদ্ধার অঞ্জলি অর্পণ করিতেছি। তাঁহাদের "কুলং পবিত্রম্ জননী কৃতার্থা।"

মহীশূর রাজ্যের নূতন দেওয়ান

[আমান্‌উল্‌মুল্ক মির্জা এম্‌ ইস্মাইল্‌]

মহীশূরের মহারাজা আমান্‌উল্‌মুল্ক মির্জা এম্‌ ইস্মাইল্‌কে তাঁহার দেওয়ান বা প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়াছেন। ইনি পূর্ব্বে মহারাজার খাস্‌ মুন্‌শী বা প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন। মহীশূরেই ইঁহার নিবাস। ইঁহার নিয়োগে রাজ্যের নানাস্থান হইতে লোকেরা ইঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছে। চিতলদ্রুগ হিন্দুপ্রধান জেলা। তাঁহাকে অভিনন্দন করিবার জন্য সেখানেই প্রথমে সভার অধিবেশন হয়।

মহীশূরের নৃপতি হিন্দু এবং তাঁহার রাজ্যের ৫৯, ৭৮, ৮৯২ জন অধিবাসীর মধ্যে ৫৪, ৮১, ৭৫৯ জন হিন্দু এবং কেবলমাত্র ৩, ৪০, ৪৬১ জন মুসলমান। তিনি একজন মুসলমানকে রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া নিজের উদারতা সপ্রমাণ করিয়াছেন।

১৩৩৩ ফাল্গুন

ডাক্তার স্যার্‌ কৈলাসচন্দ্র বসু

স্যার্‌ কৈলাসচন্দ্র বসুর সম্প্রতি ৭৭ বৎসর বয়সে মৃত্যু হইয়াছে। কলিকাতার মাড়োয়ারীদের উপর তাঁহার খুব প্রভাব ছিল, এবং তাঁহাদের দ্বারা তিনি অনেক হিতকর প্রতিষ্ঠানের সাহায্য করাইয়াছিলেন। তিনি ১৮৯৪ সালে ভারতীয় মেডিক্যাল কংগ্রেসের সহকারী সভাপতি হইয়াছিলেন, এবং অন্যতম প্লেগ কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট ও কলিকাতা মিউনিসিপ্যালটীর তিনি সভ্য ছিলেন। তিনি এন্টিম্যালেরিয়াল সোসাইটী ও কলিকাতা মেডিক্যাল স্কুলের সভাপতি ছিলেন। কলিকাতা স্কুল অব্‌ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। মাড়োয়ারী হাসপাতাল, পশুচিকিৎসা কলেজ, পিঞ্জরাপোল, কুষ্ঠরোগীদের আশ্রম, প্রভৃতি কতকগুলি প্রতিষ্ঠান অংশতঃ তাঁহার প্রভাব ও পরিশ্রমে স্থাপিত হয়।

১৩৩৪ মাঘ

হাকিম আজমল খাঁ

দিল্লীর হাকিম আজমল খাঁর বয়স হইয়াছিল, এবং তিনি কিছু দিন হইতে রোগে ভুগিতেছিলেন, কিন্তু এত শীঘ্র তাঁহার মৃত্যু হইবে, কেহ ভাবে নাই। তিনি সকল সম্প্রদায়ের লোকদের প্রিয় ও বিশ্বাসভাজন ছিলেন। সকলেই মনে করিতেন যে, তিনি সাম্প্রদায়িক কোন ঝগড়া বিবাদের যে নিষ্পত্তি করিবেন, তাহা তাঁহার জ্ঞান বুদ্ধি অনুসারে নিরপেক্ষ ভাবেই করা হইবে। ঝগড়াবিবাদের দিনে এরূপ মহৎ ব্যক্তির মৃত্যুতে ভারতবর্ষ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। আর এক দিক্ দিয়াও দেশের ক্ষতি হইল। তিনি য়ুনানী হকিমী চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ ও পারদর্শী ছিলেন। এবিষয়ে তাঁহার মত বিদ্বান ও অভিজ্ঞ লোক দেখা যায় না।

স্যার টি সদাশিব আইয়ার

স্যার্ টি সদাশিব আইয়ার মান্দ্রাজে হাইকোর্টের জজ ছিলেন। পেন্সান লইবার পর মৃত্যুকালে তিনি মান্দ্রাজের দেবোত্তর সম্পত্তি বোর্ডেব সভাপতির কাজ করিতেছিলেন। মান্দ্রাজে ব্রাহ্মণ ও ন-ব্রাহ্মণদের মধ্যে বড় রেষারেষি আছে। অথচ তিনি ব্রাহ্মণ হইয়াও ন-ব্রাহ্মণ মন্ত্রী দ্বারা ঐ কাজের জন্য মনোনীত হইয়াছিলেন। ইহা তাঁহার নিরপেক্ষতা ও সর্ব্বজনপ্রিয়তার একটি প্রমাণ। তিনি উচ্চপদস্থ ও ধনী ছিলেন, কিন্তু খুব সাদাসিধা ভাবে জীবনযাপন করিতেন। তিনি উৎসাহী থিয়সফিস্ট এবং সমাজসংস্কারক ছিলেন। তাঁহার নানা সমাজহিতকর কার্য্যে সর্ব্বদা তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণীর সাহচর্য্য ও সাহায্য লাভ করিবতেন।

১৩৩৪ চৈত্র

সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ

সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ কৃতী পুরুষ ছিলেন। তিনি নিজের বুদ্ধি, বিদ্যা, ধীরতা, পরিশ্রম ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা দ্বারা রাজকার্য্যে ভারতীয়দের মধ্যে সর্ব্ব-প্রথমে নানা উচ্চপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এবং এপর্য্যন্ত তিনি ভিন্ন অন্য কেহ ব্রিটিশ পার্লেমেন্টের আণ্ডার সেক্রেটারী বা প্রাদেশিক গবর্ণরের পদে নিযুক্ত হন নাই। কোন পদে নিযুক্ত হইয়া তাঁহার আর্থিক লাভ হয় নাই,

বরং ক্ষতিই হইয়াছিল। ইহা সত্য, যে, তাঁহার রাজনৈতিক মত, চরমপন্থীদের কথা দূরে থাক, অনেক উদারনৈতিক (মডারেট) নেতাদের মত অপেক্ষা ইংরেজরা অধিক পছন্দ করিত। কিন্তু তাহা হইতে ইহা অনুমান করা মিথ্যা হইবে, যে, তিনি ইংরেজদের মন জোগাইয়াই উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি এমন কোন পদ লাভ করেন নাই, যে-পদে অধিষ্ঠিত ইংরেজরা সাধারণতঃ তাঁহা অপেক্ষা যোগ্য, কিংবা সেই পদে অধিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে তাঁহা অপেক্ষা অধিক টাকা রোজগার করিতেন।

আইনজীবী ধনী কোন কোন লোকের চরিত্রের বিরুদ্ধে যেরূপ নানা কথা শুনা যায়, সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের বিরুদ্ধে তাহা কখন শুনি নাই।

তিনি অকপট স্বদেশহিতৈষী ছিলেন, ইহা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি; যদিও তাঁহার রাজনৈতিক মতের সহিত আমাদের মতের মিল ছিল না। তিনিও স্বরাজ চাহিতেন—যদিও উহা লাভের যোগ্যতা, উপায় এবং সময় সম্বন্ধে তাঁহার মতের সহিত অনেক প্রসিদ্ধ নেতার মতের (এবং আমাদেরও মতের) মিল ছিল না। সৈন্যদলে ভারতীয়দের নেতৃত্ব স্থাপন দ্বারা আমাদের আত্মরক্ষার সামর্থ্য লাভ তিনি একান্ত প্রয়োজনীয় মনে করিতেন।

তিনি বঙ্গসাহিত্যানুরাগী ছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথকে লিখিত তাঁহার যে বাংলা চিঠি কয়টি আমরা ছাপিয়াছিলাম, তাহার প্রমাণ ছিল।

নিজের গ্রামের ও জেলার প্রতি এবং গ্রাম্য লোকদের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম প্রীতি ছিল। তিনি নিজের গ্রামের শিক্ষা, কৃষি ও স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য অনেক চেষ্টা ও অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন, এবং বাঁচিয়া থাকিলে ভবিষ্যতে আরও করিতেন। আশা করি, তাঁহার পুত্রেরা তাঁহাদের পিতার সমুদয় সদনুষ্ঠান চালাইতে থাকিবেন।

১৩৩৫ অগ্রহায়ণ

সতীশরঞ্জন দাশ

ছাপ্পান্ন বৎসর বয়সে শ্রীযুক্ত সতীশরঞ্জন দাশের মৃত্যুতে বাংলা দেশের ও ভারতবর্ষের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। মৃত্যুকালে তিনি ভারত গবর্মেন্টের উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আইনের জ্ঞান তাঁহার বিশেষ রকম ছিল, আইনের ব্যবসাতেও তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ দিক্ নানা সৎকর্ম্মে, দানশীলতায়, বন্ধু ও স্বজন বাৎসল্যে, অকপট ব্যবহারে এবং নারীর উপর অত্যাচার দমনের চেষ্টায় প্রকট হইয়াছিল। আসাম-বেঙ্গাল রেলওয়ে ধর্ম্মঘটে নাম কিনিবার চেষ্টা ও অকাজ অনেকে করিয়াছিলেন, কিন্তু নিজের টাকা খরচ করিয়া ধর্ম্মঘটীদিগকে বিপন্মুক্ত করিবার চেষ্টা তাঁহা অপেক্ষা বেশী কেহ করেন নাই।

পীযূষকান্তি ঘোষ

শ্রীযুক্ত পীযূষকান্তি ঘোষ বিখ্যাত সাংবাদিক ও লেখক পরলোকগত শিশিরকুমার ঘোষের পুত্র এবং অমৃতবাজার পত্রিকার অন্যতম স্বত্বাধিকারী ছিলেন। সাংবাদিকের কার্য্যেও তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল। বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সভার তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। বঙ্গীয় বালক ও যুবকদের মধ্যে ব্যায়ামচর্চ্চা প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন।

১৩৩৬ অগ্রহায়ণ

মহানুভব মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

জগতে জন্ম হয় অনেক মানুষের, মৃত্যুও হয় অনেকের। কিন্তু মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর মত মানুষের আবির্ভাব ও তিরোভাব নিত্য ঘটে না।

তাঁহার কথা ভাবিলে প্রথমেই মনে পড়ে, তাঁহার বিরাট দানযজ্ঞের কথা। এত বড় দাতা আধুনিক ভারতে দেখা যায় না। তিনি জীবিতকালেই এক কোটির অধিক টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন, দানশীল পার্সীদিগের মধ্যেও ইঁহার মত দাতা দেখা যায় না।

তাঁহার দানশীলতার অনেক বিশেষত্ব ছিল। তাঁহার দান কখনও অপাত্রে পড়ে নাই বা কেহ তাঁহাকে ঠকাইয়া টাকা লয় নাই, এরূপ বলা যায় না বটে। কিন্তু তাঁহার মহত্ত্ব এইখানে, যে, উপকৃত কোন ব্যক্তি অকৃতজ্ঞ হইলেও তাঁহার দান অনুপযুক্ত ব্যক্তি পাইয়াছে জানিতে পারিলেও, কেহ প্রবঞ্চনা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে টাকা লইয়াছে জানিতে পারিয়াও, তিনি মানবপ্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধাহীন বা মানববিদ্বেষী হইয়া যান নাই। জীবনের শেষ সময় পর্য্যন্ত তিনি কোমলহৃদয়, দয়ালু, বিশ্বাসপ্রবণ এবং সৎকর্ম্মে উৎসাহী ছিলেন।

তাঁহার দান শীলতায় প্রাচীন ও নবীন ভাবের সম্মিলন হইয়াছিল। আগেকার লোকে যে-প্রকার সৎকাজের জন্য দান করা পুণ্যকর্ম্ম মনে করিতেন, তাঁহার সেরূপ দান বিস্তর ছিল; আবার আধুনিক দানশীল লোকেরা বিদ্যাপীঠস্থাপন, দরিদ্র ছাত্রদের ভরণপোষণ, তাহাদের পুস্তকক্রয়ে সাহায্যদান, পরীক্ষায় ফীদান, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক নিয়োগের জন্য প্রভৃত দান, সর্ব্বসাধারণের লাইব্রেরী বা পণ্ডিত-বিশেযের গবেষণা-লাইব্রেরীর জন্য বহু অর্থদান, দরিদ্র গ্রন্থকারের বহি ছাপাইবার ব্যয়নির্ব্বাহ, বিদ্বৎ পরিষদে ভূমিদান ও অর্থদান, বিদ্বজ্জন-সম্মেলনের জন্য অর্থদান, প্রভৃতির জন্য ব্যয়ও তাঁহার খুব বেশী ছিল।

তিনি জানিতেন ও বুঝিতেন, যে, আমাদের দেশে যে-সব পণ্যশিল্প ছিল, তাহার অনেকগুলি লুপ্ত বা লুপ্তপ্রায় হওয়ায় দেশের দারিদ্র্য বাড়িয়াছে, এবং তাহাদের অনেকগুলির জায়গায় বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী পণ্যদ্রব্যোৎপাদনের কারখানা স্থাপিত না হইলে দেশের ধনবৃদ্ধি ও বেকার

সমস্যার সমাধান হইবে না। এই কারণে তিনি আধুনিক পণ্যশিল্পক্ষেত্রেও উদ্যোগিতা দেখাইয়া গিয়াছেন এবং প্রভূত অর্থ এই কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছিলেন। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের পর বিদেশী পণ্যবর্জ্জনের জন্য কলিকাতার টাউন হলে প্রথম যে সভা হয়, তিনি তাহার সভাপতি হইয়াছিলেন।

কৃষিকার্য্যের উন্নতির দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল। কৃষি ও পণ্যশিল্পে উৎসাহ দিবার জন্য তিনি প্রদর্শনীর বন্দোবস্ত করিতেন। ব্যাঙ্কস্থাপন, জীবনবীমা কোম্পানী স্থাপন, প্রভৃতি ব্যাপারেও তাঁহার উদ্যোগিতা ছিল।

তিনি সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাত ও অজ্ঞাত যত সৎকার্য্য করিয়াছেন ও যত দান করিয়া গিয়াছেন, কেহ যন্ত্রের মত তাহা করিয়া গেলেও, তাহারও প্রশংসা হইত। কিন্তু মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী তাঁহার কাজের চেয়ে বড় ছিলেন। তাঁহার মত সকল ধর্ম্মের সাধুলোকদের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ও প্রীতিসম্পন্ন, নিরহঙ্কার, নম্র, অমায়িক ও অতি ভদ্রলোক ক্বচিৎ দেখা যায়। তাঁহার যে এত ব্যয় হইত, তাঁহার যে লক্ষ লক্ষ টাকা ঋণ হইয়াছিল, তাহা নিজের বিলাস ও ভোগসুখের জন্য নহে। তিনি বৈষ্ণব ছিলেন। শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের গুণাবলী তাঁহাতে লক্ষিত হইত। তিনি তৃণাদপি সুনীপে নিজেকে মনে করিতেন, তবুর মত সহিষ্ণু ছিলেন, নিজে সম্মানপ্রয়াসী না হইয়া অন্যকে মান দিতেন;—তিনি হরিগুণগানের যথার্থ উপযুক্ত ছিলেন। ধন্য তিনি। ধন্য তাঁহার বংশ ও জন্মভূমি।

১৩৩৭ অগ্রহায়ণ

নিরালম্ব স্বামী

গৃহস্থাশ্রমে নিরালম্ব স্বামীর নাম ছিল শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্দ্ধমান জেলার চন্না নামক গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স প্রায় তিপ্পান্ন বৎসর হইয়াছিল। প্রবাসীর সম্পাদক এলাহাবাদের কায়স্থ পাঠশালা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল থাকিবার সময় শ্রীমান যতীন্দ্রনাথ তাঁহার ছাত্র ছিলেন। তিনি বুদ্ধিমান্ ছাত্র ছিলেন, লিখিবার ক্ষমতাও তাঁহার ছিল; কিন্তু পরীক্ষার জন্য পঠনীয় পুস্তক পাঠে তেমন মনোযোগী তিনি ছিলেন না। কলেজ ছাড়িয়া যাইবার পর তাঁহার জীবনের সকল ঘটনা অবগত নহি। তিনি কিছু কাল বড়োদা রাজ্যের সৈনিক বিভাগে কাজ করিয়াছিলেন এবং আধুনিক রণকৌশল অনেকটা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তিনি যখন বড়োদায় ছিলেন, তখন শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ তথাকার শিক্ষাবিভাগে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কথিত আছে শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ যতীন্দ্রনাথের নিকট হইতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা মন্ত্র লাভ করেন। অরবিন্দ, তাঁহার ভ্রাতা বারীন্দ্র, উল্লাসকর দত্ত, প্রভৃতি যখন আলিপুরে রাজদ্রোহের ষড়যন্ত্র আদি অভিযোগে অভিযুক্ত হন, তখন যতীন্দ্রনাথও অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ না থাকায় তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

নিরালম্ব স্বামী শেষজীবনে শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে সোহহম স্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি আফিগানিস্থান, তিব্বত এবং

নিকটবর্ত্তী অন্যান্য দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি দীর্ঘাকৃতি নির্ভীক পুরুষ ছিলেন। প্রবাসীতে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ১৩১২ সালে প্রয়াগে যে কুম্ভমেলা হয়, সেই সময় তিনি প্রবাসী-সম্পাদকের কোটাপার্চার বাসায় থাকিতেন। দিবসের অধিকাংশ সময় নিজের কামরায় দরজা বন্ধ করিয়া থাকিতেন। নিজের গৈরিক বসন এবং একটি কি দুটি কম্বল তাঁহার একমাত্র সম্বল ছিল। তিনি সন্ন্যাসী বলিয়া সন্ন্যাসীদের ব্যবহৃত নানা কথা তাঁহার জানা ছিল। সন্ন্যাসী বলিয়াই তাঁহার সঙ্গে গেলে কুম্ভমেলার সমুদয় আখাড়া আদি দেখিবার সুবিধা হইবে বলিয়া একদিন আমরা তাঁহার সঙ্গে মেলা দেখিতে গেলাম। নৌ-চালনায় তিনি দক্ষ ছিলেন। মাঝিকে বিশ্রাম দিয়া নিজেই একটা নৌকা চালাইয়া আমাদিগকে কোন কোন জায়গায় লইয়া গেলেন। সন্ন্যাসী হইলেও সাংসারিক বৃহৎ ব্যাপার সম্বন্ধে তিনি মনটাকে নির্লিপ্ত করেন নাই। তাঁহার দেশভক্তি প্রবল ছিল। যত সাধু সম্প্রদায়ের আখাড়ায় তিনি আমাদিগকে লইয়া যাইতেছিলেন, সর্ব্বত্রই মোহন্ত বা অন্য প্রধান সাধুদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, তাঁহাদের গ্রন্থাদিতে এবং সাধুসন্তদিগের বাণীতে ভারতবর্ষ কখন স্বাধীন হইবে সে বিষয়ে কিছু উক্ত আছে কি না। প্রায় সকলেই উত্তর দেন, ওরূপ সাংসারিক বিষয় সম্বন্ধে তাঁহারা উদাসীন এবং কিছু জানেন না। কেবল গরীবদাসী সম্প্রদায়ের একজন প্রবীণ সাধু, সন্ন্যাসী যতীন্দ্রনাথ নির্ব্বন্ধাতিশয্য প্রকাশ করায়, বলিলেন, "আমাদের একখানি গ্রন্থে [বা একটি সন্তবাণীতে, ঠিক্ কিসে বলিয়াছিলেন, এখন মনে নাই] আছে, ভারতবর্ষ আটাশ বৎসর পরে স্বাধীন হইবে।" সন ১৩২২ হইতে আটাশ বৎসর ১৩৪০ সনে পূর্ণ হয়। ভবিষ্যদ্বাণীর সম্ভাব্যতা ও সত্যতায় যাঁহারা বিশ্বাস করেন না, মনের মত ভবিষ্যদ্বাণীতে তাঁহাদেরও কতকটা গুপ্ত বিশ্বাস থাকিতে পারে। সুতরাং বলা বাহুল্য, সাধুটির কথা শ্রোতাদের ভাল লাগিয়াছিল।

নিরালম্ব স্বামীর আশ্রম তাঁহার জন্মগ্রাম চন্নাতেই অবস্থিত ছিল। গত ১৯শে ভাদ্র তিনি দেহরক্ষা করেন।

১৩৩৮ ভাদ্র

পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী

পরলোকগত পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী একদিকে যেমন বেদাদি শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন, অন্যদিকে তেমনি স্বদেশের স্বাধীনতাকামী ছিলেন। তিনি ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের যুগের মানুষ; তাঁহার রাজনৈতিক মতও অনেকটা উপাধ্যায়ের মত ছিল। যাঁহারা রাজনৈতিক কারণে একবারও জেলে যান নাই, পলিটিক্সের ম্যাট্রিকুলেশন পাসও তাঁহারা করেন নাই। এ হিসাবে, অন্য অনেক লোকের মত, সামাধ্যায়ী মহাশয়কে পলিটিক্সের গ্র্যাজুয়েট বলা যাইতে পারিত।

১৩৩৮ মাঘ

শ্রীমতী ফুল্লনলিনী রায় চৌধুরী

শ্রীমতী ফুল্লনলিনী রায় চৌধুরী তাঁহার শ্বশুর পরলোকগত দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী এবং স্বামী শ্রীযুক্ত প্রভাতকুসুম রায় চৌধুরীর মৃত্যুর পর "নব্যভারত" মাসিক পত্রখানি বাঁচাইয়া রাখিবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাকে অন্য নিদারুণ শোকও পাইতে হইয়াছিল। তাহা সত্ত্বেও তিনি বাড়িতে পড়াশুনা করিয়া ক্রমে ক্রমে বি-এ পর্য্যন্ত পাস করিয়াছিলেন। তাঁহার বেশ মননশক্তি ও রচনার ক্ষমতা ছিল। অকালে তাঁহার মৃত্যু না হইলে বঙ্গসাহিত্য তাঁহার সেবায় উপকৃত হইতে পারিত; অন্য দিকেও দেশের উপকার তাঁহার দ্বারা হইতে পারিত।

১৩৩৯ অগ্রহায়ণ

মহারাণী সুনীতি দেবী

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা, কুচবিহারের বর্ত্তমান মহারাজার পিতামহী মহারাণী সুনীতি দেবী ৬৮ বৎসর বয়সে পরলোক যাত্রা করিয়াছেন। তিনি দানশীলা এবং কথকতার দ্বারা ধর্ম্মোপদেশ দানে সুদক্ষা ছিলেন। দার্জ্জিলিঙের মহারাণী বালিকা বিদ্যালয় তাঁহার নারীশিক্ষানুরাগের সাক্ষ্য দেয়। কলিকাতায় আপার সার্কুলার রোডে তাঁহার পিতৃদেব কমলকুটীর নামক যে অট্টালিকায় বাস করিতেন, তাহার হাতা-সমেত সমস্ত বাড়িটি তিনি ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশ্যন নামক বালিকা শিক্ষালয়ের জন্য দান করিয়া ট্রাষ্টীদের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ দে

ব্রজেন্দ্রনাথ দে, এম-এ, আই-সি-এস্ গত ২৮শে সেপ্টেম্বর ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। গত শতাব্দীতে যে-সকল বাঙালী উচ্চ রাজপদ লাভ করেন তিনি তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। ১৮৭২ সনে তিনি আই-সি-এস্ পরীক্ষা পাস করেন। ইহার পর শিক্ষানবীশ রূপে তাঁহাকে দুই বৎসর বিলাতে থাকিতে হয়। এই সময়ের মধ্যেই তিনি ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং সংস্কৃতে বোডেন বৃত্তির জন্য অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ম্যাক্সম্যুলারের নিকট অধ্যয়ন করেন।

যথাসময়ে তিনি বৃত্তি প্রাপ্ত হন।

কার্য্যবশে তিনি বাংলা ও বিহারের বহু স্থানে বাস করেন। প্রবাসীর সম্পাদক যখন বাঁকুড়া জিলা স্কুলের উপরের ক্লাসের ছাত্র, তখন দে-মহাশয় বাঁকুড়ার জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া যান, এবং ঐ স্কুল ও ঐ ক্লাস পরিদর্শন করেন। ইহা 'প্রবাসী'-সম্পাদকের এখনও মনে আছে। কারণ সেকালে জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট হওয়াও বেশী ভারতীয় বা বাঙালীর ভাগ্যে ঘটিত না। দে-মহাশয় কর্ম্ম-জীবনেও স্বাধীন মত ত্যাগ করেন নাই। তিনি হুগলীতে থাকাকালীন ইলবার্ট বিল লইয়া গোলযোগ চলিতেছিল। গবর্ন্মেণ্ট অন্যান্য উচ্চ রাজকর্ম্মচারীদের মত দে-মহাশয়ের নিকটও মত চাহিয়া পাঠান। তিনি দৃঢ়তার সহিত স্পষ্ট ভাষায় মন্তব্য করেন, যে, বিচারক্ষেত্রে ভারতীয় ও ইউরোপীয়ের কোন প্রভেদ না রাখিয়া একই ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বিচার হওয়া বাঞ্ছনীয়।

দে-মহাশয় সুপণ্ডিত ছিলেন। ১৯১০ সনে কর্ম্মত্যাগের পর তিনি বিদ্যালোচনায় মনোনিবেশ করেন। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটি অফ্ বেঙ্গালের একজন সদস্য ছিলেন। তিনি 'তবকাৎ ই-নাসিরি'র ও সম্রাট আক্‌বরের সভাসদ্ নিজামুদ্দীন আহম্মদ্ রচিত 'তবকাৎ-ই-আকবরী' নামক একখানি ফার্সী পুঁথির সটীক অনুবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন ও তাহা প্রায় সমাপ্ত করিয়া গিয়াছেন। কেবল মাত্র সূচীপত্র লেখার ভার সোসাইটির উপর ন্যস্ত রহিয়াছে।

মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮০ বৎসরেরও অধিক হইয়াছিল।

যদুনাথ মজুমদার

রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার মহাশয়ের মৃত্যুতে বাংলা দেশ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। তিনি রাজনীতি ও বিদ্যাচর্চ্চা উভয় ক্ষেত্রেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছিলেন, এবং নানারূপ জনহিতকর কার্য্যের দ্বারা তাঁহার নিজ জেলা যশোহরের প্রভূত উপকার করিয়াছিলেন। ১৮৮৯ সনে যখন যশোহরে দ্বিতীয়বার নীলবিদ্রোহ উপস্থিত হয় তখন যদুনাথ মজুমদার মহাশয়ই উদ্যোগী হইয়া সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহায্যে বিলাতে দরখাস্ত পাঠান এবং তাহার ফলে ব্র্যাড্‌ল সাহেব পার্লেমেন্টে এই প্রশ্ন উত্থাপন করেন। এই ব্যাপারে মীমাংসার জন্য অবশেষে একটি সালিশী কমিটি স্থাপিত হয়। উহাতে প্রজাদের পক্ষে যদুনাথ মজুমদার মহাশয় উপস্থিত হন।

যদুবাবু প্রথম জীবনে সংবাদপত্র সম্পাদনের কার্য্যও করেন। তিনি কিছুকালের জন্য পঞ্জাবের বিখ্যাত সংবাদপত্র ট্রিবিউনের সম্পাদক ছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া, ব্রহ্মচারীন্, সম্মিলনী, হিন্দু পত্রিকা নামে কয়েকটি পত্রিকাও সম্পাদন করেন। মজুমদার মহাশয়ের জীবন কর্ম্মবহুল হইলেও তিনি বিদ্যাচর্চ্চা ত্যাগ করেন নাই। হিন্দুশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। তিনি কাশীতে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং এক সময়ে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক

ছিলেন। তিনি হিন্দুধর্ম্ম ও দর্শন ইত্যাদি সম্বন্ধে সর্ব্বসুদ্ধ বাইশখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

রাজনৈতিক জীবনে যদুবাবুর যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ছিল। তিনি বাংলা দেশ ও ভারতবর্ষ, উভয় ব্যবস্থাপক সভারই সদস্য ছিলেন। যশোহরের জেলাবোর্ড ও মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান হিসাবে তিনি নিজের জেলার প্রভূত উপকার করিয়াছেন। বাংলা দেশের নদীগুলিকে সজীব রাখিবার আন্দোলন তিনি বহুপূর্ব্বেই আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং জনসাধারণের জলকষ্ট নিবারণের জন্য তিনি অনেক পুষ্করিণী ও কূপ খনন করাইয়াছিলেন। শিক্ষাপ্রচারকার্য্যে মজুমদার মহাশয়ের অপরিসীম উদ্যম ছিল। তিনি এগারটি স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা। ইহার মধ্যে দুইটি বালিকা-বিদ্যালয়। মহাত্মা গান্ধীর চরকা প্রচলনের বহু পূর্ব্বেই তিনি নিজের বাড়িতে ও অন্যত্র সূতাকাটার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং নিজে তুলার বীজ বিতরণ করিয়া প্রজাসাধারণকে তুলার চাষ করিবার উপকারিতা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার কয়েকটি পুস্তিকা আছে।

স্যর আলি ইমাম

স্যর আলি ইমামের মৃত্যুতে ভারতবর্ষ একজন দেশপ্রেমিক কর্ম্মী হারাইল। প্রথম জীবনে যে তিনি মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের পক্ষপাতী ছিলেন, এ-কথা তিনি নিজেই বলিয়া গিয়াছেন। আগা খাঁর নেতৃত্বে মুসলমানদের যে ডেপুটেশ্যন লর্ড মিন্টোর নিকট উপস্থিত হয়, তিনি তাহার একজন ছিলেন। কিন্তু পরজীবনে তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন হয়, এবং তিনি প্রকাশ্যে হিন্দু-মুসলমানের একত্র নির্ব্বাচন সমর্থন করেন। কোন বিশেষ জনসমষ্টির জন্য ব্যবস্থাপক সভায় পদসংখ্যা রিজার্ভ করিয়া রাখারও তিনি বিরোধী ছিলেন।

১৩৩৯ চৈত্র

ইন্দুভূষণ সেন

সাতান্ন বৎসর বয়সে প্যারিসে শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেনের মৃত্যুর সংবাদ হঠাৎ আসিয়া তাঁহার আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবর্গকে স্তম্ভিত করিয়াছে। তিনি ব্রাহ্মসমাজে সুপরিচিত স্বর্গীয় ভুবনমোহন সেন মহাশয়ের অন্যতম পুত্র। ইন্দুভূষণ নিজের চেষ্টায় দেশে একটি শ্রদ্ধার স্থান করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি এম্ এ, বি এল, এবং ব্যারিস্টার ছিলেন। এক সময়ে পেশকারী ও

পরে ওকালতী করেন। ওকালতীতে বেশ পসার ছিল। তাহার পর ব্যারিষ্টার হন। তাহাতেও তাঁহার পশার ছিল। আইনের জ্ঞান ও সততার জন্য তাঁহার খ্যাতি ছিল। বঙ্গের রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি স্বাধীনচিত্ততার জন্য শেষে সকল দলের সহিত সংস্রব ত্যাগ করেন, কিন্তু কাহারও সহিত বিরোধ করেন নাই। তাঁহার সোশ্যালিজমের (সমাজতন্ত্র বাদ বা সামাজিক সাম্য বাদের) বিস্তৃত ও গভীর জ্ঞান ছিল। তিনি পৃথিবীর ও ভারতবর্ষের শ্রমিক প্রচেষ্টার (লেবার মুভমেন্টের) সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন। কয়েকটি শ্রমিক ধর্ম্মঘটের সহিত তাঁহার যোগ ছিল। শ্রমিক প্রচেষ্টার সহিত সংশ্লিষ্ট অনেক যুবকের তিনি প্রধান সহায় ছিলেন। তিনি কেবল আইনজ্ঞ ছিলেন না, সাহিত্যাদি নানাবিষয়ে তাঁহার বিস্তৃত ও প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। তিনি চিত্রকলার রসজ্ঞ ছিলেন। বিশ্বভারতীর সহিত তাঁহার যোগ ছিল। তিনি বিবাহ করেন নাই।

নামযশের বা অন্য কোন প্রকার লাভের প্রত্যাশা না রাখিয়া যোগ্যতার সহিত দেশের সেবা করিবার সামর্থ্য ও ইচ্ছা তাঁহার ছিল। আগে একবার পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া এবং এবারও অনেক দেশ দেখিয়া তিনি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় দ্বারা সেই যোগ্যতা বাড়াইতেছিলেন। ভারতবর্ষে তিনি ফিরিয়া আসিলে তাঁহার দ্বারা দেশ উপকৃত হইত। কিন্তু তাহা হইল না।

১৩৪০ ভাদ্র

জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সাতান্ন বৎসর বয়সে অবসরপ্রাপ্ত সব্‌জজ্‌ জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি সুর্ব্বসাধারণের পরিচিত ছিলেন না। রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিলে মানুষ সহজেই নামজাদা হইতে পারে। সরকারী চাকরি করিতেন বলিয়া তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেন নাই। কিন্তু তাঁহার রাজনীতির জ্ঞান যে কিরূপ গভীর ও ব্যাপক ছিল, তাহা আমাদিগকে লিখিত তাঁহার চিঠিপত্র হইতে আমরা ভাল করিয়া জানিতাম। সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতিবিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে তিনি পুরাতন বহি ত পড়িয়াই ছিলেন, নূতন বহিও প্রকাশ হইবা মাত্র ক্রয় করিয়া বা লাইব্রেরী হইতে আনিয়া পড়িতেন। কিন্তু তা বলিয়া তিনি গ্রন্থকীটজাতীয় মানুষ ছিলেন না। "পলিটিকাস্‌", এই ছদ্মনামে তিনি মডার্ণ রিভিউ কাগজে প্রবন্ধ লিখিয়া ও নানা পুস্তকের সমালোচনা করিয়া পাঠকবর্গকে তাঁহার বিস্তৃত অধ্যয়নের ফলভাগী করিতেন। আমরা মডার্ণ রিভিউ কাগজে এবং কখন কখন প্রবাসীতেও তাঁহার সংগৃহীত বহু বিখ্যাত লেখকের উক্তি ও মন্তব্য প্রকাশিত করিয়াছি। এখনও সেরূপ কিছু উপকরণ আমাদের নিকট রহিয়াছে। তিনি কয়েকখানি পুস্তক লিখিবার জন্য অনেক বৎসর ধরিয়া প্রস্তুত হইতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রস্তুতির আদর্শ এত উচ্চ ছিল, যে দুঃখের বিষয় কোন পুস্তকই তিনি লিখিয়া যাইতে পারেন নাই। প্রাচীন

ভারতের বৌদ্ধ যুগ প্রভৃতি সম্বন্ধে তিনি খুব পড়াশুনা ও সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

তাঁহার চিঠিপত্র হইতে আমরা সমসাময়িক অনেক রাজনৈতিক ঘটনা সম্বন্ধে নিগূঢ় সঙ্কেত পাইতাম এবং আমাদের লেখায় তাহা ব্যবহার করিতাম। তাঁহার মত আন্তরিক স্বাজাতিকতা ও বাঙালী-হিতৈষিতা কম লোকেরই দেখিয়াছি।

তিনি বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভাষাতেই সুলেখক ছিলেন। ইংরেজীই বেশী লিখিতেন। আমরা যখন 'প্রদীপ' নামক অধুনালুপ্ত মাসিক পত্র গত খ্রীষ্টীয় শতাব্দীতে বাহির করি, তাহাতেও তিনি কখন কখন প্রবন্ধ লিখিতেন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে লক্ষ্ণৌ শহরে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তাহাতে তাঁহার সহিত আমাদের প্রথম চাক্ষুষ পরিচয় হয়। তখন তিনি সরকারী চাকরি গ্রহণ করেন নাই। তিনি কিছুকাল ত্রিপুরা রাজ্যে চাকরি করিয়াছিলেন। তিনি আমাদের শ্রদ্ধেয় ও হিতকারী বন্ধু ছিলেন।

অনিলকুমার রায়চৌধুরী

শ্রীযুক্ত অনিলকুমার রায় চৌধুরীর অকাল মৃত্যুতে বাংলা দেশের, বিশেষ করিয়া হিন্দু বাঙালীদের, সাতিশয় ক্ষতি হইয়াছে। তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দুসভার সহকারী সম্পাদক, উহার হিন্দুনারী-রক্ষা সমিতির সম্পাদক, এবং হিন্দু অবলা-আশ্রম ও শিশু-সদনের সম্পাদক ছিলেন। তদ্ভিন্ন তিনি কোন কোন ব্যায়াম সমিতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, এবং কংগ্রেসেরও একজন কর্ম্মিষ্ঠ সভ্য ছিলেন।

১৩৪০ ফাল্গুন

মধুসূদন দাস

উড়িষ্যার প্রসিদ্ধ জনহিতকর্ম্মী শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস মহাশয় প্রায় ৮৬ বৎসরে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মত কার্য্যতঃ ও আন্তরিক দেশহিতৈষী মানুষ শুধু উড়িষ্যায় নহে, ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই বিরল। তিনি উড়িষ্যার জন্য যাহা যাহা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, উড়িষ্যাবাসীরা যদি সেই সকল চেষ্টা সফল করিতে অন্তরের সহিত যত্নবান হন, তাহা হইলেই তাঁহার প্রতি প্রকৃত কৃতজ্ঞতা ও সম্মান প্রদর্শন করা হইবে।

তাঁহার সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ সৌজন্য সহকারে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহা তথ্যবহুল, এবং তাহাতে তাঁহার চরিত্রের

বিশেষত্ব বেশ বুঝা যায়। নীচে তাহা প্রকাশিত হইল :—

"কটকের প্রসিদ্ধ কর্ম্মী মধুসূদন দাস গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে লোকান্তরিত হইয়াছেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ২৮শে এপ্রিল তারিখে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি কলিকাতায় অধ্যয়ন করেন এবং উড়িয়াদিগের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধি লাভ করেন। তিনি এম্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বি-এল পরীক্ষা দিয়া উকীল হইয়াছিলেন। পঠদ্দশায় তিনি আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে পড়াইয়াছিলেন। তিনি উকীল হইলেও ওকালতীতে তাঁহার অখণ্ড মনোযোগ দেওয়া হয় নাই। উড়িষ্যার উন্নতিকল্পে তিনি সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকিতেন এবং দরিদ্র উড়িষ্যাবাসীর কল্যাণকল্পে তথায় নানা শিল্প প্রতিষ্ঠা করেন। উড়িষ্যা হইতে বৎসর বৎসর যে চর্ম্ম অপরিষ্কৃত অবস্থায় রপ্তানী হয়, তাহা পরিষ্কৃত করিয়া জুতা প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্য তিনি য়ুরোপীয় পদ্ধতিতে উৎকল ট্যানারী প্রতিষ্ঠিত করেন। তদ্ভিন্ন তিনি উড়িষ্যার প্রসিদ্ধ স্বর্ণরৌপ্যের কাজ দেশে আদৃত করিবার চেষ্টা ও বেন্টউডের চেয়ার প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার শিল্প প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি স্বয়ং খ্রীষ্টধর্ম্মাবলী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কখনও জাতীয়তা বর্জ্জন করেন নাই। ইংলণ্ডের যুবরাজ যখন এদেশে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের অন্যতম মন্ত্রী। তিনি ইংরেজেব বেশে যুবরাজের দরবারে উপস্থিত হইতে অস্বীকার করেন এবং তাহার ফলে স্থির হয়, ভারতীয় মন্ত্রীরা ভারতীয় বেশে দরবারে উপস্থিত হইতে পারিবেন।

"দাস মহাশয়ের বিশ্বাস ছিল, এদেশের শিল্পে জাতিভেদের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। কারণ, পুরুষানুক্রমে একই শিল্পে রত থাকিলে তাহাতে শিল্পীর স্বাভাবিক দক্ষতা জন্মে। সেই দক্ষতার মূল্য অবজ্ঞা করা যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তিনি বিলাতে এক বক্তৃতায় কটকের তারের কাজের শিল্পীদিগের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন—ইহারা সূক্ষ্ম তার জিহ্বায় রাখিয়া প্রভেদ বুঝিতে পারে, এবং যেভাবে তারের কাজ করে, আর কেহ তাহা পারে না।

"শিল্পপ্রতিষ্ঠায় তাঁহার যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি হয় এবং শেষে তিনি সর্বস্বান্ত হইয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

"যখন উড়িষ্যা বাংলার অন্তর্ভুক্ত ছিল, তখন তিনি চারি বার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইয়াছিলেন; এবং ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে বিহার ও উড়িষ্যার ব্যবস্থাপক সভা হইতে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তাহার পর মন্টেগু-চেমস্ফোর্ড শাসনপদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইলে তিনি বিহারে অন্যতর মন্ত্রী হইয়াছিলেন।

"উড়িষ্যার তাঁহার অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল। মেদিনীপুরে প্রথম যে-বার বঙ্গীয় প্রাদেশিক অধিবেশন হয়, সেইবার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার সম্মতি না লইয়াই স্থির করিয়াছিলেন—কটকে পরবর্ত্তী অধিবেশন হইবে। দাস-মহাশয়ের আপত্তিতে উড়িষ্যায় সম্মিলনের অধিবেশন হয় নাই। তিনি এই ব্যাপারে সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু রাজনীতিক্ষেত্রে সুরেন্দ্রনাথের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার অভাব ছিল না।

"মন্ত্রী হইয়া তিনি যে-কারণে পদত্যাগ করেন, তাহাতে তাঁহার মতদৃঢ়তা ও আত্মসম্মানজ্ঞান সপ্রকাশ হয়। তিনি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-বিভাগের ভার পাইয়াছিলেন। ভারতশাসন আইনের বিধান—মন্ত্রী শাসন-

পরিষদের সদস্যের সমান বেতন পাইতে পারেন। সদস্যদিগের বেতন সেকালের সিভিলিয়ানী রীতিতে নির্দ্ধারিত ও অত্যন্ত অধিক। বেতনে তারতম্য হইলে সম্মানে তারতম্য হয়, এই ছল ধরিয়া মন্ত্রীরা অনেকেই বেতন হ্রাসের বিরোধিতা করিয়া আসিয়াছেন। বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে মন্ত্রীর বেতন হ্রাসের প্রস্তাব হয়। এই সময় দাস-মহাশয় প্রস্তাব করেন, তিনি বিনাবেতনে মন্ত্রীত্ব করিবেন, কিন্তু তিনি দরিদ্র—সুতরাং তাঁহাকে ওকালতী করিতে দেওয়া হউক। এই প্রসঙ্গে তিনি কতকগুলি যুক্তি দেখান। তিনি বলেন :—

(১) বিহার ও উড়িষ্যা দরিদ্র প্রদেশ। এই প্রদেশে অর্থাভাবে অনেক জনহিতকর কার্য্য কবা অসম্ভব হয়। সুতরাং যাহাতে ব্যয়সঙ্কোচ হয়, তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

(২) স্বায়ত্তশাসন-বিভাগে বহু লোকই অবৈতনিক হিসাবে কাজ করিয়া থাকেন; অর্থাৎ জেলা বোর্ড, স্থানীয় বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সদস্য ও সভাপতি প্রভৃতি বিনাবেতনে কাজ করিয়া থাকেন। সে অবস্থায় সেই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বেতনভুক্ হইলে সমগ্র বিভাগের অবস্থার সামঞ্জস্য নষ্ট হয়—"In an organization in which all the workers are honorary a salaried Minister mars the symmetry and harmony of the organization."

(৩) যখন দ্বারবঙ্গের মহারাজাধিরাজ ও মামুদাবাদের রাজা শাসন-পরিষদের সদস্য থাকিতে পারেন, অর্থাৎ এই-সব জমীদার আপনাদিগের সম্পত্তির কার্য্য দেখিয়া এবং মামলায় পক্ষভুক্ত হইয়া ও সাক্ষ্য দিয়া সদস্য থাকিলে দোষ হয় না, তখন মন্ত্রীর পক্ষে জীবিকার্জ্জনের জন্য ওকালতী করায় দোষ হইতে পারে না।

"স্যার হেনরী হুইলার তখন বিহারের গভর্ণর। তিনি দাস-মহাশয়ের প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন নাই। তিনি বলেন, মন্ত্রী যখন সরকারেরই একজন, তখন তাঁহার পক্ষে সরকারের অধীন আদালতে উকীলরূপে হাজির হওয়া কখনই সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। এই যুক্তি দেখাইয়া তিনি দাস-মহাশয়কে জানান—তাঁহার প্রস্তাব গৃহীত হইতে পারে না।

"ফলে দাস-মহাশয় মন্ত্রীর পদ ত্যাগ করেন। তিনি দীর্ঘ কাল যে-ভাবে দেশের অবস্থা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার পদত্যাগে যে সরকারের ক্ষতি হয়, তাহা বলা যাইতে পারে। কিন্তু সরকার সেজন্য মত পরিবর্ত্তন করেন নাই।

"মন্ত্রীর পদ ত্যাগ করিয়া তিনি পুনরায় উড়িষ্যাবাসীর উন্নতিচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি উড়িষ্যাবাসীর স্বার্থের সহিত আর কাহারও স্বার্থের সংঘাত উপস্থিত হইলে সর্ব্বপ্রথমে উড়িষ্যাবাসীর স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করিতেন। সে-বিষয়ে তিনি উড়িষ্যার লোকই ছিলেন।

"এক সময়ে উড়িষ্যার সামন্ত রাজাদিগের উপর তাঁহার অসাধারণ প্রভাব ছিল এবং তাঁহারা তাঁহার পরামর্শেই চলিতেন। তিনিও তাঁহাদিগের স্বার্থ-বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন।

"তিনি সুশিক্ষিত ছিলেন এবং তাঁহার জীবনযাত্রার পদ্ধতিও অনেকটা য়ুরোপীয়দিগের মত ছিল। তাঁহার ফুলের সখ ছিল; তিনি অতিথিসৎকারপটু ছিলেন। সর্ব্বোপরি তিনি স্থির ও ধীর বুদ্ধি ছিলেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উড়িয়াদিগের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। উড়িষ্যায় উচ্চশিক্ষা-বিস্তারে তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল।

"জীবনের শেষ কয় বৎসর তিনি জরাজীর্ণ ও আর্থিক ক্ষতিতে বিব্রত হইয়া জনসাধারণের কার্য্যে পূর্ব্ববৎ যোগ দিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু তিনি দীর্ঘকাল উড়িষ্যাবাসীদিগের হিতসাধনের জন্য যে কার্য্য করিয়াছিলেন, সেজন্য উড়িষ্যাবাসীরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ, সন্দেহ নাই।

"শেষ পর্য্যন্ত তিনি উদ্যম ও আশা হারান নাই— উড়িষ্যাকে শিল্পে সমৃদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কর্ম্মশক্তি অসাধারণ ও বিশেষ প্রশংসনীয় ছিল।

"তিনি আপনাকে উড়িয়া বলিয়া পরিচয় দিতে যেন গর্ব্ব অনুভব করিতেন।

"দাস-মহাশয় নিখিল ভারত খ্রীষ্টিয়ান সম্মিলনের সভাপতি হইয়াছিলেন।

"তিনি মনে করিতেন এদেশের লোক যে ধর্ম্মাবলম্বীই কেন হউন না—কখনও জাতীয়তা বর্জ্জন করিবেন না; কেন-না, জাতীয়তার সহিত আত্মসম্মান অচ্ছেদ্যরূপে বিজড়িত।"

রঙ্গাস্বামী আয়েঙ্গার

মান্দ্রাজের প্রসিদ্ধ ইংরেজী দৈনিক কাগজ "দি হিন্দু"র সম্পাদক শ্রীযুক্ত এ রঙ্গাস্বামী আয়েঙ্গার ৫৭ বৎসর বয়সে পরলোকযাত্রা করিয়াছেন। এই অকালমৃত্যুতে সমগ্র ভারতবর্ষ, বিশেষতঃ মান্দ্রাজ, ক্ষতিগ্রস্ত হইল। সাধারণতঃ সাংবাদিকদিগের যে সকল বিষয়ের জ্ঞান থাকা দরকার, তাহা তাঁহার ছিল। অধিকন্তু ভারতবর্ষীয় রাজস্বসংক্রান্ত এবং কন্সটিটিউশ্যন (মূল রাষ্ট্রবিধি) সম্বন্ধীয় বিষয়সকলের জ্ঞানে তিনি বিশেষজ্ঞদের মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। তাঁহার মাতুল পরলোকগত কস্তুরীরঙ্গা আয়েঙ্গার যখন "হিন্দু"র সম্পাদক ছিলেন, সেই সময়ে তিনি তাঁহার অধীনে সাংবাদিকের কার্য্যে শিক্ষানবীশী করেন, এবং ভারতীয় শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে একখানি বই লেখেন। পরে তিনি স্বদেশমিত্রন্ নামক বিখ্যাত তামিল সংবাদপত্রের সম্পাদক হন। তাঁহার মাতুলের মৃত্যুর পর তিনি "হিন্দু"র সম্পাদক-পদে নিযুক্ত হন। এই কাগজ মান্দ্রাজের বিখ্যাত সাংবাদিক, রাজনীতিজ্ঞ ও অর্থনীতিজ্ঞ জী-সুব্রহ্মণ্য আয়ার কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও প্রথমে সম্পাদিত হয়। ইহার পরবর্ত্তী সম্পাদকদ্বয় করুণাকর মেনন এবং কস্তুরীরঙ্গা আয়েঙ্গার প্রসিদ্ধ সাংবাদিক ছিলেন। এরূপ লোকদের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াও রঙ্গাস্বামী আয়েঙ্গার কাগজখানির গৌরব ও মর্যাদা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি কংগ্রেসওয়ালা ও স্বরাজ্যদলভুক্ত ছিলেন। কংগ্রেসের এবং স্বরাজ্যদলের সম্পাদকের কাজ তিনি কিছুকাল করিয়াছিলেন। স্বরাজ্যদল ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হওয়ার বিরোধী ছিলেন না। তিনিও এক সময় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়াছিলেন এবং সেখানে অনেক সারবান্ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কংগ্রেসের কর্ত্তৃপক্ষ এক আদেশ প্রচার করেন, যে, সমুদয় ন্যাশনালিষ্ট অর্থাৎ স্বাজাতিক খবরের কাগজ যেন বন্ধ করা হয়। এই হুকুম তামিল করাইবার জন্য সে-সময় অমৃতবাজার পত্রিকা ও বসুমতীর আফিসে পিকেটিং হইয়াছিল। এই আদেশ বিবেচনা করিবার নিমিত্ত বোম্বাইয়ে সাংবাদিকদিগের এক কন্‌ফারেন্স

হয়। রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার তাহার সভাপতি মনোনীত হন। তিনি এই আদেশের প্রতিকূল বক্তৃতা করেন এবং কন্‌ফারেন্সেও ইহার প্রতিকূল প্রস্তাব গৃহীত হয়। তিনি দ্বিতীয় তথাকথিত গোলটেবিল বৈঠকের তথাকথিত প্রতিনিধি হইয়া বিলাত গিয়াছিলেন এবং তাহার আলোচনা প্রভৃতিতে কন্সটিটিউশ্যন বিষয়ক বিস্তৃত ও গভীর জ্ঞানের এবং তার্কিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

প্রভাসচন্দ্র মিত্র

স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্রের আকস্মিক মৃত্যুতে বাংলা দেশ নানা রাষ্ট্রীয় বিষয়ের বিশেষজ্ঞ একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সেবা হইতে বঞ্চিত হইল। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স প্রায় ৬০ হইয়াছিল। তাঁহার স্বাস্থ্য যেরূপ ছিল, তাহাতে তাঁহার আরও দীর্ঘজীবী হইবার সম্ভাবনা ছিল। রাজকার্য্য হইতে অবসর লইবার পর তিনি বাঁচিয়া থাকিলে দেশ অনেক বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান হইতে লাভবান হইতে পারিত। রাউল্যাট কমিটির সভ্যপদগ্রহণ ও তাহার রিপোর্টে স্বাক্ষর করায় তিনি স্বাজাতিক-দিগের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। কিন্তু যে-সব বিষয়ে তাঁহার যোগ্যতা ও কৃতিত্ব ছিল, তাহা বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। বাংলার রাজস্ব, বাংলার শিক্ষাবিষয়ক নানা তথ্য, বঙ্গের জমীর খাজনা বিষয়ক নানা ব্যবস্থা, ইত্যাদি বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ ও নিখুঁত জ্ঞান তাঁহার মত কম লোকেরই ছিল, এবং তাহা তিনি নিজে এবং তাঁহার নিকট হইতে জানিয়া লইয়া অন্যে দেশের কাজে লাগাইয়াছিলেন। মন্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসনসংস্কার বিধির কাঠামোটা প্রভাসচন্দ্রের মস্তিষ্কপ্রসূত। তিনি দু-বার তথাকথিত গোলটেবিল বৈঠকে বঙ্গীয় হিন্দুদের তথাকথিত প্রতিনিধি হইয়া বিলাত গিয়াছিলেন। পাটরপ্তানী শুল্কের টাকাটা বাংলাকে দিবার সপক্ষে আন্দোলন তথায় প্রথমে তিনিই আরম্ভ করেন। বাংলা ঐ টাকা অংশতঃ পাইলেও তাহার প্রশংসা প্রথমতঃ প্রভাসচন্দ্রের প্রাপ্য হইবে। ভারতবর্ষে যত ইংরেজ সৈন্য কাজ করিতে আসে, তাহাদের সংগ্রহ ও শিক্ষাদান বাবতে ভারতবর্ষকে অনেক টাকা অন্যায়রূপে বরাবরই ইংলণ্ডকে দিতে হইয়া আসিতেছে। এই টাকাটার হিসাব সৈন্যদের মাথাপিছু ধরা হইত বলিয়া ইহার নাম ক্যাপিটেশ্যন চার্জ। ভারতবর্ষ যে ইহার কিয়দংশ হইতেও নিষ্কৃতি পাইয়াছে, তাহারও প্রশংসা স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্রের প্রাপ্য।

তিনি দীর্ঘকাল বঙ্গের অন্যতম মন্ত্রী ও অন্যতম শাসন-পরিষৎ-সভ্যের কাজ দক্ষতার সহিত করিয়া গিয়াছেন।

তিনি দীর্ঘকাল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়ে-শ্যনের সম্পাদক ও পরে সভাপতি ছিলেন। ভারত-সভারও সভাপতি ছিলেন। তিনি ভারতীয় উদারনৈতিক দলের একজন প্রধান সভ্য ছিলেন।

বঙ্গ ও আসামের অনুন্নত শ্রেণীসমূহের উন্নতিবিধায়িনী সমিতির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বা পরিচালিত প্রায় ৪৫০টি বিদ্যালয় আছে। তাহাতে প্রায় ১৮০০০ ছাত্রছাত্রী পড়ে। স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র অনেক বৎসর ইহার সভাপতি ছিলেন। অনেক বৎসর ইহার কাজ চালাইবার জন্য থোক টাকা চাঁদা দিতেন।

১৩৪১ বৈশাখ
কুমুদনাথ চৌধুরী

কুমুদনাথ চৌধুরী কলিকাতা হাইকোর্টের অর্ন্যতম বিখ্যাত ব্যারিষ্টার ছিলেন। তা ছাড়া তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল শিকারী বলিয়া। তাঁহার লেখা শিকারবিষয়ক পুস্তক ও অনেক প্রবন্ধ আছে। দুঃখের বিষয়, তিনি গত মাসে মধ্যপ্রদেশে বাঘ শিকার করিতে গিয়া বাঘের দ্বারাই নিহত হইয়াছেন।

১৩৪১ শ্রাবণ
কবিরাজ-শিরোমণি শ্যামাদাস বাচস্পতি

কবিরাজ-শিরোমণি শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয়ের মৃত্যুতে বঙ্গদেশ—শুধু বঙ্গদেশ কেন সমগ্র ভারতবর্ষ—একজন সংস্কৃত সাহিত্য ও আয়ুর্ব্বেদে সুপণ্ডিত সুচিকিৎসক ও পরহিতকর্ম্মী ব্যক্তির সেবা হইতে বঞ্চিত হইল। তাঁহার যশ বাংলা দেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, বঙ্গের সীমা অতিক্রম করিয়া ভারতব্যাপী হইয়াছিল। ধনী বা দরিদ্র কেহ দুশ্চিকিৎস্য জটিল রোগে আক্রান্ত হইলে তাঁহার চিকিৎসায় ফল পাইবেন এই আশা করিতেন।

মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স সত্তর বৎসর হইয়াছিল। তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি ছিলেন এবং আগামী বৎসরের জন্যও নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি কয়েক বার নিখিল ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদিক মহাসম্মেলনের সভাপতি হইয়াছিলেন। বাংলা দেশের ঐরূপ মহাসভারও তিনি সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।

তিনি স্বকৃতপুরুষ, সামান্য অবস্থা হইতে বিখ্যাত ও সঙ্গতিপন্ন হইয়াছিলেন। অল্প বয়সে কাহারও নিকট উপকার পাইয়া থাকিলে কখনও তাহা বিস্মৃত হইতেন না, পরন্তু বহুগুণ প্রত্যুপকার দ্বারা সেই ঋণ কৃতজ্ঞচিত্তে পরিশোধ করিতেন। তিনি স্বধর্ম্ম হিন্দুধর্মে দৃঢ়বিশ্বাসী এবং অন্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদার ছিলেন।

আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষাদান ও আয়ুর্ব্বেদের প্রচার কল্পে তিনি বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ স্থাপন করেন। ইহা তাঁহার একটি প্রধান কীর্ত্তি। ইহাতে ছাত্রেরা আয়ুর্ব্বেদ শিখিবার এবং রোগীরা আয়ুর্ব্বেদ অনুসারে চিকিৎসিত হইবার সুযোগ পাইয়া আসিতেছে। ইহার জন্য তিনি আপার সার্কুলার রোডে জমী পাইয়াছিলেন। তাহাতে বিদ্যালয় ও হাসপাতাল নির্ম্মাণ করিবার তাঁহার সঙ্কল্প ছিল। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ তর্কতীর্থ মহাশয়ের দ্বারা বাচস্পতি মহাশয়ের অভিপ্রায় অনুযায়ী কাজ হইবে বলিয়া সকলে আশা করিবেন। সর্ব্বসাধারণেও এই কার্য্যে সহযোগিতা করিলে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার প্রকৃষ্ট উপায় হইবে।

পুরুলিয়ার হরিপদ দাঁ

পুরুলিয়ার হরিপদ দাঁ মহাশয় বিখ্যাত লোক ছিলেন না, বিদ্বান্ ছিলেন না, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্ন বা উচ্চ কোন উপাধিধারী ছিলেন না, সরকারের 'জানিত' লোক ছিলেন না, বিশেষ ধনী ছিলেন না; কিন্তু তিনি খাঁটি জনহিতৈষী দেশহিতৈষী হৃদয়বান বড় নজরের লোক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে পুরুলিয়ার উজ্জ্বল রত্নের, বঙ্গের একটি উজ্জ্বল রত্নের তিরোধান হইয়াছে। পাঁচ বৎসরের কিছু অধিক পূর্ব্বে ১৩৩৬ সালের বৈশাখ মাসে পুরুলিয়ার অবৈতনিক পাঠাগার সম্বলিত হরিপদ সাহিত্যমন্দিরের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে আমি ঐস্থানে যাই ও তথায় উহার প্রতিষ্ঠাতা হরিপদ বাবুর সহিত পরিচিত হই। তখন সেখানকার কাজ শেষ করিয়া আসিয়া আমি ১৩৩৬ সালের আষাঢ় মাসের প্রবাসীতে লিখিয়াছিলাম—

"পুরুলিয়ার সাহিত্যমন্দিরটির নাম রাখা হইয়াছে শ্রীযুক্ত হরিপদ দাঁ মহাশয়ের নাম অনুসারে। তিনি ইহা নির্ম্মাণের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াছেন। স্বর্ণ ও রৌপ্য পদকাদির ব্যয়সমেত উৎসবের ব্যয়ও প্রধানতঃ (বা সমস্ত?) তিনি নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। পুরুলিয়ায় থাকিতে শুনিয়াছিলাম, উৎসবের কয়েক দিন মফঃস্বল হইতে আগত দুই তিন শত লোক তাঁহার বাড়ীতে আহার করিতেন। সাহিত্যমন্দির ছাড়া পুরুলিয়ায় তাঁহার অন্য কীর্ত্তিও আছে। অথচ তাঁহাকে ধনী লোক বলিলে ঠিক বলা হইবে না। তাঁহার পরিচ্ছদ দেখিলে ত সে সন্দেহ হইবেই না।"

হরিপদ বাবুর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয় গত করাচী কংগ্রেসের অধিবেশনের সময়। এই অনাড়ম্বর মানুষটিকে চিনিতে আমার কোন বিলম্ব হয় নাই।

তাঁহার সম্বন্ধে অনেক তথ্য বিলম্বে হস্তগত হওয়ায় এবার ছাপিবার স্থান ও সময় পাইলাম না। আগামী মাসে তাহা মুদ্রিত হইবে।

১৩৪১ ভাদ্র

ব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী

মৈমনসিংহ জেলার মুক্তাগাছার জমিদার ব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়ের অকালমৃত্যুতে বঙ্গদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। নানা সদনুষ্ঠানের সহিত তাঁহার যোগ ছিল। নির্য্যাতিতা নারীদের তিনি হৃদয়ের সহিত এবং কার্য্যতঃ কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করিতেন। দেশ গণতান্ত্রিক স্বরাজ লাভ করে, তিনি ইহা চাহিতেন। তাঁহার সৌজন্য তাঁহাকে জনপ্রিয় করিয়াছিল। তিনি বেশ বাংলা লিখিতে পারিতেন। তাঁহার শিকার-কাহিনী তাহার পরিচায়ক।

রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায়

পরলোকগত রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এক জন কৃতী এটর্নী ছিলেন। রাষ্ট্রীয় আন্দোলনাদির সহিত তাঁহার প্রকাশ্য যোগ ছিল না বটে, কিন্তু অনেক হিতকর প্রচেষ্টার সহিত তাঁহার আন্তরিক যোগ ছিল। বিলাতে স্যর নৃপেন্দ্রনাথ সরকার প্রধান মন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাটোয়ারার, পুনা-চুক্তির, এবং প্রধান মন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত দ্বারা ভারতীয় হিন্দুদের, বিশেষতঃ বাঙালী হিন্দুদের প্রতি যে অবিচার হইয়াছে, তাহার, যে প্রতিকার-চেষ্টা করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা কতকটা রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অপ্রকাশিত সহযোগিতায় পারিয়াছিলেন।

১৩৪১ পৌষ

জানকীনাথ বসু

কটকের ভূতপূর্ব্ব গবর্ন্মেণ্ট উকীল শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসু প্রায় ৭৫ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুর সময় তাঁহার অন্য সকল সন্তান নিকটে ছিলেন, কেবল শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ভিয়েনা হইতে এরোপ্লেনে আসিয়াও ঠিক সময়ে পৌঁছিতে পারেন নাই। বাল্যকালেই জানকীনাথের পিতৃবিয়োগ ঘটে। কিন্তু তিনি নিরুৎসাহ না হইয়া জ্ঞানলাভে ব্যাপৃত থাকেন। কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার শিক্ষার অনেক সাহায্য করেন। বি-এ পাস করিবার পর জানকীনাথ জেনার‍্যাল এসেম্ব্লীজ্ ইনস্টিটিউশ্যনে ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ইহা এক্ষণে স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ নামে পরিচিত। অতঃপর তিনি বি-এল পাস করিয়া কটকে ওকালতী আরম্ভ করেন। তাহাতে তাঁহার খুব পসার ও প্রভূত অর্থাগম হয়। গবর্ন্মেণ্ট তাঁহাকে সরকারী উকিল নিযুক্ত করেন ও পরে রায় বাহাদুর উপাধি দেন। অসহযোগ-আন্দোলনের সময় তিনি ঐ উপাধি পরিত্যাগ করেন। তিনি কয়েক বৎসর হইতে হৃদ্‌রোগে ভুগিতেছিলেন। গত বৎসর যখন আমরা রামমোহন শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কটক গিয়াছিলাম, তখন তিনি অসুস্থতা সত্ত্বেও সেই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

তাঁহার পুত্রেরা সকলেই কৃতী। তাহার মধ্যে রাজনৈতিক কর্ম্মিষ্ঠতার জন্য শরৎচন্দ্র ও সুভাষচন্দ্র সমধিক বিখ্যাত।

১৩৪২ আশ্বিন

স্বর্গীয়া কুমারী জেন এডাম্‌স্

কুমারী জেন এডাম্‌স্ ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় জন্মগ্রহণ করেন। বর্ত্তমান বৎসরে প্রায় ৭৫ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি আমেরিকার সাধারণ লোকদের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনের জন্য শিকাগো শহরে হল্ হৌস্ (Hall House) নামক প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত করেন ও মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ৪৬ বৎসর তাহা পরিচালন করেন। জগতে শান্তি স্থাপনের জন্য কেহ কোন বৎসর বিশেষ কিছু করিয়া থাকিলে এবং সকলের চেয়ে বেশী করিয়া থাকিলে তিনি "শান্তি নোবেল পুরস্কার" পাইয়া থাকেন। কুমারী এডাম্‌স এই পুরস্কার পাইয়াছিলেন। আন্তর্জাতিক নানা বিষয়ে এবং তাঁহার স্বদেশের রাষ্ট্রীয় বিষয়ে বড় বড় রাজনীতিজ্ঞেরা তাঁহার মত জানিতে চাহিতেন এবং তাঁহার পরামর্শ লইতেন। এই পূতশীলা মহিলা আমেরিকার আধুনিক সময়ের শীর্ষস্থানীয়া নারী, এবং জগতের সকল দেশের সকল যুগের অতিবরেণ্যা নারীদের মধ্যে অন্যতমা।

ইঁহার ছবি এখানে প্রকাশিত হইল।

১৩৪২ অগ্রহায়ণ

আনন্দচন্দ্র রায়

ঢাকার প্রসিদ্ধ নেতা আনন্দচন্দ্র রায় গত ম.সে ৯১ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি অতি বিখ্যাত উকীল ছিলেন। ৪০ বৎসর ওকালতি করিয়া এবং রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়া তিনি ১৯০৮ সালে ২৭ বৎসর আগে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করেন। অনেকে জানিতই না যে তিনি এখনও বাঁচিয়া আছেন। ওকালতিতে তাঁহার এরূপ পসার হইয়াছিল, যে, তিনি য়্যাডভোকেট জেনার‍্যালের সমান ফী চাহিতেন ও পাইতেন। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ হওয়ায় তিনি উহার বিরুদ্ধে আন্দোলনে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহকর্ম্মী রূপে বিশেষ আগ্রহের সহিত যোগদান করেন। মিঃ (পরে সর্) কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত পিতার অমতে বিলাতে সিবিল সার্বিসের জন্য প্রস্তুত হইতে যান। আনন্দচন্দ্র রায় তাঁহার সব ব্যয়ভার বহন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের জন্য যে কমিটি হইয়াছিল, তিনি তাহার সভ্য মনোনীত হন। ঢাকা পীপলস্ এসোসিয়েশ্যন ও পূর্ব্ববঙ্গ ভূম্যধিকারী সভাদ্বয়ের তিনি মেরুদণ্ডের মত ছিলেন। উভয়ের কার্য্যালয় তাঁহার গৃহেই ছিল। তিনি জগন্নাথ কলেজের অন্যতম ট্রষ্টী ও তাহার কৌন্সিলের সভ্য ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী আনন্দময়ীর নামে তিনি ঢাকায় একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। অনেক দরিদ্র ছাত্র তাঁহার সাহায্যে শিক্ষালাভ করিয়াছে। এখনও অনেক দরিদ্র পরিবার তাঁহার বাড়ি হইতে মাসিক সাহায্য পায়। সাংখ্যদর্শনের ছাত্রদের জন্য তিনি কয়েকটি বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

মনোমোহন পাণ্ডে

মনোমোহন পাণ্ডে কলিকাতায় একটি থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী ছিলেন। তিনি অনেক দরিদ্র ছাত্র ও অন্য অনেক গরিব লোককে পালন করিতেন। কাশীতে তিনি কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ ও প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। ইহার দ্বারা তীর্থযাত্রীদের ও অন্য হিন্দু কাশী-দর্শকদের বিশেষ সুবিধা হইবে। ইহা তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করিবে।

১৩৪২ পৌষ

কর্ম্মবীর গোপালকৃষ্ণ দেবধর

কর্ম্মবীর গোপালকৃষ্ণ দেবধরের মৃত্যুতে সমগ্র ভারতবর্ষ এবং বিশেষ করিয়া বোম্বাই বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। পুণার সেবাসদন নামক মহিলাদের নানাবিধ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান তাঁহার অন্যতম প্রধান কীর্ত্তি। তাঁহার হৃদয় যেমন বড়, স্বভাব তেমনই শান্ত ধীর ছিল। তিনি ভারতভৃত্য-সমিতির (Servant of India Societyর) সভাপতি ছিলেন। এম এ পাস করিবার পর এই সমিতির সভ্য হন। এই সমিতি গোপালকৃষ্ণ গোখলে মহাশয় দেশসেবার জন্য স্থাপন করেন। ইহার সভ্যদিগকে অনন্যকর্ম্মা হইতে হয়। দেবধর মহাশয় জাতিধর্ম্মশ্রেণীদল-নির্ব্বিশেষে সকলের হিত করিতেন। তিনি বোম্বাইয়ের সোশ্যাল সার্ভিস লীগ স্থাপন করেন, বহু বৎসর ভারতীয় সমাজসংস্কার কন্‌ফারেন্সের সেক্রেটারী ছিলেন, মালাবারে মোপলা-বিদ্রোহে উৎপীড়িত ও সর্ব্বস্বান্ত লোকদের স্থায়ী সাহায্য ও বিপন্মোচনের জন্য প্রভূত চেষ্টা করেন, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে কো-অপারেটিভ্ প্রচেষ্টার অন্যতম প্রবর্ত্তক ছিলেন ও মান্দ্রাজ মহীশূর ত্রিবাঙ্কুড় ও কোচীনের কয়েকটি কো-অপারেটিভ অনুসন্ধান কমিটির সভ্য ছিলেন, শ্রমিকদের অবস্থার উন্নয়নে বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন, বোম্বাইয়ের ঋণভার-প্রপীড়িত লোকদের ঋণশোধ-সমিতি স্থাপন করেন, "অস্পৃশ্য"দের সামাজিক দুর্গতির বিরুদ্ধে বরাবর যুদ্ধ করিতেন, মহারাষ্ট্র-হরিজন-সংঘের সভাপতি ছিলেন, দাক্ষিণাত্য-কৃষি-সমিতির সভাপতি ছিলেন, সরকারী কৃষি-গবেষণা কৌন্সিলে ভারত-গবর্ন্মেন্ট কর্ত্তৃক তিন বার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বন্যা বা দুর্ভিক্ষে বিপন্ন লোকদের সাহায্যের অনেকবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

জননায়ক শ্যামাচরণ রায়

ময়মনসিংহের গৃহীতাবসর ব্যবহারজীব ও জননায়ক শ্যামাচরণ রায় মহাশয়ের ৯১ বৎসর বয়সে মৃত্যু হইয়াছে। তিনি মহৎ ও বিশুদ্ধ চরিত্র এবং নানা সৎকর্ম্মের জন্য জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোকের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। ১৮৭২ সাল হইতে ১৯১৮ পর্য্যন্ত ওকালতী করেন। তিনি উকীল সভার সম্পাদক ও সভাপতি ছিলেন। চল্লিশ বৎসর মিউনিসিপাল কমিশনার, ছয় বৎসর মিউনিসিপালিটীর ভাইচেয়ারম্যান ও একুশ বৎসর উহার চেয়ারম্যান ছিলেন। ময়মনসিংহ জেলার সমুদয় জনহিতকর কার্য্যে অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া তিনি যুক্ত ছিলেন। তথাকার আনন্দমোহন কলেজের তিনি সম্পাদক ও প্রাণস্বরূপ ছিলেন। তথাকার লিটন মেডিক্যাল স্কুলও প্রধানতঃ তাঁহার চেষ্টা ও উদ্যোগে স্থাপিত হয়। উহার হাসপাতাল, শহরের জলের কল ও টাউন-হল তাঁহার উদ্যোগিতা ও শ্রমশীলতার সাক্ষ্য দেয়। কর্ম্মজীবনের প্রথম অংশে তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিতেন। তিনি নেত্রকোণায় জেলা কন্‌ফারেন্সের সভাপতি এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সের ময়মনসিংহ অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন।

১৩৪২ মাঘ

স্বর্গীয় ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ বসু

সুপ্রসিদ্ধ ধাত্রীবিশারদ ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ বসু সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। ডাঃ বসু দরিদ্রের বন্ধু ছিলেন, চিকিৎসকের মহৎ জীবিকাকে তিনি কেবলমাত্র অর্থাগমের উপায় বলিয়াই গ্রহণ করেন নাই, ব্রত বলিয়া জানিয়াছিলেন।

১৩৪২ চৈত্র

মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়

বিখ্যাত এটর্নী মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ৭৮ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি রামমোহন রায়েব দৌহিত্রীর বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জামাতা ছিলেন। তিনি বাংলা, ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার লিখিত বাংলা ও ইংরেজী কয়েকখানি ভাল বহি আছে। তিনি এক সময়ে থিয়সফিষ্ট ছিলেন এবং ১৮৮৪

খ্রীস্টাব্দে ম্যাডাম ব্লাভাট্স্কী ও কর্ণেল অলকটের সহিত আমেরিকা গিয়াছিলেন। তিনি পরে পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর শিষ্য হন। তিনি অতি সজ্জন ছিলেন এবং বহু জনহিতকর প্রচেষ্টার সহিত তাঁহার যোগ ছিল। এক সময়ে তিনি একটি আশ্রম স্থাপন করিয়া ছিলেন যাহাতে থাকিয়া কলুষিত জীবন ত্যাগানন্তর নিরাশ্রয় নারীরা সৎপথে থাকিয়া জীবন যাপন করিতে পারে। যৌবনকালেই তিনি এরূপ জ্ঞানী ও বাক্‌পটু ছিলেন, যে, বিখ্যাত কবি ডবল্যু বি য়ীট্‌স তাঁহার সহিত পঞ্চাশ বৎসরেরও পূর্ব্বে পরিচিত হইয়া থাকিলেও গত বৎসর তাঁহাকে একখানি চিঠিতে লেখেন :—

Dear Mohini Chatterjee,

I have often wondered where you were. Somebody sent me a book of yours a couple of years ago which interested me, and now I have been able to get your address through a friend. I write merely tell you that you are vivid in my memory after all these years. That week of talk when you were in Dublin did much for my intellect, gave me indeed my first philosophical exposition of life. When I knew you, you were a very beautiful young man; I think you were twenty-seven years old, and astonished us all, learned and simple, by your dialectical power. My wife tells me that I often quote you....

য়ীটসের The Winding Stair নামক গ্রন্থে মোহিনী বাবুর সম্বন্ধে একটি কবিতা আছে।

শ্রীমতী কমলা নেহরু

দীর্ঘকাল সাংঘাতিক ব্যাধির সহিত সংগ্রাম করিয়া শ্রীমতী কমলা নেহরু দেহত্যাগ করিয়াছেন। শ্বশুর, শ্বশ্রূ, ও স্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া এই নারীরত্ন আত্মোৎসর্গ, কষ্টসহিষ্ণুতা ও সাহসের সহিত রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে দেশের সেবা করিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৩৬ বৎসর হইয়াছিল। আমি যখন ১৯২৬ সালে সেপ্টেম্বর মাসে জেনিভায় ছিলাম, তখন তিনি তাঁহার স্বামী, ছোট ননদ কৃষ্ণকুমারী ও কন্যা ইন্দিরার সহিত চিকিৎসার্থ সেখানে ছিলেন। তাঁহারা যে হোটেলের একটি ফ্ল্যাটে ছিলেন, তথায় একদিন গিয়াছিলাম। ১৯২৬এরও আগে হইতে তিনি পীড়িত ছিলেন। দেশে ও বিদেশে চিকিৎসা যত ভাল হইতে পারে, তাহা তাঁহার হইয়াছিল, এই সান্ত্বনা তাঁহার স্বামী ও আত্মীয়েরা অনুভব করিতে পারেন। চিকিৎসা হইতে পারিত কিন্তু হয় নাই, এ দুঃখ দুর্বিষহ এবং কখনও ইহার উপশম হয় না। তাঁহার আত্মীয়দিগের কেবল ঐ দুঃখটা নাই। ভারতের সেবিকা তিনি ছিলেন। তাঁহার দেহাবশেষ ভারতেরই গঙ্গাগর্ভে স্থান পাইয়াছে।

১৩৪৩ আষাঢ়

পূরণচন্দ্র নাহার

পূরণচন্দ্র নাহার মহাশয়ের অকালমৃত্যুতে বাংলা দেশ, এবং সমগ্র ভারতবর্ষের জৈন সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। তিনি জৈন সম্প্রদায়ের ভূষণ ছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ, বি-এল ছিলেন। কিন্তু তাঁহার বিদ্যাবত্তার পরিচয় ইহা নহে। তাঁহার পাণ্ডিত্য ও ঐতিহাসিক জ্ঞান তাঁহাকে বিদ্বৎসমাজে সম্মানিত করিয়াছিল। ভারতীয় ঐতিহাসিক সাহিত্যে তাঁহার "জৈন অনুশাসন লিপি" প্রশংসিত স্থান লাভ করিয়াছে। ভারতীয় চিত্র ও মূর্ত্তিশিল্পের অনেক উৎকৃষ্ট নমুনা এবং বহু প্রাচীন মুদ্রা তিনি সংগ্রহ করিয়া নিজগৃহে রাখায় তাহা একটি মিউজিয়মের মত হইয়াছিল। এই সকল বিষয়ের ও নানা ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয়ের অনেক মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ তাঁহার লাইব্রেরীতে আছে। অনেক ঐতিহাসিক গবেষক তাঁহার ললিতকলা বিষয়ক ও প্রাচীন মুদ্রাবিষয়ক সংগ্রহের এবং লাইব্রেরীর সাহায্য পাইয়াছেন। আমরাও, গবেষক না হইলেও, এইগুলি হইতে কখন কখন সাহায্য পাইয়াছি। নাহার মহাশয়ের পারিবারিক বাসভবনের অন্তর্গত কুমারসিংহ হলে তালতলা পাব্লিক লাইব্রেরীর উদ্যোগে কয়েক বৎসর হইতে কলিকাতা সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া আসিতেছে।

নাহার মহাশয়কে তাঁহার সৌজন্য ও বিনয়নম্রতা লোকপ্রিয় করিয়াছিল। তাঁহার অসুস্থতার কথা তাঁহার মুখে মধ্যে মধ্যে শুনিতাম, কিন্তু এত শীঘ্র তাঁহার দেহান্ত হইবে কল্পনাও করি নাই।

১৩৪৪ অগ্রহায়ণ

ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতম পৌত্র শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি যৌবনকাল হইতে আদি ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। দীর্ঘকাল এই সমাজের সম্পাদক ও আচার্য্যের কাজ তিনি করিয়াছিলেন। তিনি বহু বৎসর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি "অভিব্যক্তিবাদ" প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক। নূতন গবেষণার ফলে অভিব্যক্তিবাদ এখন যে আকার ধারণ কবিয়াছে, তদনুসারে তাঁহার ঐ বহিটি সংশোধন করিয়া পুনর্মুদ্রণ করিলে বঙ্গীয় পাঠকসমাজের উপকার হইবে। আমরা যত দূর জানি, বাংলা ভাষায় ঐ বিষয়ে ঐরূপ বহি আর নাই।

সংবাদপত্রে দেখিয়াছি, ক্ষিতীন্দ্রবাবু যখন হাবড়া মিউনিসিপালিটির সম্পাদক ছিলেন তখন ঐ পদের কাজ যোগ্যতার সহিত নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন।

অধ্যাপক প্রমোদকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

অধ্যাপক প্রমোদকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে বাঁকুড়ার ওয়েসলিয়ান কলেজ এবং তথাকার বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল স্কুল বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। "বাঁকুড়া দর্পণ" পত্রিকায় দেখিলাম তিনি ওয়েসলিয়ান কলেজের ল্যাবরেটরীতে কয়েকটি গবেষণা করিয়া ইংলণ্ডীয় এফ্ সি এস্ উপাধি পান। এই কলেজের তিনি অধ্যাপক ছিলেন। অধ্যাপকতার জন্য তাঁহাকে খুব পরিশ্রম করিতে হইত। তদ্ভিন্ন তিনি বাঁকুড়া সম্মিলনীর মেডিক্যাল স্কুলটির অবৈতনিক তত্ত্বাবধায়ক রূপেও বিশেষ পরিশ্রম করিতেন।

১৩৪৫ জ্যৈষ্ঠ

অন্ধ্র দেশীয় নেতা নাগেশ্বর রাও

অন্ধ্রদেশের অন্যতম কংগ্রেসনেতা শ্রীযুক্ত নাগেশ্বর রাও ৭০ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ঐ অঞ্চলে ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারক বলিয়া এবং আধুনিক তেলুগু গদ্যসাহিত্যের জনক বলিয়া যেমন ব্রাহ্মসমাজের পণ্ডিত বীরেশলিঙ্গাম্ পান্টুলু মহাশয়ের প্রসিদ্ধি আছে, তাঁহার কিছু পরবর্ত্তী কালে রাজনৈতিক ও তৎসম্পৃক্ত অন্যবিধ অনেক সার্ব্বজনিক কার্য্যের ক্ষেত্রে পণ্ডিত নাগেশ্বর রাও পান্টুলুর সেই প্রকার প্রসিদ্ধি আছে বলিয়া শুনিয়াছি। "অমৃতাঞ্জন" নামক ঔষধের ব্যবসা করিয়া তিনি নিজ আর্থিক অবস্থার উন্নতি করেন। পরে তিনি এই ব্যবসাটিকে একটি লিমিটেড কোম্পানীতে পরিণত করেন। উপার্জ্জিত অর্থ তিনি নানা ভাবে দেশের সেবায় লাগাইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার মাতৃভাষা তেলুগুতে সাপ্তাহিক ও দৈনিক অন্ধ্র-পত্রিকা চালাইতেন এবং "ভারতী" নামক একটি মাসিকপত্রও চালাইতেন। এগুলি তাঁহার আয়বৃদ্ধির উপায় না হইয়া ব্যয়-বৃদ্ধিরই উপায় হইয়াছিল বলিয়া শুনিয়াছি। শুনিয়াছি, অন্ধ্র-পত্রিকা যত ছাপা হইত, তাহার অর্দ্ধেকই বিনা মূল্যে বিতরিত হইত। তিনি বহু সাহিত্যিককে অর্থসাহায্য করিতেন, তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। নানা দিকে তিনি মুক্তহস্ত পরদুঃখকাতর দাতা ছিলেন। তজ্জন্য আন্ধ্রেরা তাঁহাকে বিশ্বদাতা উপাধি দিয়াছিলেন। ললিত-কলারও তিনি বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন। এই কারণে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে "কলাপ্রপূর্ণ" পদবীতে ভূষিত করিয়াছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়া তাঁহাকে কারাবরণ করিতে হইয়াছিল। এই কারণে এবং প্রধান প্রধান পত্রিকার পরিচালক বলিয়া তিনি স্বদেশবাসীর নিকট হইতে দেশোদ্ধারক পদবী পাইয়াছিলেন।

১৩৪৬ বৈশাখ
সন্তোষের মহারাজা

সন্তোষের মহারাজা সর্ মন্মথনাথ রায়চৌধুরীর মৃত্যু হইয়াছে। নানা বিষয়ে তাঁহার যোগ্যতা ছিল, এবং জাতীয় জীবনের নানা ক্ষেত্রে বহু জনহিতকর কার্য্যের সহিত তাঁহার যোগ ছিল। তিনি কর্ম্মিষ্ঠ লোক ছিলেন, চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিতেন না। রক্তের চাপ অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় ডাক্তারেরা তাঁহাকে দীর্ঘকাল শুইয়া থাকিতে বলেন। তাহা সত্ত্বেও তিনি কয়েকবার উঠিয়া কাজে প্রবৃত্ত হওয়ায় তাঁহার রোগ বৃদ্ধি পায় ও মৃত্যু হয়।

যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হন এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ১৯ বৎসর বয়সেই তিনি লাহোর কংগ্রেসে বাগ্মিতার সহিত বক্তৃতা করেন।

তিনি তিন বৎসর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি ছিলেন এবং যোগ্যতার সহিত তাহার কার্য্য পরিচালন করেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখরের ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছিলেন।

নানা প্রকার ক্রীড়ার উৎসাহদাতা বলিয়া এবং ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশ্যনের প্রেসিডেন্টরূপে তিনি সমধিক বিখ্যাত হইয়াছিলেন। আরও অনেক ক্রীড়া-সমিতি ও ব্যায়াম সমিতির এবং কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্স্টিটিউটের তিনি সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। কলিকাতায় একটি স্টেডিয়াম নির্ম্মাণের তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল। তাহা পূর্ণ হয় নাই।

১৩৪৭ বৈশাখ
দীনবন্ধু চার্লস ফ্রীয়ার এণ্ডরূজ

চার্লস ফ্রীয়ার এণ্ডরূজ ইংলণ্ডের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ উপাধিকারী এবং তথাকার পেম্ব্রোক কলেজের ফেলো ছিলেন। তিনি যৌবনেই খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারার্থ সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করিয়া দিল্লীর সেন্ট স্টীফেন্স কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া আসেন। তখন তিনি অন্যান্য পাদরীদের মত রেভারেণ্ড উপাধিভূষিত ছিলেন। পরে তিনি ঐ উপাধি ত্যাগ করেন। তাহা করিলেও, তাঁহার চরিত্র ও জীবনের দ্বারা সত্য খ্রীষ্টীয় আদর্শ যেরূপ প্রচারিত হইয়াছে, অল্প পাদরী বা সাধারণ খ্রীষ্টিয়ানের দ্বারাই তাহা হইয়া থাকে। তাঁহার নামের তিনটি আদ্য অক্ষর "সী," "এফ্" এবং "এ" "Christ's Faithful Apostle" (খ্রীষ্টের বিশ্বাসী প্রেরিত-পুরুষ) এই আখ্যারই আদ্য অক্ষরত্রয়, ইহা যিনি বলিয়াছিলেন, তিনি ঠিকই বলিয়াছিলেন। কারণ, খ্রীষ্টের জীবন ও চরিত্র যে আদর্শের ছিল বলিয়া শ্রদ্ধাবান্ খ্রীষ্টিয়ান ও অ-খ্রীষ্টিয়ানগণ মনে করেন, এণ্ডরূজ সেই আদর্শ অনুসারে চলিবার চেষ্টা আমরণ করিয়া গিয়াছেন।

সেই আদর্শের একটি অংশ যাহারা, অবজ্ঞাত,

উপেক্ষিত, নির্যাতিত, দীনহীন, তাহাদের সহায় হওয়া। এণ্ডরূজ এইরূপ সকল মানুষের বন্ধু ছিলেন। এই জন্য তাঁহাকে যে 'দীনবন্ধু' নাম দেওয়া হইয়াছিল তাহা সার্থক।

দক্ষিণ-আফ্রিকায়, ফিজিতে, এবং অন্যান্য উপনিবেশে দুর্গত ভারতীয়দের জন্য তিনি বহু পরিশ্রম করিয়াছিলেন,বহু দুঃখ ও লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিলেন। এই সকল স্থানে ভারতীয়দের অবস্থার যদি কিছু উন্নতি হইয়া থাকে, তাহার প্রশংসার বহু অংশ এই সার্থকনামা দীনবন্ধুর প্রাপ্য। ব্রিটিশ গিয়ানা হইতে যে-সব ভারতীয় শ্রমিক ভারতে স্থান ও সুখশান্তি পাইবার আশায় ফিরিয়া আসিয়া নিরাশ হইয়া মাটিয়াবুরুজে দুঃখে দিনপাত করে, তাহাদের খবর পর্য্যন্ত ভারতীয়েরা অল্প লোকেই জানে, কিন্তু দীনবন্ধু তাহাদের নিমিত্ত পরিশ্রম করিতেন, বড় লাটসাহেব ও তাঁহার পারিষদদের নিকট দৌড়াদৌড়ি করিতেন।

বিহারের চম্পারনের নীলকরপীড়িত প্রজাদের সহায় তিনি ছিলেন, ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত বিহারে তিনি কর্ম্মিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, বহু বার প্লাবন ও দুর্ভিক্ষ পীড়িত উড়িষ্যার স্থায়ী দুঃখমোচন-ব্যবস্থার চেষ্টা তিনি করিয়াছিলেন। উত্তরবঙ্গের অবিস্মরণীয় প্লাবনপীড়নের সময়ও তিনি দুর্গতদের বন্ধুরূপে দেখা দিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনচরিত লিখিতেছি না, সুতরাং তিনি যে কোথায় কি কি করিয়াছিলেন তাহা এখন লেখা যাইবে না। ব্যক্তিগতভাবে তিনি যে কত লোকের উপকার করিয়াছেন, তাহার ত কোন হিসাবই পাইবার জো নাই।

তিনি অনুগ্রাহক মুরব্বি রূপে কিছু করিতেন না, কখন ভাই কখন বা সেবকরূপে করিতেন। প্রভুজাতি-সুলভ মুরুব্বিয়ানার ভাব বর্জন করিতে তিনি সর্বদা চেষ্টা করিতেন। যাহা করিতেন, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর আদেশে বা পরামর্শে করিতেছেন যথাসম্ভব এইরূপ বলিতে চেষ্টা করিতেন—সৎকার্য্যের প্রশংসা নিজে লইতে চাহিতেন না।

ইহা সুবিদিত যে, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর মধ্যে কোন কোন প্রধান বিষয়েও মতভেদ আছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও উভয়েরই সহিত দীনবন্ধুর ঘনিষ্ঠতা ছিল; রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁহার "গুরুদেব", গান্ধীজী "মোহন"। হৃদয়মনের যে ঔদার্য ও বিশালতা তাঁহাকে এই উভয় পুরুষপ্রবরকে শ্রদ্ধাভক্তি দিতে সমর্থ করিয়াছিল, তাহারই প্রভাবে তিনি সকল ধর্মসম্প্রদায়ের বহু লোকের বন্ধুত্ব লাভ করিতে ও তাঁহাদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন।

আজকাল সচরাচর পরিচিত লোকমাত্রকেই অনেক সময় বন্ধু বলা হয়। দীনবন্ধু তাঁহার অন্তিম বাণীতে ভগবৎকৃপায় যে বহু বন্ধুলাভের সৌভাগ্যের কথা বলিয়াছেন, সে বন্ধুত্ব প্রকৃত বন্ধুত্ব। সে-সৌভাগ্য তাঁহার হইয়াছিল তাঁহার হৃদয়ের অগাধ প্রেমের অফুরন্ত ভাণ্ডারের গুণে। প্রেম দিতে তাঁহার কৃপণতা ছিল না। যাঁহাকে বন্ধু মনে করিতেন, এমন কেহ উপেক্ষা করিলে, ঔদাসীন্য দেখাইলে, এমন কি কঠোর আঘাত করিলেও, তাঁহার প্রেম বিমুখ বা ভিন্নমুখ হইত না, ইহা বেদনামিশ্রিত প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে বলিতে পারি। এ-বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ মহানুভবতা ও সদাশয়তা ছিল।

বয়োজ্যেষ্ঠের প্রতি তাঁহার ভক্তি ও স্নেহ অসামান্য ছিল। মহামতি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তিনি বড় দাদা বলিতেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের জীবিতকালে যখনই এণ্ডরূজ শান্তিনিকেতনে থাকিতেন, প্রত্যহ বড় দাদাকে দেখিতে গিয়া প্রণাম করিয়া পদধূলি লইতেন এবং তাঁহার সঙ্গে

চা খাইতেন। বড় দাদার প্রতি তাঁহার ভক্তি ও স্নেহের কেবলমাত্র দুটি দৃষ্টান্ত দিতেছি— অধিক স্থান ও সময় নাই। এক দিন, কি কারণে জানি না, দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রভুজাতির উপর চটিয়া বসিয়া ছিলেন, এমন সময় এণ্ডরূজ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ইংরেজীতে নিত্যকার প্রশ্ন করিলেন, "বড় দাদা, কেমন আছেন?" বড় দাদা ইংরেজীতে যে উত্তর দিলেন তাহাতে বৃদ্ধ স্বদেশভক্তের এই মতই প্রকাশিত হইল যে, প্রভুজাতির সব লোক ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত না হইলে কোন সুখশান্তি নাই! এই ব্যাপারটির বর্ণনা করিতে গিয়া এণ্ডরূজ দ্বিজেন্দ্রনাথের পৌত্র দিনেন্দ্রনাথকে হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন, "I say Dinoo, your grandfather is terrible"। আর এক দিন এণ্ডরূজের সহিত আমিও দ্বিজেন্দ্রনাথকে প্রণাম করিতে গিয়াছিলাম। সেদিন তিনি, কি কারণে জানি না, খ্রীষ্টিয়ান পাদরীদের উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন। আমরা উভয়ে প্রণাম করিবার পর, পাদরীদের হিন্দুধর্ম ও হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধে অজ্ঞতার বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ উদ্দীপনার সহিত অনেক কথা বলিলেন—ইহা ভুলিয়াই গিয়াছিলেন যে, এন্ডরূজ এক সময় কার্য্যতঃ এবং নামেও পাদরী ছিলেন এবং তখনও বস্তুতঃ পাদরী ছিলেন। পরে বড় দাদা আবার শান্তভাব ধারণ কবিলেন। আমরা যখন ফিরিয়া আসিতেছিলাম, তখন পথে নানা কথাবার্ত্তার মধ্যে এণ্ডরূজ বেশ প্রসন্নভাবেই বলিলেন, "We had a very interesting talk from Bara Dada this evening!"

রবীন্দ্রনাথের প্রতি এণ্ডরূজের ভক্তি ও প্রীতির প্রগাঢ়তা, প্রাবল্য ও অচঞ্চল স্থৈর্য্য অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। কেহ তাঁহা অপেক্ষা গুরুদেবের প্রিয়তর ও নিকটতর হয়, এই সম্ভাবনার চিন্তাও যেন তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। নারীসুলভ একনিষ্ঠ প্রেম এই বর্ষীয়ান চিরকুমারের হৃদয়ে বাসা বাঁধিয়াছিল।

সেন্ট স্টীফেন্স কলেজের প্রিন্সিপ্যাল স্বর্গত সুশীলকুমার রুদ্র দীনবন্ধুর অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। উভয়ে যেন আধ্যাত্মিক অভিন্নহৃদয় ছিলেন। রুদ্র মহাশয়ের একটি নাতনীর যখন জন্ম হয়, তখন এণ্ডরূজ আমাকে স্পর্দ্ধার সহিত লিখিয়াছিলেন, "এখন আমিও ঠাকুরদাদা হয়েছি!"—কারণ তিনি বোধ হয় মনে করিতেন, আমার অনেকগুলি নাতনী আছে বলিয়া আমি অহঙ্কৃত! সে বিষয়ে আমার কথঞ্চিৎ সমকক্ষতা এই স্পর্দ্ধিত উক্তির কারণ!

তিনি শান্তিনিকেতনে আগে অধ্যাপনা করিতেন। তিনি বিদ্বান, সুশিক্ষক এবং গদ্যে ও পদ্যে বহু পুস্তক ও সাময়িকপত্রের প্রবন্ধের সুলেখক ছিলেন। বালকেরা তাঁহাকে অতিশয় ভালবাসিত। বলা বাহুল্য, তিনিও তাঁহাদিগকে সাতিশয় স্নেহ করিতেন, এবং সকল বিষয়ে স্বাধীন ও নির্ভীক চিন্তা করিতে ও লোকহিতকর কাজ করিতে উৎসাহ দিতেন। তাহার দৃষ্টান্ত দিবার সামর্থ্য থাকিলেও দিতে পারিলাম না।

ভারতবর্ষের লোকদের সহিত অভিন্নতা স্থাপন করিবার চেষ্টা করা তাঁহার পক্ষে সহজ ছিল। সরকারী ইংরেজ রাজপুরুষদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করিবার সময় তিনি নিজের জাতীয় পোষাক পরিতেন। অন্য সব সময়ে তিনি দেশী পরিচ্ছদ—ধুতি পিরান চাদর—ব্যবহার করিতেন। তাহাতে কোন পারিপাট্য ছিল না, গলার বোতাম খোলাই থাকিত। শান্তিনিকেতনের কঙ্করাকীর্ণ পথে মাঠে অনেক সময় খালি পায়েই চলিতেন, কখন কখন চটি জুতা পায়ে থাকিত।

এই লেখাটার গোড়ায় তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণের কথা বলিয়াছি। তাঁহার হৃদয়মন

ভারতীয়মুখী না হইলেও হয়ত তিনি বিষয়াসক্তিহীন মানুষই থাকিতেন। কিন্তু ভারতবর্ষকে—বিশেষতঃ বাংলা দেশকে—স্বদেশ বলিয়া বরণ করিবার পর তিনি ভারতীয় অর্থেই সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। কোন আয় বা সম্পত্তির উপর তাঁহার আসক্তি ছিল না। রবীন্দ্রনাথ একবার এণ্ডরূজের সমক্ষে পরিহাস করিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন, "আপনার যদি কোন জিনিষ হারাবার দরকার থাকে, তা হ'লে সেটা এণ্ডরূজকে দেবেন।" এণ্ডরূজ তাহা শুনিয়া প্রতিবাদচ্ছলে হাসিয়া বলিলেন, "No, no, Gurudev, you are very Mischievous." কিন্তু বাস্তবিকই কোন জিনিষ আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল।

তিনি উত্তর-ভারতে, বিশেষতঃ বাংলা দেশেই জীবনের বহু বৎসর কাটাইয়াছিলেন। শেষের দিকে দক্ষিণভারতেও কিছু কাল কাটাইয়া তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্থাপন করিতেছিলেন।

তিনি ভারতীয় বহু সমস্যা মানবিকতার দিক্ হইতেই আলোচনা করিয়া সেই দিক্ হইতেই তাহার সমাধান-চেষ্টা করিতেন, সাক্ষাৎভাবে রাজনৈতিক বিষয়ের সহিত সম্পর্ক রাখিতেন না—যদিও রাষ্ট্রনৈতিক জ্ঞান ও বিচক্ষণতা তাঁহার খুবই ছিল। কিন্তু তিনি যে ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতাই চাহিতেন, তাহার প্রমাণস্বরূপ গত ফেব্রুয়ারী মাসের মডার্ণ রিভিয়ুতে লিখিত তাঁহার একটি প্রবন্ধ হইতে (পৃষ্ঠা ১৫৬) নিম্নমুদ্রিত বাক্যগুলি উদ্ধৃত করিতেছি :—

Every year that now passes in India, without removal of the foreign yoke, is undoubtedly an evil. It is likely to undo any benefit that may have been derived before. This was my main thesis in a series of articles which I wrote in 1921, called "The Immediate Need of Independance," where I emphasised the word "immediate," and I hold fast to every word which I then wrote.

Nearly twenty years have passed since that date and hope deferred has made the heart sick. Things in India *have* deteriorated, as Prof. Seeley prophesied, and the evil is rapidly increasing. This agony of subjection is eating like iron into the soul, and the strain must be relieved at once.

এরূপ মানুষকে অধিকাংশ সাধারণ ইংরেজ—বিশেষতঃ ভারতপ্রবাসী ইংরেজরা—ভালবাসিতে পারে না। লর্ডবিশপ মহোদয় যে প্রত্যহ তাঁহাকে রোগশয্যায় দেখিতে যাইতেন এবং গির্জায় তাঁহার শ্রাদ্ধিক উপাসনা করিয়া সমাধিস্থান পর্য্যন্ত পদব্রজে গিয়া সেখানে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেন ইহা তাঁহার (লর্ড বিশপের) বন্ধুপ্রেম, ধার্মিকতা ও মহানুভবতার প্রমাণ। গির্জাতে ও সমাধিস্থানে অ-পুরোহিত ইংরেজ অতি অল্প জনই উপস্থিত ছিলেন; অধিকাংশই ভারতীয়।

স্বাধীন দেশের লোকদের ইহা একটি সৌভাগ্য ও উচ্চ অধিকার যে, তাঁহাদের হৃদয় অন্য দেশের লোকদের দুঃখেও সক্রিয় সহানুভূতিতে পূর্ণ হইতে পারে। দীনবন্ধু এই সৌভাগ্য ও উচ্চ অধিকারের যথোচিত ব্যবহার করিয়াছিলেন।

পূর্বে বলিয়াছি, সাধারণত ভারতীয় ইংরেজরা তাঁহাকে ভালবাসিতে পারিতেন না। কিন্তু তাঁহার মত স্বদেশপ্রেমিক বিরল। তিনি জানিতেন, স্বাধীন ভারতের সহিত স্বাধীন ব্রিটেনের মৈত্রীর চেয়ে ব্রিটেনের পক্ষে (এবং জগতের

পক্ষেও) অধিকতর কল্যাণকর অবস্থা আর কিছু হইতে পারে না। এই নিমিত্ত উভয় দেশের স্বাধীনতার ভিত্তির উপর নির্মিত মৈত্রীসৌধের স্থপতি তিনি হইতে চাহিয়াছিলেন। সৌধ নির্মিত হয় নাই। কিন্তু যদি কখনও হয়, দীনবন্ধুর বিদেহী আত্মা আনন্দিত হইবেন।

যে-সকল ইংরেজ তাঁহাকে ভালবাসিতেন না, তাঁহারা জানেন না বুঝেন না, দীনবন্ধু এণ্ড্রূজের মত প্রতিনিধি পাওয়া একটা জাতির কত বড় সৌভাগ্য। তিনি জাতিতে জাতিতে মৈত্রীর, বিশ্বমৈত্রীর অন্যতম অগ্রদূত ছিলেন। তিনি ভারতীয়দের ও ভারতের সম্পর্কে সব কাজ এইরূপ ভাবে করিতেন যেন নিজ জাতির সব দুষ্কৃতির প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন। কিন্তু আমরা তাহা প্রায়শ্চিত্ত মনে করিব না, তিনি আমাদিগকে মৈত্রী ও হিতকারিতার অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, ইহাই মনে করিব।

তাঁহার স্নেহভাজন পরলোকগত শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রদের সহিত মিলিত হইয়া তিনি এখন নবজীবনের ও নববর্ষের উৎসব করুন।

জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

আকস্মিক মোটর দুর্ঘটনায় অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু শোকাবহ। তিনি বঙ্গীয় কৌন্সিলে সদস্যপদের প্রার্থী রূপে আসানসোলে কাজ সারিয়া মোটরে বর্ধমান আসিতেছিলেন। পথে পানাগড়ের নিকট এই দুর্ঘটনা ঘটে।

ইংরেজী সাহিত্যে তাঁহার বিস্তৃত জ্ঞান ছিল। তিনি কৃতী অধ্যাপক ছিলেন। কলেজপাঠ্য অনেক ইংরেজী বহির তাঁহার লেখা টীকা ছাত্র ও অধ্যাপকদের মধ্যে আদর লাভ করিয়াছিল। তিনি বিখ্যাত বাগ্মী ছিলেন। শব্দের ভাণ্ডার ছিল তাঁহার অফুরন্ত। বক্তৃতা করিতে উঠিয়া কথা যোগাইতেছে না এরূপ অবস্থা তাঁহার কখনও হইত না। রাজনীতিক্ষেত্রেও তিনি নামজাদা লোক ছিলেন।

১৩৪৭ জ্যৈষ্ঠ

সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বর্গত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পুত্র ও রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র মনীষী সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুতে ভারতবর্ষ—বিশেষতঃ বাংলা দেশ—বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। বিশেষ দুঃখের কারণ এই যে, তাঁহার প্রতিভা ও বিদ্যাবত্তা কিরূপ ছিল, তিনি কিরূপ মনস্বী ও হৃদয়বান ছিলেন, তাঁহার

স্বদেশপ্রেম ও দেশহিতৈষণা কিরূপ ব্যাপক, প্রবল ও সর্বদিগ্দর্শী ছিল, তাহার কোন বাহ্য চিহ্ন অবস্থাবৈগুণ্য ও আত্মপ্রকাশবিমুখতাবশতঃ তিনি রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। বাংলায় তিনি, "একটি সদ্যঃপ্রস্ফুটিত সাকুরা পুষ্প" নাম দিয়া, একটি জাপানী গল্পের অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং মহাভারতের প্রধান গল্পটি সাধুভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের একাধিক গ্রন্থ এবং অনেক প্রবন্ধ ও ছোট গল্প তিনি অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাহার অধিকাংশ মডার্ণ রিভিয়ুতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ ইংরেজী মাসিকে "গোরা"র পিয়ার্সন সাহেব-কৃত যে অনুবাদ প্রকাশিত হয়, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহা সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি বিশুদ্ধ মনোজ্ঞ ইংরেজীতে খুব দ্রুত অনুবাদ করিতে পারিতেন। রবীন্দ্রনাথের লিখনভঙ্গী এবং চিন্তাধারা ও ভাবধারার সহিত তাঁহার এরূপ ঘনিষ্ঠ যোগ ও পরিচয় ছিল যে, তিনি অনুবাদে কোন স্থানে অক্ষরে অক্ষরে মূলের অনুসরণ না করিলেও তাঁহার অনুবাদ রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা ও অনুমোদন লাভ করিত। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের গান ও সুর যেমন বহুজনের অধিগম্য করিয়া দিয়া গিয়াছেন, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরও তেমনই রবীন্দ্রনাথের বহু রচনা বাংলার ও বাঙালী জাতির বাহিরের লোকদের অধিগম্য করিয়া দিয়াছেন। তিনি তাহা না করিলে কবির বহু রচনা বাংলা-না-জানা লোকদের অজ্ঞাত থাকিয়া যাইত।

অনেক গুরুতর বিষয়ে কবি তাঁহার পরামর্শ লইতেন।

তিনি যে কেবল সাহিত্যরসিক ও সাহিত্যক্ষেত্রেই অবাধ বিচরণক্ষম ছিলেন, তাহা নহে, জীবনবীমার কার্য্যেও তিনি সুদক্ষ ছিলেন। হিন্দুস্থান কোঅপারেটিভ ইন্সিওর্যান্স সোসাইটি প্রধানতঃ যাঁহাদের চেষ্টায় গড়িয়া উঠিয়াছে, তিনি তাঁহাদের অন্যতম।

কালীমোহন ঘোষ

জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীর কাজ শেষ করিবার সময় বিশ্বভারতীর শ্রীনিকেতনের শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া অল্প কথায় কি যে লিখিব স্থির করিতে পারিতেছি না। বিশ্বভারতীর গ্রাম-পুনরুজ্জীবন ও পুনর্গঠন বিভাগের কথা মনে হইলে তাঁহার কথাই সর্ব্বাগ্রে মনে পড়িত। জাতির বাঁচিয়া থাকিবার শ্রী ও শক্তি লাভ করিবার পক্ষে একান্ত আবশ্যক এই গ্রামসেবা যেন তাঁহাতে মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়াছিল।

১৩৪৭ অগ্রহায়ণ
কিশোরীমোহন সাঁতরা

শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন সাঁতরার অকালমৃত্যুতে বিশ্বভারতীর প্রভূত ক্ষতি হইল। তিনি দীর্ঘকাল উহার সহকারী কর্মসচিব ছিলেন এবং বিশেষ করিয়া গ্রন্থপ্রকাশ বিভাগে বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে কাজ করিতেন। দেশের অন্যান্য হিতকর বহু কার্য্যের সহিতও তাঁহার যোগ ছিল। তাঁহার সৌজন্যের জন্য তিনি বন্ধু ও পরিচিতবর্গের অনুরাগভাজন ছিলেন।

১৩৪৮ শ্রাবণ
গুরুসদয় দত্ত

গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের মৃত্যুতে শুধু বাংলা দেশের নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের যে ক্ষতি হয়েছে তার পূরণের আপাততঃ কোন সম্ভাবনা নাই।

তিনি প্রধানতঃ ব্রতচারী প্রচেষ্টার ও সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির প্রবর্ত্তক ও প্রতিষ্ঠাতা বলে বিদিত। কিন্তু এই দুটি প্রতিষ্ঠিত হবার আগে থেকেই, ম্যাজিস্ট্রেটের কর্ত্তব্য বলে না করলেও চলত এমন জনহিতকর কাজ তিনি করতেন। তাঁর পত্নী সরোজনলিনীও তাতে যোগ দিতেন। তিনি যখন বাঁকুড়ার ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, তখন এরূপ কাজ তাঁরা যা করেছিলেন তার থেকে এর পরিচয় পেয়েছিলাম।

তিনি সিবিল সার্বিসে নিযুক্ত হবার পরবর্ত্তী শেষ (Final) পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। সিবিলিয়ানদের বিদ্যাবুদ্ধি সাধারণতঃ যেরূপ থাকে, তার চেয়ে তাঁর যে ঐ দুটি কম ছিল না, এর থেকেই তা বুঝা যায়। তিনি দক্ষ ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ কর্ম্মচারীও ছিলেন। যোগ্যতার জোরে এরূপ অফিসারের প্রাদেশিক গবর্ণর নিযুক্ত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু একাধিক বার তাঁকে ডিঙিয়ে অন্য, ইংরেজ অফিসারকে গবর্ণর করা হয়েছিল। কারণ তিনি ছিলেন ভারতীয় ও বাঙালী। তা ছাড়া তাঁর অন্য 'অপরাধ'ও ছিল যার জন্যে তাঁকে কখনো ডিবিজন্যাল কমিশনার বা চীফ সেক্রেটারী করা হয় নাই। একটা হচ্ছে তাঁর নির্ভীক স্বাধীনচিত্ততা। অন্যায় দেখলে তিনি ইংরেজ অফিসারদেরকেও তিরস্কার করতে পশ্চাৎপদ হতেন না— যেমন বামনগাছি গুলি চালানোর ব্যাপারে তিনি ইংরেজ মিলিটারি ও পুলিশ অফিসারদের [দায়ী] করেছিলেন। আর একটা 'অপরাধ'ও তাঁর ছিল। স্বদেশবাসীদের সঙ্গে তাঁর 'সহানুভূতি'টা মৌখিক ও পোষাকী ছিল না; —যেমনটি ছিল, তার নাম একাত্মবোধ। তা তাঁর নানা কাজে ও ব্যবহারে প্রকাশ পেত। তিনি যখন চাকরীতে ছিলেন, তখনও অনেক সময় দেখেছি, আফিসের বাইরে আফিসের সময় ছাড়া অন্যত্র অন্য সময়ে তাঁর ব্রতচারী মালকোঁচা ও বাঙালি বেশ। ব্রতচারীর নিয়ম অনুসারে কোঁচা দোলান

নিষিদ্ধ। তিনি 'আপনি আচরি' ব্রতচারী ধর্ম শেখাবার জন্যে নিজের প্রণীত সব নিয়ম মেনে চলতেন।

রবীন্দ্রনাথ যখন গ্রামোন্নয়ন প্রবর্তন করেন, সে ত অনেক আগেকার কথা। তাঁর প্রবর্তিত নানা রকম গ্রাম-পুনরুজ্জীবন ও গ্রাম-পুর্নগঠনের কাজ তখন থেকে চলে আসছে। শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠানটিই তার জন্যে। এখন গ্রাম পুনর্গঠনের কথা বলা ও তার সঙ্গে 'সহানুভূতি' দেখান অনেক হোমরাচোমরার মধ্যেও ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু স্বয়ং বিলাতফেরত ম্যাজিস্ট্রেট কুড়াল কোদাল হাতে জঙ্গল আগাছা কাটতে আর পঙ্কোদ্বার করতে নরদামা সাফ করতে লেগে গেছেন, শভেল হাতে শহরের আবর্জনাস্থালী উজাড় করছেন, এ দৃশ্যটা গুরুসদয় দত্তর আগে কেও দেখান নি।

ব্রতচারী শুধু নৃত্য নয়। এর যেটুকু নৃত্য আছে, তারও মধ্যে ব্যায়াম, দলবদ্ধতা-শিক্ষা, সংগীতের তাল ও সংযম আছে, কিন্তু বিলাসবিভ্রম হাবভাব নাই। দেশী হাডুডুডু, বিদেশী ক্রিকেট ফুটবল ইত্যাদিতে যে রেষারেষির ভাব আছে, এতে তা নাই। মেয়েদের পক্ষে এর আরো এই উপযোগিতা আছে যে, এতে তাদের ব্যায়াম ত হয়ই, অধিকন্তু ছোট বড় সকলের সঙ্গে মুক্ত বাতাসে আকাশের নীচে সাহচর্যের সুযোগ হয়। ব্রতচারী প্রতিজ্ঞাগুলি পালিত হলে মানুষের সর্বাঙ্গীন উন্নতি হতে পারে।

ব্রতচারীর মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা নাই। এর মধ্যে নানা ধর্মসম্প্রদায়ের লোক আছে। প্রাদেশিকতাও এর মধ্যে নাই। বাংলার বাইরে, বিশেষ ক'রে মান্দ্রাজ প্রদেশে, ব্রতচারী কোন কোন জায়গায় সাদরে গৃহীত হয়েছে। লণ্ডনে পর্য্যন্ত গুরুসদয় ব্রতচারী সমিতি স্থাপন করেছিলেন।

গুরুসদয় খুব উৎসাহের সহিত সকলের সঙ্গে ব্রতচারী নৃত্য করতেন, ব্রতচারী গান গাইতেন—কোন সংকোচ বোধ করতেন না। কতকগুলি নৃত্য আমাদের বাংলাদেশেরই চিরাগত নৃত্য। গ্রাম্য বলেই তিনি কোন জিনিসকে অবজ্ঞা করতেন না; শ্রদ্ধেয় যা তাকে শ্রদ্ধা করতেন। সে কালের অনেক গ্রাম্য নাচগানের পুনরুদ্ধার ক'রে তিনি সেগুলিকে নূতন জীবন দিয়ে গেছেন। বীরত্বব্যঞ্জক রায়বেশে নৃত্য তার মধ্যে একটি। আমাদের দেশের অনেক পট তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। সেই পটগুলি, তাদের বিষয় সম্বন্ধে গানের সঙ্গে, পটুয়ারা গ্রামে গ্রামে দেখিয়ে বেড়াত। এই রকম গানও তিনি পটুয়াদের আঁকা ছবির প্রতিলিপি সমেত প্রকাশিত করে গেছেন। সেকালের কাঠখোদাইয়েরও অনেক উৎকৃস্ট নমুনা তিনি সংগ্রহ করেছিলেন, কতকগুলির ছবিও ছাপিয়েছিলেন। বঙ্গের প্রাচীন স্থাপত্যও তাঁর প্রিয় ছিল। তার চর্চাও তিনি করেছিলেন। বঙ্গের অনেক প্রাচীন মূর্ত্তিও তাঁর সংগ্রহে আছে। বাংলা দেশের স্বকীয় সকল রকম সংস্কৃতির তিনি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। এর নানা রকম নমুনা তাঁর মিউজিয়মে আছে। এই মিউজিয়মটিকে কেন্দ্র ক'রে তিনি ব্রতচারী জনশিক্ষা পরিষদ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। এই গণ-বিশ্ববিদ্যালয়ের নিমিত্ত জমী নিয়েছিলেন, টাকাও সংগ্রহ করেছিলেন।

তিনি গদ্যে ও পদ্যে ছোট ছোট অনেক বই লিখে গেছেন। তাঁর কবিতায় লালিত্যের চেয়ে অন্তরের আবেগের প্রাধান্য লক্ষিত হয়।

জামশেদপুরে গত ডিসেম্বরে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের গত অধিবেশনে তিনি সভাপতির কাজ দক্ষতা এবং স্বভাবসুলভ

আন্তরিকতা ও উৎসাহের সহিত করেছিলেন। তিনি যা কিছু করতেন, তাতে সমস্ত প্রাণ ঢেলে দিতেন।

চারশতাধিক-শাখা বিশিষ্ট সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতি তাঁর আর একটি কীর্তি। এর দ্বারা তিনি নারীসমাজের বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ সর্বাঙ্গীন হিতসাধনের চেষ্টা করে গেছেন। একনিষ্ঠ পতিপ্রেমের দৃষ্টান্ত অনেক সাধ্বী মহিলা দেখিয়ে চিরপূজ্য হয়ে আছেন। গভীর পত্নীপ্রেমকে সক্রিয় নারীহিতৈষণার ও সমাজসেবার মূর্তি দিয়ে গেছেন গুরুসদয় দত্ত। এরূপ দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত মনে পড়ছে না।

১৩৪৮ মাঘ

সর্ আকবর হাইদরী

সর্ আকবর হাইদরী মহাশয়ের মৃত্যুতে ভারতবর্ষ একজন অতি অভিজ্ঞ, বিজ্ঞ ও প্রবীণ রাজনীতিবিদের সেবা হ'তে বঞ্চিত হ'ল। গত সিকি শতাব্দীতে নিজামের রাজ্যে ভাল যে-সব ব্যবস্থা হয়েছে, তার জন্য প্রশংসা তাঁরই বেশী প্রাপ্য। নিজামের রাজ্যে হিন্দুদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা এখনও সন্তোষজনক নয়; কিন্তু তাদের অবস্থায় যদি কিছু উন্নতি হ'য়ে থাকে, তার জন্য প্রশংসাভাজন প্রধানতঃ সর্ আকবর হাইদরী। তিনি সেখানে না থাকলে সেটুকুও হোত না।

ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি ছিল। ভারতীয় ললিতকলা তাঁর অনুরাগের বস্তু ছিল। নিজামের রাজ্যে অবস্থিত অজন্টাগুহাবলী এবং তার মধ্যস্থিত স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার নিদর্শনগুলি যে সুরক্ষিত হয়েছে, তা তাঁর মত রাজপুরুষদের চেষ্টাতেই হয়েছে। তিনি সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী তিনি অনুবাদের সাহায্যে অধ্যয়ন করতেন। তাঁর চেষ্টায় বিশ্বভারতী নিজামের নিকট থেকে এক লক্ষ [টাকা] সাহায্য পেয়েছিলেন। সম্পূর্ণ ভারতীয় ভাষায় সাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয় চালাবার সাহস তিনি হায়দরাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখিয়েছেন। তাঁর এই প্রশংসা করবার সঙ্গে সঙ্গে দুঃখের সহিত বলতে হচ্ছে বটে যে, ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবহৃত ভাষা—উর্দু ভাষা—নিজামের রাজ্যের অধিবাসীদের সামান্য অংশেরই ভাষা। অধিকাংশের ভাষা উর্দু নয়। কিন্তু ভাষা নির্বাচনে, আমাদের বিবেচনায়, ভুল হয়ে থাকলেও, ভারতবর্ষের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উচ্চতম শিক্ষাও যে ভারতবর্ষেরই একটি ভাষার মাধ্যমে হ'তে পারে এই বিশ্বাসপোষণের এবং সেই বিশ্বাস অনুসারে কাজ করবার দৃঢ় অধ্যবসায়ের প্রশংসা তাঁর প্রাপ্য।

হায়দরাবাদে দীর্ঘ কাল কাজ ক'রে তিনি ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের শাসনপরিষদের সদস্যপদ গ্রহণ ক'রে ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে ভারত-গবর্মেণ্ট একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ সদস্য হারালেন।

বাঙালি নিজবাসে ও পরবাসে

১৩১১ বৈশাখ

প্রবাসী বাঙ্গালীবিদ্বেষ।

ভারতবর্ষের কোন কোন প্রদেশে বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে অনেক বাঙ্গালী স্থায়ী বা অস্থায়ী ভাবে বাস করায় তথাকার অনেক অধিবাসী বাঙ্গালীদের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হইয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রধানতঃ বেহার, আগ্রা—অযোধ্যা, ও পঞ্জাবের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। বাস্তবিক কিন্তু কেবল স্বার্থপরতার দিক্ দিয়া দেখিলে ইঁহাদের বাঙ্গালীবিদ্বেষ ভ্রম হইতে উৎপন্ন। সমগ্র বেহারে ১০৪৩৯৬ জন বাঙ্গালী বাস করে। কিন্তু কেবল কলিকাতাতেই গয়া ও পাটনা জেলা হইতে ২০ হইতে ৪০ হাজার জন করিয়া লোক আসিয়াছে। তদ্ভিন্ন সারণ, শাহাবাদ, মুজঃফরপুর ও মুঙ্গের হইতে যথাক্রমে ১৮৭৪২, ১৭৮৬৫, ১৯৯৪৩ এবং ১০৪৩২ জন লোক আসিয়াছে। মোটের উপর ১২০০০০ লোক দক্ষিণ-বেহার, সারন ও মুজঃফরপুর হইতে আসিয়াছে। সমগ্র বাঙ্গালাদেশে প্রায় ৫ লক্ষ বেহারী কাজ করিতেছে। আগ্রা—অযোধ্যা প্রদেশদ্বয়ে মোট বাঙ্গালীর সংখ্যা ২৪১২০। কিন্তু কেবল কলিকাতাতেই ১০৬৪৩০ জন আগ্রা—অযোধ্যার লোক বাস করে। কলিকাতা, ২৪ পরগণা ও হাবড়াতে ১৭৮৩০০ আগ্রা—অযোধ্যার লোক বাস করে; সমগ্র বঙ্গে ঠিক্ কত, সেন্সন রিপোর্ট হইতে তাহা বাহির করা যায় না। পঞ্জাবে ২৪১৯ জন বাঙ্গালী বাস করে। কিন্তু কেবল কলিকাতাতেই ৬৫৯৯ জন পঞ্জাবী বাস করে।

বাঙ্গালীরা যে যে প্রদেশে গিয়াছে, তথায় অল্পসংখ্যক বাঙ্গালী ওকালতী, ডাক্তারী প্রভৃতি করে, অল্পসংখ্যক উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত; কিন্তু অধিকাংশই অল্প বেতনের কেরাণী। পক্ষান্তরে উত্তর-ভারতের অন্যান্য প্রদেশের যে সকল লোক বাঙ্গলা দেশে আসে, তাহারা অধিকাংশই কুলি, মজুর, দরোয়ান, পেয়াদা ও কনষ্টেবলের কাজ করে; কিন্তু অনেকে ব্যবসায় করে, এবং রাজমিস্ত্রি, ছুতার ও ঠিকাদারের কাজ করে। কেহ কেহ উকীল এবং উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী। ইহা সত্য যে বাঙ্গালী যেখানে যায়, অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত বলিয়া তাহার সেখানে কিছু প্রভাব প্রতিপত্তি জন্মে। কিন্তু অন্য প্রদেশবাসীদের তজ্জন্য ঈর্ষাপরায়ণ হওয়া উচিত নয়। তাঁহারাও শিক্ষিত হইলে প্রভাব প্রতিপত্তিশালী হন। আসল প্রশ্ন এই যে (১) বাঙ্গালী অন্য প্রদেশে যত রোজগার করে, অন্য প্রদেশবাসীরা বাঙ্গালা দেশে আসিয়া তত রোজগার করে কি না; (২) রোজগারের টাকা কে কি পরিমাণে কর্ম্মস্থানে, ও জন্ম বা পিতৃভূমিতে ব্যয় করে।

একজন সাধারণ মজুরের আয় একজন সাধারণ কেরাণীর আয় অপেক্ষা কম। কিন্তু একজন সাধারণ ব্যবসাদারের আয় একজন সাধারণ কেরাণীর আয়ের চেয়ে বেশী। কলিকাতার এক একজন বড়বাজারের ব্যবসাদার শত শত বাঙ্গালী কেরাণী অপেক্ষা অধিক রোজগার করেন। হিন্দুস্থানী শ্রমজীবীদের অনেকে খিদিরপুরের ডক্ (Dock) প্রভৃতি স্থানে কাজ করে। তাহারা সাধারণ বাঙ্গালী কেরাণী অপেক্ষা কম রোজগার করে না। হিন্দুস্থানী শ্রমজীবীদের মধ্যে সহস্র সহস্র লোক গঙ্গার উভয় তীরস্থ কলকারখানায় কাজ করে। তাহাদের আয় সাধারণ মজুরদের চেয়ে বেশী। রাজমিস্ত্রি ও ছুতার প্রভৃতির আয়ও

বেশ। মোটের উপর পশ্চিম প্রবাসী বাঙ্গালীদের গড় আয় কিছু বেশী হইলেও তাঁহাদের সংখ্যা বঙ্গপ্রবাসী বেহারী পঞ্জাবী ও হিন্দুস্থানীদের চেয়ে অনেক কম বলিয়া উভয় পক্ষের মোট আয় সমান সমান ধরিলে কোন দোষ হয় না; যদিও আমাদের ধারণা এই যে, প্রবাসীবাঙ্গালীদেরই মোট আয় কম। এরূপ মনে করিবার আর একটি কারণ আছে। প্রবাসীবাঙ্গালীদের মধ্যে স্ত্রী পুরুষের সংখ্যা নিম্নলিখিত রূপ :—

	পুরুষ।	স্ত্রী।
বেহার	৫২৭৬৪	৫১৬২৮
আগ্রা—অযোধ্যা	১১৪৯০	১২৬৩০
পঞ্জাব	১৫০৫	৯১৪

প্রবাসী বাঙ্গালীরা শ্রমজীবীর কাজ করে না। সুতরাং কেবল তাহাদের পুরুষেরাই কাজ করে। তাহাও অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক ও যুবক বাদে।

ইহা হইতে আরও দেখা যাইতেছে যে, প্রবাসী- বাঙ্গালীরা অধিকাংশ সপরিবারে বাস করে। সপরিবারে বাস করিলে লোকে আয়ের টাকা বহু পরিমাণে বাসস্থানেই খরচ করে। এখন দেখা যাক্, বঙ্গপ্রবাসী হিন্দুস্থানী প্রভৃতিদের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষের অনুপাত কিরূপ। কলিকাতাপ্রবাসী ১০৬৪৩০ আগ্রা--- অযোধ্যাবাসীর মধ্যে শতকরা ১৫.৯ জন মাত্র স্ত্রীলোক। কলিকাতার ৩৭১৩৯৭ হিন্দীভাষীর মধ্যে শতকরা ২৬.৭ জন স্ত্রীলোক। বঙ্গের অন্যত্রও ইহাদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের অনুপাত ন্যূনাধিক এইরূপ। ইহা হইতে এই প্রমাণ হয় যে (১) বঙ্গপ্রবাসী অধিকাংশ লোকই সপরিবারে বাস করে না; (২) অধিকাংশই প্রাপ্তবয়স্ক, সুতরাং উপার্জ্জনক্ষম; (৩) তাহাদের আয়ের অনেকঅংশ জন্মস্থানে প্রেরিত হয়। তদ্ভিন্ন ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, প্রবাসীহিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকগণ অনেকে কুলি মজুরের কাজ করিয়া উপার্জ্জন করে; কিন্তু প্রবাসিনী বাঙ্গালিনীরা এ হিসাবে একেবারেই অকেজো।

বাঙ্গালীবিদ্বেষের আর একটা দিক্ দেখুন। পঞ্জাবে কাশ্মীর হইতে ৩৮২৯৬, রাজপুতানা হইতে ২৬৯৫১৫, এবং আগ্রা—অযোধ্যা হইতে ২৩২৭২৪ জন লোক গিয়াছে। বাঙ্গলা হইতে ২৪১৯ জন মাত্র! এই মুষ্টিমেয় বাঙ্গালীর প্রতি ঈর্ষা কেন? অন্যান্য প্রদেশেরও এইরূপ হিসাব দেওয়া যাইতে পারে। আমাদের বোধ হয়, ইংরাজ গবর্ণমেন্টের ভেদনীতি এই ঈর্ষাবিদ্বেষ উৎপাদনের জন্য বহু পরিমাণে দায়ী। যত দিন ইহা থাকিবে, ততদিন ভারতবাসীদের একজাতিত্ব আকাশ-কুসুমবৎ থাকিবে।

বাঙ্গালীর, বিশেষ করিয়া প্রবাসীবাঙ্গালীর আর একটি চিন্তনীয় বিষয় আছে। বাঙ্গালী ভারতের যেখানে যেখানে গিয়াছে, প্রধানতঃ ইংরাজের আফিস আদালতের সংশ্রবেই গিয়াছে। সুতরাং তাহার ভাগ্য ইংরাজের অনুগ্রহসাপেক্ষ। অপর পক্ষে কুলি মজুর বলিয়া ঘৃণিত প্রবাসীহিন্দুস্থানী কাহারও অনুগ্রহ চায় না। সে বেশী খাটিতে পারে, বেশী শ্রমসহিষ্ণু, অন্য শ্রমজীবী অপেক্ষা অল্প আয়ে সন্তুষ্ট, সুতরাং তাহাকে কে পারিবে? তাহার পর মাড়োয়ারীদের কথা ভাবুন। তাহারাও রাজানুগ্রহ চায় না। বাণিজ্য উপলক্ষে মাড়োয়ারী সর্ব্বত্র যাইতেছে। ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী তাহার গতিরোধ করিতে পারেন না; কিন্তু প্রবাসীবাঙ্গালীর গলা টিপিয়া ধরিতে পারেন। এখন ঘটিয়াছেও তাই। বাঙ্গালী এখন স্বপ্রদেশ ভিন্ন আর কোথাও পুরুষানুক্রমে বাস করিয়াও চাকরীর দাবী করিতে পারে না। সমস্ত আগ্রা—অযোধ্যায় মোটে একজন বাঙ্গালী ডেপুটি মাজিস্ট্রেট আছেন; তহশীলদার (সব- ডেপুটী)

একজনও নাই। স্বপ্রদেশেও ইংরাজ ফিরিঙ্গীতে বাঙ্গালীর অন্ন মারিতে বসিয়াছে। ইহা এক প্রকার শাপে বর। কারণ, যতই চাকরী দুর্ল্লভ হইবে, লোকে তত স্বাধীনবৃত্তিতে মন দিতে বাধ্য হইবে।

বেহার, হিন্দুস্থান ও পঞ্জাবে প্রবাসী-বাঙ্গালীদের অধিকাংশ আর প্রবাসী নহে; তাহারা স্থায়ী অধিবাসীর মধ্যে গণনীয়। সুতরাং তাহাদের উপার্জ্জিত টাকা তত্তৎপ্রদেশেই ব্যয়িত ও সঞ্চিত হয়; এবং তাহাদের সমস্ত অভিজ্ঞতা ঐ সকল প্রদেশের কাজে লাগে। "প্রবাসী"তে মুদ্রিত প্রবাসীবাঙ্গালীদের বৃত্তান্ত হইতে ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, বাঙ্গালী যে যে প্রদেশে গিয়াছে, তাহারই হিতসাধন করিয়াছে। এই সকল কারণে প্রবাসীবাঙ্গালীর প্রতি বিদ্বেষ নিতান্ত অসঙ্গত ও অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হয়।

অবশ্য প্রবাসীবাঙ্গালীদেরও দোষ আছে। উভয় পক্ষই নিজ নিজ দোষ পরিহার করিয়া সৌহার্দ্দ্যসূত্রে বদ্ধ হইলে কালে একটি ভারতীয় জাতি গঠিত হইতে পারিবে।

১৩১৪ পৌষ

প্রবাসী বাঙ্গালীর কথা।

[বাঙালি তীর্থযাত্রীদের আশ্রয় প্রসঙ্গ

নিবেদন।

তীর্থোপলক্ষে প্রয়াগে বিস্তর বাঙ্গালি ভদ্রলোক ও বাঙ্গালি সাধু সন্ন্যাসীর আগমন হয়। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এ স্থানে সম্পূর্ণ অপরিচিত। মাড়য়ারি, মহারাষ্ট্রীয়, হিন্দুস্থানি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের অপরিচিত আগন্তুক ভদ্রলোক এবং সাধু-সন্ন্যাসীদিগের সুবিধার জন্য এ স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মশালা, অতিথিশালা, অন্নক্ষেত্র প্রভৃতি আছে কিন্তু বাঙ্গালীদিগের এরূপ কোন স্থান নাই যেখানে দুই দিন বাস করিতে পারা যায় অথবা রেল হইতে নামিয়া অল্প সময়ের জন্য আশ্রয় লওয়া যায়। প্রয়াগে বাঙ্গালী যাত্রীর সংখ্যা অল্প নহে। উঁহাদের মধ্যে অনেকে পাণ্ডাদিগের পাল্লায় পড়িয়া সময় সময় বিস্তর কষ্ট পান। বিশেষতঃ উঁহাদের মধ্যে যাঁহারা পরিবার ও বালকবালিকা সঙ্গে করিয়া আসেন তাঁহাদের আরও বিপদে পড়িতে হয়। এলাহাবাদের বাঙ্গালী অধিবাসীর সংখ্যা অল্প নহে। এইরূপ কাশী, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানেও বিস্তর বাঙ্গালী আছেন। এই সকল প্রবাসী বাঙ্গালী ভদ্রলোকের কর্ত্তব্য যে আমরা আমাদের স্বজাতীয় তীর্থযাত্রী ভদ্রলোক এবং সাধু সন্ন্যাসীদিগের এইরূপ অসুবিধা দূর করিবার জন্য সচেষ্ট হই এবং উঁহাদের বাসের ও দুই এক দিবসের আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিই।

এলাহাবাদে একটি পুরাতন কালীবাড়ি আছে। উহা উপরোক্ত উদ্দেশ্যেই স্থাপিত হইয়াছিল এবং উহা দ্বারা অল্পমাত্রায় উক্ত উদ্দেশ্য সাধিতও হইত। আজি কয়েক বৎসর যাবৎ সাধারণের অযত্নে এবং তত্ত্বাবধানের অভাবে উহার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। যে সকল

গৃহাদি উপস্থিত বর্ত্তমান আছে তাহাও সংস্কারাভাবে পড় পড় হইয়াছে। অভ্যাগত অতিথি প্রভৃতির থাকিবার জন্য আদৌ কোন স্থানই নাই, পরিবার লইয়া থাকিবার উপযুক্ত স্থানেরও বিশেষ অভাব। এই সকল অভাব দূর করিতে হইলে উক্ত কালীবাড়ির জীর্ণসংস্কার আবশ্যক এবং নূতন গৃহাদি নির্ম্মাণ করাও দরকার। উহা বহুব্যয়সাপেক্ষ। প্রত্যেক বঙ্গবাসীর কর্ত্তব্য এ সম্বন্ধে যতদূর সাধ্য সাহায্য করা। অন্ততঃ দুই হাজার টাকা ওঠা চাই। আশা করি সকলেই সাধ্যমত সাহায্য দান করিতে ত্রুটি করিবেন না। সম্প্রতি উক্ত কালীবাড়ির বন্দোবস্তের ভার একটি কমিটির উপর ন্যস্ত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, এডভোকেট, এলাহাবাদ হাইকোর্ট, উক্ত কমিটির সম্পাদক এবং—

শ্রীযুক্ত ডাক্তার অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
" সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এডভোকেট
" সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার
" হরিমোহন রায়, উকিল
" অভয়চরণ বসু
" কালীনাথ কীর্ত্তি
" কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
" হরিদাস মুখোপাধ্যায়
" হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায়
" ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
" জ্ঞানানন্দ চট্টোপাধ্যায়
" পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
" রাখালদাস বসু

প্রভৃতি স্থানীয় বাঙ্গালি ভদ্রলোক কমিটীর সভ্য হইয়াছেন।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য, এম. এ, মহাশয় তত্ত্বাবধায়ক কমিটির পৃষ্ঠপোষক ও পরামর্শদাতা হইতে স্বীকার করিয়াছেন।

নিম্নলিখিত ভদ্রলোকগণ নিম্নে লিখিত অর্থসাহায্য করিতে স্বীকার করিয়াছেন। কেহ কেহ দিয়াছেন।

কলিকাতার বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ... ৫০০৲
শ্রীযুক্ত চৌধুরী মহাদেব প্রসাদ, জমিদার,
আহিয়াপুর ২০০৲
" বিচারপতি প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫০৲
" দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৫০৲
" সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৪০৲
" হরিমোহন রায় ... ১০৲
" ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ... ১০৲
ইত্যাদি।

এক্ষণে অপরাপর বঙ্গবাসী ভদ্রমহোদয়গণ কিছু কিছু সাহায্য করিলে আমরা কার্য্য আরম্ভ করি।

শ্রীহরিমোহন রায়।

কালীবাড়ির অতিথিসৎকার বিভাগ ও পূজা বিভাগ স্বতন্ত্র করা হইয়াছে। ইহাতে এক্ষণে সকল সম্প্রদায়ের বাঙ্গালীই যাঁহার যে বিভাগে ইচ্ছা দান করিতে পারেন।

গত দুই বৎসরের ন্যায়, এ বৎসরও, সরস্বতী পূজার সময় প্রয়াগবাসী বাঙ্গালীদের সম্মিলন হইবে। আগে হইতেই যুবক ও বালকদিগের নানারকম পৌরুষ ও বলবর্দ্ধক খেলা হইতেছে। সন্তরণের পরীক্ষাও হইয়া গিয়াছে। তদ্ভিন্ন অশ্বারোহণ, লক্ষ্যবেধ, লাঠিখেলা প্রভৃতির পরীক্ষাও হইবে। কবিতা আবৃত্তি, মেয়েদের জন্য রন্ধনাদি গৃহকর্ম্ম, সূচিশিল্প প্রভৃতির পরীক্ষারও ব্যবস্থা হইয়াছে। সম্মিলনসভায় সঙ্গীতাদিও হইবে। প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতি বৃদ্ধির, এবং একতা স্থাপন উদ্দেশ্যে, এবং বালক ও যুবকদের মধ্যে পৌরুষ ও দৈহিক

বল প্রভৃতির অনুরাগ বাড়াইবার জন্য, এই সম্মিলনের ব্যবস্থা করা হয়।

কিন্তু একটি একান্ত প্রয়োজনীয় কাজে এখনও প্রবাসী বাঙ্গালীরা হাত দেন নাই। সকলেই জানেন, বাঙ্গালীর প্রতি এখন গবর্ণমেণ্ট,—এবং বে-সরকারী ইংরাজও, বিরূপ। অথচ সরকারী ও রেলের চাকরীই প্রবাসী বাঙ্গালীর প্রধান অবলম্বন। প্রবাসী বাঙ্গালীর চাকরী পাওয়া এখন খুব কঠিন হইয়াছে। পরে তাঁহারা মোটেই চাকরী পাইবেন না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ, ইংরাজের বাঙ্গালীবিদ্বেষ ও হিন্দুস্থানীদিগের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার। দ্বিতীয় কারণটি সুখের বিষয়। চাকরী ছাড়া ওকালতী ও ডাক্তারী আছে। কিন্তু এই দুই ব্যবসায়ে অধিক লোকের প্রতিপালন হইতে পারে না। তদ্ভিন্ন, এখানেও হিন্দুস্থানীগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার হওয়ায় প্রবাসী বাঙ্গালীর কার্য্যক্ষেত্র সংকীর্ণ হইতেছে। অবশ্য বিশেষ গুণ ও শক্তিসম্পন্ন লোক প্রতিষ্ঠা লাভ করিবেনই। কিন্তু সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে হিন্দুস্থানী মক্কেল ও রোগীর পক্ষে হিন্দুস্থানী উকীল ও ডাক্তারের সাহায্য লওয়াই স্বাভাবিক। তদ্ভিন্ন ইংরাজ রাও আজ কাল বাঙ্গালী উকীলদের কাজ করা শক্ত করিয়া তুলিতেছেন।

এই সব কারণে প্রবাসী বাঙ্গালীদের স্বাধীনবৃত্তি শিক্ষার, শিল্পবাণিজ্যাদি ব্যবসায় অবলম্বনের প্রয়োজন হইয়াছে। তাহার শিক্ষার বন্দোবস্ত আমাদিগকেই করিতে হইবে। কলিকাতাস্থ মাননীয় যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রতিষ্ঠিত শিল্পবিজ্ঞান সমিতির সহিত যোগ দিয়া বৎসরে দুই একজন ছাত্রকেও বিদেশে পাঠাইতে পারিলে কিছু ফল হয়। কিন্তু প্রকৃত সফলতা লাভ করিতে হইলে স্বদেশেই শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। প্রবাসী বাঙ্গালীদের নেতাগণ এ বিষয়ে মন দিলে নিশ্চয়ই সুফল লাভ হইবে।

কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন, এম্ এ, এল্ এল্ বী, মহাশয় এবার অনার্স্-ইন-ল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন; যথাসময়ে ডী এল্ অর্থাৎ আইনাচার্য্য হইয়া হাইকোর্টের এড্‌ভোকেট হইবেন। সুরেন্দ্রবাবু বিদ্বান্ ও বিনয়ী; তিনিও কবি;—দাদার সমান নহেন বলিয়া কোন ক্ষোভের কারণ নাই। সুরেন্দ্র বাবুর উন্নতিতে আমরা সুখী।

১৩১৫ জ্যৈষ্ঠ

[বাঙালি শ্রমিক]

অনেক বৎসর হইতেই বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালী, মুটে মজুরের কাজ, কল কারখানায় কুলির কাজ, প্রভৃতি শ্রমসাধ্য কাজ হইতে বঞ্চিত হইতেছিল, বা নিজেই নিজেকে বঞ্চিত করিতেছিল। হিন্দুস্থানী ও ওড়িয়া তাহার স্থান অধিকার করিতেছিল। তের বৎসর পরে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া দেখিতেছি, শ্রমের ক্ষেত্র হইতে, ছুতার প্রভৃতি কারিগরের কাজ হইতে, মুদিখানা, পানের দোকান, সরবতের দোকান হইতে আরম্ভ করিয়া বড় বড় কারবার

হইতে, বাঙ্গালী পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে তাড়িত হইয়াছে। যাহারা বাঙ্গালীর স্থান অধিকার করিতেছে, তাহাদের বিরুদ্ধে আমাদের কিছুই বলিবার নাই। যোগ্যতমের প্রতিষ্ঠা অনিবার্য্য। আমাদের বিচার্য্য এই যে বাঙ্গালী কেন দিন দিন দুর্ব্বল ও শ্রমকাতর হইয়া পড়িতেছে? সাধারণ বাঙ্গালী, বাঙ্গালী বাবুর মত কি শারীরিক শ্রমকে ঘৃণা করিতে শিখিতেছে? তাহা হইলে ইহার চেয়ে জাতীয় দুর্ভাগ্য, ও অধোগতির কারণ, আর কি হইতে পারে? ভগবান্ হাত পা দিয়াছেন, বাতে পঙ্গু লোকদের মত অক্ষম হইয়া বসিয়া থাকিবার জন্য নহে, কাজ করিবার জন্য। ধুলা মাটিতে, ময়লাতে, মানুষ কলঙ্কিত ও অপবিত্র হয় না,—অসাধুতা ও দুর্নীতিতেই কলঙ্কিত হয়। বাহিরের মলিনতা স্নানপ্রক্ষালনেই দূর হয়, দুর্নীতির দুর্গন্ধ কোনও সুগন্ধি জিনিষে দূর করিতে পারে না। মাটির সঙ্গে, শারীরিক পরিশ্রমের সঙ্গে যে জাতির যত কম সম্পর্ক, সে জাতি ততই বিনাশের নিকটবর্ত্তী।

১৩১৫ মাঘ

প্রবাসী বাঙ্গালীর কথা।

মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য।

গত ১১ই নভেম্বর পঞ্জাবের শ্মশান-চিতায় প্রবাসী বাঙ্গালী মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্যের শবদেহ ভস্মীভূত হইয়াছে। মন্মথনাথ পরলোকগত মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন এবং পিতার জ্ঞানপ্রিয়তা, অমায়িকতা, পরোপকারপ্রবৃত্তি প্রভৃতি বহুগুণের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে মন্মথনাথ জন্মগ্রহণ করেন, সুতরাং মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৪৫ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। এই বয়সে তিনি যেরূপ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন তাহা সকলের পক্ষে সহজসাধ্য নহে। প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের মধ্যে মন্মথনাথের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়।

মন্মথনাথ কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। এই কলেজ হইতে তিনি বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষাতেই তিনি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি সংস্কৃত কলেজের উপাধি পরীক্ষায় "বিদ্যারত্ন" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি অত্যল্পকাল মধ্যে আপনার কার্য্যদক্ষতায় সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। যাঁহারা তাঁহার কার্য্য লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার কার্য্যদক্ষতায় বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছেন। মান্দ্রাজ, রেঙ্গুন, শিলং, কলিকাতা, নাগপুর—নানাস্থানে কার্য্য করিবার পর মন্মথনাথ পঞ্জাবের একাউন্‌টেন্ট জেনারল পদ লাভ করেন ও লাহোরে যাইয়া ৩রা নভেম্বর কার্য্যভার গ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য ইতঃপূর্ব্বে আর কোন ভারতবাসী এই পদ লাভ করেন নাই। পরদিন তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন, এবং আট দিনে পীড়া সাংঘাতিক হইয়া তাঁহার জীবন নষ্ট করে। ইংরাজাধিকৃত ভারতে

মন্মথনাথ প্রথম ভারতবাসী একাউন্‌টেন্ট- জেনারল।

কিন্তু মন্মথনাথের গৌরব বিদায় বা উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর পদে নহে; পরন্তু সবল ও সবল মনুষ্যত্বের বিকাশে। তাঁহার মত সরল ও অমায়িক লোক দুর্ল্লভ। তিনি লোকের উপকার করিতে পারিলে আপনাকে ধন্য মনে করিতেন। তিনি প্রবাসে যখন যেস্থানে যাইতেন তখন সেইস্থানে তাঁহার গৃহ বাঙ্গালীদিগের মিলনমন্দিরে পরিণত হইত। তিনি যৎকালে মাদ্রাজে অবস্থান করিতেছিলেন, তৎকালে উত্তরকালে স্বামী বিবেকানন্দ নামে প্রসিদ্ধ নরেন্দ্রনাথ তাঁহার গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ তখন আমেরিকায় যাইতে ইচ্ছুক, কিন্তু পাথেয়সম্বলশূন্য। মন্মথনাথ উদ্যোগী হইয়া সভা আহ্বান করিয়া তাঁহার আমেরিকাযাত্রার ব্যবস্থা করিয়া দেন। সেই সভায় নরেন্দ্রনাথের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ দুই সহস্র টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল।

রেঙ্গুনে অবস্থানকালে মন্মথনাথ প্রত্যহ ষ্টীমার ঘাটে বেড়াইতে যাইতেন, জাহাজ হইতে কোন বাঙ্গালী নামিলে সাদরে তাঁহাকে আপনার গৃহে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেন। মৌলবী আব্দুল জব্বর ব্যতীত আর কোন প্রবাসী বাঙ্গালীর এরূপ স্বজাতিপ্রীতির কথা আমরা জানি না। কত অভিমানী, গৃহত্যাগী বালক তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া অ্যাডভোকেট হইয়াছে। আর তিনি যে কতজনের চাকরী করিয়া দিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই।

তিনি যখন নাগপুরে ডেপুটী কনট্রোলার তখন নাগপুরে প্লেগের প্রবল প্রকোপ, প্রতিদিন শত শত লোক এই বিষব্যাধির অতর্কিত আক্রমণে প্রাণ হারাইতেছে। ধনবানগণ সহর পরিত্যাগ করিতেছে। সকলেই ভীত। মন্মথনাথ দরিদ্রদিগের দুঃখ দুর্দ্দশায় ব্যথিত হইলেন। তিনি আপনার গৃহপ্রাঙ্গনে তাম্বু খাটাইয়া নিরাশয় প্লেগপীড়িত রোগীর চিকিৎসার ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিলেন; সময় সময় স্বয়ং রোগীর সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। এমন অসাধারণ সহানুভূতি ও দয়া সচরাচর দেখা যায় না। নাগপুরবাসীরা মন্মথনাথের গুণে মুগ্ধ হইয়াছিল। তাহারা তাঁহাকে "ধর্ম্মরাজ" বলিত।

আশ্রিত, অনুগত ও অধস্তন কর্ম্মচারী—সকলকেই মন্মথনাথ আপনার মনে করিতেন। তিনি আফিসের কেরাণীদিগের সহিত বন্ধুভাবে আলাপ করিতেন বলিয়া তাঁহার কোন পদগর্ব্বগর্ব্বিত বন্ধু একবার তাঁহাকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। মন্মথনাথ হাসিয়া বলিয়াছিলেন,—উহারা কি আমার সমকক্ষ নহে? যতক্ষণ আপিসের কাযে থাকি, ততক্ষণ উহারা আমার অধীন সত্য; কিন্তু তাহার পর আমরা সকলেই সমান। মন্মথনাথ যখন নাগপুরে তখন উপরওয়ালা য়ুরোপীয়কে সামান্য দোষে কেরাণীদিগকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিতে দেখিয়া তিনি তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। য়ুরোপীয় কর্ম্মচারী বলেন, অর্থদণ্ড ব্যতীত কেরাণীরা ত্রুটিসংশোধনে সচেষ্ট হইবে না। শুনিয়া মন্মথনাথ বলেন, একবার জরিমানা রদ করিয়া--কেবল সতর্ক করিয়া দিলেই তিনি বুঝিবেন--জরিমানা অনাবশ্যক, কেবল দরিদ্রের পীড়ন। তাঁহার কথায় য়ুরোপীয় কর্ম্মচারী সেবার জরিমানা রদ করিলেন; ফলে দেখিলেন ও বুঝিলেন, জরিমানা অনাবশ্যক। একটি ব্রাহ্মণ যুবক পাচকরূপে বহুদিন মন্মথনাথের সেবা করিয়াছিল। তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক জানিয়া এবং বিবাহ ব্যয় নির্ব্বাহে অসমর্থ জানিয়া মন্মথনাথ স্বয়ং সমস্ত ব্যয় বহন করিয়া তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন, এবং বিবাহের পর সস্ত্রীক তাহাকে এক দিনের জন্য আপনার গৃহে আনিয়া তাহার ব্যবহার জন্য আপনার শয়নকক্ষ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। যে দুর্লভ সহানুভূতির পূত প্রবাহে সকল প্রভেদ ভাসিয়া যায় মন্মথনাথের হৃদয়ে সেই সহানুভূতি নিত্যপ্রবাহিত ছিল। মন্মথনাথ যখন নাগপুর ত্যাগ করেন তখন তাঁহাকে একখানি অভিনন্দন পত্র প্রদানের উদ্যোগ হয়। মন্মথনাথ চেষ্টা করিয়া তাঁহার গুণমুগ্ধদিগকে সে চেষ্টা হইতে নিরস্ত করেন। কিন্তু যখন এই অভিনন্দন পত্র প্রদানের উদ্যোগ হয় তখনই তাঁহার অধীনস্থ একজন কর্ম্মচারী তাঁহার উপরওয়ালাদিগকে সে কথা জানাইয়া লিখেন যে, মন্মথ বাবু নিয়মবিগর্হিত কার্য্য করিতেছেন।

উপরওয়ালা য়ুরোপীয় কর্ম্মচারী মন্মথনাথকে স্নেহ করিতেন, তিনি অভিযোগকারীর ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া তাহার ব্যবহারের কথা মন্মথনাথকে জানান। বলা বাহুল্য মন্মথনাথ তাহাকে কোন রূপ শাস্তিদান করেন নাই। পরন্তু অল্পদিন পরে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়া তাঁহার নিরন্ন পুত্রকে একটি চাকরী জোগাড় করিয়া দেন।

মন্মথনাথ বিদ্যানুরাগী ছিলেন, এবং নিজ ব্যয়ে স্বগ্রামস্থ বিদ্যালয়ের জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

নানা গুণে মন্মথনাথ লোকের শ্রদ্ধা, ভক্তি, স্নেহ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার বন্ধুবর্গ চাঁদা সংগ্রহ করিয়া তাঁহার স্মৃতি রক্ষার্থ কলিকাতায় অ্যালবার্ট ভিক্টর হাঁসপাতালে একটি গৃহ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদিগের এই সাধু চেষ্টা সফল হইলে দুঃখী দরিদ্রের যথেষ্ট উপকার হইবে এবং মন্মথনাথের স্মৃতি রক্ষার উপযুক্ত কার্য্যই হইবে।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

১৩১৬ পৌষ
[রুচি ও পোশাক]

মানুষের রুচি পোষাক সম্বন্ধে কোন যুক্তি অনুসরণ করে কিনা, কিম্বা কি যুক্তির অনুসরণ করে, তাহা সহজে বুঝা যায়া না। এই ধরুন নব্য বাঙ্গালীর পোষাক। আমরা যখন দেশী বাঙ্গালা জুতা বা হিন্দুস্থানী নাগরা ছাড়িয়া ইংরাজী তা বা বুট ধরিলাম, তাহাতে সাহেবিআনা হইল না। সেটা বোধ হয় বিলাতীকে পদদলিত করি বলিয়া। তাহার পর চুড়িদার পায়জামা বা ঢিলে মোগলাই পায়জামা ছাড়িয়া বিলাতী প্যান্টালুন পরাতেও দোষ হইল না। দেশী মেরজাই বা পিরান ছাড়িয়া বিলাতী কামিজ পরাতেও হাসি আসিল না। তাহার উপর চোগা চাপকান বা চায়নাকোটের বদলে গলা পর্য্যন্ত বোতাম আঁটা মিলিটারী কোটেও স্বদেশীত্ব বজায় রহিল। এমন কি গলা ফাঁক করা কোট পরিয়া, কৃত্রিম কলার পবিধান, নেক্‌টাই বন্ধনেও পোষাকের জাতি থাকে — যদি মাথাটা খালি থাকে বা তদুপরি একটা "বাবু ক্যাপ্" বা পাগড়ী থাকে! কিন্তু যাই তুমি মাথায় হ্যাট্‌টি দিলে অম্‌নি তুমি অবাঙ্গালী হইলে, তোমার পোষাকের জাতি গেল। অথচ বাস্তবিক ইংরাজদের পোষাকের যদি কোন অংশ আমাদের গ্রহণীয় ও সুবিধাজনক হয়, তাহা হইলে তাহা সোলা হ্যাট্। কারণ রোদে ছাতা ধরিয়া দু হাতে, এমন কি ভাল করিয়া এক হাতেও, কাজ হয় না। সোলা হ্যাট্ পরিলে তাহা হয়। অবশ্য একবার একটি ছেলে একজন হ্যাটধারী বাবুকে যাহা বলিয়াছিল, সে প্রস্তাবও বিচার্য্য। সে বলিয়াছিল, "আপনি হ্যাট্ না পরিয়া একটা ছাতা খুলিয়া তাহার বাঁট কোমরে ও বুকে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া লইলেই হয়।" আমাদের মনে হয় আমরা যতক্ষণ বিলাতী পোষাকের অংশগুলিকে পদধার্য্য, কটিবক্ষোধার্য্য, বা গলধার্য্য পর্য্যন্ত করি, ততক্ষণ দেশবাসীদের রাগ হয় না, কিন্তু যখনই 'আত্ম অভিমান ডুবায়ে সলিলে' আমরা কোন অংশকে শিরোধার্য্য করি, তখনই আমাদের পোষাকীয় জাতি নষ্ট হয়। কারণ মস্তক শরীরের মাননীয়তম অংশ, তাহার অপমান অসহ্য।

১৩১৯ শ্রাবণ

"বাঙ্গালীর গ্রহণযোগ্য কি দেখিয়াছি"

নানাদেশের সাহিত্যে যেসব ভাল জিনিষ আছে, লোকমুখে অলিখিত যেসকল গল্প প্রচলিত আছে, ইংরাজেরা সে সমুদয় অনুবাদ করিয়া আপনাদের সাহিত্য পরিপুষ্ট করিয়াছে। এইরূপ বাণিজ্যরীতি, শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিবার প্রণালী, প্রভৃতিও তাহারা নানাদেশ হইতে শিখিয়াছে। ইংরাজদের ন্যায় পাশ্চাত্য অপরাপর জাতিরাও এই প্রকারে অন্য জাতির জিনিষ আবশ্যকমত পরিবর্ত্তন করিয়া গ্রহণ করিয়াছে। এইরূপ অনুকরণ ও অনুসরণ প্রাচীন কাল হইতে জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে চলিয়া আসিতেছে।

আমরা এইরূপে অন্য দেশের ও অন্যজাতির এবং ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশবাসীদের অনেক জিনিষ লইয়াছি ও পাইয়াছি, আরও এমন অনেক জিনিষ আছে, যাহা বিচার করিয়া লইবার যোগ্য। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই বাঙ্গালীরা ভ্রমণ করিয়াছে ও করিতেছে। আপাততঃ আমরা যদি ভারতবর্ষের নানাপ্রদেশে আমাদের গ্রহণযোগ্য কি আছে, তাহার আলোচনা করি, তাহা হইলে আমাদের মঙ্গল হইতে পারে। এইজন্য আমরা পর্য্যবেক্ষণপটু প্রবাসীবাঙ্গালীদিগকে এই কার্য্যে আমাদের সাহায্য করিবার জন্য আহ্বান করিতেছি। যিনি যে প্রদেশে বাস করেন বা করিয়াছেন, তিনি তথাকার বিষয় লিখিবেন। সকলেই যে সকল বিষয়ে লিখিবেন, তাহা নয়; যিনি যাহা জানেন ও পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহাই লিখিবেন। বঙ্গনারীর গ্রহণযোগ্য রীতিনীতি আদি সম্বন্ধে প্রবাসিনী বঙ্গমহিলারা লিখিলে উপকৃত হইব।

কি কি বিষয়ে লেখা যাইতে পারে, মোটামুটি তাহার একটি তালিকা দিতেছি। এই তালিকা সম্পূর্ণ নহে। ইহা ছাড়াও আরও অনেক বিষয় আছে।

১। লেখক বা লেখিকা যে প্রদেশের বিষয় লিখিতেছেন, তথাকার সাহিত্যে ও লোককথায় ব্যঙ্গালায় অনুবাদ করিবার মত কি কি জিনিষ আছে, এবং সম্ভবতঃ কাহার দ্বারা এই অনুবাদ, ও সংগ্রহ-কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে? (ক) ঐ প্রদেশের ভাষায় ক্রিয়াপদের গঠন, বিশেষণ, ক্রিয়ার বিশেষণ, ইংরাজীতে which দিয়া বিশেষণবাক্য রচনার যে রীতি আছে তদ্রূপ কোন রীতি থাকিলে তাহা,— এইরূপ বিষয়ে অনুকরণযোগ্য কিছু আছে কি না?

২। খাদ্য।* ৩। রন্ধন।* (ক) একত্র বা একাকী আহার; (খ) খাইবার সময় উপবেশনের আসন, বসিবার রীতি, ইত্যাদি। ৪। (ক) পুরুষের পরিচ্ছদ, (খ) নারীর পরিচ্ছদ। ৫। স্নানের নিয়ম, স্থান ও রীতি। ৬। শৌচের স্থান, নিয়ম আদি। ৭। সামাজিক শিষ্টাচার, অভিবাদন- প্রণালী, ইত্যাদি। ৮। বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিবার সময় বা তৎপূর্ব্বে যাহা করা হয়। (ক) কন্যা-পণ ও বরপণ। (খ) বিবাহের বয়স। (গ) শ্বশুরালয়ে যাইবার বয়স। (ঘ) মাতৃত্বের বয়স। (ঙ) পূর্ব্বরাগ। (চ) বরযাত্রীদের আচরণ এবং

* কেবল ঔদরিকের রসনাতৃপ্তির সুবিধা করিয়া দিবার জন্য কিছু লিখিবার প্রয়োজন নাই। বলকারিতা, স্বাস্থ্যকরতা ও মিতব্যয়িতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া লিখিতে হইবে।

তাহাদের প্রতি ব্যবহার। (ছ) দুই বৈবাহিক পরিবারের পরস্পরের প্রতি ব্যবহার ও মনের ভাব। ৯। পর্দ্দা ১০। অবগুণ্ঠন। ১১। নারীর সম্মান বা অসম্মান। ১২। অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় নারীর যত্ন বা অযত্ন। ১৩। সূতিকাগার ও তথায় নারীর প্রতি ব্যবহার। ১৪। ভিন্ন ভিন্ন জাতির পরস্পরের প্রতি ব্যবহার ও সম্বন্ধ। ১৫। ব্যবসাবাণিজ্যের রীতি। ১৬। চাষের রীতি। (ক) জল তুলিবার ও সেচন করিবার রীতি। (খ) গুড় ও চিনি ব্যবসায়। ১৭। ভিন্ন ভিন্ন রকমের শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিবার রীতি। (ক) বস্ত্রবয়ন, ইত্যাদি। ১৮। মৃতের সৎকারে প্রতিবেশীর সাহায্য করা। ১৯। পঞ্চায়ৎদ্বারা নানাপ্রকার বিবাদভঞ্জন। ২০। সামাজিক শাসন। ২১। পূজাপার্ব্বণ। (ক) সর্ব্বসাধারণের উৎসব, যেমন রামলীলা। ২২। বারব্রত। ২৩। আতিথ্য। ২৪। অন্নসত্রাদি। ২৫। খেলা ও ব্যায়াম। ২৬। সুনীতি ও স্বাস্থ্যরক্ষা হয়, এরূপভাবে গৃহ। বিশেষত অন্তঃপুর নির্ম্মাণপ্রণালী। ২৭। বিশুদ্ধ পানীয় জল পাইবার উপায়। ২৮। প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালী। (ক) লিখিবার সরঞ্জাম। ২৯। ধর্ম্মশিক্ষা।

কোনো বিষয় চিত্রদ্বারা বুঝাইবার প্রয়োজন হইলে আমাদিগকে ফটোগ্রাফ বা অঙ্কিত চিত্র পাঠাইতে হইবে। প্রয়োজন হইলে আসল ফটোগ্রাফ ও ছবির খরচ দিব।

সম্পাদক

১৩২২ জ্যৈষ্ঠ

মাননীয় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

অমায়িক বিনয়নম্র সপ্রেম ব্যবহার এবং দেশের সেবা দ্বারা কেমন করিয়া প্রবাসী বাঙ্গালী অন্য সকলের বিশ্বাসভাজন হইতে পারেন, আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে একটি ঘটনায় সম্প্রতি তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। মাননীয় পণ্ডিত সুন্দরলাল উক্ত প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি ছিলেন। বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় আইনের পাণ্ডুলিপি আলোচিত ও সংশোধিত হইয়া পাস্ হইবে। এইকার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য পণ্ডিত সুন্দরলাল বড় লাটের সভার সভ্য নিযুক্ত হওয়ায়, প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহার পদ খালি হয়। তাঁহার স্থানে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যগণ শ্রীযুক্ত ডাক্তার সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে মনোনীত করিয়াছেন। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ফেলো বাঙ্গালী নহেন। যাঁহারা ভোট দিয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশের ভোটে সতীশবাবু নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

সতীশবাবু কলিকাতা ও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-এ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিপ্রাপ্ত এবং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের এল্ এল্-ডী। তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টের ব্যবহার জীবীদের অন্যতম অগ্রণী। তিনি আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের প্রাদেশিক সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। তাঁহার মত পণ্ডিত, দেশসেবক ও পরোপকারী ব্যক্তির বিশ্ববিদ্যালয়ের

প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হওয়া ঠিকই হইয়াছে।

তিনি আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের হিতচেষ্টা করেন; আবার কেবলমাত্র প্রবাসী বাঙ্গালীদের হিতকর কার্য্যেও যোগ দেন ও সাহায্য করেন।

১৩২৪ ভাদ্র

সার প্রতুল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

লাহোর চীফ্‌কোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ সার্ প্রতুল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু অকালে না হইলেও, এখনও তাঁহার কার্য্যশক্তি ছিল বলিয়া, দেশ তাঁহার মৃত্যুতে নিঃসন্দেহ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তিনি প্রথমে লাহোর চীফ্‌কোর্টে ওকালতী করিতেন, পরে জজের পদে উন্নীত হন। তিনি বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ লোক ছিলেন; উভয় কার্য্যেই যশস্বী হইয়াছিলেন। তিনি পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার মনোনীত হইয়াছিলেন। পরে কিছু কাল একটি দেশী রাজ্যে মন্ত্রীর কাজ করিয়াছিলেন। পঞ্জাবের নানা প্রকার সার্ব্বজনিক কাজে তাঁহাব এরূপ উৎসাহ ও যোগ ছিল যে তিনি বাঙালী হইলেও পঞ্জাবের লোকেরা তাঁহাকে আপনাদের লোক ও অন্যতম নেতা মনে করিত। এক প্রদেশের লোক বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে অন্য প্রদেশে গিয়া দীর্ঘকাল বা স্থায়ীভাবে বাস করিলে তাঁহাদের সহিত এইপ্রকার সম্বন্ধই স্বাভাবিক ও বাঞ্ছনীয়। যে-সকল প্রদেশ শিক্ষায় পূর্ব্বে অগ্রসর ছিল না বলিয়া প্রবাসী বাঙালীরা তথায় রাজকার্য্যে বা অন্যবিধ কার্য্যে প্রাধান্য ও সামাজিক নেতৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন, অতঃপর সেখানে বাঙালীদের আর তেমন প্রতিপত্তি না হইতে পারে। তাহা দুঃখের বিষয় নহে। কিন্তু নানা কারণে সকল সময়েই এক প্রদেশের মানুষ অন্য প্রদেশে গিয়া কাজ করিবেই। তাঁহারা বিখ্যাত হউন বা না হউন, প্রতুল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মত যে-সব প্রবাসী বাঙালী খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের দৃষ্টান্ত তাঁহাদের পক্ষে অনুকরণীয়।

১৩২৪ পৌষ

একজন প্রবাসী-বাঙ্গালী
নির্ম্মলচন্দ্র মল্লিক

দিল্লী-প্রবাসী নির্ম্মলচন্দ্র মল্লিক মহাশয় গত ২৩ কার্ত্তিক শুক্রবার দেহত্যাগ করিয়াছেন। ধন মান বা পাণ্ডিত্যের গৌরব তাঁহার ছিল না। কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিত্বে এমন এক গুণ ছিল, যাহা দ্বারা তিনি ধনী, মানী এবং পণ্ডিতগণকে সম্মিলিত করিয়া সভা সমিতির অনুষ্ঠানে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ১৮ বৎসর

পূর্ব্বে তিনি যখন এখানে আসেন, তখন দিল্লীতে এখনকার মত এত অধিক বাঙ্গালী ছিলেন না; সুতরাং তৎকালে বাঙ্গালী-প্রতিষ্ঠানও এখনকার মত কিছুই ছিল না। তৎপরে, ক্রমশঃ বাঙ্গালীগণের সংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীতে বাঙ্গালীর যে-সকল জাতীয় প্রতিষ্ঠান হইয়াছে, তাহাদের সংগঠনে যে-সকল ব্যক্তির উদ্যম ও চেষ্টা উল্লেখযোগ্য, নির্ম্মলচন্দ্র তাঁহাদেরই একজন। প্রবাসে বাঙ্গালীর স্বতন্ত্রতা রক্ষণ বিষয়ে গৌরবের যদি কিছু থাকে, তবে তাহার মাতৃভাষা অন্যতম। এই কথা তিনি বেশ ভালরূপেই উপলব্ধি করিতেন। এই দূর প্রবাসে মাতৃভাষার অনুশীলন যাহাতে অটুট থাকে, সে উদ্দেশ্যে শত বাধা বিপত্তি, শত দুঃখ-দারিদ্রের মধ্যেও তিনি স্থানীয় "বঙ্গ সাহিত্য-সভা"কে সঞ্জীবিত রাখিয়াছিলেন। এই "বঙ্গ সাহিত্য-সভা" তিনি ১৯০৩ সালে অর্থাৎ ১৫ বৎসর পূর্ব্বে কতিপয় বন্ধুর সহযোগে প্রতিষ্ঠিত করেন। "সভা" এক্ষণে যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, নির্ম্মলচন্দ্র নিজের দেহপাত করিয়া ইহার প্রাণরক্ষা না করিলে, ইহা সে অবস্থায় উপনীত হইত কি না সন্দেহ। এইরূপ, প্রত্যেক অনুষ্ঠানে তাঁহার আন্তরিক চেষ্টা ও যত্ন দেখা যাইত। তাঁহার মৃত্যুতে স্থানীয় বাঙ্গালীগণ একজন অকপট কর্ম্মী ও বন্ধু হারাইলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৪৮ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। তিনি দীর্ঘকাল অম্লরোগে ভুগিতেছিলেন।

দিল্লী। শ্রীযামিনীকান্ত সোম।

১৩৩৬ জ্যৈষ্ঠ

বাঙ্গালী মাত্রেই ভীরু কিনা

এমন কোন জাতি নাই যাহার প্রত্যেক মানুষই সাহসী বীর পুরুষ। কোন জাতিকে ভীরু বলাও মূর্খতা। এখনও কিন্তু এমন বাঙালী আছে যাহারা নিজের জাতিভাইকে ভীরু বলিতে লজ্জাবোধ করে না। তাহার একটা দৃষ্টান্ত সেদিন পাওয়া গিয়াছে। বাগ্‌নাপাড়া দাঙ্গার মোকদ্দমা কালনার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ইউ এন্ বসুর নিকট হইতে কোন ইউরোপীয় ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বিচারার্থ প্রেরণের জন্য বর্দ্ধমানের ম্যাজিস্ট্রেট ডাগলাস্ সাহেবের নিকট দরখাস্ত পড়ে। দরখাস্ত নামঞ্জুর করিবার সময় ডাগলাস্ সাহেব যে রায় দেন, তাহার মধ্যে আছে, "দরখাস্তকারীর [বাঙালী] কৌঁসিলি বলেন তাঁহার স্বদেশবাসীরা স্বভাবতই কাপুরুষ। আমি তাঁহাকে ইহা জানান দরকার মনে করি নাই, যে, আমি গত মহাযুদ্ধে বাঙালী পল্টনের একদলের নেতা ছিলাম, এবং সেইজন্য তাঁর চেয়ে আমার ইহা বলিবার বেশী অধিকার আছে, যে, বাঙ্গালীদের মধ্যে সাহসী লোকের অভাব নাই। তাঁহার যুক্তিটা আমার কাছে হাস্যকর মনে হইতেছে।"

মেকলে ও অন্য অনেক ইংরেজ নিন্দুকের কথায় বাঙ্গালীরা মন্ত্রমুগ্ধবৎ মানিয়া লইয়াছিল, যে, তাহারা ভীরু। সেই কুসংস্কার এখনও অনেকের আছে। দেশভ্রমণ করিলে, বাঙ্গালীরা যত সাহসের পরিচয় দিয়াছে তাহা স্মরণ করিলে এবং মেকলের প্রতিবাদ যে-সব ইংরেজ করিয়াছেন তাঁহাদের কথা জানিলে ঐ কুসংস্কারাবিষ্ট লোকদের ধারণা বদলাইবে। যেমন ধরুন ভূতপূর্ব্ব সিভিলিয়ান

স্ক্রাইন্ সাহেব তাঁহার "ভারতের আশা" (*India's Hope*) নামক পুস্তকের ৪৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :

"Considerations of space forbid me to discuss all the allegations made [by Macaulay] in the *Essay on Warren Hastings,* but I must refer briefly to the charge of cowardice. No quality is so widely diffused as physical courage, and healthy Bengalis possess it in a marked degree. They wage pitched battles for a morsel of land, and their cricketers stand up to fast bowling without leg-pads. If they are not a martial race the reason must be sought for in their environment."

১৩৩৭ অগ্রহায়ণ

বামনদাস বসু

পূজার ছুটির জন্য কার্ত্তিকের প্রবাসী কার্ত্তিক মাস আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল। এইজন্য আমরা যথাসময়ে প্রয়াগনিবাসী শ্রীযুক্ত বামনদাস বসু মহাশয়ের মৃত্যু-সংবাদ প্রবাসীতে মুদ্রিত করিতে পারি নাই। তাঁহার মত বিদ্বান্, চরিত্রবান্, কৃতী ও দেশভক্ত ব্যক্তির মৃত্যুতে প্রবাসী বাঙালী সমাজের মুকুটমণি খসিয়া পড়িয়াছে, ভারত-আকাশের অন্যতম জ্যোতিষ্ক অস্তমিত হইয়াছে।

মেজর বসু মহোদয়ের সম্বন্ধে পৌষের প্রবাসীতে একটি সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে। এইজন্য এখন আর কিছু লিখিলাম না।

১৩৩৭ পৌষ

বামনদাস বসু

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্জাবে ইংরেজ-রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার কিছু পরে শ্যামাচরণ বসু নামক একটি বাঙালী যুবক লাহোরে উপস্থিত হন। সেকালে রেলগাড়ী না থাকায় তাঁহাকে অন্য যানে পঞ্জাব যাইতে হয়। কলিকাতা হইতে লাহোর যাইতে তাঁহার কয়েক মাস লাগিয়াছিল। বর্ত্তমানে খুলনা জেলার অন্তঃপাতী টেংরা-ভবানীপুর নামক একটি গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি সেখানে কিছু লেখাপড়া শিখিয়া কলিকাতায় ডাফ্ সাহেবের বিদ্যালয়ে কয়েক বৎসর অধ্যয়ন করেন। লাহোর পৌঁছিয়া তিনি প্রথমে দুই বৎসর একটি মিশনরী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের কাজ করেন। তাহার

পর ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কমিশনারের আফিসে কাজে নিযুক্ত হন। যখন পঞ্জাবে শিক্ষাবিভাগ প্রথম খোলা হয়, তখন তিনি উহার ডিরেক্টরের প্রধান কেরানী নিযুক্ত হন। এই পদে থাকিয়া তিনি পঞ্জাবে শিক্ষাকার্য্যের সুব্যবস্থা করেন। এই সুব্যবস্থার জন্য ডিরেক্টর যে সুখ্যাতি লাভ করেন, তাহার অনেক অংশ বস্তুতঃ যে শ্যামাচরণ বসু মহাশয়েরই প্রাপ্য, তাহা ইংরেজ-সম্পাদিত তখনকার "ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নে" স্বীকৃত হইয়াছিল। ১৮৬৭ সালে ৪০ বৎসর বয়সে অকালে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি সুশিক্ষিত, সচ্চরিত্র কর্ত্তব্যনিষ্ঠ এবং সুযোগ্য লোক ছিলেন। ধর্ম্মে তিনি বৈদান্তিক ছিলেন। স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তৃতি ও উন্নতি সাধনে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। সেকালে পঞ্জাবে জিনিষপত্র সস্তা ছিল। এই জন্য যদিও তাঁহার বেতন দুইশত টাকা হইতে আরম্ভ করিয়া মাত্র তিন শত পর্য্যন্ত হইয়াছিল, তথাপি তিনি মৃত্যুকালে বিষয় সম্পত্তি বেশ রাখিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু বন্ধু নামে পরিচিত কোন কোন লোকের বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁহার মৃত্যুর অল্পকাল পরেই তাঁহার বিধবাপত্নী শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী দেবী প্রায় নিঃস্ব হইয়া পড়েন, এবং নিজের অলঙ্কারগুলিই একটি একটি করিয়া বিক্রয় করিয়া নিজের ও চারিটি সন্তানের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হন। তাঁহাদের নিজের বাড়ী অন্যের হস্তগত হইয়া যাওয়ায় তিনি মাসিক বার আনা ভাড়ার একটি কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময়ে তাঁহাদের কাম্মু নামক একজন বিশ্বস্ত পুরাতন ভৃত্য তাঁহাদের একমাত্র সহায় ছিল। কাম্মু যতদিন বাঁচিয়াছিল, ততদিন বসু পরিবারের সেবা করিয়াছিল এবং তাহার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র নেহালা তাহাদের পরিচর্য্যা করিয়াছিল। এই কাম্মুই বার আনা ভাড়ার বাড়ীটি ঠিক করে এবং তাহারই হাত দিয়া ভুবনেশ্বরী দেবী একটি একটি করিয়া অলঙ্কার বিক্রয় করিতেন।

বামনদাস বসু শ্যামাচরণ বসু মহাশয়ের ও ভুবনেশ্বরী দেবীর কনিষ্ঠ পুত্র। পিতার মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়স ছিল পাঁচ মাস মাত্র। তাঁহাদের চারি ভাই বোনের মধ্যে এক ভগিনী সকলের বড় ছিলেন। একমাত্র তিনিই এখনও জীবিত আছেন। বামনদাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুপণ্ডিত ও মহানুভব শ্রীশচন্দ্র বসু বিদ্যার্ণব তাঁহা অপেক্ষা ছয় বৎসর কয়েক দিনের বড় ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী ছিলেন শ্রীমতী জগৎমোহিনী দাস। বামনদাস সকলের ছোট।

তাঁহাদের মাতা ভুবনেশ্বরী দেবীর সুশীলতা, বুদ্ধি বিবেচনা ও কর্ম্মিষ্ঠতার গুণে শ্রীশচন্দ্র ও বামনদাস শৈশবে পিতৃহীন হইয়াও মানুষ হইতে পারিয়াছিলেন — শিক্ষিত, চরিত্রবান, সুপণ্ডিত ও দেশভক্ত বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহারাও সাতিশয় মাতৃভক্ত ছিলেন। শুনিয়াছি, তাঁহাদের শৈশবে ও বাল্যকালে ভুবনেশ্বরী দেবী মাসিক দশ টাকা ব্যয়ে সংসার চালাইতেন। শ্রীশচন্দ্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক ১৫৲ টাকা বৃত্তি পাইবার পর তাঁহার মাতা বার আনা ভাড়ার কুটীরটি ছাড়িয়া মাসিক দেড় টাকা ভাড়ার অন্য একটি বাড়ীতে উঠিয়া যান। তিনি সাধারণ রকমের বাংলা লেখাপড়া জানিতেন। বাংলা রামায়ণ মহাভারত ও গীতা পড়িতে পারিতেন এবং তাঁহার দীর্ঘ ৮৬ বৎসরব্যাপী জীবনে এই গ্রন্থগুলি পুনঃ পুনঃ পড়িতেন।

বামনদাস ১৮৮২ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া লাহোর মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হন। ১৮৮৭ সালে মেডিক্যাল কলেজের শেষ পরীক্ষায় একটি বিষয়ে তিনি ফেল হওয়ায় অত্যন্ত নিরুৎসাহ হইয়া পড়েন। কিন্তু তাঁহার দাদা শ্রীশচন্দ্র

এবং ছোট ভগিনীপতি শ্রীযুক্ত তারণচন্দ্র দাস বিলাত যাইতে উৎসাহ দেওয়ায় ও সাহায্য করায় তিনি তাঁহাদের পরামর্শ অনুসারে ইংলণ্ড যাত্রা করেন। তাহার ঠিক্ পূর্ব্বে তাঁহার মাতার আদেশ অনুসারে তিনি এলাহাবাদের পরলোকগত হরিমোহন দে মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুকুমারী দেবীকে বিবাহ করেন।

১৮৮৮ সালের আগস্ট মাসে তিনি ইংলণ্ড পৌঁছেন। সেখানে তিনি প্রথমে এল্-এম-এ, তাহার পর এম-আর-সি-এস এবং সর্ব্বশেষে ১৮৯০ সালের আগস্ট মাসে আই-এম্-এস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। লাহোরে থাকিতে তিনি চিকিৎসাবিদ্যা ভাল করিয়া শিখিয়াছিলেন বলিয়া বিলাতে দুই বৎসরে তিনটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছিলেন। অতঃপর অফিসারদের শিক্ষা পাইবার পর তিনি ১৮৯১ সালের ১৩ই এপ্রিল ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্বিসে রাজার কমিশন (King's Commission) প্রাপ্ত হন। ঐ বৎসর ১৩ই এপ্রিল তিনি বোম্বাই পৌঁছেন এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সী তাঁহার কর্ম্মস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। ১৯০৭ সালে পেন্স্যান লওয়া পর্য্যন্ত তিনি বোম্বাই প্রদেশেই কাজ করেন। মধ্যে মধ্যে যুদ্ধ উপলক্ষ্যে আফ্রিকা, চিত্রাল প্রভৃতি যাইতে হইয়াছিল। অন্যসময়েও তিনি প্রায়ই সৈন্যদলের সহিত কাজ করিতেন; কেবল পুনা, আহমদনগর ও বেলগাঁওয়ে সিবিল সার্জ্জনের কাজ করিয়াছিলেন। বেলগাঁওয়ে কাজ করিবার পরই তিনি পেন্স্যান গ্রহণ করেন। পেন্স্যান লইবার সময় তিনি "মেজর" ছিলেন। বালুচিস্থান, মালাকন্দ প্রভৃতি স্থানে সৈন্যদলের সহিত গুরুতর শ্রমসাপেক্ষ কাজ করায় তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়। তাঁহার "স্কাভি" পীড়া ও তাহা হইতে বহুমূত্র হয়। ইহা তাঁহার পেন্স্যান লইবার অন্যতম কারণ। বহুমূত্রজনিত ব্যাধিতে বর্ত্তমান ১৯৩০ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর এলাহাবাদে তাঁহার মৃত্যু হয়।

তিনি যে কেবল ষোল বৎসর চাকরি করিবার পর পেন্স্যান গ্রহণ করেন, ভগ্ন স্বাস্থ্য তাহার উপলক্ষ্য হইলেও তাহা একমাত্র কারণ ছিল না। তিনি তেজস্বী ও স্বাধীনচিত্ত ছিলেন। তাঁহার নিজের আত্মসম্মানবোধ এবং জাতীয় সম্মানবোধ প্রখর ছিল। এরূপ লোকের পক্ষে সৈন্যদলের ব্রিটিশ কর্ম্মচারীদের সহিত মিলামিশা ও চলাফিরা প্রীতিকর ছিল না। তাহাদের সহিত কি প্রকার খিটিমিটি হইত, তাহার কেবল একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। কোন এক বৎসর ইংলণ্ডেশ্বরের জন্মদিন উপলক্ষ্যে যখন রেডিমেণ্টের ইংরেজ-সেনানায়কেরা রাজার স্বাস্থ্যের উদ্দেশ্যে মদ্যপান করিতেছিলেন, তখন বসু মহাশয়কেও তাঁহারা মদ্য পান করিতে বলেন। তিনি বিলাতে বা অন্য কোথাও জীবনে কখনও মদ্য পান করেন নাই। সুতরাং তিনি এই উপলক্ষ্যেও সুরা পান করিতে অস্বীকার করিলেন। তাহাতে ইংরেজ অফিসাররা তাঁহাকে এই বলিয়া খোঁটা দেন, যে, তিনি ইংলণ্ডেশ্বরের নিমক খান অথচ তাঁহার স্বাস্থ্যের উদ্দেশে পান করিবেন না — অর্থাৎ তাঁহাকে অকৃতজ্ঞ অরাজভক্ত বলা হয়। তিনি উত্তর দেন, "আমি নিজের দেশের নুন খাই"— অর্থাৎ তাঁহার বেতন ভারতবর্ষের রাজস্ব হইতে আসে। অন্য প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা ও কথাও তাঁহার গোচর হইত।

তিনি চাকরি উপলক্ষ্যে স্বদেশে ও বিদেশে নানা স্থানে গিয়াছিলেন। অনেক ঘটনা তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। অনেক বিখ্যাত ও অন্যবিধ লোকের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হইয়াছিল। এই সমুদয় সম্বন্ধে তাঁহার যাহা মনে ছিল, তিনি তাহা ইংরেজীতে "জীবন স্মৃতি" (Reminis-

cences) নাম দিয়া লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার শেষ কঠিন পীড়ার সময় ইহার অধিকাংশ হারাইয়া গিয়াছে। যদি এই হারান খাতাগুলি খুঁজিয়া পাওয়া না যায়, তাহা হইলে তাঁহার জীবনের অনেক প্রয়োজনীয় কথা অজ্ঞাত থাকিয়া যাইবে।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে বসু মহাশয়ের একমাত্র সন্তান ও পুত্র ললিতমোহনের জন্ম হয়। তাহার জন্মের অনতিবিলম্বে জননী সুকুমারী দেবী পীড়িত হন। তাহা ক্রমে ক্ষয়রোগে পরিণত হয়, এবং তিনি ১৯০২ সালে কালগ্রাসে পতিত হন। শিশুটিকে তাহার ছোট পিসী শ্রীমতী জগৎমোহিনী দাস মানুষ করেন। ৩৫ বৎসর বয়সে বিপত্নীক হইবার পর মেজর বসু আর বিবাহ করেন নাই। তিনি এই ঘটনার পূর্ব্বে আমিষ ভক্ষণ করিতেন, যদিও বেশী নয়। বিপত্নীক হইবার পর নিরামিষভোজী হন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে, তিনি কখনও মদ্য পান করেন নাই। চা-পানও করিতেন না। ধূমপান ইংলণ্ডে একবারমাত্র করিয়াছিলেন। তাহাতে মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাওয়ায় আর কখনও ধূমপান করেন নাই।

মেজর বসু পেন্স্যন লইবার পূর্ব্বেই তাঁহার দাদা ও তিনি সপরিবারে এলাহাবাদের বাসিন্দা হন। তাঁহারা তথায় যে বাটী নির্ম্মাণ করেন, তাঁহাদের মাতৃদেবীর নামে তাহার নাম ভুবনেশ্বরী আশ্রম রাখা হয়। তিনি পেন্স্যন লইয়া এলাহাবাদে আসিবার পর তৎকালে সেখানকার কয়েকজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক তাঁহাকে চিকিৎসা ব্যবসায় না করিতে অনুরোধ করেন; কারণ তাহাতে তাঁহাদের ক্ষতি হইবে! বামনদাস অর্থগৃধ্নু ছিলেন না, তাঁহার পেন্স্যন তাঁহার ও তাঁহার শিশুপুত্রের সামান্য ব্যয়ের পক্ষে যথেষ্ট ছিল, এবং তাঁহার মনও স্বভাবতঃ অর্থোপার্জ্জন অপেক্ষা লেখা ও পড়ার দিকেই ধাবিত হইত। এই সব কারণে তিনি এলাহাবাদে চিকিৎসা ব্যবসায় না করাই স্থির করেন। বিনা পারিশ্রমিকে ক্বচিৎ কখনও কেবল বন্ধুবান্ধবের বাড়ীতে রোগী তিনি দেখিতেন। তাহাতে বুঝিতে পারা যাইত, তিনি কিরূপ সুচিকিৎসক ছিলেন।

পেন্স্যন লইবার পর তাঁহার নিজের ব্যয় সামান্য হইবার কারণ, তিনি সাতিশয় অবিলাসী ছিলেন। তাঁহার চালচলন অত্যন্ত সাদাসিধা ছিল। সর্ব্বদা এক খানা মোটা ধুতি ও একটা পঞ্জাবী বা কামিজ পরিয়া থাকিতেন। বাহিরে যাইবার সময় একটা চাদর লইতেন। শীতের সময় একটা কোট পরিতেন। তিনি যথাসম্ভব দেশী জিনিষ ব্যবহার করিতেন। ক্বচিৎ কখন সরকারী বা অন্য উচ্চপদস্থ লোকদের সহিত দেখা করিতে হইলে আগে আগে পোষাক পরিতেন, শেষাশেষি অনেক বৎসর কোথাও যাইতেন না। দিন রাত খোলা জায়গায় থাকিতেন। গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রের সময় এবং বর্ষার বৃষ্টির সময় একটা ঘরে কিম্বা দুতলার একটা টিনের চালার নীচে আশ্রয় লইতেন। বৃষ্টির সময় ভিন্ন সকল ঋতুতে রাত্রে খোলা ছাতে শুইয়া থাকিতেন। তিনি অল্পাহারী ছিলেন। জীবনের শেষ কিছু কাল দিন রাত্রে একবার আহার করিতেন।

পড়া ও লেখা তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় কাজ ছিল। জীবনের শেষ কয়েক বৎসর চোখে ছানি হওয়ায় তিনি ভাল দেখিতে পাইতেন না। কিন্তু তখনও সমস্ত দিন জাগ্রত অবস্থায় হয় পড়িতেন কিম্বা লিখিতেন। যখন চোখ ভাল ছিল, তখন সন্ধ্যার পরও কয়েক ঘণ্টা কাজ করিতেন। তিনি নানা বিষয়ে যত বহি লিখিয়াছিলেন, তাহার কতকগুলি অপ্রকাশিত আছে। তাঁহার প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত সমুদয় গ্রন্থের পুরা তালিকা ডিসেম্বর

মাসের 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকায় দেওয়া হইয়াছে। ভারতবর্ষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার তিনি ইংরেজীতে যে প্রায় আড়াই হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী ইতিহাস লিখিয়াছেন, স্বদেশে ও বিদেশে নিরপেক্ষ লোকদের নিকট তাহা আদৃত হইয়াছে। আমেরিকার ভারতবন্ধু সাণ্ডার্ল্যাণ্ড সাহেব তৎসম্বন্ধে বলিয়াছেন, "আমার বিবেচনায় ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজত্বের যত ইতিহাস আছে, ইহা তন্মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, এবং যে-কেহ যত্নপূর্ব্বক এই সময়ের ইতিহাস পড়িতে চান, তাঁহার পক্ষে ইহা একান্ত আবশ্যক।" ঐতিহাসিক আরও যত বহি তিনি লিখিয়াছেন, তাহাও উৎকৃষ্ট। তৎসমুদয়ও সুধীসমাজে আদৃত হইয়াছে। বিলাতী ওয়েষ্টমিন্‌স্টার গেজেটের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক বিখ্যাত সাংবাদিক স্পেণ্ডার সাহেব তাঁহার "পরিবর্ত্তনশীল প্রাচ্য" (The Changing East) নামক পুস্তকের ২৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, জীবনের নানা বিভাগে শক্তিমান্ লোক ভারতে যত আছে, অন্য কোন প্রাচ্য দেশে তত নাই। তাঁহার মতে ভারতের বিস্তর লোক ইউরোপের শ্রেষ্ঠ লোকদের সহিত বুদ্ধিবিদ্যাসাপেক্ষ কাজে সমকক্ষতা করিতে পারেন, এবং ইউরোপের যে-কোন দেশে তাঁহারা বিখ্যাত হইতেন। এইরূপ যে-কয়জন ভারতীয় লোকের তিনি নাম করিয়াছেন, তাহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু এবং বামনদাস বসুর নাম আছে।

তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীশচন্দ্র ও তিনি পাণিনি কার্য্যালয় স্থাপিত করেন। শ্রীশচন্দ্র এখান হইতে পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ ইংরেজী অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সহ প্রকাশিত করেন। ম্যাক্সমূলর প্রভৃতি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা এইজন্য তাঁহার পাণ্ডিত্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তদ্ভিন্ন শ্রীশচন্দ্র কয়েকটি প্রধান উপনিষদের ঐরূপ সংস্করণ বাহির করেন এবং কোন কোন স্মৃতি ও অন্যান্য শাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেন। ভট্টোজীদীক্ষিত প্রণীত "সিদ্ধান্তকৌমুদী" ব্যাকরণ দুই ভাই ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া বাহির করেন। সেক্রেড বুক্‌স অব দি হিন্দুজ নাম দিয়া পাণিনি আফিস হইতে যে বহুসংখ্যক শাস্ত্রগ্রন্থের মূল ও ইংরেজী অনুবাদ বা শুধু ইংরেজী অনুবাদ বাহির হয়, বামনদাস তাহা সম্পাদন করেন। তদ্ভিন্ন তিনি অনেক দুষ্প্রাপ্য ইংরেজী পুস্তক ও পুস্তিকা পুনর্মুদ্রণ করেন।

বামনদাস ইচ্ছা করিলে একজন শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক হইতে পারিতেন। অনেক ইংরেজী কাগজে তিনি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকায় তিনি যে-সকল মূল্যবান্ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহার তালিকা উহার ডিসেম্বর সংখ্যায় দিয়াছি। প্রবাসীতে লিখিয়াছিলেন :—

১৩০৯	বৈশাখ	:—	শত্রুঞ্জয় পর্ব্বত
	শ্রাবণ	:—	সিন্ধুদেশ
	কার্ত্তিক	:—	ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাবকর্ত্তা
	অগ্রহায়ণ	:—	ইংরাজী ভাষায় বাঙ্গালী লেখক
	চৈত্র	:—	পাশ্চাত্য দেশে সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা
১৩১০	বৈশাখ	:—	বীজাপুর
	জ্যৈষ্ঠ	:—	আহমদনগর
	আষাঢ়	:—	জার্মানদেশীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ "ঔরঙ্গজেবের সমাধি"—উত্তর
	শ্রাবণ	:—	নাসিক
	আশ্বিন	:—	গুজরাতী ভাষা ও প্রাচীন সাহিত্য
	কার্ত্তিক	:—	চাঁদবিবির ছবি

	অগ্রহায়ণ	:—	মহারাষ্ট্রীয় ভাষা ও সাহিত্য
	পৌষ	:—	
	মাঘ	:—	মহারাষ্ট্রীয় সাহিত্যের তৃতীয় যুগ
	ফাল্গুন	:—	ষোলাপুর
	চৈত্র	—	পুণা
১৩১১	জ্যৈষ্ঠ	:—	ঠানা জেলা
	শ্রাবণ	:—	সাতারা
	কার্ত্তিক	:—	বিজয়নগরের ইতিবৃত্ত
	অগ্রহায়ণ	:—	রত্নাগিরি ও মহারাষ্ট্র রণতরী
	পৌষ	:—	বম্বাই সহর
	মাঘ	:—	জঞ্জিরা
	ফাল্গুন	:—	কচ্ছপ্রদেশ
	চৈত্র	:—	খান্দেশ
১৩১২	বৈশাখ	—	কোলাবা
	পৌষ	:—	অকবরের নিন্দুকগণ
	চৈত্র	:—	ভারতধর্ম্ম কি?
১৩১৩	বৈশাখ	:—	হিতকর ও অর্থকর ভারতীয়
	কার্ত্তিক	:—	উদ্ভিদাবলী
১৩২১	ভাদ্র	:—	বাঙ্গালীর কয়েকটি বিশেষত্ব
১৩৩৩	বৈশাখ	:—	আশীর্ব্বচন

বামনদাস বসু মহাশয়ের লেখা নানা শহরের ইতিহাস-সম্বলিত প্রবন্ধগুলি ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার মহাশয় পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে বলিয়াছিলেন। ভবিষ্যতে তাহা করা হইবে।

শ্রীশচন্দ্র ও বামনদাস বসু ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে যেরূপ হৃদ্যতা, পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধা এবং সকল কাজে সহযোগিতা ছিল, সেরূপ সৌভ্রাত্র সচরাচর দেখা যায় না। এই সৌভ্রাত্রের গুণে তাঁহারা নানা মূল্যবান্ গ্রন্থের প্রচার রূপ কঠিন কার্য্য করিতে পারিয়াছিলেন।

আটাশ বৎসর পূর্ব্বে বামনদাস বাবুর সহিত আমার পরিচয়ের সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। ঠিক্ কোন্ বৎসর কোন্ তারিখে তাঁহার সহিত আমার পরিচয় হয়, তাহা আমার মনে নাই; কিন্তু তাঁহার মনে ছিল। তিনি তাঁহার জীবনস্মৃতির একটি খাতায় তাহা লিখিয়াছিলেন, কিন্তু অন্যান্য কয়েকটি খাতার সহিত ঐ খাতাটি হারাইয়া গিয়াছে। পাণিনি আফিস হইতে রাজা রামমোহন রায়ের বাংলা ও ইংরেজী গ্রন্থাবলীর যে সংস্করণ বাহির করা হয়, আমি তাহার ইংরেজী খণ্ডটির প্রুফ দেখিয়াছিলাম এবং একটি দীর্ঘ ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছিলাম। তাহার দু-একটি পাদটীকাও আমার লেখা।

১৯০৬ সালে আমি এলাহাবাদের কায়স্থ পাঠশালা কলেজের প্রিন্সিপ্যালের কাজে ইস্তফা দি। 'প্রবাসী' তাহার পূর্ব্বেই বাহির হইয়াছিল। তখন ইংরেজী 'মডার্ণ রিভিউ' বাহির করিতে মনস্থ করি। এই সময়ে এবং তাহার পরও বরাবর বামনদাস বসু মহাশয় নানা প্রকারে আমার সাহায্য করিয়াছেন। তজ্জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ।

বামনদাস বসু মহাশয়ের স্মৃতিশক্তি অসাধারণ ছিল। ত্রিশ চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর আগেকার ঘটনার বৃত্তান্ত ও তারিখ তাঁহার মনে থাকিত। 'মডার্ণ রিভিউ' ও 'প্রবাসী'তে বহু বৎসর পূর্ব্বে কিছু প্রকাশিত হইয়া থাকিলে তাহা দেখিবার প্রয়োজন হইলে আমি যদি তাহা খুঁজিয়া না পাইতাম, তাঁহাকে চিঠি লিখিলে ফেরত ডাকে ঠিক্ সন্ধান তিনি লিখিয়া পাঠাইতেন। তিনি নানা বিষয়ের বহুসংখ্যক পুস্তক পড়িয়াছিলেন এবং অনেক পুস্তক হইতে অনেক অংশ আবৃত্তি করিতে পারিতেন। তিনি যে সব বিদ্যা জানিতেন, তদ্বিষয়ক অনেক কথা প্রয়োজন হইলেই জানিয়া লইতে পারিতাম। বাংলা ইংরেজী সংস্কৃত ও ফার্সী কবিতা তিনি অনেক আওড়াইতেন।

লণ্ডনে পড়িবার সময় বামনদাসের পুরাতন পুস্তকের দোকানে ঘুরিয়া বেড়াইবার অভ্যাস ছিল। সেখান হইতে তিনি অনেক দুস্প্রাপ্য পুরাতন বহি এবং মুদ্রিত ছবি ক্রয় করেন। এই সকল ছবি ও বহি তিনি সঙ্গে করিয়া লইয়া আসেন। দেশে আসিয়াও তিনি অনেক বহি ক্রয় করেন। তাঁহার দাদাও অনেক বহি কেনেন। পাণিনি আফিস হইতে প্রকাশিত বহির বিনিময়ে প্রাপ্ত এবং গবর্মেন্ট ও কোন কোন গ্রন্থকার ও প্রকাশক কর্তৃক উপহৃত বহু পুস্তক দ্বারাও এই গ্রন্থসমষ্টি পুষ্ট হয়। বসুভ্রাতৃদ্বয় তাঁহাদের মাতার নামে এই গ্রন্থসংগ্রহের নাম ভুবনেশ্বরী লাইব্রেরী রাখেন। ইহাতে প্রধানতঃ সংস্কৃত, প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস বিষয়ক বহি বিস্তর আছে। বোম্বাইয়ের কর্ণেল কীর্ত্তিকর যখন ১৯১৪ সালে এলাহাবাদ আসেন, তখন এই লাইব্রেরী তাঁহার এত ভাল লাগে, যে, তিনি তাঁহার জীববিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যা বিষয়ক সমুদয় গ্রন্থ ও পত্রিকা এবং অপুষ্পক উদ্ভিদসমূহের নমুনা, রঙীন ছবি ও ফোটোগ্রাফ উইল করিয়া তাঁহার বন্ধু মেজর বসুকে দিয়া যান। মেজর বসু ১৯২০ সালে এইগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে এই সর্ত্তে দান করেন, যে, বিশ্ববিদ্যালয় একটি শুষ্ক-উদ্ভিদ-মন্দির স্থাপন করিয়া তাহার নাম রাখিবেন কীর্ত্তিকর উদ্ভিদ-মন্দির এবং ভারতবর্ষীয় অপুষ্পক উদ্ভিদসমূহ সম্বন্ধে একটি গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করাইবেন যাহাতে কীর্ত্তিকর মহাশয়ের তদ্বিষয়ক গবেষণা ও চিত্র-সমূহ সন্নিবিষ্ট হইবে। এই সকল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় অপুষ্পক উদ্ভিদ সম্বন্ধে গবেষণাকার্য্যে উৎসাহ দিবার নিমিত্ত মেজর বসু কীর্ত্তিকর ও তাঁহার প্রণীত ঔষধার্থে ব্যবহৃত ভারতীয় উদ্ভিদা-বলীবিষয়ক মূল্যবান্ সচিত্র গ্রন্থের একশত সেট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন। প্রত্যেক সেটের মূল্য দুইশত পঁচাত্তর টাকা। ভারতীয় অপুষ্পক উদ্ভিদাবলী সম্বন্ধীয় পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক বিজ্ঞানচার্য্য সহায় রাম বসু মহাশয় কীর্ত্তিকর ফণ্ড হইতে বৃত্তিপ্রাপ্ত দুইজন গবেষক ছাত্রের সাহায্যে প্রস্তুত করিয়াছেন। উহা অচিরে ছাপিবার জন্য প্রেসে দেওয়া হইবে। উহাতে বহু রঙীন চিত্র থাকিবে। এই গ্রন্থখানির প্রকাশ দেখিয়া যাইতে পারিলে মেজর বসু আহ্লাদিত হইতেন। তাঁহার প্রদত্ত উপকরণ হইতে তাঁহার অভিলাষ অনুসারে অধ্যাপক ফণীন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক লিখিত তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীশচন্দ্রের জীবনচরিতের প্রকাশও দেখিয়া যাইতে পারিলে তিনি সাতিশয় সুখী হইতেন।

তাঁহার লাইব্রেরীর কিয়দংশ প্রয়াগের মহিলা বিদ্যাপীঠে তিনি জীবদ্দশাতেই দান করিয়া গিয়াছেন।

বামনদাস বাবু কেবল যে পুরাতন পুস্তকই সংগ্রহ করিতেন তাহা নহে; পুরাতন খবরের কাগজ ও পত্রিকা সংগ্রহেও তাঁহার উৎসাহ ছিল। যত বহি তিনি পড়িতেন, তাহা হইতে প্রয়োজনীয় অংশ খাতায় টুকিয়া রাখিতেন। পুরাতন খবরের কাগজ ও পত্রিকা হইতে অনেক প্রবন্ধ ও তথ্য কাটিয়া রাখিতেন। চাকরি উপলক্ষ্যে কোন একটি স্থানে থাকিবার সময় তিনি তত্রত্য অফিসার ও অন্য লোকদের নিকট হইতে দশ মণ পুরাতন সংবাদ-পত্র ক্রয় করিয়া তাহা হইতে এইরূপ টুকরা কাটিয়া রাখেন। ঐ জায়গা হইতে বদলী হইবার সময় ঐ টুকরাগুলিরই ওজন আড়াই মণ হইয়াছিল! অতএব, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, যে, তাঁহাকে অন্য অফিসারেরা বাতিকগ্রস্ত মনে করিয়াছিল।

তাঁহার পুরাতন পত্রিকা ক্রয়ের অভ্যাস দ্বারা

"প্রবাসী" উপকৃত হইয়াছিল। বহু বৎসর পূর্ব্বে যখন রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য ইংরেজী পত্রিকা হইতে প্রবাসীতে সারসংগ্রহ করিয়া দিতেন, তখন মেজর বসু এলাহাবাদ হইতে রেলে বাক্সবন্দী করিয়া ঐ সব পত্রিকা কবিকে পাঠাইতেন।

সংবাদপত্র হইতে কর্ত্তিত ও রক্ষিত এই টুকরাগুলির মধ্যে কিছু তাঁহার কোন কোন গ্রন্থের জন্য, কতক বা তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ-সমূহের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছিল। আমিও কিছু ব্যবহার করিয়াছি। সম্ভবতঃ এখনও কিছু সঞ্চিত আছে।

ভারতবর্ষে কোম্পানীর রাজত্ব কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহা জানিবার এবং মানুষকে জানাইবার প্রবল বাসনা হইতে তাঁহার ভারতে ইংরেজ-রাজত্ব স্থাপন-বিষয়ক পূর্ব্বোক্ত বৃহৎ গ্রন্থের উৎপত্তি। ইতিহাস কিরূপ হওয়া উচিত, তাহার জন্য কিরূপ উপকরণ সংগৃহীত হইয়া তাহা কি প্রকারে লিখিত হওয়া উচিত, তদ্বিষয়ে তিনি অনেক অধ্যয়ন ও চিন্তা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের দীর্ঘ ভূমিকা পড়িলে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ভারতবর্ষের ব্রিটিশ অধিকার যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে যাহা পড়িয়াছিলেন ও সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সমুদয় তাঁহার গ্রন্থাবলীতে ব্যবহার করিতে পারেন নাই। তিনি গবেষকদিগকে আহ্লাদের সহিত পঠিতব্য গ্রন্থতালিকা দিতেন, অনেক সময় গ্রন্থ ধার দিতেন।

তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এলাহাবাদ পাব্লিক লাইব্রেরীর কমিটির সভ্য ছিলেন। তিনি যখন উহার সেক্রেটারী ছিলেন, তখন কোম্পানীর আমলের ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় পার্লেমেন্টের সমুদয় রিপোর্ট আনাইয়াছিলেন। ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস জানিবার পক্ষে এগুলি অত্যাবশ্যক্। ইহার কতকগুলি তিনি পড়িয়াছিলেন। এই ঐতিহাসিক উপাদানগুলি ভারতীয় ঐতিহাসিক গবেষকেরা ব্যবহার করেন না বলিয়া তিনি দুঃখ করিতেন। পার্লেমেন্টের ভারতবর্ষ-সম্পৃক্ত এইরূপ রিপোর্টসংগ্রহ এলাহাবাদ পাব্লিক লাইব্রেরীতে যেরূপ আছে, সেরূপ ভারতবর্ষের আর কোন লাইব্রেরীতে আছে বলিয়া অবগত নহি। তিনি নিজে কয়েক হাজার টাকা এবং নিজের লাইব্রেরীটি দিয়া এবং আরও অধিক অর্থ সংগ্রহ করিয়া একটি গবেষণা মন্দির স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

এলাহাবাদ পাব্লিক লাইব্রেরীর জন্য প্রতি বৎসর টাকার বরাদ্দ অনুযায়ী নানা বিষয়ে নূতন বহি কেনা হয়। কমিটির এক এক জন সভ্যের এক এক বিষয়ে বহির তালিকা দিবার কথা। কিন্তু মেজর বসুকে নিজের বিষয় ছাড়া অন্য বিষয়েও বহির নাম দিতে হইত।

তিনি ভারতে ঔষধার্থ ব্যবহৃত নানা উদ্ভিজ্জ ও অন্য জিনিষ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই সংগ্রহকে কেন্দ্র করিয়া তিনি কর্ণেল কীর্ত্তিকর এবং একজন ভারতীয় সিবিলিয়ানের সহযোগিতায় ঔষধার্থে ব্যবহৃত ভারতীয় উদ্ভিদ-বিষয়ক তাঁহার মূল্যবান্ গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থের সাহায্যে ভারতীয় ঔষধপ্রস্তুতকর্ত্তারা ঔষধ প্রস্তুত করিলে অর্থ উপার্জ্জন করিতে এবং লোকহিত সাধন করিতে পারিবেন।

১৯১০-১১ সালে এলাহাবাদে যে প্রদর্শনী হয়, বসু মহাশয় তাহার প্রত্নতত্ত্ব ও ভারতীয় ঔষধ এই দুটি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কমিটির সভ্য ছিলেন। প্রদর্শনীতে তাঁহার ঔষধসংগ্রহ প্রদর্শিত হয়। এই সংগ্রহ তিনি এলাহাবাদ মিউনিসিপালিটীর প্রস্তাবিত মিউজিয়মে দান করিয়া গিয়াছেন। প্রদর্শনীর কমিটির সভ্য থাকায় তিনি আর দুটি কাজ করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় ভারতীয় চিত্রকলা প্রদর্শনের বন্দোবস্ত হয় এবং

তাঁহার প্রস্তাব অনুসারে ডাঃ আনন্দ কুমারস্বামীকে চিত্র-বিভাগের ভার দেওয়া হয়। দ্বিতীয় কাজটি, ভারতীয় কার্পাস ও পশমী কাপড় ও কম্বল আদির যে নমুনা বহি কোম্পানীর আমলে প্রস্তুত হয়, তাহা তিনি লক্ষ্ণৌ হইতে আনাইয়া প্রদর্শনীতে দেখান। এই নমুনা বহির অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের কিছুই জানা ছিল না। তিনি ১৯০৮ সালের ডিসেম্বর মাসের 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকায় ঐ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন। বিলাতের তাঁতীরা প্রথম প্রথম ভারতবর্ষের লোকদের মত কাপড় ও পাড় প্রভৃতি করিতে পারিত না। তাহাদের সুবিধার জন্য ভারতের ৭০০ সাত শত রকম কাপড়, পাড়, কম্বল প্রভৃতির টুকরা কাটিয়া ১৮ ভল্যুম বহি প্রস্তুত হয়। এই বহি মোট কুড়ি সেট প্রস্তুত হয়। তাহার একটি সেটও প্রথম প্রথম ভারতবর্ষে রাখিবার সঙ্কল্প ছিল না। কিন্তু শেষে অন্য মতলবে ১৩ সেট ইংলণ্ডের বস্ত্রশিল্পের প্রধান প্রধান কেন্দ্রে এবং ৭ সেট ভারতবর্ষে রাখা হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের সেটগুলি এমন অনেক জায়গায় রাখা হয় যাহা বস্ত্রশিল্পের জন্য বিখ্যাত নহে। লক্ষ্ণৌয়ে এক সেট রাখা হয় তাহা মেজর বসু জানিতেন। তাহাই তিনি আনাইয়া এলাহাবাদ প্রদর্শনীতে দেখান।

এই প্রদর্শনী খুব বৃহৎ হইয়াছিল। ইহা দেখিবার জন্য ভারতবর্ষের বহু রাজা মহারাজা ও সাধারণ লোক নানা স্থান হইতে এলাহাবাদ সমবেত হন। আমিও সপরিবারে গিয়াছিলাম এবং বসুভ্রাতৃদ্বয়ের গৃহে অতিথি ছিলাম। কয়েক দিন ধরিয়া তাঁহাদের বাড়ীতে যেরূপ বহু অতিথির সমাগম দেখিয়াছিলাম, এমন আর কখনও কোথাও দেখি নাই। কয়েক দিন তাঁহাদের গৃহে প্রায় এক শত জন অতিথির পরিচর্য্যা হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে বহু মহিলা এবং বালকবালিকাও ছিলেন। আমার যতটা মনে পড়ে, বসুভ্রাতৃদ্বয় সেই সময়ে অতিথিদের জন্য নিজেদের বাড়ীতে যথেষ্ট স্থান না হওয়ায় জন্য বাড়ীও ভাড়া লইয়াছিলেন। তাঁহাদের মাতার, তাঁহাদের এবং বাড়ীর মহিলা ও ছেলেমেয়েদের আতিথেয়তা সুবিদিত। অন্যান্য বৎসবেও, বিশেষতঃ পূজার ছুটি, মাঘমেলা ও কুম্ভমেলার সময়, তাঁহাদের বাড়ীতে পরিচিত অপরিচিত বহু অতিথির সমাগম দেখিয়াছি। বসুভ্রাতৃদ্বয়ের সৌজন্য অনুকরণীয়। তাঁহারা ছোট ছেলেমেয়েদের পর্য্যন্ত আপনি বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

বামনদাস বসু মহাশয় যখন চাকরি উপলক্ষ্যে উত্তর পশ্চিম সীমান্তে ছিলেন, তখন অনেক দুরধিগম্য স্থানে গিয়া খনন করাইয়া মাটির নীচে হইতে অনেক বৌদ্ধ মূর্ত্তি আবিষ্কার করেন। তাহা গান্ধার শিল্পের নিদর্শন। এরূপ মূর্ত্তিসংগ্রহ মিউজিয়মে আছে, কিন্তু ভারতবর্ষের ব্যক্তি-বিশেষের এরূপ সংগ্রহ কেবল মেজর বসুর গৃহে আছে। ইহার সচিত্র বৃত্তান্ত- পরলোকগত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯২৪ সালের এপ্রিল মাসের 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন। পাটনা মিউজিয়ামের জন্য পরলোকগত অধ্যাপক যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার ইহা তিন হাজার টাকা মূল্যে কিনিতে চান, কিন্তু বসু মহাশয় দেন নাই। তিনি একবার কৌশাম্বী দেখিতে গিয়া এক মুদির দোকানের বারাণ্ডায় উঠিবার ধাপে প্রাচীন লিপিযুক্ত একখানি প্রস্তর-ফলক দেখিতে পাইয়া তাহা তৎক্ষণাৎ কয়েক আনা মূল্যে ক্রয় করেন। এই আবিষ্কারের সংবাদ পাইয়া রাখালবাবু এলাহাবাদ গিয়া তাহার ছাপ তুলেন এবং পাঠ করেন। ইহার লিপি অতি প্রাচীন। রাখালবাবু একশত টাকা দিয়া ইহা কিনিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু বামনদাস বাবু দেন নাই। ইহা তাঁহাদের বাড়ীতে আছে। প্রাচীন

মুদ্রা সংগ্রহে তাঁহার খুব উৎসাহ ছিল; অনেক দুষ্প্রাপ্য মুদ্রা সংগ্রহ করিয়াও ছিলেন। তাঁহার দাদা যখন ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে চাকরি উপলক্ষ্যে কাশীতে ছিলেন, তখন এই সকল মুদ্রা সেখানে তাঁহাদের বাড়ীতে ছিল। দুঃখের বিষয় তাহা চুরি হইয়া যায়।

মেজর বসু সাধারণতঃ সার্ব্বজনিক কার্য্যে যোগ দিতেন না, নিজের লেখা ও পড়া লইয়া থাকিতেন। ভারতীয় ঔষধ সংগ্রহ ও তদ্বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করায় তিনি একবার নিখিল ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদ কন্‌ফারেন্সের লাহোর অধিবেশনের সভাপতি মনোনীত হন। একবার পরলোকগত বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের সহিত ধর্ম্ম সম্মেলনের (Convention of Religions) সহযোগী সম্পাদক হন, এবং একবার শ্রদ্ধানন্দ স্বামী প্রতিষ্ঠিত গুরুকুলের বার্ষিক উৎসবে সভাপতির কাজ করেন। তিনি বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি ছিলেন এবং এই পরিষদকে তাঁহার এতদ্বিষয়ক সমুদয় লেখা-সংগ্রহ দান করিয়াছেন।

বামনদাস বসু মহাশয় বাঙালী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং বংশতঃ তিনি বাঙালী। কিন্তু জন্মের স্থান ও শিক্ষার স্থান লাহোব বলিয়া তাঁহাকে পঞ্জাবী বলিতে পারা যায়। তাহার পর চাকরি উপলক্ষ্যে তিনি ভারতবর্ষের—বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্যের—নানা স্থানে বাস করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহাকে মহারাষ্ট্রের ও গুজরাটের লোকও বলা চলে। সর্ব্বশেষে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি প্রয়াগের স্থায়ী অধিবাসী হন। সে হিসাবে তিনি হিন্দুস্থানী। তাঁহার ভ্রাতা ও তিনি সাতিশয় হৃদ্যতার সহিত হিন্দুস্থানী বন্ধুদের সহিত মিশিতেন। এই সব কারণে তিনি যে-অর্থে "ভারতীয়", কম লোককেই সে-অর্থে ভারতীয় বলা যায়। তিনি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করিয়াছিলেন বলিয়াই যে ভারতীয়, তাহা নহে। তিনি ভারতবর্ষের নানা প্রাচীন ও আধুনিক দেশভাষা জানিতেন। প্রাচীন ভাষার মধ্যে তিনি সংস্কৃত এবং আরবী ও ফার্সী জানিতেন বলিয়া হিন্দু ও মুসলমান উভয় সভ্যতার সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। আধুনিক ভারতীয় ভাষার মধ্যে, মাতৃভাষা বাংলা ছাড়া, তিনি পঞ্জাবী, পশ্‌তো, সিন্ধী, কাশ্মীরী, হিন্দী, উর্দ্দু, নেপালী, গুজরাটী ও মরাঠী জানিতেন এবং বলিতে পারিতেন। ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশে তাঁহার বন্ধু ছিল। তাঁহাদের সহিত তাঁহাদের ভাষায় কথা বলিতেন। একবার দেখিলাম, তাঁহার একজন পুরাতন পাঠান-বন্ধুর সহিত পাঠানী রীতিতে করকম্পন করিয়া পশ্‌তো ভাষায় কথা বলিতেছেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে কাজ করিবার সময় তিনি রক্ষী সঙ্গে না লইয়া একাকী পাঠান গ্রামে যাইতেন ও পাঠানদের কুটীরে বসিয়া গল্প করিতেন। তাঁহার ব্রিটিশ সহকর্ম্মীরা একাকী যাওয়ার বিপদের কথা বলিলে তিনি হাসিতেন। পাঠানেরাও ইংরেজদের এই ভয়ের কথা শুনিয়া হাসিত; বলিত, "আপনার সঙ্গে ত আমাদের কোন বংশানুক্রমিক ঝগড়া নাই; আপনার অনিষ্ট কেন করিব?" মেজর বসু কখন কখন সামরিক কর্ম্মচারীদের পশ্‌তো ভাষার পরীক্ষক হইতেন এবং তাঁহাদের উত্তরের কাগজ দেখিতেন। একবার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে এক ছোকরা ইংরেজ অফিসারের পশ্‌তোর জ্ঞানের মৌখিক পরীক্ষা উপলক্ষ্যে তাহাকে একটি পশ্‌তো কথার মানে জিজ্ঞাসা করেন, যাহার অর্থ 'মানুষ'। কিন্তু ছোকরাটি তাঁহাকে অপমানিত করিবার জন্য উত্তর দেয়, "এর মানে কালা আদমী"। বামনদাস বাবু শান্তভাবে তাহার ভ্রম সংশোধন করিয়া বলেন, "না, এর মানে শাদা ইতর লোক।"

তাহাতে সে চটিয়া স্থানীয় সেনাপতির কাছে নালিশ করিলে তিনি সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া তাহাকে বলেন, "তুমি মুখের মত জবাব পাইয়াছ।"

তিনি সার্ব্বজনিক কোন প্রচেষ্টায় যোগ দিতেন না বটে, কিন্তু দেশের পরাধীনতা ও অপমান তাঁহাকে মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা দিত। জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ডের পর তিনি অনেক রাত্রি ঘুমাইতে পারেন নাই। তিনি সাতিশয় স্বাধীনতাপ্রিয় ও স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন। তিনি ১৯০৩ সালেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যে, দেশে গুপ্ত সমিতি এবং রাজনৈতিক হত্যা আদি হইবে, এবং প্রকাশ্য ভাবে সাধারণ কৃষকদিগের দ্বারা নিরুপদ্রব প্রতিরোধনীতি অনুসৃত হইবে। এই এই বিষয়ে তাঁহার মুদ্রিত লেখা আছে। কিরূপে সমগ্র মানবজাতির উন্নতি হইতে পারে, তিনি তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতেন। এই বিষয়ে তাঁহার অনেকগুলি ইংরেজী প্রবন্ধ সাপ্তাহিক ও মাসিক কাগজে বাহির হইয়াছে।

তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত হিন্দুসমাজভুক্ত ছিলেন। তাঁহার পিতা বৈদান্তিক ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা থিয়সফিস্ট ছিলেন। তাঁহার ভগিনী শ্রীমতী জগৎমোহিনী ও ভগিনীপতি শ্রীযুক্ত তারণচন্দ্র দাস ব্রাহ্ম ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মমত উদার ছিল। তিনি শিখধর্ম্মে কখনও দীক্ষিত না হইলেও একজন সাধারণ শিখ সিপাহীকে গুরু বলিয়া মানিতেন। এই সিপাহী অতি ধার্ম্মিক লোক ছিলেন। একটা যুদ্ধের পর লুটের অংশ লইতে অস্বীকার করায় তাঁহাকে চাকরি ছাড়িতে হয়। একজন সাধারণ সিপাহীকে গুরু বলিয়া মানায় বুঝা যায় বামনদাস বাবু মনুষ্যত্বকেই মূল্যবান মনে করিতেন, পদমর্য্যাদাকে নহে। বামনদাস বাবু কাশীর ভাস্করানন্দ স্বামীকে খুব ভক্তি করিতেন, এবং স্বামীজীও তাঁহাকে স্নেহ করিতেন। বসু মহাশয় জাতিভেদ-প্রথাকে হিন্দুসমাজের নানা দুর্গতির কারণ মনে করিতেন। তিনি পর্দ্দা-প্রথার বিরোধী এবং স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু পাশ্চাত্য ফ্যাশানপ্রিয়তা অপছন্দ করিতেন। তিনি তাঁহার ভগিনী ও ভগিনীপতির নামে এলাহাবাদে "জগৎতারণ বালিকা-বিদ্যালয়" স্থাপন করেন এবং ইহার জন্য কিছু টাকা দিয়াছেন। ইহাতে প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত পড়ান হয়। ইহা বিশেষ করিয়া বাঙালী বালিকাদের জন্য স্থাপিত। ইহাতে সরকারী সাহায্য আছে।

১৩৩৯ অগ্রহায়ণ

বিচারপতি ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

এলাহাবাদ হাইকোর্টের জজ রায় বাহাদুর ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের আকস্মিক অকালমৃত্যুতে প্রবাসী বাঙালী সমাজ হইতে একজন মান্যগণ্য ব্যক্তি অন্তর্হিত হইলেন। তিনি তাঁহার পিতা স্বর্গীয় স্যর প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মত বিখ্যাত জজ না হইলেও সুবিচারক বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। তিনি পরিহাসরসিক ও আমোদপ্রিয় লোক ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি

একজন সুদক্ষ ক্রিকেট খেলোয়াড় ছিলেন। ওকালতীতে প্রবেশ করিবার পরও তিনি অনেক বৎসর পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে ক্রিকেট- খেলোয়াড়দের ক্যাপ্টেনের কাজ করিতেন। জজিয়তী করিবার সময়েও ক্রিকেটের উৎসাহদাতা ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে একটা ক্ষুদ্র কথা এখন মনে পড়িতেছে। তাঁহার হাতের লেখাও এলাহাবাদের প্রসিদ্ধ উকীল সুপণ্ডিত স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতের লেখা ঠিক এক রকম ছিল। সতীশ বাবু যখন এক সময় চোখের ব্যারামে ভুগিতেছিলেন, তখন একটি লোক তাঁহার নিকট হইতে একটি প্রতিশ্রুত দান লইতে আসে। আমি তখন তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। সতীশ বাবু ললিত বাবুকে বলিলেন, "আমার দেরাজ থেকে চেক্ বহিটা নিয়ে লোকটিকে এক-শ টাকার একখানা চেক্ দাও, আমার নামটাও তুমিই দস্তখত ক'রে দাও।" ললিতবাবু তাহাই করিলেন। দস্তখতটি ঠিক সতীশ বাবুর স্বাক্ষরের মতই হইল।

১৩৪০ শ্রাবণ

বঙ্গে অবাঙালী নামের বিকৃতি

অনেক বাংলা খবরের কাগজে বঙ্গের বাহিরের স্থানের নাম এবং অবাঙালী মানুষদের নাম বিকৃত করিয়া লেখা হয়। দৃষ্টান্ত দিতেছি। এখনও কেহ কেহ "গোখলে" নামটি "গোখেল" লেখেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, "মালব্য" নহেন, তিনি নিজে নাগরী অক্ষরেও মালবীয় লেখেন। পুনার "পর্ণকুটীর" অধিকারিণী "থ্যাকারসে" নহেন; তিনি "ঠাকরসী"। বাহাওলপুর (Bahawalpur) রাজ্যের হিন্দু প্রজাদের অভিযোগের বিষয় লিখিতে গিয়া অনেক বাংলা কাগজ রাজ্যটির নাম লিখিয়াছেন "ভাওয়ালপুর"। আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

১৩৪১ অগ্রহায়ণ

বঙ্গের বাহিরে বাঙালীবিদ্বেষ

ভারতের এক একটা প্রদেশ কেবল সেই সেই প্রদেশের লোকদের জন্য হওয়া উচিত, বাংলা দেশ কেবল বাঙালীদের জন্য হওয়া উচিত, এই প্রকার রব বাঙালীরা আগে তুলে নাই। বাংলা দেশে অবাঙালী কাহারও ব্যবসা-বাণিজ্য, শ্রমিকের কাজ, বা চাকরি করায় বাঙালীরা প্রথম

প্রথম আপত্তি করে নাই। বরং বাঙালীরাই প্রথমে সমগ্রভারতীয় মহাজাতি গঠনের কল্পনা ও তদনুরূপ বক্তৃতাদি করিয়াছিল। "বিহার কেবল বিহারবাসীদের জন্য" ইত্যাদি রব বহু বৎসর ধরিয়া চলিবার পর এত দিন পরে, যখন বাঙালীরা বঙ্গেও সকল কার্য্যক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত ও বেদখল হইতে বসিয়াছে, যখন বঙ্গে অন্য প্রত্যেক প্রদেশের যত লোক উপার্জ্জন করে বঙ্গের তাহা অপেক্ষা অনেক কম লোক সেই সেই প্রদেশে উপার্জ্জন করে, কেবল তখনই বাঙালীদিগকে বলিতে হইতেছে, যে, বঙ্গের সব কার্য্যক্ষেত্রে বাঙালীরই অধিকার সর্ব্বাগ্রে। অথচ অন্য প্রদেশবাসীরা বাঙালীদিগকেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাদেশিকসঙ্কীর্ণতাগ্রস্ত বলে! কিন্তু কার্য্যতঃ দেখিতে পাই, সিমলায় বাঙালীদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে তাহারা বেদখল হইয়াছে, দিল্লীর বাঙালীদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়েও সেই অবস্থা ঘটিয়াছে।

১৩৪১ ফাল্গুন
ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

রাজপুতানার অন্তর্গত জয়পুর রাজ্যের অন্যতম ভূতপূর্ব্ব প্রসিদ্ধ প্রধান মন্ত্রী স্বর্গীয় কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পুত্র এবং স্বয়ং তথাকার এক জন প্রধান অমাত্য ও জায়গীরদার ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ-পরিচয়ের আনন্দ আমরা পাইয়াছিলাম। বঙ্গদেশে জলপ্লাবনাদিতে মানুষ বিপন্ন হইলে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া সাহায্য পাঠাইতেন। ইহা আমরা সাক্ষাৎভাবে জানি। পাঠকবর্গ তাঁহার কিঞ্চিৎ পরিচয় জয়পুর-প্রবাসী ডাক্তার পান্নালাল দাস কর্ত্তৃক 'প্রবাসী'র জন্য লিখিত নিম্নমুদ্রিত প্রবন্ধটি হইতে পাইবেন :—

কালের পরিবর্ত্তনে যদিও বিশিষ্ট প্রবাসী বাঙ্গালীর সংখ্যা ক্রমশই বিরল হইতেছে; যদিও পূর্ব্বের মত রাজস্থানের বিবিধ রাজ্যে, মন্ত্রী পদাধিষ্ঠিত বিদ্যাধর ভট্টাচার্য্য, হরিমোহন সেন, কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সংসারচন্দ্র সেন, ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়, ভোলানাথ বিশ্বাস ও মতিলাল ভট্টাচার্য্য প্রমুখ মনীষী প্রবাসী বাঙ্গালীর আর আবির্ভাব নাই; তথাপিও যাঁহারা সেই স্বনামধন্য পুরুষপ্রবরদের কীর্ত্তিরশ্মির অনুসরণ করিয়া তাঁহাদের প্রদর্শিত মার্গ অবলম্বন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অন্যতম একজন ছিলেন রায় বাহাদুর ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। এত দিন প্রবাসী বাঙ্গালীর গৌরব রক্ষা করিয়া তিনি আজ বিধাতার আহ্বানে ইহজগৎ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

গত ১৯শে জানুয়ারী শনিবার সন্ধ্যার সময় চন্দ্রগ্রহণের কিছু পূর্ব্বে তিনি স্বর্গধামে চলিয়া গিয়াছেন। কৌন্সিলের সদস্য-পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। অতিরিক্ত মস্তিষ্ক চালনার ফলে পীড়িত হইয়া তাহার পরিণামেই একদিন মাত্র অজ্ঞান অবস্থায় থাকিয়া তিনি দেহত্যাগ করেন।

রায় বাহাদুর ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভূতপূর্ব্ব জয়পুর নরেশের প্রধান অমাত্য রাও বাহাদুর কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সি-আই-ই, মহোদয়ের তৃতীয় পুত্র। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে জয়পুর নগরে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার শিক্ষা-দীক্ষা জয়পুরেই হয়। এখানে মহারাজার কলেজে বি-এ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া তাঁহাব পিতার নিকট হইতে নৈতিক ও রাষ্ট্র-শাসন পদ্ধতিতে প্রত্যক্ষ শিক্ষালাভ করেন। পরে উপযুক্ত হইলে জয়পুরাধিপতি মহারাজা সওয়াই মাধো সিংজী সাহেব বাহাদুরের আজ্ঞাক্রমে তাঁহার পিতা কান্তিবাবু তাঁহাকে আপীল কোর্টের জজ রূপে নিযুক্ত করেন।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে কান্তিবাবু গবর্ণমেণ্ট দ্বারা ভারতীয় দুর্ভিক্ষ-নিবারণ কমিশনে সদস্য মনোনীত হইলে, মহারাজ ভারতের হিতকর ঐ কার্য্যে তাঁহাকে প্রেরণ করেন। তখন কান্তিবাবুর স্বাস্থ্য ভাল না থাকায়, বড়লাট লর্ড কর্জ্জন স্বয়ং তাঁহার পুত্র ঈশান বাবুকে পিতার সাহচর্য্যে থাকিতে অনুমতি প্রদান করেন। এই বিশেষ কার্য্যে থাকাতে এবং বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করাতে তাঁহার বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা জন্মে। কমিশন যখন নাগপুরে আসেন, তখন দুর্ভাগ্যক্রমে হঠাৎ কান্তিবাবুর পীড়া বৃদ্ধি পাওয়াতে অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি কালগ্রাসে পতিত হন।

এই অভাবনীয় ঘটনাতে গভর্ণমেণ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং ঈশান বাবুকে যথারীতি সান্ত্বনা প্রদান করিতে বিলম্ব করেন নাই। নাগপুর শহরে কান্তিবাবু স্মারক-মন্দির নির্ম্মাণ জন্য এক বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড দান করেন, যাহাতে ঈশানবাবু তাঁহার পিতার স্মরণার্থে এক স্মারক-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া প্রবাসী বাঙ্গালীর নাম অক্ষুণ্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। মহারাজা মাধো সিংজী তাঁহার বিশ্বস্ত প্রধান অমাত্যের অকালমৃত্যুতে অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়েন এবং অনন্যোপায় হইয়া কৌন্সিলের সদস্য পদে উন্নীত করিয়া, আপনার "গুরুভাই" ঈশানবাবুকে রাজ্যশাসনের গুরুভার অর্পণ করেন; এবং গুরুভাইকে গুরুপদে বরণ করেন। কান্তিবাবু ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে দেহত্যাগ করেন। মহারাজা এপ্রিল মাসেই ঈশানচন্দ্রকে কৌন্সিলের সদস্যপদ দেন, এবং কান্তিবাবুর মৃত্যুর এক মাসের মধ্যেই তাঁহাকে তাজিমী সরদার পদে জায়গীরদার স্বীকার করিয়া "মহাৎমী" অর্থাৎ সনদ দিবার জন্য তাঁহার বাটীতে স্বয়ং আসেন। এত অল্প সময়ে, অর্থাৎ কোন জায়গীরদারের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রের মহাৎমী, এক মাসের মধ্যে হয় না। কিন্তু অম্বররাজ মহারাজ মাধো সিংজী তাঁহার 'গুরুভাই'এর জন্যই এরূপ অনুগ্রহ দেখাইয়া শীঘ্রই মহাৎমী করেন।

কান্তিবাবুর জীবদ্দশায় ঈশানচন্দ্র বিবিধ রাজকার্য্যে পিতার সহকারী রূপে থাকায় হাতেকলমে সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষার তাঁহার সুযোগ হয়। সে শিক্ষা ভবিষ্যতে কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহার বিশেষ উপকারে আসে। কৌন্সিলের সকল বিভাগেই রাজস্ব ফৌজদারী দেওয়ানী প্রভৃতিতে এরূপ যোগ্যতা ও ন্যায়পরায়ণতার সহিত তিনি কার্য্য করেন যে, রাজা প্রজা সকলেরই অল্পসময়ের মধ্যে প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠেন। তাঁহার সহকর্ম্মী অন্যান্য সদস্যবর্গ পলিটিক্যাল অফিসার ও উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীরা সকলেই তাঁহার বিচারে নির্ভীকতা ও সততার জন্য মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি যে রাজ্যশাসন কার্য্যে এক স্তম্ভ-স্বরূপ ছিলেন তাহা তাঁহারা মনে করেন।

মহারাজ সওয়াই মাধো সিংজী সাহেব বাহাদুর স্বর্গলাভ করিবার কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে অসুস্থ হইয়া থাকেন; তাহার জন্য তিনি রাজকার্য্য

সুচারুরূপে পরিদর্শন করিতে না পারায় কিছু বিশৃঙ্খলা ঘটে। তাঁহার মৃত্যুর পর সওয়াই মহারাজা মানসিং বাহাদুরের নাবালকতায় ব্রিটিশ গর্ভমেণ্ট একটি কমিটি গঠন করিয়া ঐ বিশৃঙ্খলতা দূর করিতে মনস্থ করেন, এবং ঈশানবাবুকে একমাত্র উপযুক্ত সদস্য নির্দ্ধারিত করিয়া তাঁহাকে ঐ কমিটিতে নিযুক্ত করেন। তাঁহার অভিজ্ঞতার ফলে রাজ্যের ঐ বিশৃঙ্খলতা দূর হয় এবং অপরাধীরা দণ্ডিত হয়। এই জটিল কর্ম্মের সমাধানে ব্রিটিশ গবর্ম্মেণ্ট অতীব প্রীত হইয়া তাঁহাকে জানুয়ারী ১৯২৫ খ্রীঃ অব্দে রায় বাহাদুর খেতাবে ভূষিত করেন।

কৌন্সিলের সদস্য পদের নির্দ্ধারিত বেতন আছে, কিন্তু ঈশান বাবু তাঁহার পৈতৃক জায়গীরের অধিকারী হইয়াছিলেন বলিয়া, অনেক দিন অবৈতনিক ভাবেই কর্ম্ম করেন। পরে মহারাজার আদেশানুসারে ঐ নির্দ্ধারিত বেতন গ্রহণ করেন।

গবর্ম্মেণ্টের তত্ত্বাবধানে চালিত কৌন্সিল অব রিজেন্সীতেও বিশেষ যোগ্যতার সহিত কার্য্য করিয়া তিনি ইংরেজ রাজপুরুষদের বিশ্বাসভাজন ও শ্রদ্ধার পাত্র হন। তিনি এমন স্বাধীনচেতা ও উচিতবক্তা ছিলেন যে নিজের সুবিবেচিত মত পরিবর্ত্তন করিতে চাহিতেন না, তজ্জন্য ক্ষতিস্বীকার করিতেও প্রস্তুত হইতেন।

ঈশানচন্দ্রের পিতামাতা তাঁহাকে আদর করিয়া "হাতি" বলিয়া ডাকিতেন। তাই সাধারণ্যে "হাতি বাবু" নামেই তিনি প্রসিদ্ধ।

১৯২৫ অব্দে শারীরিক অসুস্থতা-নিবন্ধন তিনি রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেও কখনই তিনি আলস্যে কালক্ষেপ করিতেন না। স্বর্গলাভের এক দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও দৈনিক বিষয়কর্ম্ম, পুস্তকপাঠ, উদ্যান-পরিদর্শন প্রভৃতি কোন কার্য্যই অসমাপ্ত রাখেন নাই।

উদ্যানের উন্নতি ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করা তাঁহার এক প্রধান দৈনিক কর্ম্ম ছিল। প্রাতে, সায়াহ্নে, নিয়মিত ভাবে উদ্যান পরিদর্শন ও উদ্যানপালদের কার্য্য দেখান, তাঁহার তৃপ্তি সাধন করিত। দূর দেশ হইতে আনীত বহুমূল্য নানাবধি বৃক্ষলতাদিতে তাঁহার মনোরম উদ্যানটি সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার বাগানের আম্র এত সুবাসিত ও উত্তম, যে, মহারাজা তাঁহার নিজের ব্যবহারের জন্য কয়েকটি বৃক্ষ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, এবং দূর প্রবাসে বা তীর্থস্থলে থাকিলেও তথায় বিশ্বস্ত লোকের হস্তে ঐ আম তাঁহাকে অতি যত্নের সহিত পাঠাইতে হইত। এরূপ সুন্দর উদ্যান যে-কোন নগরেরই গৌরবকর। বাগানের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করা ব্যতিরেকে তাঁহার প্রাসাদতুল্য সৌধমালাকেও সর্ব্বদা সংস্কৃত ও শোভিত করিতে উচ্চদরের শিল্পী নিযুক্ত করিয়া প্রত্যহ তাহাদের কার্য্য পরিদর্শন করিতেন। ইহা অপেক্ষাও তাঁহার সংস্কৃতির অধিক পরিচায়ক তাঁহার বহুমূল্য ও সুন্দর পুস্তকাগার। এই পুস্তকাগায়ে শিক্ষানুরাগী সকলেরই অবারিতদ্বার ছিল। তাঁহার পছন্দসই কোন পুস্তক, কি ইংরেজী, কি বাংলা, কি হিন্দী, কি সংস্কৃত, কি উর্দ্দু, যখনই যাহা প্রকাশিত হইত, তখনই তিনি তাহা আনাইয়া নিজে পাঠ করিয়া বা পাঠ করাইয়া আলমারী শোভিত করিতেন। যখন কোন কার্য্যব্যপদেশে কলিকাতা বা অন্য নগরীতে যাইতেন, তখন পুরাতন দুষ্প্রাপ্য পুস্তক সংগ্রহ করা তাঁহার এক বিশেষ কার্য্যের মধ্যে ছিল। তিনি পুরাতন পুস্তকালয়গুলি অনুসন্ধান করিয়া তথায় নিজে গিয়া পুস্তক- বিক্রেতাদিগকে অতিরিক্ত মূল্যে পুস্তক ক্রয় করিয়া উৎসাহিত করিতেন। তাঁহার পুস্তকাগার সংরক্ষণের জন্য মুন্সী ও দপ্তরী প্রভৃতি

কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিল।

ধর্ম্মবিষয়ে তিনি সনাতনপন্থী হইলেও, তাঁহার ধর্ম্মমত উদার ছিল। হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতি সকলকেই দেখিতেন এবং তাঁহারাও তাঁহাকে শ্রদ্ধা-ভক্তির চক্ষে দেখিত।

৩২ বৎসর বয়সে তাঁহার প্রথমা পত্নীর স্বর্গলাভ হয়। আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবদের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে ও মহারাজার আদেশে তিনি পুনরায় দারপরিগ্রহ করেন।

জয়পুর-প্রবাসী হইলেও তিনি তাঁহাদের পৈত্রিক বাসভূমিকে ভুলেন নাই। শ্যামনগরের নিকট রাহুতা তাঁহাদের আদিম গ্রাম। সে গ্রামের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি করিতে তিনি উদাসীন ছিলেন না। তাহার রাস্তাঘাট স্বাস্থ্যোন্নতি প্রভৃতি সমস্ত সৎকার্য্যেই তাঁহার আগ্রহ ছিল এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় যে শিক্ষাবিস্তার, তাহাতে বিশেষ মনোনিবেশ করিয়া "কান্তিচন্দ্র হাই স্কুল" নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া, তাহার সমস্ত খরচ বহন করিয়া দেশের সকলেরই কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন।

বাহ্যিক আকৃতি প্রকৃতিতে তিনি সম্পূর্ণ আড়ম্বরশূন্য ও আভিজাত্য-গর্ব্বহীন ছিলেন। আভিজাত্যমণ্ডিত এ রাজস্থানের কায়দা- কানুনের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন না। সাধারণ কর্ম্মচারী প্রভৃতির সহিত একাসনে বসিতে দ্বিধাবোধ করিতেন না। তাঁহার এই অমায়িক ব্যবহার এদেশে আদব-কায়দার খেলাপ-ভ্রমে, লোকে প্রথমে তাহা তত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত না। কিন্তু পরে তাঁহার গুণগ্রামের ও সদ্ব্যবহারের পরিচয় পাইলে, স্বতঃই তাহাদের আদব- কায়দাজড়িত মস্তক শ্রদ্ধায় ও সম্ভ্রমে অবনত হইত।

অভ্যাগত বাঙ্গালীরা তাঁহার ধর্ম্মশালায় আদরের সহিত স্থান পাইতেন এবং যাহাতে বাঙ্গালীর কোন উপকার হয় তিনি তাহা করিতে করিতে কখনও পরাঙ্মুখ হইতেন না। জয়পুর-প্রবাসী বাঙ্গালীদের নেতাস্বরূপ হইয়া তিনি অনেকের দুঃখকস্ট নিবারণ করিয়াছেন। গত পাঁচ বৎসর তাঁহার নেতৃত্বে সকল বাঙ্গালী একনিষ্ঠ হইয়া শারদীয়া বারোয়ারী পূজা উপলক্ষ্যে বিশেষ আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন। তাঁহার মহিমায়ময়ী ভার্য্যার বার-ব্রত উপলক্ষ্যে রাস দোল প্রভৃতি উৎসবে সুদূর এই মরুভূমিতেও ভক্তি-উৎস প্রবাহিত হইত। শিল্প, নাট্যকলা ও সঙ্গীতেও তাঁহার বিলক্ষণ সহানুভূতি ছিল। সে-সব আজ প্রবাসী বাঙ্গালীদের মানসপটে মরীচিকামাত্র প্রতীত হইতেছে!

বাল্যকালে তাঁহার দুই অগ্রজের অকালমৃত্যুতে ঈশানচন্দ্র পৈত্রিক বিস্তীর্ণ জায়গায়, স্বর্ণগদালতারভূষিত তামিমী সরকারী ও গুরুপদের অধিকারী হন।

তাঁহার প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত দুই পুত্র দুই কন্যা এবং কনিষ্ঠা পত্নীর গর্ভজাত দুই পুত্র ও দুই কন্যা এবং তাঁহার এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও বৃহৎ পরিবারবর্গ বন্ধুবান্ধব সহ তাঁহার মৃত্যুতে শোকাতুর হইয়াছেন। তাঁহার পুত্রেরা সকলেই শিক্ষিত, এবং আশা করা যায় তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়, বি-এ, মহাশয় তাঁহার পৈত্রিক বিষয় ও মর্য্যাদার অধিকারীরূপে তাঁহাদের বংশগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া প্রবাসী বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বলকারী হইবেন।

সন্তরণবিদ প্রফুল্লকুমার ঘোষ • কার্তিক ১৩৩৬
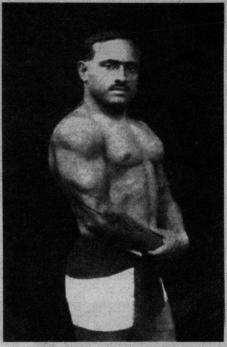
ব্যায়ামবিদ রাজেন্দ্রনারায়ণ গুহঠাকুরতা • অগ্রহায়ণ ১৩৪১
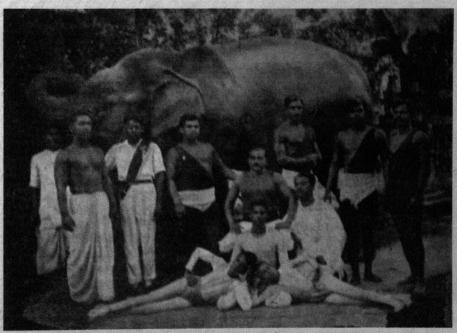
বাংলাদেশে ব্যায়ামচর্চা—সশিষ্য রাজেন্দ্রনারায়ণ গুহঠাকুরতা • অগ্রহায়ণ ১৩৪১

মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় • ফাল্গুন ১৩৪১

হরিহর শেঠ • চৈত্র ১৩৪৩

আলামোহন দাস • কার্তিক ১৩৪৭

রায়সাহেব নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় • ভাদ্র ১৩৪৫

আয়রনম্যান নীলমণি দাস • চৈত্র ১৩৪২

মুষ্টিযোদ্ধা রবীন্দ্রনাথ সরকার
• ফাল্গুন ১৩৪২

বলবান জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
• অগ্রহায়ণ ১৩৪২

জুজুৎসুবীর এ এস তাকাগাকি • অগ্রহায়ণ ১৩৩৭
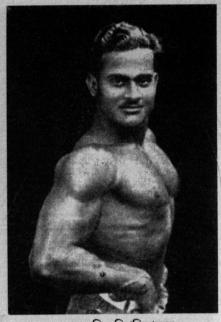
বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে
ব্যায়ামচর্চার তত্ত্বাবধায়ক মণি রায়
• ভাদ্র ১৩৪৫
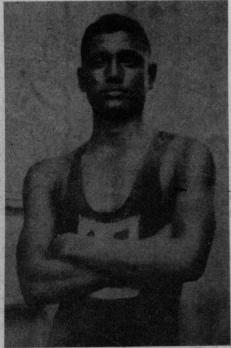
সাঁতারু নলিনচন্দ্র মল্লিক • কার্তিক ১৩৩৬

সারদারঞ্জন রায় • অগ্রহায়ণ ১৩৩২
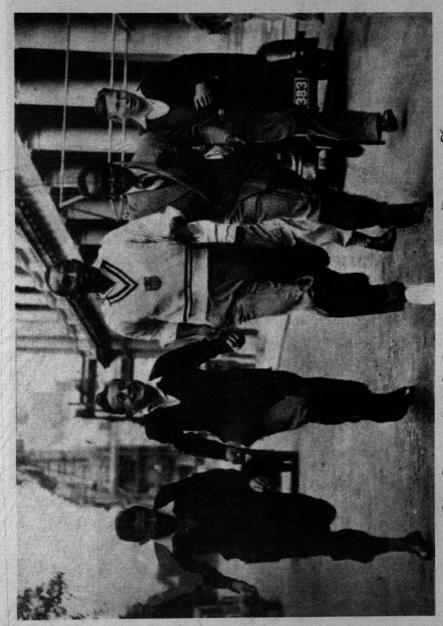
অ্যাথলিট জেসি ওয়েন্স অটোগ্রাফ শিকারি ছেলেদের সঙ্গে লন্ডনের পথে দৌড়চ্ছেন • কার্তিক ১৩৪৫

ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় • ভাদ্র ১৩৪৩

পরিতোষ সেন • মাঘ ১৩৪৭

ম্যাক্স লিবারম্যান, হেনরিক হাইনে, ফেলিক্স মেন্ডেলসন বার্টহোল্ডি, গুস্তাভ মালের
• ফাল্গুন ১৩৪৫

কমলা চট্টোপাধ্যায় ও
হালিদে এদীব হানুম • ফাল্গুন ১৩৪১

হাকিম আজমল খাঁ • মাঘ ১৩৩৪

রাসবিহারী ঘোষ • চৈত্র ১৩২৭

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় • পৌষ ১৩৪৩

১৩৪৩ অগ্রহায়ণ
জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

রায় বাহাদুর জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এক সময় এলাহাবাদের গবর্ন্মেণ্ট কলেজ মিওর সেন্ট্র্যাল কলেজে অধ্যাপক ছিলেন। তাহার পর তিনি স্কুল-ইনস্পেক্টর হন। গবর্ন্মেণ্টের চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করার পর তিনি লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তাহার পর তিনি কিছুকাল কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়েরও ভাইস চ্যান্সেলার ছিলেন। গত ২১শে আশ্বিন ৭৪ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি এক জন বিখ্যাত থিয়সফিস্ট ছিলেন, মিসেস এনী বেসাণ্টের সহযোগিতায় থিয়সফিক্যাল সোসাইটির মত প্রচারের চেষ্টা করিতেন। তিনি পৃথিবীর বহু দেশ পর্য্যটন করিয়াছিলেন। যদি তিনি নিজের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বা আত্মচরিত লিখিয়া গিয়া থাকেন এবং যদি তাহা প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে তাহা বহুতথ্যপূর্ণ ও পাঠযোগ্য হইবে। তিনি বিদ্বান ও মিষ্টালাপী ছিলেন।

১৩৪৫ ভাদ্র
বাঙালীর প্রাধান্য

সকল প্রদেশ অপেক্ষা বঙ্গে স্বদেশী আন্দোলন প্রবল হইয়াছিল। তাহার ফলে বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অনেক লক্ষপতি মিল-মালিক ক্রোড়পতি হইয়াছেন।

সকল প্রদেশ অপেক্ষা বাঙালী যুবকেরা স্বরাজলাভার্থ প্রবল আন্দোলন প্রভৃতি করিয়াছিলেন। তাহার ফলে অন্য অনেক প্রদেশ কংগ্রেসী গবর্ন্মেণ্ট পাইয়াছে। বঙ্গে অধিকতমসংখ্যক যুবক ও যুবতী বিনা বিচারে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বন্দী থাকিবার পর এবং অনেকের আত্মহত্যা ও যক্ষ্মা প্রভৃতিতে মৃত্যু হইবার ও কাহারও কাহারও চিররুগ্ন ও অক্ষম হইবার পর অবশিষ্ট ব্যক্তিরা ক্রমশঃ খালাস পাইতেছেন।

স্বাধীনতার জন্য যাঁহারা প্রাণপণ করিয়াছিলেন, বা করিয়াছিলেন বলিয়া পুলিশ অনুমান করিয়াছিল, বঙ্গেই এরূপ অধিকতমসংখ্যক ব্যক্তি কেবল গ্রাসাচ্ছাদনপ্রার্থী হইয়াছেন।

বাঙালীর প্রাধান্য এই সকল বিষয়ে।

১৩৪৬ পৌষ

ভারতবর্ষে "বড়র পীরিতি"

এমন এক সময় ছিল যখন বাঙালীরা ইংরেজের খুব প্রিয় ছিল, খুব চাকরী-চাঁদ ও খেতাব-চাঁদ পাইত। এখন সেই বাঙালীর ভাগ্যে হাতে দড়ি যে পরিমাণে জুটিতেছে, এমন আর কাহারও ভাগ্যে নহে।

১৩৪৭ অগ্রহায়ণ

বাঙালী জাতির আধুনিক অতীত কৃতিত্ব

বত্রিশ বৎসর আগে ১৯০৮ সালে বিলাতের তখনকার প্রসিদ্ধ দৈনিক কাগজ "ডেলী নিউস" ভারতবর্ষীয় পরিস্থিতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাপ্রসূত বিবৃতি দিবার নিমিত্ত নিজের এক জন বিশেষ ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধিকে এদেশে প্রেরণ করেন। তাঁহার বিবৃতির এক অংশে বাঙালী জাতি সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা তখন মায়াবতী হইতে প্রকাশিত "প্রবুদ্ধ ভারতে"র ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের মে সংখ্যায়, ৯৬ পৃষ্ঠায়, উদ্ধৃত হইয়াছিল। "প্রবুদ্ধ ভারত" লিখিয়াছিলেন :—

The Special Commissioner deputed by the *Daily News sends that* paper his estimate of the Bengali character and the situation in India today. In the course of it he wirtes :

"The Bengali is the maker of the new India. The Indian who has suffered most from the historic travesty is the native of Bengal. Our view of him is shamefully imperfect. Bengalis are in some respectes the most intellectual of the Indian peoples, so they are the most assimilative They have learnt our ways and grown into our system. British India without the Bengali is inconceivable. He is ubiquitous and indispensable."

Speaking of the "Greatness of Bengal" and its part in the New Movement, he says :

"It is in accordance with the fitness of things that such a tendency should have had its beginnings in Bengal, so often the birthplace of great movements and the home of great personalities, although in certain respects behind the South and West of India. An un-written chapter in the history of modern India is the record of what had been one for the people by men of Indian race, and in that record a commanding share has fallen to Bengal. This Act makes all the more curious the rooted belief of Anglo-India that the Bengali people is hoeplessly degenarat. The century just passed will furnish us with aboundant illlustration. In Ram Mohun Roy and Keshub Chandra Sen we have examples

of daring religious reformers; in the Pandit Vidyasagar, an educationist of genius; in Vivekananda, famous on both sides of the Atlantic by the lectures. a singhularly powerful embodiment of the renascent Indian ideal; while in our own day, Rabindranath Tagore has revealed the riches-of Bengali as a literary language. The brilliant experimental work of Dr. P. C. Ray and Dr. J. C. Bose has been acclaimed in every laboratory in Europe; and a long line of eminent citizens have left their mark on the public life of the country. All this does not look like exhaustion."

তাৎপর্য। ডেলী নিউস হইতে ভারপ্রাপ্ত স্পেশ্যাল কমিশ্যনার সেই কাগজকে বাঙালী-চরিত্র ও চরিত সম্বন্ধে এবং ভারতবর্ষের বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে নিজ নির্ধারণ পাঠাইয়াছেন। তাহার মধ্যে তিনি বলিয়াছেন :—

"বাঙালী নবীন ভারতের নির্মাতা। ইতিহাসের হাস্যোদ্দীপক বিকৃতিতে যে-ভারতীয়ের প্রতি সর্ব্বাধিক অবিচার হইয়াছে সে বাঙালী। তাহার সম্বন্ধে আমাদের ধারণা লজ্জাকর রূপে অসম্পূর্ণ। কোন কোন দিকে ভারতীয় জাতিসমূহের মধ্যে বাঙালীরাই সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিশালী; সেই জন্য তাহারা বাহিরের জিনিষকে নিজের ব্যক্তিত্বের অঙ্গীভূত করিতে সর্বাপেক্ষা অধিক সমর্থ। তাহারা আমাদের ধরণধারণ শিখিয়াছে এবং আমাদের রাষ্ট্রপদ্ধতির অনুরূপ ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে (বা আপনাদিগকে গড়িয়া তুলিয়াছে)। বাঙালীবর্জিত ব্রিটিশ ভারত অচিন্তনীয়। বাঙালী সব ঘটে বিদ্যমান এবং তাহাকে না হইলে চলে না।"

'বঙ্গের মহত্ত্ব' 'নব প্রচেষ্টা'য় তাহার অংশ সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া ডেলী নিউসের প্রতিনিধি বলিয়াছেন:—

"বঙ্গেই যে এইরূপ প্রবণতার আরম্ভ হইয়াছে, তাহা যথাযোগ্যই হইয়াছে,--কারণ যদিও বাংলা দেশ কোন কোন বিষয়ে দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের পশ্চাদ্বর্ত্তী তথাপি অনেক সময়ই বহু মহৎ প্রচেষ্টার জন্মভূমি ও বহু মহৎ ব্যক্তির বাসভূমি হইয়াছে বঙ্গদেশ (* এই বাক্যটির পূর্ববর্তী বাক্যটি প্রবুদ্ধ ভারতে উদ্ধৃত না হওয়ায়, লেখক কীদৃশ প্রবণতার কথা বলিয়াছেন, তাহা বুঝা যাইতেছে না। প্রবাসীর সম্পাদক)। ভারতবর্ষের লোকদের নিমিত্ত ভারতীয় জাতির মানুষেরা কি করিয়াছেন তাহার বৃত্তান্ত আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি অলিখিত অধ্যায়, এবং সেই কৃতিত্বের প্রধানতম একটি অংশ বঙ্গদেশের বাঙালীরা নৈরাশ্যপূর্ণরূপে অধোগতিপ্রাপ্ত, ভারতবর্ষপ্রবাসী ইংরেজদের এই বদ্ধমূল ধারণা উক্ত তথ্যের আলোকে আরও অদ্ভুত প্রতীয়মান হয়। যে (উনবিংশ) শতাব্দী সম্প্রতি শেষ হইয়াছে, তাহা হইতে প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে। রামমোহন রায় ও কেশব চন্দ্র সেনে আমরা অতি সাহসী ধর্মসংস্কারকের দৃষ্টান্ত পাই; পণ্ডিত বিদ্যাসাগরে পাই প্রতিভাশালী শিক্ষাবিধায়কের: বাগ্মিতার জন্য অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের উভয় দিকে প্রসিদ্ধ বিবেকানন্দে নবীভূত ভারতীয় আদর্শ বিশেষ শক্তিমান মূর্তি ধারণ করে; এবং আমাদের সমকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্গের সাহিত্যিক ভাষার ঐশ্বর্য উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। ইয়োরোপের প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে ডাঃ পি, সি, রায় ও ডাঃ জে, সি, বোসের সমুজ্জ্বল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাকার্য সম্বর্ধিত হইয়াছে; এবং বহু বিশিষ্ট নাগরিক দেশের সার্বজনিক জীবনে আপনাদের কৃতিত্বের চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। এই সকল হইতে প্রতীয়মান

হয় না যে, বঙ্গের শক্তি নিঃশেষ হইয়াছে।"

আমাদের বাঙালীদের অহঙ্কার বাড়াইবার নিমিত্ত এক জন বিচক্ষণ বিদেশী পর্যবেক্ষকের এই কথাগুলি উদ্ধৃত হয় নাই। বাংলা দেশ ও বাঙালী কি ছিল এবং এখন কি হইয়াছে ও হইতে বসিয়াছে, সে বিষয়ে আমাদের মধ্যে চিন্তার উদ্রেক হইলে কিঞ্চিৎ সন্তোষের বিষয় হইবে।

আমরা এখনও শিল্পবাণিজ্যে পশ্চিম-ভারতবর্ষ ও অন্য কোন কোন অঞ্চল অপেক্ষা অনগ্রসর আছি, আগে আরও বেশী ছিলাম; এখনও বাংলা দেশ স্ত্রীস্বাধীনতা বিষয়ে দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারত অপেক্ষা অনগ্রসর আছে, আগে আরও বেশী ছিল। এইরূপ অন্যান্য দিকেও আমাদের অনগ্রসরতা উপলব্ধি করিয়া উন্নতির চেষ্টা করা উচিত। আগে আমরা সাহিত্যে, ললিতকলায়, বিজ্ঞানে, প্রত্নতত্ত্বে, ইতিহাস, দর্শনে, ধর্মসংস্কারে ও সমাজ-সংস্কারে, রাজনীতিতে... অগ্রণী ছিলাম। অগ্রণী বরাবর না-থাকিতে পারি, কারণ অন্য সকলেরও অগ্রসর হওয়া স্বাভাবিক; কিন্তু কোন দিকে পিছাইয়া পড়া অবাঞ্ছনীয় ও অনুচিত। পিছাইয়া পড়িতেছি কিনা, তাহাই বিশেষ সতর্কতার সহিত লক্ষ্য করিতে হইবে এবং পিছাইয়া পড়া সত্য হইলে তাহা নিবারণ করিতে হইবে।

১৩৪৭ পৌষ

বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর কৃতি

অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দেব, এম. এ.

"বাঙ্গালী নব্য ভারতের স্রষ্টা। ...সে সর্ব্বস্থানেই আছে, সে অপরিহার্য্য। ...ভারতীয়েরা তাহাদের জনসাধারণের জন্য যাহা করিয়াছে তাহা আধুনিক ভারতেতিহাসের এক অ-লিখিত অধ্যায়। এবং এই স্মরণীয় অধ্যায়ের প্রধান অংশ বাংলার ভাগেই পড়িয়াছে।"*

শুধু ব্রিটিশ ভারতে নহে, বহু দেশী রাজ্যেও বাঙ্গালীর কৃতিত্ব আছে।

সেই বাঙ্গালী কেবল আজ নিজ বাসভূমেই 'পরবাসী' নহে, কিন্তু যে-সকল প্রদেশে সে সম্মানের সহিত বন্ধুভাবে শতাধিক বৎসরাবধি বসবাস করিয়াছে, আজ সেখানে হইতে তাহাকে "খেদাইতে" পারিলে সে-প্রদেশবাসীরা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে। তাহারা এখন মনে করে আমাদের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতে আসিয়াছে ইহারা। ইহা নিজেদের হীনতাবোধের ('inferiority complex'-এর) প্রতিক্রিয়া নহে কি? কিন্তু "British India without the Bengali is impossible", "বাঙ্গালীকে বাদ দিয়া ব্রিটিশ ভারত অসম্ভব।" ব্রিটিশ ভারত কেন, দেশী ভারতও বাঙ্গালী না হইলে যে চলে না। তাহারা ভুলিয়া যায়, এই অভিশপ্ত জাতিই ভাগ্যান্বেষণ

* The Bengalee is the maker of new India...British India without the Bengali is impossible. He is ubiquitous and indispensable... An unwritten chapter in the history of Modern India is the record of what has been done for the people by men of Indian race. and in that record a commanding share has fallen to Bengali"— Extract from a Report of the Special Commissioner deputed by the "London Daily News" in 1908.

করিতে আসিয়া বিহার, আসাম, উড়িষ্যা, বর্ম্মা, রাজপুতানা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, মহীশূর ও সুদূর হিমালয়ের উচ্চশিখরেও শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম্ম ও সভ্যতার আলোক বিস্তার করিয়াছে; কত কুসংস্কার দূর করিয়াছে, কত অহিতকর প্রথার উচ্ছেদ সাধনে সহায়তা করিয়াছে, কত আতুরের সেবা করিয়াছে, কত দুর্ভিক্ষপীড়িতের মুখে অন্ন দিয়াছে।*

পাল ও সেন বংশের বহু নৃপতি যখন অনেক দেশ জয় করিয়াছিলেন, তখন বহু বাঙ্গালী হিমালয় প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। সিমলা ও কাশ্মীরের মধ্যবর্ত্তী সুকেত, কেঁওখাল, কাংড়া, কিশনাবর প্রভৃতির রাজবংশ এবং তথাকার সাধারণ অধিবাসী অনেকেই সেই সকল, বাঙ্গালীর বংশধর। শেরিং সাহেব তাঁহার "Hindu Tribes and Castes"এ ইহা বলিয়াছেন ও তাহারাও এ-কথা স্বীকার করে।

বাঙ্গালীরা এক কালে ভারতের অনেক প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। ভারতে ঔপনিবেশকতায় সেই সর্ব্বপ্রধান।

পঞ্জাবের গৌড় ব্রাহ্মণরা বাঙ্গালা দেশ হইতে গিয়াছিল। দিল্লী, বরেলী, বিজনোর ইত্যাদির "গৌড়তগা" ব্রাহ্মণেরা এককালে বাঙ্গালী ছিলেন। বর্ত্তমান তামিল জাতি তাম্রলিপ্তির সমুদ্রকূলবাসী বাঙ্গালীদের বংশধর বলিয়া কিম্বদন্তী আছে। তামিলদিগের ভাষায় বহু বাঙ্গালা শব্দ পাওয়া যায়। কাশী ও মৃজাপুরে কিছু গৌড় কায়স্থ পাওয়া যায়। তাহারাও এক কালে বাঙ্গালার অধিবাসী ছিল।

এক কালে বঙ্গের শিল্পজাত দ্রব্য বহু দেশের শিল্পকে পরাস্ত করিয়াছিল। এই সকল দ্রব্য লইয়া বাঙ্গালী সওদারগণ গ্রীস, রোম, মিশর, পারস্য ও তুরস্ক দেশে যাতায়াত করিত।

মাদ্রাজের নামবুদ্রী ব্রাহ্মণদের বহু আচারব্যবহার বাঙ্গালীদের মত। আমার বন্ধু হায়দ্রাবাদের অমৃতলাল শীল বলেন, তাহারা বিজয়ের সিংহল-যাত্রার সময় তাঁহার সহিত বাঙ্গালা দেশ হইতে আসিয়াছিল।

পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন, বাঙ্গালীরা নেপালে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। পরবর্তীয়া ভাষা অনেকটা বাঙ্গালার মত।

বাঙ্গালীরা তিব্বত, বর্ম্মা, সিংহল, যবদ্বীপ, সুমাত্রা,বোরনীও, বালী, শ্যাম, চীন, জাপানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়ছিল; ঐ সকল স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল; হিন্দু সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিল। এ-সকল পুরাতন কথা। ইহার কাহিনী ধীরে ধীরে উদ্ঘাটিত হইতেছে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে ও বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাঙালীর নানা কৃতির ইতিহাস এখনও রচিত হয় নাই। ক্রমশঃ লোকে উহা ভুলিয়া যাইতেছে।

অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা নিজের বাসভূমি ছাড়িয়া দেশ-বিদেশে যায় কেবল টাকা রোজগার করিবার জন্য। বিহারের কুলীরা বাংলা দেশ হইতে মনি-অর্ডার দ্বারা প্রত্যেক বৎসর চার কোটি (?) টাকা তাহাদের "মুল্লুকে" পাঠায়। সঙ্গে কত লইয়া যায় তাহার কোন হিসাব নাই। মাড়বারী, মাদ্রাজী, গুজরাতী, কাঠিয়াবাড়ী, পাঞ্জাবী বাঙ্গালায় আসিয়া কেবল অর্থের রাশি সঞ্চয় করে, কিন্তু তাহার পরিবর্তে বাঙ্গালা দেশকে কি দিয়া যায়?*

* শিক্ষিত পাঞ্জাবীগণের সমাজে বহু কুৎসিত আচার প্রচলিত ছিল। স্বর্গত অবিনাশ মজুমদার মহাশয়ের অবিরাম চেষ্টায় উহার অনেক সংশোধন হইয়াছে। তাঁহার "Purity Servant" পত্রিকা পাঞ্জাবে সুনীতি প্রবর্ত্তনের যন্ত্রস্বরূপ হইয়াছিল। অবিনাশ বাবুরই চেষ্টায় ১৯০৭ সালে এলাহাবাদের অনশন পীড়িতদের জন্য করাচীর একেশ্বরবাদী সম্মেলন ৩০০০ টাকা দান করেন। অনাথদের ভরণপোষণ, অনশনক্লিষ্টদের অন্নদান তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। ঐরূপ উদাহরণ আরও কত আছে, তাহা পাঠকরা সংগ্রহ করিয়া দিবেন।

* এখন অবশ্য হাসপাতালে কিছু দেয়, কিম্বা বঙ্গদেশে দুই-চারিটা ধর্ম্মশালা স্থাপন করে। যে-পরিমাণে লইয়া যায়, তাহার তুলনায় দান নগণ্য।

বিহারের অন্যতম পূর্ব্বতন নেতা রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর তাঁহার এক অভিভাষণে বলিয়াছিলেন—

"বাঙ্গালী যথায় বসতি করিয়াছে সেই স্থানেই অধিবাসীদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছে। প্রত্যেক বিশিষ্ট জেলায় তাহারা স্কুল খুলিয়াছে, স্ত্রী-শিক্ষার পথ প্রদর্শন করিয়াছে। প্রথম বালিকা-বিদ্যালয় তাহারাই স্থাপন করিয়াছে, স্বায়ত্ত শাসন প্রসারের ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সংগ্রাম করিয়াছে। তাহারাই প্রথম সংবাদপত্র প্রচার করিয়াছে। রাষ্ট্র ও পৌর জীবনের তাহারাই জন্মদাতা। আইন ব্যবসায় বাঙ্গালীরাই নেতৃত্ব করিয়াছে; এবং উচ্চ আদর্শ দ্বারা উহাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। যাহা কিছু বিহারের নৈতিক, মানসিক বা বৈষয়িক উন্নতির অনুকূল, বাঙ্গালীরাই তাহাতে বিশেষ অংশ লইয়াছে।"

উপরে যাহা বলা হইয়াছে অনেক প্রদেশেই উহা সমান ভাবে খাটে। পঞ্জাব তাহার যাবতীয় উন্নতির জন্য বাঙ্গালার নিকটই ঋণী। একজন শিক্ষিত পঞ্জাবী বলিয়াছিলেন—

"When the country was involved in utter darkness Raja Rammohan Roy brought light to this country".

"এই আলোক পঞ্চনদ প্রদেশকে এতদূর উদ্ভাসিত করিল, যে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পর হইতে পঞ্জাবে পুনরায় জীবন্ত ভাব লক্ষিত হইল। যে আর্য্যধর্ম্ম পঞ্জাবের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছে উহা ব্রাহ্মসমাজের আদর্শেই স্থাপিত হইয়াছিল।"

গোলোকনাথ চট্টোপাধ্যায়ের * চেষ্টায় পঞ্জাবের নানা স্থানে ইংরাজী স্কুল, দেশীয় ভাষার পাঠশালা, পুস্তকালয়, বক্তৃতা-গৃহ, চিকিৎসালয়, অনাথাশ্রম এবং বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্যামাচরণ বসু † (রায় বাহাদুর শ্রীশচন্দ্র বসু ও মেজর বামনদাস বসুর পিতা) মহাশয়ের দ্যোতনায় ও নবীনচন্দ্র রায়, সর্ প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখ সমাজের শীর্ষস্থানীয় প্রবাসী বাঙ্গালীদের সহযোগিতায় ১৮৮৫-৮৬ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস্-চ্যান্সেলার ছিলেন সর্ বিপিনকৃষ্ণ বসু। তিনিই উহাকে সুপ্রণালীবদ্ধ করেন। মধ্যপ্রদেশের বহু উন্নতির মূলে ছিলেন তিনি। বহু জনহিতকর কার্য্যের প্রেরণা দিয়াছিলেন তিনিই।

বোম্বাই-প্রবাসের সময় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁহার পত্নীর প্রভাবে ও আদর্শে ঐ প্রদেশের উচ্চস্তরের বহু নৈতিক ও সামাজিক উন্নতি সাধিত হয়।

মহীশূরের উন্নত শাসনপ্রণালী প্রস্তুত করিতে ও উহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে ও মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে সর্ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ও দেওয়ান বাহাদুর জ্ঞানশরণ চক্রবর্ত্তী মহীশূর গবর্ণমেণ্টকে অশেষপ্রকারে সাহায্য করিয়াছিলেন।

অযোধ্যা প্রদেশে (তখন অযোধ্যা স্বতন্ত্র ছিল, আগ্রা প্রদেশের সহিত মিলিত হয় নাই) রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়েরই বিশেষ চেষ্টায় ক্যানিং কলেজ ও অবধ তালুকদার্স এসোসিয়েশ্যন স্থাপিত হয়।

লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস্চ্যান্সেলার ছিলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী। তিনিই উহাকে সুপ্রণালীবদ্ধ করেন।

---

* গোলোকনাথ ১৭ বৎসর বয়সে কলিকাতার পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া পঞ্জাবে উপস্থিত হন। তথায় ১৯ বৎসর বয়সে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। কপূরতলার রাজকুমার সর্ হরনাম সিংহ অহলুবালিয়া তাঁহার জামাতা ছিলেন। কুমার সর্ মহারাজকুমার সিংহ, বড়লাটের শাসনপরিষদের ভূতপূর্ব্ব মেম্বার, কুমার দলীপ সিংহ, পঞ্জাব হাইকোর্টের জজ, তাঁহার দৌহিত্র। বাঙালীর শোণিত ইহাদের শিরায় প্রবাহিত।

† পঞ্জাবের যাবতীয় জনহিতকর অনুষ্ঠানে তাঁহার সহযোগিতা ছিল। তাঁহাকে শিক্ষার ক্ষেত্রে ঐ প্রদেশের ডেভিড হেয়ার বলা হইত।

যুক্তপ্রদেশে প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও সার্‌দাপ্রসাদ সান্যাল মিওর কলেজ স্থাপনের মূলে। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের চিন্তা প্রথমে এই শেষোক্ত ভদ্রমহোদয়ের চিত্তে উপস্থিত হয় ও তিনি তৎকালীন লাটসাহেব সর্ আলফ্রেড লায়েলকেকে উহার পন্থা বলিয়া দেন।

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের (বর্ত্তমান যুক্ত প্রদেশের) গবর্ণমেণ্ট যখন আগ্রা কলেজ তুলিয়া দিতে মনস্থ করেন, সে সময় আগ্রার সবজজ্ অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ডাঃ সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা) মহাশয়ের ঘোরতর আন্দোলনের ফলে উহার তত্ত্বাবধান এক বোর্ড অব ট্রষ্টীর হস্তে ন্যস্ত হয়। কলেজ মৃত্যুর মুখ হইতে মুক্তি পায়। আগ্রায় এখন এক বিশ্ববিদ্যালয় হইয়াছে। ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র বসু তিন বৎসরের জন্য উহার ভাইস্-চ্যান্সেলার মনোনীত হন। ইনি এই পদ দ্বিতীয় বার শোভিত করেন। তাঁহা অপেক্ষা যোগ্য ভাইস্-চ্যান্সেলার তাঁহার আগে কেহ হন নাই। এ বৎসর রেভরেণ্ড জে. সি. চাটুজ্যে উঁহার স্থলে ভাইস্-চ্যান্সেলার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

উপরোক্ত সকল প্রদেশে বাঙ্গালীরাই প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশ করেন ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রথম উন্মেষ বাঙ্গালীদের দ্বারাই হয়। প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতা ভুলিয়া সমগ্র ভারতকে ভালবাসিতে, উহার স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিতে আমরাই শিক্ষা দিয়াছিলাম্। আমরাই "বন্দেমাতরমে"র রচয়িতা। পৃথিবীর কোন জাতীয় সঙ্গীত উহার সমকক্ষ নহে, ভাবে কিংবা ভাষায়। কংগ্রেস প্রথমতঃ বাঙ্গালীদেরই দ্বারা স্থাপিত ও পরিপোষিত, যদিও হিউম ও কটনের মনে উহার প্রথম পরিকল্পনা উদিত হয়। এখন অবস্থা উল্টা দাঁড়াইয়াছে।

হিন্দুধর্ম্মকে পূর্ণজীবিত করিবার জন্য ভারতের অনেক প্রদেশে বাঙ্গালীরা বহু ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন। বিধর্ম্মী দ্বারা বিধ্বস্ত মথুরা বৃন্দাবনের পুনর্গঠন ও মন্দিরাদি স্থাপন বাঙ্গালীদের দ্বারাই হইয়াছিল। শ্রীশ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম্মের বার্ত্তা বাঙ্গালীরাই এই সকল দেশে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

যে আর্য্যসমাজের প্রভাব আজ পঞ্জাবের ধর্ম্মপরিবর্ত্তনের স্রোত রুদ্ধ করিয়াছে, যাহার শিক্ষায় উহার এরূপ সামাজিক ও নৈতিক উন্নতি হইয়াছে, সেই "আর্য্যধর্ম্ম" রাজা রামমোহন রায়ের সংস্কার-আন্দোলন হইতেই প্রেরণা পায়। উহার প্রবর্ত্তক স্বামী দয়ানন্দকে নবীনচন্দ্র রায় ও সারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য পঞ্জাবে আনয়ন করেন ও লাহোর ব্রাহ্মসমাজই তাঁহার প্রধান সহায় হয়।

আসামী, উড়িয়া, হিন্দী বাংলা ভাষার নিকট অশেষ প্রকারে ঋণী; আমরাই উহাদের নূতন করিয়া সঞ্জীবিত করিয়াছি। কিন্তু ঐ ভাষাভাষীরা এখন উহা স্বীকার করিতেও লজ্জা বোধ করে।*

---

* এক বিহারী সাহিত্য-সভায় সম্প্রতি বলা হইয়াছে, বিহারী সাহিত্য বাংলা সাহিত্যকে অনেক কিছু দান করিয়াছে। বিহারের নিজস্ব কোন পুরাতন সাহিত্য আছে কিনা জানা নাই। যদি মিথিলার কথা বলা হইয়া থাকে, তবে বিহারীদের মৈথিলী সাহিত্যের উপর যতটা দাবী আমাদেরও ততটাই। কারণ, উত্তর-ভারতের ভাষাগুলা একটা অন্যের সহিত এরূপ বেমালুম ভাবে মিশিয়া গিয়াছে, যে, তাহাদের সীমারেখা কোথায় টানিতে হইবে বলা কঠিন। আমরা যদি বিদ্যাপতিকে আমাদের কবি বলিয়া দাবী করি, সেটা অন্যায় হয় না। বিদ্যাপতির বাসভূমি বাংলার দ্বারে, "দ্বারবঙ্গো"। একালের মানচিত্র দেখিলে বুঝা যায় না, কিন্তু সেকালে "দ্বারভাঙ্গা" বঙ্গের দ্বারদেশেই ছিল। এখনকার 'সব লাল হো জায়েগা' বিহারী নীতিতে কি হইয়াছে জানি না, কিন্তু ২৫ বৎসর পূর্ব্বে মিথিলার অক্ষরগুলা ত প্রায় অর্দ্ধেক বাংলার মত ছিল। আমি এরূপ একটা পোষ্টকার্ড দেখিয়াছিলাম। আমার এক মৈথিলী ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম মৈথিলী অক্ষর অর্দ্ধেক বাংলা। ভাষাও তদ্রূপ। আমি ১৯১০ সালে বৈদ্যনাথধামে এক বিহারী পাণ্ডাকে তাহার শিশুপুত্রদের বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাংলার "প্রথম

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পরীক্ষায় লিখন ও রচনা পদ্ধতি (composition) শিক্ষার জন্য যে-সকল পুস্তক নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তন্মধ্যে দেখিলাম মৈথিলীতে "কপালকুণ্ডলা", মালায়ালমে "বিষবৃক্ষ"; উড়িয়াতে "কোনারক"। এগুলা নিশ্চয় ঐ নামের বাংলা পুস্তকের অনুবাদ। বাঙ্গালীরা কি তবে এই সকল ভাষাব রচনা-কৌশলও শিক্ষা দিবে?

ভাগ" হইতে অক্ষর-পরিচয় করাইতে দেখিয়াছি। তখন হিন্দী তাহাদের ভাষা ছিল না। বিহারের আদালতের কাগজপত্র "কয়থী"তে লিখিত হয়। কয়থী "দেবনাগরী" নহে, উহার বিকৃত রূপ; যেমন "মুড়িয়া" ইত্যাদি 'শঙ্কর' অক্ষর। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় তাঁহার বিদ্যাপতির মুখবন্ধে বলেন, "এক কালে মিথিলা ও গৌড় লিপি অভিন্ন ছিল। এখন উভয়ে কিছু প্রভেদ হইয়াছে।.. "বিদ্যাপতি গৌড় ভাষা কিছু ব্যবহার করিতেন।" "..মৈথিলী ভাষা কতক বাঙ্গালা ভাষার অনুরূপ।" প্রায় ৫০০ বৎসরের অধিক আমরা বিদ্যাপতিকে আমাদের কবি বলিয়া সম্মানিত করিয়াছি। নিজ বাসভূমে তাঁহাকে লোকে একপ্রকার ভুলিয়াই ছিল। আমরাই তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিস্মৃতি হইতে রক্ষা করিয়াছি। আমরাই তাঁহার কবিতা সংগ্রহ করিয়া ৬০ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত করিয়াছি।

পণ্ডিত মহাবীরপ্রসাদ দ্বিবেদী তাঁহার "হিন্দী ভাষা কী উৎপত্তি" নামক পুস্তকে বলেন, "বিহারী ভাষা যদ্যপি হিন্দী সে বহুত কুছ মিলতী জুলতী হয়, তথাপি বহ উসকী শাখা নহী। বহ বঙ্গালা সে অধিক সম্বন্ধ রখতী হয়; হিনদী সে কম।" চট্টগ্রামী কথিত ভাষা আমাদের পক্ষে বুঝা কঠিন, কিন্তু বিদ্যাপতির ভাষা শিক্ষিত অশিক্ষিত বাঙ্গালী সকলেই বুঝিতে পারে। যদি চট্টগ্রামের ভাষা বাঙ্গালা ভাষার একটা শাখা, তবে বিদ্যাপতির ভাষাই বা কেন আমাদের ভাষার একটি শাখা নহে ও তিনি আমাদের কবি কেন নহেন? আমেরিকার লংফেলো, স্কটল্যাণ্ডের বার্ন্‌স্ ও পঞ্জাবেব কিপলিংকে ইংরাজ কবি বলে কেন? ভাষা হিসাবেই না? কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে

প্রবাসে বাসকালীন বাঙ্গালীরা কত জনহিতকর কার্য্য করিয়াছে—কত স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, অনাথালয়, আতুরাশ্রম, কুষ্ঠাশ্রম, অন্নসত্র, মাতৃমন্দির (Meternity Hospital), পরিত্যক্ত-শিশু-আশ্রম (Foundling Hospital), কূপ, পুষ্করিণী, ঘাট, মন্দির ইত্যাদি স্থাপিত করিয়াছে, মনে করিলে হৃদয় আনন্দে ও আত্ম-গৌরবে উচ্ছলিত হইয়া উঠে।

উত্তর-ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য চিকিৎসাপ্রণালী আমরাই লোকপ্রিয় করিয়াছি। কারণ, ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে এ-সকল প্রদেশে সরকারী-বেসরকারী ডাক্তার বাঙ্গালীরাই ছিলেন।

আমরাই এ-সকল প্রদেশে আয়ুর্ব্বেদকে পুনর্জীবিত করিয়াছি। অশিক্ষিত অর্দ্ধশিক্ষিত হাতুড়েদের হাত হইতে উহাকে উদ্ধার করিয়াছি। আমরাই আয়ুর্ব্বেদের লুপ্তপ্রায় পুস্তকাবলীকে পুনর্মুদ্রিত করিয়া বিস্মৃতির গর্ভ হইতে উদ্ধার করিয়াছি। ভারতবর্ষে হোমিওপ্যাথির প্রচার আমরাই করিয়াছি।

মৈথিলী স্বতন্ত্র ভাষারূপে পরিগণিত হয়। মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ ঝা (এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস্-চ্যান্সেলার) প্রমুখ বিশিষ্ট মৈথিলীরা তাঁহাদের ভাষাকে হিন্দী বা ভোজপুরী হইতে পৃথক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টিত। এই প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ দ্বারভাঙ্গার মহারাজ পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি মৈথিলী অধ্যাপকের পদ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অনেক টাকা দিয়াছেন।

আর যদি বিহারী সাহিত্য-সভার সভ্যেরা বিহারী ভাষার অর্থ "ভোজপুরী" মনে করিয়া থাকেন, তবে উহা ত অপভাষা, উপভাষা বা Patois। তাহার সাহিত্য নাই। যাহার সাহিত্য কিছুই নাই, সে অন্যকে, বাঙ্গালা সাহিত্যকে কি দিবে? বিহারে এখন যে দুই-চারিটি কবি আছেন তাঁহাদের কবিতার ভাষা হিন্দী, কিন্তু নূতন 'ফরমানে' উহা শীঘ্র "হিন্দুস্থানী" হইয়া যাইবে। সম্প্রতি সংবাদপত্রে দেখিলাম, বিহারীরাই এই 'হিন্দুস্থানী'র বিপক্ষে আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছে।

যখন হিন্দুস্থানীরা উর্দ্দুর প্রেমে মশগুল, হিন্দীকে যুক্তপ্রদেশে আদালতের ভাষারূপে প্রচলিত করিবার প্রচেষ্টা সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালীরাই করিয়াছে। সে আজ ৭০ বৎসরের কথা।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দীতে প্রথম ক্ষুদ্র গল্প (short stories) লেখার সম্মান এক বাঙ্গালী মহিলারই প্রাপ্য।

পঞ্জাবী স্ত্রীলোকদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রথম হিন্দী পত্রিকা এক বাঙ্গালী রমণীই বাহির করেন।

বাঙ্গালীদের (কলিকাতা) বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের সকল প্রধান ভাষাকেই শিক্ষা ও পরীক্ষাব বাহন করিয়াছে। এরূপ উচ্চ আদর্শ অন্য কোন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নাই।*

কাশ্মীরের সকল প্রকার উন্নতির মূলে বাঙালীই ছিলেন। নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, ঋষিবর মুখোপাধ্যায়, ডাঃ আশুতোষ মিত্র, উহাকে নূতন রূপ দিয়াছেন। ঋষিবরবাবু উহার রেশম বিভাগের অধ্যক্ষ (Director of Sericulture) ছিলেন। কাশ্মীরের রেশম উৎপাদনের এত উন্নতি ও তাহার গুটি হইতে রেশম লাটাইয়ে জড়াইবার কারখানা (filature) যে পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, উহা তাঁহারই প্রচেষ্টার ফল। আশুতোষবাবুকে কাশ্মীরের "পুনর্জন্মদাতা" বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন, "নেপালের সহিত বাঙ্গালাব সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ, অনেক সময় মনে হয়, নেপাল আগে বোধ হয় বাঙ্গালীরই উপনিবেশ ছিল।" আমার কতকগুলি নেপালী ছাত্রকে নিজেদের মধ্যে "পরবতীয়া"য় কথা কহিতে শুনিলে অনেক সময় বোধ হইত উহারা বাংলায় কথা কহিতেছে। বাঙ্গালী ডাক্তার, এঞ্জিনীয়ার, শিক্ষক নেপালের অশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। আধুনিক নেপাল তাঁহাদের গঠিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

১৯৪০-এর আগস্টের মডার্ণ রিভিয়ুতে শ্রীযুত পি. রাজেশ্বর রাও লিখিয়াছেন যে, যদিও অন্ধ্রদেশ বাংলা দেশের সমীপবর্ত্তী নহে এবং বাঙ্গালীরা এদেশে আসিয়া বাস স্থাপনও করে নাই, তথাপি বাংলার প্রভাব এখানে যথেষ্ট বিদ্যমান; ব্রাহ্মসমাজ, রামকৃষ্ণ মিশন, বঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলন, স্বদেশী আন্দোলন এ-সকলই অন্ধ্রদেশকে নূতন জীবন দান করিয়াছে; শিক্ষার ক্ষেত্রে বাঙ্গালার প্রভাব সুস্পষ্ট; আজকার দিনেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দক্ষিণ-ভারত হইতে যত ছাত্র শিক্ষা পাইবার জন্য আসে, তন্মধ্যে অন্ধ্রদের সংখ্যাই অধিক; সর্ রাধাকৃষ্ণনের গৌরব গরিমা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরই কারণে; অধ্যাপক রামচন্দ্র রাও-এর অর্থশাস্ত্রের খ্যাতির মূলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই ছিল; তেলুগু ভাষায় বহু বাংলা উপন্যাসের অনুবাদ হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ছন্দহীন কবিতার (free verse) অনুকরণও আজ বহু অন্ধ্র নবীন কবিরা করিতেছেন।

এ স্থলে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে,

---

* যুক্তপ্রদেশে বাঙ্গালী বালকবালিকারা ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদির উত্তর তাহাদের মাতৃভাষায় দিতে পারিবে না, হিন্দী বা উর্দ্দু বা হিন্দুস্থানীতে দিতে হইবে এই নিয়ম হইয়াছে। ইংরাজীতে দিতে হইলে কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি লইতে হইবে। সেটা আবার তাঁহাদের মর্জ্জির উপর নির্ভর করে। অথচ এংলো-ইণ্ডিয়ানদের বেলায় সে বাঁধাবাঁধি নাই। যদি বলা হয়, বাংলার খাতা কে দেখিবে? সেটা কোন ওজর নহে। বাংলা ভাষার খাতা দেখিবার লোক পাওয়া যায়, আর অন্য বিষয়গুলার বাঙ্গালী পরীক্ষক পাওয়া যাইবে না? পরীক্ষার ফী বাঙালী ছেলেমেয়েরাও দেয়, যদি তাহাতে না কুলায় ২।৫ টাকা আরও অধিক ফী লইলেই হয়। অনেক বাঙালী শিক্ষক বা শিক্ষিত ব্যক্তি আছেন যাঁহারা বিনা পারিশ্রমিকে এ সকল খাতা দেখিয়া দিতে পারেন। বাঙালী পরীক্ষার্থী পরীক্ষার্থিনীদের ইংরেজীতে উত্তর দিবার একটা স্থায়ী আদেশ দিলেই হয়। প্রত্যেক বার অনুমতি লইবার লেঠা কেন? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কি উদার ব্যবস্থা, আর এ প্রদেশের শিক্ষা বিভাগ কি সংকীর্ণমনা!

মহেন্দ্রলাল সরকারের সায়েন্স এসোসিয়েশ্যন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় না থাকিলে অধ্যাপক রামনের কখনই রয়্যাল সোসাইটির ফেলোশিপ ও নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির সৌভাগ্য হইত না।

বাঙ্গালীর এ-সকল সৎকার্য্যের ইতিহাস ক্রমশঃ প্রায় বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়া যাইতেছে। উহাদের একটা বিশ্বস্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা আবশ্যক অন্যান্য প্রদেশেব লোকদের ও আমাদের পরবর্ত্তীদের বিজ্ঞপ্তিব জন্য। তাহারা যেন আমাদের ভুল না বুঝে। বাঙ্গালীর প্রবাসজীবন অন্যান্য প্রদেশবাসীর হিংসা, দ্বেষ বা অবজ্ঞার বস্তু না হইয়া বরং তাঁহাদের শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা আকর্ষণ করুক ও বাঙ্গালী উহা বাংলার ইতিহাসের একটা গৌরবজনক অধ্যায় বলিয়া মনে করুক, ইহাই আমাদের সকলের ইচ্ছা।

এ-কার্য্য এক বা দুই জনের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না। যদি প্রত্যেক বাঙ্গালী (প্রবাসী বা বঙ্গবাসী) সহায়তা করেন ও যে কোন প্রদেশের গ্রাম বা নগর বা বিভাগের সহিত তাঁহারা সুপরিচিত তথাকার বাঙ্গালীদের সৎকার্য্যের কাহিনী সংক্ষেপে লিখিয়া পাঠান, তবে সংস্কৃতি, সভ্যতা; শিক্ষা, আহার-বিহার, রাজনীতি, সমাজনীতির ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর কৃতিত্বের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিত হইতে পারে।

এই উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নাবলী প্রকাশিত হইল। "প্রবাসী"র পাঠক-পাঠিকাদের, তাঁহাদের বন্ধুবান্ধবদের ও বঙ্গদেশের সুসন্তানদের—যাঁহারা জন্মভূমির মুখোজ্জ্বল দেখিতে চাহেন—নিকট সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এই স্মৃতি-মন্দিরের এক-একখানা ইষ্টক সংগ্রহ করিয়া উহা নির্ম্মাণে সহায়তা করুন।

যিনি যে-বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারেন বা জ্ঞাত আছেন, উহার সঠিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রবাসী-সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। খামের শীর্ষে "বঙ্গের বাহিরে বাঙালীর কৃতি" এই কথাগুলি লিখিয়া দিলে পত্রগুলি প্রবাসী আপিসের পত্রস্তূপ হইতে বাছিয়া লইতে সুবিধা হইবে। লেখকরা যে-সকল প্রশ্নের উত্তর দিবেন তাহার নম্বর দিতে ভুলিবেন না। প্রত্যেক পত্রের শিরোদেশে প্রদেশের নাম নিশ্চয় দিবেন, যথা—আসাম, উড়িষ্যা, বিহার ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য, এই লেখাগুলি সমস্তই প্রবাসীতে ছাপিবার কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইতেছে না। লেখাগুলি একখানি গ্রন্থের উপকরণরূপে রক্ষিত হইবে।

যিনি যাহা পাঠাইবেন, অনুগ্রহ করিয়া রেজিষ্টরি করিয়া পাঠাইবেন। স্বতন্ত্র রসীদ দেওয়া বা ডাকযোগে স্বতন্ত্র প্রাপ্তিস্বীকার করা হইবে না।

ফোটোগ্রাফ পাঠাইলে, তাহাও সাদরে গৃহীত হইবে;কিন্তু তাহা ফেরত দিতে পারা যাইবে না।

"বঙ্গের বাহিরে বাঙালীর কৃতি" সম্বন্ধে বর্তমান লেখকের আরও প্রবন্ধ পরে প্রকাশিত হইবে।

প্রশ্নাবলী

১। আপনাদের প্রদেশে, জেলায় বা নগরে বাঙালীরা সে-দেশের লোকেদের শিক্ষার জন্য কি করিয়াছেন?

২। যে বাঙালী শিক্ষকেরা তাঁহাদের জীবন সে-প্রদেশের যুবকদের মানসিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য উৎসর্গ করিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম ও অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

৩। আপনাদের প্রদেশের বাঙালীরা শিক্ষা, নীতি, ধর্ম্ম বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে কি পুস্তকাবলী জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য প্রণয়ন ও প্রকাশিত করিয়াছেন।

৪। আপনাদের প্রদেশে বাঙালী দ্বারা প্রকাশিত বা সম্পাদিত সংবাদপত্র—দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ইত্যাদির নামধাম।

৫। আপনাদের প্রদেশের প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য বাঙালীর প্রচেষ্টা।

৬। জন-স্বাস্থ্যের উন্নতিসাধন ও সামাজিক দুর্নীতি দূরীভূত করিবার নিমিত্ত বাঙালীরা কি চেষ্টা করিয়াছেন।

৭। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিকিৎসা (এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক ও আয়ুর্ব্বেদিক) বিস্তারে বাঙালীর উদ্যম।

৮। চিকিৎসালয়, অনাথ আশ্রম, কুষ্ঠাশ্রম, আতুরাশ্রম, নারীরক্ষা-আশ্রম প্রভৃতি কত ও কোন্ স্থানে স্থাপন করিয়াছেন?

৯। জনসাধারণের সুবিধার জন্য কত পথঘাট প্রস্তুত করিয়াছেন ও কূপ পুষ্করিণী ইত্যাদি খনন করিয়াছেন?

১০। কত পুস্তকালয়, সভাসমিতি সে-দেশের-জনসাধারণের উপকারার্থ স্থাপিত করিয়াছেন?

১১। সাধারণের উপকারার্থে কত হাট-বাজার বাগান ইত্যাদি দান করিয়াছেন?

১২। স্থাপত্য গৃহ-নির্ম্মাণ ইত্যাদিতে কি পরিবর্ত্তন আনিয়াছেন?

১৩। সে-প্রদেশীয়দের আহার বিহার, পোষাক ও পরিচ্ছদে কি উন্নতি সাধন করিয়াছেন?

১৪। চারুশিল্পে (painting & sculpture) স্বর্ণ রৌপ্য কাংস্য ও বস্ত্রশিল্পে বাঙালীদের প্রভাব কি পরিমাণে বিদ্যমান?

১৫। ব্যবসায়, বাণিজ্য ও কৃষি ইত্যাদির জন্য তাঁহারা কি করিয়াছেন?

১৬। সঙ্গীত নৃত্যকলা ইত্যাদিকে ভদ্রসমাজে প্রচলিত ও শ্রদ্ধেয় করিতে তাঁহাদের প্রচেষ্টা কতটা?

১৭। সামাজিক নৈতিক ও রাজনৈতিক জাগরণের জন্য বাঙালীরা কত ত্যাগ স্বীকার

১৮। শাসনকার্য্যে ও বিচারাসনে ন্যায়ের উচ্চ আদর্শ রক্ষায় বাঙালীরা কিরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন?

১৯। রঙ্গালয়ে এবং ছায়াচিত্র-জগতে (সিনেমায়) বাঙালীরা ভারতকে কি দিয়াছেন?

২০। বিজ্ঞান, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব ইত্যাদির গবেষণায়, বাঙালীর অংশ।

২১। ভারতের সর্ব্বপ্রদেশের সাহিত্যের উন্নতির জন্য বাঙালীরা বা বাঙালীর সাহিত্য কতটা সাহায্য করিয়াছে।

১৩৪৭ ফাল্গুন

বঙ্গের বাহিরে বাঙালীদের গণনা

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি সর্ লালগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গের বাহিরের সমুদয় বাঙালীকে, তাঁহারা সেন্সসের গণনাকারীদের প্রশ্নের উত্তর যে ভাষাতেই দিন্ না কেন, তাঁহাদের মাতৃভাষা যে বাংলা তাহা স্পষ্ট করিয়া জানাইতে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন। মধ্যপ্রদেশের ও যুক্তপ্রদেশের কোন কোন অঞ্চলে "বাঙ্গালী" (Bangali) নামক একটি অবাঙালী উপজাতি আছে। এই Bangali ও Bengali যাহাতে এক বলিয়া ভ্রম না হয়, সেই জন্যও বঙ্গের বাহিরের বাঙালীদের মাতৃভাষাটি স্পষ্ট করিয়া বলা আবশ্যক।

১৩৪৯ আশ্বিন

সর্ লালগোপাল মুখোপাধ্যায়

এলাহাবাদ-নিবাসী সর্ লালগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যু অকালে হয়েছে বলা না চল্‌লেও তিনি যেরূপ কর্ম্মিষ্ঠ ছিলেন তাতে তাঁর দ্বারা সমাজ আরো বহু বৎসর উপকৃত হবে, আশা ছিল। তিনি মুন্সেফী থেকে আরম্ভ ক'রে এলাহাবাদ হাইকোর্টের জজ হয়েছিলেন এবং তার প্রধান বিচারপতির কাজও অস্থায়ী ভাবে কিছু কাল ক'রেছিলেন। তিনি যখন হাইকোর্টের কাজ থেকে অবসর নেন, তখন সর্ তেজ বাহাদুর সাপ্রু প্রমুখ হাইকোর্টের আইনজীবীরা তাঁর সুবিচারশক্তির ও আইনের গভীর ও বিস্তৃত জ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা করেন। বলা বাহুল্য, তাঁর ভদ্রতার প্রশংসাও তাঁরা করেছিলেন। হাইকোর্টের কাজ থেকে অবসর নেবার পর তিনি কিছু কাল কাশ্মীর ও জম্মু রাজ্যের বিচার বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন।

কানপুরের ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেন এবং তিনি প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের কর্ণধার ছিলেন। ডাক্তার সেন, সুখের বিষয়, এখনও আমাদের মধ্যে আছেন। লালগোপালবাবুর মৃত্যুতে প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের প্রভূত ক্ষতি হ'ল। তাঁর স্থান নেবার ঠিক লোক এখন কাউকে দেখছি না। বয়ঃকনিষ্ঠদিগকে তাঁর কাজ চালিয়ে নিতে হবে। এলাহাবাদে শেষ যেবার প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশন হয়, গোরখপুরে যখন অধিবেশন হয ও কলিকাতার যখন হয়, তখন এবং অন্য অনেক উপলক্ষ্যে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসবার সুযোগ ও সৌভাগ্য হ'য়েছিল। তিনি সব সময়ই এরূপ নম্র, অমায়িক ও ভদ্র ব্যবহার করতেন যে, তাতে খুবই সঙ্কোচ বোধ হ'ত। একবার এলাহাবাদে এই রকম সঙ্কোচ প্রকাশ করায় তিনি ব'লেছিলেন, "আমার ভাই জয়গোপাল আপনার ছাত্র ছিলেন, আমিও আপনার ছাত্র হ'তে পারতাম।" বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। বাংলা উৎকৃষ্ট পুস্তক-সমূহের অ-বাঙালীদের মধ্যে বহুল প্রচার উদ্দেশ্য তিনি সেগুলি দেবনাগরী অক্ষরে ছাপবার পক্ষপাতী ছিলেন—যত দূর মনে পড়ছে কলকাতায় প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতিরূপে তাঁর অভিভাষণে নাগরীতে বাংলা বই ছাপবার প্রস্তাব ক'রেছিলেন। তিনি একবার একখানি উৎকৃষ্ট ইংরেজী বই বাংলায় অনুবাদ করবার ইচ্ছা প্রকাশ ক'রেছিলেন—কি বই তা এখন মনে পড়ছে না। তিনি অনুবাদ শেষ ক'রে রেখে গিয়ে থাকলে তা যথাসময়ে প্রকাশিত হবে, আশা করি।

তিনি ধর্ম্ম ও সামাজিক বিষয়ে উদারমতাবলম্বী ছিলেন। ভগবদ্‌গীতার তিনি নিষ্ঠাবান্ ভক্ত ছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ শ্রীমতী রমা স্বর্গত বৈজ্ঞানিক শিল্পী শরচন্দ্র দত্তের কন্যা। মুখোপাধ্যায়-মহাশয়ের পত্নীর মৃত্যুর পর শ্রীমতী রমাই তাঁর পরিবারের কর্ত্রীত্ব করতেন। চিত্রকলায় শ্রীমতী রমার দক্ষতার নানা নিদর্শন দেখেছি; তার মধ্যে তাঁর শ্বশুর মহাশয়ের আলেখ্য একটি। তিনি পুত্রবধূর চিত্রকলা ও নানাবিধ কারুশিল্পের গুণগ্রাহী ও উৎসাহদাতা ছিলেন।

আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে বাঙালী, ছাত্রছাত্রীদের মাতৃভাষা শিক্ষা ও মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভের বাধা দূর করবার তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রেছিলেন।

বাঙালির ব্যবসা

১৩১৮ আশ্বিন

হরিদাস চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মধ্যপ্রদেশের খাণ্ডোয়ানগরে ওকালতি করেন। তিনি অনেক দিন হইতে উক্ত প্রদেশে খেজুর গুড়ের কারবার করিতে চেষ্টা করিতেছেন। তথায় খেজুর গাছ অনেক হয়, কিন্তু তথাকার লোকেরা উহার রস সংগ্রহ করিয়া গুড় প্রস্তুত করে না ও করিতে জানেনা। তিনি হোলকার রাজ্যে এবং খাণ্ডোয়া জেলায় কয়েকটি গ্রাম ইজারা লইয়াছেন। তথায় খেজুর গুড়ের কারবারে তিনজন বাঙ্গালীকে অংশীদার লইতে চান। তাঁহাদিগকে উহার কোন না কোন গ্রামে থাকিতে হইবে ও প্রত্যেককে দুই জন করিয়া শিউলি বা গাছী সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্ত হরিদাস বাবুকে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলে জানা যাইবে:—

Babu Haridas Chatterjee.
Pleader,
Khandwa, C. P.

১৩২৫ বৈশাখ

বঙ্গের বাহিরে বাঙালীর সম্মান

[হরিদাস চট্টোপাধ্যায়]

সম্প্রতি বেরার ও মধ্যপ্রদেশে যে প্রাদেশিক রাজনৈতিক কন্‌ফারেন্স হইয়া গিয়াছে, তাহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়। বঙ্গের বাহিরে বাঙালী স্বদেশবাসীর নিকট হইতে এই সম্মান পাইয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়। কিন্তু আমরা প্রধানতঃ সে কারণে এই খবরটি উল্লেখ করিতেছি না। ভারতবর্ষের এক প্রদেশের লোক বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষ্যে অন্যপ্রদেশে গিয়া বসবাস করেন, তাঁহাদের ব্যবহারের আদর্শ এই হওয়া উচিত, তাঁহারা তথাকার পুরুষানুক্রমিক স্থায়ী বাসিন্দাদের সহিত সম্পূর্ণ একযোগে কাজ করিবেন ও স্বতন্ত্র শ্রেষ্ঠ জীবের মত ব্যবহার করিবেন না। যেসব বাঙ্গালী বাহিরে গিয়াও ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশবাসী কর্ত্তৃক আদৃত ও সম্মানিত হন, তাঁহারা এই আদর্শ অনুসারে অনেকটা চলিতে পারিয়াছেন মনে করিয়া আমরা প্রীত হই।

শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মধ্যপ্রদেশে ও কোন কোন দেশী রাজ্যে খেজুর গুড় উৎপাদনের ব্যবসা চালাইবার জন্য অনেক বৎসর হইতে চেষ্টা করিতেছেন।

১৩২২ কার্ত্তিক

দেশী ফটোগ্রাফী সরঞ্জামের কারবার

শ্রীযুক্ত সহস্রবুদ্ধি নামে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গ্র্যাজুয়েট বিলাতে গিয়া ম্যাঞ্চেস্টার টেক্‌নোলজিক্যাল ইনস্‌টিটিউট হইতে ফটো-মেকানিক্স বিষয়ে অনার্স কোর্সে প্রথম পুরস্কার পাইয়া পাশ হন এবং লণ্ডনের পলিটেক্‌নিক ল্যাবরেটারীতে এক বৎসর কাজ করেন। ভারতে ফিরিয়া পুনার ফার্গুসান কলেজের ল্যাবরেটারীতে তিনি দেশের আলো ও তাপের সম্পর্কে ফটোগ্রাফীর অবস্থা পর্য্যালোচনায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি এক্ষণে পুনায় কারখানা করিয়া ফটোগ্রাফের শুষ্কপ্লেট ও ব্রোমাইড কাগজ প্রস্তুত করিতেছেন। তিনি ব্যবহৃত নেগেটিভের কাচগুলিকে পুনরায় শুষ্কপ্লেটে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতে পারেন। ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর অনেক লক্ষ টাকার ফটোগ্রাফী সরঞ্জাম বিদেশ হইতে আমদানী হয়; তাহার কিয়দংশ টাকা দেশে থাকিলে দেশেরই অন্নসমস্যা মিটে। সুতরাং সকলের উচিত এই নব উদ্যমের যথাসাধ্য পৃষ্ঠপোষণ করা।

১৩২২ পৌষ

মহীশূরের সাবানের ব্যবসায়।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি এ, পূর্ব্বে কলিকাতার একটি সাবানের কারখানাব পরিচালক ছিলেন। তিনি মহীশূররাজ কর্ত্তৃক ঐ রাজ্যে প্রাপ্তব্য চর্ব্বি ও তৈল হইতে সাবান প্রস্তুত করা যায় কি না, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শুনিয়া সুখী হইলাম যে তিনি "সান্‌লাইট্" সাবানের মত সাবান প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার প্রস্তাব অনুসারে মহীশূর রাজ বাঙ্গালোরে একটি সাবানের কারখানা স্থাপন করিবেন।

স্বদেশী ঘড়ী

বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কোঙ্কণ প্রদেশে মাল্‌ওান নামক স্থানে শিবরাম দাদাবা মিস্ত্রী নামে একজন সূত্রধর বহু অর্থব্যয় ও অবিরত পরীক্ষার পর একটি ঘড়ীর কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। শিবরাম বিদেশে যান নাই, কোন পাশ্চাত্য কারিগরী শিক্ষা পান নাই। তিনি নিজেই ঘড়ীর

প্রায় সমস্ত অংশ নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এবং নির্ম্মাণ করিবার সমুদয় যন্ত্রও প্রস্তুত করিয়াছেন। কেবল স্প্রিং প্রস্তুত করিতে পারেন নাই। আপাততঃ কোন মুলধনী যদি তাঁহাকে সুইট্জারল্যাণ্ড হইতে স্প্রিং আমদানী করিবার টাকা দেন, এবং ঐ দেশ হইতে কাহাকেও স্প্রিং নির্ম্মাণ শিখাইয়া আনেন, তাহা হইলে দেশে একটি স্থায়ী কারবার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। স্প্রিঙ্গের কারবার খুব লাভজনক। ২০ টাকার ভাল ইস্পাতে ২০০০ টাকার স্প্রিং হইতে পারে। শিবরাম ১৫।২০ টাকার যেসব ঘড়ী প্রস্তুত করিয়াছেন, সেগুলি দেখিতে সুন্দর, এবং বেশ কাজ দেয়। এই ঘড়িগুলি পকেট ঘড়ী নয়, বাজা ঘড়ী বা ক্লক।

১৩২৩ আশ্বিন

হেমেন্দ্রমোহন বসু।

পরলোকগত হেমেন্দ্রমোহন বসু বঙ্গে সুগন্ধি দ্রব্যের ব্যবসায় চালাইয়া দেশের কতক টাকা দেশে রাখিবার পথ খুলিয়া দিয়াছিলেন। বাংলা ছাপাখানা হইতে পরিষ্কার ছাপা যাহাতে হয়, তদ্রূপ চেষ্টা ও আয়োজন করিয়া তিনি বাঙালীদের ছাপাখানাগুলির উন্নতির অন্যতম কারণ হইয়াছিলো। বাইসিকেল, ফোনোগ্রাফের রেকর্ড গ্রহণ, মোটর-কার প্রভৃতির ব্যবসা, তিনিই বাঙালীদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে করিয়াছিলেন কি না জানি না, কিন্তু তিনি যে এসব বিষয়ে অন্যতম অগ্রণী ছিলেন, তাহা নিশ্চিত। তিনি বুদ্ধিমান্, দানশীল, দয়ালু, সৎকর্ম্মানুরাগী, স্বদেশপ্রেমিক লোক ছিলেন। স্বদেশী মেলার জন্য তিনি খুব পরিশ্রম করিতেন। তাঁহার বেশ সামাজিকতা ছিল। তিনি বেশ "খোলাপ্রাণের" লোক ছিলেন। চটিয়া গেলে কর্ম্মচারীদিগকে খুব হয়ত বকিয়া দিতেন, কিন্তু কখনও কাহারও অন্ন মারিতে চাহিতেন না।

১৩২৮ অগ্রহায়ণ

নেপালে বাঙালী অস্ত্রনির্মাতা

আমরা এই পত্রখানি পাইয়াছি,—

বাবু রাজকৃষ্ণ কর্ম্মকার গত ৩রা অগ্রহায়ণ ১৩২৭ সালে ১০৫ বৎসর বয়ঃক্রমে নেপাল রাজ্যে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইতি গত ৪০ বৎসরের অধিক নেপাল রাজ্যে চাকরী করিয়া রাজ্যের কলকারখানার বিশেষ উন্নতি করিয়াছিলেন; এবং বহুবিধ নূতন

কার্‌খানা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে মেশিন গান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি তথাকার অশিক্ষিত নেপালীদিগকে সুদক্ষ কারিকর করিয়া দিয়া আসিয়াছেন। ইহাঁর ন্যায় সুদক্ষ ও বহুদর্শী মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার কর্ম্মকার জাতির মধ্যে আর কখনও জন্মিবে কি না সন্দেহ। ইহাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী 'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী, নামক পুস্তকে সন্নিবেশিত আছে। ইহাঁর মৃত্যুকালে মহারাজা সার চন্দ্রসম্‌সের জঙ্গ বাহাদুর রাণা, তথাকার ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া ১০০ শত দুগ্ধবতী গাভী দান করিয়াছেন। মৃত ব্যক্তির স্বর্গ কামনায়ও দেশে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিবার জন্য ইহাঁর পুত্রকে ১০০০্ টাকা দান করিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ হতভাগ্য পুত্র ইহাঁর মৃত্যুকালে তথায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। ইতি—

বিনীত
শ্রীহরিদাস কর্ম্মকার,
৺রাজকৃষ্ণ কর্ম্মকারের পুত্র,
বেলুড় (হাওড়া)।

এমন একজন বাঙ্গালী শিল্পীর বিয়োগে আমরা দুঃখিত হইলাম। —'বঙ্গবাসী'।

ক্যাপ্টেন রাজকৃষ্ণ কর্ম্মকার মহাশয়ের সচিত্র জীবনচরিত প্রথমে ১৩২১ সালের চৈত্র মাসের প্রবাসীতে বাহির হয়। উহার লেখক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস পরে উহা প্রবাসীর চিত্রসহ তাঁহারই লিখিত "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" নামক অপূর্ব্ব গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেন।

১৩৩৪ জ্যৈষ্ঠ

বেঙ্গাল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক ফেল হওয়া

বেঙ্গাল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ায় কেবল যে তাহার অংশীদারদের ও যাহাদের টাকা গচ্ছিত ছিল, তাহাদের ক্ষতি হইয়াছে তাহা নহে, বাঙ্গালীর চালিত কারবারের প্রতি লোকের বিশ্বাস কমিয়া যাওয়ায় সমগ্র বাঙালী জাতির ক্ষতি হইয়াছে। ইংরেজদের এবং অন্য সবজাতিরই কোন না কোন ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ার সংবাদ মধ্যে মধ্যে শোনা যায়। কিন্তু তাহাদের ব্যবসাবাণিজ্য বহুবিস্তৃত, এবং সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচালিত কার্‌বার তাহাদের অনেক আছে। এই জন্য দু একটা কার্‌বার দেউলিয়া হইলেও তাহাদের জাতীয় অক্ষমতা বা অন্য বদনাম হয় না। আমাদের তেমন কার্‌বার অল্পই থাকায় আমাদের উপর অবিশ্বাস লোকের সহজেই হয়। মান্দ্রাজের আরবুথ নটরা যখন ফেল হয়, তখন প্রতারণা অপরাধে তাহাদের বড় সাহেবের জেল হইয়াছিল। তিন বৎসর আগে ইংরেজদের এলায়েন্স ব্যাঙ্ক ফেল যে ব্যক্তিবিশেষের জুয়াচুরীর জন্য হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। ইংরেজদের ব্যাঙ্ক ফেল এইরূপ আরও বিস্তর হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে তাহাদের জাতীয় অক্ষমতা বা অবিশ্বাস্যতার কথা উঠে নাই। বেঙ্গাল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ার কারণ কাহারও জুয়াচুরী, এরূপ অপবাদ উহার শত্রুরাও দেয় নাই। সম্প্রতি যে ব্যাঙ্ক্ অব্ তেইওয়ান নামক বৃহৎ জাপানী ব্যাঙ্ক টাকা দেওয়া বন্ধ করে, তাহাতেও জাপানীদের কোন বদ্‌নাম হয় নাই। অধিকন্তু জাপান স্বাধীন দেশ বলিয়া উহার গবর্ন্মেন্টের আদেশ ও সাহায্যে উক্ত ও

অন্যান্য সব জাপানী ব্যাঙ্কের কাজ পূর্ব্ববৎ চলিতেছে।

অবশ্য, আমাদের দেশী মহাজনী কারবার না চলিলে বিদেশীরা খুব খুসী হয়। যখন পঞ্জাবের পীপলস্‌ ব্যাঙ্ক ফেল হয়, তখন কোন একটি সহরের ইংরেজরা ভোজ দিয়াছিল এবং যে-প্রদেশে ঐ সহর অবস্থিত তাহার লাট ভোজে-সভাপতির কাজ করিয়াছিল।

বাঙালীদের ব্যাঙ্ক প্রভৃতি খুব বেশী দক্ষতা, হুশিয়ারী ও সততার সহিত চালান উচিত, অংশীদার ও ডিপজিটরদের স্বার্থরক্ষার্থ, দেশের কল্যাণ ও সুনামরক্ষার জন্য, এবং শত্রুদের বিদ্রূপ ও উল্লাসের কারণ না জন্মাইবার নিমিত্ত।

বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের ডিরেক্টারদের রিপোর্টে দেখা যায়, গত এপ্রিল মাসে ব্যাঙ্ক হইতে খুব বেশী লোক খুব বেশী টাকা উঠাইয়া লইতে চাওয়ায় এবং ততবেশী টাকা উহার হাতে না থাকায়, টাকা দেওয়া বন্ধ করিতে হয়। মুখে মুখে গুজব রটিয়াছিল এবং পরে খবরের কাগজেও দেখা গেল, যে, রাজনৈতিক দলাদলির জন্য ইহা ঘটিয়াছে। ইহা সত্য না হইলেই সন্তোষের বিষয় হইবে। বিস্তর নিরাপরাধ লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া এবং জাতীয় অযোগ্যতা সপ্রমাণ করিয়া রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা অতিশয়

ইহা কেহ বা কোন দল না করিয়া থাকিলেই সুখের বিষয়। এবম্বিধ ও অন্য সব আলোচনা ও অনুমান বন্ধ করিয়া এখন যাহাতে ব্যাঙ্কটি আবার খোলা হয় ও ভাল চলিতে পারে, তাহার আলোচনা ও চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য।

১৩৩৫ ভাদ্র

সমবায়-প্রচেষ্টা

সমবায় আন্দোলনের ইতিহাস খুব বেশী দিনের নহে। এই অত্যল্প কালের মধ্যে এই আন্দোলনের ফলে সকল দেশের সকল সমাজের সকল স্তরের লোকের যে উন্নতি হইয়াছে, তাহা সত্যই বিস্ময়কর। বিশেষ করিয়া পৃথিবীর কৃষকসমাজ এই আন্দোলনের সাহায্যে যেন পুনর্জ্জন্ম লাভ করিয়াছে। ফড়ে ও দালালদের নিকট দাদন লইয়া তাহারা তাহাদের কায়িক পরিশ্রমলব্ধ শস্যাদি নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় করিয়া এতকাল অর্দ্ধমৃত অবস্থায় কাল কাটাইতেছিল। ঋণের দায়ে তাহারা বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। সমবায় আন্দোলনের পত্তন হয় শুধু এই কৃষকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য। সমবায়-প্রচেষ্টায় যে-সকল কৃষকসমিতি যোগদান করিতেছে, তাহাদের জীবনযাত্রা যে কতদূর উন্নত ও সহজ হইয়াছে তাহার ইতিহাস বর্ত্তমান সংখ্যা "ভাণ্ডারে" বিশদভাবে দেওয়া হইয়াছে। আমাদের দেশের জনসাধারণ এখনও সমবায় আন্দোলন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানে না। বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতির উদ্যোগে "ভাণ্ডার" পত্রিকা বাহির হইতেছে। কয়েক বৎসর যাবৎ এই আন্দোলন সম্বন্ধে এই পত্রিকায় সহজবোধ্য ভাষায় নানা

প্রবন্ধ ও বিবরণাদি প্রকাশিত হইতেছে। এই আন্দোলন সম্বন্ধে যে ধীরে ধীরে আমাদের অজ্ঞতা দূর হইতেছে তাহার প্রমাণ বর্ত্তমান সংখ্যা "ভাণ্ডার"। ভারতবর্ষের, বিশেষ করিয়া বঙ্গদেশের, সকল সমবায় প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে বিবরণ এই পত্রিকায় দেওয়া হইয়াছে, এবং পৃথিবীর সকল দেশের সমবায় আন্দোলনের ইতিহাস প্রকাশ করিয়া নানা তুলনামূলক সংখ্যা ও তথ্য দ্বারা সমবায় প্রচেষ্টায় আমাদের স্থান কোথায় তাহা দেখান হইয়াছে।

এই সংখ্যার উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগুলির মধ্যে সর্ব্বপ্রথম নাম করা যাইতে পারে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সমবায়ের আদর্শ। গত ৭ই জুলাই এ্যালবার্ট হলে ষষ্ঠ আন্তর্জ্জাতিক উৎসব উপলক্ষ্যে বঙ্গীয় সমবায়সংগঠন সমিতি কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতির অভিভাষণ হিসাবে আচার্য্য রায় মহাশয় এই প্রবন্ধটি পাঠ করিয়াছিলেন। সমবায়ের মূলতত্ত্ব ও ইতিহাস, সমাজতন্ত্রবাদ প্রভৃতি প্রচেষ্টার সহিত সমবায়ের সম্বন্ধ এবং পৃথিবীব্যাপী সমবায়-প্রচেষ্টার ক্রম-পরিণতির সরল ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ যাঁহারা জানিতে চান, তাঁহারা এই প্রবন্ধটি পড়িতে পারেন। অন্যান্য প্রবন্ধগুলির মধ্যে "ক্যানাডায় সমবায়" (সচিত্র) ও বঙ্গীয় সমবায়সমিতিসমূহের রেজিস্ট্রার শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন মিত্র মহাশয়ের লিখিত "সমবায়-উপনিবেশ" (সচিত্র) প্রবন্ধদ্বয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ক্যানাডার কৃষকগণ সমবায়ের সাহায্যে বৃহৎ বৃহৎ বিক্রয়সমিতি স্থাপন করিয়া প্রতিপত্তিশালী ব্যবসায়িগণের সহিত যেভাবে প্রতিযোগিতা করিতেছে, তাহা ভ কৃষকগণের অনুকরণীয়।

১৩৩৫ ফাল্গুন

শশিভূষণ নিয়োগী

রেঙ্গুনের সওদাগর ও জনহিতৈষী স্বর্গীয় শশিভূষণ নিয়োগী মহাশয়ের প্রতি শ্রদ্ধা-প্রদর্শনার্থ গত ১৮ই জানুয়ারী তথায় একটি সভার অধিবেশন হইয়াছিল। রেঙ্গুনের মেয়র শ্রীযুক্ত মোহম্মদ রাফী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কলিকাতায় নিয়োগী মহাশয়ের মৃত্যু হয়। তিনি রেঙ্গুনের একটি সওদাগরী আফিসে অল্প বেতনের কেরাণীর পদে নিযুক্ত হইয়া তথায় গিয়াছিলেন। পরে স্বয়ং বড় বণিক হন। তিনি নানা সৎকাজে জীবদ্দশায় চারি লক্ষের উপর টাকা দান করিয়াছিলেন।

১৩৩৬ কার্ত্তিক

পরলোকগত শশীভূষণ নিয়োগী

অল্প বয়সে রেঙ্গুনের একটি সওদাগরী অফিসে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ নিয়োগী সামান্য চাকরীতে নিযুক্ত হন। তাহার পর তিনি নিজের একটি দোকান খুলেন। বুদ্ধিমত্তা, সততা ও পরিশ্রমের দ্বারা তিনি অর্থ সঞ্চয় করিয়া চালের কল, তেলের কল, ময়দার কল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত করেন। এখনও ব্রহ্মদেশে তাঁহার ময়দার কলই বৃহত্তম। তিনি নানা রকম লোকহিতকর কাজে বহু লক্ষ টাকা জীবিতকালেই দান করেন। কলিকাতায় তাঁহার বাসগৃহ তিনি দাতব্য চিকিৎসালয়ে পরিণত করিবার জন্য দান করিয়া গিয়াছেন। রেঙ্গুনের বৃহৎ একটি বাংলা জনহিতকর কার্য্যের জন্য দিয়া গিয়াছেন। রেঙ্গুনে বাঙালী ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য দুই বিদ্যালয়ে অনেক হাজার টাকা দান করিয়াছেন। বালকদের জন্য নির্ম্মিত বেঙ্গাল একাডেমী বিদ্যালয়ের হলের নামকরণ, তাঁহার নামে করা হইয়াছে। রেঙ্গুনের রামকৃষ্ণ মিশন, দুর্গাবাড়ী, হনুমান মন্দির, কোন কোন মাদ্রাসা ও অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠান তাঁহার নিকট হইতে সাহায্য পাইয়াছিল। তিনি সাদাসিদা মানুষ ছিলেন। সরকারী খেতাব বা জনতার বাহবার ভিখারী ছিলেন না। গরীবকে গরীব বলিয়াই তিনি দয়া করিতেন। এ বিষয়ে তাঁহার সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। এই কারণে যে ট্রাষ্টডীড্ দ্বারা তিনি দরিদ্র বিধবাদের সাহায্যের ব্যবস্থা করেন, এটর্নীকৃত তাহার মুসাবিদার "হিন্দু বিধবা" কথাদ্বয়ের হিন্দু শব্দটি তিনি কাটিয়া দিয়াছিলেন।

১৩৩৬ অগ্রহায়ণ

কুষ্টিয়ার মোহিনী মিল

কয়েকদিন হইল আমরা কুষ্টিয়ার ৺মোহিনী মোহন চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত মোহিনী মিল দেখিতে গিয়াছিলাম। ইহা খুব বড় কারখানা নয়, কিন্তু ইহাতে প্রস্তুত সুতা ও কাপড় উৎকৃষ্ট। ৬০ নং পর্য্যন্ত সুতা ও তাহার কাপড় এই মিলে প্রস্তুত হইতেছে, দেখিলাম। ৮০ ও ১১০ নম্বরের সুতা আমদানী করিয়া এখন তাহা হইতে কাপড় বুনান হয়। এরূপ সুতা এই মিলে ভবিষ্যতে প্রস্তুত হইবে।

এই মিলটির একটি বিশেষত্ব এই, যে, ইহার অধিকাংশ শ্রমিক ও কারিগর বাঙালী, এবং অনেকে নিকটবর্ত্তী গ্রামসকল হইতে আসিয়া কাজ করিয়া কর্ম্মান্তে প্রত্যহ বাড়ী ফিরিয়া যায়। তজ্জন্য তাহারা পারিবারিক জীবনের প্রভাবের বাহিরে চলিয়া যায় না।

১৩৪০ অগ্রহায়ণ

বাঙালীর তৈরি মোটর গাড়ী

অনেক দিন হইল, কলিকাতা মিউনিসিপালিটী শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দাসকে একখানি মোটর গাড়ীর নির্ম্মাণ করিবার ফরমাইস দিয়াছিলেন। তাহা প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা পুলিসের মোটর-যান বিভাগ উহা চালাইবার অনুমতি দিয়াছেন এবং রেজিস্টরীভুক্ত করিয়া উহার নম্বর দিয়াছেন ৩৫৯৭৭। এই মোটর গাড়ীটি নির্ম্মাণ করিতে অনেক সময় লাগিয়াছে এবং ইহা খুব উৎকৃষ্ট হয় নাই, কিন্তু বেশ চলন সই হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, উপযুক্ত মূলধন ও যন্ত্রাদি থাকিলে বাঙালী কারিকর মোটর গাড়ীর এঞ্জিন আদি সমুদয় অংশ প্রস্তুত করিয়া বাজারে প্রতিযোগিতায় নামিতে সমর্থ।

১৩৪১ ফাল্গুন

ব্যবসা-বাণিজ্যে বাঙালীর আত্মরক্ষা

ইংলণ্ডের লোকেরা স্বদেশে "বাই ব্রিটিশ" ("Buy British") নীতির অনুসরণ করে, ইংরেজের তৈরি জিনিষ পাইলে বিদেশী জিনিষ কেনে না। তথাকার যুবরাজ এই নীতির প্রধান পাণ্ডাগিরি করিয়াছেন। এদেশে মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন, "আমার গ্রামে যে জিনিষটি তৈরি হয়, তাহাই আমার স্বদেশী জিনিষ," অর্থাৎ তিনি সর্ব্বাগ্রে সেই জিনিষ কিনিবেন, তাহা না-পাইলে বা তাহা না-থাকিলে অন্য ভারতীয় জিনিষ কিনিবেন। অথচ আমরা দেখিতে পাই ও শুনিতে পাই, যে, বাংলা দেশে যদি কেহ বলে, "আমি আগে বঙ্গে বাঙালীর তৈরি জিনিষ কিনিব, তাহা না-থাকিলে বা না-পাইলে তবে অন্য প্রদেশের ভারতীয় জিনিষ কিনিব", তাহা হইলে তাহাকে সংকীর্ণমনা বলা হয়! যদিও দেখিতে পাই, এই কলিকাতা শহরে শিখরা বাঙালীদিগকে বয়কট করে, নিজেদের হোটেল, মুদিখানা, চিকিৎসা পর্য্যন্ত পঞ্জাব হইতে আমদানী লোকদের দ্বারা চালায়; গুজরাটী ব্যবসাদাররা নিজেদের দোকান ও ব্যাঙ্কের কেরানীটি পর্য্যন্ত অনেকটা গুজরাট হইতে আমদানী করে; কিন্তু বাঙালী নিজের শহরে ও গ্রামে বসিয়া যদি বাঙালীর ব্যবসা-বাণিজ্য রক্ষার ও বেকার বাঙালীদের অন্নের উপায়ের কথা ভাবে, তাহা হইলে সে হয় সংকীর্ণমনা! সংপ্রতি হাবড়া মিউনিসিপালিটিতে এইরূপ একটি প্রস্তাব ধার্য্য হইয়াছে, যে, যোগ্য বাঙালী থাকিলে চাকরি তাহাকেই দিতে হইবে, যোগ্য বাঙালী কণ্ট্রাক্টর থাকিলে তাহাকেই কণ্ট্রাক্ট দিতে হইবে, মিউনিসিপালিটির জিনিষপত্র খরিদ করিবার সময় বাঙালীর তৈরি জিনিষই কিনিবার চেষ্টা আগে করিতে হইবে। এরূপ প্রস্তাব আমরা ন্যায্য মনে করি। বঙ্গপ্রবাসী অবাঙালীদের ইহার বিরুদ্ধে

আন্দোলন করা উচিত নয়। বরং তাঁহাদের পক্ষে বঙ্গে স্থায়ী বাসিন্দা হইয়া যাওয়াই ভাল, যেমন স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর পূর্ব্বপুরুষেরা হইয়াছিলেন, পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্করের পূর্ব্বপুরুষেরা হইয়াছিলেন। বাঙালীরা এমন কথা বলে না যে, তাহারা অন্য প্রদেশের বা অন্য প্রদেশীয়দের জিনিষ কিনিবে না। বঙ্গের ও বাঙালীর তৈরি জিনিষ যা নাই, অন্য প্রদেশের ও প্রদেশীয় সেরূপ জিনিষ বাঙালী নিশ্চয় কিনিবে ও কেনে।

বাংলা দেশের ও বিহারের কয়লা না কিনিয়া বোম্বাই ও আহমেদাবাদের মিলওয়ালারা যে দক্ষিণ-আফ্রিকার কয়লা কেনে, তাহাতে ত আমাদের সমগ্রভারতীয় স্বদেশপ্রেমের শিক্ষাদাতারা কোন উচ্চবাচ্য করেন না!

১৩৪২ আষাঢ়

সিন্ধুর মিষ্টান্ন বিদেশে প্রেরণ

বাঙালীরা মনে করেন তাঁহাদের সন্দেশ রসগোল্লা প্রভৃতির সমান মিষ্টান্ন আর কোথাও নাই। তাহা সত্য কিনা তাহার বিচারক আমরা নই। কিন্তু বাঙালী যে মিষ্টদ্রব্যভোজনপরায়ণ তাহার প্রমাণ, একজন মিষ্টান্নবিক্রেতা বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, যে, গত বৎসর তিনি নয় লক্ষ টাকার সন্দেশ বিক্রী করিয়াছেন। বাঙালী যদি এতই সন্দেশপ্রিয় হন, তাহা হইলে কেবল নিজেই খাইবেন কি? বিদেশেও এমন করিয়া নানা মিষ্টদ্রব্য পাঠান, যাহাতে তাহা তথায় তাজা অবস্থায় পৌঁছিয়া বিক্রী হইতে পারে। তাহাতে অর্থাগম হইবে এবং এ ধারণাও বিদেশীদের হইতে পারে, যে, বাঙালীরা কেবল বোমা ও রিভলভারের গুলি এবং খবরের কাগজের অত্যন্ত তিক্ত তীব্র বা ঝাঁঝাল মন্তব্যের জন্যই বিখ্যাত নয়, মানুষকে 'মিষ্টমুখ' করাইতেও জানে।

সিন্ধুদেশের লোকেরা খুব উদ্যমশীল বণিক। পৃথিবীর এমন কোন বড় বন্দর নাই, যেখানে সিন্ধী বণিক দেখা যায় না। সিন্ধুদেশের শিকারপুরে যে মিষ্টান্ন প্রস্তুত হয়, সিন্ধী বণিকেরা তাহা টাট্‌কা অবস্থায় বিদেশে পাঠাইবার আয়োজন করিতেছে।

১৩৪২ আশ্বিন

কলিকাতা কর্পোরেশ্যন ও ট্রামওয়ে

গুজব রটিয়াছে, কলিকাতা মিউনিসিপালিটী কলিকাতার ট্রামওয়েগুলি কিনিয়া লইবেন। লইলে খুব ভাল হয়। পৃথিবীর অনেক বড় শহরের ট্রাম ও বাস্ তথাকার মিউনিসিপ্যালিটীর সম্পত্তি। কলিকাতাতেও তাহা হইলে লাভের টাকাটা দেশে থাকিবে।

চায়ের বিজ্ঞাপন

আমাদের বিজ্ঞাপন-কর্ম্মচারীকে বলা আছে, কি কি রকমের বিজ্ঞাপন তিনি লইবেন না। চায়ের বিজ্ঞাপন লইতে তাঁহাকে অতীত কালে কখনও নিষেধ করা হয় নাই, বর্ত্তমানেও করা হয় নাই। অন্য বিজ্ঞাপনের জন্য যে হারে আমরা টাকা পাই, চায়ের জন্যও সেই হারে পাই। আমি স্বয়ং চা-পানে অভ্যস্ত নহি, এবং সর্ব্বসাধারণ চা-পানে অভ্যস্ত হয়, ইহাও আমি চাই না। কিন্তু চাকে আমি মদ, তাড়ি, আফিং, গাঁজা প্রভৃতির সমশ্রেণীস্থ মনে করি না বলিয়া তাহার বিজ্ঞাপন ছাপিতে আমি নিষেধ করি নাই, করিবও না। অন্য সব বিজ্ঞাপনের মত চায়ের বিজ্ঞাপনে যাহা লেখা থাকে, তাহার সত্যাসত্যতার দায়িত্ব লইতে আমি অসমর্থ। দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতাদের।

১৩৪৩ আষাঢ়

প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য

পাবনা জেলার একটি অতি দরিদ্র ভদ্র পরিবারে প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। গত মাসে ৭৬ বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। কিছু দিন হইতে তিনি অতিরিক্ত রক্তের চাপে অসুস্থ ছিলেন। তাহারই ফলে সন্ন্যাস রোগে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি মৃত্যুর সপ্তাহ দুই পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্রকে বলিয়াছিলেন, যে, তাঁহার সময় আসিয়াছে, আর চৌদ্দ-পনের দিন মাত্র বাঁচিবেন, সেই জন্য বিশেষ কিছু কথা বলিবার নিমিত্ত তাঁহাকে ডাকাইয়াছেন।

আচার্য্য মহাশয় অতি দরিদ্র অবস্থা হইতে সকল দিকে উচ্চ অবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন। কেহ যদি দরিদ্র অবস্থায় জন্মিয়া কেবলমাত্র ধনী

হয়, এবং সেই ধনশালিতা যদি আকস্মিক ঘটনার বা চৌর্য্য প্রবঞ্চনার ফলে না ঘটে, তাহা হইলে সে কৃতিত্বও সামান্য নহে, বরং প্রশংসনীয়। কিন্তু আচার্য্য মহাশয়ের কৃতিত্ব শুধু দারিদ্র্য হইতে সচ্ছল অবস্থায় উপনীত হওয়াতে নয়। তিনি সততা, বুদ্ধিমত্তা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের দ্বারা মানুষের মতো মানুষ হইয়াছিলেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী জ্ঞানী সাধুপুরুষের যে-সকল লক্ষণ নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন—জ্ঞানে গভীরতা, প্রেমে বিশালতা, চরিত্রে সংযম, কর্ত্তব্যে নিষ্ঠা, ভগবদ্ভক্তি সমস্তই তাঁহার ছিল।

ছাত্রাবস্থায় তিনি বুদ্ধিমান ও বিশেষ কৃতী ছাত্র ছিলেন। ছাত্ররূপে তাঁহার সাধারণ শিক্ষা এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া পর্যন্ত হইয়াছিল। চিকিৎসা-বিদ্যা শিখিয়া তিনি এম-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং চিকিৎসকের কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। আমি যখন কলিকাতায় পড়িতে আসি তখনও প্রাণকৃষ্ণবাবু ছাত্র—যদিও আমার চেয়ে অনেক উচ্চ শ্রেণীর ছাত্র। তিনি গণিতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, একটি কলেজের ছাত্রকে তিনি গণিত শিখাইতেন আমার এই রূপ মনে পড়িতেছে।

সাধারণ কলেজ ও মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি যখন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হন তখনও নানা বিষয়ে অধিকতর জ্ঞানলাভে বিরত হন নাই। হিন্দু নানা শাস্ত্র তিনি গভীর অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন ও আয়ত্ত করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টিয়ানদের শাস্ত্রও তিনি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অন্যান্য ধর্ম্ম সম্বন্ধেও তাঁহার পর্যাপ্ত জ্ঞান ছিল। দর্শন ও ধর্মতত্ত্বেও তাঁহার যথেষ্ট অধিকার ছিল।

কলিকাতার ও বঙ্গের তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ছিলেন। বন্ধুবান্ধবদের চিকিৎসা ত প্রীতিবশত তিনি করিতেনই, কলিকাতার ও মফস্বলের বিস্তর গরীব লোকের চিকিৎসা তিনি সাগ্রহে বিনা পারিশ্রমিকে করিতেন। অন্য কাজ উপলক্ষ্যে তিনি মফস্বলে গেলেও গরীবের চিকিৎসা-রূপ কর্ত্তব্যটি তিনি ভুলিতেন না। জীবনের শেষ কয় বৎসর উপার্জ্জনের জন্য চিকিৎসা প্রায় ছাড়িয়াই দিয়াছিলেন।

তিনি অর্থ উপার্জ্জন যেমন করিতেন, তাহার সদ্ব্যবহারও তেমনই করিতেন। দরিদ্র ছাত্রদিগকে সাহায্য করা জীবনের শেষ সজ্ঞান দিবস পর্য্যন্ত তাঁহার একটি নিয়মিত কর্ম্ম ছিল। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বেও সিটি কলেজে ষোলটি দরিদ্র ছাত্রের শিক্ষার সাহায্যের বিষয়ে চিন্তা ও সঙ্কল্প করিয়া পুত্রদ্বয়কে তদনুযায়ী উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। "দাসাশ্রম" নামে গত ঊনবিংশ শতাব্দীতে কলিকাতার অসহায় নিরাশ্রয় আতুরদের বাস গ্রাসাচ্ছাদন ও চিকিৎসাদির যে প্রতিষ্ঠান ছিল, আচার্য্য মহাশয় দীর্ঘকাল তাহার স্বেচ্ছাবৃত চিকিৎসক ছিলেন। বাণীবন বালিকা-বিদ্যালয়ের অট্টালিকানির্ম্মাণ প্রধানত তাঁহার ব্যয়েই নির্ব্বাহিত হইয়াছিল। আরও কত প্রতিষ্ঠানে তিনি আরও কত দান করিয়াছেন, আমরা জানি না।

যে মহৎ ও বৃহৎ কাজটিতে তাঁহার জীবনের শেষ কয় বৎসর তিনি অনেক সময় দিতেন, তাহা আসাম ও বঙ্গের অনুন্নত শ্রেণীসমূহের উন্নতিবিধায়িনী সমিতি। তিনি ইহার সম্পাদক ছিলেন। জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে দরিদ্র গ্রামিক লোকদের পুত্রকন্যাদিগকে শিক্ষাদান ইহার প্রধান কাজ। ইহার তত্ত্বাবধানে নানা জেলায় প্রায় সাড়ে চারি শত বিদ্যালয় আছে। গ্রামিক লোকদিগকে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ করিবার নিমিত্ত এবং ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপনার্থ তিনি পদব্রজে, পা ক্ষতবিক্ষত করিয়া, বহুবার বহু দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়াছিলেন। বস্তুত তিনি

কলিকাতায় বসিয়া শুধু কাগজে নাম স্বাক্ষর করিয়া জনহিতকর কার্য্যের সহিত যোগ রক্ষায় তৃপ্ত হইতেন না, স্বয়ং মফস্বলে কার্য্যক্ষেত্রে গিয়া কাজ করিতে ভালবাসিতেন। আমার মনে পড়ে, কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে তিনি বাঁকুড়া জেলার দুর্ভিক্ষে বিপন্ন লোকদের সাহায্য করিতে গিয়া তথাকার একটি গ্রামে ছিলেন।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে ও স্বদেশীর পক্ষে বঙ্গে যে প্রবল আন্দোলন হয়, আচার্য্য মহাশয় তাহাব অন্যতম নেতা, আন্তরিক সমর্থক, এবং বাগ্মী বক্তা ছিলেন। অন্য বহু দেশহিতকর কার্য্যের সহিত তাঁহার যোগ ছিল।

তিনি বৈষয়িক ব্যাপারও বুঝিতেন ভাল। একাধিক জীবনবীমা কোম্পানীর প্রধান ডিরেক্টরের কাজ কোন-না-কোন সময় তিনি করিয়াছিলেন।

তিনি যৌবন কালে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন এবং জীবনের শেষ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম্মে পূর্ণ আস্থাবান্ ছিলেন। গ্রামিক অশিক্ষিত ও অধিকাংশ স্থলে দরিদ্র লোকদের সকল দিক দিয়া উন্নতি তাহাদের অন্তরের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ অনুসারে চলার উপর নির্ভর করে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন। তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন, এবং ইহার অন্যতম আচার্য্য ছিলেন। তাঁহার প্রাণস্পর্শী উপাসনা ও সারগর্ভ উপদেশ যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহারা তাহা ভুলিতে পারিবেন না। উদ্বোধন, আরাধনা ও উপদেশের সময় তিনি যে-সব শা ্রীয় বচন আবৃত্তি করিতেন, তাহা পুস্তক হইতে বা হস্তলিপি হইতে পড়িতেন না, সমস্ত তাঁহার কণ্ঠস্থ থাকায় অনর্গল বলিয়া যাইতেন এবং সেই জন্য শ্রোতাদের মনের উপর সেগুলির প্রভাব অধিক হইত।

তিনি স্বাধীনচিত্ত পুরুষ ছিলেন। লোকে অনেক সময় যে-সকল গুণকে পরস্পরবিরোধী মনে করে, সেগুলি তাঁহাতে বিদ্যমান ছিল। এক দিকে তিনি স্পষ্টবাদী ছিলেন, পূর্ণ সত্যটি অপ্রীতিকর হইলেও বলিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না; অন্য দিকে সাতিশয় স্নেহশীল এবং দয়ালুও ছিলেন। অন্যায়ের প্রতি ক্রোধ তাঁহার প্রকৃতিতে ছিল, অথচ তিনি সাতিশয় হাস্যরসিক ছিলেন—তাঁহার নির্ম্মল শুভ্র অট্টহাস্য ভুলিবার নহে।

আচার্য্য মহাশয় যদি আত্মচরিত লিখিয়া রাখিয়া গিয়া থাকেন, কিংবা যদি তাঁহার ডায়েরী থাকে, তাহা হইলে তাহা দেশের পক্ষে কল্যাণকর হইবে। তাঁহার আবাল্য বা আযৌবন বন্ধুদের সাহায্যে তাঁহার একটি বিস্তারিত জীবন চরিত তাঁহার কৃতী কন্যাপুত্রেরা প্রকাশ করুন।

রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বিরাশী বৎসর বয়সে সর্ রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি যে প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন, তাহা তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে পান নাই, কোন আকস্মিক ঘটনাচক্রেও তাহা তাঁহার ভাগ্যে জুটে নাই; তাহা তিনি সততা, বুদ্ধিমত্তা, নিজের ব্যবসায়জ্ঞান, সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করিবার ক্ষমতা ও অভ্যাস, ধীরতা ও পরিশ্রম দ্বারা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন।

তিনি অল্প বয়সে পিতৃহীন হন। শিক্ষার জন্য তিনি নিজ মাতৃদেবীর ও অপরের নিকট ঋণী ছিলেন। তাঁহার আশী বৎসর বয়সেব সময় যখন আলবার্ট হলে একটি অনুষ্ঠানে ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য মহাশয় তাঁহার মাতৃদেবীর সম্বন্ধে একটি কথা বলিতেছিলেন, তখন বৃদ্ধ রাজেন্দ্রনাথকে মাতৃহীন শিশুর মত অশ্রুমোচন করিতে দেখা গিয়াছিল। তিনি ধনী হইয়াছিলেন, কিন্তু ধনগর্ব্বিত হন নাই. তাঁহার শৈশব, বাল্য ও যৌবনের অবস্থা ভুলিয়া যান নাই।

তিনি এঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু পরীক্ষা দিতে পারেন নাই, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে যে উপাধি পাওয়া যায়, তাহা পান নাই। কিন্তু এই বিদ্যা এরূপ ভাল শিখিয়াছিলেন এবং ইহাতে তাঁহার এরূপ দক্ষতা ছিল, যে, তিনি ইহার বলে কলিকাতার দুটি বড় কোম্পানীর প্রধান ব্যক্তি হইতে পারিয়াছিলেন।

তাঁহার জন্মগ্রাম ভ্যাবলার শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতির নিমিত্ত এবং তাহার অধিবাসীদের জীবনযাত্রানির্ব্বাহ সুখকর করিবার নিমিত্ত তিনি যথেষ্ট চিন্তা, শ্রম ও অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। জন্মস্থানের উন্নতিবিধান মানুষের প্রধান কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহাতেই মানুষের কর্ত্তব্য শেষ হয় না। রাজেন্দ্রনাথও কেবল্ যে ভ্যাবলারই হিত করিয়া গিয়াছেন তাহা নহে। দেশের অন্য বহু প্রতিষ্ঠান তাঁহার দ্বারা উপকৃত হইয়াছে। তাহার মধ্যে বঙ্গ ও আসামের অনুন্নত শ্রেণী সমূহের উন্নতি বিধায়িনী সমিতি বোধ হয় প্রধান। তিনি জীবনের শেষ কয় বৎসর ইহার সভাপতি ছিলেন এবং ইহার কাজে খুব মন ও সময় দিতেন। ইহার স্থায়ী ফণ্ডে টাকা দিয়াছিলেন; তদ্ভিন্ন নিয়মিত চাঁদা দিতেন এবং পরিচিত বিত্তশালী লোকদিগকে চিঠি দিয়া ইহার জন্য অর্থ সংগ্রহ করাইতেন। অল্প সময়ের মধ্যে ইহার সভাপতি সর্ রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সম্পাদক ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্যের পরলোকগমন উদ্বেগের কারণ হইয়াছে।

রাজেন্দ্রনাথ রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রের কর্ম্মী কখনও হন নাই। কিন্তু তিনি দেশের রাষ্ট্রনৈতিক উন্নতির জন্য আত্মোৎসর্গের মূল্য বুঝিতেন। পরলোকগত গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লেকে তিনি নিয়মিত মাসিক দক্ষিণা দিতেন। যখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্মৃতিরক্ষার্থ অর্থসংগ্রহের চেষ্টা আরব্ধ হয়, তখন তিনি উহার কোষাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন, এবং তিনি কোষাধ্যক্ষ হওয়াতে এমন অনেক লোকে টাকা দিয়াছিলেন যাঁহারা সম্ভবত তিনি কোষাধ্যক্ষ না হইলে টাকা দিতেন না।

তিনি যে রাজনীতি বুঝিতেন না, এমন নয়। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি, গবর্ণ্মেণ্ট তিনি (তথাকথিত) গোলটেবিল কন্‌ফারেন্সের (তথাকথিত) প্রতিনিধি হইতে রাজী হইবেন কিনা জানিতে চান। তিনি রাজী হন নাই। আমরা যাঁহার নিকট একথা শুনিয়াছি, তাঁহাকে রাজেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, গবর্ণ্মেণ্ট স্বশাসনক্ষমতা কিছুই দিবে না সুতরাং ওরূপ কন্‌ফারেন্সে তিনি যাইতে চান না। ওরূপ কাজে গিয়া বৃথা স্বদেশবাসীদের বিরাগভাজন হইতে তিনি রাজী ছিলেন না।

আমরা উপরে সামান্য যাহা কিছু লিখিলাম, তাহা হইতেও বুঝা যাইবে, যে, তিনি নিজের চেষ্টায় ধনী হইয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার সম্বন্ধে একমাত্র জ্ঞাতব্য কথা নহে। তাঁহার সম্বন্ধে বলিবার ও শুনিবার অন্য অনেক কথা আছে। কিন্তু অধুনা অর্থোপার্জ্জনের ক্ষেত্রে বাঙালীদের পরাজয় ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে বলিয়া ব্যবসাবাণিজ্যে রাজেন্দ্রনাথের কৃতিত্বের বিশেষ মূল্য আছে। তিনি কেমন করিয়া এরূপ কৃতী হইলেন, তাহা বিস্তারিত ভাবে বাংলায় লিখিয়া বা লিখাইয়া তাঁহার পুত্রেরা প্রকাশ করিলে বঙ্গদেশের উপকার হইবে।

১৩৪৪ জ্যৈষ্ঠ

ডাক্তার সুরেশচন্দ্র রায়

ইদানীং ভারত ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর কলিকাতা আপিসের ভারপ্রাপ্ত ডিরেক্টর ও তাহার পূর্ব্বে নিউ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কলিকাতা আপিসের জীবনবীমা-বিভাগের ম্যানেজার ডাঃ সুরেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের অকালমৃত্যুতে বীমার কার্য্যে বিশেষ অভিজ্ঞ এবং সাধারণতঃ ব্যবসাবাণিজ্য বিষয়ে বিচক্ষণ এক জন উদ্যোগী পুরুষকে বাংলা দেশ হারাইল। তিনি নিজের চেষ্টায় সমাজে নিজের স্থান করিয়া লইয়াছিলেন। রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে তিনি কংগ্রেসওয়ালা ছিলেন। কলিকাতার ভারতীয় সাংবাদিক সভার তিনি একজন সহকারী সভাপতি ছিলেন। জীবনবীমার কাজ শিখাইবার জন্য তিনি উক্ত বিষয়ে একটি শিক্ষালয় খুলিয়াছিলেন। জীবনবীমা ও অন্যান্য ব্যবসাবাণিজ্য বিষয়ক একখানি ইংরেজী ও একখানি বাংলা কাগজ তিনিই চালাইতেন। ভারত ইন্সিওর‍্যান্স কোম্পানীর কাজ লইবার পর তিনি "ভারত ম্যাগাজিন" নাম দিয়া একটি মাসিক প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার নিজের জীবন-চরিত ও সমসাময়িক ঘটনা-সমূহের ইতিহাসবিষয়ে তিনি একটি ইংরেজী বহির লেখক ও প্রকাশক। তিনি দীর্ঘকাল দিল্লী ও মীরাটে ছিলেন, এবং প্রবাসী বাঙালীদের সহিত তাঁহার গভীর সহানুভূতি ছিল। প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের গোরখপুর অধিবেশনে তিনিই সম্মেলনকে কলিকাতায় আহ্বান করেন, এবং ইহার কলিকাতার অধিবেশনের সুশৃঙ্খল বন্দোবস্ত প্রধানতঃ তাঁহারই উদ্যোগিতা ও পরিশ্রমে হইয়াছিল। তিনি সহৃদয় ও পরোপকারী ছিলেন। কেহ তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী হইলে তিনি যথাসাধ্য তাহার উপকার করিতেন।

১৩৪৪ অগ্রহায়ণ

"ইণ্ডিয়া মেশিনারী কোম্পানী লিমিটেড"

শ্রীযুক্ত আলামোহন দাসের উদ্যোগে ভারত জুট মিল স্থাপিত হওয়ায় চারি হাজার বাঙালীর অন্নসংস্থান হইয়াছে। তাঁহার উদ্যোগিতায় "ইণ্ডিয়া মেশিনারী কোম্পানী" স্থাপিত হইতে যাইতেছে। ইহাতেও কয়েক হাজার বাঙালীর কাজ জুটিবে। আলামোহন বাবুর প্রতিষ্ঠিত দুটি কারখানায় আগে হইতেই রেলগাড়ীর ওজনের কল, ছাপাখানার কল, জুট মিলের কল প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে। ঐ দুটি কারখানা নূতন কোম্পানীর পরিচালনাধীন হইবে এবং ক্রমশঃ আরও নানা রকমের কল নির্ম্মিত হইবে। এই কোম্পানীর সাফল্য প্রার্থনীয়।

১৩৪৫ কার্ত্তিক

চলন্ত স্বদেশী দোকান

কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর কমার্শ্যাল (বাণিজ্যিক) মিউজিয়ামের উদ্যোগে কলিকাতায় স্বদেশী জিনিষের একটি চলন্ত প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে। ৭০ খানি লরীতে নানা স্বদেশী জিনিষ সাজাইয়া তাহা বড় বড় রাস্তা দিয়া ধীরে ধীরে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। ইহার ফলে, স্বদেশী জিনিষ যে কতরকম ও কেমন সুন্দর প্রস্তুত হইতেছে, সে-বিষয়ে অনেকের চোখ ফুটিয়াছে। এইরূপ প্রদর্শনী আরও হওয়া উচিত—শুধু কলিকাতায় নহে, মফঃসলেও। কয়েক বৎসর হইতে ঈষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়েও পূজার আগে দোকানের ট্রেন চালাইয়া ক্রেতা ও বিক্রেতাদের সুবিধা করিয়া দিতেছেন।

নানা কথা

১৩১৯ জ্যৈষ্ঠ
[টাইটানিক জাহাজ-ডুবি]

"টাইটানিক্" জাহাজের অধ্যক্ষ ও কর্ম্মচারিগণ মনে করিয়াছিলেন যে উহা কখনই জলমগ্ন হইতে পারে না। কিন্তু একটি তুষারশৈলের সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়া উহা সামান্য একটি নৌকার মত ভাঙ্গিয়া ডুবিয়া গেল। প্রাকৃতিক শক্তির নিকট মানুষের নৈপুণ্য এতই অকিঞ্চিৎকর! অতএব মানুষের দম্ভ করা ভাল নয়। এই পর্য্যন্ত সকল জাতির চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই মত এক হইবে। কিন্তু পুরুষ ও কাপুরুষের মধ্যে ইহার পর মতভেদ ও আচরণভেদ দৃষ্ট হইবে। পুরুষ বলিবে, প্রাকৃতিক শক্তি অপরাজেয় বটে, কিন্তু উহারই সাহায্যে উহাকে বশে আনিয়া কতদূর পর্য্যন্ত স্বকার্য্য সাধন করিতে পারি তাহা দেখিব; নতুবা জন্মই বৃথা, বাঁচিয়াই বা লাভ কি? কাপুরুষ বলিবে, বিপদের মুখে আপনাকে ফেলা বুদ্ধিমানের কাজ নয়; যে ক'দিন পরমায়ু আছে, কোন প্রকারে আরামে কাল কাটানই ভাল। কাপুরুষ বলিবে, যখন মরিতেই হইবে, যে ক'দিন পারা যায়, বাঁচা ভাল; মরিবার সময় নিজের বিছানায় শুইয়া আত্মীয়স্বজনের সেবা লইতে লইতে মরা ভাল। পুরুষ বলিবে, যদি মরিতেই হয়, রোগে ভুগিয়া আত্মীয়স্বজনকে ভোগাইয়া মরায় কি লাভ? পুরুষের মত যুঝিতে যুঝিতে মরায় তীব্র আনন্দ আছে,—তা সে যুদ্ধ মানুষের সঙ্গেই হউক, হিংস্রজন্তুর সহিতই হউক, বা প্রাকৃতিক শক্তির সহিতই হউক।

কথিত আছে, একবার একজন ডাঙার মানুষ এক নাবিককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, ভাই, তোমার প্রপিতামহ কিরূপে মারা যান? "সমুদ্রে জাহাজ ডুবি হওয়ায়।" তোমার পিতামহ? "সমুদ্রে জাহাজ ডুবিতে।" "তোমার পিতা?" "সমুদ্রে জাহাজ ভাঙিয়া যাওয়ায়।" তখন সেই ডাঙার মানুষ বলিল, "তবু তুমি নাবিক হইয়াছ?" নাবিক জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই, তোমার সাত পুরুষ কিরূপে মরিয়াছে?" ডাঙার মানুষ বলিল, "কেন, ঘরের মধ্যে, বিছানায় শুইয়া, কোন না কোন রোগে।" তখন নাবিক বলিল, "তবুও তুমি প্রতিদিনই ঘরে থাক, ও বিছানায় শোও? ভয় করে না?"

যে জাতির পৌরুষ আছে, শত জাহাজ ডুবিয়া লক্ষ লোক মরিলেও তাহারা সমুদ্রযাত্রা ছাড়িবে না। আরও ভাল জাহাজ তৈয়ার করিবে, আরও সুদক্ষ নাবিক হইতে চেষ্টা করিবে, জাহাজ ডুবিবার পর প্রাণরক্ষার জন্য শত উপায় নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিবে। পৌরুষে তত মানুষ মরে না; সুমেরু, কুমেরু, নানা অজ্ঞাত দেশ আবিষ্কারের চেষ্টায় তত মানুষ মরে না; আকাশে উড়িবার চেষ্টায় তত মানুষ মরে না; যত মরে নিরুদ্যম, মূর্খ, অলস, পৌরষহীন জাতির মধ্যে ম্যালেরিয়া, ওলাউঠা, প্লেগ ও অনাহারে। উনবিংশ শতাব্দীর সমুদয় যুদ্ধে সমগ্র পৃথিবীতে যত মানুষ মরিয়াছে, শুধু ভারতে ঐসময়ে তার চেয়ে বেশী মানুষ মরিয়াছে প্লেগ আদি নিবার্য্য (preventible) রোগে ও দুর্ভিক্ষে। অতএব, হে ভারতবাসী, টাইটানিক্ জাহাজ ডুবিয়া ১৫০০ লোক মরিয়াছে বলিয়া, শোক করিও, কিন্তু ভয় পাইও না। যাহাদের আত্মীয়স্বজন ডুবিয়া মরিয়াছে, সেই শ্বেতকায়েরা ভয় পায় নাই। তুমি গৃহকোণে বসিয়া ভয়ে আড়ষ্ট হইও না, সমুদ্রযাত্রা হইতে বিরত হইও না। শ্বেতকায়দের মত যদি তোমরা পুরুষ হও, উদ্যমশীল হও, তাহা হইলে, তাহাদের দেশে যেমন এখন আর প্লেগ ও দুর্ভিক্ষ নাই,

তোমাদের দেশেও তেমনি থাকিবে না। জাহাজ ডুবি, অজ্ঞাত দেশ আবিষ্কার, পুরুষোচিত ক্রীড়া, আকাশে উড্ডয়ন, ইত্যাদিতে যদি ২০০/৫০০ লোক মরা সহিতে পার, তবেই তোমরা বড় জাতি হইতে পারিবে।

টাইটানিক জাহাজে দুই হাজারের উপর পুরুষ নারী শিশু ছিল। তাহাদের মধ্যে ২/৪ জন ভীরু নিজপ্রাণ-রক্ষায় ব্যগ্র লোক পাছে জীবনতরী (life-boat) গুলিতে লাফ দিয়া পড়িয়া সেগুলি উল্টাইয়া দিয়া শত শত লোকের প্রাণহানির কারণ হয়, তজ্জন্য জাহাজের কর্ম্মচারীদিগকে রিভল্‌ভার হস্তে পথ আগ্‌লাইতে হইয়াছিল বটে; কিন্তু এই ২/৪ জন ভীরুর কাপুরুষতায় অবশিষ্ট শত শত বীর পুরুষ ও বীরনারীর স্থিরচিত্ততা, সাহস ও আত্মোৎসর্গের কাহিনী নিষ্প্রভ হইতে পারে না। হে টাইটানিকের বীর মাঝি মাল্লা ও বীর কর্ম্মচারিগণ, হে টাইটানিকের বীরহৃদয় পুরুষ ও নারীযাত্রিগণ, তোমাদিগকে প্রণাম করি, তোমাদের বন্দনা করি। ধন্য তোমরা, ধন্য তোমাদের জননীগণ!

কি কারণে কতকগুলি নারী ও বালকবালিকা এবং দরিদ্র লোকের প্রাণরক্ষা হয় নাই, তাহা এখনও জানিতে পারি নাই, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে স্ত্রীলোক এবং শিশুদের প্রাণরক্ষার চেষ্টাই সর্ব্বাগ্রে হইয়াছিল, ইহা নিশ্চয় যে দরিদ্র লোকদিগকে বাদ দিয়া আগে লক্ষপতিদের প্রাণরক্ষার কোন চেষ্টা হয় নাই, অজ্ঞাতনামা, যশোহীন লোকদিগকে বাদ দিয়া বিখ্যাত লোকদের প্রাণ রক্ষার কোন চেষ্টা হয় নাই। অনেক নারীকে জোর করিয়া তাঁহাদের স্বামীদিগের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া জীবনতরীতে ফেলিয়া দিতে হইয়াছিল, অনেক নারীকে স্বামিসঙ্গ হইতে বিচ্যুত করিবার চেষ্টা বিফল হইয়াছিল; তাঁহারা স্বামীর সঙ্গে সমুদ্রগর্ভে প্রাণত্যাগ করিয়া জগতে সতীধর্ম্মের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। কর্ণেল আষ্টরের মত ক্রোড়পতি অনেক গরিব লোককে, অনেক সদ্যবিবাহিতা বধূকে জীবনতরীতে তুলিয়া দিয়া, নিজে স্বেচ্ছায় প্রাণ দিলেন। তাঁহারা বিলাসসুখ ভোগে অভ্যস্ত, ভোগের কোন বস্তু তাঁহাদের আয়ত্তের বহির্ভূত ছিল না, কিন্তু তাঁহারা আসন্ন মৃত্যুতে ভীত হইলেন না, নিজের প্রাণ বাঁচাইতে ব্যস্ত হইলেন না, অন্যের প্রাণরক্ষাতেই জীবনের শেষ মুহূর্ত্তগুলি ক্ষেপণ করিলেন। ষ্টেড্ সাহেবের মত ভুবনবিখ্যাত কর্ম্মবীর, পাছে জীবনতরীতে তাঁহার প্রাণরক্ষা হইলে আর একজন সেই সুবিধা হইতে বঞ্চিত হয়, সম্ভবতঃ এই কারণেই অপর অনেকে প্রাণরক্ষাকার্য্যে সাহায্য করিয়া, শেষে নির্ব্বিকা চিত্তে নিজ কক্ষে গিয়া মৃত্যুর অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। জাহাজের কাপ্তেন অবিচলিত ভাবে নিজ কর্ত্তব্য করিতে করিতে, এক ঢেউ খাইয়া পড়িয়া গিয়া আবার দাঁড়াইয়া উঠিয়া যাত্রীদের প্রাণরক্ষায় সচেষ্ট হইলেন। পরক্ষণেই আর ঢেউ তাঁহাকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গেল! বিনা তারে সংবাদ প্রেরণের কর্ম্মচারীকে যখন কাপ্তেন বলিলেন, তুমি নিজ কর্ত্তব্য করিয়াছ, এখন আত্মরক্ষা কর, তখন জাহাজের উপর সমুদ্রের জল উঠিয়াছে, সমুদ্রের ঢেউ খেলিতেছে; তখনও যুবক নিজের কর্ত্তব্য করিতেছেন! কাপ্তেন মরিবার সময়ও মাঝিমাল্লাদিগকে চীৎকার করিয়া বলিলেন, —"তোমরা ব্রিটিশ হও," অর্থাৎ ব্রিটিশ জাতি যেমন আত্মোৎসর্গপরায়ণ বীর হয়, তাহাই হও।

মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া যে আত্মহারা ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয় সে মানুষ নামের অযোগ্য; যে আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হয়, সে উচ্চতর শ্রেণীর অধিকারী; যে গত্যন্তর নাই জানিয়া স্থির চিত্তে মৃত্যুর অপেক্ষা করে, সে মানুষ নামকে কলঙ্কিত

করে না। কিন্তু মানুষের মত মানুষ তিনি যিনি মৃত্যু আসন্ন জানিয়া, নিরুদ্বেগ থাকেন, এবং আপনার কথা না ভাবিয়া অপরের প্রাণরক্ষার জন্যই ব্যস্ত হন।

১৩২২ আশ্বিন
বিবাহের সর্ত্ত।

আমাদের দেশের জামাইবাবুরা এক-একটি ক্ষুদ্র নবাব বিশেষ—তাঁহার নানা অজুহাতে রাজকর জোগাইতে জোগাইতে শ্বশুর বেচারাকে ব্যতিব্যস্ত ত থাকিতেই হয়, সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িতেও হয়। আমাদের দেশে মেয়ের যেন কোনো মূল্যই নাই, অনুগ্রহ করিয়া যিনি কন্যা "দায়" হইতে উদ্ধার করেন নানা উপায়ে তাঁহার ক্ষতিপূরণ করিয়া মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিতে হয়। আমাদের দেশে আগে কন্যার পিতারাই ধনুক-ভাঙা পণ করিতেন, এবং সেইটাই স্বাভাবিক; এখন অস্বাভাবিক রকমে বর বা বরের বাপ পণ করেন। এই স্বভাব-ও-প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ব্যাপার অনেক সময় বরের শ্বশুরদের অন্যায় করিতেও প্রবর্ত্তিত করায়। আপিসে একটি কাজ খালি আছে, আপিসের যোগ্যতর কর্ম্মচারীদের দাবী অগ্রাহ্য করিয়া বা যোগ্যতর প্রার্থীকে প্রত্যাখ্যান কবিয়া সে কাজ বড়বাবুর জামাইকে দেওয়া হয়; না দিলে তাঁহার কন্যাকে শ্বশুরবাড়ীতে উঠিতে বসিতে গঞ্জনা ও দুঃখ পাইতে হইবে।

সম্প্রতি আমেরিকার একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টপন্থীদিগের সংবাদপত্র বষ্টন সহরের ক্রিশ্চান রেজিষ্টারে একটি বিপরীত রকমের সংবাদ দিয়াছেন। ৎ । এক প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরীতে ইস্তফা দিয়া একজন অধ্যাপক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের কন্যার পাণিপ্রার্থী হন। অধ্যক্ষ এই সর্ত্তে বিবাহ দিতে স্বীকার করেন যে তাঁহার ভাবী জামাতা তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরীতে ইস্তফা দিয়া চাকরী ছাড়িয়া যাইবেন, কারণ কোনো লোক তাহার আত্মীয় সম্বন্ধে নিরপেক্ষ বিচারক হইতে পারে না। বিবাহার্থী এই সর্ত্তেই চাকরী ছাড়িয়া প্রার্থিতা কন্যাকে গ্রহণ করিয়াছেন। এই আমেরিকান অধ্যাপকটি নারীর মর্য্যাদা ও প্রেমের মূল্য ঠিক বুঝিয়াছেন। তিনি জীবনের প্রকৃত সঙ্গিনী পাইবার জন্য চাকরীকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছেন।

এই দৃষ্টান্তটি আমাদের দেশের সকলকার লক্ষ্য করিবার বিষয়। এখানে কোন আফিসের বড়বাবু যদি তাঁহার ভাবী জামাতা কোন অধস্তন কর্ম্মচারীকে বলেন, "বাপু, যদি আমার জামাতা হইতে চাও, তাহা হইলে আমার আফিসের চাকরীটি তোমাকে ছাড়িতে হইবে", তবে তাঁহাকে লোকে হয়ত পাগলা-গারদে যাইবার উপযুক্ত মনে করিবে।

—

১৩২২ কার্ত্তিক

নেশাখোরের সংখ্যাবৃদ্ধি।

ভারতবর্ষ ধীরমন্থর গতিতে শিক্ষায় উন্নত হইতেছে ও রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ করিতেছে; কিন্তু এক বিষয়ে তাহার উন্নতি অতি আশ্চর্য্যজনক দ্রুত—সেটা নেশা করাতে। ১৮৭৪-৭৫ সালে আবকারী-বিভাগের আয় ছিল ১৫,৬১,০০০ পাউণ্ড; ১৯১১-১২ সালে হইয়াছে ৭২,৫০,০০০ পাউণ্ড; অর্থাৎ ৩৬ বৎসরে চারগুণ! চমৎকার!

ছোট ছেলেকে গহনা পরানো

ছোট ছেলেকে আদর করিয়া গহনা-পরানো আমাদের দেশের একটা কু-প্রথা। ইহাতে ধনলোভী তস্করদিগকে প্রলুব্ধ করা হয় এবং তাহার ফলে গহনার সঙ্গে-সঙ্গে শিশুর প্রাণ পর্য্যন্ত যায়। আগ্রা-আযোধ্যা যুক্তপ্রদেশের ছোটলাট মেস্টন সাহেব এই কু-প্রথা সম্বন্ধে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া এইরূপ করিতে বিরত থাকিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে মীরাট জেলায় ছয় বৎসরের একটি জাঠ-বালককে ১৫৲ টাকা দামের গহনার জন্য চোরে খুন করিয়াছিল; এরূপ দৃষ্টান্ত তিনি আরও দেখাইয়াছেন। সাধারণের এ বিষয়ে সতর্ক হইয়া শিশুদিগকে নিরাভরণ রাখাই উচিত।

১৩২৩ ভাদ্র

বিলাতী শিশুর এশিয়া সম্বন্ধে জ্ঞান

বিদেশের শিশুদের আমাদের সম্বন্ধে সত্য মিথ্যা নানা রকম ধারণা আছে। তাহা তাহারা তাহাদের পঠিত বহি হইতে লাভ করে। তাহারা আমাদিগকে কি মনে করে, তাহা জানা ভাল। তাহারাই ত বড় হইলে কর্ম্মকর্ত্তা হইবে। তাহাদের সঙ্গেই আমাদের দেশের লোকদের নানা সম্পর্ক ঘটিবে ও বুঝা পড়া করিতে হইবে।

টমাস্ নেল্‌সন এণ্ড সন্সদের প্রকাশিত Highroads of Geography নামক সচিত্র পুস্তিকাবলীর উপক্রমণিকা খণ্ডে ভারতবর্ষের লোকদের কিছু বৃত্তান্ত আছে। এদেশের লোকেরা মাথার উপর ঝুড়ি কলসী রাখিয়া বহন করে, লিখিয়া, বলা হইতেছে:—

"From childhood the women carry

jus of waster or baskets of earth in this way. They hold themselves very upright and walk like queens."

"স্ত্রীলোকেরা খুব সোজা হইয়া রাণীদের মত হাঁটে।"

"Not only Bombay but all India belongs to Britain" "শুধু বোম্বাই নয়, সমুদয় ভারতবর্ষ ব্রিটেনের সম্পত্তি।"!*

"When Indians grow up they are rather grave and sad. The children, however, are always bright and merry. Indian fathers and mothers are very fond of their boys. They care very little for their girls."

"ভারতবাসীরা বড় হইলে গম্ভীর ও বিমর্ষ হয়।† শিশুরা কিন্তু খুব ফুর্ত্তিবাজ ও প্রফুল্ল। ভারতীয় পিতামাতারা পুত্রদিগকে খুব ভাল বাসে। কন্যাদের দেখিতে পারে না।" ‡

পাল্কীর বর্ণনাটা বেশ মজার। মেয়েদের কথা বলিতে গিয়া গ্রন্থকার বলিতেছেন:—

"Sometimes they are carried from place to place in a closely shut box on poles." "মেয়েদিগকে কখন কখন একটা সিন্দুকে বন্ধ করিয়া তাহার দুদিকে ডাণ্ডা লাগাইয়া বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হয়।"

"I think Indian boys are much fonder of their lessons than our boys." "আমার ধারণা ভারতবর্ষের ছেলেরা আমাদের ছেলেদের চেয়ে পড়িতে বেশী ভাল বাসে।"

এই জন্যই শাস্ত্রে বলে, "লিখিব পড়িবি মরিবি দুখ্‌খে, মৎস্য ধরিবি, খাইবি সুখ্‌খে।" মৎস্যটা ব্যাপক অর্থে বুঝিতে হইবে।

চীনদেশ সম্বন্ধে লেখা হইয়াছে, চীনা বাপ মা ছেলে খুব ভালবাসে; কিন্তু তারা মেয়ে চায় না।

"Girls, however, are not welcome. Sometimes they are called "Not-wanted" or Ought-to-have-been-a-boy."

"বালিকার জন্ম হইলে কেহ আনন্দিত হয় না। কখন কখন তাহাদের নাম রাখা হল, "চাই-না, " কিম্বা "বালক-হওয়া-উচিত-ছিল।"

আমাদের দেশেও উপর্য্যুপরি কন্যা হইলে লোকে নাম রাখে "ক্ষান্ত", "আর-না-কালী।" কিন্তু কাহারও দশ দশটা পুত্র হইলেও কেহই শেষ ছেলেটার নাম রাখে না, "বহুৎ-হুআ-রাম", "বাস্‌-বাস্‌-রাম্‌" কিম্বা "আর-না-হরি।" কন্যার বিবাহ দিতেই হইবে, এবং বালিকা বয়সেই দিতে হইবে, এইরূপ সামাজিক প্রথা থাকায়, এবং নারীর সদুপায়ে স্বাধীন জীবিকা অর্জ্জন করিয়া স্বচ্ছন্দে থাকিবার উপায় না থাকায় লোকে কন্যার আগমনে আনন্দ প্রকাশ করিতে পারে না। নতুবা, মানবপ্রকৃতি সর্ব্বত্রই এক; আমাদের দেশের লোকেও কন্যাকে খুব স্নেহ করে। তাহা না হইলে আগমনী গানের করুণ সুর এত মর্ম্মস্পর্শী হইত না। যাহাই হউক, বরপণ, শৈশব-বিবাহের অবশ্যকর্ত্তব্যতা, প্রভৃতি যে-সব কারণে আমাদিগকে কন্যার জন্মে ভীত করে, সেই সব প্রথার উচ্ছেদসাধনে আলস্য করা উচিত নয়। এই সব প্রথায় আমাদিগকে অমানুষ করিতেছে।

* মহারাণী ভিক্টোরিয়ার দ্বারা প্রচারিত এবং তাঁহার পুত্র ও পৌত্রের দ্বারা সমর্থিত ঘোষণা-পত্র অনুসারে কিন্তু আমরা ইংরেজের সমান সমান, কেবল ইংলণ্ডের রাজার প্রজা; অর্থাৎ লর্ড মর্লীর কথায়, "equal subjects of the King." অনেক দেশী রাজ্যের রাজা ইংলণ্ডেশ্বরের মিত্র রাজা বা Allies। অন্ততঃ তাদের রাজ্যগুলি ব্রিটেনের সম্পত্তি নয়। সম্পাদক।

† হইবার যথেষ্ট কারণ আছে।— সম্পাদক।

‡ বিয়ে দেওয়া কঠিন বলিয়া।— সম্পাদক।

১৩২৩ আশ্বিন

বাকুড়ায় দুভ

মাননীয় বীট্সন-বেল সাহেব বাঁকুড়া পরিদর্শন করিয়া গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে স্থির করিয়াছেন যে অক্টোবর মাসের শেষ পর্য্যন্ত দুর্ভিক্ষক্লিস্ট লোকেরা সরকারী সাহায্য পাইবে। ব্যবস্থাপক সভায় মাননীয় ক্ষীরোদবিহারী দত্তের প্রশ্নের উত্তরে গবর্ণমেন্ট জানাইয়াছেন যে এ বৎসর বাঁকুড়া জেলায় ভাল ফসল হইবার সম্ভাবনা খুব বেশী। যদি যথাসময়ে যথেষ্ট বৃষ্টি হয়, অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে শস্য ভালই হইবে। অজন্মার পর এইরূপ হইয়া থাকে। যে-সকল সভাসমিতি সাহায্য দিতেছেন, তাঁহাদিগকে এখনও আরো কিছুদিন সাহায্য চালাইতে হইবে।

১৩২৭ বৈশাখ

পুরীতে দুর্ভিক্ষ

শ্রীক্ষেত্র পুরী জেলার প্রধান সহর। সহরটিকে পুরীও বলে। এখানে জগন্নাথদেবের মন্দির অবস্থিত। এই জেলায় প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া অন্নকষ্ট চলিতেছে। এখন উহা ভীষণ দুর্ভিক্ষে পরিণত হইয়াছে। প্রায় ১৫০ বর্গ মাইল জায়গায় অধিবাসীরা বিপন্ন হইয়াছে। গত বৎসর প্রায় সমস্ত জেলা অনাবৃষ্টি হেতু দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়। অনাবৃষ্টির পর জলপ্লাবন হয। বিহার ও ওড়িষ্যার ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সভ্য মাননীয় শ্রীযুক্ত গোপবন্ধু দাস স্বয়ং প্লাবিত স্থানগুলি দেখেন। প্লাবনের জল প্রায় এক মাস ছিল। ইহাতে লোকদের অশেষ দুর্গতি হয়। ক্ষেতের ধান সমুদয় নষ্ট হইয়া যায়। কোথাও কোথাও অল্পসংখ্যক লোকে রবিশস্য যাহা আর্জাইয়াছিল, তাহাও পরে বৃষ্টিতে ধুইয়া লইয়া যায়। উপর্য্যুপরি এইরূপ প্রাকৃতিক উৎপাতে বিস্তর লোককে সম্পূর্ণ নিঃস্ব ও অসহায় করিয়াছে। গত মার্চ্চ মাসের শেষ পর্য্যন্ত সামান্য পরিমাণ তাগাবী ঋণ ভিন্ন গবর্ণমেন্টের তরফ হইতে সাহায্য দেওয়া হয় নাই। লোকে অন্নকষ্টে পড়িয়া খাটিয়া খাইতে রাজি আছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য কোন কোন জায়গায় কয়েক মাসের জন্য গবর্ণমেন্ট "টেস্ট ওয়ার্কস্" খুলেন; কিন্তু মজুরীর অল্পতা এবং দৈহিক দুর্ব্বলতা বশতঃ বেশী লোকের এসব কার্য্যক্ষেত্রে কাজ করিতে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। কতকগুলি গ্রাম প্রায় জনশূন্য হইয়াছে। বেসর্কারী লোকদের চেষ্টায় ম্যাজিস্ট্রেটকে সভাপতি করিয়া গঠিত জেলা সাহায্য সমিতির প্রদত্ত সাহায্য মোটেই যথেষ্ট হয় নাই।

আমরা গত অক্টোবর মাসে যখন পুরী গিয়াছিলাম, তখনই লোকদের অবস্থা শোচনীয় হইয়াছিল। তাহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি ও

স্বকর্ণে শুনিয়াছি। এখনকার অবস্থা কি আব বর্ণনা করিব! গত জানুয়ারী মাসে তোলা একটি ফটোগ্রাফ হইতে যে ছবি প্রস্তুত করাইয়া ৯৫ পৃষ্ঠায় ছাপিতেছি, তাহা হইতেই সহৃদয় লোকে অবস্থা বুঝিতে পারিবেন। আর একটি ছবি (৯৬ পৃঃ) একরকম ঘাসের। ইহাই অনেকদিন হইতে লোকদের প্রধান খাদ্য হইয়াছিল, কিন্তু গ্রীষ্মাধিক্য বশতঃ এখন ইহাও দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। মাননীয় শ্রীযুক্ত গোপবন্ধু দাস ইহা বিহার-ওড়িষ্যার ব্যবস্থাপক সভায় সভ্যদিগকে দেখাইয়াছিলেন।

যিনি যত বেশী পারেন, সাহায্য করুন। নিম্নলিখিত তিনজনের কাহাকেও টাকা পাঠাইলেই হইবে:—

(১) বাবু জগবন্ধু সিংহ, দুর্ভিক্ষ অনুসন্ধান কমিটীর সভাপতি, পুরী।

(২) বাবু গোপবন্ধু দাস, সত্যবাদী, সাক্ষীগোপাল পোষ্ট-আফিস্, জেলা পুরী।

(৩) বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ সাহু, ভারতভৃত্য-সমিতির সভ্য, পুরী।

ফটোগ্রাফটি এবং ঘাসগুলি গোপবন্ধু দাস মহাশয় পাঠাইয়াছেন।

১৩২৯ অগ্রহায়ণ

ডাকাইত ও গ্রামবাসী

এমন কোন সপ্তাহ যায় না যাহাতে বাংলা দেশে কতকগুলি ডাকাইতি না হয়। ইহার মধ্যে যে যে স্থলে গ্রামবাসীরা ডাকাইতদিগকে তাড়াইয়া দিবার বা ধরিবার চেষ্টা করে, এবং যে যে স্থলে তাহারা ডাকাইতদিগকে জখম করিতে বা ধরিতে সমর্থ হয়, তাহার তালিকা ও বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইলে পল্লীবাসী জনসাধারণ উৎসাহিত হয়।

গত ১লা অক্টোবর মেদিনীপুর জেলার নাড়াজোল গ্রামের রামপদ বিশাইয়ের বাড়ীতে সশস্ত্র ডাকাইতি হয়। রামপদর পিতা অধর বিশাই একজন ডাকাতকে গুলি করেন। যদিও ডাকাতরা লুণ্ঠিত টাকা ও জিনিষ পত্র লইয়া পলায়ন করে, তথাপি গ্রামবাসীদের চেষ্টায় পরে দুজন ডাকাত ধরা পড়ে। তাহার মধ্যে গুলিদ্বারা আহত ব্যক্তি হাঁসপাতালে মারা পড়িয়াছে।

২৮শে অক্টোবর চব্বিশ পরগণা জেলার গোজালিয়া ঘোষপুর গ্রামের দ্বারিক বারের বাড়ীতে ডাকাইতি হয়। এস্থলেও হরদাস ও দ্বারী ঘরীর চেষ্টায়, একজন ডাকাত ধৃত হয়।

বীরভূম জেলার নাদির খাঁ ও হাফিজ্ খাঁ ত্রিশজন ডাকাইতের সহিত লড়িয়াছিল। তাহারা পরাস্ত হইলেও ডাকাইতদিগকে সামান্য লুট লইয়া পলাইতে বাধ্য করে। কর্তৃপক্ষ নাদির খাঁ ও হাফিজ্ খাঁকে তাহাদের সাহসের জন্য পুরস্কার দিয়াছেন।

১৩৩০ মাঘ
"আনন্দবাজারে"র অর্দ্ধসাপ্তাহিক সংস্করণ

দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকার অর্দ্ধসাপ্তাহিক সংস্করণ দেখিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। ইহাতে সপ্তাহের খবর, রাজনৈতিক প্রবন্ধ, বক্তৃতার প্রতিলিপি, প্রভৃতি ত থাকেই, অধিকন্তু হিন্দুজাতির হ্রাসের কারণ, স্ত্রীলোকদের মধ্যে যক্ষ্মার প্রাদুর্ভাব, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় লিখিত সমাজ-সেবা প্রভৃতির মত অতি হিতকর প্রবন্ধও থাকে। দেশবিদেশের ভারতীয় দেশভক্তদের ছবি এবং মুসলমান-জগতের সংবাদ প্রকাশে ইহার খুব উদ্যোগিতা আছে।

১৩৩৫ চৈত্র
ইংলণ্ডের বিবাহের বয়স নির্দ্ধারক বিল

বর্ত্তমানে ইংলণ্ডে যে আইন প্রচলিত আছে তাহাতে নারীর বিবাহের বয়স অন্ততঃ ১২ ও পুরুষের অন্ততঃ ১৪ হওয়া চাই। বিগত ১২ বৎসরের মধ্যে এই দেশে ৩১৮টি বিবাহ হইয়াছে যাহাতে মেয়ের বয়স ছিল ১৫, ১৮টি বিবাহ হয় যাহাতে মেয়ের বয়স ছিল ১৪; ৩টি বিবাহে মেয়ের বয়স ১২ হইয়াছিল। এই এই বয়সে ভারতবর্ষে যত সংখ্যক বিবাহ হয় তাহার তুলনায় এই সংখ্যাগুলি অতি কম। তবে অতীত কালে ইংলণ্ডে বাল্যবিবাহ আরও অধিক প্রচলিত ছিল, ইহা নিঃসন্দেহ এবং ইংলণ্ড তখনই স্বাধীন ছিল; বাল্যবিবাহ প্রভৃতি কুসংস্কার ছিল বলিয়া ইংলণ্ড স্বাধীনতা ভোগ করিবার অধিকারী নহে এরূপ কথা কেহ মনে করিত না। স্বাধীনতার সাহায্যেই ইংলণ্ড ক্রমশ কুসংস্কার-সমূহের উচ্ছেদ করিতে সমর্থ হইয়াছে। সম্প্রতি হাউস অব লর্ডস-এ একটি আইনের খসড়া স্থাপন করা হইয়াছে যাহাতে বলা হইয়াছে যে মেয়েদের বিবাহের বয়স অন্ততঃ ১৬ হওয়া চাই। এই আইনের সাহায্যে প্রাচীন কুসংস্কার সমূলে উৎপাটিত হইবে। ইংলণ্ডে এই খসড়ার বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন ইতিপূর্ব্বে হয় নাই এবং ভবিষ্যতেও হইবে না। কিন্তু সরদা বিলের বিরুদ্ধে কয়েকজন ভারতবাসী আন্দোলন করিয়াছেন; এবং ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টও এই বিলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন। অথচ রাজকর্ম্মচারী, এমন কি রাজকর্ম্মচারী নহেন এমন ইংরেজেরা এই যুক্তি দেখান যে ভারতবর্ষে কতকগুলি সামাজিক কুসংস্কার আছে বলিয়াই ভারতবাসী স্বায়ত্ত-শাসনের যোগ্য নহে। এ বিষয়ে অনেক দেশী রাজ্যের শাসন-কর্ত্তারা অনেক বেশী সংস্কার-মুক্ততা ও উন্নতির পরিচয় দিয়াছেন। আমাদের মনে হয় যদি ভারতবর্ষে জাতীয় শাসনতন্ত্র বর্ত্তমান থাকিত, তাহা হইলে সম্ভবতঃ তাহারাও সামাজিক সংস্কারের বিদ্বেষী হইত না।

হাউস্ অব লর্ডস্-এ এই খসড়া লইয়া আলোচনার সময় ইহার পক্ষ সমর্থন করিতে

গিয়া লর্ড বাক্‌মাস্টার স্বীকার করেন যে, এই আইন সম্পর্কে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের অবস্থা প্রায় সমান। এমন কি এক বিষয়ে ভারতবর্ষের অবস্থা ইংলণ্ডের চাইতেও ভাল। সম্ভবতঃ এই উক্তির কারণ এই যে, ভারতবর্ষের বাল্যবিবাহগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাগ্‌দানের সামিল; কারণ বিবাহের পরই স্ত্রী-পুরুষ স্বামীস্ত্রীর মত বসবাস করে না। এই-সকল কথায় আমাদের উল্লসিত হইবার বিশেষ কারণ নাই।

১৩৩৬ বৈশাখ
আমেরিকার ডাইনী-হত্যা

লিটেরারী ডাইজেস্ট পত্রে দেখিলাম :—

জন, এইচ ব্লিমায়ার (বয়স ৩৩ বৎসর); জন কারী (বয়স ১৫); এবং উইলবার্ট জি, হেস (বয়স আঠার) তাহারা নেলসন, ডি, রেমেইয়ার নামক একজন বৃদ্ধ কৃষিজীবীকে হত্যা করিয়াছে! হত্যাকারীগণ বলে যে রেমাইয়ার তাহাদিগকে গুণ বা যাদু করিয়াছিল। রেমেইয়ারকে তাহারা তাহার নিজের ঘরে প্রহার করিয়া হত্যা করে এবং তাহার ঘরবাড়ী লুঠ করিয়া ও তাহার দেহ অগ্নিসাৎ করিয়া দিয়া পলায়ন করে। হত্যাকারীগণ বলে যে, হত্যাকাণ্ড পূর্ব্ব-পরিকল্পিত ছিল না এবং তাহারা রেমেইয়ারের বাড়ীতে শুধু যাদু নষ্ট করিবার জন্যই গিয়াছিল। রেমেইয়ার হেসের পরিবারবর্গের উপর যাদু লাগাইয়া ছিল এবং যাদু ভাঙিবার জন্য তাহাদের মতে রেমেইয়ারের নিকট হইতে "দি লং লষ্ট ফ্রেণ্ড" নামক একখানা পুস্তক সংগ্রহ করার প্রয়োজন ছিল; অভাবে রেমেইয়ারের মাথার একগোছা চুল কাটিয়া লইয়া আট ফুট গভীর একটা গর্ত্তে পোঁতা দরকার ছিল। সে মারা যায় তাহার কারণ চুল কাটিতে দিতে সে বাধা দেয়।

পেনসিলভেনিয়ার, ইয়র্ক সহরে একটা হত্যাকাণ্ডের বিচার চলিতেছে, তাহার তুলনা মেলা ভার। এরূপ হত্যাকাণ্ড বর্ত্তমানকালে আর হয় নাই বলিলেই চলে। হত্যাকারী অভিযুক্ত হইয়া দণ্ডিত হইয়াছে। ইয়র্কের করোনার ডাঃ এল, ইউ, জেক নাকি বলিয়াছেন যে, ইয়র্কের অন্ততঃ অর্দ্ধেক বাসিন্দা গুণ, ডান যাদু প্রভৃতিতে আস্থাবান। মিস মেয়োর সভ্যতম দেশের এ কি দুর্গতি হইল!

১৩৩৯ আশ্বিন

কলিকাতার পশুক্লেশনিবারণী সমিতি

কলিকাতাতে যে পশুক্লেশনিবারণী সমিতি আছে, তাহাকে ইংরেজরা কেবলমাত্র নিজেদের সমিতিতে পরিণত করিতেছেন, তাহার হাজার টাকা বেতনের মেম সেক্রেটারি নানাপ্রকার নিয়মবহির্ভূত কাজ করিতেছেন, সমিতির দেশী কর্ম্মচারীদের প্রতি অন্যায় ব্যবহার হইতেছে, এইরূপ অনেক অভিযোগ আলবার্ট হলের একটি সর্ব্বসাধারণের সভায় করা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এই সমিতির বিরুদ্ধে আনীত সব অভিযোগের অনুসন্ধান করুন। ইহাকে বার্ষিক লাখ টাকার উপর সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়। তাহার অপব্যবহার হওয়া উচিত নয়।

একটি শিশু একটি বিড়ালছানার উপর উপদ্রব করিতেছিল। তাহাতে তাহার পিতা তাহাকে বলেন, "বিড়ালছানাকে মারিতে নাই।" তাহাতে শিশুটি বলিল, "তবে আমি কুকুরছানাটাকে মারি"! কলিকাতার এই সমিতিটির ন্যায়শাস্ত্র কতকটা এই শিশুটির মত। ইতর প্রাণীর প্রতি নিষ্ঠুরতা সমিতির নিয়মে নিষিদ্ধ। সেই জন্য কি তাঁহারা তাঁহাদের কর্ম্মচারীরূপ মানুষগুলিকে নানা প্রকারে কষ্ট দিতেছেন?

১৩৪০ অগ্রহায়ণ

আশানন্দ ঢেঁকির স্মৃতিস্তম্ভ

আশানন্দ ঢেঁকি শান্তিপুরের একজন বিখ্যাত শক্তিমান বাঙালী ছিলেন। তিনি ছিলেন মুখুজ্যে, অন্য লোকে যেমন অনায়াসে লাঠি ব্যবহার করে তিনি তেমনি সহজে ঢেঁকি ব্যবহারে সমর্থ ছিলেন বলিয়া তাঁহার 'ঢেঁকি' পদবী হইয়াছিল। গত ১১ই আশ্বিন বীরাষ্টমীর দিনে শান্তিপুরে তাঁহার স্মৃতিস্তম্ভের আবরণ উন্মোচিত হইয়াছে। শান্তিপুরবাসীরা যথাযোগ্য কাজ করিয়াছেন। তথাকার শ্যামসুন্দর দৈহিক বল বৃদ্ধির উপায় শিক্ষা দিয়া ও তাহাব দৃষ্টান্ত স্বয়ং প্রদর্শন করিয়া আশানন্দের স্মৃতি অন্য প্রকারে রক্ষা করিতেছেন।

বঙ্গের যেখানে যত অসাধারণ বলিষ্ঠ লোক ছিলেন, সকলেরই স্মৃতি কোন-না-কোন প্রকারে রক্ষিত হওয়া এবং শারীরিক উন্নতির চেষ্টা সর্ব্বত্র হওয়া আবশ্যক।

১৩৪০ চৈত্র
বায়স্কোপে দুর্নীতি

আমরা বায়স্কোপ দেখিতে যাই না, সুতরাং সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা হইতে তৎসম্বন্ধে কিছু বলিতে পারি না। কিন্তু 'সুচিকিৎসা' নামক মাসিকপত্র এবিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সত্য হইলে শীঘ্র প্রতিকার আবশ্যক। উহা লিখিত হইয়াছে—

"এদেশে বিদেশী চিত্রনাটকের যেরূপ প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে এবং যেরূপ অবাধ গতিতে যৌনরূপ গ্রহণ করিতেছে তাহাতে, এখন হইতে যদি বালকবালিকাগণের অভিভাবকগণ বিশেষ ভাবে সাবধান না হন তবে ইহার পরিণতি কোথায় কি ভাবে দাঁড়াইবে, তাহা চিন্তা করিলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়।"

১৩৪১ মাঘ
ভারতীয়দের পরিচ্ছদ

খবরের কাগজে আজকাল ছবি দেওয়ার রীতি খুব বাড়িয়াছে। এই সব শাদা-কাল ছবি যে-সব মানুষের, তাঁহাদের গায়ের রং তাহা হইতে বুঝিবার যো থাকে না, নাম দেখিয়া ও পরিচ্ছদ দেখিয়া বুঝিতে হয় তাঁহারা কে। অনেক সভার লোকদের, স্কুল-কলেজের ছাত্রদের ও অধ্যাপকদের ছবিও কাগজে বাহির হয়। তাঁহাদের অধিকাংশের কেবল পরিচ্ছদ দেখিয়া বিচার করিতে হইলে, নাম ছাপা না থাকিলে, মনে হইত তাঁহারা ইউরোপীয়। অনেক সভায় গেলে অবশ্য গায়ের রঙে প্রায়ই বুঝা যায় কে ইউরোপীয় কে নহে : পাগড়ী ও হ্যাট হইতেও তাহা বুঝা যায়। বাংলা দেশ ছাড়া ভারতের অন্যত্র ইউরোপীয় কোট, টাই ইত্যাদির সঙ্গে পাগড়ীও দেখা যায়, কিন্তু হ্যাটও কম দেখা যায় না। মোটের উপর বলা যাইতে পারে, "শিক্ষিত" ভারতীয়েরা পরিচ্ছদে অনেকটা ইউরোপীয় বনিয়া গিয়াছে। কিন্তু ভারতীয় মহিলারা পরিচ্ছদে ইউরোপীয় বনেন নাই—যদিও অনেকের জ্যাকেট ব্লাউস কতকটা ইউরোপীয় ধরণের বটে। তবে, ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়, যে, কোন কোন মেম-ঘেঁষা ভারতীয়া শাড়ীটাকেই পরেন আঁট-সাঁট-খাট স্কার্টের মত করিয়া।

সম্প্রতি কলিকাতায় যে দুটি বৃহৎ সভার অধিবেশন হইয়াছিল, তাহার মধ্যে প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশনগুলিতে সব উদ্বোধক, সভাপতি ও প্রতিনিধি এবং প্রায় সব দর্শককে বাঙালী বলিয়া বুঝা গিয়াছিল। বিজ্ঞান-কংগ্রেসের যে-দুটি জলযোগ-সভায় গিয়াছিলাম, তাহাতে বাঙালী বিজ্ঞানবিদ্‌দিগের মধ্যে কয়েক জন এবং পঞ্জাবের বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক রুচিরাম সাহনী ছাড়া (অবশ্য ভারতীয় মহিলাদেরও ছাড়া) আর সকলের পরিচ্ছদ ছিল ষোল আনা বা চৌদ্দ আনা ইউরোপীয়।

ইউরোপীয় বলিয়া কোন কিছুর নিন্দা করা আমাদের অভিপ্রেত নহে। যাহা কাজের পক্ষে সুবিধাজনক, যাহা স্বাস্থ্যকর, যাহা অল্পব্যয়সাধ্য, যাহাতে শ্লীলতা রক্ষা হয়, যাহা জটিল ও নানা অঙ্গ বা অঙ্গের সমষ্টি নহে, পরিচ্ছদ এইরূপ হওয়া ভাল। তাহার উপর তাহা সুন্দর এবং জাতীয় হইলে আরও ভাল। জাতীয় বলিতেছি এই জন্য, যে, তাহা হইলে দেশের সর্ব্বসাধারণের সঙ্গে পার্থক্য কম হয়। অন্যদের সঙ্গে অনাবশ্যক অসাদৃশ্যবৃদ্ধি বাঞ্ছনীয় নহে—তাহাতে জাতীয় সংহতি নষ্ট হয়।

খদ্দরের চলন যে কোন সময়েই খুব বেশী হইয়াছিল, তাহা নহে। কিন্তু আগে যতটুকু হইয়াছিল, এখন তাহাও বহু পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে।

খবরের কাগজের ছবি এবং নানা প্রাদেশিক সভা-সমিতি দেখিয়া মনে হয়, বাঙালীরা এখনও দলবলে ধুতি ত্যাগ করে নাই।

১৩৪২ শ্রাবণ
দু-কোটি টাকার সেতু

গঙ্গার উপর কলিকাতা ও হাওড়ার মধ্যে যে নূতন সেতু হইবে তাহাতে দু-কোটি টাকা খরচ হইবে। ইহার ঠিকা কে পাইবে তাহা লইয়া অনুমান চলিতেছে। ভারতবর্ষের অনেক ঠিকাদার এবং ভারতের বাহিরের ন্যূনকল্পে ছয়টি দেশের বহু ঠিকাদার. তাহারা কত টাকায় সেতুটি প্রস্তুত করিয়া দিতে পারে, তাহা জানাইয়াছে। এখন গবর্ণমেন্ট কাহাকে এই প্রভূত লাভের কাজটি দিবেন, লোকে তাহাই ভাবিতেছে। বাংলা স্বাধীন দেশ হইলে ইহা কোন বাঙালীকেই দেওয়া হইত। পরাধীন বলিয়া বাঙালীর ইহা পাইবার অধিকার নাই বলিতেছি না। অন্য ঠিকাদারদের সমান টাকায় কাজটি ভাল করিয়া করিয়া দিতে পারে এমন বাঙালী ঠিকাদার আছে, কিন্তু বাঙালী বলিয়াই হয়ত উহা কোন বাঙালী পাইবে না।

১৩৪৩ কার্ত্তিক
দুর্ভিক্ষ

বঙ্গে দুর্ভিক্ষ লাগিয়া আছে। উত্তর-ভারতে বহুপ্রদেশে বন্যা হওয়ায় সেখানেও নানা স্থানে দুর্ভিক্ষের মত হইয়াছে। বোম্বাই প্রেসিডেন্সির কোথাও কোথাও দুর্ভিক্ষ হইয়াছে।

হৈমন্তিক ধান্য না হওয়া পর্য্যন্ত বঙ্গের যে-সব জেলায় দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, সেখানে লোকের

কষ্ট চলিতে থাকিবে। তাহার পরও যে নিরন্নদের স্বচ্ছল অবস্থা হইবে এমন নয়। তাহাদের দুঃখের কিছু উপশম হইবে মাত্র।

বঙ্গের দশ বারটি জেলায় অন্নকষ্ট ও বস্ত্রাভাব হইয়াছে। আমরা সর্ব্বত্র সাহায্য দানের কাজ চালাইবার মত অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিব না এবং আমাদের সব জায়গায় কর্ম্মীও নাই। ইহা জানিয়া আমরা কেবল বাঁকুড়া জেলার কয়েকটি কেন্দ্রে যথাসাধ্য সাহায্য দিবার চেষ্টা করিতেছি। এবারকার দুর্ভিক্ষে টাকা অতি সামান্যই আসিয়াছে। পুনর্ব্বার সাহায্য পাঠাইতে সদাশয় ব্যক্তিদিগকে অনুরোধ করিতেছি।

স্বাস্থ্য ব্যায়াম খেলাধুলা

প্রাসঙ্গিক কথা

ভারতবাসীর জন্য রামানন্দর প্রার্থনা—'চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু, সাহসবিস্তৃত বক্ষপট'। বৎসরের পর বৎসর নানা সংবাদে, মন্তব্যে এই প্রার্থনা, এবং প্রার্থনাপূরণের পথ, *প্রবাসী* পত্রিকায় নির্দেশিত হয়েছে। একদিকে যেমন আছে শরীরচর্চা-বিষয়ক প্রবন্ধাবলি (রাজেন্দ্রনারায়ণ গুহঠাকুরতা রচিত 'বাংলা দেশে ব্যায়ামচর্চ্চা', ১৩৪১ অগ্রহায়ণ ইত্যাদি), অন্যদিকে তেমনই সংবাদ সাহিত্য-তে প্রকাশিত রামানন্দর নিজের প্রাসঙ্গিক চিন্তাভাবনা। শ্বেতাঙ্গ সমাজে ঘৃণিত অপমানিত ক্রীতদাসতুল্য নিগ্রোজাতির ব্যায়াম খেলাধুলা ইত্যাদি বিষয়ে অনেক সংবাদও দিয়েছেন—পরাধীন ভারতবর্ষের অপমানিত এক নেটিভ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

ফুটবল ক্রিকেট ইত্যাদি জনপ্রিয় খেলায় বাঙালি ও ভারতীয়দের সাফল্য-কথা রামানন্দ জানালেও, দেখা যাবে যে এই সকল খেলা সম্বন্ধে তিনি উৎসাহহীন। এক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত, ১৯১১ সালে সাহেবি দল ইস্ট ইয়র্ক-কে হারিয়ে প্রথম ভারতীয় দল হিসাবে মোহনবাগানের আই-এফ-এ শিল্ড জয় সম্পর্কে তাঁর রচনা। (স্মর্তব্য. এই প্রতিযোগিতা তখন সারা ভারতের সেরা ফুটবল প্রতিযোগিতা)। দেশবাসী যখন মোহনবাগানের জয়ে আত্মহারা, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের একটি যুদ্ধজয়ের তুল্য বলে তা ঘোষিত-বিঘোষিত, দেশীয় সংবাদপত্রগুলিতে উচ্ছ্বাসের সীমা নেই, তখন রামানন্দ অনতিউচ্ছ্বাসের সঙ্গে লিখেছেন : "মোহন-বাগানের ফুটবল দল প্রতিযোগিতায় অনেক শ্রেষ্ঠ ইংরাজ খেলোয়াড়দের দলকে পরাজিত করিয়া সম্মানসূচক রৌপ্য 'শীল্ড' বা ঢাল লাভ করায় আমরা আনন্দিত হইয়াছি বটে কিন্তু বিস্মিত হই নাই। কারণ বাঙ্গালী ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক পৌরুষের কাজ করিতে পারে।" এইসঙ্গে মাত্রাহারা আবেগের বেলুনে খোঁচা মেরে বলেছেন : "অপরপক্ষে যাহারা মোহনবাগানের জিতের প্রসঙ্গে রুষ-জাপান-যুদ্ধের কথা বা তদ্বিধ কোনো কথা আনিয়া ফেলিয়াছেন, তাহাদের মাত্রাজ্ঞান ও রসবোধ বড় কম।" (ভাদ্র ১৩১৮)। বছরখানেকের মধ্যে আবার খোলাখুলিভাবে ফুটবল-ক্রিকেট নিয়ে ছেলেদের মাতামাতির সমালোচনা তিনি করলেন। ওতে ছেলেদের পড়াশোনায় অবহেলা হয়। ওটা 'হুজুক মাত্র'। ওতে 'শরীরের বিন্দুমাত্রও উন্নতি' হয় না। 'এই-যে হাজার হাজার লোক নিজের কাজ ফেলিয়া রোদে পুড়িয়া, জলে ভিজিয়া, ফুটবল খেলা দেখিতে থাকে ও হৈ হৈ রৈ রৈ করে, তাহাতে কাহার মঙ্গল হয়?' (শ্রাবণ ১৩১৯)। তবে জনমনোহারী ফুটবলকে পত্রিকার পৃষ্ঠা থেকে বহিষ্কারও করতে পারেননি। ১৩৩০ আষাঢ় সংখ্যায় 'মোহনবাগানের জয়' লেখায় মোহনবাগান কর্তৃক পুনশ্চ ইংরেজদের হারানোর কথা জানিয়ে দিলেন। এই প্রসঙ্গে বাঙালি দর্শকদের ধিক্কারযোগ্য আচরণের কথাও লিখেছেন। এরিয়ান

ক্লাব হাইল্যান্ডার ক্যামেরনদের বিরুদ্ধে গোল দিলে শতাধিক ক্যামেরন যখন মারপিট শুরু করে তখন হাজার হাজার বাঙালি দর্শক বিনা প্রতিরোধে প্রাণভয়ে পালিয়েছিল। এই লজ্জাজনক কাপুরুষতায় মর্মাহত রামানন্দ বলেন, বাঙালিকে অবশ্যই দৈহিক বল ও মানসিক সাহসের অনুশীলন করতে হবে যাতে তারা 'আত্মরক্ষার জন্য গায়ের জোরে ও প্যাঁচে দুর্বৃত্তকে কাবু' করতে পারে। রামানন্দ মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের লিগ ও শিল্ড জয় নিয়ে সানন্দ মন্তব্যও করেছেন—এবং করার সময় মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে ভারতীয় দল হিসাবেই গ্রহণ করেছিলেন—মুসলমান দল হিসাবে নয়।

কীসে জাতির মঙ্গল হয় তা-ও রামানন্দ বারবার জানিয়েছেন। তা ঘটে শরীরচর্চায় এবং দুঃসাহসিক অভিযান প্রভৃতিতে। সেইসঙ্গে তিনি সোৎসাহে এদেশীয়দের মল্লযুদ্ধ, অসিযুদ্ধ, অশ্বারোহণ, দূরপাল্লার দৌড়, ধনুর্বিদ্যা, সাইকেলে ভূ-পরিক্রমা এবং ব্যায়ামের দ্বারা উন্নত দেহগঠনাদি-বিষয়ে অনুকূল সংবাদ-সহ সপ্রশংস মন্তব্য করেছেন। শেষোক্ত ব্যাপারে ভীম ভবানীর দারুণ শারীরিক শক্তির সচিত্র দীর্ঘ বিবরণ ছেপেছেন (অগ্রহায়ণ ১৩২৯), কিংবা ব্যারিস্টার ব্যায়ামবিদ 'বলবান' জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের (অগ্রহায়ণ ১৩৪২), কিংবা 'সুইডেনে ব্যায়ামদক্ষ বাঙালী'র কথা (কার্ত্তিক ১৩৪৩)। মল্লক্রীড়ার ক্ষেত্রে কুস্তিগির পালোয়ান গামা-র সঙ্গে গোবরবাবুর কথাও এসে গেছে (অগ্রহায়ণ ১৩১৭), এসেছে সংগঠিত ব্যায়ামশালার কথাও। দুঃসাহসিক পর্বতারোহণে বাঙালিদের পাওয়া যায়নি বলে, দুঃখ করেছেন, তবে কৈলাসযাত্রায় বাঙালিদের পাওয়া গেছে বলে (যাদের অন্যতম ছিলেন তরুণ উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়) খুশি হয়েছেন, সুমেরু-অভিযানে বাঙালির অংশগ্রহণ নিয়েও।

খেলার নামে জুয়াখেলা সম্বন্ধে রামানন্দ একেবারে খড়্গহস্ত। ঘোড়দৌড়কে কেন্দ্র করে যে বাজি রাখা হয়, তাতে অংশ নিয়ে কত পরিবারের সর্বনাশ হয়ে গেছে, তার দিকে তিনি বারেবারে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কিন্তু হায়, ভারতে ব্রিটিশ সরকার জুয়াখেলাকে দণ্ডনীয় করলেও রাজা-রানি-বড়োলাট-ছোটোলাটগণ ঘোড়দৌড়ের জুয়াতে অংশগ্রহণ করেন বলে ঘোড়দৌড়কে জুয়ার তালিকা থেকে বাদ দিয়াছেন। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় জনৈক দেশি সভ্য ঘোড়দৌড়কে আইনে দণ্ডনীয় করার প্রস্তাব উত্থাপন করলে তাতে বড়োলাটের সম্মতি মেলেনি। ভারতে ব্রিটিশ সরকারের জাতিবিদ্বেষ-ঘটিত স্বার্থপরতা নিয়ে রামানন্দের তির্যক মন্তব্য আছে। সাদা চামড়ার হিংস্র স্বার্থপরতার নমুনা তিনি দিয়েছেন 'নিগ্রো মুষ্টিযোদ্ধা' সংবাদে। যতক্ষণ মুষ্টিযুদ্ধে সাদা চামড়ার মানুষেরা কালো চামড়ার নিগ্রোদের পর্যুদস্ত করেছে, ততক্ষণ কুলি পেটানোর আনন্দে শ্বেতচর্মীরা আত্মহারা, কিন্তু যেই-না কালো মুষ্টিযোদ্ধার হাতে সাদা আমেরিকানের হার হল, অমনি দাঙ্গা বেধে গেল, নিগ্রোদের ঘরবাড়ি পুড়ল, এবং তাদের খুনজখম করা হতে লাগল। রামানন্দ সুমিষ্টভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—ইংরেজ শাসকরা ভারতে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের জন্য শাসনসংস্কার করা যাচ্ছে না বলে অজুহাত তোলেন, কিন্তু কুস্তি প্রতিযোগিতায় হিন্দু বা মুসলমান কখনো হারে কখনো জেতে, কই তখন তো দাঙ্গা বাধে না!

প্রবাসী পত্রিকায় নারীজীবন ও তার সমস্যা সম্পর্কে রামানন্দর সদাজাগ্রত সচেতনতা—ব্যায়াম ও খেলাধূলার ক্ষেত্রেও প্রকাশ পেয়েছে। এক ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্যের রানির বাঘ-শিকারের কাহিনি আমরা

পেয়েছি। রামানন্দর সশ্রদ্ধ মনোযোগ পেয়েছেন মধ্যপ্রদেশের বেল সাহেবের স্ত্রী, যিনি অসমসাহসে ক্ষুধার্ত বাঘের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন—যখন সেই হিংস্র শ্বাপদটি তাঁর স্বামীর শরীর ছিন্নভিন্ন করছিল। তাঁর তাড়নায় বাঘটি শেষপর্যন্ত পালিয়ে যায়, যদিও স্বামীর প্রাণরক্ষা করা সম্ভব হয়নি। এই বীরাঙ্গনাকে রামানন্দ এদেশের অভ্যস্ত ভাষায় 'সতী' আখ্যা দিয়েছিলেন। উলটোদিকে তিনি একেবারেই পছন্দ করেননি বিলাতে গিয়ে কোচবিহারের ইন্দিরা মহারানির শিকারখেলা। বিদেশে পয়সা ওড়ানো এই বড়োলোকামির বিষয়ে রামানন্দ তিক্ত মন্তব্য করেছেন। স্বদেশে দুঃখী-দরিদ্রের কষ্টনিবারণ বা সাহিত্যশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা ইত্যাদি না করে উক্ত মহারানি বিলাতে যে বাহাদুরি দেখাচ্ছিলেন সে-বিষয়ে রামানন্দর তিরস্কারের ভাষায় হিন্দু রক্ষণশীলতার ছোঁয়া লেগেছে : 'দুঃখের বিষয়, তিনি এই সাত্ত্বিক পথের পথিক হইবার মতো শিক্ষা কখনও পান নাই। নতুবা হিন্দু বিধবার শিকার খেলার সংবাদ আমাদিগকে শুনিতে হইত না।" বিধবা-বিবাহের অতীব সমর্থক হলেও রামানন্দ তাঁর এই এই মন্তব্যের জন্য নারী-অধিকারে হস্তক্ষেপকারী বলে সংস্কারপন্থীদের নিন্দালক্ষ্য হবেন কি না জানি না। ব্যায়াম শরীর পুষ্ট করে, খেলোয়াড়গণ সেই সুস্থ সমর্থ শরীরের নানা কীর্তিকলাপ সম্ভব করে—কিন্তু শরীর বলতে যাদের প্রায় কিছু নেই, রোগক্ষয়িত কঙ্কালশরীর নিয়ে ঘোরাফেরা করে, তখন তাদের কীবা ব্যায়াম কীবা ক্রীড়াপ্রতিযোগিতা! আগে স্বাস্থ্যরক্ষা, পরে শরীরচর্চা। তাই স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় নানা আলোচনায় তিনি প্রায়শই নানা স্বাস্থ্য-সংস্থা ও তাদের দ্বারা আয়োজিত আলোচনাসভার উল্লেখ করেছেন—আলোচনার বিষয়বস্তুর সারসংক্ষেপও পাই। 'বঙ্গের স্বাস্থ্যের শোচনীয় অবস্থা' সম্বন্ধে পুনঃপুন তাঁর দুঃখার্ত মন্তব্য পাই। 'বেঙ্গল ফিজিক্যাল কনফারেন্স'-এর এক অধিবেশনসূত্রে তিনি বিখ্যাত চিকিৎসক স্যার নীলরতন সরকারের মন্তব্য উৎকলন করেন। স্যার নীলরতন বলেছিলেন, যেখানে বাংলার শতকরা ৫০ জনের অধিক ছাত্রছাত্রী 'শরীর ও শক্তির দিক দিয়া বিকল', সেখানে কয়েকটি খেলোয়াড়কে বিশ্বজয়ী করানোর অপেক্ষা বালকবালিকা, ছাত্রছাত্রীদের অধিক স্বাস্থ্য ও শক্তি অর্জন করানোর চেষ্টা বাঞ্ছনীয়। তিনি এমনও বলেন, 'বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিজয় করিবার আগে নিজের শরীর জয় করা দরকার।' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে ছাত্রদের স্বাস্থ্য-বিষয়ে সচেতনতা দেখা গিয়েছিল এবং রামানন্দ সে-বিষয়ে সম্পাদকীয় মন্তব্যও করেছিলেন। ('ছাত্রদের স্বাস্থ্য', ভাদ্র ১৩৩২)। 'দেশ বিদেশের কথা' বিভাগে (মাঘ ১৩৩৫) বাঙালি ছাত্রদের শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়োজিত কমিটির বিবরণীর সারসংক্ষেপ করা আছে। তাতে দেখা যায়, শতকরা ৭১ জন ছাত্র কোনো-না-কোনো ব্যাধিগ্রস্ত, তার মধ্যে শতকরা ৩৫ জন নানাপ্রকার গুরুতর পীড়াগ্রস্ত। বাঙালি ছাত্রদের গড় দৈর্ঘ্য ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি, বুকের ছাতি ৩১ ইঞ্চি, ওজন ১ মন ১৫ সের। এই অবস্থার প্রতিবিধানে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে রুগ্ণ ছাত্রদের চিকিৎসাব্যবস্থা, কলেজে কলেজে ব্যায়ামশালা স্থাপন-সহ নানা স্বাস্থ্যবর্ধক প্রকল্প গ্রহণের কথা আমরা জানতে পারি। সেইসঙ্গে স্বাস্থ্যসচেতনতা সৃষ্টির জন্য শরীরচর্চা সম্বন্ধে বক্তৃতাদি শুরু হওয়ার কথাও। এর আগে একই বিভাগে ফাল্গুন ১৩২৯ সংখ্যায় বিশেষ সন্তোষের সঙ্গে আজমিরে "মল্লবিদ্যাশালা" প্রতিষ্ঠার কথা লেখা হয়েছিল, যেখানে "ডাকাতি বা বন্যজন্তুর উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষা করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়।" আরও লেখা

হয়েছিল—"বিদ্যাশালার ছাত্রেরা লাঠি ও তলোয়ার খেলিতে পারে এবং ধনুর্বিদ্যাতেও তাহারা অভিজ্ঞতা লাভ করে।... বাংলাতে এরূপ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন যে খুব বেশী তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।"

ব্যায়াম, খেলাধুলা সম্বন্ধে *প্রবাসী*-র এইসকল সংবাদ ও সম্পাদকীয় মন্তব্য দেখিয়ে দেয়, পত্রিকাটি কেবল সাহিত্যসংস্কৃতির ক্ষেত্রে মনঃক্রীড়ার পোস্টা ছিল না—দেহক্রীড়ারও স্থান ছিল তাতে। দেহ বিনা মানুষের সকলই বিফল, এই সহজ অথচ অবহেলিত সত্যটির দিকে ধারাবাহিকভাবে রামানন্দ দৃষ্টি আকর্ষণ করে গেছেন।

মনুষ্যজীবনের প্রাথমিক ভিত্তি কী, রামানন্দ জানতেন এবং জানিয়েছেন।

১৩১৭ শ্রাবণ

কাফ্রি বনাম মার্কিন

সম্প্রতি আমেরিকায় তদ্দেশবাসী শাদায় কালোয় ঘুষির বলপরীক্ষা হইয়া গেছে।

জেফ্রিস একজন শ্বেতকায় আমেরিক, ঘুষোঘুষির ওস্তাদ। সে বক্সিং লড়াইয়ে অনেকবার লড়িয়াছে কিন্তু হারে নাই কখনো। সে পুনঃপুন জয়লাভ করিয়া জগৎ-জয়ী উপাধি লাভ করিয়াছিল। সে তখন ঘুষোঘুষির প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র হইতে সরিয়া দাঁড়াইল এবং বলিল "যদি কখনো কোনো কাফ্রি তুল্য প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠে, তখন তাহাকে দমন করিতে এক হাত লড়িব। শাদার সম্মান বজায় রাখিব।"

জেফ্রিসের পরে বর্ন্‌স্ জগৎজয়ী উপাধি লাভ করে। তাহাকে পরাজিত করিয়া জন্‌সন সেই সম্মান কাড়িয়া লয়। জন্‌সন্ একজন কাফ্রি।

এতদিনে জেফ্রিসের তুল্য প্রতিদ্বন্দ্বী কাফ্রি মিলিল। জেফ্রিস, কাফ্রি জনসনের সহিত লড়িবে স্বীকৃত হইল।

জেফ্রিস লড়াইয়ের আয়োজন করিতে লাগিল। সে জর্ম্মান্নিতে জলবায়ু পরিবর্ত্তন করিয়া বলাধান করিতে গেল। সেখানে আঠারো মাস সংগ্রাম সাধনায় কাটিল।

জেফ্রিস সম্বন্ধে ডাক্তার ক্রসের অভিমত—"আমি আমার ব্যবসায়-সূত্রে ১৫/২০ হাজার লোকের স্বাস্থ্য দেখিয়াছি, কিন্তু এমনতরটি দেখি নাই। তাহার শারীর যন্ত্রসকল যতদূর সম্ভব সুস্থ। জনসনও অবিকল এমনি সুস্থ। তবে সে একটু মোটা।"

জেফ্রিস খুব ভালো লড়িয়ে নয়—খেলার কায়দার চেয়ে তাহার জোর ঘুষি, অসমসাহসিক গোঁ ও পেশীর কাঠিন্য তাহাকে দুর্দ্ধর্ষ করিয়াছিল।

আর জনসন একজন পাকা খেলোয়াড়, ওস্তাদ।

নিম্নে উভয়ের তুলনা সুস্পষ্ট হইবে—

	জেফ্রিস	জনসন
বয়স	৩৪	৩১
খাড়াই	৬ ফুট ১১/২ ইঞ্চি,	৬ ফুট ১/৪ ইঞ্চি
ওজন	২ মন ৫৩ সের,	২ মন ২৫১/২ সের
সিনা (ছাতি)	৪৪ ইঞ্চি,	৪২ ইঞ্চি
ঘুষির দৌড়	৭৬৩/৪ "	৭৪ "

প্রথমে স্যান ফ্রানসিস্কোতে লড়াই হইবার কথা হয়। কিন্তু সেখানকার আইনে এরূপ লড়াই নিষিদ্ধ বলিয়া কালিফর্ণিয়ার সীমান্তে রেনো নগরে লড়াই হয়। লড়াইয়ে তিন লক্ষ তেষট্টি হাজার টাকা বাজি ধরা হইয়াছিল। এই টাকার শতকরা ৬০্ টাকা পাইবে জেতা এবং ৪০্ পাইবে বিজিত।

লড়াইয়ে কাফ্রি জনসনের জয় হইয়াছে। শ্বেতকায়ের সম্মান জেফ্রিস উদ্ধার করিতে পারে নাই। জেফ্রিস ঠেকিয়া বুঝিয়াছে যে শাদা হইলেই জয় তাহার একচেটিয়া হয় না, সাধনার বলে কালো মানুষও শাদাকে জয় করিতে পারে।

কিন্তু শ্বেতকায়েরা এই পরাজয় শিষ্ট শান্তভাবে সহ্য করিতে পারে নাই। আমেরিকার সহরে সহরে শাদা লোকেরা কালো লোকের উপর ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। অকারণে জাতীয় বিদ্বেষ শাদা লোকগুলিকে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছে। কোথাও কোথাও নিগ্রোরাও আততায়ী হইয়াছে। কালো কাফ্রিদিগকে কুকুর বিড়ালের মতো অসম্মানের লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইতেছে। মরিয়াছে এ পর্য্যন্ত ১৩/১৪ জন, আহত হইয়াছে অসংখ্য, জেলখানা ভর্ত্তি। নিউ ইয়র্ক সহরের এক

কাফ্রিপল্লী আগুন লাগাইয়া ধ্বংস করা হইয়াছে।

আমেরিকা সুসভ্য, সুশিক্ষিত, স্বয়ংশাসিত। তাহাদের দেশে একজন কালো চামড়ার লোক শাদা চামড়ার একজনকে ঘুষির লড়াইয়ে হারাইয়াছে, ইহা আর বরদাস্ত হইতেছে না। একদল আর এক দলের উচ্ছেদ সাধনে উদগ্র হইয়া উঠিয়াছে।

এই উপলক্ষে আমাদের নিজেদের একটা কথা মনে হইতেছে। ইংরেজ বলেন—আমাদেব ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতির মধ্যে—বিশেষ করিয়া হিন্দু মুসলমানে—রেষারেষি এমন বেশি যে এদেশ স্বায়ত্তশাসনের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।

ইহা রাজপক্ষের কথা। সুতরাং খুব জোর করিয়া প্রতিবাদ করিবার সামর্থ্য কাহারো নাই। তবে আমরা বাস্তব ক্ষেত্রে দেখিতেছি কি তাহাই একবার দেখা যাক।

এই সেদিন কাল্লু কিক্কর সিংহের কুস্তি হইয়া গেল। হিন্দু কিক্কর সিং জিতিয়াছিল। আবার মুসলমানও অনেকবার জিতিয়াছে। কিন্তু জয়োন্মত্ত হিন্দু কজন মুসলমান বধ করিয়াছে বা পরাজয়লজ্জিত মুসলমান কজন হিন্দু খুন করিয়াছে? ইহা ভারতবর্ষের দস্তুর নয়।

ভারতবর্ষে ধর্ম্ম বি-সম ও আচাররীতি বিপরীত হইতে পারে, কিন্তু মহাতাপস ভারতবর্ষের সাধনার বিশেষত্বই সহ্য করা—পরাজয়ে মুহ্যমান বা জয়ে উদ্ধত না হওয়া। ভারত বিশ্বমানবের সম্মিলনক্ষেত্র, শান্তিমন্ত্রের জন্মভূমি। তবু ভারতের অপবাদ—এখানে ধর্ম্ম ও জাতিগত বিদ্বেষ সর্ব্বাপেক্ষা বেশি—সুতরাং এই দেশ স্বায়ত্তশাসন পাইতে পারে না; আর আমেরিকা মানবধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ খৃষ্টশিষ্যত্বের পরিচয় দিতেছে—সেখানে স্বায়ত্তশাসন ত তুচ্ছ কথা, স্বাধীনতাও নিতান্ত স্বাভাবিক।

১৩১৭ অগ্রহায়ণ

কুস্তিগির পালোয়ান গামা

ভারতের পালোয়ান গামা ইংলণ্ডে গিয়া সে দেশের বহু পালোয়ানকে পরাজিত করাতে বিলাতে গামার ধন্য ধন্য পড়িয়া গেছে। গামা খুব বড় পালোয়ান হইতে পারে, কিন্তু তথাপি সে ভারতের শ্রেষ্ঠ পালোয়ান নয় বোধ হয়। সুতরাং ভারতের নামজাদা পালোয়ানরা যে বিদেশী পালোয়ান অপেক্ষা আরো শ্রেষ্ঠ তার আর কোনো ভুল নাই। এইরূপ আমাদের সকল বিষয়ে বিদেশের প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইয়া আমাদের মনুষ্যত্বের পরিচয় দিবার সময় আসিয়াছে। আত্মশক্তির উপর আস্থা থাকিলেই মানুষ যে কোন বিষয়ে অসাধ্যসাধন করিতে পারে। চাই শুধু উদ্যম ও সাধনা। এবং ভারতবর্ষ ফলত্যাগী সাধনাকারীদেরই দেশ।

১৩১৮ ভাদ্র
[মোহনবাগানের শিল্ড জয়]

যুদ্ধ দেহমনের বলবিক্রম দেখাইবার প্রধান ক্ষেত্র। ভারতবাসীদের এই প্রকারে পৌরুষ দেখাইবার সুযোগ এখন খুব কম। ভারতীয় শিখ, গুর্খা আদি কোন কোন জাতি এখনও সাধারণ সৈনিক এবং খুব নিম্নপদস্থ সৈনিক কর্ম্মচারীরূপে পৌরুষ দেখাইতে পারে। কিন্তু ভারতীয় অধিকাংশ জাতির মত বাঙ্গালীর এ সুযোগও নাই। কিন্তু পূর্ব্বে যখন বাঙ্গালীর এ সুযোগ ছিল, তখন অনেক বাঙ্গালী সেনানায়ক ও সাধারণ সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্রে শৌর্য্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ক্লাইব যে লাল পল্টনের সাহায্যে অনেক যুদ্ধ জয় করেন, তাহা প্রধানতঃ বঙ্গীয় সৈনিকগণের সমষ্টি ছিল। হিংস্র পশুর শিকারেও পৌরুষ দেখান যায়। তাহাতেও অনেক বাঙ্গালীর খ্যাতি আছে। পুরুষোচিত অনেক ব্যায়াম ও ক্রীড়াতেও দেহের বল ও ক্ষিপ্রকারিতা ও মনের সাহস দেখান যায়। বাঙ্গালী সার্কাসে সিংহ ব্যাঘ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছে, বেলুনে উঠিয়াছে, এরোপ্লেনে চড়িয়া বাঙ্গালী পুরুষ ও নারী আকাশে বিচরণ করিয়াছে। সুতরাং ফুটবল প্রভৃতি খেলায় যে বাঙ্গালী কৃতিত্ব প্রদর্শন করিবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এইজন্য মোহন-বাগানের ফুটবলের দল প্রতিযোগিতায় অনেক শ্রেষ্ঠ ইংরাজ খেলোয়াড়ের দলকে পরাজিত করিয়া সম্মানসূচক রৌপ্য "শীল্ড" বা ঢাল লাভ করায় আমরা আনন্দিত হইয়াছি বটে, কিন্তু বিস্মিত হই নাই। কারণ বাঙ্গালী ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক পৌরুষের কাজ করিতে সমর্থ। শুধু বাঙ্গালী কেন, যে কোন জাতি সময় সুযোগ ও শিক্ষা পাইলে যে কোন কাজ করিতে পারে।

অনেকে এই সব খেলাকে বড় তুচ্ছ জ্ঞান করেন। আমাদের মত সেরূপ নয়। আমরা যেমন অকালপক্ক অকালাবজ্ঞ ছেলে ভালবাসি না, যাহারা কুড়িতে পা দিবার আগেই দৌড়াদৌড়ি করা পর্য্যন্ত "ছেলেমানুষী" ও অসভ্যতা মনে করে, তেমনি অতিবিজ্ঞ জাতিও ভালবাসি না। যে জাতির যৌবন আছে ও কর্ম্মিষ্ঠতা আছে, তাহাদের মধ্যে এই অস্বাভাবিক অকালবিজ্ঞতা ও অতিবিজ্ঞতা লক্ষিত হয় না। তাহাদের পক্ককেশ লোকেরাও নানা রকমের লাফালাফিও দৌড়াদৌড়ির খেলা করে। এ সব খেলা জাতীয় সুস্থতা ও যৌবনের লক্ষণ। কিন্তু অপর পক্ষে যাহারা মোহনবাগানের জিতের প্রসঙ্গে রুষ-জাপান-যুদ্ধের কথা বা তদ্বিধ কোন কথা আনিয়া ফেলিয়াছেন, তাঁহাদের মাত্রাজ্ঞান ও রসবোধ বড় কম। ফুটবলে জিৎ যুদ্ধজয়ের সমতুল্য নয়, মেরু আবিষ্কারেব সমানও নয়; যদিও ইহা আনন্দের ও গৌরবের বিষয় বটে।

১৩১৯ বৈশাখ
[স্বাস্থ্য-সমাচার পত্রিকা]

ডাক্তার শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র বসু স্বাস্থ্য-সমাচার নামে একটি মাসিক পত্র বাহির করিতেছেন। ইহার বৈশাখ সংখ্যা পাইয়াছি। আমাদের মত রোগজীর্ণ দেশে যে এমন একটি অতীব প্রয়োজনীয় কাগজ এতদিন ছিল না ইহাই আশ্চর্য্যেব বিষয়। এখন প্রকাশিত হইয়াছে; আশা করা যায় যে ইহার খুব কাট্‌তি হইবে। কারণ, ইহার লেখাও খুব সারবান্ এবং বিষয়বৈচিত্র্যও খুব আছে। অধিকন্তু ৪৮ পৃষ্ঠা পরিমিত কাগজের বার্ষিক মূল্য ও ডাকমাশুল এক টাকা সস্তাও বটে। বৈশাখ সংখ্যায় আছে— সূচনা, রোগ কি, ডাবের জল, নিরামিষভোজীর বিপদ (গল্প), দন্ত, বায়ুর সহিত শরীরের সম্বন্ধ, শ্বাস প্রশ্বাস, ব্যায়াম, ম্যালেরিয়া, বিবিধ সংগ্রহ। আমরা ইহার স্থায়িত্ব ও বহুল প্রচার কামনা করি।

১৩১৯ শ্রাবণ
[ওলিম্পিক ক্রীড়া]

আমরা ছেলে বেলা পড়িয়াছিলাম, "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্।" আমাদের দেশে রোগের এত প্রাদুর্ভাব, এবং যথেস্ট ও পুস্টিকর খাদ্যের অভাবে এবং অন্যান্য কারণে আমাদের শরীর এত দুর্ব্বল, যে শরীরের উন্নতি দিকে মন দেওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য। তবে, দুঃখের বিষয় এই যে যাহারা শরীরের উন্নতির দিকে মন দেয়, তাহারা "ধর্ম্মসাধনের" জন্য অর্থাৎ মনুষ্যোচিত জীবন যাপনের জন্য দেহে বল সঞ্চয়ের চেষ্টা করে না। যাহা হউক, দেহটা বলিষ্ঠ হইলে, মানুষকে সৎকাজে লাগাইতে পারিলে তাহার নিকট যতটা কাজ পাওয়া যায়, দুর্ব্বল লোকের কাছে ততটা পাওয়া যায় না। সুতরাং দৈহিক বলের দিকে ঝোঁক থাকা ভাল। কয়েক বৎসর হইতে ইউরোপে প্রাচীন গ্রীসের ওলিম্পিক ক্রীড়া পুনঃপ্রবর্ত্তিত হইয়াছে। প্রাচীন ওলিম্পিক ক্রীড়ায় দৌড়, লাফ দেওয়া প্রভৃতির প্রতিযোগিতায় যাহারা শ্রেষ্ঠ হইত তাহারা অলিভপত্র-বিরচিত জয়মুকুটে ভূষিত হইত। আধুনিক ওলিম্পিক ক্রীড়া ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে এথেন্স নগরে প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। বর্ত্তমান বৎসর সুইডেনের রাজধানী স্টক্‌হল্‌ম্ নগরে ঐ ক্রীড়া হইয়া গিয়াছে। উহাতে মার্কিনেরা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যক খেলায় জিতিয়াছে। ইংরাজেরা আরও কয়েকটি জাতির নিম্নে স্থান পাইয়াছে। দুঃখের বিষয় যে ভারতবাসী কেহ কোন প্রকার প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করা দূরে থাক্, কেহ উহাতে প্রবৃত্তও হয় নাই। আগামী ওলিম্পিক ক্রীড়া ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে বার্লিন সহরে

হইবে। কোন কোন ইংরাজ মনে করেন যে বাঙ্গালীরা ফুটবল খেলায় যেরূপ দ্রুত দৌড়িতে পারে, তাহাদের পা যেরূপ লম্বা ও শরীর যেরূপ লঘু, তাহাতে তাহারা এখন হইতে চেষ্টা করিলে বার্লিনে অন্ততঃ দৌড়ের প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারে।

আমাদের দেশে অনেক ছেলে পড়াশুনায় অবহেলা করিয়া ফুটবল, ক্রিকেটে মাতিয়া থাকে; ইহা ভাল নয়। কিন্তু অনেকে যে এইসকল ক্রীড়া করে, তাহা ভাল। তবে, এই যে হাজার হাজার লোক নিজের কাজ ফেলিয়া রোদে পুড়িয়া জলে ভিজিয়া ফুটবল খেলা দেখিতে থাকে ও হৈ হৈ রৈ রৈ করে, তাহাতে কাহার মঙ্গল হয়? দর্শকদের শরীরের বিন্দুমাত্রও উন্নতি হয় কি? না, তাহাদের ঐহিক পারত্রিক কোন সুবিধা হয়? এটা হুজুক মাত্র। আমরা ইহার পক্ষপাতী নহি।

১৩২২ কার্ত্তিক
সাঁতার ও দৌড়ে ভারতবাসীর কৃতিত্ব।

যুরোপের সমাজতত্ত্বজ্ঞ ও মনস্তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা এবং আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীরা মানুষের খেলার উপকারিতা ঘোষণা করিতেছেন। খেলা মানুষের মনকে পবিত্র ও সুস্থ করে, বলিষ্ঠ ও তৎপর করে; তাহাতে মানুষ কাজের অধিকতর উপযোগী হয়। ভারতবাসী বড় ভারিক্কি জাত, খেলা মনে করে ছেবলামি, লঘুতা; তাই তাহার অঙ্গে স্ফুর্ত্তি নাই, অন্তরে আনন্দ নাই, কর্ম্মে উদ্যোগ নাই, কর্ত্তব্যে নিষ্ঠা ও অধিকক্ষণ লাগিয়া থাকিবার শক্তি নাই। যুরোপের লোকেরা ছেলে হইতে বুড়ো পর্য্যন্ত খেলে খুব, খাটেও খুব। তাহাদের দেখাদেখি এখন আমাদের দেশেও খেলার প্রচলন হইতেছে। প্রতিযোগিতা সকল কাজে মানুষের আগ্রহ ও উৎসাহ বাড়াইয়া তোলে; খেলার মধ্যেও তাই প্রতিযোগিতা প্রবল হইয়া উঠিতেছে। প্রাচীন কালে গ্রীসে ম্যারাথনে সমস্ত দেশের খেলোয়াড়েরা সমবেত হইয়া বিভিন্ন খেলায় প্রতিযোগিতা করিয়া আপনাদের কৃতিত্ব দেখাইয়া পুরস্কৃত হইত। সেই ধারা যুরোপে আজও চলিতেছে; যে, যে-খেলা ভালো খেলিতে পারে সে প্রতিযোগিতায় সকলকে হারাইয়া প্রথমে দেশের মধ্যে প্রধান হয়; পরে ভিন্ন ভিন্ন দেশের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করিয়া অবশেষে সে সমস্ত জগতের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি Champion হইয়া দাঁড়ায়। এইরূপে ঘুষির লড়াই, দৌড়, সাঁতার, বাচ, ক্রিকেট, ফুটবল, গোল্‌ফ, শতরঞ্জ প্রভৃতি সকল খেলারই World Champion বা জগৎজয়ী বীর এক-একজন আছে। আমাদের দেশ এখনো জগৎসভায় স্থান না পাইলেও, ক্রমশঃ নিজের দেশের মধ্যেই কৃতিত্ব দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছে, ইহা আনন্দ ও আশার কথা। সম্প্রতি কলিকাতায় সাঁতারের প্রতিযোগিতা হইয়া গিয়াছে—তাহাতে যুরোপীয় ও ভারতবাসী উভয়েই যোগ দিয়াছিলেন; আধ মাইল সাঁতার খেলায় আহিরীটোলা স্পোর্টিং ক্লাবের শ্রীযুক্ত ম, ল, মুখোপাধ্যায় এ বৎসর প্রথম হইয়া পুরস্কার

পাইয়াছেন এবং বিজয়ী Champion বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। পুনাতে দৌড়ের প্রতিযোগিতায় শ্রীযুক্ত স, ব, দত্তর ২ ঘণ্টা ৫৯ মিনিটে ২৭ মাইল পথ দৌড়িয়া গিয়াছিলেন; ম্যারাথনের সার্ব্বভৌম দৌড়ে এ পর্য্যন্ত যত লোক দৌড়িয়াছে তাহার মধ্যে মাত্র একজনের দৌড় ইহাঁর চেয়ে বেশী। এখনও পর্য্যায়ক্রমে পাশ্চাত্য দেশ-সকলের কোথাও না কোথাও ম্যারাথন রেস্ বা প্রতিযোগিতা হয়; তাহাতে ভারতবাসীর যোগ দিয়া জগতের সমক্ষে প্রমাণ করা উচিত যে ভারতবাসী অকর্ম্মণ্য দুর্ব্বল নহে; ভারতবাসী সকল প্রকার বলের ও কৌশলের কাজই দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিতে পারে। কিন্তু অনাহারক্লিষ্ট ও ম্যালেরিয়াগ্রস্ত বলিয়া আমাদের প্রাণশক্তি অল্প, দম অল্প। অনেক পুরুষ ধরিয়া বাল্যপিতৃত্ব ও বাল্যমাতৃত্বও আমাদিগকে হীনবল করিয়াছে। বলহীনতার এই-সকল এবং আরও অনেক কারণের প্রতিকার অবিলম্বে আমাদের করা কর্ত্তব্য।

১৩২২ পৌষ
বাঙ্গালী পালোয়ান

শ্রীযুক্ত তারাচরণ মুখোপাধ্যায় প্রবাসী বাঙ্গালী। তাঁহার জন্মস্থান ঢোলপুর। তাঁহারা দুই তিন পুরুষ পশ্চিম-প্রবাসী। তারাচরণ বাবু শক্তিশালী, সুপুরুষ; ঐ অঞ্চলে তিনি বিখ্যাত পালোয়ান বলিয়া পরিচিত। সম্প্রতি সিমলায় ভারতের প্রসিদ্ধ পালোয়ানদের প্রতিযোগী কুস্তিখেলা হয়; পাটিয়ালা ও ঢোলপুরের মহারাজা এই মল্লযুদ্ধের সকল ব্যয় বহন করেন ও মধ্যস্থতাও করেন। সেই মল্লযুদ্ধের ব্যাপারে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মল্ল বলিয়া স্বীকৃত শিখ পালোয়ান হরদয়াল সিংকে বাঙ্গালী তারাচরণ বাবু পরাজিত করিয়া পাটিয়ালার মহারাজার প্রদত্ত দশ হাজার টাকার পারিতোষিক লাভ করেন; কাশ্মীরের মহারাজা তাঁহাকে একজোড়া উৎকৃষ্ট দোশালা উপহার দেন। এই কুস্তি জেতাতে তারাচরণ বাবু ঢোলপুরের মহারাণা কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া তাঁহার এডিকং বা শরীররক্ষী ও প্রাইভেট সেক্রেটারী বা খাস মুন্সি নিযুক্ত হইয়াছেন। তারাচরণ বাবু কেবল বলচর্চ্চাই করেন নাই, বিদ্যাচর্চ্চাও করিয়াছেন। তিনি ইংরেজী, সংস্কৃত, পার্শী, হিন্দী ও বাঙ্গালা ভাষা উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়া

লাহোরে প্রবাসী বাঙ্গালীদের মল্লক্রীড়া।

লাহোরে সম্প্রতি প্রবাসী বাঙ্গালীদের মল্লক্রীড়া হইয়া গিয়াছে। ইহাতে অনেক শিক্ষিত অগ্রণীও যোগ দিয়া বয়ঃকনিষ্ঠদের দৃষ্টান্তস্থল হইয়াছিলেন। সার্ প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পুরস্কার বিতরণ করিয়াছিলেন। মোটা মানুষদের দৌড়, তিন-ঠ্যাঙ্গে দৌড়, প্রভৃতি অনেক রকম মজার দৌড় হইয়াছিল।

সর্ব্বত্র এইরূপ হওয়া উচিত। দুঃখের বিষয় কোথাও কোথাও আগে যাহা হইত, এখন তাহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এলাহাবাদে বাঙ্গালী সমিতির বার্ষিক উৎসবে নানা প্রকার মল্লক্রীড়া, লাঠিখেলা, কবিতা আবৃত্তি, মহিলাদের শিল্পকার্য্য প্রদর্শন, প্রভৃতি হইত। শুনিতে পাই, এখন আর তাহা হয় না।

১৩২২ মাঘ

রাণীর বাঘ শিকার।

সোঁড়ুর নামক ক্ষুদ্ররাজ্যের শ্রীমতী সৌভাগ্যবতী "তারারাজে" রাণীসাহিবা ঘোরপাড়ে একটি বাঘ শিকার করিয়াছেন। কিছুদিন হইতে তাঁহার শিকারের সখ চড়ে। গত বৎসর ৯ই আগস্ট সন্ধ্যা ৫৷৷১০ টার সময় সোঁড়ুর রাজ্যের স্বামী কার্ত্তিক পাহাড়ের পশ্চাতে তিনি এই বাঘ শিকার করেন। শিকারের সময় তাঁহার কাছে আর কোন মানুষ ছিল না; তিনি তখন শিকারের বেশেও ছিলেন না; কিন্তু বাঘকে সামনে আসিতে দেখিয়া অব্যর্থ সন্ধানে একগুলিতেই তাহার প্রাণবধ করেন। রাণীসাহেবা অক্কল-কোটের মহারাজার তৃতীয়া কন্যা। তাঁহার বয়স ন্যূনাধিক বিশ বৎসর। "হিন্দী চিত্রময় জগতে" এই সংবাদ ও রাণীর ছবি বাহির হইয়াছে।

১৩২৩ আষাঢ়

সতীর বীরত্ব।

মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুরের বেল্‌সাহেব ও তাঁহার স্ত্রী বনে বাঘ শিকার করিতে যান। একটা বাঘকে বেল্‌সাহেব গুলি করিবার পর সেটা পলাইয়া যায়। অনুচর ও সঙ্গীদের নিষেধসত্ত্বেও বেল্‌সাহেব তাহার অনুসরণ করেন। তাঁহার স্ত্রীও পশ্চাৎ পশ্চাৎ যান। বেল্‌সাহেব কতকদূর যাইবার

পর একটা ঝোপ হইতে বাঘ তাঁহার উপর লাফাইয়া পড়ে, এবং তাঁহাকে ফেলিয়া তাঁহার পেট চিরিয়া দেওয়ায় অন্ত্র বাহির হইয়া পড়ে। বাঘ তাঁহার নিতম্বদেশের হাড় চিবাইয়া পিষিয়া দেয়, এবং সেখানে মুখ দিয়া রক্ত পান করিতে থাকে। বাঘ কিম্বা শিকারী কোন শব্দ না করায় বিবি বেল্ দূর হইতে এই ভীষণ ব্যাপার ঘূণাক্ষরেও জানিতে পারেন নাই। তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াই এই লোমহর্ষণ হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখিতে পাইলেন; কিন্তু তাহাতে আত্মহারা না হইয়া বাঘটাকে লক্ষ্য করিয়া নিজের হাতের ছোট বন্দুক হইতে গুলি ছুড়িলেন। কিন্তু গুলি লাগিল না। বাঘ তখনও তাঁহার স্বামীকে ছাড়ে নাই, তাঁহার রক্ত পান করিতেছে। তিনি তখন জন্তুটাকে বন্দুকের ঘা ও লাথি মারিতে লাগিলেন। অবশেষে বাঘটা ভয় পাইয়া পলাইয়া গেল। সতী তখন স্বামীর অন্ত্র যথাস্থানে স্থাপিত করিয়া পেট ও অন্যান্য ক্ষত বাঁধিয়া দিলেন, এবং মাতা যেমন শিশুকে বহন করে, তেমনি করিয়া স্বামীকে বহন করিয়া ১৮ মাইল পথ চলিয়া নিকটতম রেলওএ ষ্টেশনে গিয়া চিকিৎসকেব সাহায্যের জন্য টেলিগ্রাফ করিলেন। কিন্তু স্বামীর প্রাণরক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি দেহত্যাগ করিলেন। ধন্য এই সতীর প্রেম, সাহস ও শক্তি!

১৩২৩ পৌষ

নকল যুদ্ধ।

কলিকাতার কয়েকটি ইংরেজী দৈনিক কাগজে নৌশেরায় কতকগুলি বাঙালী সিপাহী ও পাঠান সিপাহীর মধ্যে নকল যুদ্ধের একটি বৃত্তান্ত বাহির হইয়াছে। তাহাতে বাঙালীর ছেলেদের রণকৌশলে পারদর্শিতার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা সন্তোষজনক। কিন্তু ইহা লইয়া বড়াই করা এবং বলা যে পাঠান সিপাহী অপেক্ষা বাঙালী সিপাহীর শ্রেষ্ঠতার একটা প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, নিতান্তই ছেলেমানুষী; কোন সাবালক বাঙালী সম্পাদকের তাহা করা উচিত নয়। করিলে, যে-সব জাতি যুদ্ধ করিতে অভ্যস্ত, তাহাদের নিকট উপহাসাস্পদ হইতে হয়। উপহাস ইতিমধ্যেই কাগজে বাহির হইয়াছে। নকল যুদ্ধ পুরুষোচিত ক্রীড়ার মত; রণকৌশল শিখাইবার জন্য এই খেলা খেলিতে হয়। ক্রিকেট, ফুটবল, হকি, প্রভৃতির চেয়ে এ-খেলা শক্ত বটে, এবং ইহাতে বেশী কৌশলের এবং নেতৃত্ব-শক্তির প্রয়োজন হয়। কিন্তু তাহা হইলেও ইহা আসল যুদ্ধের সমতুল নয়।

বাঙালীর ছেলেদের সাহস সম্বন্ধে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। এইজন্য তাহাদের কোন একটা সাধারণ কৃতিত্বে তৃপ্তিলাভ করিলেও আমরা উৎফুল্ল হইয়া বড়াই করিবার কারণ দেখি না। এ রকম বাহাদুরী ত তাহারা দেখাইবেই। যে-সব জাতি অনেক দিন হইতে যুদ্ধ করিয়া আসিতেছে, যুদ্ধক্ষেত্রে তাহাদের যেরূপ কীর্ত্তি উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয়, আমাদের ছেলেরাও যুদ্ধক্ষেত্রে তেমন কিছু করিলে আমাদের তাহাতে উৎফুল্ল হওয়া হয়ত চলিতে পারে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা সুশোভন

ও সঙ্গত হয়, যদি আগে অ-বাঙালী কাগজে বাঙালীর ছেলেদের প্রশংসা বাহির হয়, এবং পরে তাহা বাঙালীদের কাগজে উদ্ধৃত হয়। কাঁচা ভিত্তির উপর বড়াইয়ের বিরাট অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে যাওয়া সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে।

১৩২৫ মাঘ

চিকিৎসক-কন্‌ফারেন্স

বৎসর বৎসর বহুলক্ষ লোক লরিয়া, কলেরা, প্রভৃতি রোগে মারা পড়ে। বিনা চিকিৎসায় অধিকাংশের মৃত্যু হয়। যখন নূতন কোন একটা রোগ দেশে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন আরো মর্ম্মান্তিক ভাবে চিকিৎসকের অভাব উপলব্ধি করিতে পারা যায়। দিল্লীতে চিকিৎসক কন্‌ফারেন্সে সভাপতি সার্ নীলরতন সরকার ঠিকই বলিয়াছেন, যে, ইনফ্লুয়েঞ্জায় প্রত্যেক ডাক্তারকে খুব পরিশ্রম করিতে হইয়াছে; কিন্তু তাঁহাদিগকে হার মানিতে হইয়াছে, হাজার হাজার লোক বিনা চিকিৎসায় মারা পড়িয়াছে। তিনি যে বলিয়াছেন যে আরও অনেক চিকিৎসা- শিক্ষালয় চাই, নারীদের জন্য অনেক চিকিৎসা- শিক্ষালয় চাই, ইহা অতি ঠিক কথা। মানুষ আগে বাঁচিবে, তবে ত তাহার দ্বারা নিজের উন্নতি ও দেশের উন্নতি হইবে? শত শত ছাত্র মেডিক্যাল কলেজে স্কুলে স্থান পায় না। দেশে সাধারণ ইস্কুল কলেজ বাড়িতেছে, ভাল; কিন্তু চিকিৎসা-শিক্ষালয় বৃদ্ধি তদপেক্ষাও আবশ্যক। বেলগেছিয়া কলেজটিকে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন করা চাই; প্রত্যেক বিভাগীয়-কেন্দ্রে একটি করিয়া মেডিক্যাল কলেজ চাই; এবং প্রত্যেক জেলার হাঁসপাতালের সংস্রবে একটি করিয়া চিকিৎসাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। নারীদের শিক্ষার জন্যও স্বতন্ত্র একাধিক শিক্ষালয় চাই।

ডাক্তার সরকারের বক্তৃতায় এবং অন্য বক্তৃতাতেও আয়ুর্ব্বেদসম্মত চিকিৎসার কথা ছিল। ডাক্তারদেরও ইহা হইতে শিখিবার আছে, এবং কবিরাজদের ত ইহা ভাল করিয়া শিক্ষা করাই উচিত। কোন চিকিৎসা-প্রণালী নির্ভুল নহে, কিম্বা এখন বা অতীতকালে চরম উন্নতি লাভ করে নাই। প্রত্যেকের প্রণালী ও ঔষধ বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষিত হওয়া চাই। দুঃখের বিষয় ডাক্তার বা কবিরাজ কোন পক্ষ হইতেই আয়ুর্ব্বেদের বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরীক্ষা ও উন্নতির চেষ্টা হইতেছে না। আয়ুর্ব্বেদীয় বিদ্যালয় দুএকটি আছে শুনিয়াছি। তাহাদের শিক্ষাপ্রণালীতে মানব-শরীরের পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রত্যক্ষ জ্ঞান কেমন করিয়া দেওয়া হয়, রোগের প্রত্যক্ষ জ্ঞান কেমন করিয়া দেওয়া হয়, গাছ গাছড়া ঔষধের পরিচয় উদ্যানাদির সাহায্যে কিম্বা অন্ততঃ চিত্রের সাহায্যে দেওয়া হয় কি না, জানিতে ইচ্ছা হয়। এলাহাবাদের পাণিনি আফিস্ হইতে যে ইণ্ডিয়ান মেডিসিন্যাল প্ল্যাণ্টস্ নামক সচিত্র বৈজ্ঞানিক বহি বাহির হইয়াছে, তাহার বিজ্ঞাপনে দেখিতেছি, কলিকাতার কেবল একজন চিকিৎসক তাহা কিনিয়াছেন; কিন্তু তিনি কবিরাজ নহেন। ইংরেজী জানা কবিরাজেরাও বোধ হয় তাঁহাদের ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিবার জন্যও এরূপ বহির প্রয়োজন অনুভব

করেন না। এ বিষয়ে মিউজিয়মে একজন ইংরেজ ডাক্তারের বক্তৃতার বিজ্ঞাপন দেখিয়াছিলাম। তাহাতে বুঝা যায়, ইংরেজরা এইরূপ বহির সাহায্যে ভারতীয় গাছ গাছড়া হইতে নূতন নূতন ঔষধ প্রস্তুত করিয়া ধনশালী হইবে, এবং আমরা তাহা বিলাত হইতে আমদানী করিয়া সেবন করিব; এবং কোন ইংরেজ ডাক্তার আয়ুর্ব্বেদসম্মত চিকিৎসার নিন্দা করিলে খুব জোর কলমে লিখিব ও জোর গলায় বলিব, "আমাদের আয়ুর্ব্বেদের মত অভ্রান্ত ও অব্যর্থ চিকিৎসাশাস্ত্র পৃথিবীতে নাই, ইহা খুব বৈজ্ঞানিক; এলোপ্যাথী ত হাতুড়িয়ার ব্যাপার।"

১৩২৭ বৈশাখ

স্বাস্থ্য ও শিশুমঙ্গল প্রদর্শনী।

টাউনহলের স্বাস্থ্য ও শিশুমঙ্গল প্রদর্শনী দেখিতে গিয়াছিলাম। ইহা হইতে নূতন কিছু শিখিয়াছি, ভাল করিয়া দেখিবার ও জিজ্ঞাসা করিবার সময় থাকিলে তার চেয়ে অনেক বেশী শিখিতে পারিতাম। প্রত্যেক সহরে ও গ্রামে এরূপ প্রদর্শনী দীর্ঘকাল খোলা থাকিলে অনেক উপকার হয়। ইহা সত্য, যে, দারিদ্র্য, ভাল খাইবার পরিবার ঘর করিবার সামর্থ্য না থাকা, রুগ্নতার ও শিশুমৃত্যুর ভীষণ আধিক্যের প্রধান কারণ; কিন্তু স্বাস্থ্যের নিয়ম না জানা ও তাহা পালন না করা এবং সূতিকাগারের শোচনীয় অবস্থাও যে প্রধান কারণ, তাহা অস্বীকার করা যায় না। দারিদ্র্যই একমাত্র কারণ হইলে কলিকাতার বড়বাজার প্রভৃতি ধনী মাড়োয়ারীদের বাসস্থানগুলিতে শিশুমৃত্যু সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইত না। দারিদ্র্য দূর করিবার চেষ্টা অবশ্যই হওয়া উচিত; কিন্তু স্বাস্থ্যসম্বন্ধে জ্ঞান বাড়াইবার, সূতিকাগৃহের অবস্থার উন্নতি করিবার চেষ্টাও হওয়া চাই। যদি কেহ স্বাস্থ্যবিষয়ক জ্ঞান বিস্তার করিতে চান, সূতিকাগৃহের অবস্থা ভাল করিতে বলেন ও তাহার পথ দেখাইয়া দেন, তাহা হইলে এই বলিয়া চীৎকার করা উচিত নয়, যে, "যেহেতু দারিদ্র্য রুগ্নতার ও শিশুমৃত্যুর আধিক্যের প্রধান কারণ এবং তুমি তাহা দূর করিবার চেষ্টা করিতেছ না, অতএব তোমার প্রদর্শনীটা বাজে, অনাবশ্যক, অকেজো, ভূয়ো ইত্যাদি। এ-কথাও ভোলা উচিত নয় যে স্বাস্থ্যের উন্নতি হইলে মানুষ শ্রম করিতে পারে, ও রোজগার করিয়া দারিদ্র্য দূর করিতে পারে।

প্রদর্শনী সম্বন্ধে আমাদের একটা প্রস্তাব এই যে ইহার ছবিসমূহে লিখিত নাম ও বিবরণ যতদূর সম্ভব বাংলায় হওয়া চাই। এরূপ প্রদর্শনী সব শহরে ও গ্রামে খোলা সম্ভবপর নহে। এইজন্য প্রদর্শনীর প্রধান প্রধান ছবি প্রভৃতির বড় বড় হাফটোন ব্লক করাইয়া তাহা ছাপিয়া বর্ণনাসহ এল্‌বাম্ বা ছবির বহির আকারে অল্পমূল্যে বিক্রী করিলে লোকের উপকার হইবে।

বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলীর যে-সব ছবি ছোট আকারে এবার প্রবাসীতে দেওয়া হইয়াছে, তাহার অনেকগুলির মূল ছবি টাউনহলের প্রদর্শনীতে দেখান হইয়াছে।

১৩২৭ অগ্রহায়ণ
দৌড়ে দক্ষ ভারতীয় ওস্তাদ।

খেলায় বা ব্যায়ামে যে বহু লোককে পরাজিত করিয়া জয়ী হয় তাকে ইংরেজিতে চ্যাম্পিয়ান বা ওস্তাদ বলে। য়ুরোপে মাঝে মাঝে সার্ব্বভৌম খেলোয়াড়দের প্রতিযোগিতা হয়; তাকে ম্যারাথন বলে। লণ্ডনের হার্নহীল পাড়ায় গানার্সবেরী পার্কে এক ম্যারাথন প্রতিযোগিতা হয়; তাতে ১০ মাইল ও ১৩ মাইল লম্বা দৌড়ে বোম্বাই এর শ্রীযুক্ত চৌগুলে প্রথম হইয়াছেন। চৌগুলের বয়স মাত্র ২৩ বৎসর। উইণ্ডসর হইতে লণ্ডন পর্য্যন্ত দৌড়ে তিনি চতুর্থ আসিতেছিলেন; ২০ মাইল দৌড়ের পর তিনি নিবৃত্ত হইতে বাধ্য হন। বেল্‌জিয়মের এণ্ট্‌ওার্পে ৬০ জন দৌড়ওয়ালার মধ্যে চৌগুলে ১৯ স্থান লইয়া সার্টিফিকেট পান; তখন তাঁর শরীর অসুস্থ ছিল বলিয়া ডাক্তারের চিকিৎসাধীন ছিলেন, নতুবা ফল আরো ভালো হইত আশা করা যায়। এদেশ থেকে যেসব খেলোয়াড় প্রতিযোগিতা করিতে য়ুরোপে গিয়াছিলেন, তাঁদের খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা ভালো করা হয় নাই বলিয়াই তাহাদের স্বাস্থ্য খারাপ হইয়াছিল বলিয়া তাঁরা অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন।

সম্প্রতি বোম্বাই শহরে ম্যারাথন দৌড় হইয়া গেল। তাতে ২৭ মাইল দৌড়ে অন্যান্য খেলোয়াড় চৌগুলে অপেক্ষা কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

১৩২৮ আষাঢ়
বাচ্‌খেলা

বিলাতে কেম্ব্রিজ ও অক্সফর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বাচ্-খেলার প্রতিযোগিতা পৃথিবীর একটা বার্ষিক প্রধান হুজুক। এই নৌ-চালন প্রতিযোগিতায় যাহারা জিতে, তাহাদের খুব বেশী আদর সম্মান হয়; সে সম্মান কেম্ব্রিজের র‍্যাংলারদের চেয়ে বেশী বই কম নয়। এই খেলা দেখিবার জন্য নদীর দুধারে কাতারে কাতারে লক্ষাধিক লোক দাঁড়াইয়া যায়। শারীরিক বল ও দক্ষতার প্রতিযোগিতা দেখা অপেক্ষা স্বয়ং শারীরিক বল ও দক্ষতা লাভের চেষ্টা করা অধিক বাঞ্ছনীয়; সুতরাং খেলা দেখা অপেক্ষা খেলা করা ভাল ও দর্‌কার বটে, কিন্তু দেখিবার হুজুক্‌ও নিরর্থক নহে। ইহা জাতির মধ্যে শারীরিক বলের আদর ও চর্চ্চার পরিচায়ক ও পরিবর্দ্ধক। সেইজন্য সম্প্রতি কলিকাতার নূতন খালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বেঙ্গাল কেমিক্যাল কার্‌খানার লোকদের মধ্যে যে প্রতিযোগিতা হইয়া গিয়াছে, তাহা উল্লেখযোগ্য ও আদরণীয়। "বেঙ্গালী" কাগজে দেখিলাম, দর্শিকা ও দর্শকের ভিড় ও উৎসাহ খুব হইয়াছিল, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের জিত্‌ হইয়াছিল। ভবিষ্যতে ঢাকা, কলিকাতা, কাশী, পাটনা, লক্ষ্ণৌ, প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে, এবং কলেজে কলেজেও

প্রতিযোগিতা প্রবর্ত্তিত হইতে পারিবে। বেঙ্গল-কেমিক্যাল্ কার্‌খানার কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের চিরাভ্যস্ত আতিথেয়তা অনুসারে দর্শকদিগকে শীতল পানীয় এবং প্রতিযোগীদিগকে মিষ্টান্ন দ্বারা তৃপ্ত করিয়াছিলেন! তাঁহারা নিজের কর্ম্মচারীদিগকে সুস্থ ও আনন্দিত রাখিবার চেষ্টা এক্ষেত্রেও করিয়াছেন।

বাজী-রাখা

"বেঙ্গালীতে" এই বাচ্-খেলার বৃত্তান্তের অন্যান্য অংশ পড়িয়া তৃপ্ত হইয়াছি; কেবল একটি কথায় আশঙ্কা হইয়াছে। এক জায়গায় লেখা আছে :—

"For several days past, training had been going on apace, and both the University and B. C. P. W. rowers developed a form that won everybody's admiration and would have made betting extremely difficult."

"গত কয়েকদিন ধরিয়া দাঁড়ীদিগের শিক্ষা ও অভ্যাস দ্রুত চলিতেছিল, এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও বেঙ্গল কেমিক্যালের দাঁড়ীরা এমন একটা ধরণধারণ অর্জ্জন করিয়াছিল যাহা সকলেরই প্রশংসা লাভ কবিয়াছিল, এবং যাহা (কোন্ দল জিতিবে তৎসম্বন্ধে) বাজী রাখা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার করিয়া তুলিত।"

আশা করি সত্যসত্যই বাজী কেহ রাখে নাই, এবং বাজী রাখা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। ইহাও এক-রকম জুয়া খেলা। ঘোড়দৌড়ের বাজী রাখা ইংরেজ ফিরিঙ্গীদের সমাজ হইতে দেশী লোকদের মধ্যেও সংক্রামিত হইয়া মহা অনিষ্ট করিতেছে। ইহা উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত ইংরেজরা, সম্রাট সম্রাজ্ঞী পর্য্যন্ত, করে বলিয়াও আমাদিগকেও এই গর্হিত কাজ করিতে হইবে, ইহা যেন কেহ না ভাবেন। ঘোড়দৌড় বিষয়ক কোন ইঙ্গিত ইসারা হদিস্ কোন খবরের কাগজেই বাহির হওয়া উচিত নয়। যাঁহারা শাস্ত্র মানেন, অন্ততঃ শাস্ত্রের যুক্তিসঙ্গত ও হিতকর ব্যবস্থা পালনীয় মনে করেন, তাঁহাদের জন্য মনুসংহিতার নবম অধ্যায় হইতে এই বিষয়ে এবং এতৎসদৃশ অন্য কোন কোন বিষয়ে মনুর উপদেশ তুলিয়া দিতেছি :—

দ্যূতং সমাহ্বয়ঞ্চৈব রাজা রাষ্ট্রান্নিবারয়েৎ।
রাজ্যান্তকরণাবেতৌ দ্বৌ দোষৌ পৃথিবীক্ষিতাম্॥
প্রকাশমেতৎ তাস্কর্য্যং যদ্দেবনসমাহ্বয়ৌ।
তয়োর্নিত্যং প্রতীঘাতে নৃপতির্যত্নবান্ ভবেৎ॥
অপ্রাণিভির্যৎ ক্রিয়তে তল্লোকে দ্যূতমুচ্যতে।
প্রাণিভিঃ ক্রিয়তে যস্তু স বিজ্ঞেয়ঃ সমাহ্বয়ঃ॥
দ্যূতম্ সমাহ্বয়ঞ্চৈব যঃ কুর্য্যাৎ কারয়েত বা।
তান্ সর্ব্বান্ যাতয়েদ্রাজা শূদ্রাংশ্চ দ্বিজলিঙ্গিনঃ॥
কিতবান্ কুশীলবান্ ক্রূরান্ পাষণ্ডস্থাংশ্চমানবান্।
বিকর্ম্মস্থান্ শৌণ্ডিকাংশ্চ ক্ষিপ্রং নির্ব্বাসয়েৎ পুরাৎ॥
এতে রাষ্ট্রে বর্ত্তমানা রাজ্ঞঃ প্রচ্ছন্নতস্করাঃ।
বিকর্ম্মক্রিয়য়া নিত্যং বাধন্তে ভদ্রিকাঃ প্রজাঃ॥
দ্যূতমেতৎ পুরাকল্পে দৃষ্টং বৈরকরং মহৎ।
তস্মাদ্ দ্যূতং ন সেবেত হাস্যার্থমপি বুদ্ধিমান্॥
প্রচ্ছন্নং বা প্রকাশং বা তন্নিষেবেত যো নরঃ।
তস্য দণ্ডবিকল্প স্যাদ্ যথেষ্টং নৃপতেস্তথা॥

(২২১ হইতে ২২৮ শ্লোক)।

বর্ত্তমান কালের উপযোগী হইবার আবশ্যক অংশের তাৎপর্য্য :

"রাজা রাজ্য হইতে দ্যূতক্রীড়া এবং সমাহ্বয় [বাজী-রাখা সমাহ্বয়ের অন্তর্গত] নিবারণ করিবেন। এই দুই দোষ রাজাদিগের রাজ্যনাশক। দ্যূত এবং সম্যাহ্বয় প্রকাশ্য চৌর্য্য মাত্র; এজন্য ইহাদের নিবারণে রাজা নিত্য যত্নবান্ থাকিবেন। অক্ষশলাকাদি অপ্রাণী দ্বারা ক্রীড়া করাকে দ্যূত বলে এবং মেষ-কুক্কুটাদি প্রাণী দ্বারা পণপূর্ব্বক যে ক্রীড়া, তাহাকে সমাহ্বয় বলে। যে-ব্যক্তি দ্যূতক্রীড়া ও সমাহ্বয় নিজে করে বা অপরের দ্বারা করায়, রাজা তাহাদের সকলকে দণ্ড দিবেন। কিতব অর্থাৎ দ্যূতসমাহ্বয়কর্ত্তা, নটবৃত্তি [নৃত্যগীতবৃত্তি] ব্যপদেশে বশ্যাবৃত্তিজীবী ক্রুরচেষ্ট, চৌরাদি, এবং মদ্যবিক্রেতা শৌণ্ডিকাদিকে পুরের ভিতর বাস করিতে দিবে না। এই-সকল প্রচ্ছন্ন তস্করেরা রাজ্যে বসতি করিলে নানা প্রকার বঞ্চনাদি অধর্ম্ম দ্বারা ভদ্র প্রজাদিগকে নিত্যই পীড়া দেয়। দ্যূত যে মহৎ বৈরকর—ইহা পুরাণ কথাতেও দৃষ্ট হইয়া থাকে; এজন্য বুদ্ধিমান্ জন পরিহাসচ্ছলেও দ্যূতসেবা করিবেন না। প্রচ্ছন্নভাবে বা প্রকাশ্যরূপে যে ব্যক্তি দ্যূতক্রীড়া করে রাজা তাহার প্রতি যথেষ্ট দণ্ড ব্যবস্থা করিবেন।"—বঙ্গবাসীর সংস্করণ অবলম্বনে লিখিত।

পাঠকেরা লক্ষ্য করিবেন, মনুর বিধান অনুসারে কোন্ কোন্ রঙ্গালয়ের লোকদিগকে কলিকাতা হইতে তাড়াইয়া দেওয়া উচিত।

১৩২৮ কার্ত্তিক

ঘোড়দৌড়ে জুয়াখেলা

কলিকাতায় ঘোড়দৌড়ে জুয়াখেলা সমাজের একটা মস্ত কুপ্রথা হইয়া উঠিয়াছে। চোর গাঁটকাটা হইতে রাজা-মহারাজা পর্য্যন্ত সকলে উহার কবলে আসিয়া পড়িতেছে। ঘোড়দৌড়ের দিনে যেদিকে খেলা হয় হাজার হাজার লোক সেদিকে যায়। অনেকে সেদিন নিজের উপজীবিকার ক্ষতি করিয়া ও কাজকর্ম্ম আফিস আদালত কামাই করিয়া জুয়া খেলিতে যায়। দ্বিপ্রহরের পূর্ব্ব হইতে অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত সেদিন ট্রাম, মোটর, ঘোড়ার গাড়ীর হুড়াহুড়ি লাগিয়া যায়। সকলকারই এক উদ্দেশ্য—কিরূপে পরিশ্রম বা বুদ্ধিখরচ না করিয়া হঠাৎ কপাল ঠুকিয়া বড় মানুষ হওয়া যায়। ফলে শত শত "ভদ্র" ও "ইতর" লোক বাড়ী, গহনা, পোষাক, পরিচ্ছদ, আস্বাব, পুস্তক বাঁধা দিয়া বা বিক্রী করিয়া জুয়া খেলে। হারিলে তাদের স্ত্রীপুত্রপরিবার সংস্থানহীন হয়। সময়ে সময়ে তাহাদের গ্রাস-আচ্ছাদন সমস্যার বিষয় হইয়া পড়ে। তারা নিজে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তাদের মধ্যে কেহ বা চোর হয়, কেহ বা জুয়াচোর, আর কেহ বা পাগল হইয়া যায়। জিতিলে প্রায়ই বদখর্চে ও কুচরিত্র হয়। এই কুপ্রথা যতশীঘ্র সমাজের শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিদের ও স্বেচ্ছা- সেবকদলের যুবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, ততই মঙ্গল। আইন দ্বারা অন্যান্য রকমের জুয়াখেলার মত ইহাও বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। যে-সব খবরের কাগজ ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার উপর বাজী-রাখার খবর, এবং বাজী জিতিবার সঙ্কেত প্রকাশ করেন, তাঁহাদের তাহা বন্ধ করা উচিত। অন্যান্য জুয়াখেলার মত ইহাও অভদ্র ব্যসন, এইরূপ লোকমত যাহাতে প্রবল হয়, তাহার বিহিত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

১৩২৯ অগ্রহায়ণ

বাঙ্গালী-বীর ভীম ভবানী

শক্তিচর্চ্চা আমাদের দেশে এক সময়ে খুবই প্রচলিত ছিল। আমাদের বাঙ্গালা দেশে এককালে ঘরে ঘরে শক্তিমান্ পুরুষের কথা শুনা যাইত, এখন সে-সব স্বপ্ন বলিয়াই মনে হয়। যে দু চারজন বাঙ্গালী দেহশক্তির জন্য এখনও প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারিয়াছেন তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন ভীম ভবানী। কিন্তু দুঃখের বিষয় অল্প বয়সেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

ভবানী ১৪/১৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অতি জীর্ণকায়, ম্যালেরিয়াগ্রস্ত ছিলেন। সেই সময়ে একদিন সমবয়স্ক একটি ছেলে ভবানীকে প্রহার করে। তাহাতে ভবানীর মনে বড়ই ধিক্কার আসে। তিনি এই সময় হইতেই শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টায় তৎপর হইয়া উঠেন।

কলিকাতা দর্জ্জিপাড়ায় তখন গুহ বাবুদের বাড়ীতে পালোয়ানের আখড়া। ভবানী ক্ষেতু বাবুর শরণ লইল। ক্ষেতু গুহের আখ্‌ড়াতেই বাঙ্গালীর মুখোজ্জলকারী দুইটি যুবকই কুস্তির প্যাঁচ শিখিতে লাগিল। এই দু'জনেই আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র বীর বলিয়া পরিচিত—একটি আমাদের ভীম ভবানী, অন্যটি গোবর বাবু।

ভবানীর যখন ১৯ বৎসর বয়স, তখন সুপ্রসিদ্ধ রামমূর্ত্তি কলিকাতার খেলা দেখাইতে আসেন। ভবানী খেলা দেখিতে গিয়াছেন। তাঁবুতে তিল ধারণের স্থান নাই, ভবানী হতাশ ভাবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। হঠাৎ কাহার করস্পর্শে চমকিত হইয়া ভবানী ফিরিয়া দেখেন, এক অপূর্ব্ব সুন্দর দিব্যকায় ব্যক্তি! তেমন বীরমূর্ত্তি আর কখনও ভবানী দেখিয়াছেন বলিয়া মনে হইল না। আগন্তুক নির্ণিমেষ নেত্রে ভবানীর দিকে চাহিয়া ছিলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত অতিবাহিত হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি খেলা দেখিতে আসিয়াছ?" তাহাই উদ্দেশ্য শুনিয়া আগন্তুক ভবানীর হাত ধরিয়া সস্নেহে বলিলেন, "তুমি আমার সঙ্গে আইস; আমি তোমাকে ভাল জায়গা দিতেছি।" তাঁবুর মধ্যে সেখানে দলের লোকেরা বসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, সেইখানে একখানা আসন দেখাইয়া দিয়া তিনি ভবানীকে বলিলেন, "বস!"

বীরকায় পুরুষ পলকহীন নেত্রে তখনও সেই বঙ্গীয় যুবকের দেহের দিকে চাহিয়া ছিলেন। তিনি ভবানীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বয়স কত?"

ভবানী বলিলেন, "উনিশ।"

"এই বয়সে তোমার এমন শরীর! আমি অনেক কুস্তিগীর পালোয়ান দেখিয়াছি। এমন অঙ্গসৌষ্ঠব, এমন বীর গঠন ত দেখি নাই! তোমার মত যুবক পাইলে আমার সর্ব্ববিদ্যা দিয়া পারদর্শী করিয়া তুলি!"

ভবানী তখনই জানিতে পারেন, ইনিই সুবিখ্যাত প্রোফেসর রামমূর্ত্তি! ভবানীও রামমূর্ত্তির বীরপনা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন; তাঁহার বীর বপুর দিকে চাহিতে চাহিতে ভবানীর তরুণ হৃদয়ের মধ্যে তুফান বহিল। খেলা ভঙ্গে রামমূর্ত্তি আবার সস্নেহে ভবানীকে আহ্বান করিলেন।

মনস্থির করিতে, ভবানীর দিন তিনেক লাগিয়াছিল। রামমূর্ত্তির সাদর আহ্বান তিনি উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। রামমূর্ত্তি ভবানীকে পাইয়া হর্ষ প্রকাশ করিলেন।

কিন্তু বাড়ীর লোকের মত পাওয়া শক্ত। জননী জীবিত, তিনি জানিতে পারিলে কিছুতেই রাজী হইবেন না। অতএব না বলিয়া পলায়ন করাই ভবানী যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন। তিনি রামমূর্ত্তির দলের সহিত একেবারেই রেঙ্গুন যান। রেঙ্গুন হইতে সিঙ্গাপুর, যবদ্বীপ প্রভৃতি পরিভ্রমণ করেন।

যবদ্বীপে এক ওলন্দাজ পালোয়ান রামমূর্ত্তির বীরত্বে সন্দিহান হইয়া তাঁহার সহিত মল্লযুদ্ধের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কেহ চ্যালেঞ্জ করিলে প্রত্যাখ্যান

করা বীরধর্ম্মের বিরুদ্ধ। রামমূর্ত্তি সম্মত হইলেন। ভবানী নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিলেন, বলিলেন, "গুরুদেব! আমি আপনার শিষ্য।—আমার সঙ্গে আগে লড়ুক, আমি হারিলে গুরুদেব আছেন।"

রামমূর্ত্তি মহা খুসী হইয়া সম্মতি দিলেন।

তিন মিনিটের মধ্যে ওলন্দাজ পালোয়ান পরাজিত হইল। তখন রামমূর্ত্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সাহেব, গুরুর সঙ্গে লড়িবে?"

ওলন্দাজের আর "গুরু" দেখিবার ইচ্ছা ছিল না। তিনি মুখটি চুন করিয়া সরিয়া পড়িলেন।

রামমূর্ত্তির স্নেহ ভোগ করা ভবানীর ভাগ্যে বেশী দিন ঘটে নাই। বিদ্যার পারদর্শিতায় শিষ্য গুরুকে ছাড়াইয়া উঠিতেছে দেখিয়া রামমূর্ত্তি ভবানীকে দূর করিয়া দিলেন। ভবানী বঙ্গদেশে ফিরিলেন।

প্রোফেসর বসাকের হিপোড্রোম সার্কাস তখন এসিয়াখণ্ডে খেলা দেখাইয়া বেড়াইতেছিল। তাঁহারা ভবানীকে লইয়া সফরে বাহির হইলেন। ভবানী সেই প্রথম স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে আত্মবলের পরিচয় দিলেন। সে কি পরিচয়! কিছুদিন পূর্ব্বে লোকে রামমূর্ত্তির অদ্ভুত বলের পরীক্ষা দেখিয়াছিল, এবার যাহা দেখিল, তাহা আরো আশ্চর্য্য!

রামমূর্ত্তি একখানা মোটর-গাড়ী টানিয়া রাখিতেন, ভবানী দু'খানাকে দুই হাতে অচল করিয়া দিলেন; ৫ মণ বারবেলটাকে শিশুর ক্রীড়নকের মত দেখাইলেন; সিমেন্টের পিপের উপর ৫/৭ জন লোককে বসাইয়া পিপের ধার দাঁতে চাপিয়া তুলিয়া পিপে সুদ্ধ লোকদের শূন্যে ঘুরাইয়া দিলেন; বুকের উপর চল্লিশ মণী পাথর চাপাইয়া তাহার উপর বিশ পঁচিশজনকে খাম্বাজ খেয়াল গাহিবার অবসর দিলেন। লোকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেল।

সাঙ্ঘাইতে থাকিতে ফার্ম্মার নামে একজন মার্কিন পালোয়ান ভবানীকে চ্যালেঞ্জ করে। ১০০০ ডলার বাজী। মার্কিন পালোয়ান বেচারা হারিয়া, ১০০০ ডলার গণিয়া দিয়া ধুলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে মাঠ ছাড়িয়া চলিয়া যায়। ফার্ম্মার অপমানের প্রতিশোধ লইতে ভবানীর জীবন-নাশের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়। স্থানীয় কন্‌সাল ভবানীর প্রাণ রক্ষা করেন। ফার্ম্মারের ক্রোধের কারণ জানিয়া কন্‌সাল স্বচক্ষে একবার বাঙ্গালী বীরের শক্তির পরিচয় লইবার অভিলাষ জ্ঞাপন করেন। তাঁহার একখানি নূতন মিনার্ভা মোটর-গাড়ী ছিল। তিনি বলিলেন, আমি গাড়ী চালাইব, ভবানী যদি আমার গাড়ী থামাইতে পারেন এই গাড়ী তাঁহার। ভবানী সফল হইলেন, মিনার্ভা গাড়ীখানি পাইয়া ভবানী তাহা সেইখানেই বিক্রয় করিয়া দেন।

জাপানের মহিমান্বিত সম্রাট মিকাডো মহোদয় একবার ভবানীর বলের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে একখানি সুবর্ণপদক ও নগদ ৭৫০ টাকা পুরস্কার দেন।

এসিয়া জয় করিয়া ভবানী ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিলেন। সমগ্র ভারতময় ভবানীর বীরত্বের খ্যাতি বিস্তৃত হইয়া পড়িল।

ভরতপুরের মহারাজ একবার বলেন, ভবানী যদি তিনখানা মোটর ধরিতে পারেন তবে তাঁহাকে হাজার টাকা পুরস্কার দিব। ভবানী ইতিপূর্ব্বেই দুই হস্তে দুখানা মোটর ধরিয়া তাঁহার অমানুষিক বলের পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু তিনখানা যে কিরূপে ধরিবেন তাহা তাঁহার বুদ্ধির অগোচর ছিল। তথাপি সম্মত হইলেন।

ভরতপুরের মহারাজ বাহাদুর, ইংরেজ রেসিডেণ্ট ও রাজমন্ত্রী তিনজনে তিনখানা মোটরে চড়িয়া বসিলেন। গাড়ীগুলির পিছনে প্রকাণ্ড রজ্জু বাঁধা হইল। ভবানী একটা কোমরে ও দুইটি রজ্জু দুই হস্তে ধরিয়া বলিলেন—"Go"। তিনজনেই একসঙ্গে স্টার্ট দিলেন। বিরাট শব্দ করিয়া এঞ্জিন চলিল। স্পীডোমিটারে জানা গেল এঞ্জিন পুরাদমে চলিতেছে, কিন্তু কোন গাড়ীই এক ইঞ্চিও নড়িতে চড়িতে পারিল না, যেখানে ছিল সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। গাড়ী তিনখানির পিছনের চাকাগুলি শূন্যে উঠিয়া পড়িল—খর-র-র শব্দে চাকাই ঘুরিতে লাগিল।

একখানা পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি লোহার বরগার উপর ৩০ জন লোককে বসাইয়া কাঁধের উপর ঝুলাইয়া ভবানী সেখানাকে অর্দ্ধবৃত্তাকারে পরিণত

করিতে পারিতেন। সর্ব্বাঙ্গ লৌহ-শিকলে বাঁধিয়া ভবানী কেবলমাত্র নিশ্বাসের শব্দের সঙ্গেই মুক্ত হইতে পারিতেন—চক্ষের পলক ফেলিতে যতটুকু সময় লাগে, ততটুকু সময়ের মধ্যেই ভবানী ফুলের মালার মতই শিকলটাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দাঁড়াইতেন।

৫০ জন করিয়া মানুষ-বোঝাই দুইখানি গো-শকট একই সময় একসঙ্গে বুক ও উরু দেশের উপর দিয়া চলিয়া গেলেও ভবানী ক্লেশ বোধ করিতেন না।

ভবানীর শিক্ষাগুরু প্রোফেসর রামমূর্ত্তি সর্ব্বপ্রথম বুকের উপর হাতী চালাইয়া অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় দেন। পরে আরও দুইজন বঙ্গীয় বীর বক্ষে হাতী ধরিয়াছেন। সে-সকলই সার্কাস-দলের শিক্ষিত হাতী। ভবানীও এতদিন সার্কাসের হাতীই বুকের উপর তুলিতে ছিলেন—এ পর্য্যন্ত অন্য হাতী তোলার চেষ্টাও করেন নাই। এক বার মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরের হাতীশালায় এক বুনো হাতী আসিয়া হাজির হয়। হাতীটা ওজনে ও আয়তনে সচরাচর যে-সব হাতী দেখা যায় তার চেয়ে অনেক বেশী। দৈর্ঘ্যে জীবটি, নয় ফুট সাত ইঞ্চি। নবাব বাহাদুরের ইচ্ছা, বুনো হাতিটাকে ভবানী বুকের উপর দিয়া চালাইতে পারেন কি না পরীক্ষা করা। ভবানী নবাব- বাহাদুরের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, নবাব বাহাদুরের সন্তোষবিধানার্থ হাতীটাকে বুকের উপর দিয়া চালাইতে তিনি সম্মত আছেন।

ভবানী যখন সহস্র সহস্র দর্শকের সম্মুখে স্বয়ং নবাব বাহাদুর ও তদানীন্তন বাংলার লাটের সাক্ষাতে বুকের উপর দিয়া সেই হাতীটাকে চালাইয়া দিয়া সুস্থ ও অক্ষত দেহে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তখন দিগ্‌দিগন্তে তাঁহার জয়ধ্বনি উঠিল।

ভবানী সর্ব্বসুদ্ধ ১২ খানি স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক পাইয়াছিলেন। পদক ব্যতীত শাল আলোয়ান অঙ্গুরী মোটর-গাড়ী নগদ মুদ্রাও তিনি যথেষ্ট পাইয়াছিলেন। বাঙ্গালী জাতি—ভারতবাসী—তাঁহার সম্মানে সম্মানিত হইয়াছেন।

স্বদেশী-মেলায় দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তির সম্মুখে বীরত্ব-লীলা দেখাইয়া ভবানী 'ভীম' আখ্যা প্রাপ্ত হন।

পশ্চিমাঞ্চলে ইঁহাকে লোকে "ভীম-মূর্ত্তি" বলিয়া থাকে।

ভীমমূর্ত্তির আসল নাম হইতেছে, ভবেন্দ্রমোহন সাহা। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বীডন স্ট্রীটের সাহা বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। ভবেন্দ্রের পিতা ৺উপেন্দ্রমোহন সাহাও বলিষ্ঠকায় পুরুষ ছিলেন। ভবানী নয় সহোদরের মধ্যম; তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতারা সকলেই ভবানীর শিক্ষকতায় শারীরিক বলের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন।

ভীম ভবানীর বয়ঃক্রম মাত্র ৩১ বৎসর হইয়াছিল। তিনি অকৃতদার ছিলেন। তিনি অত্যন্ত মোটামুটি রকমে জীবন যাপন করিতেন।

কিছু দিন হইতে তিনি আমেরিকায় যাইবার জন্য পাস্‌পোর্টের চেষ্টা করিতেছিলেন।

প্রাতে ২০০ শত বাদামের সরবৎ, এক ছটাক গব্য ঘৃত; মধ্যাহ্নে সাধারণ ভাত ডাল; অপরাহ্নে ২ বা ২৷৷০ টাকার ফল ও ৫০টি বাদামের সর্‌বৎ এবং এক সের মাংস; রাত্রে আধ সের আটার রুটি ও তিন পোয়া মাংস—ইহাই ভীম ভবানীর দৈনন্দিন আহার ছিল।

[এই বিবরণ ১৩২৯ সালের ভাদ্র-সংখ্যা মানসী ও মর্ম্মবাণীতে প্রকাশিত, শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন মজুমদার কর্ত্তৃক লিখিত, বিবরণ হইতে সঙ্কলিত হইল।]

নিগ্রো মুষ্টিযোদ্ধা

বক্সিং অর্থাৎ মুষ্টিযুদ্ধের খেলার ইউরোপ আমেরিকায় খুব চলন আছে। ইহাতে কোন সময়ে যে আর-সব খেলোয়াড়কে পরাস্ত করিতে পারে তাহাকে চ্যাম্পিয়ন্ বা সর্ব্ব প্রধান খেলোয়াড় বলে। নূতন কোন খেলোয়াড় চ্যাম্পিয়নকে হারাইয়া দিতে পারিলে চ্যাম্পিয়ন্ পদ পায়। মুষ্টিযোদ্ধারা শরীরে ওজন অনুসারে খুব ভারী, মাঝারী, হাল্কা, প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। অনেক বৎসর হইতে ফ্রান্সের কার্পেন্টিয়ার এক শ্রেণীর চ্যাম্পিয়ন্ ছিল। তাহাকে সম্প্রতি সিকি (Siki) নামক একজন নিগ্রো হারাইয়া দিয়া চ্যাম্পিয়ন্ হয়। এই সিকিকে এক ইংরেজ মুষ্টিযুদ্ধে আহ্বান করে। কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডে তাহাদের মুষ্টিযুদ্ধ নিষেধ করিয়াছেন। ইহার কারণ কেবল এই হইতে পারে, যে, তাঁহারা নিগ্রোর নিকট শ্বেতকায়ের পরাজয় সহ্য করিতে পারিবেন না, কিম্বা শ্বেতকায় নিগ্রোর দ্বারা পরাজিত হইলে ইংরেজরা উত্তেজিত হইয়া শান্তিভঙ্গ করিতে পারে, এবং তাঁহারা সেই শান্তিভঙ্গ নিবারণ করিতে চান। কারণ যাহাই হউক, এরূপ আশঙ্কার মানেই পরাজয়, এবং এরূপ আশঙ্কার দ্বারা বুঝা যায়, যে, ইংরেজরা অশ্বেত লোকদিগকে কিরূপ ঘৃণা ও বিদ্বেষের চক্ষে দেখে।

১৩২৯ ফাল্গুন

দেশ-বিদেশের কথা

মল্লবিদ্যাশালা

আজমীরে একটি মল্লবিদ্যাশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানে ডাকাতি বা বন্য জন্তুর উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষা করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যাশালার ছাত্রেরা লাঠি ও তলোয়ার খেলিতে পারে এবং ধনুর্বিদ্যাতেও তাহারা অভিজ্ঞতা লাভ করে। রাজস্থানের এই মল্লবিদ্যাশালার সভ্যগণ শীঘ্রই ভারতে ভ্রমণে বাহির হইবেন। এ বিষয়ে যাঁহারা কোন সংবাদ জানিতে চান তাঁহারা "প্রফেসর জি আর পাণ্ডে, রাজস্থান মল্লবিদ্যাশালা, আজমীর" এই ঠিকানায় পত্র দিলে প্রয়োজনীয় খবর পাইতে পারিবেন। *বাংলাতে এরূপ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন যে খুব বেশী তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।*

—

১৩৩০ আষাঢ়

মোহনবাগানের জয়

বাঙালীদের মোহনবাগান ফুটবল ক্লাব যে আবার ইংরেজদের কলিকাতা ক্লাবকে হারাইয়া দিয়াছে, বাঙালী এরিয়ান ক্লাব যে হাইল্যাণ্ডার্ ক্যামেরন্‌দিগকে গোল্ দিয়াছিল, ইহা সুখবর। কিন্তু শতাধিক ক্যামেরন্ মারপিট্ আরম্ভ করায় হাজার হাজার বাঙ্গালী ফুটবল দর্শক পলায়ন করিয়াছিল, ইহা লজ্জার কথা। বাঙালী ফুটবল খেলোয়াড়দিগকে ইংরেজ ফুটবল খেলোয়াড়রা আঘাত করিলে, এই খেলোয়াড় বাঙ্গালীরা যখন মনুষ্যোচিত ব্যবহার করিতে সমর্থ হয়, তখন দর্শক বাঙালীরাও দৈহিক বল ও মানসিক সাহসের অনুশীলন দ্বারা নিশ্চয়ই মানুষ হইতে পারে। আমরা কাহাকেও প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া মানুষ হইতে বলি না; কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য গায়ের জোরে ও প্যাঁচে দুর্বৃত্তকে কাবু করিবার অধিকার সকলেরই আছে।

১৩৩০ অগ্রহায়ণ

গৌরীশঙ্কর অভিযান

ইংরেজ ও আমেরিকান পর্য্যটকেরা গৌরীশঙ্করের দুর্লঙ্ঘ্য শিখরে আরোহণ করিবার জন্য আবার দলবদ্ধ হইতেছেন। তাঁহারা অক্সিজেনপূর্ণ একটি যন্ত্র এই অভিযানের সময় ব্যবহার করিবেন; আল্‌প্‌স্ পর্ব্বতে তাহার কার্য্যোপযোগিতার পরীক্ষা হইতেছে।

এ বিষয়ে ভারতবাসীদের কি কিছুই করিবার নাই? আমরা কি চিরকাল পরের হাতে আমাদের দেশের সকল কঠিন কার্য্যের ভার ফেলিয়া দিয়া তাহাদের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকিব? ভারতের কয়েকজন ধনী মিলিয়া একদল যুবককে সুইজারল্যাণ্ডে পর্ব্বত-আরোহণ-বিদ্যায় দক্ষতা লাভ করিতে পাঠাইয়া দিলে ত পারেন। ইঁহারা ফিরিয়া আসিলে ভারতীয়ের দ্বারাই ভারতীয় পর্ব্বতশিখর আরোহণ ও আবিষ্কারের কার্য্যে এই ধনীরা সাহায্য করিতে পারেন। আমাদের যাহাতে কোনো ক্ষতি হইবে না, এমন সকল উদ্দেশ্যে বিদেশীরা আমাদের দেশে আসিলে আমরা কোনোই আপত্তি করি না; কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই ভারতীয়দের পিছনে পড়িয়া থাকিতে দেখিলে ক্লেশ বোধ হয়। পাশ্চাত্য দেশে ধনী মাত্রেই অষ্টপ্রহর নবাবী ব্যসন ও চর্ব্বির বোঝায় ডুবিয়া খুসী হইয়া কেদারা হেলান দিয়া থাকে না। তাহারা জনসমাজের বিশেষ একজাতীয় কাজে লাগিয়া যায়। এই-সকল কাজে হাতে হাতে টাকা পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু পরিণামে এগুলি দেশের উপকার করে। ধনীরা বৈজ্ঞানিক উপায়ে গোবংশের উৎকর্ষসাধন, অশ্বপালের উৎকর্ষসাধন, হাঁস মুরগীর পাল তৈয়ারী প্রভৃতি কাজে মন দেন। কেহ বা বহু কষ্ট ও ব্যয়সাধ্য দেশ পর্য্যটন কি

আবিষ্কারে লাগিয়া যান। ইঁহারাই অনেকে মিলিয়া বিমান-বিহার, মোটর চালনা, ঘোড়সওয়ারি, খেলা, কুস্তি ও নানা প্রকার ব্যায়ামের আদর্শ উচ্চ হইতে উচ্চতর করিয়া তোলেন। ইঁহারা নানাভাবে শিল্পী, কারিগর ও সাহিত্যিকের উৎসাহদাতা ও পৃষ্ঠপোষক হন, সাহিত্য ও শিল্প সৃষ্টিতেও মন দেন। এক কথায় বলিতে দেশের ও জাতির সর্ব্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ সাধন ও সভ্যতার বিকাশের ইঁহারা অনেকে সহায়। কিন্তু ভারতের ধনকুবেররা কি করিতেছেন? দেশের এই ধনী-সম্প্রদায় জাতির কোন্ হিতকর্ম্মে লাগিতেছেন?

১৩৩১ আশ্বিন

ঘোড়দৌড়ের জুয়াখেলা

জুয়াখেলা আইন-অনুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ। কিন্তু ঘোড়দৌড়ের জুয়াখেলা দণ্ডনীয় নহে। কারণ ইহাতে বড়লাট হইতে আরম্ভ করিয়া সব বড়-বড় রাজপুরুষ যোগ দিয়া থাকেন, এবং ইংলণ্ডের রাজা ও যুবরাজ এইরূপ খেলার মুরুব্বি! ঘোড়দৌড়ে আমাদের আপত্তি নাই, কিন্তু তৎসংক্রান্ত জুয়াখেলায় আপত্তি আছে। ইহাতে বিস্তর লোকের আর্থিক সর্ব্বনাশ ও নৈতিক অধোগতি হইয়াছে। এইজন্য ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার একজন দেশী সভ্য এই জুয়াখেলার বিরুদ্ধে একটি আইনের পাণ্ডুলিপি তৈয়ার করিয়া তাহা সভায় উপস্থিত করিবার নিমিত্ত অনুমতি চাহিয়াছিলেন। তিনি অনুমতি দেন নাই। তাহার কারণ নাকি এই, যে, ঘোড়দৌড়ে কোন্ ঘোড়া জিতিবে তাহা স্থির করিয়া তাহার উপর বাজি রাখা দক্ষতা-সাপেক্ষ। যাহা দক্ষতা-সাপেক্ষ, তাহাতে জিত আকস্মিক নহে, সুতরাং তাহা জুয়াখেলা নহে, ইহা বলাই বোধ হয় বড়লাটের অভিপ্রায়। কিন্তু অন্য যত-রকমের জুয়াখেলা আছে, তাহাতে পাকা জুয়াড়ীরা দক্ষতা দ্বারা জিতে। তাহাদের জয়লাভ কেন দণ্ডনীয় বিবেচিত হয়?

তীর-ধনুক খেলা

বহুশতাব্দী পূর্ব্বে সভ্য জাতিরাও যুদ্ধের জন্য তীর-ধনুক ব্যবহার করিত। এক্ষণে কোন সভ্য জাতি যুদ্ধের জন্য, এমন কি শিকারের জন্যও, তীর-ধনুক ব্যবহার করে না। কিন্তু ব্যায়াম, ক্রীড়া, ও লক্ষ্য-ভেদ শিক্ষার জন্য পাশ্চাত্য বহু সভ্য দেশে ও জাপানে এখনও তীর-ধনুক ব্যবহৃত

হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য বহুদেশে স্ত্রীলোকেরাও এইসকল উদ্দেশ্যে তীর-ধনুক ব্যবহার করিয়া থাকে। প্রয়োজন-মত মনের চাঞ্চল্য নিবারণ করিয়া একাগ্রতা উৎপাদনেরও সাহায্য এই খেলায় হয়।

আমরা অনেক সময় চিন্তা না করিয়াই কতকগুলি কাজকে কেবলমাত্র পুরুষোচিত বলিয়া ধরিয়া রাখি; যেমন অশ্বারোহণ। অথচ অন্য দেশের কথা ছাড়িয়া দিয়া ভারতবর্ষেই দেখা যায়, যে, মহারাষ্ট্রে বহু সম্ভ্রান্ত মহিলারা পর্য্যন্ত অশ্বারোহণে নিপুণ ছিলেন। ইহার দৃষ্টান্ত ফ্যাসী পার্কসের ভারতভ্রমণ পুস্তকে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়েও মহারাষ্ট্রে ও অন্য অনেক অঞ্চলে নারীরা ঘোড়ায় চড়িয়া থাকেন। দার্জ্জিলিঙে অনেক বাঙালীর মেয়েও ঘোড়ায় চড়েন। যাঁহারা এসব কথা জানেন, তাঁহাদের নিকট বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠে শান্তির অশ্বারোহণ বা রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গাদায়, চিত্রাঙ্গাদার ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা অদ্ভুত ঠেকিবে না।

১৩৩২ বৈশাখ
দীর্ঘ জীবন লাভের উপায়

দীর্ঘ-জীবন লাভের উপায়-সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন। বিখ্যাত আরো দু-এক জনের কথা শুনিতে ক্ষতি কি?

মোটরগাড়ী-নির্মাতা হেন্‌রী ফোর্ড্ পৃথিবীর একজন সর্ব্বাপেক্ষা ধনী লোক। কর্ম্মিষ্ঠও খুব। সাধারণতঃ ধর্ম্মোপদেষ্টারাই বিলাস-ব্যসন ত্যাগ করিতে বলেন। ইনি সে-শ্রেণীর লোক নহেন। পাকা ব্যবসাদার, কাজ কিসে বেশী হয় ও ভাল হয়, তাই চান। এই হেন্‌রী ফোর্ড্ বলেন, "মানুষ একশত পঁচিশ বৎসর বাঁচিতে পারে কিন্তু তাঁহাকে চা, কফি, তামাক, ও মদ্য ছাড়িতে হইবে।" অবশ্য এই জিনিষগুলির প্রত্যেকটি অন্যগুলির সমান অনিষ্টকর নহে; কিন্তু তামাক মদের সমান অনিষ্টকর নহে বলিয়া, যে, তাহা নির্দ্দোষ বা হিতকর, তাহাও নহে।

স্বভাবজাত নানাবিধ গাছের ফলের মিশ্রণ দ্বারা যিনি নূতন নূতন উৎকৃষ্ট ফুল ও ফলের সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই আশ্চর্য্যকর্ম্মা বৈজ্ঞানিক লুথার বারব্যাঙ্কও তামাক, চা ও কফির দারুণ বিরোধী।

১৩৩২ ভাদ্র

ছাত্রদের স্বাস্থ্য

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিবার বন্দোবস্ত করেন। এ-পর্য্যন্ত বহুসংখ্যক ছাত্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষিত হইয়াছে। তাহার ফলে জানা গিয়াছে, যে, অধিকাংশ ছাত্রেরই স্বাস্থ্য ভাল নয়। অথচ ইহাও ঠিক, যে, সাবধান হইলে ও উপযুক্ত ব্যবস্থা করিলে অধিকাংশের স্বাস্থ্য ভাল হইতে পারে। কলেজের ছাত্রদের মত বিদ্যালয়ের ছাত্রদেরও স্বাস্থ্য পরীক্ষিত হওয়া উচিত। তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, বিদ্যালয়ের ছাত্রদেরও স্বাস্থ্য ভাল নয়। ছাত্রদের পক্ষে যাহা সত্য, ছাত্রীদের পক্ষেও তাহা সত্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন অর্থ নাই যাহার দ্বারা সমুদয় কলেজ ও বিদ্যালয়ের ছাত্রদের স্বাস্থ্যের নিয়মিত পরীক্ষা হইতে পারে। এই কাজটি গবর্ণমেণ্টের কবা উচিত। ডিস্ট্রিক্ট্‌বোর্ড্ ও মিউনিসিপালিটীর অধীনে যে-সব বিদ্যালয় আছে, তাহাদের ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার বন্দোবস্ত ডিস্ট্রিক্ট্‌বোর্ড্ ও মিউনিসিপালিটী-সমূহের দ্বারা হওয়া উচিত।

শুধু স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিলেই চলিবে না, স্বাস্থ্যের উন্নতির চেষ্টাও করিতে হইবে, এই সোজা কথা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জানিতেন। এক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয় সমুদয় বিদ্যালয়ে ও কলেজে কোন-না-কোন প্রকার অঙ্গচালনা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। উপবাসী থাকিয়া ব্যায়াম করিলে তাহার দ্বারা ইষ্টের পরিবর্ত্তে অনিষ্টই হইবে, ইহাও বিশ্ববিদ্যালয় জানিতেন। সেইজন্য, অভিভাবকদের সহিত পরামর্শ করিয়া ছাত্রদের জল যোগের বন্দোবস্ত যাহাতে হয়, সে-বিষয়েও বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টি পড়িয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট্-সভায় কলেজের ছাত্রদিগকে সামরিক শিক্ষা দিবার প্রস্তাবও বিবেচিত হয়। ইহার বিরুদ্ধে দু-রকমের তর্ক উত্থাপিত হয়। একজন ইংরেজ ফৌজী কর্ম্মচারী বলেন, দেশী ছাত্রদের শরীর ও স্বাস্থ্য যেরূপ, তাহাতে তাহারা সামরিক শিক্ষার কষ্ট ও কঠোরতা সহ্য করিতে পারিবে না। আমরা যুদ্ধের বিরোধী এবং ইংরেজী ও বাংলায় আমাদের বিরোধিতার কারণ একাধিকবার বলিয়াছি। কিন্তু ফৌজী কর্ম্মচারীর যুক্তির বলবত্তা স্বীকার করিতে পারিলাম না। গত মহাযুদ্ধের সময় অনেক বাঙালী ছেলে বেঙ্গালী রেজিমেণ্টভুক্ত হইয়াছিল এবং যুদ্ধ শিখিয়াছিল। ইহারা পদাতিক শ্রেণীভুক্ত ছিল। তা' ছাড়া কতকগুলি ছেলে বেঙ্গাল লাইট্‌হস্-নামক অশ্বারোহী সেনাদলেও প্রবেশ করিয়া যুদ্ধ শিখিয়াছিল। সুতরাং কোন বাঙালী ছেলেই যুদ্ধশিক্ষার কঠোরতা সহ্য করিতে পারিবে না, ইহা সত্য নহে। পক্ষান্তরে, ইহাও সত্য নহে, যে, সকলেই যুদ্ধ শিক্ষা করিবার মত শক্ত-সমর্থ। কিন্তু গত মহাযুদ্ধের সময় বিলাতেও শতকরা অনেক বেশী-সংখ্যক যুবক যুদ্ধের অনুপযুক্ত বিবেচিত হইয়াছিল। তাহাদের সংখ্যা ও বৃত্তান্ত আমরা মডার্ণরিভিউ কাগজে ছাপিয়াছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখে যে-প্রস্তাব ছিল, তাহা এ নয়, যে, দেহের পটুতা-অপটুতা নির্ব্বিশেষে সকলকেই যুদ্ধ শিখাইতে হইবে; প্রস্তাব এই, যে, যাহাদের দেহ ও স্বাস্থ্য তদ্রূপ শিক্ষার উপযোগী, তাহাদিগকে ঐ শিক্ষা দিতে হইবে। যত্ন ও উপযুক্ত ব্যবস্থা করিলে আজ যাহাদের শরীর শক্ত ও স্বাস্থ্য ভাল নয়, কিছুকাল পরে তাহাদের

শরীর কষ্টসহিষ্ণু ও স্বাস্থ্য ভাল হইতে পারে। এবং তাহাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য।

আর এক রকমের আপত্তি এই উঠিয়াছিল, যে, অনেকের মতে যুদ্ধটা বিবেকবিরুদ্ধ, ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য। সুতরাং তাহারা যুদ্ধ শিক্ষা করিতে পারে না। এ-বিষয়ে বক্তব্য এই, যে, খৃষ্টীয় কোয়েকার সম্প্রদায়ের লোকদের মতে যুদ্ধ করা অধর্ম্ম। ভারতবর্ষে যদি ঐরূপ-মত- বিশিষ্ট কোন সম্প্রদায় থাকে, তাহা হইলে সেই সম্প্রদায়ের ছাত্রদিগকে যুদ্ধ শিক্ষা করিতে বাধ্য না করিলেই চলিবে।

সেনেটে যে-যে আপত্তি উঠিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে আমাদের মত বলিলাম। যুদ্ধ ও যুদ্ধশিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের নিজের মত আগে কোন-কোন সংখ্যায় বলিয়াছি; এক্ষণে পুনরুক্তির প্রয়োজন দেখিতেছি না।

১৩৩২ কার্ত্তিক

বীরাষ্টমী

কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমতী সরলা দেবী বঙ্গে বীরাষ্টমী উৎসব পুনঃপ্রবর্ত্তিত করেন। বহু বৎসর উহা বন্ধ ছিল। এবার তিনি আবার উহা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। বালক ও যুবকেরা সুস্থ, সবল এবং আত্মরক্ষা ও দুর্ব্বলের রক্ষায় সমর্থ হন ইহা সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়। শ্রীমতী সরলা দেবী নারীদিগের মধ্যেও আত্মরক্ষার সামর্থ্য লাভের ইচ্ছা জাগাইয়া তুলিতে পারিলে বঙ্গের মহা কল্যাণ সাধন করিবেন।

বীরাষ্টমী উৎসব উপলক্ষে প্রতাপাদিত্যকে বঙ্গের আদর্শ বীররূপে খাড়া করার সমর্থন আমরা করিতে পারি না। তাঁহাকে আদর্শ বীর বলিয়া চিত্রিত করিতে হইলে বহু ঐতিহাসিক তথ্যের অপলাপ করিতে হয়, এবং চূণকামের প্রয়োজনও বড় কম হয় না। একজন আদর্শ বীর খাড়া করিতে না পারিলেও বীরাষ্টমীর উৎসব সুনির্ব্বাহিত এবং উহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।

১৩৩৪ বৈশাখ

সাইকেলে পৃথিবীভ্রমণ

শ্রীযুক্ত অশোক মুখোপাধ্যায় ও অন্য যে কয়জন বাঙালীযুবকের সাইকেলে আর্য্যাবর্ত্ত ও কাশ্মীর ভ্রমণের বৃত্তান্ত গত চৈত্রের প্রবাসীতে শেষ হইয়াছে, তাঁহারা সাইকেলে পৃথিবী ভ্রমণের

জন্য বাহির হইয়াছেন। তাঁহাদের গত ২০শে চৈত্র চাক্‌লা জাহাজে করাচী হইতে ইরাক্ দেশে যাইবার এবং ২৪শে চৈত্র বস্‌রা পৌঁছবার কথা ছিল। বাঙালী জাতি তাঁহাদের এই সাহসিকতা ও কষ্টসহিষ্ণুতার উদ্যমের সাফল্য কামনা করিবে।

১৩৩৪ আশ্বিন

সুমেরু অভিযানে বাঙালী

আমেরিকার শিকাগো সহরের প্রাণিবিদ্যাবিষয়ক মিউজিয়মের একটি বিভাগের কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় উক্ত মিউজিয়মের সুমেরুবৃত্ত অভিযানের অন্যতম কর্ম্মী নির্ব্বাচিত হইয়া সুমেরু সমুদ্রে ও দেশে গিয়াছেন। যে অভিযানের সঙ্গে তিনি গিয়াছেন, তাহার নায়ক কম্যাণ্ডার ডোনাল্ড বি ম্যাকমিলন্। তিনি একজন সুপরিচিত সুমেরু প্রদেশের অজ্ঞাত অঞ্চল আবিষ্কারক।

শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় শিকাগো মিউজিয়মে কাজ করিবার পূর্ব্বে আলবানীতে নিউইয়র্ক ষ্টেট্ মিউজিয়মের বৈজ্ঞানিক কর্ম্মীদের একজন ছিলেন। তিনি বি-এ এবং এম-এস্‌সি উপাধিধারী এবং শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্টগ্রাজুয়েট বিভাগে গবেষক ছাত্র।

অভিযানের অন্যান্য বৃত্তান্ত সেপ্টেম্বর মাসের মডার্ণ রিভিউতে দ্রষ্টব্য। বাঙালীর ছেলে যে সুমেরু প্রদেশের শীত সহ্য করিয়া তথায় নূতন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আহরণ করিতে পারে, এবং তাহার জন্য বিদেশীর দ্বারা নির্ব্বাচিত হইতে পারে, ইহা সুখের বিষয়। ইহাতে বাঙালী যুবকদের উৎসাহ বাড়িবে।

১৩৩৪ কার্ত্তিক

বিলাতে ইন্দিরা মহারাণীর শিকার

খবরের কাগজে দেখা গেল, কুচবিহারের মহারাণী ইন্দিরা বিলাতে শিকার খেলাইবার বন্দোবস্ত করাইয়াছেন! আগে আগে দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষের রাজা মহারাজারাই বিদেশে প্রজাদের টাকা নানা প্রকারে উড়াইতেন। এখন এই রোগ মহারাণী-মহলে পৌঁছায় উদ্বেগের কারণ বাড়িতেছে। মহারাণী ইন্দিরা যদি স্বদেশে থাকিয়া দীন-দুঃখীর দুঃখ নিবারণে, সাহিত্যশিল্পাদির চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিতেন, তাহা হইলে দেশের মঙ্গল হইত, এবং তিনিও এমন আনন্দ ও শান্তি পাইতেন

যাহা কোন-প্রকার জীব শিকার করিয়া কেহ কখন পায় নাই। দুঃখের বিষয়, তিনি এই সাত্ত্বিক পথের পথিক হইবার মত শিক্ষা কখনও পান নাই। নতুবা হিন্দু বিধবার শিকার খেলার সংবাদ আমাদিগকে শুনিতে হইত না।

১৩৩৫ মাঘ

দেশ-বিদেশের কথা

বাঙ্গালী ছাত্রের স্বাস্থ্য

ছাত্রগণের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতির চেষ্টা করিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিশেষ কমিটি আছে, এ সংবাদ অনেকেরই জানা আছে। বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রতি এই কমিটি ১৯২৭ সনে যে-সকল কাজ করিয়াছেন, তাহার একটি বিবরণী প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহাতে বাঙালী ছাত্রের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যে-সকল তথ্য ও সংবাদ দেওয়া হইয়াছে তাহা বাস্তবিকই ভাবনার কথা। প্রায় পনর হাজার ছাত্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া কমিটি যে-সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্তসার এই,—

(১) ছাত্রগণের মধ্যে ব্যাধির প্রসার। শতকরা ৭১ জন ছাত্র কোন-না-কোনও ব্যাধিগ্রস্ত, ১৯ জনের মাত্র স্বাস্থ্য ভাল বলা যাইতে পারে; শতকরা ৩৫ জন কোন-না-কোনও গুরুতর পীড়াগ্রস্ত; ইহাদের মধ্যে হৃদযন্ত্রের পীড়া শতকরা ৪ জনের, ফুসফুসের ব্যাধি অপেক্ষাকৃত কম, শতকরা ২০ জনের গলনালীর ব্যাধি, শতকরা ২ জনের প্লীহা ও শতকরা ১২ জনের পাকযন্ত্রের ব্যাধি; দৃষ্টিশক্তি শতকরা ৩২ জনের খারাপ; শতকরা ৩০ জনের দাঁত খারাপ।

(২) ছাত্রগণের শারীরিক অবস্থা। গড়ে বাঙ্গালী ছাত্রের শরীর পাঁচফুট ছয় ইঞ্চ উচ্চ; বুকের ছাতি (অপ্রসারিত অবস্থায়) সাড়ে একত্রিশ ইঞ্চ; ওজন ১ মণ ১৫ সের। এই প্রসঙ্গে বিবরণীতে আর একটি সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। পরীক্ষকগণ বলিতেছেন যে, কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ, স্কটিশ চার্চ্চেস্ কলেজ ও সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্রগণ দৈহিক আয়তনে, শক্তিতে ও স্বাস্থ্যে অন্যান্য কলেজের ছাত্রগণের অপেক্ষা ভাল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যসমিতি কেবলমাত্র ছাত্রগণের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহারা ছাত্রগণের স্বাস্থ্যের উন্নতিরও চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থাভাবের জন্য এই বিষয়ে যতটুকু কাজ করা উচিত, ততটুকু কাজ করিতে পারিতেছেন না। তবুও তাঁহারা যে-সকল চেষ্টা করিতেছেন তাহাদিগের চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে— (১) রুগ্ন ও পীড়াগ্রস্ত ছাত্রগণের চিকিৎসা ও তত্ত্বাবধান, (২) কলেজে কলেজে ব্যায়ামের প্রবর্ত্তন, (৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের নৌকা চালাইবার ক্লাব স্থাপন, (৪) ছাত্রগণের খাদ্যের উন্নতি, ও (৫) শরীরচর্চ্চায় উৎসাহ দান। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বিশ্ববিদ্যালয় অর্থের অনটনের জন্য ছাত্রগণের চিকিৎসার জন্য উপযুক্ত সংখ্যক চিকিৎসক নিযুক্ত করিতে পারিতেছেন না। তবুও ১৯২৭ সনে বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসক ৭৫টি পীড়াগ্রস্ত ছাত্রের তত্ত্বাবধান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বহু ছাত্র তাঁহার নিকট চিকিৎসা সম্বন্ধে পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরোধে ক্যাপ্টেন পি কে গুপ্ত (আই এম্ এস্) কলিকাতার বিভিন্ন কলেজে শরীরচর্চ্চা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। আজকাল মেসে ও হোষ্টেলে ছাত্রগণের জন্য যে-খাদ্যের ব্যবস্থা আছে, তাহাতে পুষ্টিকর পদার্থের অত্যন্ত অভাব। ছাত্রগণের খাদ্য

কি হওয়া উচিত, এ সম্বন্ধে রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর একটি প্রস্তাব করেন ও বিশ্ববিদ্যালয় সেই প্রস্তাব কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট পাঠান। খাদ্য-পরিবর্ত্তন সম্বন্ধের আপত্তি এই যে, প্রথমতঃ ইহাতে খরচ কিছু বেশী হওয়ার সম্ভাবনা (যদিও তাহা অতি সামান্য), দ্বিতীয়তঃ, ছাত্রগণের অধিক পরিমাণ আটা ও ডাল খাইতে আপত্তি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থাভাবের দরুণ ছাত্রগণের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য যতটা চেষ্টা হওয়া উচিত ততটা হইতেছে না, ইহা দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় অপেক্ষাও ছাত্রগণেব নিজেদেরই বেশী যত্নবান হওয়া আবশ্যক। অশিক্ষিত লোকেরা অজ্ঞতার জন্য অথবা বুদ্ধির অভাবে শরীরের যত্ন করিতে জানে না একথা বলিতে পারে, কিন্তু উচ্চ-শিক্ষিত ও উচ্চ-শিক্ষার্থী ছাত্রগণের পক্ষে একথা স্বীকার করা বড়ই লজ্জার কথা।

১৩৩৬ জ্যৈষ্ঠ

ভারতীয় যুবকের বাইসিক্লে ভূপ্রদক্ষিণ

দুই বৎসর আগে বিমল মুখোপাধ্যায় তিনজন সঙ্গীর সহিত বাইসিক্লে ভূপ্রদক্ষিণে বাহির হন। সে তিন জন ক্ষান্ত হইয়াছেন, তিনি একা এখনও বাইসিক্ল চালাইতেছেন। তাঁহার শেষ খবর স্কটল্যাণ্ডের এবার্ডীন সহর হইতে পাওয়া গিয়াছে। এপর্য্যন্ত তিনি দুই বৎসরে এগার হাজার মাইল ভ্রমণ করিয়াছেন। বাকী আছে আরও অনেক হাজার মাইল। তাহা তিনি আরও তিন বৎসরে শেষ করিতে পারিবেন মনে করেন।

১৩৩৬ আষাঢ়

আধুনিক ভারতের প্রথম বৈমানিক

আধুনিক ভারতের প্রথম বৈমানিক শ্রীযুক্ত পি এম কাবালী লণ্ডন হইতে "উষার পালক" নামক তাঁহার আকাশযানে একাকী উড়িয়া ফ্রান্স পৌঁছিয়াছেন খবর পাওয়া গিয়াছে। এই লেখাটি ছাপা হইয়া প্রকাশিত হইবার সময় হয়ত তিনি পৌঁছিবেন। ভারতীয় যুবকেরা আরো বেশী সংখ্যায় এইরূপ দক্ষতা ও সাহসের কাজে অগ্রসর হইলে ভাল হয়। বাঙালীদের মধ্যে শ্রীযুক্ত বি কে সিংহ ও জে পি গাঙ্গুলী বৈমানিকের কাজে বহুপরিমাণে দক্ষতা লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা অচিরে পূর্ণ পারদর্শিতা লাভ করিবেন।

১৩৩৬ কার্ত্তিক

সন্তরণদক্ষতা ও সন্তরণশ্রমসহিষ্ণুতা

সমগ্র ভারতের ত্রিশ মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতায় শ্রীযুক্ত নলিনচন্দ্র মল্লিক প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। তিনি হুগলীর জুবিলি সেতু হইতে কলিকাতার কুমারটুলি ঘাট পর্য্যন্ত চারি ঘণ্টা দুই মিনিটে সাঁতার দিয়া আসেন।

গত সেপ্টেম্বর মাসে দুজন ভারতীয় যুবক কত দীর্ঘকাল ক্রমাগত সাঁতার দিতে পারেন, তাহার প্রমাণ দেন। ঐ মাসের গোড়ায় ওয়েলেস্‌লী স্কোয়্যারের পুকুরে মিঃ শাফী আহমদ অবিরাম ২৬ ঘণ্টা ৪০ মিনিট সাঁতার দেন। ইহা খুব শক্ত কাজ।

ইহার প্রায় দুই সপ্তাহ পরে হেদুয়া দীঘিতে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার ঘোষ ক্রমাগত আটাশ ঘণ্টা সাঁতার দেন। থামিবার সময় তাঁহাকে বেশী ক্লান্ত মনে হয় নাই। এই ২৮ ঘণ্টায় তিনি ২৫ মাইল ৪৮০ গজ সাঁতার দিয়াছিলেন।

তিনি বলেন অবিরত ৫০ ঘণ্টা তিনি সাঁতার দিতে পারেন। ইহা অপেক্ষা বেশী সময় সাঁতার দিবার প্রতিযোগিতায় তিনি ভারতবর্ষের সন্তরকদিগকে আহ্বান করিয়াছেন।

—

১৩৩৭ আশ্বিন

দৌড়চক্র ও ব্যায়ামশালা

নানা প্রকারে দৈহিক বল চর্চ্চায় উৎসাহ দিবার নিমিত্ত কয়েক বৎসর হইল বঙ্গীয় ওলিম্পিক সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সম্প্রতি তাহার এক অধিবেশনে স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় একটি ষ্টেডিয়াম বা দৌড়চক্র ও ব্যায়ামশালা নির্ম্মাণের কথা বলেন। ইহার খুব প্রয়োজন আছে। শুধু কলিকাতায় নয়, বঙ্গের যত বেশী জায়গায় দৌড়চক্র ও ব্যায়ামশালা প্রতিষ্ঠিত হয়, ততই ভাল।

—

১৩৩৮ আষাঢ়

বাংলায় শারীর সাধন

বাঙালীর চিরকালের দুর্নাম যে তাহাকে আত্মরক্ষার জন্য ছোট বিষয়ে পশ্চিমা দারোয়ানের ও বৃহৎ ব্যাপারে গোরা পল্টনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। ইহা অবশ্য ইংরেজী যুগের সম্বন্ধেই সত্য। কারণ যদিও বর্ত্তমানে আমাদের ঘরের দারোয়ান, পথের পুলিস, ও সীমান্তের সৈনিক সকলেই অবাঙালী, তথাপি ইংরেজী যুগের পূর্ব্বে বাংলা দেশের যোদ্ধা ও বীরপুরুষ বাংলা দেশেরই লোক ছিল। সাহস, শারীরসাধন বা যুদ্ধবিদ্যা বিষয়ে পারগ হওয়া কোন জাতি-বিশেষের নিজস্ব নহে। চেষ্টা করিলে ও শিক্ষা পাইলে সকল জাতির লোকই উৎকৃষ্ট যোদ্ধা বা সাহসী শক্তিমান হইতে পারে। প্রমাণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ভারতেই ইংরেজরা এদেশীয় বহুজাতিকে কখন যোদ্ধা জাতি বলিয়া প্রমাণ করিয়াছে এবং কখন-বা নিজ স্বাথানুসারে আবার তাহাদের যুদ্ধে অপারগ বলিয়া অপর কাহাকেও সৈন্যদলে গ্রহণ করিয়াছে। ভারতের বাহিরে বহু জাতি ইতিহাসের এক যুগে যুদ্ধে অকর্ম্মা বলিয়া খ্যাত হইয়া পরবর্ত্তী যুগে উৎকৃষ্ট যোদ্ধা রূপে দেখা দিয়াছে। যথা প্রাচীন রোমানরা প্রথমে যুদ্ধে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, পরে বহু জাতির পদদলিত হইয়া বর্ত্তমানে আবার মুসোলিনির নেতৃত্বে ইউরোপের ভয়ের কারণ হইয়া দাঁড়াইতেছে। চেক, স্লোভাক, ক্রোট, পোল প্রভৃতি বহু জাতি কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও পরদাসত্বে আবদ্ধ ছিল, কিন্তু এখন তাহারা বড় বড় যোদ্ধা জাতি বলিয়া পরিচিত। প্রাচীন পারস্য ও গ্রীসের লোকেরা এককালে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ছিল; বর্ত্তমানে তাহারা যুদ্ধ-বিদ্যার জন্য বিখ্যাত নহেন।

ভারতবর্ষে ইংরেজ সরকার যদিও সামরিক কারণে বহু কোটি টাকা ব্যয় করেন তথাপি এই টাকাটা ব্যয় সম্বন্ধে তাঁহাদের ব্যবস্থা একটু খামখেয়ালি ধরণের। যে-ক্ষেত্রে সমগ্র দেশ রাজস্ব-হিসাবে এই টাকাটা দিতে বাধ্য হইতেছে, সে ক্ষেত্রে ইহার ব্যয় এরূপ ভাবে হওয়া উচিত যাহাতে সব প্রদেশেরই ইহাতে কিছু কিছু উপকার হয়। অর্থাৎ সৈনিক সমগ্র ভারত হইতেই লওয়া উচিত এবং সামরিক-বিভাগের রসদ প্রভৃতিও সমগ্র দেশ হইতে (ও শুধু ভারত হইতেই) ক্রয় করা উচিত। কোন জাতি-বিশেষ শুধু সৈনিক হইতে পারে, এ কথাটা যে মিথ্যা, তাহা ইংরেজ রাজত্বের ইতিহাস হইতেই প্রমাণ করা যায়। এ বিষয়ের আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। মোটকথা যে বাংলার প্রজা বহু কোটি টাকা রাজস্ব দিয়া থাকে। এই টাকার অধিকাংশ সামরিক হিসাবে খরচ হয়। সুতরাং বাংলার প্রজার দেশরক্ষার কাজে নিযুক্ত হইবার অধিকার আছে। যে দেশে সহস্র সহস্র যুবক বেকার, সে দেশে এ কথার মূল্য বুঝাইতে বেগ পাইতে হইবে না। বাংলার বেকার যুবকমণ্ডলী যদি আকাশে, জলে ও স্থলে সৈনিক রূপে স্থান পান, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে আর রাস্তায় রাস্তায় নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকিতে হইবে না। নিজদেশ রক্ষার কার্য্য সম্মানের কার্য্য। বাংলার যুবক এ কার্য্য সাগ্রহে ও সানন্দেই করিবেন। সৈনিকের সহিত পুলিশ সার্জ্জেন্ট প্রভৃতির কাজও তাহাদের করিবার অধিকার চাই। এখন বক্তব্য যে সৈনিক প্রভৃতি হইতে হইলে যে-পরিমাণ শারীরিক সার্মথ্য ও সাহস প্রয়োজন তাহা বাঙালীর আছে কি না। না থাকিলে তাহা আহরণ করা বাঙালীর পক্ষে অসম্ভব কি না। আজকাল বাঙলার সর্ব্বত্র

শারীরসাধন লইয়া খুব একটা উৎসাহের সূত্রপাত হইয়াছে। শত শত যুবক বাংলার শহরে শহরে ও গ্রামে গ্রামে শারীরসাধনায় ব্রতী হইয়াছেন। তাঁহারা যে এই কার্য্য ভাল করিয়াই করিতেছেন তাহার প্রমাণের অভাব নাই। বাংলায় বহু সহস্র শক্তিমান যুবক আছেন ও প্রত্যহ আরও শত শত যুবক শক্তির পথে আগুয়ান হইতেছেন। একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে বাংলা এখন ভারতের সেনাবাহিনীর জন্য যথেষ্ট লোক দিতে পারে। আমাদের চেষ্টা করা উচিত, যাহাতে বাঙালী পল্টন পুনর্গঠিত হয় এবং সম্ভব হইলে একাধিক পল্টন গঠিত হয়। ইহা আমাদের দাবি, ভিক্ষা নহে।

১৩৪০ অগ্রহায়ণ

সন্তরণসামর্থ্য

সম্প্রতি রেঙ্গুনে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার ঘোষ ৭৯ ঘণ্টা ২৪ মিনিট অবিরাম সন্তরণ করিয়াছেন। পৃথিবীতে এ-পর্য্যন্ত কেহ এত দীর্ঘকাল অবিচ্ছেদে সাঁতার দিতে পারে নাই।

১৩৪০ পৌষ

ভ াতে বিলাতের ক্রিকেট খেলোয়াড়দল

কিছুদিন পূর্ব্বে হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করিবার জন্য ইংলণ্ডের পক্ষ হইতে ইংরেজদের যে ক্ষুদ্র দল চেষ্টা করিয়াছিল, তাহার ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন একজন ইংরেজ মহিলা। তিনি যে এত টাকা খরচ করিয়াছিলেন, তাহার উদ্দেশ্য বলিয়াছিলেন ভারতীয়দের দেখান, যে, ইংরেজদের এখনও পৌরুষ, দুঃসাধ্য কাজ করিবার সাহস এবং কষ্টসহিষ্ণুতা আছে। অর্থাৎ তিনি পরোক্ষভাবে ভারতবর্ষের লোকদিগকে বলিতে চাহিয়াছিলেন, "তোমরা ভারতের ইংরেজাধীনতা ঝাড়িয়া ফেলিতে চাহিতেছ হয়ত এই মনে করিয়া, যে, ইংরেজরা পৌরুষহীন নির্বীর্য্য হইয়াছে; কিন্তু দেখ সে ধারণা সত্য নহে।" ভারতবর্ষে যে ইংরেজ ক্রিকেটার দল খেলায় ভারতীয়দিগকে বিশেষ রকম পরাজয় স্বীকার করাইতে আসিয়াছে এবং তাহাতে সফলকামও হইতেছে, সেই খেলার অভিযানের মধ্যেও ঐ রকম মতলব আছে কিনা, কে জানে। ইংরেজদের খেলায় ইংরেজরা ওস্তাদ হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছু নাই। কিন্তু রণজিৎ সিংহজী, দলীপ সিংহজী প্রভৃতি ভারতীয়

ক্রিকেটার ইংলণ্ডেও খুব কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন, সুতরাং অবসরবিশিষ্ট বলিষ্ঠ লোকদের লইয়া দল বাঁধিতে পারিলে ক্রিকেটে ভারতীয় দলও যশস্বী হইতে পারে। তাহার পরোক্ষ প্রমাণ, ধ্যানসিং প্রমুখ ভারতীয় হকির দল জগতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। বিজয়নগরমের মহারাজকুমারের দল যে কাশীতে ইংরেজ ক্রিকেটারদিগকে পরাজিত করিয়াছে, ইহা আর একটা প্রমাণ। ইংরেজরা ও ইউরোপীয়রা তাহাদের পুরুষোচিত খেলায় প্রতিযোগিতা করিতে আমাদিগকে আহ্বান করে। ভারতীয়দের উচিত ভারতীয় পুরুষোচিত কোন খেলায় তাহাদিগকে প্রতিযোগিতা করিতে আহ্বান করা।

বাংলা দেশে ও অন্যান্য প্রদেশে অনেক ধনীর সন্তান বিলাসে ব্যসনে বা তাহা অপেক্ষা গর্হিত ব্যাপারে দেহ-মন নষ্ট করেন, কাজ কিছু না করিয়া অকাজ করেন। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে দেশী-বিদেশী সব পুরুষোচিত ক্রীড়ায় পারদর্শী হইতে পারেন।

১৩৪১ আষাঢ়

কৈলাস পর্ব্বত আরোহণ

বাঙালী যুবকদের মধ্যে বাইসিকলে বা পদব্রজে দেশভ্রমণ, এমন কি পৃথিবীভ্রমণ ব্রত ইতিপূর্ব্বে কেহ কেহ গ্রহণ করিয়াছেন। শুনা যায়, সেকালে রামমোহন রায় তিব্বত গিয়াছিলেন। গত শতাব্দীতে চট্টগ্রামের রায় শরৎচন্দ্র দাস বাহাদুরের তিব্বতযাত্রা সুবিদিত। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে তীর্থযাত্রা উপলক্ষ্যে কোন কোন বাঙালী কৈলাস পর্ব্বত ও মানসসরোবর দর্শন করিয়াছেন। সম্প্রতি পরলোকগত স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার বন্ধু শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার চট্টোপাধ্যায় যে কৈলাসযাত্রা করিয়াছেন, তাহা অন্য প্রকারের কাজ। ইহা দ্বারা প্রধানতঃ সাহসিকতা ও কষ্টসহিষ্ণুতার দ্বারা নূতন ভৌগোলিক ও অন্যবিধ জ্ঞান সঞ্চিত হইবে এবং বাঙালী ছেলেরা যে এরূপ সাহসের ও শ্রমের কাজ এখনও করিতে পারে, তাহা প্রমাণিত হইবে। উক্ত দুই যুবকের সঙ্গে আরও চারি জন জুটিবেন। তাঁহারা সকলে সফলকাম হইবেন বলিয়া আমরা মনে করি। কিন্তু এরূপ যুবকদের কৈলাস দেখিয়া আসিয়াই নিবৃত্ত হওয়া উচিত নয়। তাঁহারা সুইজার্লাণ্ডের ও অন্যত্র স্থিত আল্পসের উচ্চতম শৃঙ্গে ইউরোপীয় পর্ব্বতারোহীরা কি প্রকারের উঠে তাহা তাহাদের নিকট হইতে শিখিয়া আসুন। তাহার পর তাঁহারা হিমালয়ের উচ্চতম শৃঙ্গসকলে আরোহণের চেষ্টা করিবেন। কৈলাস-আরোহণ শিক্ষানবীসীমাত্র।

হিমালয়ের উচ্চশৃঙ্গসকলে আমাদের যুবকদিগকে উপযুক্ত শিক্ষানন্তর আরোহণে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য সমুদয় ব্যয়নির্ব্বাহার্থ স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একটি ফণ্ড খোলা উচিত।

১৩৪২ ভাদ্র

বঙ্গের স্বাস্থ্যের শোচনীয় অবস্থা

১৯৩৩ সালে বঙ্গের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সরকারী রিপোর্ট সম্প্রতি বাহির হইয়াছে। তাহা হইতে নীচে একটি তালিকা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। তাহা হইতে বঙ্গের স্বাস্থ্যের শোচনায় অবস্থা বুঝা যাহবে।

প্রদেশ।	হাজারকরা জন্মের হার	হাজারকরা মৃত্যুর হার	শিশুদের মৃত্যুর হার
বাংলা	২৯.৫	২৪.০	২০০.১
মান্দ্রাজ	৩৭.৭২	২৩.৬৬	১৮৪.৯৪
বোম্বাই	৩৬.৩৯	২৪.৭৯	১৬০.৬৬
আগ্রা-অযোধ্যা	৩৯.২২	১৮.৬৯	১৩৭.৮৮
পঞ্জাব	৪৪.৪৪	২৮.১৬	১৯২.৫৫
মধ্যপ্রদেশ	৪৪.২৫	২৬.৫৫	২০০.০৭
বিহার-উড়িষ্যা	৩৫.৭	২২.১	১৩৫.২
উ. প. সীমান্ত	৩০.০৫	২১.২৮	১৩৭.৩৬
ব্রহ্ম	২৯.৮৩	১৮.৭১	১৯২.২৬
আসাম	৩১.০৪	২০.৩১	১৬৩.৪৬

জন্মের হার হইতে মৃত্যুর হার বাদ দিলে দেখা যাইবে, যে, ১৯৩৩ সালে হাজারকরা স্বাভাবিক লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছিল বঙ্গে ৫.৫, মান্দ্রাজে ১৪.০৬, বোম্বাইয়ে ১১.৬০, আগ্রা-অযোধ্যায় ২০.৫৩, পঞ্জাবে ১৬.২৮, মধ্যপ্রদেশে ১৭.৭০, বিহার-উড়িষ্যায় ১৩.৬, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ৮.৭৭, ব্রহ্মদেশে ১১.১২ এবং আসামে ১০.৭৩। সুতরাং বঙ্গেই লোকসংখ্যাবৃদ্ধির হার সকলের চেয়ে কম।

অতঃপর শিশুমৃত্যুর হার বিবেচনা করিলে দেখা যায়, তাহাও বঙ্গে সকলের চেয়ে বেশী। মধ্যপ্রদেশ বঙ্গের কাছাকাছি যায় বটে, কিন্তু সেখানে জন্মের হার বঙ্গের দেড়গুণ বলিয়া তথায় স্বাভাবিক লোকসংখ্যাবৃদ্ধি বঙ্গের তিনগুণেরও অধিক।

বঙ্গের স্বাস্থ্যহীনতা ও ক্ষয়িষ্ণুতা

১৯৩৩ সালের বার্ষিক স্বাস্থ্য-রিপোর্ট হইতে যে কয়টি তালিকা দিলাম, তাহা হইতে বঙ্গের স্বাস্থ্যহীনতা ও ক্ষয়িষ্ণুতা বুঝা যাইবে। বঙ্গের দারিদ্র্যের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

ম্যালেরিয়া প্রভৃতিও তাহার সঙ্গে জড়িত। সমগ্র দেশটির আর্থিক ও স্বাস্থ্য বিষয়ক উন্নতি কি কি উপায়ে হইতে পারে, তাহা স্থির করিবার ও উপায় অবলম্বন করিবার লোক চাই। তদ্ভিন্ন প্রত্যেক জেলার ও তাহার প্রত্যেক ক্ষয়িষ্ণু অংশের উন্নতির উপায় স্থির ও অবলম্বন করিবারও লোক চাই। জেলাগুলির নাম দেখিলেই বুঝা যাইবে, যে, ক্ষয়িষ্ণুতা হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টিয়ানদের বাসস্থান-নির্ব্বিশেষে হইয়াছে। অতএব সকলকে সমগ্র দেশটির এবং সমগ্র জেলার ও তাহার ক্ষয়িষ্ণু সব অংশের হিতচেষ্টা করিতে হইবে।

১৩৪২ কার্ত্তিক

সন্তরক রবীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এলাহাবাদের প্রসিদ্ধ সন্তরক রবীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ কাল জলে সাঁতার দিয়া এ পর্য্যন্ত যে রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা উচ্চতর রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে উচ্চতম রেকর্ড ছিল ইতালীয় পেদ্রো কন্দিওত্তির। তাহা ছিল ৮৭ ঘণ্টা ১৯ মিনিট। রবীন্দ্রের রেকর্ড ৮৮ ঘণ্টা ১২ মিনিট।

১৩৪২ অগ্রহায়ণ

বলবান্ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্যাপটেন্ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জননায়ক সর্ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। তিনি ইংলণ্ড গিয়া ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়াছিলেন। ব্যারিষ্টারী তাঁহার বৃত্তি ছিল। কিন্তু তিনি বঙ্গে দৈহিকবলবিশিষ্ট পুরুষ বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। আমরা যৌবনকাল হইতে তাঁহার বলশালিতার ও ইংরেজ ঠ্যাঙাইবার অনেক গল্প শুনিয়া আসিয়াছি। ব্যায়াম ও পুরুষোচিত ক্রীড়ায় উৎসাহ দিবার জন্য যখন যেখানে তাঁহার ডাক পড়িত সেখানেই তিনি উপস্থিত হইয়া উপদেশ দিতেন। তাঁহার চেহারা দেখিলেই লোকের ব্যায়ামে অনুরাগী হইবার ইচ্ছা হইত। দৈহিক উন্নতির চেষ্টায় উৎসাহ দিবার জন্য তিনি দেড় লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি চিরকুমার ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৭৬ বৎসর বয়স হইয়াছিল। তিনি রিপন কলেজ কমিটির সভাপতি ছিলেন।

১৩৪২ চৈত্র

বেঙ্গাল ফিজিক্যাল কাল্চার কনফারেন্স

ভারতবর্ষে বহুকাল ধরিয়া নানা বিষয়ের আলোচনা করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন সভাসমিতির অধিবেশন হইয়া আসিতেছে;—রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে কংগ্রেস, সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য-সম্মেলন, বিজ্ঞান মহাসভা, দর্শন কংগ্রেস, ঐতিহাসিক সভা ইত্যাদি। শরীর গঠন, শক্তি ও স্বাস্থ্য চর্চ্চা যদিও ভারতবাসীর পক্ষে, বিশেষ করিয়া বাঙালীর পক্ষে, একান্ত আবশ্যক, তথাপি এ বিষয়ে ভারতবর্ষে কখনও কোন কংগ্রেস বা কনফারেন্স হয় নাই। শক্তি ও স্বাস্থ্য চর্চ্চার

বিভিন্ন শাখাপ্রশাখার সম্যক আলোচনার উদ্দেশ্যে বিগত ৪ঠা, ৫ই ও ৬ই মার্চ কলিকাতায় সিনেট হলে এক আলোচনা-সভা বা কনফারেন্সের অধিবেশন হয়। এরূপ আলোচনা-সভা ইতিপূর্ব্বে আর কোথাও হয় নাই বলিয়া এবং বাংলায় এই সম্বন্ধে আজকাল বিশেষ একটা জাগরণ আসিয়াছে বলিয়া এই অধিবেশন উল্লেখযোগ্য। ৪ঠা বেলা ৪-৪৫ ঘটিকায় সিনেট হলে সভাপতি সর্ নীলরতন সরকার মহাশয় আলোচনা-সভা আরম্ভ করেন। অভ্যর্থনা-কমিটির সভাপতি সর্ হরিশঙ্কর পাল নিজ অভিভাষণে শরীর ও স্বাস্থ্য চর্চ্চা সম্বন্ধে বহু প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। শরীর ও শক্তি চর্চ্চা যে শুধু মাংসপেশীগুলিকেই বাড়াইয়া তোলে না, পরোক্ষভাবে মানুষের ইচ্ছাশক্তি, নৈতিক গুণাগুণ, সাহস, সংযম ও একাগ্রতাকে পুষ্ট করিয়া তোলে, একথা সর্ হরিশঙ্কর জোরের সহিত বলেন। জীবনসংগ্রামে সর্ব্বক্ষেত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠায় সফলতা লাভ করিতে হইলে মানুষের যে-সকল ক্ষমতা প্রয়োজন হয়, শক্তি ও স্বাস্থ্য সাধনাদ্বারা সেই সকল ক্ষমতা আমরা অর্জ্জন করিতে পারি। পাশ্চাত্য জাতিদের উন্নতি বিশেষ করিয়া শক্তি ও স্বাস্থ্য চর্চ্চার ফল। প্রাচীন ভারতের গৌরবও ঐ শক্তি ও স্বাস্থ্যের ভিত্তির উপরে পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। বর্ত্তমানে যে এই ক্ষেত্রে আবার একটা নব জাগরণের সূত্রপাত হইয়াছে ইহাই আমাদের এই দুঃখদারিদ্র্যপীড়িত দেশের পক্ষে একটা বড় আশার কথা। সকল প্রকার দেশী ও বিদেশী খেলা, মল্লযুদ্ধ, লাঠিখেলা, মুষ্টিযুদ্ধ, সাঁতার, নৌচালনা, ড্রিল্, জিমন্যাষ্টিক-প্রভৃতির দিকে আমাদের পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। জাতীয় কর্ম্মশক্তির অনেকাংশ এই দিকে ব্যয় করিতে পারিলে তবেই আমাদের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভব হইবে।

সর্ নীলরতন সরকার মহাশয় তাঁহার বক্তৃতায় কয়েকটি বিষয়ের দিকে বিশেষ করিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন যে শতাধিক বর্ষ ধরিয়া বাংলায় শুধু শরীর-বর্জ্জিত ভাবে বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় এই পন্থার দোষ বুঝিয়া এখন জাতির শরীর ও শক্তির বনিয়াদ দৃঢ়তর করিবার জন্য তৎপর হইয়াছেন। আমাদের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শতকরা ৫০ জনের অধিক শরীর ও শক্তির দিক দিয়া বিকল। কাহারও চক্ষু, কাহারও শ্রবণশক্তি খারাপ, কেহ বা ফুসফুসের পীড়ায় বা অপর কোন রোগে আক্রান্ত। কয়েকটি খেলোয়াড়কে বিশ্ববিজয়ী করিয়া তোলা অপেক্ষা সকল বালক বালিকা ও যুবক যুবতীকে আরও অধিক শক্তি ও স্বাস্থ্য অর্জ্জন করাইতে পারিলে কাজ ভাল হইবে। বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিজয় করিবার আগে নিজের শরীরকে জয় করা দরকার। শরীর ও মনের সকল শক্তির পূর্ণ বিকাশ প্রয়োজন। একপেশে হইয়া বাড়িয়া উঠিলে জগতে আমাদের স্থান পিছনেই থাকিয়া যাইবে। দেহকে এমন করিয়া গড়িতে হইবে যে রোগ সে মন্দিরে প্রবেশ করিতে অক্ষম হইবে। মানুষের জন্ম হইয়াছে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য, অকালমৃত্যুর জন্য নহে। বাঁচিয়া থাকিবার পথ শরীর ও শক্তি সাধনার ভিতর দিয়া। এই সাধনা আত্মা ও মনের পবিত্রতা ও উন্নতির আকর।

বেঙ্গাল ফিজিক্যাল কালচার কনফারেন্সের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভাপতি মেজর ডাঃ পি, কে, গুপ্ত মহাশয় বলেন, যে, বাংলা নূতন উদ্দীপনায় অনুপ্রাণিত হইয়াছে। সে প্রেরণা আজ লক্ষ লক্ষ বাঙালী যুবকের প্রাণে জীবন্তরূপে বর্ত্তমান। এ একটা ফাঁকা আওয়াজ নহে। বাংলার ভবিষ্যতের সম্বল এই নূতন সাধনার আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু সম্মুখে বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র। সকলকেই এই

কার্য্যে নামিতে হইবে। যে সকল ব্যক্তি এই কর্ম্মে ব্রতী হইয়াছেন তাঁহাদের মিলিত চেষ্টা যদি একমুখী না হয়, তাহা হইলে চেষ্টা সফল হইবে না।

অতঃপর অধিবেশনের কার্য্য নিম্নলিখিতরূপে সম্পন্ন হয়।

৪ঠা মার্চ্চ। স্বাস্থ্যশিক্ষা শাখা। সভাপতি সর্ নীলরতন সরকার। এই শাখায় ডাক্তার রমেশচন্দ্র রায়, এম-বি, ডাঃ নবজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-বি, ডাঃ রায় হরিনাথ ঘোষ বাহাদুর, মেজর ডাঃ পি কে গুপ্ত প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা করেন।

৪ঠা মার্চ্চ। চিকিৎসামূলক ব্যায়াম শাখা। সভাপতি মেজর পি কে গুপ্ত। প্রবন্ধ-পাঠক ও বক্তা :—ডাঃ আর এন ঘোষ, এম-বি, ডাঃ এস কে সেন, এম-বি, মিঃ বি-কে বাঁড়ুজ্যে, মিঃ ভূপেশ কর্ম্মকার, মিঃ ইউ এন বাঁড়ুজ্যে প্রভৃতি।

৫ই মার্চ্চ। জলক্রীড়া শাখা। সভাপতি রায় ডাঃ হরিধন দত্ত বাহাদুর। বক্তৃতা ও প্রবন্ধ পাঠ করেন, মিঃ শ্যামচাঁদ দত্ত, মিঃ শান্তি পাল, বৃন্দাবন ভট্টাচার্য্য, মিঃ প্রভাস ঘোষ, মিঃ মাখনলাল ধর, মিঃ দেবেশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি।

৫ই মার্চ্চ। শক্তিপরিচায়ক খেলা ও শরীর গঠন শাখা। সভাপতি স্বামী যোগানন্দ। বক্তা ও প্রবন্ধপাঠক মধুসূদন মজুমদার, অরবিন্দ ঘোষ, বি কে বাঁড়ুজ্যে, দিগেন দেব, সমীরণ বাঁড়ুজ্যে, কেশব গুপ্ত, হরেন কাপাসী, রাধানাথ বাঁড়ুজ্যে, কেশব সেনগুপ্ত, নীলমণি দাস, কুঞ্জলাল বসু, বিধুভূষণ জানা, রবীন সরকার প্রভৃতি।

৬ই মার্চ্চ। বড় ও ছোট খেলা ও দৌড়ধাপ (atheltics)। সভাপতি মিঃ এস এন বন্দ্যোপাধ্যায়, বার-এট-ল। বক্তা ও প্রবন্ধ-পাঠক প্রফেসর শৈলজারঞ্জন রায়, মিঃ গোষ্ট পাল, মিঃ কে ভট্টাচার্য্য, মিঃ রবীন সরকার, মিঃ হাবুল সরকার প্রভৃতি।

৬ই মার্চ্চ। খোলা হাওয়ায় জীবনযাত্রা শাখা। সভাপতি মিঃ এন এন বসু, বার এট-ল। বক্তা ও প্রবন্ধপাঠক মিঃ ডি এন মুখুজ্যে ও মিঃ বি কে জোশী, বার-এট-ল।

৬ই মার্চ্চ। পুরুষোচিত ক্রীড়াকলাপ শাখা। সভাপতি, মল্লযুদ্ধ বিভাগ, মিঃ জে সি গুহ (গোবর বাবু); সভাপতি, লাঠি ও অসি বিভাগ, মিঃ পুলিনবিহারী দাস; সভাপতি, মুষ্টিযুদ্ধ-বিভাগ, মিঃ ডি, পি, খেতান।

বক্তা ও প্রবন্ধপাঠক সত্যেন গাঙ্গুলী, পি বল্লভ, কমলাকান্ত গুপ্ত, সন্তোষ দত্ত, সুবলচাঁদ চন্দ, জগৎকৃষ্ণ শীল, অশোক চট্টোপাধ্যায়, রবীন সরকার, সুশীল মিত্র প্রভৃতি। অধিবেশনের সূত্রে ৫ই ও ৬ই সন্ধ্যায় জিমন্যাষ্টিক, লাঠি, ছুরি, তলোয়ার, রামদা, সড়কি, বল্লম ইত্যাদির খেলা, মল্লযুদ্ধ, মুষ্টিযুদ্ধ ইত্যাদি দেখান হয়। ইহাতে কলিকাতা ও মফঃস্বলের অনেক স্বনামধন্য খেলোয়াড় যোগদান করেন। তাহার মধ্যে ফরিদপুরের ডাঃ সুবোধচন্দ্র সরকার, এম-বি র নাম বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য। তিনি ফরিদপুর হইতে অনেকগুলি খেলোয়াড়কে লইয়া আসেন ও কলিকাতায় প্রায় দেখা যায় না এরূপ বহু খেলা দেখান। কুমারী বাণী ঘোষ ও কুমারী বীণা ঘোষের লাঠি ও তলোয়ার খেলাও বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল। বাঙলায় যে বালিকাদের মধ্যে এরূপ খেলোয়াড় আছে তাহা অনেকে না দেখিলে বিশ্বাস করিতেন না।

১৩৪৩ ভাদ্র

মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের জয়

১৯১১ সালে মোহনবাগান দলের ফুটবল খেলোয়াড়রা অন্য সব ভারতীয় ও ইংরেজ দলকে পরাজিত করিয়া ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশ্যনের শীল্ড প্রাপ্ত হন। তাহার পর ২৫ বৎসর ধরিয়া আর কোন ভারতীয় দল শীল্ড পান নাই। সেই জন্য বর্ত্তমান বৎসরে আর সব দেশী ও বিদেশী দলকে হারাইয়া মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের শীল্ড লাভ বিশেষ সন্তোষের কারণ হইয়াছে। এই দল পুরুষোচিত ক্রীড়ার ক্ষেত্রে দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন।

১৩৪৩ আশ্বিন

হনুমান ব্যায়ামপ্রসারক মণ্ডল

হনুমান রামচন্দ্রের প্রধান ভক্ত ও সেবক ছিলেন, এবং দৈহিক শক্তি ও বীরত্বেও তিনি অনতিক্রান্ত ছিলেন। রামায়ণ হইতে ইহা জানিতে পারা যায়; এবং রামায়ণের পাঠক বঙ্গে অগণিত। অথচ, যেহেতু তিনি এই মহাকাব্যে বানর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, এই কারণে বাংলা দেশে 'হনুমান' নামটি তাচ্ছিল্য ও উপহাসের জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের অন্য অনেক প্রদেশে হনুমান শব্দটির সহিত এরূপ কোন ভাব জড়িত নাই। সেই হেতু পশ্চিমে, 'হনুমানপ্রসাদ' 'হনুমানসহায়' প্রভৃতি নাম অনেকের থাকে, এবং মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতেও 'হনুমন্ত রাও' নামের প্রচলন আছে।

বেরারের অমরাবতী নগরের 'হনুমান ব্যায়ামপ্রসারক মণ্ডল' সম্বন্ধে কিছু সংবাদ দিবার পূর্ব্বে এই ভূমিকাটুকু করা আবশ্যক মনে করিলাম।

এই মণ্ডলের উদ্দেশ্য, দেশী বলবর্দ্ধক ক্রীড়া ও ব্যায়াম-সমূহের প্রচলন বৃদ্ধি ও উৎকর্ষ সাধন। ইহার একটি ব্যায়ামদক্ষ ক্রীড়ানিপুণ দল সম্প্রতি বার্লিনে ওলিম্পিক গেমসের সময় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সেখানে 'হা-ডু-ডু-ডু', (মহারাষ্ট্রীয়) 'আট্যা পাট্যা' প্রভৃতি খেলা বিশ হাজার দর্শকের সম্মুখে দেখাইয়া সকলের তাক লাগাইয়া দিয়াছেন। নানাবিধ ব্যায়ামে তাঁহাদের ছন্দোবদ্ধ অঙ্গসঞ্চালন সকলকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করিয়াছে। তথায় দেশী এই সকল ক্রীড়া ও ব্যায়ামের বর্ণনা-পুস্তিকার চাহিদা হইয়াছে। তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের "যদি তোর ডাক শুনে কেও না আসে, তবে একলা চলরে", দল বাঁধিয়া গাইয়াও হাজার হাজার শ্রোতার আনন্দ ও বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের গান বঙ্গের নিরক্ষর সাধারণ লোকেও গায়, তাঁহার "জনগণমন অধিনায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা" ভারতবর্ষে সিন্ধু প্রভৃতি দেশে ও সিংহলে গীত হয়, কিন্তু "একলা চলরে" গানটি যে পৌরুষসম্পন্ন বহু মহারাষ্ট্রীযের হৃদয় জয় করিয়াছে, তাহা জানিতাম

না।

আমাদের দেশী দৈহিক শক্তিবর্দ্ধক খেলাগুলির ও অধিকাংশ তদ্রূপ ব্যায়ামের একটি গুণ এই, যে, তাহাদের অনেকগুলির জন্য একটি পয়সারও সাজসরঞ্জাম কিনিতে হয় না, এবং যেগুলির জন্য সাজসরঞ্জাম আবশ্যক, তাহাদের উপকরণের মূল্যও সামান্য। সুতরাং ধনী নির্ধন সকলেরই এগুলি উপযোগী। বঙ্গো নিরক্ষর গ্রাম্য লোকদের মধ্যে এই রকম সব খেলা ও কুস্তি বরাবর প্রচলিত ছিল, এবং এখনও কিয়ৎপরিমাণে আছে—যদিও ফুটবল প্রভৃতিও তাহাদের মধ্যে ঢুকিয়াছে। আমরা বাল্যকালে ইস্কুলে পড়িবার সময় এই সকল খেলা খেলিতাম ও কুস্তি করিতাম। এখন কলিকাতায় ও অন্য কোথাও কোথাও এই সব খেলা আবার প্রচলনের চেষ্টা হইতেছে। কিছু প্রচলন হইয়াছেও। ইহা শুভ লক্ষণ।

১৩৪৩ কার্ত্তিক

সুইডেনে ব্যায়ামদক্ষ বাঙালী

ঢাকার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্ররঞ্জন বিশ্বাস, বি-এ, এখন গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাবিজ্ঞান অধ্যয়ন করিতেছেন এবং দৈহিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠান স্কটিশ কলেজ অব্ ফিজিক্যাল এডুকেশ্যনেও শিক্ষালাভ করিতেছেন। তিনি সুইডেনের মাল্মাহেড্ নামক স্থানে গত গ্রীষ্মের সময় সুইডিশ ব্যায়াম-উৎসবে (Swedish gymnastic festivalএ) যোগদান করেন। ইউরোপের্ নানা স্থান হইতে সমাগত জনতা বিদেশী বলিয়া তাঁহার সমাদর করেন। তিনি সুইডেনের পৃথিবীবিখ্যাত ব্যায়ামপ্রণালী শিখিবার জন্য সারা সুইডেন ভ্রমণ করিয়াছেন। সিড্স্ভেনস্কা জিমনাষ্টীক নামক প্রতিষ্ঠান (Sydsvenska Gymnastic Institute) তাঁহাকে প্রশংসাপত্র (diploma) দিয়াছে। তিনি সুইডিশ জিম্নাষ্টীক সভা হইতে "শ্রেষ্ঠ ব্যায়ামদক্ষের নিদর্শন" ("Elite gymnastic mark") লাভ করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে কেবল এক জন বিদেশী এই নিদর্শন পাইয়াছিলেন। তিনি বাংলা দেশে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার সুইডেনের উৎকৃষ্ট ব্যায়ামপদ্ধতির অভিজ্ঞতা দেশের কাজে লাগিবে।

১৩৪৪ শ্রাবণ

মোহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের জয়

মোহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব কলিকাতায় ফুটবল লীগ খেলায় এবারেও বিজয়ী হইয়াছেন। ইহার পূর্ব্বের তিন বৎসরও তাঁহারা লীগ খেলায় জয়লাভ করিয়াছিলেন। অন্য কোন ক্লাব এ-পর্য্যন্ত এরূপ কৃতিত্ব অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের এই কৃতিত্বে ক্রীড়ার ক্ষেত্রে দেশ গৌরবান্বিত হইয়াছে।